প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

১৫৮০ খৃঃ অব্দে টোডরমল্ল কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয় হইতে ১৬৮০ খৃঃ অব্দে শিবজীর মৃত্যু পর্য্যন্ত একশত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল, এই একশত বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষে মোগলক্ষমতা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সময়ে ভারতবাসিদিগের জাতীয় জীবন ও উদ্যম ও কার্য্যপরম্পরা সম্যক্‌রূপে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করা লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য। উপরিউক্ত শতবর্ষের মধ্যে আকবর ও জেহাঙ্গীর, শাহজেহান ও আরংজীব এই সম্রাটচতুষ্টয়ের শাসনকাল এই উপন্যাসচতুষ্টয়ে যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গবাসিগণ বঙ্গদেশ মাত্র আপনাদিগের দেশ বলিয়া মনে করিতেন; অর্দ্ধশতাব্দির সুশিক্ষা ও অন্যান্য ঘটনাবশতঃ অদ্য তদপেক্ষা উদার মতের আবির্ভাব হইয়াছে। অধুনা সুশিক্ষিত বঙ্গবাসী মাত্রই সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া জ্ঞান করেন; মহারাষ্ট্রীয় ও রাজপুত, উত্তরপশ্চিমবাসী ও শিখ সকলকেই স্বদেশী ও ভ্রাতাস্বরূপ জ্ঞান করেন ভারতের অসংখ্য লোকের মধ্যে দিনে দিনে সৌহৃদ্য ও নিকট সম্বন্ধ বৃদ্ধি পাইতেছে, দিনে দিনে ভারতবাসিগণ এক জাতি হইতেছে। লেখকের অল্প ক্ষমতার যতদূর সাধ্য, এই উদার বিশ্বাস সমর্থন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই উপন্যাসোল্লিখিত ব্যক্তিগণ বঙ্গক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া ভ্রমণ করিয়াছেন, সমস্ত ভারতক্ষেত্র লেখকের কল্পনাবিচরিত ভূমি। বঙ্গদেশ ও রাজস্থান, উত্তর, পশ্চিম ও মহারাষ্ট্র এই প্রদেশচতুষ্টয় অবলম্বন করিয়া এই উপন্যাসচতুষ্টয় যথাক্রমে রচিত হইয়াছে।

উপরি উক্ত শত বৎসরের মধ্যে প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি,—অর্থাৎ মোগলক্ষমতার উন্নতি ও রাজপুতদিগের অবনতি, পরে মোগলক্ষমতার অবনতি ও মহারাষ্ট্রদিগের উন্নতি,—এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। এই ঘটনা বলিতে যে যে মহল্লোক লিপ্ত ছিলেন, তাঁহাদিগেরও যথাস্থানে উল্লেখ আছে। টোডরমল্ল, মানসিংহ, প্রতাপসিংহ, জয়সিংহ, জগৎসিংহ ও শিবজী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় হিন্দু বীরগণ এই শত বৎসরের মধ্যে আপন আপন কীর্ত্তিদ্বারা যশের অবিনশ্বর মন্দিরে স্থান পাইয়াছেন।

শিবজীর মৃত্যু হইতে দুই শতাব্দি অতিবাহিত হইয়াছে;—এতদিনের পূর্ব্বের কথা বর্ণনা করিতে স্থানে স্থানে ভুল হয় নাই, এরূপ আশা করি না। তবে যতদূর সাধ্য ইতিহাস আদর্শ করিয়া ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রের প্রকৃত বর্ণনায় যত্নবান হইয়াছি। ছয় বৎসরের পরিশ্রমের ফল অদ্য পাঠক-হস্তে অর্পণ করিলাম।

কাটওয়া।
১৩ই আগষ্ট ১৮৭৯।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

বঙ্গবিজেতা।

শতবর্ষ।

অর্থাৎ,

মোগল কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয় হইতে শিবজীর মৃত্যু পর্য্যন্ত
একশত বৎসরের ঘটনা-সম্বন্ধীয়
উপন্যাস-চতুষ্টয়।

"বঙ্গবিজেতা," "জীবনসন্ধ্যা," "মাধবীকঙ্কণ," "জীবনপ্রভাত"।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত-প্রণীত।

২য় সংস্করণ।

কলিকাতা।
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং কর্ত্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮৮ সাল।

উপহার।

মদীয়

বিদ্যালয়ে সহাধ্যায়ী,

বিদেশ-ভ্রমণে চির-সহচর,

জীবনের বন্ধু,

শ্রীবিহারীলাল গুপ্ত মহানুভবকে

এই প্রণয়োপহার প্রদান

করিলাম।

মেহেরপুর।
২৬এ অক্টোবর, ১৮৭৪।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

বঙ্গবিজেতা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রুদ্রপুরে আগমন।

While the ploughman near at hand,
Whistles o'er the furrowed land,
And the milkmaid singeth blithe,
And the mower whets his scythe,
And every shepherd tells his tale
Under the hawthorn in the dale.

Milton.

১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ ও বিহার দেশে হিন্দুরাজ্যের নাম লোপ হইল। সেই অবধি ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আফগান অথবা পাঠানেরা এই দেশে রাজত্ব করেন। ইঁহারা কখন দিল্লী সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিতেন, কখন বা সময় পাইলে স্বাধীনভাব অবলম্বন করিতেন। ইঁহাদিগের রাজ্যতন্ত্র অনেকাংশে ইউরোপীয় ফিউডল রাজ্যতন্ত্রের সদৃশ ছিল। দেশের সিংহাসন শূন্য হইলেই কখন কখন সেনাপতিগণ আপনাদিগের মধ্যে কাহাকেও রাজা স্থির করিতেন, কখন বা কোন সেনাপতি আপন বাহুবলে সিংহাসনে আরোহণ করিতেন। দেশের অধিপতি কোন একটী উৎকৃষ্ট জেলা আপন অধীনে রাখিতেন, অন্যান্য জেলা প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতেন। তাঁহারা আবার আপন অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে জমী বিভাগ করিয়া দিতেন। কালক্রমে এইপ্রকার রাজ্যতন্ত্রের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। সেনাপতিগণ কখন কখন বঙ্গাধিপতির অধীনতা স্বীকার করিতেন, আবার সুযোগ পাইলেই আপন আপন জেলায় স্বাধীনভাব

অবলম্বন করিতেন। বঙ্গদেশীয় হিন্দুগণ সাহস ও যুদ্ধকৌশলে ন্যূন হইলেও অতিশয় বুদ্ধিমান ও কর্ম্মঠ; এজন্য পাঠান অধ্যক্ষগণ তাঁহাদিগকেই প্রধান প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, তাঁহাদিগকেই জমীদার করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা প্রজার নিকট কর সংগ্রহ করিতেন এবং তাঁহাদিগকেই বিশেষ সম্ভ্রমের পাত্র করিতেন। এমন কি, বঙ্গদেশের পাঠান রাজাদিগের মধ্যে আমরা একজন হিন্দুরাজারও নাম দেখিতে পাই। ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংস রাজা বঙ্গদেশের অধিপতি হইয়া সাত বৎসর নিরাপদে রাজত্ব করেন। তিনি পূর্ব্বে জমীদার ছিলেন, আপন বাহুবলে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পুত্র মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করেন ও তাঁহার বংশ সর্ব্বশুদ্ধ চত্বারিংশৎ বৎসর বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। উপরি উক্ত বিবরণ হইতে অনায়াসেই প্রতীয়মান হইবে যে, দেশে হিন্দুদিগের প্রভূত ক্ষমতা ছিল। দেশস্থ জমীদার, জায়গীরদার, অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন; প্রধান প্রধান জমীদারদিগের কিছু কিছু সৈন্য থাকিত ও যুদ্ধসময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধাগণ তাঁহাদিগকে স্ব স্ব দলভুক্ত করিতে বিশেষ যত্ন করিতেন।

দেশের কৃষক ও প্রজাগণ সম্পূর্ণরূপে জমীদারদিগের অধীন থাকিত। জমীদারগণ সচ্চরিত্র ও সদয় হইলে কৃষকদিগের আনন্দ; জমীদার প্রজাপীড়ক হইলে তাহাদিগের আর নিস্তার থাকিত না। পরাক্রান্ত জমীদারগণ প্রায়ই আপনাদিগের মধ্যে যুদ্ধ করিতেন, তাহাতেও দেশের বিশেষ অনিষ্ট হইত। ফলতঃ সে সময়ে যে জমীদার বিশেষ বুদ্ধিকুশল হইতেন, তিনি ছলে বলে কৌশলে অন্যান্য জমীদারের নিকট হইতে জমী লইয়া আপন অধিকার বাড়াইতে পারিতেন। প্রজাদিগের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ হইলে তাঁহারা কিম্বা তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণ নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন, দস্যু ও দুশ্চরিত্র লোকদিগকে তাঁহারাই দণ্ড দিতেন, তাঁহারাই গ্রামে গ্রামে শান্তিরক্ষা করিতেন। অধিক কি, তৎকালে তাঁহারাই প্রজাগণের "বাপ মা" ছিলেন। প্রজারা কি হারে কর দিবে, তাহা তাঁহারাই নির্দ্ধারিত করিতেন; তাঁহারা যাহা চাহিতেন, তাহা দিতে অসম্মত হওয়া কোন প্রজার সাধ্য ছিল না। তাঁহারা অবিচার করিলে সুবিচারের সম্ভাবনা ছিল না। ফলতঃ জমীদারেরাই প্রজাদিগের শাসনকর্ত্তা ও বিচারপতি ছিলেন, তাঁহারাই প্রজাদিগের রক্ষক ও রাজা ছিলেন।

১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে শেষ পাঠান রাজা দায়ুদ খাঁ বঙ্গদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার পরবৎসরেই আকবর শাহ এই দেশ জয় করি-

বার অভিলাষ করেন। তিনি স্বয়ং পাটনা নগর বেষ্টন ও অধিকার করিয়া মনাইম খাঁকে সেনাপতি রাখিয়া দিল্লী যাত্রা করেন। মনাইম খাঁ নামমাত্র সেনাপতি ছিলেন; ক্ষত্রিয়চূড়ামণি রাজা টোডরমল্লই বস্তুতঃ পাঠানদিগের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ জয় করেন। তিনিই দায়ুদ খাঁকে বার বার পরাস্ত করিয়া অবশেষে কটকের মহাযুদ্ধে জয়লাভ করেন। তাহাতে দায়ুদ খাঁ ভীত হইয়া ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ ও বিহারদেশ মোগলদিগকে অর্পণ করিলেন ও কেবল উড়িষ্যা মাত্র আপন অধীনে রাখিলেন। এই সন্ধির পরই টোডরমল্ল দিল্লী যাত্রা করেন, এবং দায়ুদ খাঁ অবকাশ পাইয়া সন্ধির কথা বিস্মৃত হইয়া পুনরায় বঙ্গদেশ অধিকার করেন। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আকবর শাহ হোসেন কুলীখাঁকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করেন; তিনি নামমাত্র সেনাপতি; রাজা টোডরমল্লই সর্ব্বেসর্ব্বা। টোডরমল্ল দ্বিতীয়বার বঙ্গদেশে আসিয়া রাজমহলের মহাযুদ্ধে দায়ুদ খাঁকে পরাস্ত করেন। সেই যুদ্ধে দায়ুদ খাঁ নিহত হয়েন ও পাঠান রাজ্য বিলুপ্ত হয়। দিল্লীশ্বর হোসেন কুলীখাঁকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন, এবং টোডরমল্ল পুনরায় দিল্লী প্রত্যাগমন করেন। হোসেন কুলী ও তৎপরে মজফ্ফর খাঁ চারি বৎসরকাল বঙ্গদেশ শাসন করেন। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইল ও মজফ্ফর খাঁ নিধন প্রাপ্ত হইলেন। আকবর শাহ অতিশয় বুদ্ধিমান সম্রাট্ ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, যে হিন্দুসেনাপতি বঙ্গদেশ দুইবার জয় করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর কেহই সেই শত্রুসঙ্কুল দেশ দিল্লীর অধীনে রাখিতে পারিতেছেন না। সুতরাং ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে টোডরমল্ল সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত হইয়া বঙ্গদেশে প্রেরিত হইলেন। কিপ্রকারে এই নিঃশঙ্ক বীরপুরুষ তৃতীয়বার বঙ্গদেশ জয় ও দুই বৎসরকাল বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যাদেশ শাসন করেন, তাহা এই আখ্যায়িকায় বিবৃত হইবে। এই আখ্যায়িকায় ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের কথা লিখিত হইবে, সুতরাং সেই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান, জমীদার ও প্রজা, পাঠান ও মোগলদিগের মধ্যে কিপ্রকার সম্বন্ধ ছিল, সংক্ষেপে বিবৃত হইল, তাহাতে পাঠক মহাশয় বোধ হয় বিরক্ত হইবেন না।

একদিন প্রাতঃকালে এক ব্রহ্মচারী নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী ইচ্ছামতী নদীতীরস্থ রুদ্রপুর নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। চারিদিকে কেবল বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র সকল দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছিল।

প্রভাতবায়ু রহিয়া রহিয়া শস্যক্ষেত্রের উপর খেলা করিতেছিল। শস্য আনন্দে যেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতেছিল। বহুদূরে প্রান্তরসীমায় দুই একটী পল্লীগ্রাম দেখা যাইতেছিল; কুটীরাবলি দেখা যায় না, কেবল নিবিড় হরিৎবর্ণ বৃক্ষাবলি নয়নগোচর হইতেছিল। আকাশ অতি নীল, পক্ষী সকল গান করিতেছিল। কৃষকগণও পল্লীগ্রাম হইতে আসিতে আসিতে মনের উল্লাসে গান করিতেছিল। ব্রহ্মচারী যাইতে যাইতে একজন কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রুদ্রপুর আর কত দূর?" কৃষক উত্তর করিল, "অধিক দূর নাই, প্রায় আধ ক্রোশ হইবে।"

সেই ক্ষেত্র হইতে একজন ভদ্রোচিত বেশে ব্রহ্মচারীর নিকট আসিতে আসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, রুদ্রপুরে যাইতেছেন? আমি তথাকার লোক; চলুন, একত্রে যাই,—আপনার নাম কি, নিবাস কোথায়?" এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিল। ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "আমার নাম শিখণ্ডিবাহন, ইচ্ছামতী নদীতীরে মহেশ্বরমন্দির হইতে আসিতেছি। তোমার নাম কি?"

"আমার নাম নবীন দাস; এই স্থানে আমার কিছু জমী আছে, সেইজন্য আমি আসিয়াছিলাম।"

শিখ। "এবার শস্য হইয়াছে?"

নবী। "ঠাকুর, আমার দুই কুড়ি বৎসর পার হইয়াছে, এমন সুন্দর শস্য কখন দেখি নাই। বিধাতার অনুগ্রহের সীমা নাই। তবে—"

শিখ। "তবে কি?"

নবী। "অদৃষ্টে কি আছে কে বলিতে পারে? মোগল পাঠানে যেরূপ যুদ্ধ, কি হয়, কে জানে? যেস্থান দিয়া একবার সেনা যায়, সেস্থান যেন মরুভূমি হইয়া পড়ে।"

ক্ষণেক পর নবীন দাস আবার বলিতে লাগিল, "আমাদের জমীদার-পুত্রের কি হইয়াছে, শুনিয়াছেন?"

শিখ। "না; কি হইয়াছে?"

নবী। "তিনি এক প্রকার উন্মত্তের মত হইয়াছেন, কারণ কেহ জানে না। তাঁহার পিতা তাঁহার আরোগ্যের জন্য কত যত্ন করিলেন, কোন ফল হইল না। আপনি ঠাকুর লেখাপড়া জানেন, আপনি কিছু স্থির করিতে পারেন?"

শিখ। "শাস্ত্রে উন্মত্ততার অনেক কারণ নির্দ্দেশ করে,—বন্ধুর বিয়োগ, রমণীর প্রেম—"

নবী। "না, সেরূপ নহে; আমাদের জমীদারপুত্র কত প্রকার বিহ্বল কথা বলেন, কিছু ঠিকানা থাকে না। বোধ হয়, অনেক লেখা-পড়া শিখিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছেন।"

শিখ। "কি বলেন, বলিতে পার?"

নবী। "কখন বলেন, বৈরনির্যাতন পরম ধর্ম্ম, কখন বলেন, স্ত্রীরত্ন পরম রত্ন,—কেও ইন্দ্রনাথ শর্ম্মা? ঠাকুর প্রণাম।"

এই বলিয়া নবীন দাস পথের একপার্শ্বে উপবিষ্ট এক মলিনবসন যুবাপুরুষকে সম্বোধন করিল। যুবক কি চিন্তা করিতেছিলেন, হঠাৎ আপন নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া ফিরিয়া দেখিলেন, দেখিয়া উঠিয়া পথিকদিগের সঙ্গে চলিলেন। নবীন দাস বলিতে লাগিল,—

"ইনি আমাদের গ্রামের পাগলা ঠাকুর। তবে পাগলা ঠাকুর! অনেক দিন দেখি নাই কেন? আমাদের গ্রাম হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছিলে? আর এখনই বা ভূমিতে উপবিষ্ট কেন?" ইন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "সমস্ত রাত্রি চলিয়া শ্রান্ত হইয়াছিলাম।" নবীন পাগলকে আর কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়া পূর্ব্বোক্ত কথা আরম্ভ করিল,—

"শুনিয়াছি, আমাদের জমীদারপুত্র কখন কখন বলিতেন, বৈরনির্যাতনে পরম সুখ, কখন বলিতেন, স্ত্রীরত্ন পরম রত্ন, কখন বলিতেন, বন্ধুহত্যার মত পাপ নাই, আবার কখন বলিতেন, প্রজার কষ্ট দেখা অপেক্ষা মৃত্যু-ভাল।"

শিখণ্ডিবাহন অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমার বোধ হয়, তিনি কোন ভয়ানক পাপ করিয়া থাকিবেন, মহাপাপে চিত্তের উন্মত্ততা জন্মে।"

নবী। "তিনি কোন পাপ করিবেন, আমার এমন বিশ্বাস হয় না।"

এই বলিয়া নবীন দাস ক্ষণেক স্থির হইয়া যেন পূর্ব্বকথা স্মরণ করিতে লাগিল। পুনরায় বলিল, "তাঁহার অন্তঃকরণে যে দয়া, তিনি পাপ করিতে পারেন না। আজ প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইল, আমি একবার ইচ্ছাপুর গিয়াছিলাম, দেখিলাম দুই চারি জন প্রজা খাজানা দিতে পারে নাই বলিয়া ঘরে আবদ্ধ আছে। তখন আমাদের জমীদারপুত্র সুরেন্দ্র-নাথের বয়স ৫।৬ বৎসর হইবে। তিনি লুকাইয়া ঘরের দ্বার খুলিয়া দিলেন ও প্রজাগণের হস্তে দুইটী করিয়া মুদ্রা দিলেন। প্রজারা আনন্দে খাজানা দিয়া চলিয়া গেল।"

ইন্দ্রনাথ অতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার পর?"

"তাহার পর প্রজারা হঠাৎ কেন খাজানা দিল, মুদ্রাই বা কোথা হইতে পাইল, কেহ কিছু স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে প্রজারা গৃহে ফিরিয়া গেলে পর শিশু অতি ভয়ে ভয়ে পিতার নিকট আপন কর্ম্ম স্বীকার করিলেন। তাঁহার পিতা নগেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। আমি দ্বারে, দাঁড়াইয়াছিলাম; আমার চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল।"

এই প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে তিন জনই রুদ্রপুর গ্রামে উপস্থিত হইলেন। নানাপ্রকার বৃহদাকার বৃক্ষে গ্রাম আচ্ছাদিত রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে সূর্য্যরশ্মি পত্রের ভিতর দিয়া শুষ্কপত্ররাশি ও গ্রাম্য পথের উপর পতিত হইতেছে। ডালে ডালে নানাপ্রকার সুন্দর পক্ষী গান করিতেছে,—কোকিল, শ্যামা, দোয়েল, ফিঙ্গা, পাপিয়া, ঘুঘু, সকলেই নিজ নিজ রবে মনের উল্লাস প্রকাশ করিতেছে! মোগল পাঠানের জয়-বিজয়ে তাহাদের বিশেষ চিন্তা বা ক্ষতি লাভ নাই,—সম্পূর্ণ উদাসীন, উচ্চে বসিয়া রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে গ্রাম্য সরোবরে পদ্ম ও শালুক ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, স্থানে স্থানে বৃক্ষতলে দুই একটী কুটীর দেখা যাইতেছে, স্থানে স্থানে দুই একজন কৃষক গান করিতে করিতে মাঠে যাইতেছে, তাহাদের গৃহিণীগণ মৃন্ময়-কলস কক্ষে লইয়া হেলিয়া দুলিয়া জল আনিতে যাইতেছে।

শিখণ্ডিবাহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশ্বেতা নামে এক ব্রাহ্মণী এই গ্রামে বাস করেন, তাঁহার নিবাস কোথা?"

ইন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিলেন। ক্ষণেক পর বলিলেন, "চলুন, আমি দেখাইয়া দিতেছি।" অনন্তর কিছু পথ লইয়া গিয়া দূর হইতে মহাশ্বেতার ঘর দেখাইয়া দিলেন। শিখণ্ডিবাহন মহাশ্বেতার ঘরে অতিথি হইলেন, আর ইন্দ্রনাথ তাঁহার চিরপরিচিত সরলস্বভাব বন্ধু নবীন দাসের বাটীতে অতিথি হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্রতাবলম্বিনী।

She stole along, she nothing spoke,
The sighs she heaved were soft and low,
And naught was green upon the oak,
But moss and rarest mistletoe:
She kneels beneath the huge oak tree,
And in silence prayeth she.
Coleridge.

রজনী প্রায় এক প্রহর হইয়াছে। আজি শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী; কিন্তু মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন; ক্ষেত্র, গ্রাম, অটবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। খদ্যোৎমালা বৃক্ষলতাদির নিবিড় অন্ধকার রঞ্জিত করিতেছে। ইচ্ছামতী নদী বিপুলকায়া হইয়া তরঙ্গমালায় প্রবাহিত হইতেছে ও সেই তরঙ্গমালা নিশাবায়ুবেগে অধিকতর উচ্ছ্বাসিত হইতেছে। নিবিড় নিকুঞ্জ বনের ভিতর দিয়া স্বন্ স্বন্ শব্দে বায়ু প্রধাবিত হইতেছে, বায়ুর শব্দ ও তরঙ্গের শব্দ ভিন্ন আর কিছুই কর্ণগোচর হইতেছে না। সমগ্র জগৎ সুপ্ত।

এপ্রকার গভীর অন্ধকারে, এই শীত বায়ুতে একাকিনী কোন্ শুভ্র-বসনা নদীজলে অবগাহন করিতেছেন? ইনি ব্রতাবলম্বিনী! অন্ধকারে ইহাঁর শুভ্র বসন ব্যতীত আর কিছুই দেখা যাইতেছে না। স্নানানন্তর বন-পুষ্প চয়ন করিতে লাগিলেন। পরে নিকটবর্ত্তী এক পুরাতন বটবৃক্ষতলে এক শিবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া কবাট রুদ্ধ করিলেন।

মন্দিরের ভিতর একটী অল্পায়ত শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত শিবপ্রতিমা ও একটী প্রদীপ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। সেই প্রদীপের জ্যোতিঃ রমণীর শুভ্র বসনে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। রমণী অনেককাল যৌবনাবস্থা অতি-বাহন করিয়াছেন; বয়ঃক্রম চত্বারিংশৎ বর্ষের অধিক হইবে, শীর্ণ কলেবর ও দুই একটী শুভ্র কেশ দেখিলে হঠাৎ পঞ্চাশৎ বর্ষেরও অধিক বোধ হয়! যদি তাঁহার শ্বেত বসন না থাকিত, তাহা হইলে অন্ধকারে ঘাটে স্নান করিতে দেখিলে কৃষকপত্নী বলিয়াও বোধ হইতে পারিত। মন্দিরাভ্যন্তরে দীপালোকে তাঁহার মুখ অবলোকন করিলে সে ভ্রম আর থাকিতে পারে না। শরীর শীর্ণ, দীর্ঘায়ত অথচ কোমলতাশূন্য নহে। ললাট উচ্চ

ও প্রশস্ত; কিন্তু চিন্তারেখায় গভীরাঙ্কিত। গুচ্ছ গুচ্ছ শ্বেত কৃষ্ণ কেশ-রাশি কপোলে, হৃদয়ে ও গণ্ডে লম্বিত রহিয়াছে। নয়নে যে সমুজ্জ্বলতা, তাহা প্রায় নবীনার নয়নেও দেখা যায় না। কিন্তু সে যৌবনের সমুজ্জ্বলতা নহে, হৃদয়ের সমুজ্জ্বল চিন্তাগ্নি যেন নয়ন দিয়া বিস্ফুলিঙ্গরূপে বহির্গত হইতেছে। ওষ্ঠ অতি সুচিক্কণ অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞাপ্রকাশক। সমস্ত শরীর গম্ভীর ও উন্নত; ও বিধবার শ্বেতবস্ত্রে আবৃত হইয়া অধিকতর গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়াছে। রমণী পুষ্প সকল প্রতিমার সম্মুখে রাখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

অনেকক্ষণ উপাসনা করিতে লাগিলেন। বায়ু ক্রমশঃই প্রবল হইতে লাগিল, ও রহিয়া রহিয়া বটবৃক্ষের ভিতর দিয়া ভীষণশব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে কবাট ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিতে লাগিল, প্রদীপ নির্ব্বাণপ্রায়, কিন্তু রমণীর মুখমণ্ডলের স্থিরভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইল না। স্থিরভাবে, মুদিতনয়নে, নিস্পন্দশরীরে প্রায় এক প্রহর কাল আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে কি কামনা, কি বিষয়ে আরাধনা করিলেন, অনুভব করিতে আমরা সাহস করি না।

উপাসনা সাঙ্গ হইলে রমণী প্রদীপ লইয়া বহির্গত হইবার জন্য কবাট খুলিলেন। খুলিবামাত্র বাতাসে প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। সেই ঘনান্ধকার নিশীথসময়ে ক্ষীণাঙ্গী প্রবল বায়ুবেগে কিঞ্চিন্মাত্র কাতরা না হইয়া ধীরে ধীরে রুদ্রপুরের গ্রাম্য পথ দিয়া কুটীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথ অতি সঙ্কীর্ণ; উভয় পার্শ্বে কেবল নিবিড় বন ও তাহার পার্শ্বে বৃহৎ বৃক্ষসমূহের পত্ররাশি দ্বারা অন্ধকার দ্বিগুণ নিবিড় বোধ হইতেছে। সেই বৃক্ষতলে স্থানে স্থানে এক একটা কুটীর দেখা যাইতেছে। কুটীরবাসীগণ সকলেই সুপ্ত; জীবজন্তুর শব্দমাত্র নাই। এইপ্রকারে মহাশ্বেতা কতক পথ অতিবাহিত করিয়া অবশেষে এক কুটীরে উপস্থিত হইয়া কবাটে আঘাত করিলেন। দ্বার ভিতর হইতে উদ্ঘাটিত হইল; মহাশ্বেতা প্রবেশ করিলে ভিতরে প্রদীপহস্তে এক অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক পুনরায় দ্বার রুদ্ধ করিল।

মহাশ্বেতা কি চিন্তা করিতে করিতে আসিতেছিলেন; অল্পবয়স্কার মুখ দেখিবামাত্র সহসা সকল চিন্তা দূর হইল ও পবিত্র স্নেহভাব বদনমণ্ডলে বিকাশ পাইতে লাগিল। বলিলেন—"সরলা, এত রাত্রি হইয়াছে, তুমি এখনও জাগিয়া আছ? যাও মা, শোও গে যাও।" এই বলিয়া সস্নেহে সরলার মুখচুম্বন করিলেন। সরলা উত্তর করিল, "রাত্রি অধিক

হইয়াছে, তা মা আমি জানিতাম না ; ব্রহ্মচারী ঠাকুর মহাভারতের কথা কহিতেছিলেন, তাহাই শুনিতেছিলাম। আমার বোধ হয়, মহাভারতের কথা শুনিলে আমি সমস্ত রাত্রি জাগিতে পারি।”

“না মা, সমস্ত রাত্রি জাগিলে পাড়া হইবে।” এই বলিয়া মাতা সরলাকে আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় মুখচুম্বন করিলেন। সরলা প্রদীপ লইয়া যখন শয়নগৃহে যাইতেছিল, তাহার মাতা অনিমেষলোচনে অনেকক্ষণ তাহার দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ও অর্দ্ধস্ফুটবচনে বলিলেন, “তুমি আমার সর্ব্বস্ব, বিধাতা কি বনশোভার নিমিত্ত এই অমূল্য রত্ন, এই অতুল্য পুষ্প সৃজন করিয়াছিলেন ?” বলিতে বলিতে যে ঘরে ব্রহ্মচারী ছিলেন, তথায় গমন করিলেন।

সরলা শয়নগৃহে যাইয়া প্রদীপ রাখিল। মাতা শয়ন করিতে আসিবেন বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল না, প্রদীপও নির্ব্বাণ করিল না। তাহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ হইবে, কিন্তু এখনও যৌবন সম্যক্‌রূপে আবির্ভূত হয় নাই, মুখ দেখিলে এখনও বালিকা বলিয়া বোধ হয়। অবয়ব বা মুখে বিশেষ রূপের ছটা বা লাবণ্য কিছুই ছিল না ; কবিগণ যেরূপ তন্বঙ্গী রূপসীদিগের বর্ণনা করিতে ভালবাসেন, আমাদের সরলার সে অপরূপ সৌন্দর্য্যের কিছুই ছিল না ; তবে শরীর কোমলতাপূর্ণ ও মুখমণ্ডলে এক স্বর্গীয় মধুরিমা ও সরলতা বিরাজমান রহিয়াছে,—দেখিলেই বোধ হয়, যেন বালিকাহৃদয়ে কুটিলতার লেশমাত্র নাই, কেবল সুশীলতা, সরলতা ও মানব-সাধারণের প্রতি পবিত্র প্রেম এবং স্নেহরাশি বিরাজ করিতেছে। বিশেষ সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাহার মাতার মত নয়ন দুটী সমুজ্জ্বল; সমুজ্জ্বল, কিন্তু শান্ত, সরল ও কোমলতাপূর্ণ। ওষ্ঠদ্বয় বিশেষ সুচিক্কণ নহে, কিন্তু দেখিলে বোধ হয়, পরিমল-মিষ্টতার আধার, আর সদা সুহাসিতে বিকশিত। গুচ্ছ গুচ্ছ নিবিড় কৃষ্ণ কেশ বদনমণ্ডলের সরল কিশোর ভাব অধিকতর বর্দ্ধন করিতেছে। সর্ব্বাঙ্গ কোমল ও সুস্নিগ্ধ। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর শয্যায় শয়ন করিতে না করিতে নিদ্রার আবির্ভাব হইল, প্রস্ফুটিত পদ্ম যেন পুনরায় মুকুলিত হইয়া কোরকভাব ধারণ কবিল।

যে কুটীরে মাতা ও কন্যা বাস করিতেন, সে কুটীর অতিশয় সামান্য। পল্লীগ্রামের অন্যান্য ঘর যে প্রকার, এ কুটীরও সেই প্রকাব। ক্ষুদ্র একটী পাকশালা ও একটী গোশালা ছিল, এতদ্ভিন্ন দুইটী বড় ঘর ছিল, তাহার মধ্যে একটীতে মাতা ও কন্যা ও একমাত্র দাসী শয়ন করিত, ও অপরটীতে দিনের বেলা কর্ম্ম কার্য্য হইত, ও কোন অতিথি আসিলে তাহাতেই শয্যা

রচনা হইত। গোশালায় দুই তিনটী গাভী থাকিত; প্রাঙ্গণে একটী গোলা ছিল, তাহাতে কিছু ধান্য সঞ্চিত থাকিত। গৃহপার্শ্বে একটী ক্ষুদ্রায়ত বাগান ছিল, তাহাতে কতকগুলি ফলবৃক্ষ ছিল ও সরলা কতকগুলি পুষ্পের চারা রোপণ করিয়াছিল। যদিও কুটীর সামান্য, তথাপি কোন আগন্তুক আসিলেই অনায়াসেই অনুভব করিতে পারিতেন যে, কুটীর-বাসিনীগণ নিতান্ত সামান্য লোক নহেন। গৃহের মধ্যে সকল দ্রব্যই এমন পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন যে, কি গ্রামে, কি নগরে, প্রায় সেরূপ দেখা যায় না। বসন যৎসামান্য, কিন্তু অতি পরিচ্ছন্ন; ঘরগুলিও যৎসামান্য, কিন্তু যৎপরোনাস্তি পরিষ্কৃত; প্রাঙ্গণে তৃণমাত্র নাই। কুটীরবাসিনীদিগের আচার-ব্যবহার দেখিয়া শুনিয়া প্রথম প্রথম গ্রামবাসীগণ নানাপ্রকার আলোচনা করিত। এক্ষণে ছয় সাত বৎসরাবধি তাঁহাদিগকে সেই গ্রামে বাস করিতে দেখিয়া সকলেই নূতন অনুভবে বিরত হইল; সকলেই সিদ্ধান্ত করিল যে, মহাশ্বেতা কোন ধনাঢ্যের বনিতা হইবেন। ধনাঢ্য বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় বিবাহ করাতে পূর্ব্বস্ত্রী জ্বালাতন হইয়া স্বীয় কন্যাকে লইয়া নিভৃতে এই গ্রামে বাস করিতেছেন।

এদিকে মহাশ্বেতা বহু সম্মান করিয়া শিখণ্ডিবাহন ব্রহ্মচারীকে আহার করাইয়া আপনিও কিছু জলযোগ করিলেন। পরে ব্রহ্মচারীকে এক আসনে উপবেশন করাইয়া আপনি ভূমিতে বসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি কথোপকথন হইতে লাগিল, আমরা তাহার কিয়দংশ বিবৃত করিব।

শিখণ্ডিবাহন বলিলেন, "ভগিনি, আমি ধর্ম্মপিতা চন্দ্রশেখরের নিকট হইতে আসিতেছি, তিনি সম্প্রতি তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আজি সাত বৎসর হইল, ধর্ম্ম-পিতা তীর্থে গিয়াছিলেন, তখন মোগল পাঠানের মধ্যে কোন প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। সাত বৎসরে হিমালয় হইতে কাবেরী-তীর পর্য্যন্ত সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন।"

মহা। "পিতার সার্থক জীবন।"

শিখ। "অবশেষে মুঙ্গেরের নিকট কোন গ্রামে ধ্যান করিতে করিতে সহসা তাঁহার স্বপ্ন হইল, যে রক্তস্রোতে এক মহা অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে, তিমিরে এক মহাতেজঃ লীন হইয়াছে। স্বপ্নের মর্ম্ম কিছু কিছু অনুভব করিয়া বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে আমার প্রমুখাৎ তোমার ভয়ানক ব্রতের বিষয় শুনিয়া ধর্ম্মপিতা অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তিনি ব্রতের সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু আমার

আশঙ্কা হইতেছে, এ ব্রত হইতে অনিষ্টের সম্ভাবনা। ভগিনি, এখনও ক্ষান্ত হও!"

মহাশ্বেতা বলিলেন, "ভ্রাতঃ, এ অনুরোধ হইতে আমাকে মার্জ্জনা করুন। এ ব্রত আমার প্রাণের অংশস্বরূপ ও জীবনের অবলম্বনস্বরূপ হইয়াছে। এত শোক, এত মনস্তাপ সহ্য করিয়া যে আমি জীবিত আছি, এই ভয়ানক অবস্থার পরিবর্ত্তনেও যে আমি স্বচ্ছন্দে আছি, সে কেবল এই ভীষণ বৈরনির্যাতন ব্রতের নিমিত্ত। যেদিন ব্রত উদ্যাপন করিব, সে দিন আমাকে জীবন ত্যাগ করিতে হইবে।"

এই উত্তর শ্রবণ করিয়া শিখণ্ডিবাহন ব্রতত্যাগের অনুরোধ হইতে একবারে নিরস্ত হইলেন। ক্ষণেক পর বলিলেন, "বৈরনির্যাতনের কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতেছ?"

"আমি এক সিদ্ধ পুরুষের নিকট এক ভীষণ মন্ত্র লইয়াছি। তিনি এই মন্ত্রের সাধনের জন্য যে অনুষ্ঠান বলিয়া দিয়াছেন তাহাও ভীষণ, কিন্তু সে অনুষ্ঠানে আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছি। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় স্নান করিয়া নিশা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত দেবদেব মহাদেবের সেই মন্ত্রদ্বারা আরাধনা করিব,—যতদিন মহাদেব শত্রুনিপাত না করেন, ততদিন কন্যা অবিবাহিতা থাকিবে;—সপ্তম বর্ষের মধ্যে শত্রুনিপাত না হইলে কুমারী কন্যাকে মহাদেবের নিকট হত্যা দিয়া চিতারোহণ করিব।"

অনেকক্ষণ উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ব্রহ্মচারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তোমার ব্রত কি, তাহা আমি অবগত আছি। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বৈরনির্যাতন সাধনের জন্য এই ব্রতধারণ ভিন্ন অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিয়াছ?"

মহাশ্বেতা গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "যিনি এই বিপুল সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার সহায়তা লাভ অপেক্ষা স্ত্রীলোকে আর কি উপায় অবলম্বন করিতে পারে?"

সরলস্বভাব ব্রহ্মচারী মহাশ্বেতাকে উপরি উক্ত ভীষণ ব্রত হইতে নিরস্ত করিবার জন্য আর একবার চেষ্টা করিলেন। মহাশ্বেতা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "আপনি পূর্ব্বকথা সকল জানিলে এপ্রকার অনুরোধ করিতেন না,—আমি নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আর মহাত্মা চন্দ্রশেখরকেও এই সকল কথা জানাইবেন।"

পূর্ব্বকথা স্মরণ করিতে করিতে মহাশ্বেতার শরীর কম্পিত হইতে

লাগিল, মুখমণ্ডল বিকৃতি ধারণ করিল, শরীর কণ্টকিত হইল, উজ্জ্বল চক্ষু আরও ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। প্রদীপ স্তিমিতপ্রায়, ঘরের চারিদিকে নিবিড় অন্ধকারে বায়ু স্বন্ স্বন্ শব্দে প্রবলবেগে প্রধাবিত হইতেছে ও মহাশ্বেতার সামান্য কুটীরকে বেগে আঘাত করিতেছে; কিন্তু স্মৃতিজাত প্রবল চিন্তাবায়ু তদপেক্ষা শতগুণে বেগে মহাশ্বেতার হৃদয়কন্দর আঘাত করিতেছিল। শিখণ্ডিবাহন এই প্রকার বিকৃতি অবলোকন করিয়া মহাশ্বেতাকে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত হইতে নিরস্ত হইতে বলিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া মহাশ্বেতা বলিলেন—"আমি পাপীয়সী বটি; যে পরের অমঙ্গলের জন্য সপ্ত বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রতধারণ করিয়া থাকিতে পারে, সে পাপীয়সী নহে ত কি? কিন্তু সামান্য অত্যাচারে আমি পাপব্রত অবলম্বন করি নাই। শ্রবণ করুন।"

সরলচিত্ত শিখণ্ডিবাহন অগত্যা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্রতাবলম্বিনীর পূর্ব্বকথা।

But o'er her warrior's bloody bier
The lady dropped nor flower nor tear.
Vengeance deep brooding on the slain
Had locked the source of softer woe,
And burning pride and high disdain
Forbade the rising tear to flow.

Scott.

আমার স্বামী রাজা সমরসিংহ বঙ্গদেশের ভূষণ ছিলেন। পাঠান দায়ুদখাঁর সহিত যৎকালে মোগলদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হয়, আকবরসাহ স্বয়ং যে সময়ে পাটনা নগর বেষ্টন করেন ও গঙ্গার অপর পার্শ্বস্থ হাজীপুর নগর অধিকার অভিলাষ করিয়া আলমখাঁকে প্রেরণ করেন, রাজা সমরসিংহ এক সহস্র অশ্বারোহী লইয়া মহাবীর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন ও তিনিই সেই নগর হস্তগত করিবার প্রধান কারণ ছিলেন। তাঁহার বীরত্ব-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দিল্লীশ্বর এত চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে, কিছুদিন পরে পাটনা হস্তগত করিয়া দিল্লী প্রত্যাগমনের সময়ে আমার স্বামীকে

সেনাপতি-পদে নিযুক্ত করেন ও রাজা উপাধি দেন। তাহার অনতি-বিলম্বেই সাগর-তরঙ্গের ন্যায় মোগল সৈন্য বঙ্গদেশ প্লাবিত করিল। তরীয়াঘড়ি জয় করিয়া পরে বঙ্গদেশের রাজধানী তণ্ডা নগর হস্তগত করিল। তথা হইতে মনাইমখাঁকে ও টোডরমল্লকে অল্প সৈন্য সমভি-ব্যাহারে পলায়নপর দায়ুদখাঁর পশ্চাতে প্রেরণ করিলেন,—রাজা সমর-সিংহ সানন্দ-চিত্তে টোডরমল্লের সহিত শত্রুপরিপূর্ণ বঙ্গদেশে যুদ্ধ করিতে নির্গত হইলেন। তণ্ডা হইতে বীরভূমি, বীরভূমি হইতে মেদিনীপুর, মেদিনী-পুর হইতে কটক,—টোডরমল্ল যেখানে যেখানে গিয়াছিলেন, সর্ব্বত্রই আমার স্বামী তাঁহার দক্ষিণ হস্তের মত সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। যে যে যুদ্ধে টোডর-মল্ল জয়লাভ করিয়াছিলেন, রাজা সমরসিংহ সেই সেই যুদ্ধে আপনার নৈসর্গিক বীরত্ব ও সাহস প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে বীরত্ব ও সাহসের কি এই পুরস্কার?

"পরে কটকের নিকট যে মহা যুদ্ধ হয় তাহাতে মনাইমখাঁ স্বয়ং বর্ত্তমান ছিলেন। মোগলেরা প্রায় পরাস্ত হইয়াছিল। মনাইমখাঁ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বেগে পলায়ন করিয়াছিলেন। আলমখাঁ যুদ্ধে নিহত হন; কিন্তু রাজা টোডরমল্ল ও রাজা সমরসিংহ ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। রাজা টোডরমল্ল বলিলেন, 'আলমখাঁর মৃত্যু হইয়াছে, তাহাতে ক্ষতি কি; মনাইমখাঁ পলায়ন করিয়াছেন তাহাতেই বা আশঙ্কা কি; সাম্রাজ্য আমাদের হস্তে আছে, আমাদের হস্তেই থাকিবে।' এই কথা উচ্চারিত হইতে না হইতে সমরসিংহ সিংহের মত লম্ফ দিয়া শত্রু-ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, মোগল সৈন্য বঙ্গদেশীয় জমিদারের সাহস দেখিয়া পুনরায় যুদ্ধারম্ভ করিল, দায়ুদখাঁ পরাস্ত হইলেন। তৎপরেই যে সন্ধিস্থাপন হইল, সেই সন্ধি সংস্থাপনের সময়ে মনাইমখাঁ দায়ুদখাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয় প্রায় এক বৎসর আপনি আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, আমাদের কোন্ সেনাপতি যুদ্ধে অধিকতর সাহস প্রকাশ করিয়াছেন আপনি অবশ্যই বলিতে পারেন।' পাঠানরাজ উত্তর করিলেন, 'প্রথম ক্ষত্রিয়কুলচূড়ামণি রাজা টোডরমল্ল, দ্বিতীয় বঙ্গীয় জমীদার রাজা সমরসিংহ।' এই কথা উচ্চারিত হইতে হইতে সমগ্র দরবার জয়ধ্বনি ও কোলাহলে প্লাবিত হইল; সেই জয়ধ্বনি বায়ুমার্গে আরোহণ করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশ আচ্ছন্ন করিল; চতুর্বেষ্টিত দুর্গে—যথায় আমি একাকিনী উপবেশন করিয়া যুদ্ধে স্বামীর বিপদ্ আশঙ্কা করিতেছিলাম,—প্রবেশ করিয়া আমার শরীর কণ্টকিত করিল! অদ্য কি না সেই সমরসিংহের বিদ্রোহ-অপবাদে

শিরশ্ছেদন হইল! দেবদেব মহেশ্বর! ইহার কি ইহকালে প্রতিহিংসা নাই, পরকালে বিচার নাই?"

ছিন্ন-তার বীণার মত সহসা মহাশ্বেতার গম্ভীর শব্দ থামিয়া গেল। শিখণ্ডিবাহন বলিলেন, "ভগিনি! পূর্ব্বকথা স্মরণে যদি কষ্ট হয়, তাহা হইলে বলিবার আবশ্যক কি? বিশেষ রাজা সমরসিংহের যশোবার্ত্তা বঙ্গদেশে কে না অবগত আছেন? সমরসিংহের পত্নীর সে কথা বিবরণ করিয়া হৃদয়ে ব্যথা পাইবার আবশ্যক কি?"

"সমরসিংহের পত্নী নহি, এককালে সমরসিংহের রাজমহিষী ছিলাম, এক্ষণে নিরাশ্রয় বিধবা!—আমার আর অধিক বলিবার নাই, শ্রবণ করুন।"

শিখণ্ডিবাহন আবার নিস্তব্ধ হইলেন। মহাশ্বেতা বলিতে লাগিলেন,—

"এক পাপাত্মা জমীদার, আমি তাহার নাম করিব না, এই যুদ্ধে দায়ুদখাঁর সহিত যোগ দিয়া সমরসিংহের প্রাণবধ করিতে যত্ন করিয়াছিল। টোডরমল্ল আমার স্বামীকে এত ভালবাসিতেন যে, যুদ্ধের পর সেই জমীদারের প্রাণসংহারের আদেশ দিলেন। জমীদার ভয়ে আমার স্বামীর চরণে লুটাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল,—উদারচেতা রাজা সমরসিংহ শত্রুকে ক্ষমা করিলেন; রাজা টোডরমল্লের নিকট আবেদন করিয়া নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণ জমীদারকে বাঁচাইয়া দিলেন। সেই পাষণ্ড সেই অবমাননা-বার্ত্তা স্মরণ করিয়া রাখিল,—আমার স্বামীর বিস্তীর্ণ জমীদারি দেখিয়া তাহার লোভ হইল। টোডরমল্ল বঙ্গদেশ হইতে প্রস্থান করিতে না করিতে, সেই জমীদার সুযোগ পাইয়া কতকগুলি জাল কাগজ প্রস্তুত করিয়া প্রমাণ করিল যে, রাজা সমরসিংহ বিদ্রোহী, পাঠানদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন! এই মিথ্যা অপবাদে স্বামীর প্রাণদণ্ড হয়,—সেই জমীদার ব্রাহ্মণতনয়—চণ্ডালতনয়—সুবাদারের প্রিয়পাত্র রাজাধিরাজ দেওয়ান হইলেন।"

শিখণ্ডিবাহন বিস্মিত হইলেন, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "তবে কি বঙ্গদেশের দেওয়ান রাজাধিরাজ সতীশচন্দ্র রায় পাপিষ্ঠ নরহত্যাকারী?" বিস্মিত হইয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। মহাশ্বেতা বলিলেন, "আমি যে কথাটি বলিবার মানস করিয়াছিলাম, তাহা এখনও বলা হয় নাই।

"আজি প্রায় ছয় বৎসর হইল, আমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। সেই ঘটনার দুই বৎসর পরে টোডরমল্ল বঙ্গদেশে আর একবার আসিয়াছিলেন। রাজমহলের মহাযুদ্ধে দায়ুদখাঁকে পুনরায় পরাস্ত ও নিহত করিয়া বঙ্গদেশে পাঠান রাজ্যের নাম লোপ করিলেন। যুদ্ধের পরেই পামর দেওয়ানকে আমার স্বামীর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। পামর সত্য বলিতে ভয়

পাইয়া বলিল, 'রাজা সমরসিংহ সর্প-দংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।' সে সত্য কথা, কিন্তু সাধারণ সর্পের এত খলতা নাই। মানবদেহাবলম্বী কাল-সর্প নহিলে এত বিষ ধারণ করিতে পারে না। আমি স্বামীর নিকট বিষম অঙ্গীকারে বদ্ধ আছি। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি আপন অদৃষ্ট জানিতে পারিয়াছিলেন। একদিন আমাকে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ হইতে গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া সন্ধ্যার সময় তথায় উপবেশন করিয়া বলিলেন, 'প্রাণেশ্বরি! তোমার নিকট আমার একটী ভিক্ষা আছে, দিতে স্বীকার করিবে?' আমি বলিলাম, 'নাথ! রমণীর স্বামীকে অদেয় কি আছে?' তখন তিনি আমাকে গঙ্গাজল স্পর্শ করিতে বলিলেন। ঘোর অন্ধকার, সন্ধ্যাকালে প্রবল প্রবাহিণী গঙ্গার সৈকতে উপবেশন করিয়া উভয়েই অনেকক্ষণ গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া রহিলাম। পরে প্রভু তরঙ্গ অপেক্ষা গম্ভীরস্বরে বলিলেন, 'আমি শুনিয়াছি, সেই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ আমার বিনাশ-সঙ্কল্পে সফল হইয়াছে। যোদ্ধার মরণে ভয় নাই, কিন্তু পাপিষ্ঠকে দণ্ড দিবার কেহ রহিল না, এই জন্য দুঃখ হয়। ভ্রাতা কি সন্তান নাই, কেবল শিশু কন্যা, আর তুমি স্ত্রীলোক। অঙ্গীকার কর, স্ত্রীলোকের যতদূর সাধ্য, তুমি বৈরনির্যাতনে যত্নবতী হইবে।' আমি অঙ্গীকার করিলাম, 'স্ত্রীলোকের যতদূর সাধ্য, বৈরনির্যাতনে যত্নবতী হইব।' সে সময় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলাম না, কেননা হৃদয়ে এখনও ক্রোধাগ্নি কালাগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিল,—সে কালাগ্নি নির্ব্বাণ হয় নাই,—সে ব্রত এখনও সফল হয় নাই।"

শিখণ্ডিবাহন দেখিলেন, মহাশ্বেতার ব্রতভঙ্গের চেষ্টা করা বৃথা। অগ্নি-রাশিতে জলবিন্দু নিক্ষেপ করা মাত্র। বলিলেন,—

"তবে আমি ধর্ম্মপিতাকে এই সকল বৃত্তান্ত বলিব?" মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন, "হাঁ বলিবেন; আরও বলিবেন যে, পক্ষিশাবক ব্যাধকর্তৃক আহত হইলে আপনার যাতনায় ক্রন্দন করিয়া প্রাণত্যাগ করে, কিন্তু মানিনী ফণিনী পদাহত হইলে আঘাতকারীকে দংশন করিয়া হর্ষে—হেলায় প্রাণত্যাগ করে।"

বলিতে বলিতে মহাশ্বেতা আসন ত্যাগ করিয়া সহসা দাঁড়াইয়া উঠিলেন, প্রদীপ স্তিমিতপ্রায়, মহাশ্বেতার সমস্ত শরীর কম্পিত ও কণ্টকিত। শিখণ্ডিবাহনের বোধ হইল যেন তিনি সে প্রকার উন্নতকায় গম্ভীরাকৃতি রমণী কখন দেখেন নাই। অন্ধকারে তাঁহার হৃদয়ে যেন কিছু কিছু ভয়-সঞ্চারও হইতে লাগিল। মহাশ্বেতা ধীরে ধীরে গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। প্রভাতের আলোকচ্ছটা সহসা তাঁহার কুঞ্চিত ললাটে পতিত হওয়ায়

তিনি চমকিয়া উঠিলেন; দেখিলেন, বৃক্ষের অগ্রভাগ তরুণ অরুণ-কিরণে স্বর্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে, ডালে ডালে নানা পক্ষী নানা রঙ্গে গান করিতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সরলা ও অমলা।

We Hermia, like two artificial gods,
Have with our needles created both one flower,
Both on one sampler, sitting on one cushion,
Both warbling of one song, both in one key;
As if our hands, our sides, voices and minds
Had been incorporate. So we grew together,
Like to a double cherry seeming parted,
And yet a union in partition,
Two lovely berries moulded on one stem.

Shakespeare.

বৃক্ষশাখা হইতে পক্ষিগণ শব্দ করিবার অনেক পূর্ব্বেই সরলা গাত্রোত্থান করিয়া গৃহকার্য্যে নিযুক্ত হইল। ঘর, দ্বার, প্রাঙ্গণ, সকল পরিষ্কার করিল। পাঠক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিবেন, রাজকুমারীর কি এ সকল কাজ সাজে? সরলা যে রাজকুমারী, তাহা সে জানিত না। পিতার মৃত্যুর সময় সে অল্পবয়স্কা বালিকা ছিল,—তখনকার কথা প্রায় একবারে বিস্মৃত হইয়াছিল। তাহার মাতাও একথা তাহাকে কখন বলেন নাই। প্রতিদিন কৃষককুমারীদিগের কর্ম্ম করিতে করিতে আপনাকেও কৃষক-কুমারী বলিয়া মনে করিত। তাহার বালিকা-হৃদয়ে অহঙ্কার, উচ্চাভিলাষ বা অভিমানের লেশমাত্র ছিল না। চিরকাল কুটীরে বাস করিয়া মাতাকে ভাল বাসিবে, কৃষকপত্নীদিগের সহিত আলাপ, সহবাস করিবে, সামান্য কর্ম্ম করিয়া আপন ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিবে, ইহা অপেক্ষা উচ্চ অভিলাষ তাহার সরলান্তঃকরণে কখন স্থান পাইত না।

গৃহাদি পরিষ্কার করিয়া সরলা মৃৎকলস লইয়া নদীতে স্নান করিতে চলিল। প্রতিদিনই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাহার স্নান সমাপন হইত। পথিমধ্যে এক কুটীরপার্শ্বে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, "সই!" কেহ উত্তর দিল না। পুনরায় ডাকিল, "সই অমলা!" "যাই লো!" এই বলিয়া ঘরের

ভিতর হইতে কে উত্তর দিল। ক্ষণেক পরে এক ষোড়শবর্ষীয়া, প্রখরনয়না, চঞ্চলহৃদয়া রমণী বাহিরে আসিল। তাহার পরিধান এক রাঙ্গাপেড়ে শাটী, কক্ষে কলস, হাতে শাঁকা, পায়ে মল। আসিয়াই সরলার চুল ধরিয়া টানিয়া ও চিম্‌টী কাটিয়া বলিল, "তোর যেমন আক্কেল, আমার ঘরে স্বামী, তাতে আবার বৃদ্ধ স্বামী, আমাকে কি এত ভোরে আসিতে দেয়? তোর কি বল, মা বিবাহ দিলেন না, সমস্ত রাত্রি ভাবনায় নিদ্রা হয় না; প্রভাত না হইতে হইতে ঘর হইতে বাহির হইতে পারিলে বাঁচিস্।" এই বলিয়া সরলাকে আবার চিম্‌টী কাটিল ও হাসিতে হাসিতে গাল টিপিয়া দিল।

সরলা বলিল, "তা, মার কেন সই, তুমি আমাকে আসিতে বল, তাই আমি ডাকিতে আসি।"

অম। "তা না হইলে আসিতে না?"

সর। "আসিতাম।"

অম। "কেন আসিতে?"

সর। "তা জানি না, কিন্তু তুমি আসিতে না বলিলেও আসিতাম।"

অম। "কেন সই, কারণ বলিতে হবে।"

সর। "সত্য বলিতেছি, কারণ আমি জানি না, কিন্তু তুমি না বলিলেও আসিতাম। সকালে উঠিয়াই তোমার মুখখানি মনে পড়ে। যদি একদিন তোমায় না দেখি, তাহা হইলে আমার সমস্ত দিন কাজ কর্ম্মে মন থাকে না। রোজ দেখি কি না, অভ্যাসের জন্য বোধ হয় এরূপ হয়।"

অমলা স্থিরলোচনে সরলার মুখখানি নিরীক্ষণ করিল,—সরলা প্রেম-রাশিতে টলমল করিতেছে,—হঠাৎ মুখ ফিরাইল। সরলা বলিল, "তোমার চক্ষুতে জল কেন সই?"

অম। "ও কিছু নয়,—একটা পোকা পড়িয়াছিল বুঝি। আর শুনিয়াছ,—জমীদারের কাছারির নূতন খবর শুনিয়াছ?"

সর। "না; কি খবর?"

অম। "আমাদের জমীদার কোন বড় ঘরের মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন; মেয়ে নাকি বড় রূপসী, রূপ যেন বিদ্যুতের মত, আর চক্ষু দুটী যেন,—যেন,—যেন সই, তোর চক্ষুর মত।"

সর। "তামাসা কর কেন সই, তার পর?"

অম। "তার পর সম্বন্ধ স্থির হইলে আমাদের জমীদারের ছেলে নাকি বলিলেন, আমি ও মেয়েকে বিবাহ করিব না।"

সর। "কেন?"

অম। "কেন, তা জানি না, শুনিয়াছি, কোন পল্লীগ্রামে কোন এক গরিব ব্রাহ্মণীর মেয়েকে দেখিয়া মন হারাইয়াছেন। তা সেই মেয়ে ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবেন না। আমার সইকেই বা দেখিয়া থাকিবেন।"

সর। "আবার তামাসা! আচ্ছা, বাপ বল্‌ছেন একজনকে বিবাহ করিতে, ছেলে আর একজনকে বিবাহ কর্‌বেন?"

অম। "তা যার যাকে মনে ধরে; বাপ্ যাহাকে বিবাহ কর্‌তে বলেন, তাহাকে যদি মনে না ধরে?"

সর। "কেন ধর্‌বে না?"

অম। "তুই যেমন টেবু, তোকে আব কত শিখাব। বলি, মাকে বল্ বিবাহ দিতে, তাহা হইলে সব শিখ্‌বি।" এই বলিয়া আবার সরলার গাল টিপিয়া দিল।

এই প্রকার কথোপকথন কবিতে করিতে উভয়ে নদীর ঘাটে উপস্থিত হইল। নদীর তীরে যাইয়া এক অপরূপ দর্শন দৃষ্ট হইল। নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘায়ত, ছিন্নবসন এক স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান আছে। তাহার গলদেশে অস্থিমালা, হস্তে দণ্ড, শরীরে ভস্ম, চক্ষু রক্তবর্ণ ও ঘূর্ণায়মান। দেখিয়া দুইজনই বিস্মিত হইল। অমলা জিজ্ঞাসিল, "তুমি কে গা?"

সে উত্তর করিল, "আমার নাম বিশ্বেশ্বরী পাগলিনী।" অমলা বলিল, "হাঁ হাঁ, আমি বিশু পাগলীর নাম শুনিয়াছি। তুমি আগে এ গ্রামে একবার আসিয়াছিলে না?"

বিশ্বে। "আসিয়াছিলাম।"

অম। "তুমি না হাত দেখিতে জান?"

বিশ্বে। "জানি।"

অম। "আচ্ছা, আমার হাত দেখ দেখি।"

পাগলিনী হাত দেখিয়া ক্ষণেক পর বলিল,—"তুমি দেওয়ানের গৃহিণী হইবে।"

অম। "দূর পাগ্‌লী, আমার স্বামী বর্ত্তমান; বলে কি না দেওয়ানের স্ত্রী হবে। আমার দেওয়ান উজিরে কাজ নাই, আমার বৃদ্ধ স্বামী বাঁচিয়া থাকুক্। এখন বল দেখি, আমার সইয়ের কবে বিবাহ হবে? বিবাহের ভাবনায় সইয়ের রাত্রিতে ঘুম হয় না।"

পাগলিনী অনেকক্ষণ সরলার হস্তধারণপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে তাহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল, আবার হস্ত দেখিতে লাগিল। অনেক ক্ষণের পর বলিল—

তোমার ভবিষ্যৎ আকাশ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন; কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশি ও ঘোর অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। সম্প্রতি তুমুল প্রলয় উপস্থিত, তাহার পর কি আছে বলিতে পারি না। তিন দিন মধ্যে ভীষণ ঝড় আসিবে, অদ্যই এ গ্রাম হইতে পলায়ন কর, পলায়ন কর, পলায়ন কর।"

সরলা ভীতচিত্তা হইল। অমলা প্রিয়সখীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া পাগলিনীকে উপলক্ষ করিয়া বলিল, "ধান ভানিতে শিবের গীত,—আমি কি না জিজ্ঞাসা করিলাম, সইয়ের বিবাহ হইবে কবে, উনি আকাশ, মেঘ, প্রলয়ের কথা আনিলেন। দাঁড়া তো, আমি মাগীকে জব্দ করি।"

এই বলিয়া অমলা পাগলিনীর গায়ে জল দিতে লাগিল, পাগলিনী ধীরে ধীরে দূরে চলিয়া গেল। দূরে যাইয়া পুনরায় সরলার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল, "পলায়ন কর, পলায়ন কর, পলায়ন কর!" অনন্তর অদৃশ্য হইল।

এদিকে অন্যান্য কৃষকপত্নীগণ আসিয়া ঘাটে উপস্থিত হইল। রামী, বামী, শ্যামী, নৃত্যের বৌ, হরির মা, ইত্যাদি অনেক গ্রাম্য সুন্দরী আসিয়া ঘাট আলো (অন্ধকার?) করিয়া বসিল। নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা ও রঙ্গরসে ঘাট জমকাইয়া তুলিল। ইচ্ছামতী নদী এত সৌন্দর্য্যের ছটা দেখিয়া আনন্দে স্ফীত হইয়া কল্ কল্ শব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল; গ্রাম্য সুন্দরীরাও আনন্দে কল্ কল্ শব্দে গল্প আরম্ভ করিলেন। গল্পের মধ্যে অল্পবয়স্কারা স্বামীর কথা ও প্রাচীনারা পরনিন্দার কথা আনিলেন। সরলা ও অমলা কলসে জল লইয়া নিজ নিজ গৃহে আসিল।

অমলার স্বামীর সহিত পাঠক মহাশয় অগ্রেই পরিচিত হইয়াছেন। নবীনদাস সে গ্রামের একজন মহাজন ছিল ও অনেক প্রকার ব্যবসায়ও করিত। তাহার স্বভাব অতি শান্ত ও সরল। তাহার কিঞ্চিৎ পরিমাণে সঙ্গতিও ছিল। ৪০।৫০ বিঘা জমি, ২০।২৫টা গরু, ৪।৫খান লাঙ্গল ও বাটীর মধ্যে আট দশটা গোলা ছিল। আর লোকের মুখে এমনও শুনা যাইত যে নগদ কিছু টাকা মাটীতে পুতিয়া রাখিয়াছিল। ইহা ভিন্ন আপন পত্নীকে অনেক গহনাও দিয়াছিল। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রায় ৩৫ বৎসর বয়সের সময় দশমবর্ষীয়া অমলাকে বিবাহ করে। এখনও বৃদ্ধ হয় নাই, কিন্তু অমলা উপহাস করিয়া তাহাকে "বৃদ্ধ স্বামী" বলিয়াই ডাকিত। অমলা স্নেহবতী ভার্য্যা, কিন্তু অত্যন্ত রসিকা। "বৃদ্ধ স্বামীর," সেবা শুশ্রূষা করিত, কিন্তু দিবারাত্রি উপহাস করিতেও ক্ষান্ত

থাকিত না। তথাপি "বৃদ্ধ স্বামী" বলিয়া অমলার চিত্তে কোন প্রকার অসন্তোষ ছিল না, যাহা কপালে ঘটিয়াছিল, তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট ছিল। এপ্রকার পত্নী পাইয়া "বৃদ্ধ স্বামীরও" স্নেহের ও সুখের সীমা ছিল না।

সরলার রুদ্রপুরে আগমন অবধি অমলা তাহাকে আপন সোদরা অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিত, প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিত। দুঃখের সময়ে সরলার নির্ম্মল বালিকা-মুখখানি দেখিয়া সকল দুঃখ একবারে ভুলিয়া যাইত, সুখের সময়ে সরলার প্রেমপূর্ণ চক্ষু দুইটী দেখিতে পাইলে সুখ দ্বিগুণ হইত। ছয় বৎসর কাল একত্র থাকিয়া তাহাদের স্নেহ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, ভালবাসার শেষ ছিল না। সরলা সময় পাইলেই অমলার নিকট যাইত, অমলা অবকাশ পাইলেই সরলার নিকট যাইত। কতদিন তাহারা দুই-জনে মধ্যাহ্নে একত্র একটী বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত, কতদিন নিশি দুই প্রহর পর্য্যন্ত সরলা অমলার সহিত নিভৃত স্থানে বসিয়া গল্প শুনিত, দুইজনের বিচ্ছেদ হইবার ইচ্ছা নাই, সুতরাং সে গল্পেরও শেষ নাই। ফলতঃ তাহাদিগের শরীর বিভিন্ন হইলেও একই মন, একই প্রাণ, একই হৃদয় ছিল।

সরলা বাটী আসিয়া দেখিল, মাতা ও ব্রহ্মচারী ঘর হইতে বাহির হই-লেন। সরলা বলিল, "মা, সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাও নাই?"

মহাশ্বেতা। "না মা, ব্রহ্মচারীর সহিত কথা কহিতেছিলাম, কথায় কথায় সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। তোমার আজ ঘাট হইতে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে,—সূর্য্য উঠিয়াছে।"

সরলা। "হাঁ মা, আজ ঘাটে বিশু পাগ্‌লী নামে এক স্ত্রীলোক আসিয়া-ছিল।" এই বলিয়া সরলা সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিল। তাহার মাতা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, বিশু পাগলিনীর জন্য অনেক অন্বেষণ করাইলেন, কিন্তু তাহাকে আর দেখা গেল না। মহাশ্বেতা বিমর্ষ হইয়া রহিলেন।

সরলা পাকশালায় যাইয়া স্বহস্তে অন্ন ও অন্যান্য সামান্য খাদ্য প্রস্তুত করিল। কর্ম্ম লাঘব করিবার জন্য দুই বেলার অন্ন একবারেই প্রস্তুত করিত। একমাত্র দাসী—দাসীর নাম চিন্তা; রুদ্রপুরে আসিয়া অবধি মহাশ্বেতা এই দাসীকে রাখিয়াছিলেন।

মহাশ্বেতা ব্রহ্মচারীকে সম্মানপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া বিদায় দিলেন। তাহার পর বাটীর সকলে ভোজন করিলে মহাশ্বেতা শয়নাগারে গমন করিলেন, সরলা দৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত হইল। দৈনিক কার্য্য কি? অনাথা

ব্রাহ্মণকন্যা জাতিমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া যে কার্য্য করিতে পারেন, সরলা তাহাই করিত।—গ্রাম হইতে দুই তিন ক্রোশ অন্তরে হাট হইতে চিন্তা তুলা ক্রয় করিয়া আনিত, সরলা তাহাতে সূতা কাটিয়া হাটে পাঠাইয়া দিত। মাতার নিকট সরলা অতি সুন্দর চিত্র ও সূচিকার্য্য শিখিয়াছিল, তদ্দ্বারা অনেক প্রকার অতি সুন্দর সুন্দর দ্রব্য প্রস্তুত করিত। প্রস্তুত হইলে সরলা অমলাকে দিত ও অমলা স্বামীর দ্বারায় নগরে পাঠাইয়া দিয়া বিক্রয় করাইত। অমলা অতিশয় স্নেহবতী ও অতিশয় চতুরা; কোন দ্রব্য বিক্রয় না হইলে, বা অল্প মূল্যে বিক্রয় হইলে, অধিক মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে বলিয়া অধিক মূল্য সরলাকে দিত। সরলা তাহা কিছুই জানিতে পারিত না। এতদ্ভিন্ন গৃহের নিকটবর্ত্তী দুই চারিটী আম্র, কাঁঠাল, নারিকেল ও অন্যান্য ফলের গাছ ছিল, তাহার ফল বিক্রয় করিয়াও কিছু কিছু পাওয়া যাইত। রাজা সমরসিংহের দুহিতা সানন্দচিত্তে এই সকল সামান্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিত,—এত যত্নের সহিত করিত যে, তাহাতে যে আয় হইত, তদ্দ্বারা তিনজন স্ত্রীলোকের অনায়াসে জীবনধারণ হইত। সরলার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাও কর্ম্ম করিত ও হাটের দিন চিন্তা হাটে যাইয়া ক্রয়-বিক্রয়াদি করিত।

সন্ধ্যাকাল সমাগত। মহাশ্বেতা দৈনিক রীত্যনুসারে স্নানার্থ গমন করিলেন। চিন্তাও অনেক রাত্রি না হইলে হাট হইতে রুদ্রপুরে পঁহুছিতে পারিত না, কুটীরে সরলা একাকিনী কাজ করিতেছে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমজনিত ক্লান্তিবশতঃই হউক বা অনেকক্ষণ একাকিনী বলিয়াই হউক, সরলার মুখমণ্ডল যেন কিছু ম্লান বোধ হইতেছে, সন্ধ্যার ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন সরলার হৃদয়ে ছায়া গাঢ়ভূত হইতেছে। চিন্তা কিছুই নাই, দুঃখ কিছুই নাই, তথাপি হৃদয়-আকাশ যেন অল্প অল্প মেঘাচ্ছন্ন হইতেছে! পাঠক মহাশয় কখন সায়ংকালে দূর হইতে দুঃখজনিত সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সহসা আপন অন্তঃকরণ দ্রবীভূত বোধ করিয়াছেন? সরলার হৃদয় সন্ধ্যাকালে যেন আপনা হইতেই সেই প্রকার দ্রবীভূত হইতেছিল। কখন প্রবাসে, বন্ধুশূন্য বিজনে পাঠক মহাশয় নির্জন নিঃশব্দ প্রান্তরাভিমুখে বিমর্ষভাবে অবলোকন করিয়া বসিয়াছেন? সরলার অন্তঃকরণ সেইরূপ বিমর্ষভাবে আচ্ছন্ন হইতেছিল। ভবিষ্যতে কোন ভয় নাই, স্মৃতিতে কোন পরিতাপ নাই, অথচ হৃদয় আপনা হইতেই পরিতপ্ত ও ভারগ্রস্ত। সম্মুখে অনবরত চরকা ঘূরিতেছে, ললাটে ঈষৎ ঘর্ম্মবিন্দু দেখা যাইতেছে,—সরলা একাকিনী বসিয়া কার্য্য করিতেছে ও অতি মৃদুস্বরে এক এক বার

গান করিতেছে। অতি মৃদু গুন্ গুন্ শব্দে গীত একটী খেদের গান এক বার, দুই বার, তিন বারে সাঙ্গ হইল, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল,—

"সরলা!"

যিনি ডাকিলেন, তিনি ব্রাহ্মণতনয়, বয়ঃক্রম প্রায় বিংশতি বৎসর হইবে। মুখমণ্ডল অতি সুশ্রী ও ঔদার্য্যব্যঞ্জক; কিন্তু ঈষৎ গম্ভীর ও ম্লান। কেশবিন্যাসে কিছুই যত্ন নাই; সুতরাং নিবিড় কৃষ্ণকুন্তল অধুনা মালিন্য প্রাপ্ত হইয়া মুখমণ্ডল কিঞ্চিৎ আচ্ছন্ন করিয়াছে। চক্ষুর্দ্বয় জ্যোতিঃপূর্ণ; কিন্তু দারিদ্র্য, অথবা দুঃখ, অথবা চিন্তায় চতুষ্পার্শ্বে কালিমা পড়িয়াছে। ললাট প্রশস্ত, উচ্চ, বক্ষঃ আয়ত, বাহুযুগল দীর্ঘ, শরীর গম্ভীর ও শান্ত, অথচ তেজঃব্যঞ্জক; আকৃতি দেখিলে সহসা বীরপুরুষ বলিয়া বোধ হয়। যতক্ষণ গান গীত হইতেছিল, আগন্তুক নিস্পন্দশরীরে পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলেন ও অনিমিষলোচনে সরলার প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। বোধ হয়, যেন সরলার শোকাবহ গানে আগন্তুকের হৃদয়ে কোন শোকচিন্তার উদ্রেক করিয়াছিল; ললাট কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হইতেছিল; এক এক বার দীর্ঘনিশ্বাস বহির্গত হইতেছিল। আগন্তুকের সহিত পাঠক মহাশয় পূর্ব্বেই পরিচিত আছেন। তাঁহার নাম ইন্দ্রনাথ। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ইন্দ্রনাথ সরলার নাম উচ্চারণ করিলেন,—

"সরলা!"

সরলা হঠাৎ পশ্চাতে দেখিয়া বলিল, "কে ও, ইন্দ্রনাথ?" ইন্দ্রনাথ আবার বলিলেন,—

"সরলা! তোমার সংসারে কি এত বৈরাগ্য হইয়াছে, যে এরূপ শোকাবহ গান গাইতেছ,—ইহার কারণ আছে বটে?"

সরলা আরও কুণ্ঠিত হইল, বলিল,—

"না, আমি মনে কিছুই ভাবি নাই,—আমার মনে কোন ভাবনাই নাই, তবে আমি ঐ একটী ভিন্ন আর গান জানি না, সেইজন্য আমি ঐটী বার বার গাইতেছিলাম। অমলা আমাকে অনেক গান শিখাইয়াছিল, তাহার মধ্যে আমার কেবল ঐটী মনে লাগে, যখন একাকিনী থাকি, তখন বসিয়া বসিয়া গাই। আমি কি জানি যে তুমি লুকাইয়া শুনিতেছ?" এই বলিয়া সরলা মুখ নত করিল।

ইন্দ্রনাথ দেখিলেন, সরলা লজ্জিত হইয়াছে, অন্য কথা পাড়িলেন, বলিলেন,—

"একাকিনী এতক্ষণ কায করিতেছ কেন?" সরলা বলিল,—"আজি চিন্তা হাটে গিয়াছে, সেইজন্য দুইজনের কায আমিই করিতেছি। তুমি বস, মা পূজা করিতে গিয়াছেন, দুই প্রহর রাত্রির আগে আসিবেন না।" এই বলিয়া সরলা ইন্দ্রনাথকে আসন আনিয়া দিল।

এতক্ষণ একাকিনী থাকিয়া সরলা যেরূপ ম্লান হইয়াছিল, চিরপরিচিত বন্ধুকে অনেক দিন পরে দেখিয়া সেইরূপ আগ্রহ ও আনন্দের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। সরলার কি কথা? সরলচিত্ত বালিকার যে কথা, সরলা সেই কথাই কহিতেছিল। কখন মাতার কথা কহিতেছিল; কখন আপন কার্য্যের কথা কহিতেছিল; কখন আপনি যে সুন্দর সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছিল, তাহাই ইন্দ্রনাথকে দেখাইতেছিল; কখন ক্ষুদ্র উদ্যানে লইয়া গিয়া আপনি যে পুষ্পচারা রোপণ করিয়াছিল, তাহাই দেখাইতেছিল। ইন্দ্রনাথ আগ্রহপূর্ব্বক তাহাই শুনিতে ও দেখিতেছিলেন। ক্রমে ক্রমে নিবিড় বৃক্ষাবলীর ভিতর দিয়া পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল। প্রথমে আকাশ সুবর্ণ বর্ণ হইয়া আসিল, ক্রমে ক্রমে বৃক্ষপত্রের ভিতর দিয়া উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রের আলোক দেখা যাইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্র উচ্চে আরোহণ করিয়া নীল আকাশে স্বর্ণ-আলোক বিস্তার করিলেন। সে আলোকে সরলার সুগোল শরীর প্লাবিত করিল; সুন্দর বদনমণ্ডলের কিশোর ভাব বর্দ্ধন করিল; সুহাসপরিপূর্ণ ওষ্ঠদ্বয় আরও মধুরিমাময় করিল; শান্তজ্যোতিঃ নয়নদ্বয় স্নেহরসে আপ্লুত করিল। সরলা কখনও পুষ্পচয়ন করিয়া ইন্দ্রনাথকে দিতেছে, কখন বা আনন্দোৎফুল্লনয়নে চন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে ও সেই সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতেছে। কতকগুলি সুগন্ধ পুষ্পচয়ন করিয়া একছড়া সুন্দর মালা রচনা করিল। "দেখ দেখি, কেমন সরস মালা গাঁথিলাম!" বলিয়া লীলাক্রমে সেই মালা ইন্দ্রনাথের মস্তকে জড়াইয়া দিল। মালা স্রস্ত হইয়া গলায় পড়িল। ইন্দ্রনাথ বলিলেন, "সরলা, আমাকে কি মাল্য দান করিলে?" সরলা কুণ্ঠিত হইল, চক্ষুর পাতা দুখানি ধীরে ধীরে পতিত হইল, মুখে আর কথা সরিল না। ইন্দ্রনাথেরও মুখে কথা নাই, সস্নেহনয়নে সেই সুবর্ণপুত্তলীর দিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, সেই নিবিড় কৃষ্ণ কুন্তল, সেই সুবঙ্কিম ভ্রূযুগল, সেই প্রেমপ্লাবিত নয়ন, সেই স্মিতমধুর ওষ্ঠাধর, সেই মোহন মুখমণ্ডল, সেই বালিকার সরল হৃদয় আলোচনা করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "সরলা!"

ইন্দ্রনাথের গম্ভীর ভাবে সরলা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। দেখিল, তাঁহার ম্লান মুখ আরও ম্লান হইয়াছে।

ইন্দ্রনাথ পুনরায় বলিলেন, "সরলা! বোধ হয়, তোমার সহিত আমার এই শেষ দেখা।" সরলার প্রফুল্ল নয়নে একবিন্দু জল আসিল, বলিল, "কেন, তুমি কি আর রুদ্রপুরে থাকিবে না?"

ইন্দ্র। "না; আমি আর রুদ্রপুরে থাকিব না; কারণ বোধ হয়, তুমি পরে জানিতে পারিবে।"

সর। "কেন, সই কি তোমাকে বাড়ীতে রাখিতে পারে না? তুমি কেন অমাদের বাড়ী থাক না? আমি মাকে বলিলে মা সম্মত হবেন। আমরা যাহা উপার্জ্জন করি, তাহাতে তোমার এখানে কোন কষ্ট হইবে না, স্বচ্ছন্দে থাকিবে। তুমি আমাদের বাড়ী থাক।"

ইন্দ্রনাথের চক্ষু জলে প্লাবিত হইল। মুখ ফিরাইলেন, অনেক কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিলেন, কহিলেন, "সরলা! তোমার দয়ার শরীর, তোমার স্নেহ অসীম।—আমার খাইবার কষ্ট কিছু নাই। তোমার সই আমাকে বিশেষ যত্ন করেন; না করিলেও আমার অন্য স্থানে খাইবার সংস্থান আছে, আমি অন্য কারণে গ্রাম ত্যাগ করিতেছি।"

সর। "নিতান্তই কি গ্রাম ত্যাগ করিতে হইবে?"

ইন্দ্র। "সরলা, আমি চলিয়া গেলে কি তোমার মনে কষ্ট হইবে?"

সর। "কষ্ট হইবে না? আমাদের আর কে আছে বল?"

ইন্দ্রনাথ পুনরায় মুখ ফিরাইলেন। রাজা সমরসিংহের দুহিতার বান্ধবের মধ্যে এক কৃষকপত্নী অমলা, আর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। ইন্দ্রনাথ অতি কষ্টে অশ্রুবেগ সম্বরণ করিলেন এবং পুনরায় কহিলেন, "সরলা, তোমার মনের কষ্ট দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে; কিন্তু আমি কোন প্রকারে আর এ গ্রামে থাকিতে পারি না। সরলা, বিদায় দাও; যদি বাঁচিয়া থাকি, যদি কার্য্য সিদ্ধ হয়, পুনরায় দেখা করিব; না হয়, এই শেষ।"

ইন্দ্রনাথের মুখ হইতে আর কথা বাহির হইল না, সরলার প্রশান্ত নীলোৎপলসদৃশ চক্ষুতে অশ্রু টল্ টল্ করিতে লাগিল। প্রথমে একটী দুইটী বড় অশ্রুবিন্দু বদনমণ্ডলে পড়িল, শীঘ্রই দরবিগলিত অশ্রুধারা বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। সরলা ইন্দ্রনাথকে ভ্রাতার মত ভালবাসিত, তাহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ভালবাসা আপন হৃদয়কোরকে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা জানিত না; বিদায় দিতে এমন যাতনা হইবে, তাহা

জানিত না। বলিল, "যাইবে?" যে কাতরস্বরে এই কথাটী উচ্চারিত হইল, সে কেবল রমণীকণ্ঠ হইতেই সম্ভবে। স্নেহার্দ্র, প্রেমপরিপূর্ণ রমণী-হৃদয় হইতে সেই স্বর বহির্গত হয়। সরলা সেই স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "যাইবে?" ইন্দ্রনাথ আর অশ্রু সম্বরণ কবিতে পারিলেন না। সরলার অশ্রুপরিপূর্ণ চক্ষু দেখিয়া, স্বর্গীয় প্রেমময় মুখমণ্ডল দেখিয়া, স্নেহমাখা কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় একবারে দ্রবীভূত হইল। দুইটী হাতে সরলার দুইটী হাত ধরিয়া রহিলেন; দুই জনেরই শরীর কম্পিত হইতে লাগিল; হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল; অশ্রুধারায় মুখমণ্ডল ভাসিতে লাগিল।

সেই পৌর্ণমাসী রজনীতে, সেই নিভৃত উদ্যানে, চন্দ্রালোকে উভয়ে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া,—উভয়ের হস্তধারণ করিয়া, পরস্পরের বদন-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন;—পরস্পর-দর্শন-সুধা পরস্পর যেন সতৃষ্ণনয়নে পান করিতে লাগিলেন;—পরস্পরের বদনমণ্ডল দেখিয়া যেন হৃদয়ের যাতনা কিছু কিছু শান্ত হইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে ইন্দ্রনাথ স্নেহভরে সরলার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া, আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—

"সরলা, আমি ধর্ম্মের গৌরবের জন্য, পাপের দণ্ডের জন্য যাইতেছি। ভগবান অবশ্যই আমাকে সাহায্য করিবেন। যদি তিনি সাহায্য করেন, তবে কাহাকে ভয়? অবশ্যই কৃতকার্য্য হইয়া আবার তোমারই নিকট আসিব।"

সরলা কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বলিল, "যদি আইস, কবে আসিবে?"

ইন্দ্রনাথ বলিলেন, "ছয় মাসের মধ্যে আসিব। আজি পূর্ণিমা, আজ হইতে সপ্তম পূর্ণিমা তিথিতে আবার তোমার সহিত দেখা হইবে। যদি না হয়, তবে জানিবে ইন্দ্রনাথ আর এজগতে নাই।"

"যদি না হয়, তবে জানিবে, সরলাও আর এজগতে থাকিবে না।"

এই কথা বলিতে বলিতে দ্বারদেশে শব্দ হইল। সরলা বুঝিল, চিন্তা আসিয়াছে। দ্বার খুলিয়া দিতে গেল। ইন্দ্রনাথ অনিমেষলোচনে তাহার দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, ও মনে মনে বলিলেন,—

"ভগবান, সহায় হও, যেন এই রমণীরত্ন লাভ করিতে পারি। যদি না পারি, এই পূর্ণচন্দ্র সাক্ষী রহিলেন, অদ্য হইতে সপ্তম পূর্ণিমাতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিব।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রুদ্রপুর পরিত্যাগ।

And there were sudden partings, such as press
The life from out young hearts, and choking sighs
That ne'er might be repeated. Who could guess,
If e'er again should meet those mutual eyes,
Since upon a night so sweet such awful morn could rise

Byron.

ইন্দ্রনাথ যে যথার্থ প্রেমের দাস, তাহা পাঠক মহাশয় অবগত হইয়াছেন। তাহা ভিন্ন আর কিছু বিশেষ পরিচয় দিতে আমরা অভিলাষ করি।

রাজা সমরসিংহ বঙ্গদেশীয় সমস্ত হিন্দু জমীদারদিগের সম্পদকালে পরম বন্ধু ও বিপদকালে একমাত্র অবলম্বন এবং আশ্রয় ছিলেন। তিনি নিজ সাহস ও বাহুবলে যে খ্যাতি ও ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা স্বধর্ম্মাবলম্বী জমীদারদিগের বঙ্গদেশে গৌরব বর্দ্ধন করিবার চেষ্টা করিতেন। ফলতঃ বিপদকালে তাঁহার নিকট উপকার প্রাপ্ত হন নাই, এপ্রকার জমীদার প্রায় বঙ্গদেশেই ছিল না। ইচ্ছাপুরের প্রজারঞ্জন জমীদার নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী রাজা সমরসিংহের বিশেষ অনুগ্রহভাজন ছিলেন। নগেন্দ্রনাথও রাজা সমরসিংহকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবৎ শ্রদ্ধা করিতেন ও তাঁহার আজ্ঞা না লইয়া কোন কার্য্যই করিতেন না।

রাজা সমরসিংহের মৃত্যুর পর নগেন্দ্রনাথ বিধবা রাজ্ঞী ও রাজকুমারীর জন্য অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহারা ছদ্মবেশে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ হইতে পলায়ন করাতে কেহই তাঁহাদের কোন সন্ধান পাইল না। বিশেষতঃ রাজা সমরসিংহের অপত্যের নিমিত্ত অধিক স্নেহ প্রকাশ করিলে রাজাধিরাজ সতীশচন্দ্রের ক্রোধভাজন হইতে হইবে, এই বিবেচনায় আন্তরিক স্নেহও কিঞ্চিৎ পরিমাণে সংবৃত রাখিতে হইয়াছিল। মানবহৃদয়ে স্নেহরজ্জু অতি সূক্ষ্ম ও ক্ষণস্থায়ী, স্বার্থপরতা যৎপরোনাস্তি প্রবল। দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে নগেন্দ্রনাথ আপনার উন্নতিপথে ধাবিত হইতে লাগিলেন; যাহাতে আপনার ধন, মান, ক্ষমতা বর্দ্ধন হয়, যাহাতে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ও দেওয়ান মহাশয়ের প্রণয়ভাজন হইতে পারেন, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে

মাসে অভাগা বিধবা ও অনাথা কন্যার কথা বিস্মৃত হইতে লাগিলেন। বৎসর মধ্যেই সে দুঃখের কথা তিনি সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গেলেন। রাজা সমরসিংহের যে বিধবা স্ত্রী ও অনাথা কন্যা আছে, তাহা নগেন্দ্রনাথের স্মরণপথ হইতে এককালে দূরীভূত হইল।

পাঠক মহাশয় নগেন্দ্রনাথকে কৃতঘ্ন পামর বলিয়া মনে করিবেন। আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, যদি নগেন্দ্রনাথ কৃতঘ্ন হয়েন, তবে এই বিপুল সংসারে ১০০ জনের মধ্যে ৯৯ জন লোক কৃতঘ্ন। পাঠক মহাশয়! এই অখিল ভূমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি করুন। ইহার মধ্যে কয়জন উপকারের প্রত্যুপকার করিবার জন্য আপন পথে কাঁটা দেন,—কয়জন পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণে আপন স্বার্থসাধনে বিরত হন? স্নেহ, দয়া, মায়া, এসকল স্বর্গীয় পদার্থ। কিন্তু স্বার্থপরতা প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে স্নেহ কতদিন থাকে,—মায়ার পাত্র নয়নের বহির্গত হইলে মায়া কতদিন থাকিতে পারে? আমরা যদি নগেন্দ্রনাথের প্রতি রাগ করিয়া থাকি, তবে নগেন্দ্রনাথকৃত অপরাধ হইতে আপনি নিরস্ত থাকিতে চেষ্টা করি। বোধ করি, অনেক দরিদ্র আত্মীয় কুটুম্ব আমাদিগের মুখ চেয়ে আছে, তাহাদিগকে যেন আশ্রয় দান করি; বোধ করি, অনেক অনাথা বিধবা যাতনায় ও কষ্টে কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতেছে, স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া তাহাদের সহায়তা দানে যেন ধাবমান হই। এ দুঃখপূর্ণ সংসারে চারিদিকে যে দুঃখরাশি দেখিতে পাই তাহা সমস্ত নিবারণ করা মনুষ্যের অসাধ্য; কিন্তু যদি একজন ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান করিতে পারি, একজন তৃষার্ত্তকে স্নেহবারি দিয়া তুষ্ট করিতে পারি, একজন অনাথিনীর নয়নজল মোচন করিতে পারি, তবে এ কার্য্যক্ষেত্রে আমরা বৃথা জন্ম ধারণ করি নাই।

নগেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ এজগতে বৃথা জন্ম ধারণ করেন নাই। স্বার্থসাধনে এতদূর বিমুখ, যে অনেক সময়ে লোকে তাঁহাকে পাগল বলিত,—স্বার্থসাধনে তৎপর হইলেই লোক জগতে বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিগণিত হয়। ধনবান্ জমীদারের পুত্র হইয়াও ধনে তাঁহার আদর ছিল না;—উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি কৃষকদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতে ভাল বাসিতেন;—কখন কখন কৃষকদিগের সহিত বাস করিতেন;—সদাই কৃষকদিগের পরম বন্ধু ছিলেন। কতবার তিনি ছদ্মবেশে কৃষকদিগের গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যখন সায়ংকালে কৃষকদিগের কুটীরে প্রদীপ জ্বলিত, যে সময়ে গো-শালায় গাভী সকল আসিয়া প্রবেশ করিত কতবার তিনি কুটীরাবলীর পার্শ্বে ইতস্ততঃ বিচরণ

করিতেন, প্রজাদিগের দারিদ্র্যে সন্তোষ, জ্ঞানশূন্যতায় দোষশূন্যতা, দুঃখ ও ক্লেশে তপস্বীর ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিতেন, দিনে দিনে বৎসরে বৎসরে যুগ যুগান্তরেও প্রজাদিগের অপরিবর্ত্তিত অবস্থা আলোচনা করিতেন। কতবার প্রজাদিগের সামান্য বিষয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতেন,—অমুক গ্রামে একটা পুষ্করিণী খনন হইতেছে;—অমুক গ্রামে ধান্য দুর্ম্মূল্য হইতেছে—এস্থানের মহাজন বড় শিষ্ট লোক;—ওস্থানের গোমস্তা বড় অত্যাচারী; সুরেন্দ্রনাথ এই সকল কথাই আগ্রহপূর্ব্বক শ্রবণ করিতেন। এরূপ সময়ে তিনি আপন ধনমর্য্যাদা বিস্মৃত হইতেন; আপন কুলগৌরব বিস্মৃত হইতেন;—সেই ধান্যক্ষেত্রবেষ্টিত, আম্রকাননশোভিত কুটীরাবলিনিবাসিদিগকে আপন ভ্রাতা জ্ঞান করিয়া ভ্রাতার মত তাহাদিগের সাহায্যে তৎপর হইতেন। এরূপ লোককে সকলেই পাগল বলিবে না ত কি?

যখন মহাশ্বেতা বালিকা কন্যা লইয়া চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ হইতে পলায়ন করেন, সুরেন্দ্রনাথ আপন পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া অনেক দিন অন্বেষণের পর তাঁহার সন্ধান পাইলেন। তৎকালে মহাশ্বেতা ইচ্ছামতী-তীরে মহন্ত চন্দ্রশেখরের নিকট মহেশ্বর-মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তথায় যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং তাঁহাকে আশ্রয় দানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু অভিমানিনী মহাশ্বেতা দরিদ্রাবস্থায়ও গর্ব্বিতা ছিলেন, সহায়তা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। সুরেন্দ্রনাথ বার বার উপরোধ করিলেন, কিন্তু মহাশ্বেতা বার বার অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "রাজা সমরসিংহের বংশ এই দরিদ্রাবস্থায়ও মাননীয়,—পরের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করে না।" এ কথায় সুরেন্দ্রনাথ অগত্যা উপরোধ হইতে নিরস্ত হইলেন। অবশেষে বলিলেন, "আপনার স্বামীর নিকট আমরা অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, অনেক বিষয়ে ঋণগ্রস্ত আছি, এই অসময়ে যদি কোন প্রত্যুপকার না করিতে পারিলাম, তবে চিরকাল আমার জন্ম বিফল মনে করিব। অতএব যদি অর্থগ্রহণ না করেন, বলুন, আর কি প্রকারে আপনার উপকার করিতে পারি?" মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন, "তবে তোমার জমীদারির মধ্যে আমাকে থাকিবার স্থান দান কর, আমি বৎসরে বৎসরে তাহার খাজানা দিব, আর কোন নদীতীরে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেও, তথায় এই শিবপ্রতিমা প্রতিরাত্রে পূজা করিব। ইহা ভিন্ন আমার প্রার্থনীয় আর কিছুই নাই।" সুরেন্দ্রনাথ রুদ্রপুর গ্রামে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, এবং সেই অবধি মহাশ্বেতা ও তাঁহার কন্যা তথায় থাকিতেন।

যে সময় সুরেন্দ্রনাথ চন্দ্রশেখরের নিকট গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ছদ্মবেশ—তখনই তিনি ইন্দ্রনাথ নাম ধারণ করিয়াছিলেন। ছদ্মবেশেই তিনি দেশে দেশে অনুসন্ধান করিয়া মহাশ্বেতার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, ছদ্মবেশেই তাঁহার সহিত সেই নিস্তব্ধ আশ্রমে সরলার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ইচ্ছামতী-তীরে কতবার তিনি বালিকাকে খেলা দিয়াছেন; কতবার তাহাকে গল্প বলিয়াছেন; কতবার তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া চুম্বন করিয়াছেন। এইরূপে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত ইন্দ্রনাথ ও সরলার মধ্যে সোদর সোদরার প্রেম জন্মিয়াছিল। তাহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ভাব অন্তরে উদয় হইয়াছে, তাহা অদ্যকার এই পূর্ণিমা রজনীর পূর্ব্বে কেহই জানিতে পারেন নাই।

প্রেমের কি প্রবল পরাক্রম! যে সরলার বালিকাহৃদয়ে কখনও কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই, আজি সেই সরলার হৃদয় চঞ্চল হইল। বাল্যকালাবধি সুরেন্দ্রনাথ যে পরোপকারব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন,—আজি তাহা ত্যাগ করিয়া প্রেমব্রত অবলম্বন করিলেন। আজি তিনি পরোপকারী সুরেন্দ্রনাথ নহেন, ঘোর স্বার্থপর ইন্দ্রনাথ।

প্রেমপরায়ণতা আর স্বার্থপরতা কি এক? যে পবিত্র প্রেমের উপরোধে লোকে প্রণয়িনীর উপকারার্থ আত্মবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হয়, সে পবিত্র প্রেম কি স্বার্থপরতার অঙ্গবিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে?—কবিগণ যাহাই বলুন, প্রণয়িগণ যাহাই বলুন, আমাদের অভিপ্রায় এই, সেই পবিত্র প্রেম স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে ভাব অবলম্বন করিয়া তুমি জগতের উপকার হইতে বিরত হইলে,—যে ভাবে অন্ধ হইয়া তুমি সমগ্র জগতে কেবল আপন প্রণয়পাত্রের প্রতিকৃতি দেখিতে পাও,—যাহার প্রভাবে তুমি বিবেচনা কর যে, এই সুন্দর নভোমণ্ডল, সুন্দর বৃক্ষলতাদি, নয়নরঞ্জন পুষ্পচয়, কেবল তোমাদের প্রণয় ও সুখবর্দ্ধনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে,—যে ভাবের প্রভাবে তুমি আত্মসুখ ও আপন প্রণয়িনীর সুখ ভিন্ন আর সকলই ভুলিলে,—সে ভাব স্বার্থপরতা নয় ত কি?

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় মহাশ্বেতা পূজা সমাধা করিয়া গৃহে আসিলেন। ইন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট বিদায় লইবার জন্যই অপেক্ষা করিতেছেন। ইন্দ্রনাথ বলিলেন;—

“আপনি যে দৃঢ় ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে সতীশচন্দ্রের নিধন সাধন না করিলে বোধ হয়, আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পাইব না।”

মহাশ্বেতা। “পাইবে না।”

ইন্দ্র। "আশীর্ব্বাদ করুন,—আমি অদ্যই সেই অভিপ্রায়ে যাত্রা করিতেছি! আশীর্ব্বাদ করুন, অবশ্যই মনোরথ সিদ্ধ হইবে।"

মহা। "আশীর্ব্বাদ করিতেছি, দেবদেব মহেশ্বর তোমার যত্ন সফল করুন। কিন্তু তুমি বালক,—সেই চতুর বুদ্ধিকুশল পামরকে কিরূপে পরাস্ত করিবে, আমার বুদ্ধির অগোচর।"

ইন্দ্র। "অধুনা আমারও বুদ্ধির অগোচর, দেখা যাউক কি হয়।"

মহা। "অবশ্যই তোমার জয় হইবে,—ধর্ম্মের যদি জয় না হয়, তবে এ সংসার ছারখার হইবে,—কেহ আর দেবদেবীর আরাধনা করিবে না।"

ইন্দ্রনাথ ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ধর্ম্মের যদি সর্ব্বদা জয় হইত, তবে আপনার স্বামী নিধন প্রাপ্ত হইতেন না, সতীশচন্দ্রও বঙ্গদেশের দেওয়ান হইতেন না, মানবজাতি কখন ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিত না। যখন চারিদিকে পাপের গৌরব দেখিতেছি,—যখন অত্যাচারী ও কপটাচারিগণ ধন, মান, ঐশ্বর্য্য লাভ করিতেছে; যখন পরমধার্ম্মিক, পবিত্রচেতা, পরোপকারিগণ নিষ্পীড়িত ও পদদলিত হইতেছেন;—তখন আর সংসারের ছারখার হইবার বাকী কি? যদি সদাই ধর্ম্মের জয় থাকিত, তাহা হইলে পাতক ও কপটাচরণ এ সংসার হইতে একবারে দূরীভূত হইত। তথাপি কেন যে অধর্ম্মের জয় হয়, কে বলিবে? ভগবানের লীলাখেলা কে বুঝিতে পারে?"

পরে মহাশ্বেতা বিশ্বেশ্বরী পাগলিনীর কথা ইন্দ্রনাথকে বলিলেন। ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "এই পাগলিনী মানুষী, কি যোগিনী, কি প্রেতকন্যা, বুঝিতে পারি না, কিন্তু তাহার কথা কখন মিথ্যা হয় নাই।"

মহাশ্বেতা। "কখন মিথ্যা হয় নাই। আমার স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে ভবিষ্যৎ গণিয়া বলিয়াছিল। আমি স্বামীকে সবিশেষ অবগত করাইয়া সপরিবারে পলাইবার উপদেশ দিলাম। সেই বীরপুরুষ যে উত্তর দিলেন, তাহা আমার স্মৃতিপথে অদ্যাপি জাগরিত রহিয়াছে। বলিলেন, 'ঘোর সংগ্রামস্থলে হিন্দু কি মুসলমান, মোগল কি পাঠান, কেহ কখন সমরসিংহকে পলায়ন করিতে দেখে নাই,—আজি পামর সতীশচন্দ্রের ভয়ে পলায়ন করিব? মরিতে হয় মরিব, যোদ্ধার তাহাতে ভয় কি?' সুরেন্দ্রনাথ! পূর্ব্বকথা আর তোমাকে কেন বলি? যে হুতাশন আমার অন্তঃকরণ দগ্ধ করিতেছে, তাহা অন্তরেই থাকৃ।"

ইন্দ্রনাথ বলিলেন, "সেইবার ভিন্ন আরও দুই তিন বার ঐ পাগলিনী যে যে কথা বলিয়াছে, তাহাই সত্য হইয়াছে। আমার পরামর্শে আপনাদিগের এই গ্রাম হইতে পলায়ন করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।"

মহাশ্বেতা চিন্তা করিতে লাগিলেন। উক্ত পাগলিনী দুই তিন বার এই প্রকার সহসা দেখা দিয়া যে যে ভবিষ্যৎ কথা বলিয়াছিল, কখন মিথ্যা হয় নাই। তিনি অন্তরে নিশ্চয় জানিলেন যে, সেই পামর সতীশচন্দ্র আবার সমরসিংহের নিরাশ্রয় বিধবার অনিষ্টচেষ্টা করিতেছে, পাগলিনী মানুষী হউক বা প্রেত-কন্যা হউক, জানিতে পারিয়া সতর্ক করিবার জন্য আসিয়াছিল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "অদ্যই পলায়ন করা শ্রেয়ঃ—উপায়ান্তর নাই।"

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইবেন,—আমার আলয়ে আপনাকে আহ্বান করিতে আর ভরসা করি না।"

মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন, "মহেশ্বর-মন্দিরের মহন্ত চন্দ্রশেখরের নিকট পুনর্ব্বার যাইব।" ইন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন, কোন উত্তর করিলেন না। তৎক্ষণাৎ গ্রাম পরিত্যাগ করিবার উদ্যোগে গমন করিলেন।

মহাশ্বেতা সরলাকে নিদ্রা হইতে তুলিয়া সবিশেষ বলিলেন। সরলার বালিকা-মুখ-মণ্ডল গম্ভীর হইল। রুদ্রপুর গ্রামে ছয় বৎসর কাল থাকিয়া সকল দ্রব্যে মায়া হইয়াছিল। সেই পরিপাটী কুটীর, সেই উদ্যান, সেই স্বহস্তরোপিত পুষ্পচারা, সকলই ত্যাগ করিতে হইবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া আর রুদ্রপুরের পক্ষিদিগের সুললিত গান শুনিতে পাইবে না, দুই প্রহরে সেই আম্রবৃক্ষের নিস্তব্ধ স্নিগ্ধ ছায়াতে উপবেশন করিয়া আর কার্য্য করা হইবে না,—সন্ধ্যায় অমলার সেই সুমধুর হাস্যবিকসিত মুখ আর দেখিতে পাইবে না। অমলার কথা স্মরণ হওয়াতে চক্ষুতে জল আসিল, বলিল,—

"মা, আমি সইয়ের নিকট বিদায় লইয়া আসি।" মহাশ্বেতা বলিলেন, "যাও মা, কিন্তু শীঘ্র আইস।"

সরলা বিদায় লইতে চলিল।

অমলার গৃহের নিকট যাইয়া ডাকিল, "সই!" প্রফুল্লবদনা অমলা গৃহের বাহিরে আসিল। কি তামাসা করিবে বলিয়া তাহার অধরোষ্ঠ হাসিতে বিস্ফারিত; বলিল "এত রাত্রিতে?" আর কথা বাহির হইল না। সরলার মুখপানে চাহিয়া অমলার প্রফুল্ল মুখ গম্ভীর হইল; অধরের হাসি শুকাইয়া গেল, দেখিল সরলার নয়নযুগল জলে ছল্ ছল্ করিতেছে, টস্ টস্ করিয়া বক্ষঃস্থলে জল পড়িতেছে। অমলা নিকটে আসিয়া স্নেহভরে হস্ত-ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি সই, কি হইয়াছে?"

সরলা উত্তর করিল, "মা বলিয়াছেন, আমরা এই গ্রাম হইতে অদ্যই চলিয়া যাইব,—তোমার সঙ্গে বোধ হয়, এই শেষ দেখা," বলিয়া সরলা

অমলার বক্ষঃস্থলে আপন মুখ লুকাইয়া দরবিগলিত ধারায় রোদন করিতে লাগিল। দ্বিপ্রহর রাত্রিতে সহসা এই কথা শুনিয়া অমলার হৃদয়ে যেন বজ্রপাত হইল। প্রথমে সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না, কিন্তু সরলার স্বরভঙ্গীতে সন্দেহেরও স্থল থাকিল না। অমলা কারণ কিছুই বুঝিতে পারিল না; কিন্তু মনে মনে প্রতীতি হইল, প্রিয়সখীর সহিত চিরবিচ্ছেদ অনিবার্য্য। তখন অমলাও চিত্ত সংযম করিতে পারিল না। সরলচিত্তা সরলাকে অমলা কনিষ্ঠ সোদরা অপেক্ষাও স্নেহ করিত। ছয় বৎসর কাল একত্র থাকিয়া তাহাকে সোদরা অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিত। এখন, সহসা সেই প্রিয়সখীর সহিত চিরবিচ্ছেদ হইল। সহসা ছয় বৎসরের প্রণয়ের কথা মনে উদয় হইতে লাগিল। অমলা অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে পারিল না, চক্ষুজলে সরলার কেশ সিক্ত করিল; কিন্তু সরলাকে রোদন করিতে দেখিয়া শীঘ্রই আপন চিত্ত সংযত করিল, সরলাকে বলিল, "আমার সঙ্গে আবার শেষ দেখা? তুমি যেখানে থাকিবে, আমি সেই খানে যাইয়া তোমার সহিত দেখা করিব, তাহার জন্য চিন্তা কেন? এক্ষণ এ গ্রাম হইতে তোমরা কেন যাইবে, বল দেখি?"

সরলা কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বলিল, "তাহা আমি জানি না; মা তাহা বলেন নাই; কিন্তু আমরা ইচ্ছামতী-তীরে মহেশ্বর-মন্দিরে যাইতেছি।"

অম। "কেন যাবে, জান না?—আমি বলিব?"

সর। "বল।"

অম। "তোমার মা তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন!"

সরলা অগত্যা দুঃখ ভুলিয়া গেল, একটু হাসিল। অমলা পুনরায় বলিল—

"তা মহেশ্বরমন্দির আর রুদ্রপুর ত এপাড়া ওপাড়া, প্রত্যহ যাইয়া তোমায় দেখিয়া আসিব। দেখিও, বিবাহের সময় আমি উপস্থিত হইয়া উলু' দিব।"

এই প্রকারে অনেকক্ষণ কথোপকথন হইতে লাগিল। কেহ আর কাহাকেও ছাড়িতে চাহে না,—ছাড়িলে যেন দুই জনেরই হৃদয় বিদীর্ণ হইবে। অথচ অমলার কথায় সরলার হৃদয় কিছু শান্ত হইয়াছে;—অমলার অধরে হাসি, চক্ষে ক্রন্দন,—হৃদয়ে কি তুমুল ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছিল, পাঠক মহাশয় বুঝিবেন।

ক্ষণেক পর অমলা বলিল, দাঁড়াও সই, আমি শীঘ্রই আসিতেছি,—বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। আসিতে অনেক বিলম্ব হইল। যখন

পুনরায় বাহিরে আসিল, সরলা দেখিল, তাহার বসন সিক্ত হইয়াছে ও মুখ রক্তবর্ণ। আসিয়া সরলার কাপড়ের অঞ্চলে কি বাঁধিয়া দিল। সরলা জিজ্ঞাসা করিল, "কি দিলে, সই?"—অমলা উত্তর করিল, "ও কিছু নহে, পথে ক্ষুধা পাইবে, সেই জন্য কিছু মুড়ী আর ফুটকড়াই আঁচোলে বাঁধিয়া দিতেছি।—আমার মাথা খাও, ফেলিয়া দিও না।" এই বলিয়া কাপড়ে ২০টী রৌপ্যমুদ্রা বাঁধিয়া দিল। অমলা আবার বলিল, "স্বামী পাইলে আমাকে মনে থাকিবে ত?"

সরলা উত্তর করিতে পারিল না, চক্ষে জল আসিল, কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইল। অমলা বলিল, "কাঁদিও না সই, আমি জানি, তুমি সইকে ভুলিবে না, কিন্তু পাছে ভুলে যাও, তাই আমার একটী চিহ্ন তোমার গায়ে রাখিয়া দি।" এই বলিয়া আপন গলদেশ হইতে সোণার চিক লইয়া সরলার গলায় পরাইয়া দিতে গেল। সরলা বাধা দিবার চেষ্টা করিল, তাহাতে অমলা বলিল, "যদি না লও, তবে আমি জানিব, আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ;—যদি আমাকে কখন ফিরাইয়া দিতে চাহ, তবে জানিব, আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ।" সরলা নিরুত্তর হইল। অমলা তাহাকে সেই চিক পরাইয়া দিতে লাগিল।

পরাইয়া দিতে দিতে অমলা সেই পূর্ণচন্দ্রের আলোকে সরলার বালিকা-মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই নিবিড় কুঞ্চিত কৃষ্ণকুন্তলবেষ্টিত মুখখানি দেখিতে লাগিল, সেই নীলোৎপল সদৃশ প্রেমবিস্ফারিত নয়ন দুটী নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, সেই সুমধুর ঈষৎ-বিভিন্ন ওষ্ঠ দুইখানি দেখিতে লাগিল। মনে মনে ভাবিল, এই প্রেমপুত্তলীকে কি আর কখন হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতে পাইব না? মনে এই ভাবনা উদয় হওয়ায় আর চিত্ত-সংযম হইল না।

চিক পরাইবার ছলে অমলা সরলাকে আপন হৃদয়ের উপর আনিল, স্নেহভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিল, নয়নের নিকট নয়ন লইয়া আসিল, কম্পিত অধরোষ্ঠে কম্পিত অধরোষ্ঠ স্পর্শ করিল। সরলা দেখিল, চিক পরান আর শেষ হয় না, দেখিল, আপনার কাপড় জলে ভাসিয়া যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, "সই কাঁদিতেছ?" অমলা বলিল, "আমি কাঁদিতেছি না, তুমি কাঁদিতেছ?—আমার ঘুম পাইয়াছে, আমি শুইগে যাই।"—এই বলিয়া বেগে গৃহের ভিতর চলিয়া গেল। সরলা ধীরে ধীরে আপন কুটীরাভিমুখে চলিল। অল্প দূর যাইয়া অমলার গৃহের দিক্ হইতে অতি মৃদু ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইল। রমণীকণ্ঠ-নিঃসৃত হৃদয়বিদারক মৃদু রোদনধ্বনি শুনিতে

পাইল। সরলা কিছু বুঝিতে পারিল না, ভাবিল সই ত ঘুমাইতে গেল, ক্রন্দন করে কে? ভাবিতে ভাবিতে দ্রুতপদে আপন গৃহাভিমুখে গমন করিল।

এদিকে ইন্দ্রনাথ নৌকা ঠিক করিলেন। মহাশ্বেতা, সরলা ও ইন্দ্রনাথ সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন, দ্রব্যাদির মধ্যে শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত শিব-প্রতিমা, আর দুই একটী আবশ্যকীয় দ্রব্য ভিন্ন কিছুই লইলেন না। নৌকা ধীরে ধীরে ইচ্ছামতী নদী দিয়া চলিতে লাগিল। কোন কোন স্থানে নদী প্রশস্ত হইয়াছে, উভয় পার্শ্বে প্রান্তর, অটবী ও গ্রামস্থ বৃক্ষলতাদি চন্দ্রালোকে অনুপম শোভা ধারণ করিয়াছে। কোন কোন স্থানে নদী এমন সংকীর্ণ হইয়াছে যে, উভয় পার্শ্বস্থ বংশশাখা লম্বিত হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে। তাহার নিবিড় পত্ররাশির মধ্যদিয়া চন্দ্রালোক প্রবেশ করিয়া স্থানে স্থানে ইচ্ছামতীর স্বচ্ছ সলীল উজ্জ্বল করিতেছে। ইচ্ছামতীর নীল জল কল্ কল্ করিতেছে ও তাহার উপর দিয়া ক্ষুদ্র তরী তর্ তর্ করিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। সরলা এই প্রকার শোভা সন্দর্শন ও শ্রুতিমধুর শব্দ শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্রই নিদ্রিত হইল। ইন্দ্রনাথ নিকটে উপবেশন করিয়া আপন অঙ্কে সরলার মস্তক স্থাপন করিলেন, সমস্ত রাত্রি আপনি অনিদ্র হইয়া সেই নির্ম্মল চন্দ্রালোক-দীপ্ত সেই নির্ম্মল মুখমণ্ডল দেখিতে লাগিলেন। চক্ষুর জ্যোতিঃ এক্ষণে স্তিমিত; নিবিড় কৃষ্ণপক্ষ্মযুক্ত পত্রগুলি নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে। প্রাতঃকালে নৌকা ইচ্ছামতী-তীরস্থ এক ক্ষুদ্র গ্রামে লাগিল। সেই গ্রাম প্রসিদ্ধ মহেশ্বর-মন্দির হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূর ও চারিদিকে কাননে বেষ্টিত। মন্দিরের মহন্ত চন্দ্রশেখর ও অন্যান্য পূজক সময়ে সময়ে মন্দির হইতে আসিয়া এই গ্রামে বাস করিত, সেই জন্য ইহাকে বনাশ্রম বলিত। আরোহীগণ নামিলেন। ধীরে ধীরে পথ অতিবাহন করিয়া চন্দ্রশেখরের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। আশ্রমবাসীগণ আগ্রহপূর্ব্বক রমণীগণকে আহ্বান করিলেন। ইন্দ্রনাথ সরলার নিকট বিদায় লইয়া বলিলেন, "আজি হইতে সপ্তম পূর্ণিমার মধ্যে যদি তোমার সহিত না সাক্ষাৎ করি, তবে জানিবে, ইন্দ্রনাথ এজগতে নাই;—সে পর্য্যন্ত আমাকে মনে রাখিও।" সরলার কোন উত্তর নাই, অতি কাতর সজল নয়নে ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার অর্থ এই, "শরীরে যতদিন জীবন থাকিবে, তুমি স্মৃতিপথে জাগরিত থাকিবে।" দেখিতে দেখিতে ইন্দ্রনাথ দৃষ্টির অগোচর হইলেন। সরলা অনেকক্ষণ শূন্য হৃদয়ে, সজল নয়নে সেইদিকে চাহিয়া রহিল, অনেকক্ষণ পর শূন্য হৃদয়ে আশ্রমাভিমুখে ফিরিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিমলা।

Now naught was heard beneath the skies,
The sounds of busy life were still,
Save an unhappy lady's sighs,
That issued from the lonely pile.

Mickle.

সন্ধ্যাকাল সমাগত। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর ভীমকান্তি চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ ও প্রাসাদ দেখা যাইতেছে। যমুনা নদী চতুর্দ্দিকে দুর্গ বেষ্টন করিয়া কল্ কল্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। দুর্গের চারিদিকের দৃশ্য অতি রমণীয়। সম্মুখে যতদূর দেখা যায়, মনোহর হরিৎ প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। সূর্য্য অস্ত গিয়াছেন, কিন্তু এখনও পশ্চিম মেঘে রক্তিমার আভা দেখা যাইতেছে। দুর্গপদচারিণী শান্তপ্রবাহিণী নদীর নির্ম্মল বক্ষে সেই আভা প্রতিফলিত হইতেছে। সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে সেই নিস্তব্ধ প্রান্তরে অবতরণ করিতেছে; অবতরণ করিয়া সায়ংকালীন নিস্তব্ধতাকে অধিকতর মনোহর করিতেছে। দূরস্থ দুই একটী বটবৃক্ষের ছায়া ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত হইতেছে; সন্ধ্যাকালের রমণীয় নীলিমা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অধিকতর রমণীয়তা প্রাপ্ত হইতেছে। প্রান্তরে শব্দমাত্র নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে বায়ুহিল্লোলে দূরস্থ পল্লীর ক্রমশঃ মন্দীভূত রব শ্রুত হইতেছে, আর মধ্যে মধ্যে পরিশ্রান্ত গৃহাভিমুখগামী কৃষকদিগের শ্রমাপনোদন গীত কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে।

দুর্গের পশ্চাদ্ভাগ এরূপ নহে। তথায় একটী প্রশস্ত আম্রকানন; উহা এত প্রশস্ত যে দুর্গ হইতে সেই আম্রবৃক্ষ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। সায়ংকাল যেমন ক্রমশঃ ঘোরতর হইতে লাগিল, সেই আম্রবৃক্ষের ভিতর পুঞ্জ পুঞ্জ খদ্যোতমালা দেখা দিতে লাগিল; নিকটে, দূরে, উচ্চে, নীচে সেই খদ্যোতমালা খেলা করিতে লাগিল। উদ্যানের ভিতর সুন্দর সরোবর, সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষের ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে, সরোবরের চারিদিকে নানাপ্রকার কীট পতঙ্গ স্ব স্ব রবে সায়ংকালের কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছে।

বাহির হইতে দেখিলে দুর্গের উচ্চ প্রাসাদ সম্পূর্ণ অন্ধকারাবৃত,—কেবল একমাত্র গবাক্ষ হইতে আলোক নির্গত হইতেছে। সেই গবাক্ষ-পার্শ্বে এক অল্পবয়স্কা রমণী আসীনা,—হস্তে গণ্ডদেশ স্থাপন করিয়া কি চিন্তা করিতেছেন।

রমণী গগনমণ্ডলের ললাটস্থ একমাত্র উজ্জ্বল তারার প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহারও সুন্দব সীমন্তে একমাত্র উজ্জ্বল হীরকখণ্ড ঝক্ ঝক্ করিতেছিল।

রমণী কি চিন্তা করিতেছেন;—কে বলিবে, কি চিন্তা করিতেছেন? একি প্রেমেব চিন্তা? প্রেমের চিন্তাতে বদনমণ্ডল ম্লান হয়, নম্র হয়,—এরূপ গর্ব্ববিস্ফারিত হয় না।

রমণীর বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষ হইবে,—যৌবনে সর্ব্ব অঙ্গ অনুপম অসাধারণ সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়াছে; কিন্তু এ সাধারণ নারীজাতির সৌন্দর্য্য নহে,—অলৌকিক উদার স্বভাব ও চিত্তোন্নতিব্যঞ্জক। সে রূপরাশির সম্মুখে দাঁড়াইলে সহসা প্রেমের সঞ্চার হয় না, শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঞ্চার হয়। শরীর কিঞ্চিৎ ক্ষীণ, উন্নত ও দীর্ঘায়ত, অথচ কোমলতা-পরিপূর্ণ। ললাট অতি সুন্দর, সুবঙ্কিম, অথচ উচ্চ ও প্রশস্ত; সেরূপ প্রশস্ত পরিষ্কার ললাট পুরুষের কদাচিৎ দেখা যায়, স্ত্রীলোকের কখনই সম্ভবে না। নয়নের স্থির উজ্জ্বলতা, ওষ্ঠের সুচিক্কণতা, সমস্ত বদনেব উন্নত ও গম্ভীর ভাব, হৃদয়ের মহত্ত্ব ও চিত্তের ঔদার্য্য ও মহাশয়ত্ব প্রকাশ করিতেছে; সমস্ত অবয়বের ভাবভঙ্গী দেখিলে হঠাৎ প্রতীয়মান হয় যে, এ তীক্ষ্ণ জ্যোতির্ম্ময়ী তন্বঙ্গী মানুষী নহেন,—কোন যোগপরায়ণা স্বর্গবাসিনী মানবজাতির উন্নতি সাধনার্থ এই মর্ত্ত্য জগতে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

সেই নিস্তব্ধ সায়ংকালে গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া রমণী সেই সুন্দর নির্ম্মল আকাশপথ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। রমণীর বদনমণ্ডলও অপরূপ সুন্দর ও নির্ম্মল। রজনী গভীর হইতে লাগিল; আকাশের বিস্তীর্ণ নীলবর্ণ ক্রমে ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল;—রমণীর হৃদয়েও যেন চিন্তারজনী গভীর হইতে লাগিল, তাঁহার প্রশস্ত ললাটও যেন ক্রমশঃ ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে লাগিল; সুবঙ্কিম ভ্রূযুগল অধিকতর কুঞ্চিত হইতে লাগিল; নয়ন হইতে তীক্ষ্ণতর উজ্জ্বলতর জ্যোতিঃ বহির্গত হইতে লাগিল।

এই সময়ে একজন পুরুষ সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, "বিমলে!" বিমলা চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিতা সতীশচন্দ্র আসিয়াছেন।

যে পুরুষ কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ বর্ষ হইবে না; কিন্তু আকার দেখিলে সহসা ষষ্টি বৎসরের বৃদ্ধ বলিয়া ভ্রম হয়। মস্তকের অধিকাংশ কেশ শুক্ল, ললাট চিন্তারেখায় অঙ্কিত, শরীরের চর্ম্ম শিথিল, সর্ব্ব অঙ্গ ক্ষীণ, তথাপি চক্ষুর্দ্বয় জ্যোতির্ম্ময় ও মুখমণ্ডলে চিন্তাদেবী সততই অধিষ্ঠান করিতেছেন। ধীর আচরণ, ধীর গমনাগমন, ধীর অথচ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসঞ্চালন। নানারূপ বহুদূরদর্শিনী বহুদূরব্যাপিনী কল্পনাতে তাঁহার জীবন ও অন্তঃকরণ চিরকালই পরিপূরিত হইয়া রহিয়াছে। কক্ষে প্রবেশ করিয়া কন্যাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিলেন। পরে ঈষৎ হাস্যসহকারে ডাকিলেন, "বিমলে!"

বিমলাও পিতাকে দেখিয়া আপন গভীর ভাবনা কিঞ্চিৎ বিস্মৃত হইলেন। বদনমণ্ডলে গম্ভীরভাব ক্রমে অপনীত হইয়া পবিত্র পিতৃস্নেহের আবির্ভাব হইল। পিতা কক্ষে আসিয়াছেন, অনবধানতা বশতঃ এতক্ষণ দেখিতে পান নাই, মনে হইয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন। সতীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিমলে! এত কি দুঃখ হইয়াছে যে, মৌনভাবে এতক্ষণ বসিয়া রহিয়াছ?"

বিমলা উত্তর করিলেন, "আপনি কল্য দুর্গ ত্যাগ করিবেন,—কতদিন আপনাকে দেখিতে পাইব না, কতদিন এই প্রকাণ্ড দুর্গ শূন্য থাকিবে;—সে চিন্তায় আমার মন অস্থির হইয়াছে,—আমি আপন মন শান্ত করিতে পারিতেছি না।"

পিতা উত্তর করিলেন, "সে কি বিমলা, কেন মিথ্যা ভাবনা করিতেছ? আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব; আমি কি তোমাকে ছাড়িয়া অধিক দিন থাকিতে পারি?"

বিমলা। "পিতা, আপনি যে আমাকে অতিশয় স্নেহ করেন তাহা জানি,—পিতা কন্যাকে ইহা অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতে পারে না।"

সতী। "তবে চিন্তা করিতেছ কেন? আমি ত প্রতিবৎসরই একবার রাজধানী যাইয়া থাকি, এবার তোমার বিশেষ চিন্তা কেন?"

বিম। "প্রতিবৎসর আমার এপ্রকার ভাবনা হয় না; এবার সহসা হৃদয়ে ভয় হইয়াছে, কেন জানি না। পিতা, আপনি গৃহে থাকুন, কোথাও যাইবেন না।"

শেষ কথাগুলি অতি অর্দ্ধস্ফুট মৃদুস্বরে উচ্চারিত হইল—শুনিয়া সতীশচন্দ্রের হৃদয়ও যেন আহত ও কিঞ্চিৎ ভীত হইল। ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন—

" বিমলা, কেন মিথ্যা ভয় করিতেছ, আমাকে যাইতেই হইবে, যাইবার সময় রোদন করিও না।"

বিমলা উত্তর করিলেন, "পিতা, মিথ্যা ভয় নহে, কল্য রজনীযোগে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, বোধ হইল যেন স্বর্গীয় মাতা দেখা দিলেন,—সাশ্রুলোচনে যেন অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, 'পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিলম্ব নাই,' বলিয়াই সহসা অন্তর্হিত হইলেন। এখনও বোধ হইতেছে, তাঁহার শুষ্ক মুখখানি,—তাঁহার অশ্রুপূর্ণ লোচন দুইটী দেখিতে পাইতেছি। কি পাপ করিয়াছি, বলিতে পারি না ; কি পাপে স্নেহময়ী মাতাকে হারাইলাম, জানি না ;—আবার কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত সমাগত, ভগবান্ই জানেন। পিতা, ক্ষমা করুন। আমার ভাবনা হইতেছে, আপনি প্রস্থান করিলে আর এ আলয়ে প্রত্যাগমন করিবেন না।"

এই বলিয়া বিমলা বাষ্পাকুলিতলোচনে পিতার নিকট যাইয়া তাঁহার হৃদয়ে আপন বদনমণ্ডল লুকাইলেন। বিমলার যদি স্থিরভাব থাকিত, দেখিতে পাইতেন যে, পিতারও মুখমণ্ডল সহসা বিকৃতি ধারণ করিয়াছিল। স্বপ্নকথা শুনিয়া সতীশচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন,—যেন ভয়াবহ কোন পূর্ব্ব-কথা হৃদয়ে সহসা জাগরিত হইল, যেন কোন গূঢ় পাপের প্রায়শ্চিত্ত সেই-ক্ষণেই আরম্ভ হইল। যখন বিমলা পিতার হৃদয়ে মুখ রাখিয়া রোদন করিতেছিলেন, পিতার সান্ত্বনা করিবার আর ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই সতীশচন্দ্র আপন চিত্ত সংযম করিয়া স্থিরভাবে বলিতে লাগিলেন—

"বিমলা, এ সকলই তোমার মিথ্যা ভয়। দিবাযোগে তুমি কেবল মিথ্যা চিন্তা কর, তাহাতেই রজনীযোগে সেই প্রকার ভয়ের স্বপ্ন দেখ। আমি দেখিয়াছি, গত কয়েক দিন অবধি তুমি কেবলই চিন্তামগ্ন রহিয়াছ, আমাকে যথার্থ করিয়া বল, সে মহাচিন্তার কারণ কি ?"

বিমলা ধীরভাবে উত্তর করিলেন, " পিতা, আপনি যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি অবশ্যই তাহার উত্তর করিব; আপনার নিকট লুকাইবার আমার কোন কথাই নাই। আপনি সে মহাচিন্তার কারণ। অদ্য প্রায় এক মাস হইতে আপনাকে কোন গভীর দুঃখে বা চিন্তায় মগ্ন দেখিতেছি, দিন দিন সেই চিন্তা গাঢ়তর হইতেছে। আপনার আহারের সময় খাদ্য-দ্রব্যে মন থাকে না, রজনীকালে আপনার নিদ্রা হয় না, যদি নিদ্রা হয়, সে কুস্বপ্ন-পরিপূর্ণ। আমি কতবার দিবাযোগে লুকাইয়া আপনার কক্ষে গিয়াছি ; যতবার যাই, দেখি, আপনি সেই চিন্তায় মগ্ন। নিশিযোগে আমি কতবার আপনার শয়নঘরে গিয়াছি, যখন যাই, দেখি কোন কুস্বপ্নে

আপনার ললাট কুঞ্চিত ও সমস্ত বদন বিকৃত হইয়া রহিয়াছে। কি ঘোর চিন্তায় আপনাকে এপ্রকার যাতনা দিতেছে? সামান্য জমীদার, সামান্য কৃষকও দৈনিক শ্রমের পর রজনীতে বিশ্রাম লাভ করে, বঙ্গদেশের রাজাধিরাজ দেওয়ান মহাশয়ের কি সে বিশ্রামে অধিকার নাই?”

বিমলা ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইলেন, দেখিলেন, পিতা স্থিরভাবে তাঁহার কথাগুলি শ্রবণ করিতেছেন,—পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

“গত একমাস অবধি আপনার নিকট এত চর আসিতেছে কেন? চর এত গুপ্তভাবে আসিয়া এবং গুপ্তভাবে চলিয়া যায় কেন? দিবারাত্রি আপনিই বা কোন্ গুপ্ত পরামর্শে ব্যস্ত আছেন? বঙ্গদেশের দেওয়ানের কার্য্যের ভার অতি গুরুতর সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশের সুশাসন ও প্রজার মঙ্গল যে কার্য্যের উদ্দেশ্য, সে কার্য্য ও সে পরামর্শ রজনী দ্বিপ্রহরের সময় গৃহের কবাট রুদ্ধ করিয়া কতকগুলি নিভৃত চরের সহিত সিদ্ধ হয় কেন? বালিকার এসকল কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে, যদি আমি অপরাধ করিয়া থাকি, পিতা মার্জ্জনা করুন; কিন্তু আপনি বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ। বিবেচনা করিয়া দেখুন, কপটাচারী খলস্বভাব সর্পেরই বক্র গতি; উদারচিত্ত মনুষ্যের গতি সরল। যাঁহার চরিত্র সরল, যাঁহার উদ্দেশ্য সরল, তাঁহার গতি বক্র হইবে কেন? পিতা, বালিকার কথায় অবধান করুন, কপট লোকের পরামর্শ ত্যাগ করুন, ধর্ম্মের পথ,—সরল পথ অবলম্বন করুন, তাহাহইলে কাহাকেও ভয় থাকিবে না, কোন চিন্তা থাকিবে না। পাপপথে সর্ব্বদাই ভয়, ধর্ম্মপথ নিরাপদ ও নিষ্কণ্টক।”

বলিতে বলিতে বিমলার উদার ললাট ও বদনমণ্ডল অধিকতর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; তাঁহার উজ্জ্বল নয়নযুগল হইতে উজ্জ্বলতর আভা বহির্গত হইতে লাগিল। বিমলা অতিশয় পিতৃবৎসলা কন্যা, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে নৈসর্গিক গৌরব ও ধর্ম্মবল বিরাজ করিত। সেই গৌরবের আবির্ভাব হইলে জনাকীর্ণ রাজসভায় যিনি শত শত বার বাক্‌পটুতার জন্য প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন, সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকার কথায় তিনি নিরুত্তর হইতেন।

“পাপপথে সর্ব্বদাই ভয়, সরল ধর্ম্মপথ নিরাপদ ও নিষ্কণ্টক,” এই কথা অর্দ্ধস্ফুটবচনে উচ্চারণ করিতে করিতে সতীশচন্দ্র সে কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পাপিষ্ঠে পাপিষ্ঠে।

Try what repentance can : What can it not?
Yet what can it when one cannot repent?
O wretched state! O bosom black as death!
O limed soul that struggling to be free,
Art more engaged. Help angels, make assay!
Bow stubborn knees! and hearts with strings of steel,
Be soft as sinews of the new-born babe,
All may be well.

Shakespeare.

সতীশচন্দ্র বাহিরে আপন কক্ষে যাইয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "শকুনিকে ডাকিয়া দে।" ভৃত্য অগ্রে প্রভুর সেবা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সতীশচন্দ্র তাহাকে মুষ্টিপ্রহার করিয়া বলিলেন, "আগে শকুনিকে ডাক্।" ভৃত্য বেগে প্রস্থান করিল।

বাহিরের কক্ষ অতি প্রশস্ত ও অতি সুন্দররূপে সজ্জিত। গৃহতল অতি সুচারুচিত্রশোভিত বস্ত্রে মণ্ডিত; প্রতিদ্বারে, প্রতিবাতায়নে সুগন্ধ পুষ্পমালা লম্বিত রহিয়াছে; স্থানে স্থানে স্তূপাকারে পুষ্প সজ্জিত রহিয়াছে; সম্মুখে সুগন্ধ তৈলপূর্ণ দীপ জ্বলিতেছে; দীপের চতুষ্পার্শ্বে আবার পুষ্পগুচ্ছ সজ্জিত রহিয়াছে। সতীশচন্দ্রের উপবেশনস্থান মহার্হ রক্তবস্ত্রে মণ্ডিত,—সেই সুন্দর কক্ষে, সেই মহার্হ আসনে উপবেশন করিয়া মহাবলপরাক্রান্ত, মহাধনসম্পন্ন, রাজাধিরাজ দেওয়ান সতীশচন্দ্র আজি বিষন্নবদন কেন? পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

পাঠক মহাশয়, যদি "বিষয়ী" লোক হয়েন, বলুন দেখি, লোকে আপনাকে যেরূপ সুখী মনে করে, আপনি কি যথার্থই সেইরূপ সুখভোগ করেন? বলুন দেখি, জগৎ সংসারে সুখবর্দ্ধন করিয়া উদারচরিত্র লোকে যেরূপ সুখসম্ভোগ করেন, আপনার ধনসঞ্চয়ে কি সেই প্রকার নির্ম্মল সুখলাভ হয়? প্রেমপাত্রের মুখাবলোকন করিয়া প্রেমিকের হৃদয় যেরূপ উল্লাসিত হয়, প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন করিলে কবির অন্তঃকরণ যেরূপ আনন্দিত হয়, উচ্চপদ লাভে কি আপনার মন সেইরূপ উল্লাস প্রাপ্ত হয়?—কাব্যরসে বা বান্ধব-সদালাপে অন্তঃকরণ যেরূপ প্রফুল্ল হয়, কেবল ধনসঞ্চয়ে হৃদয়ের কি সেরূপ জন্মে? যদি না হয়, তবে দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে,

মাসে মাসে কেবল ধনসঞ্চয়ে কেন বিব্রত রহিয়াছেন ?—তদপেক্ষা মহত্তর সুখে কেন একেবারে বঞ্চিত রহিয়াছেন ? আর যদি হয়, তবে বলুন, আমারও " বিষয়ী " লোক হইবার চেষ্টা করিয়া দেখি।

পাঠক মহাশয় যদি আমাদের মত দরিদ্র লোক হয়েন, যদি ঈর্ষাপরবশ হইয়া কখন "বিষয়ী" লোকের বিষয়ের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, কখন যদি সতৃষ্ণনয়নে রাস্তা হইতে উঁকী ঝুঁকি মারিয়া বাবুর বৈঠকখানার ঝাড়-লণ্ঠনের প্রতি নয়নপাত করিয়া থাকেন, যদি কখন অর্থের আবাস-স্থানকে সুখের আবাসস্থান মনে করিয়া থাকেন, তবে আসুন একবার লক্ষপতি সতীশচন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া মন শান্ত করি,—লোভ দূর করি।

সেই কক্ষে একাকী বসিয়া কিছুক্ষণ সতীশচন্দ্র চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সতীশচন্দ্রের হৃদয় পাপে কলুষিত, পাপান্ধকারে আবৃত, সেই পাপ-রাশির মধ্যে একটীমাত্র পুণ্য ছিল,—বিমলার প্রতি নির্ম্মল অপত্যস্নেহ সূক্ষ্ম আলোক-রেখার ন্যায় সেই পাপান্ধকারের মধ্যে দেখা যাইত। কন্যাকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন, কন্যাকে অতি স্নেহের সহিত লালনপালন করিতেন, স্ত্রীবিয়োগের পর অবধি কন্যার সহিত অনেক সময়ে বন্ধুর মত ব্যবহার করিতেন,—বিষয়কর্ম্মের কথাও কন্যার সহিত আলোচনা করিতেন, এইজন্যই কন্যাও কখন কখন পিতাকে বন্ধুর মত উপদেশ দিতে সাহস করিতেন। বিমলাও অতিশয় স্নেহবতী কন্যা, পিতার সুখ-বর্দ্ধন ভিন্ন তাঁহার আর কোন লালসা ছিল না। কিন্তু নিতান্ত স্নেহবতী হইয়াও বিমলা উন্নতচরিত্রা, ধর্ম্মপরায়ণা ও মানিনী—পিতাকে কপটাচারী দেখিলে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইতেন। আলোকের উদয়ে অন্ধকার লীন হয়, সত্যের ও সরলতার সম্মুখে পাপ ও কপটতা স্বভাবতঃ ভীত হয়, সরলা বিমলার সম্মুখে সতীশচন্দ্র নিরুত্তর হইতেন। সতীশচন্দ্রের চরিত্র কতদূর পাপে কলুষিত, তাহা বিমলা জানিতেন না; ভক্তিভাজন পিতার চরিত্রে যে অধিক পাপ আছে, তাহা বিমলার নির্ম্মল অন্তঃকরণে একবারও স্থান পায় নাই; তথাপি পিতার আচারব্যবহার দেখিয়া সম্প্রতি বিমলার চিত্ত সন্দেহ-দোলায় দুলিত হইয়াছিল ও সেই সন্দেহ তাঁহার যার পর নাই যাতনার কারণ হইয়াছিল।

কখন কখন একটী ঘটনাতে, বা একটী কথাতে, বা একটী সঙ্গীতে সহসা আমাদের হৃদয়ের কবাট খুলিয়া যায়, সাগরতরঙ্গের ন্যায় অনন্ত চিন্তা-লহরীতে সহসা হৃদয় প্লাবিত হয়; বহুকালের বিস্মৃত কথা সহসা স্মরণপথে উদয় হয়। স্নেহবতী কন্যার সস্নেহ তিরস্কার-বচনে যেন সেই প্রকার

হইল। সতীশচন্দ্রের হৃদয়কেন্দ্র ব্যথিত হইল, সহস্র চিন্তায় প্লাবিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বকথা স্মরণ হইতে লাগিল। শৈশবকালে যে খেলা করিয়াছিলেন, বাল্যকালে যে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সে সকল স্মরণ করিতে লাগিলেন। যে বিদ্যালাভ তাঁহার পক্ষে বিষময় ফল ধারণ করিয়াছিল, সেই বিদ্যালাভের আরম্ভ-কথা মনে জাগরিত হইতে লাগিল। সমবয়স্কদিগের সহিত চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতে যাইতেন, অধ্যয়নের পর সেই বয়স্যদিগের সহিত নিষ্পাপ নিশ্চিন্ত চিত্তে ক্রীড়া রহস্য করিতেন। আজি তিনি বঙ্গদেশের একজন প্রধান লোক,—লক্ষ লক্ষ মুদ্রার অধিপতি। সেই লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিলে কি এক মুহূর্ত্তের জন্য সেই নিষ্পাপ নিশ্চিন্ত চিত্ত ফিরিয়া পাওয়া যায়?

বাল্যকাল অতীত হইল, যৌবনকাল সমাগত। সেই যৌবনকালে তাঁহার স্মৃতিপথে কি গভীর পাপরেখা অঙ্কিত হইয়াছে! বিদ্যাদর্প, তাহার পর ধনদর্প, তাহার পর প্রবল দুর্দ্ধর্ষ উচ্চাভিলাষ মনুষ্যের গৌরবের কারণ হয়, অনিষ্টেরও কারণ হয়; তাহার পক্ষে সেই কাল উচ্চাভিলাষ কি ভয়ানক বিষময় ফল ধারণ করিয়াছে।

তাহার পর সেই প্রজারঞ্জন মহানুভব বীরপুরুষ রাজা সমরসিংহের কথা সতীশচন্দ্রের পামর হৃদয়ে উদিত হইল। যে মহাত্মা বঙ্গদেশের গৌরবস্তম্ভস্বরূপ ছিলেন, প্রজাদিগের পিতাস্বরূপ ছিলেন, জমীদারদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাস্বরূপ ছিলেন, তিনি তাঁহার প্রাণসংহার করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন। সে যত্ন বিফল হইল, মহানুভব বীরপুরুষ পামরকে মার্জ্জনা করিলেন, কিন্তু অচিরাৎ আপন শোণিতে সেই মহৎ পুণ্যকর্ম্মের প্রতিফল পাইলেন। সমরসিংহের শোণিতাপ্লুত ছিন্ন-শির দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইতে লাগিল, সতীশচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন, যেন সেই শোণিতাপ্লুত ছিন্নমস্তক বিকৃতি-ধারণ-পুরঃসর তাঁহার দিকে তীব্রদৃষ্টি করিতেছে, যেন বলিতেছে, "পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিলম্ব নাই।" সতীশচন্দ্র পুনরায় শিহরিয়া উঠিলেন; সম্মুখে আর চাহিতে পারিলেন না, দীপ নির্ব্বাণ করিলেন। রে মূর্খ! স্মৃতি-দীপ অত শীঘ্র নির্ব্বাণ হয় না। ঘোর অন্ধকারে বসিয়া সতীশচন্দ্র কি চিন্তা করিতেছেন? কাহার সাধ্য সে চিন্তা অনুভব করে। সহস্র বৃশ্চিক-দংশনাপেক্ষা সে চিন্তা ক্লেশদায়িনী। যাতনায় অস্থির হইয়া বলিতে লাগিলেন, "এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? যদি থাকে, হৃদয়ের শোণিত দিয়াও তাহা করিব। ভগবন্, সহায় হও, এখনও বালিকার কথা শুনিয়া কার্য্য করিব, এখনও ধর্ম্মপথে ফিরিতে চেষ্টা করিব। সত্য কথা

স্বীকার করিব, পুনরায় ক্ষমা প্রার্থনা করিব, যদি ক্ষমা না পাই, আমার অকিঞ্চিৎকর শোণিত দিয়া সমরসিংহের রক্তপ্রবাহ বর্দ্ধন করিব।"

পরক্ষণেই শকুনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন, বলিলেন, "এ কি? অন্ধকারে একাকী বসিয়া আছেন কেন?"

সতীশচন্দ্র অতিশয় গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, "আলোক সহ্য করিতে পারি না, হৃদয়ে দুর্ভেদ্য অন্ধকার ব্যাপ্ত রহিয়াছে। আমার জীবনালোকও শীঘ্র অনন্ত অন্ধকারে লীন হইবে, আমার লীলাখেলা সাঙ্গপ্রায়!"

শকুনি এ কথার উত্তর দিতে পারিলেন না, ভৃত্যকে আলোক আনিতে ইঙ্গিত করিলেন। ভৃত্য শীঘ্র আলোক আনিয়া পুনরায় কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল।

সতীশচন্দ্র পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "শকুনি! তোমার পরামর্শেই আমি এতদূর কার্য্য করিয়াছি, তাহাতে কি ফল হইল? আমার পরকাল অনেক দিনই গিয়াছে, এক্ষণে ইহকালেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত। এই পাপ-রাশিতে, এই বিপদ্‌রাশিতে তুমিই আমাকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছ, এক্ষণে আর কি করিবে, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন উন্নতিশালী লোকের সর্ব্বনাশ কল্পনা কর; আমিও, এ ঘোর পাপের যদি প্রায়শ্চিত্ত থাকে, তাহাতে প্রবৃত্ত হই।"

শকুনি প্রভুর গম্ভীরস্বর শুনিয়া চমকিত হইলেন। বুঝিলেন, প্রভুর হৃদয়ে সামান্য ক্রোধ ও ক্ষোভের উদ্রেক হয় নাই; দুই চারি কৈতব অশ্রুবিন্দু দেখাইয়া শকুনি উত্তর করিলেন—

"প্রভুর গৌরবকালে তাঁহারই স্নেহভাজন হওয়া ভিন্ন আমার অন্য অভিলাষ ছিল না,—যদি সর্ব্বনাশ যথার্থই উপস্থিত হয়, প্রভুর সর্ব্বনাশের ভাগী হওয়া ভিন্ন আমার দ্বিতীয় অভিলাষ নাই।"

সতী। "শকুনি! তোমার কথা অতি মিষ্ট,—বিধাতা এমন বিষপাত্র ক্ষীরদ্বারা আবৃত করিয়াছেন?"

শকু। "আমি পাপিষ্ঠ বটে, তা না হইলে প্রভুভক্তির এই ফল ফলিবে কেন?" এই বলিয়া শকুনি আর দুই চারিটী অশ্রুবিন্দু বাহির করিলেন। সতীশচন্দ্র দেখিয়া কিছু মুগ্ধ হইলেন, বলিলেন—

"তুমি আমার উন্নতিচেষ্টা কর, তাহা আমি জানি, কিন্তু পাপপথে সর্ব্বদাই বিপদ্। শকুনি! সে পথ ভিন্ন কি আর উন্নতির পথ ছিল না?"

শকুনি দেখিলেন, তাঁহার অশ্রুবিন্দু নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই, কাতর-স্বরে বলিতে লাগিলেন, "প্রভুভক্তি যদি পাপ হয়, তবে আমি পাপিষ্ঠ বটে, তাহা ভিন্ন পাপ কি, আমি জানি না।"

সতী। "জান না,—বঙ্গচূড়ামণি রাজা সমরসিংহকে বিনাশ করিবার পরামর্শ কে দেয়?"

শকু। "রাজাজ্ঞায় তাঁহার দণ্ড হইয়াছে।"

সতী। "ভাল, তাঁহার জমীদারী এক্ষণে কে পাইয়াছে?"

শকু। "সুবাদার স্নেহবশতঃ যাহাকে যে দ্রব্য দান করেন, তাহা সর্ব্বদাই শিরোধার্য্য।"

সতী। "শকুনি! আর আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিও না। অদ্য আমার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে ও তদ্দ্বারা স্বীয় হৃদয়ে এত অন্ধকার, এত পাপ দেখিতেছি যে, সে দৃশ্য আর সহ্য করিতে পারি না। অদ্য বালিকার নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি।" এই বলিয়া সতীশচন্দ্র বিমলার সহিত কথোপকথন সমস্ত ভাঙ্গিয়া বলিলেন, অবশেষে বলিলেন, "পাপপথে সর্ব্বদাই বিপদ্, সেই বিপদ্ আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে।"

শকুনি উত্তর করিলেন, "বঙ্গদেশের রাজাধিরাজ" দেওয়ানের কি বালিকার কথায় ভীত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ?"

সতীশচন্দ্র উত্তর করিলেন, "বালিকা যদি সত্য কথা কহে, তবে সে কথা বালিকামুখনিঃসৃত বলিয়া পরিহার্য্য নহে। পাপপথে সর্ব্বদাই বিপদ্, তাহা আমি এতদিনে জানিলাম।"

শকু। "যদি আজ্ঞা করেন, তবে বলি, আপনার বিপদ্ কি, আমি দেখিতে পাইতেছি না।"

সতী। "আজি ছয় বৎসর হইল, যখন রাজা টোডরমল্ল প্রথমবার বঙ্গ ও বিহারদেশ জয় করিয়া কটকের নিকট দায়ুদখাঁর সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া দিল্লী প্রত্যাগমন করেন, তাহার অনতিবিলম্বে পুণ্যাত্মা সমরসিংহ আমা কর্ত্তৃক নিহত হয়েন; সে কার্য্যে তুমিই পরামর্শ দিয়াছিলে।"

শকু। "দিল্লীশ্বরের অধীনস্থ বঙ্গ ও বিহারদেশের সেনাপতি মনাইম খাঁর আজ্ঞায় সমরসিংহের দণ্ড হয়।"

সতী। "সত্য, কিন্তু সে অমাদেরই পাপ ষড়যন্ত্রে। তাহার দুই বৎসর পর, যখন রাজা টোডরমল্ল রাজমহলের যুদ্ধে দায়ুদখাঁকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া দ্বিতীয়বার বঙ্গদেশ জয় করেন, তখন সমরসিংহের মৃত্যুর বিষয়ে কি মিথ্যা কহিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম, বোধ হয় বিস্মৃত হও নাই।"

শকু। "তাহার পর?"

সতী। "তাহার পর বঙ্গদেশে দুইজন সুবাদার হইয়াছেন, তন্মধ্যে হোসেনকুলীখাঁর নিকট অনেক যত্নে সত্য গোপন ছিল,—মজফ্‌ফরখাঁ আপন

কার্য্যেই ব্যস্ত, এই জন্যই এতদিন পরিত্রাণ লাভ করিয়াছি। এক্ষণে টোডরমল্ল পুনরায় সেনাপতি ও সুবাদার হইয়া মুঙ্গেরে আসিয়াছেন, আর নিস্তার নাই।”

শকু। “যে কৌশলে এতদিন কথা গুপ্ত ছিল, সে কৌশল এক্ষণে ব্যর্থ হইবে কেন?”

সতী। “যে কৌশলে হোসেনকুলী ও মজফ্‌ফর পরাস্ত হইয়াছিলেন, দূরদর্শী টোডরমল্ল তাহাতে পরাস্ত হইবেন না,—তুমি রাজা টোডরমল্লকে জান না।”

শকু। “কিন্তু এই দূরদর্শী রাজাই একবার এই কৌশলে পরাস্ত হইয়াছিলেন।”

সতী। “সত্য, কিন্তু সে বার দুই এক মাসের জন্য আসিয়াছিলেন,—এবার সুবাদার হইয়া আসিয়াছেন, অনেক দিন বাস করিবেন। শকুনি! আমাকে নিবারণ করিও না, আমি তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব,—তিনি একবার আমাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, পুনরায় ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন। তাহার পর আমি এ পাপ সংসারে থাকিব না—যোগী হইয়া এই ঘোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিব।”

শকু। “তাহা হইলে আপনাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক সংসার ত্যাগ করিতে হইবে না। প্রিয়সুহৃদ্ সমরসিংহের হত্যাকারককে রাজা টোডরমল্ল অতি শীঘ্রই জল্লাদহস্তে সংসার ত্যাগ করাইবেন।”

এই ব্যঙ্গ বাক্যে সতীশচন্দ্র মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, শকুনির কথাই সত্য! গুপ্তকথা অপ্রকাশ থাকার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু প্রকাশ হইলে প্রাণরক্ষার কিছুই সম্ভাবনা নাই। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—

“শকুনি! তুমি আমা অপেক্ষাও পাপিষ্ঠ, কিন্তু যদি তুমি মূর্ত্তিমান্ পাপ হও, তথাপি তোমার পরামর্শ অবলম্বন ভিন্ন আমার আর গতি নাই। তোমার তর্ক অলঙ্ঘনীয়।”

শকু। “আপনার সহিত তর্ক করা আমার সম্ভবে না; কিন্তু কাহার মাথার উপর মাথা আছে যে, বঙ্গদেশের দেওয়ানের বিরুদ্ধে সুবাদারের নিকট অভিযোগ করিতে যাইবে? প্রভু! আমার কথা অবধারণা করুন, যে কথা ছয় বৎসর গুপ্ত আছে, তাহা প্রকাশিত হইবে না। আমি আপনার নিকট পণ করিতেছি, যদি একথা না গুপ্ত রাখিতে পারি, তবে আপনার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব।”

আশার প্রভাব অতি চমৎকার! যে আশা মনুষ্যকে কত সুখ ও সান্ত্বনা প্রদান করে;—সেই আশাই আবার কত দুঃখের কারণ হয়। দুঃখের সময় আশা কুহকিনীরূপে আমাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করে, সুখের সময় সেই আশা আবার কত দুঃখের কারণ হয়। মানবহৃদয়ও অতি চমৎকার, আশার কুহকে কতই খেলা করে। বিপদের সময়, পীড়ার সময়, দুঃখের সময় হৃদয়ে ধর্ম্মভয় প্রবল হয়,—বিপদের শান্তি হইলে, পীড়া আরোগ্য হইলে, দুঃখের অবসান হইলে, ধর্ম্মভয়ও ক্রমে ক্রমে দূর হয়। ইতিপূর্ব্বে সতীশচন্দ্র বিপদাশঙ্কা করিতেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাপের প্রতি ঘৃণা ও ধর্ম্মভয় মনে জাগরিত হইয়াছিল। ক্রমে কুহকিনী আশা কাণে কাণে বলিতে লাগিল, "ভয় কি? বিপদ কোথায়? মিথ্যা ভাবনা কেন?" সতীশচন্দ্রও সেই কুহকে মুগ্ধ হইলেন, ভাবিলেন, বিপদ্ না আসিলেও না আসিতে পারে, ভাবিতে ভাবিতে বিপদভয় অন্তর্হিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মভয়ও চলিয়া গেল। মানবহৃদয়ে বিপদভয় যত প্রবল, ধর্ম্মভয় যদি সেইরূপ প্রবল হইত, তাহা হইলে কি পৃথিবীতে এতাদৃশ দুঃখ থাকিত?

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন, "শকুনি তোমার উপরই আমি নির্ভর করিব। আশু বিপদের কি কোন সম্ভাবনা আছে?"

শকুনি সময় বুঝিয়া উত্তর করিলেন, "আশু কি বিলম্বে, গুপ্তকথা প্রচারের কোন সম্ভাবনা নাই; আর যদিই বা বিপদের সম্ভাবনা থাকে, ভবাদৃশ মহাপুরুষের পক্ষে কি বিপদের সময় কাতরতা যুক্তিসিদ্ধ? বঙ্গদেশে আপনার যশ, আপনার সাহস কে না প্রশংসা করে? আপনার ক্ষমতার মত ক্ষমতা কাহার? আপনার গৌরবের মত কাহার গৌরব? আপনার অধিকারের মত কাহার অধিকার? বালিকার বাক্য অবলম্বন করিয়া এ সমস্ত সহসা ত্যাগ করা কি বঙ্গদেশের রাজাধিরাজ দেওয়ান মহাশয়ের পক্ষে উচিত কর্ম্ম? আপনাকে পরামর্শ দিব আমার কি সাধ্য, আপনিই বিবেচনা করুন, আপনাকে পরামর্শ দিতে পারে, এরূপ পণ্ডিত বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই।"

সতীশচন্দ্র এ কথাব কোন উত্তর করিলেন না। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "যথার্থই কি আমি বাতুল হইয়াছিলাম,—বালিকার কথায় ভীত হইয়াছিলাম!" এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইলেন। শকুনি তাঁহার মুখ দেখিয়া আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিলেন, মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"হাঁ! শকুনি শর্ম্মার হাত হইতে এখনই নিস্তার পাইবে? এখন হইয়াছে কি?" প্রকাশ্যে বলিলেন, "রুদ্রপুরে যে চর পাঠাইয়াছিলেন, তাহার সংবাদ শুনিয়াছেন কি?"

সতী। "না, সেই এক বিষয়ে এখনও ভাবনা আছে, সমরসিংহের বিধবা শুনিয়াছি ভয়ানক স্ত্রীলোক, টোডরমল্ল দেশে আসিলে হয়ত সেই একটা কাণ্ড করিয়া বসিবে।"

শকু। "সে ভয় করিবেন না। টোডরমল্ল আসিবার অগ্রেই সমরসিংহের বংশের সকলেরই মুখ বন্ধ হইবে।"

সতী। "তবে কি আমরা যে চর রুদ্রপুরে পাঠাইয়াছিলাম, তাহারা সমরসিংহের বিধবাকে ধরিয়া আনিতে পারিয়াছে?"

শকু। "না, এখনও পারে নাই, কিন্তু সে কার্য্য শীঘ্রই সিদ্ধ হইবে।"

সতী। "পারে নাই কেন?"

শকু। "শুনিলাম, তাহারা দুই একদিন পূর্ব্বেই সমাচার পাইয়াছিল, সেই পাগলিনী সমাচার দিয়াছিল।"

সতী। "পিশাচী! আমার সকল কর্ম্মেই বাধা দেয়, তাহাকে ধরিয়া আনাইতে পার না?"

শকু। "চেষ্টার ত্রুটি নাই, কিন্তু তাহার কিছুমাত্র সন্ধান পাই নাই। বোধ হয়, তাহার যথার্থই পৈশাচিক বল আছে, তাহা না হইলে আমাদিগের সকল গুপ্ত অনুসন্ধান জানিতে পারে কিরূপে, না হইলে একশত চরেও তাহার অনুসন্ধান পাইতেছে না কেন?"

সতী। "তবে এক্ষণে উপায় কি?"

শকু। "চিন্তা করিবেন না। শীঘ্রই সকলেরই মুখ বন্ধ হইবে। আর অধিক রাত্রি নাই, আপনি বিশ্রাম করুন, শকুনি শর্ম্মার মন্ত্রণা হইতে কাহারও নিস্তার নাই।"

এই বলিয়া শকুনি আপন কক্ষে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় দুই একবার সতীশচন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ভাবিলেন—"তোমারও নিস্তার নাই।"

সতীশচন্দ্রও শয়নকক্ষে গমন করিলেন। সন্ধ্যাকাল অবধি মনে যে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহাই আলোচনা করিতে লাগিলেন। উন্নতচরিত্র বিমলার তিরস্কার, আপন হৃদয়ের ভীরুতা, পূর্ব্বকথা স্মরণ, শকুনির সান্ত্বনা, সমরসিংহ, সমরসিংহের বিধবা, পাগলিনী, ইত্যাদি সমস্ত কথা আন্দোলন করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ধূর্ত্তে ধূর্ত্তে।

Curse on his perjured arts! dissembling smooth!
Are honor, pity, conscience, all exiled?
Is there no pity, no relenting truth?

Burns

পরদিন প্রাতে দেওয়ানজী মহাসমারোহে মুঙ্গের যাত্রা করিলেন। কন্যার নিকট বিদায় লইবার সময় বিমলা বলিলেন, "পিতা, আপনি চলিলেন, অনুমতি করুন, আমি প্রসিদ্ধ মহেশ্বর-মন্দিরে যাইয়া আপনার মঙ্গলার্থ পূজা দিব। তথায় আমাকে তিন দিন অবস্থিতি করিতে হইবে।" পিতা সম্মত হইলেন ও অনেক স্নেহগর্ভ বচনে কন্যার নিকট বিদায় লইলেন। কন্যার চক্ষুজলে বস্ত্র সিক্ত হইল, পিতা চলিয়া যাইবার সময়, সেই দিকে নিরীক্ষা করিয়া বিমলা মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "এই বিপুল সংসারে আপনি ভিন্ন এ হতভাগিনীর আর কেহ নাই, আপনি না থাকিলেও সংসার আমার পক্ষে অন্ধকার। ভগবান্ আপনাকে নিরাপদে রাখুন, ধর্ম্মপথে আপনার মতি হউক। আপনার নৈসর্গিক চরিত্র ত উদার ও অকপট, কুক্ষণে শকুনির সহিত মিলন হইয়াছিল।"

শকুনির সহিত বিদায় লইবার সময় শকুনি বলিল, "আপনি অগ্রসর হউন, আমিও সমরসিংহের বিধবাকে উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া ও অন্যান্য কার্য্য সমাধা করিয়া আপনার নিকট যাইতেছি।" সতীশচন্দ্র উত্তর করিলেন, "যাহা উচিত হয় কর, আমি তোমারই তীক্ষ্ণবুদ্ধির উপর নির্ভর করি।" শকুনি বলিল, "ভৃত্যের সামান্য বুদ্ধিতে যতদূর সম্ভবে, প্রভুর কার্য্য সমাধা করিতে ত্রুটি করিবে না।" সতীশচন্দ্র যখন বহির্গত হইলেন, শকুনি মনে মনে বলিতে লাগিল, "বুদ্ধিখানা তীক্ষ্ণ কি না, হাতে হাতেই টের পাইবে, বড় বিলম্ব নাই।"

শকুনির সহিত সতীশচন্দ্রের আজ আট বৎসর পরিচয়। যখন প্রথমে পরিচয় হইয়াছিল, তখন শকুনির বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর, সতীশচন্দ্রের বয়ঃক্রম চত্বারিংশৎ বর্ষ। শকুনি দেখিতে সুশ্রী ছিল ও অল্প বয়সে অনাথ ব্রাহ্মণপুত্র বলিয়া সতীশচন্দ্রের দ্বারে শরণাপন্ন হইয়াছিল। সতীশচন্দ্র

সুকুমার নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণপুত্রকে আশ্রয় দিয়াছিলেন,—সেইদিন অবধি হৃদয়ে কালসর্প ধারণ করিয়াছিলেন।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি শকুনি শীঘ্রই সতীশচন্দ্রের হৃদয় বুঝিয়াছিল, সতীশচন্দ্রের দুর্দ্দমনীয় উচ্চাভিলাষ লক্ষ্য করিল; সেই ভীষণ অগ্নিতে দিন দিন আহুতি দিতে লাগিল; আহুতি পাইয়া আরও জ্বলিয়া উঠিল; শিখা দিনে দিনে গগনস্পর্শী হইতে চলিল। এই ঘোর মদে মত্ত হইয়া সতীশচন্দ্র দিগবিদিক্ জ্ঞান হারাইলেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান হারাইলেন, একেবারে অন্ধপ্রায় হইলেন।

শকুনি সুযোগ পাইল। অন্ধকে কুটিল পথে লইয়া যাওয়া দুরূহ নহে, সৎপরামর্শ হইতে কুপরামর্শ দিতে আরম্ভ করিল; প্রভুকে সৎপথ হইতে কুপথে লইয়া চলিল। অবশেষে এমন ঘোর পঙ্কে নিমগ্ন করিল যে, তথা হইতে উদ্ধার হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। তখন সতীশ-চন্দ্রের চক্ষু উন্মীলিত হইল, ক্রমে ক্রমে ভ্রম দেখিতে পাইলেন। কিন্তু তখন পশ্চাৎ তাপ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। শকুনির মনস্কামনা সিদ্ধ হইল, প্রভুকে সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করিল।

শকুনিকে আশ্রয় দিবার অনতিবিলম্ব পরেই সতীশচন্দ্র তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। শকুনির বিনীতভাবে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার পরামর্শে চমৎকৃত ও প্রীত হইয়াছিলেন, দিন দিন তাহাকে অধিকতর স্নেহ করিতেন, আপনার পুত্র নাই বলিয়া শকুনিকে পুত্রের মত ভাল বাসিতেন। কখন তাহাকে পোষ্য-পুত্র করিবার কামনা করিতেন, কখন বা তাহাকে আপন দুহিতার সহিত বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিতেন। কিন্তু নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণ-কুমারের সহিত কন্যার বিবাহ দিলে মানহানি হইবে, এই ভয়ে শকুনিকে গৃহ-জামাতা করিতে পারেন নাই। ক্রমে কন্যার বয়ঃক্রম অধিক হইতে লাগিল, কিন্তু কুলীন-কন্যার বয়ঃক্রম অধিক হইলে ক্ষতি কি? বিশেষ সতীশচন্দ্রের স্ত্রীর মৃত্যু হওয়াতে কন্যার প্রতি স্নেহ দ্বিগুণ হইয়াছিল, কন্যার বিবাহ দিলে গৃহ শূন্য হইবে, এইজন্য বিবাহের বিলম্ব হইতে লাগিল, এইজন্য শকুনিকে জামাতা করিয়া গৃহে রাখিবার সঙ্কল্প হইতে লাগিল।

পরে যখন পাপপঙ্কে পতিত হইয়া সতীশচন্দ্রের চক্ষু উন্মীলিত হইল, তখন এই সঙ্কল্প আবার দূর হইল; পাপ এরূপ ঘৃণার পদার্থ যে, একজন পাপী অন্য জনকে ভালবাসিতে পারে না; সতীশচন্দ্র শকুনিকে আর ভাল বাসিতে পারিলেন না। উন্নতচরিত্রা, ধর্ম্মপরায়ণা দুহিতাকে কুটিলস্বভাব, কপটাচারী শকুনির হস্তে অর্পণ করিবেন, এ ভাবনা সতীশচন্দ্র সহ্য করিতে

পারিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, "আমি পাপিষ্ঠ বটে, কিন্তু পাপেরও সীমা আছে। ধর্ম্মপরায়ণ সমরসিংহকে হত্যা করিয়াছি, কিন্তু আমার স্নেহের পুত্তলি বিমলাকে নরকে ফেলিতে পারিব না। আমার যাহা হইবার হইয়াছে, বিমলা ধর্ম্মপথে থাকুক।" সতীশচন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিতেন, কিন্তু শকুনিকে কিছু বলিতে পারিতেন না। শকুনি সুবাদারের নিকট একটী কথা জানাইলে সতীশচন্দ্রের শিরশ্ছেদন হইবে, তাহা তিনি জানিতেন, সুতরাং তিনি শকুনির একরূপ হস্তগত হইলেন।

শকুনি যে ঘোর পাপিষ্ঠ, তাহা বলা বাহুল্য। সতীশচন্দ্রও পাপিষ্ঠ, কিন্তু তাঁহার পাপের সীমা ছিল,—তাঁহার চরিত্রে দুই একটী সদ্‌গুণও ছিল, তাঁহার হৃদয়ে দুই একটী মহানুভব লক্ষিত হইত। পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মধ্যে মধ্যে তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইত। শকুনির এ সমস্ত কিছুই ছিল না, কেবল ঘোর স্বার্থপরতা ও দুর্ভেদ্য কুটিলতা।

সতীশচন্দ্রের মত তাহার দুর্দ্দমনীয় বেগবতী মনোবৃত্তি একটীও ছিল না; তাহার হৃদয়ের সকল প্রবৃত্তিই শান্ত;—সকল প্রবৃত্তিই ঘোর স্বার্থপরতার অনুচারী। সুতরাং তাহার গভীর মন্ত্রণা প্রকাশ বা নষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, কিছুতেই বিচলিত হইত না। ঊর্ণনাভ যেরূপ বৃক্ষপত্রগুলি দেখিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে জাল পাতিত করে, শকুনি সেইরূপ অন্য লোকের মনোবৃত্তির বেগ বুঝিয়া অতি ধীরে ধীরে আপন সূক্ষ্ম জাল বিস্তার করিত। সে মন্ত্রণাজাল এমন সূক্ষ্ম, এমন দুর্লক্ষ্য ও এমন দুর্ভেদ্য যে, কাহার সাধ্য ভেদ করে। প্রেম, বন্ধুত্ব, দয়া, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি যে সকল সুকুমার মনোবৃত্তি দ্বারা জগৎ বদ্ধ ও মানবজাতি একীকৃত হইয়া রহিয়াছে, শকুনি সে সকল হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। যশে অভিরুচি, উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি যে সকল দুর্দ্দম মনোবৃত্তি অনেককে বিচলিত করে, তাহা হইতেও শকুনি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ছিল। সুতরাং আপন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও গূঢ় মন্ত্রণার দ্বারা আপন স্বার্থসাধনে কখনও নিষ্ফল হইত না।

সতীশচন্দ্র শকুনিকে পাপিষ্ঠ বলিয়া জানিতেন, কিন্তু স্বার্থপর বলিয়া জানিতেন না। মনে ভাবিতেন, শকুনি যতই পাপ-মন্ত্রণা করুক না কেন, কেবল আমারই উন্নতিসাধন উহার উদ্দেশ্য। এই মহাভ্রান্তি বশতঃই সতীশচন্দ্র এখনও শকুনিকে অল্প পরিমাণে ভাল বাসিতেন, এ মহাভ্রান্তি তাঁহার শীঘ্রই দূর হইবে।

শকুনি সতীশচন্দ্রকে বলিয়াছিল যে, চরেরা সমরসিংহের বিধবাকে ধরিতে অক্ষম হইয়াছে,—সেটী মিথ্যাকথা। শকুনির যেরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি,—যেরূপ

অসংখ্য চর, মহাশ্বেতাকে ধরা তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য কার্য্য নহে; সে কেবল সতীশচন্দ্রের সহিত শকুনিকে মুঙ্গেরে না যাইতে হয় এইজন্য। তবে যে এতদিন তাঁহাকে ধরা হয় নাই, তাহা শকুনির বিস্তীর্ণ মন্ত্রণাজালের এক অংশ। সে মন্ত্রণাজাল ভেদ করি, আমাদের কি সাধ্য? পাঠক মহাশয়! চলুন, শকুনি যথায় বসিয়া চিন্তা করিতেছে, তথায় যাইয়া দেখা যাউক, যদি কিছু জানা যায়।

চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের প্রশস্ত কক্ষে শকুনি একাকী পদচারণ করিতেছে, চারিদিকে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র অবলোকন করিতেছে, দুর্গপদসঞ্চারিণী কল্লোলিনী যমুনার কল কল শব্দ শ্রবণ করিতেছে,—মধ্যে মধ্যে প্রশস্ত দুর্গের শুদ্ধান্তঃপুর-দিকে অবলোকন করিতেছে। তাহার মুখমণ্ডলে আনন্দের লক্ষণ,—স্বার্থসাধন হইলে স্বার্থপর লোকের যেরূপ আনন্দ ও উল্লাস হয়, সেইরূপ আনন্দের লক্ষণ। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছে—

"এই সুবিস্তীর্ণ জমীদারি, এই প্রশস্ত দুর্গ, ঐ অন্তঃপুরবাসিনী সপ্তদশ-বর্ষীয়া সুন্দরী শীঘ্রই নব স্বামী গ্রহণ করিবে, সমরসিংহের প্রজাগণ, সতীশ-চন্দ্রের প্রজাগণ শীঘ্রই শকুনির নাম উচ্চারণ করিবে; কল্লোলিনী যমুনা শীঘ্রই শকুনির গৌরব-গীত গান করিবে। আর তুমি বিমলে! তুমি আমাকে ঘৃণা কর জানি, কিন্তু ঘৃণার দিন শেষ হইল; তোমার ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক, আমাকে স্বামী বলিয়া আলিঙ্গন করিতেই হইবে; তথাপি যদি ঘৃণা কর, এই পতঙ্গের মত তোমাকে পদে দলিত করিব; এই দলিত মৃত পতঙ্গের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিব। প্রেমের জন্য বিবাহ করিতেছি না, প্রেম বালক-বালিকার স্বপ্নমাত্র! তোমার রূপলাবণ্যের জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি না;—আমার নিকট রূপলাবণ্যের আদর নাই; যদি থাকিত, লক্ষপতির রূপলাবণ্যের অভাব কি? তবে তোমায় দলিত না করিব কেন? সতীশচন্দ্র, সাবধান! আজি তোমাকে যম-মন্দিরে প্রেরণ করিলাম;—যেরূপ চর নিযুক্ত করিয়াছি, গুপ্তকথা নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে;—অধিকন্তু শকুনির দোষও তোমার উপর নিক্ষিপ্ত হইবে। তাহার পর? তাহার পর নিঃসন্তান সতীশচন্দ্র গত হইলে তাহার জামাতা ভিন্ন আর কে উত্তরাধিকারী? তীক্ষবুদ্ধির চিরকালই জয় হউক।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শকুনি দেখিল, অন্তঃপুরে গবাক্ষপার্শ্বে বিমলা এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। পিতা চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পিতার গমনপথ-দিকে অনিমেষলোচনে নিরীক্ষণ করিতেছেন। ক্রন্দন করাতে সেই উন্নত প্রশস্ত ললাটের শিরা স্ফীত হইয়াছে; চক্ষুর্দ্বয় এখনও

জলে ঢল ঢল করিতেছে; অধরোষ্ঠ বিস্ফারিত ও কম্পিত, উন্নত বক্ষঃস্থল স্ফীত হইতেছে; বস্ত্র অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়াছে। বিমলার উন্নত আকৃতি বিষাদে অধিকতর উন্নত দৃষ্ট হইতেছে, উজ্জ্বল মুখমণ্ডল উজ্জ্বলতর রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন না,—তাঁহার হৃদয়ের যে গম্ভীর বিষণ্ণ ভাব, তাহা বালিকার উচ্চ রোদনে প্রকাশ পায় না,—নিঃশব্দ, অলক্ষিত, অবারিত অশ্রুজলে কথঞ্চিৎ প্রকাশ পায়, কথঞ্চিৎ শান্ত হয়!

দেখিয়া শকুনি আপন চক্ষে দুই এক বিন্দু জল আনিয়া আপনিও বাহিরের ঘরের গবাক্ষপার্শ্বে দাঁড়াইল। দুঃখের সীমা নাই, অশ্রুবিন্দুতে বদনমণ্ডল ভাসিয়া যাইতেছে। বিমলা চক্ষু উঠাইয়া দেখিলেন, শকুনি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ক্রোধে, ঘৃণায় ভ্রূকুটী করিয়া গবাক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন। বিমলার মনোহরণ করিবার জন্য শকুনির এই প্রথম উদ্যম,—নিষ্ফল হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

উপাসকে উপাসকে।

Enamoured, yet not daring for deep awe
To speak her love :—and watched his nightly sleep,
Sleepless herself, to gaze upon his lips
Parted in slumber, whence the regular breath
Of innocent dreams arose : then when red morn
Made paler the pale moon, to her cold home
Wildered and wan and panting, she returned.

Shelly.

চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ হইতে ৫।৬ ক্রোশ দূরে ইচ্ছামতী-তীরে প্রসিদ্ধ মহেশ্বর-মন্দির ছিল। সন্ধ্যার সময় বিমলা শিবিকা আরোহণ করিয়া চলিলেন। তাঁহার সঙ্গে দুই চারি জন প্রাচীনা স্ত্রীলোক ও অনেক সংখ্যক্ দাসদাসী চলিল। বঙ্গদেশের দেওয়ানজীর একমাত্র দুহিতার যেরূপ সমারোহে যাওয়া উচিত, সেইরূপ সমারোহে বিমলা মহেশ্বর-মন্দিরে চলিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, নিভৃতে দুই একটী প্রাচীনা স্ত্রীলোকের সহিত যাইবেন, কিন্তু পিতার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়। মহেশ্বর-মন্দির অতি সমৃদ্ধিশালী। অনেক দূরদেশ হইতে অনেক লোক এই মন্দিরে দিন দিন সমাগত হইত। বৃদ্ধাগণ পুত্রকন্যার কুশল কামনা করিয়া পূজা দিতে আসিতেন, যুবতীগণ পুত্র-

আকাঙ্ক্ষায় মহেশ্বরের উপাসনা করিতে আসিতেন; চিররোগীগণ রোগ-শান্তি-কামনায় এই মন্দিরে আসিতেন, যোদ্ধাগণ জয়াকাঙ্ক্ষায়, কৃপণগণ ধনাকাঙ্ক্ষায়, যুবকগণ বিদ্যাকাঙ্ক্ষায়, নানাবিধ প্রকারের লোক নানা-কাঙ্ক্ষায় এই মন্দিরে সমবেত হইত। বহুকালের ধন সঞ্চিত হইয়া এই মন্দিরে রাশীকৃত হইয়াছিল, মন্দিরের অট্টালিকাসমূহ দিন দিন দীর্ঘায়ত হইতেছিল। মধ্যে উচ্চ মন্দির, তাহার চারিদিকে শ্রেণীবদ্ধ, উজ্জ্বল, উন্নত সৌধমালা শোভা পাইত। আগন্তুকগণ এই সৌধমালায় বাস করিত, তাহা হইতে যে আয় হইত, তাহাও দেবসেবায় অর্পিত হইত।

এই অট্টালিকাশ্রেণী প্রকাণ্ড চক্রাকৃতিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তন্মধ্য-বর্ত্তী স্থান অতি বিস্তীর্ণ। তাহার মধ্যস্থানে উন্নত মহেশ্বর মন্দির মস্তকো-ত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং মন্দিরের যে কোন দিকে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলে কেবল সৌধমালা ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না।

এই চক্রাকৃতি সৌধমালার ভিতর দিয়া মন্দিরাভিমুখে যাইবার জন্য চারিদিকে চারিটী সিংহদ্বার ছিল। শিবিকা কি শকট সেই সিংহদ্বার পর্য্যন্ত আসিতে পারিত, তাহার ভিতর যাইতে পারিত না। সেই সিংহ-দ্বারের ভিতর প্রবেশ করিলে আর ধনগৌরবজাত কোন প্রকার বিভিন্ন-তাই স্থান পাইত না। রাজকুমারী ভিখারিণীর সহিত একত্র পদব্রজে সিংহ-দ্বার হইতে মন্দির পর্য্যন্ত যাইতেন, ভস্ম-বিভূষিত সন্ন্যাসীর সহিত স্বর্ণরৌপ্যা-লঙ্কৃত মহারাজ একত্রে পথ অতিবাহিত করিতেন। ধর্ম্মের সম্মুখে, মহেশ্বরের সম্মুখে উচ্চ কে? নীচ কে? ধনীই বা কি? দরিদ্রই বা কি? সকলই সমান।

যদিচ চারিদিকের সৌধবেষ্টিত মধ্যস্থ ভূমি অতিশয় প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ, তথাপি কখন কখন এত লোকের সমাগম হইত যে, সেই ভূমি লোকে পরিপূর্ণ হইত। তথায় যে কেবল উপাসক আসিত, এমত নহে; নানা-প্রকার লোকে নানাপ্রকার দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আসিত। বালক বালিকার জন্য নানাপ্রকার ক্রীড়াদ্রব্য, যুবক-যুবতীদিগের জন্য নানাপ্রকার অলঙ্কার, সকলের জন্যই পরিধেয়, খাদ্য ও অন্যান্য নানারূপ ব্যবহার্য্য দ্রব্য তথায় দিবানিশি বিক্রয় হইত। ক্রেতৃগণ তথায় দিবানিশি ব্যস্ত রহিয়াছে। সে পবিত্র ভূমিতে স্ত্রীলোকে সকলের সম্মুখে আসিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; যুবতীগণ দ্রব্যাদি ক্রয়ার্থ সেই বহুজনসমাকীর্ণ স্থানে বাহির হইতে লজ্জিত হইতেন না; সামাজিক নিয়ম সমুদায় সেই দেবমন্দিরে প্রবল ছিল না।

যখন বিমলা আপন সঙ্গিনীর সহিত মহেশ্বর-মন্দিরে পঁহুছিলেন, তখন রজনী আগত হইয়াছে। বিশ্রাম করিয়া আহারাদি করিতে করিতে রজনী

দ্বিপ্রহর হইল। বিমলার সঙ্গীগণ তাঁহাকে সে রাত্রিতে পূজা করিতে নিষেধ করিল; কিন্তু বিমলার হৃদয় চিন্তা-পরিপূর্ণ। তিনি বলিলেন, "আমাকে ক্ষমা করুন, আমি উপাসনা না করিয়া অদ্য শয়ন করিব না,—যদি করি, নিদ্রা হইবে না।" এই বলিয়া বিমলা একাকিনী ধীরে ধীরে মন্দিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রোদয় হইয়াছে, সম্মুখে উচ্চ মহেশ্বর-মন্দির চন্দ্রালোকে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া গভীর নীল আকশপটে যেন চিত্রের ন্যায় ন্যস্ত রহিয়াছে। চারিদিকে উজ্জ্বল শ্বেত সৌধমালা চন্দ্রকিরণে রৌপ্যমণ্ডিতের ন্যায় শোভা পাইতেছে,—সেই সৌধমালা হইতে অসংখ্য প্রদীপালোক বহির্গত হইয়া নয়নপথে পতিত হইতেছে। মধ্যস্থ প্রশস্ত ভূমিখণ্ড প্রায় জনশূন্য হইয়াছে,—যেস্থানে সমস্ত দিন কলরব হইতেছিল, এক্ষণে সেই স্থান প্রায় নিস্তব্ধ হইয়াছে। স্থানে স্থানে বৃক্ষপত্রের মধ্যে পুঞ্জ পুঞ্জ খদ্যোৎমালা নয়নরঞ্জন করিতেছে। শীতল সুগন্ধ সমীরণ রহিয়া রহিয়া বহিতেছে ও নিকটস্থ উচ্চ ঝাউবৃক্ষ হইতে সুমধুর গম্ভীর সুদূর-সমুদ্র-গর্জ্জনের ন্যায় ভীমকান্ত রব বাহির করিতেছে। সেই রব ভিন্ন অন্য রব নাই, কেবল স্থানে স্থানে পেচকের শব্দ শুনা যাইতেছে; কেবল কখন কখন দূরস্থ ক্ষেত্র হইতে দুই একটা গাভীর হম্বারব শুনা যাইতেছে;—কেবল দূরস্থ গ্রামবাসীদিগের গীত গান বায়ুপথে আরোহণ করিয়া কখন কখন কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিতেছে। সে সময়ে, সেস্থানে, সেই দূরে গীত গান শুনিতে বড় সুললিত বোধ হয়।

এই নিস্তব্ধ শান্ত পথে যাইতে যাইতে বিমলার হৃদয়ও কিছু শান্ত হইল; চিন্তা কিঞ্চিৎ পরিমাণে দূর হইতে লাগিল; প্রকৃতির গভীর নিস্তব্ধতা দেখিয়া বিমলার হৃদয়েও গভীর ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। সেই দেবায়তনে প্রাতঃকালে দুই একটী করিয়া লোক সমবেত হয়; মধ্যাহ্নে কোলাহলের সীমা থাকে না; সায়ংকালে সেই কলরব ক্রমে হ্রাস হইয়া আইসে; রজনীতে সমস্ত নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, শান্ত! বিমলা বিবেচনা করিতে লাগিলেন,—আমাদের জীবনেও এইরূপ। শৈশবে মনের প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে চলিতে থাকে; যৌবনে সেই প্রবৃত্তিসমূহের দুর্দ্দান্ত প্রতাপ,—যেন জগৎসংসারকে গ্রাস করিতে আসিবে; বার্দ্ধক্যে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আইসে; শীঘ্রই শান্ত, নিস্তব্ধ, অনন্ত সাগরে লীন হইয়া যায়—বারিবিন্দুর মত অনন্ত সাগরে লীন হইয়া যায়। তবে এত ধুমধাম কেন?—এত দর্প, এত গর্ব্ব, এত কৌশল, এত মন্ত্রণা কেন? এত ক্রোধ, এত লোভ, এত অর্থলালসা, এত উচ্চাভিলাষ কেন?—কে বলিবে কেন? বিধির নির্ব্বন্ধ

কে বুঝিবে? যে পতঙ্গ মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্মসাৎ হইবে, তাহার পক্ষবিস্তার করিয়া আকাশদিকে ধাবমান্ হওয়া কেন? যে শিশিরবিন্দু মুহূর্ত্তমধ্যে মনুষ্যপদে দলিত হইবে বা প্রাতঃকালের রবিকিরণস্পর্শে শুকাইয়া যাইবে, তাহার হীরকখণ্ডের জ্যোতিঃ বিস্তার কেন?

এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে বিমলা সহসা রজনী দ্বিপ্রহরের ঘণ্টারব শুনিতে পাইলেন, সেই ঘণ্টারব চতুর্দ্দিকস্থ সৌধমালায় প্রতিহত হইয়া দশগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বায়ুমার্গে সঞ্চরণ করিতে লাগিল,—নিস্তব্ধ নৈশ গগণে আরোহণ করিয়া সঞ্চরণ করিতে লাগিল। ঘণ্টারব শেষ না হইতে হইতে দ্বিপ্রহরের পূজা আরম্ভ হইল। সপ্তস্বরে মিলিত হইয়া মহেশ্বরের অনন্ত মহিমা গীত হইতে লাগিল;—কাদম্বিনীর গম্ভীর নির্ঘোষবৎ সেই গীত কখন মন্দীভূত, কখন সতেজে উচ্চারিত হইতে লাগিল; উপাসকদিগের মন দ্রবীভূত হইতে লাগিল। বিমলা মন্দিরের দিকে দৃষ্টি করিলেন, মন্দিরের উচ্চ চূড়া যেন আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে,—বিমলার হৃদয়ও আকাশের দিকে ধাবমান্ হইল। যে গান গীত হইতেছিল, বিমলা সপ্তস্বরে সেই গীতের সহিত যোগ দিলেন। তাঁহার হৃদয় পবিত্র প্রেমে ও উল্লাসে প্লাবিত হইতে লাগিল। সেই পবিত্র প্রেম ও উল্লাসই যথার্থ উপাসনা। উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিলে উপাসনা হয় না,—প্রকৃতির শোভা দেখিয়া, বা বিশুদ্ধ পবিত্র চিন্তায় মগ্ন হইয়া যদি হৃদয় পবিত্র প্রেম ও উল্লাসে প্লাবিত হয়, তাহাকেই হৃদয়ের উপাসনা বলে,—যদি তাহাতে হৃদয় শান্ত হয়, তাহাকেই হৃদয়ের শান্তি কহে।

বিমলা দ্রুতবেগে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবামাত্র দেখিলেন, একদিকে গায়ক ও বাদ্যকর বসিয়া রহিয়াছে,—তাহারাই গীত আরম্ভ করিয়াছিল। যথার্থ উপাসকের হৃদয় সে গীতের যে অর্থ ও মহিমা গ্রহণ করে, যাহারা গাইতেছিল, তাহাদের মধ্যে কয়জন সে অর্থ বুঝিতে পারে? অন্য একদিকে দেবদাসীগণ নৃত্য করিতেছে,—পূর্ণযৌবনসম্পন্না রূপলাবণ্যবিভূষিতা দেবদাসীগণ তালে তালে নৃত্য করিতেছে। সেই পবিত্র দেবমন্দিরের দেবদাসীদিগের কয়জনের হৃদয় পবিত্র? বিমলা এ সকল পশ্চাতে রাখিয়া পূজাস্থানে গমন করিলেন।

মহাদেবের প্রতিমার নিকটেই পূজাস্থান। তথায়ই উপাসকগণ সমবেত হন। যখন বিমলা আসিলেন, তখন আর অধিক উপাসক ছিলেন না, প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছিলেন। যাঁহারা ছিলেন, পূজকগণ তাঁহাদিগের কাহাকে কাহাকেও পূজা করাইয়া দিতেছেন। দেবালয়ের মহন্ত

চন্দ্রশেখর সে সময়ে নিকটস্থ বনাশ্রম গ্রামে ছিলেন। বিমলা পূজায় রত হইলেন।

প্রায় এক প্রহর কাল পূজা করিতে লাগিলেন। মুদিতনয়নে, নিস্পন্দ-শরীরে বিমলা পূজা করিতে লাগিলেন। হৃদয়ে যে পবিত্র কামনা উদয় হইতেছিল, বিমলার বদনমণ্ডলে তদনুরূপ পবিত্র ভাব অঙ্কিত হইতে লাগিল। বিমলার মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্বামী, বন্ধু, কেহ নাই, পিতাই একমাত্র ভক্তির আধার, পিতাই স্নেহের পাত্র, পিতাই পরম বন্ধু, পিতাই পূজনীয় দেবতা। বিমলার অপার স্নেহস্রোত, অপরিসীম ভক্তিস্রোত, পবিত্র প্রেম-স্রোত, অনির্ব্বচনীয় শ্রদ্ধাস্রোত সেই একমাত্র আধারাভিমুখে ধাবমান হইল। পিতার দুঃখেই দুঃখ, পিতার আনন্দেই আনন্দ, পিতার বিপদে চিন্তা, পিতার সম্পদে ভরসা,—বিমলা পিতার জীবনেই জীবনধারণ করিতেন। সেই পিতার মঙ্গলার্থ প্রার্থনা করিতে করিতে বিমলার হৃদয়ের দ্বার যে উদ্ঘাটিত হইবে, তাহাতে বিস্ময় কি? সেই পিতার মঙ্গলার্থ পূজা করিতে করিতে যে বিমলার হৃদয়ের নিভৃত কন্দর পর্য্যন্ত ভক্তিরসে প্লাবিত হইবে, তাহাতে সংশয় কি? এক প্রহর কাল বিমলা উপাসনা করিলেন। উপাসনান্তে যখন বিমলা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া দণ্ডায়মান্ হইলেন, তখন তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে চিন্তাশূন্য ও শান্ত।

তখন বিমলা একেবারে মন্দির হইতে বহির্গত না হইয়া ঔৎসুক্য-ফুল্ললোচনে মন্দিরের চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রফুল্লহৃদয়ে প্রতিমার সুবর্ণ-রৌপ্যাদির অলঙ্কার দেখিতে লাগিলেন; সম্মুখে স্তবকে স্তবকে সুগন্ধ পুষ্প আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। তিনি অনেকদিন এ মন্দিরে আইসেন নাই, মন্দিরের সকল দ্রব্যই নূতন বোধ হইতে লাগিল। বিমলা এরূপ সুনির্ম্মিত, প্রশস্ত, চমৎকার অট্টালিকা কখন দেখেন নাই। কখন কখন সুবর্ণমণ্ডিত পুষ্পালঙ্কৃত স্তম্ভসমূহ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; কখন কখন ভিত্তির উপর সুবর্ণ ও দ্বিরদ-রদে ভাস্করকার্য্য অবলোকন করিতে লাগিলেন; কখন ধীরে ধীরে ইতস্ততঃ পদচারণ করিতে লাগিলেন; কখন দুই এক জন দেবদাসীকে মন্দির-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। উপাসক আর কেহই নাই, সুতরাং বিমলার এইরূপ ঔৎসুক্যে কোন ব্যাঘাত জন্মে নাই।

একপার্শ্বে একমাত্র উপাসক নিদ্রিত রহিয়াছেন, সহসা বিমলার নয়ন সেই দিকে পতিত হইল। তাঁহার অলৌকিক তেজঃপরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমলা বিস্মিত হইলেন, নয়ন আর সেদিক্ হইতে অন্য দিকে ফিরাইতে

পারিলেন না। যুবকের ললাট উদার ও প্রশস্ত, কিন্তু নিদ্রাতেও যেন কোন গাঢ় চিন্তায় বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় কুঞ্চিত রহিয়াছে। নয়ন মুদিত, বদনমণ্ডল উজ্জ্বল ও বীরদর্পপ্রকাশক। প্রশস্ত স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থলের উপর দিয়া যজ্ঞোপবীত লুটাইয়া পড়িয়াছে, বাহুযুগল দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ। উপাসকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বিমলার বোধ হইল যেন কোন বীরপুরুষ বীরব্রতে ব্রতী হইয়া দূরদেশ যাত্রা করিতেছেন, পথিমধ্যে এই দেবমন্দিরে উপাসনা করিতে আসিয়াছেন। শ্রান্তিবশতঃ বা অন্য স্থান না থাকাতে উপাসনান্তে এই স্থানেই নিদ্রিত রহিয়াছেন। বিমলার অবলা হৃদয়েও বীর-ভাবের অভাব ছিল না; সুতরাং উপাসকের এই অলৌকিক বীর-আকৃতি দেখিয়া তাঁহার হৃদয় সহসা স্তম্ভিত হইল, শরীর সহসা কণ্টকিত হইল; কি কারণে তাঁহার মনে চাঞ্চল্য হইল, বিমলা কিছু বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু অনিমেষলোচনে সেই বীরপুরুষের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যত দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় আরও অগ্নি-অভিমুখে পতঙ্গবৎ আকৃষ্ট হইতে লাগিল, শরীর অধিকতর অবসন্ন হইতে লাগিল,—কলের পুত্তলীর মত একদৃষ্টে সেই উপাসকের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পাঠক মহাশয়! কখন কি প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়িয়াছেন? কখন কি কোন রমণীরত্ন দেখিবামাত্র আপনার হৃদয় সহসা চঞ্চল হইয়াছে, শরীর কণ্টকিত হইয়াছে, নয়ন আকৃষ্ট ও নিমেষশূন্য হইয়াছে? কখন চঞ্চল নয়ন দুখানি দেখিয়া আপনার হৃদয় একবারে দ্রবীভূত হইয়াছে,—সুধাপরিপূর্ণ স্মিতপ্রফুল্ল ওষ্ঠ দুখানি দেখিয়া কোন সুন্দরীকে স্নেহের পুত্তলী, প্রেমের পুত্তলী বলিয়া গ্রহণ করিতে মানস করিয়াছেন? যদি করিয়া থাকেন, তবে বিমলার মনোগত ভাব কিছু কিছু বুঝিতে পারিবেন। আমাদের ভাগ্যে এপ্রকার কখন ঘটে নাই, সুতরাং আমরা বিমলার হৃদয়চাঞ্চল্যের কারণ কিছু বুঝিতে পারিতেছি না, বিমলাকে অবোধ বালিকা বলিয়া বোধ হইতেছে।

উপাসকের নিদ্রাভঙ্গ হইল, গাত্রোত্থান করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। চক্ষু উন্মীলন করিতেই দেখিলেন, সম্মুখে উজ্জ্বলনয়না তন্বঙ্গী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, চারি চক্ষুর মিলন হইবামাত্র বিমলার সংজ্ঞা হইল। অপরিচিত পুরুষের দিকে দেখিতেছিলেন জ্ঞান হইল, লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া ধীরে ধীরে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

নিশা প্রভাতপ্রায় হইয়াছে। প্রাতঃকালের প্রথম রশ্মি বিমলার নয়নোপরি নিপতিত হইল। চারিদিকে দুই এক জন করিয়া লোক বাহির

হইতেছে। বিমলার লোকের সম্মুখে পদব্রজে যাওয়া অভ্যাস নাই, কুঞ্চিত হইয়া দ্রুতবেগে বাসস্থানাভিমুখে চলিলেন। প্রাচীনাগণ যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, এতক্ষণ কি করিতেছিলেন, তখন বিমলা কি বলিবেন,—এতক্ষণ কি উপাসনা করিতেছিলেন?

বিমলার অন্যান্য চিন্তা হইতে লাগিল। এ বীরপুরুষ কে? কি ব্রতে ব্রতী হইয়া সমস্ত রাত্রি উপাসনা করিতেছিলেন? এমন ভাগ্যবান্ বীরপুরুষের প্রার্থনীয় কি আছে? যদি কিছু থাকে, তাহা বিমলাকর্ত্তৃক দত্ত হইতে পারে না? ধন, ঐশ্বর্য্য, ভূমি, বিমলার ত কিছুরই অভাব নাই, এই বীর-পুরুষের কামনা কি বিমলা সিদ্ধ করিতে পারেন না?—রে অবোধ! এ পুরুষ তোমার কে, যে তুমি তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ করিতে তৎপর হইয়াছ? এ প্রশ্ন সহসা বিমলার হৃদয়ে উদিত হইল, তাহার উত্তর করিতে পারিলেন না ও চিন্তা দূর করিলেন।

ক্ষণেক পর আবার ভাবিতে লাগিলেন,—আচ্ছা, উহার নিবাস কোথায়? উহার পিতামাতা কে? উহার কি বিবাহ হইয়াছে?—রে অবোধ! যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার কি? এ প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিলেন না।

বিমলা যদি আপন হৃদয় বুঝিতে পারিতেন, তবে উত্তর করিতে পারি-তেন, তবে বলিতেন, উনি আমার হৃদয়ের হৃদয়।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রেমিকে প্রেমিকে।

Amid the jagged shadows
Of mossy leafless boughs,
Kneeling in the moonlight,
To make her gentle vows;

Her slender palms together prest,
And heaving sometimes on her breast;
Her face resigned to bliss or bale,—
Her face, O! call it fair not pale,—
And both blue eyes more bright than clear,
And each about to have a tear.

Coleridge.

সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর কিঞ্চিৎ আরাম লাভ করিবার জন্য বিমলা আপন শয়নভবনে গমন করিলেন। দিনের বেলা বড় অধিক নিদ্রা হইল

না; যে পরিমাণে নিদ্রা হইল, তাহা স্বপ্নপরিপূর্ণ। সেই দেবপ্রাঙ্গণ, সেই চন্দ্রালোকে মহেশ্বরগীত, সেই দেবমন্দিরে মহেশ্বরমূর্ত্তি, তৎপার্শ্বে সেই উপাসক, এই সমস্ত বিষয়ের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। বার বার সেই উপাসককে দেখিতে লাগিলেন, কখন নিদ্রিত, কখন বা উপাসনায় মগ্ন, কখন উপাসনান্তে দণ্ডায়মান, কখন বীরপুরুষের ন্যায় তরবারিহস্তে গর্জ্জন করিতেছেন। শেষবার যে স্বপ্ন দেখিলেন, সে অতি ভীষণ, বোধ হইল যেন আপনি উপাসনায় মগ্ন রহিয়াছেন, কিন্তু মহেশ্বর-চরণে পুষ্প না দিয়া মকরধ্বজ-চরণে পুষ্প দিতেছেন। যতবার মহেশ্বর-চরণে পুষ্প দিতে যান, ততবারই সেই পুষ্প কন্দর্প-চরণে পতিত হয়। কিছুতেই মহেশ্বর-পূজা করিতে পারিলেন না। দেখিয়া মহেশ্বর মূর্ত্তিমান হইয়া ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। বিভূতি-বিভূষিত; কেশে গঙ্গা কল কল করিতেছে; ললাটে চন্দ্র ধক্ ধক্ করিতেছে; ফণীন্দ্র সকল তেজে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। মহেশ্বর আজ্ঞা দিলেন, "রমণী-হৃদয় পাপে কলুষিত, হৃদয় ভেদ কর।" তৎক্ষণাৎ সেই অপরিচিত উপাসক তরবারিদ্বারা রমণীর হৃদ্‌পিণ্ড বাহির করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। বিমলা চীৎকার শব্দ করিয়া জাগিয়া উঠিলেন।

জাগিয়া দেখিলেন, গৃহে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়াছে; প্রাঙ্গণে লোকের সমাগম হইয়াছে; কলরব শুনা যাইতেছে। নিশি-জাগরণে বিমলার চক্ষে কালিমা পড়িয়াছে; ভয়ানক স্বপ্নবশতঃ তাঁহার স্বাভাবিক গৌরবদন রক্তশূন্য হইয়া অধিকতর গৌর হইয়াছে; কপোলে, গণ্ডে, বক্ষঃস্থলে ঈষৎ ঘর্ম্ম হইয়াছে। বিমলা আলুলায়িত কেশ কথঞ্চিৎ বদ্ধ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। ভাবিলেন, "পাপের সমুচিত দণ্ড হইয়াছে; আমি পিতার মঙ্গলার্থ এই মন্দিরে আসিয়া অপরিচিত পুরুষের বিষয় চিন্তা করিয়াছি, সেই জন্যই এই অনিষ্টসূচক স্বপ্ন। আমি এ চিন্তা হৃদয় হইতে উৎপাটিত করিব,—আবশ্যক হয়, হৃদয়সমেত উৎপাটিত করিব।" এই বলিয়া কক্ষ হইতে বাহিরে গমন করিলেন।

সমস্ত দিন বিমলা অন্যমনস্কার ন্যায় হইয়া রহিলেন। স্বপ্নকথা তাঁহার বার বার মনে পড়িতে লাগিল। চিন্তা করিলেন, "যদি আমি পাপীয়সী হই, সেই মহাত্মা আমার হৃদয় ছেদন করিবেন কেন?" অনেক চিন্তা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কাহাকে মনের কথা জিজ্ঞাসা করেন, এমন লোক পাইলেন না। ভবিষ্যতে তাঁহার কপালে কি আছে বুঝিতে পারিলেন না।

সেদিন সন্ধ্যাকালে বিমলা উপাসনার্থ গমন করিলেন। সমস্ত দিন যদিও তিনি অন্যমনস্কা হইয়াছিলেন, উপাসনার সময় তাঁহার চিত্ত স্থির ভাব অবলম্বন করিল। দ্বিগুণ ভক্তির সহিত বিমলা ঈশ্বর আরাধনা করিতে লাগিলেন। প্রথমে পিতার মঙ্গলার্থ পূজা করিলেন, তৎপরে আপন পাপক্ষয়-কামনায় পূজা করিতে লাগিলেন। বিমলার মহেশ্বর প্রতি অচলা ভক্তি, পূজা করিতে করিতে তাঁহার নয়ন হইতে দরবিগলিত শ্রদ্ধাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া উপাসনা শেষ করিলেন।

উঠিবামাত্র পুনরায় সেই অপরিচিত উপাসককে দেখিতে পাইলেন। তিনিও পূজা সমাধা করিয়া গাত্রোত্থান করিয়াছেন। বিমলার চিত্তসংযমের ক্ষমতা ছিল, অদ্য তিনি চিত্ত কথঞ্চিৎ সংযত করিয়াছিলেন। ক্ষণেক মাত্র বিমলা সেই উপাসকের দিকে সতৃষ্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া অবনত-মুখে মন্দির হইতে বাহির হইবার উদ্যম করিলেন।

যুবক কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। দুই দিনই সেই পরম সুন্দরী রমণীকে দেখিতে পাইলেন, দুই দিনই সুন্দরী একদৃষ্টে তাঁহার দিকে ক্ষণেক মাত্র চাহিয়া রহিয়াছিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই জানিতেন যে, দেবমন্দিরেও কুলটা কামিনী কুকামনায় যাতায়াত করিয়া থাকে, কিন্তু বিমলার আকৃতি ও মুখের ভাব দেখিয়া সেরূপ চিন্তা যুবকের মনে একবারও স্থান পায় নাই। তাঁহার হৃদয়ে স্থির সিদ্ধান্ত এই হইল যে, এই রমণীর কিছু বিশেষ বক্তব্য আছে; কিন্তু লজ্জায় অপরিচিত পুরুষের সহিত কথা কহিতে পারিতেছেন না। একবার ইচ্ছা হইল নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, অপরিচিতা, তরুণী, ভদ্রকন্যার সহিত কিরূপে ব্যক্যালাপ করিবেন। দুই দিনের কথা ক্ষণেক চিন্তা করিয়া অবশেষে ভাবিলেন, "যদি আমি না জিজ্ঞাসা করি, বোধ হয়, কোন বিশেষ গূঢ় কথা অব্যক্ত থাকিবে,—বোধ হয়, যে কারণে রমণী মন্দিরে আসিয়াছেন, নিষ্ফল হইবে।"

ধীরে ধীরে বিমলার নিকটে যাইয়া বলিলেন,—"ভদ্রে! অপরিচিত হইয়াও আপনার সহিত কথা কহিতেছি, ক্ষমা করুন; কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, আপনার কিছু বক্তব্য আছে,—যদি থাকে, আজ্ঞা করুন।"

বিমলার কর্ণে অমৃতবর্ষণ হইল, বোধ হইল, এরূপ সঙ্গীতপরিপূর্ণ কণ্ঠধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে কখন প্রবেশ করে নাই। তাঁহার প্রাতঃকালের প্রতিজ্ঞা, সন্ধ্যাকালের চিত্তসংযম একেবারে দ্রবীভূত হইয়া গেল। শরীর কম্পিত হইতে লাগিল,—মুখ অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যুবক দেখিলেন, কোন উত্তর নাই, অথচ রমণী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন,—পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

"বলুন, আমি শুনিতেছি,—এখানে আর কেহই নাই।"

বিমলার বিহ্বলতা অধিকক্ষণ স্থায়ী নহে। তিনি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আপনার নাম কি?"

যুবক উত্তর করিলেন,—"নাম এক্ষণে অজ্ঞাত থাকিবে,—আমাকে অধুনা ইন্দ্রনাথ শর্ম্মা বলিয়া জানিবেন।"

পাঠক মহাশয়! আমাদের পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুকে অনেকক্ষণই চিনিয়াছেন। বিমলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার উপাসনার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারি?"

ইন্দ্র। "সংক্ষেপে বলিতেছি—কোন অনাথা, আশ্রয়হীনা স্ত্রীলোকের সাহায্যে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি।"

বিম। "ধনদ্বারা কোন সাহায্য হইতে পারে?"

ইন্দ্র। "না; কিন্তু আপনাকে অপরিচিতের উপকারার্থ তৎপর দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, ঈশ্বর আপনাকে সুখে রাখুন।"

বিম। "তবে কিরূপে সাহায্য হইবার সম্ভব?"

ইন্দ্র। "বিচার। আমি মুঙ্গের যাত্রা করিয়া বিচার প্রার্থনা করিব; কিন্তু আপনি এ সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? আপনি অবশ্যই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছেন।"

বিমলা মুঙ্গের নাম শুনিয়া পিতার কথা স্মরণ করিলেন, পিতার বিপদ্ স্মরণ করিলেন, তখন লজ্জা একেবারে দূরীভূত হইল, সতেজে ইন্দ্রনাথকে বলিলেন, "আপনি বোধ হয় বীরপুরুষ, আপনার ক্ষমতা অপার, প্রতিজ্ঞা করুন দাসীর একটী ভিক্ষা প্রতিপালন করিবেন।"

ইন্দ্র। "রমণি! আমার ক্ষমতা নাই; কিন্তু সাধ্যমতে আপনার আজ্ঞা পালন করিতে যত্নবান হইব।"

বিম। "মুঙ্গেরে আপনি বঙ্গদেশের দেওয়ান সতীশচন্দ্রকে দেখিতে পাইবেন। তিনি এক্ষণে বিপদ্-জালে বেষ্টিত, প্রতিজ্ঞা করুন, তাঁহাকে রক্ষা করিতে যত্ন পাইবেন।"

ইন্দ্রনাথের মুখ গম্ভীর হইল, ললাট কুঞ্চিত হইল। তিনি স্থির করিলেন, "এই রমণী আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন;—মহাশ্বেতার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত জানেন; আমার ব্রতের বিষয়ও অবগত আছেন;— সেই

ব্রত ভঙ্গ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।" তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। বিমলা আবার বলিতে লাগিলেন—

"এবিষয়ে আপনি চিন্তা করিতেছেন কেন? বিপন্নের বিপদ্ শান্তি করাই বীরপুরুষের কার্য্য, আর যদি কখন তাঁহাকে অসৎ লোক বলিয়া শুনিয়া থাকেন, সে জঘন্য মিথ্যা কথা,—শকুনির প্রতারণা।"

ইন্দ্র। "আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিতেছি না, স্পষ্ট করিয়া বলুন,—শকুনি কে?"

বিম। "শকুনি সতীশচন্দ্রের শনি। সেই পামরই সকল দোষে দোষী,—সতীশচন্দ্রের উদার চরিত্রে কোন দোষ স্পর্শে না। বীরপুরুষ! এই দেবালয়ে অঙ্গীকার করুন, আপনি সতীশচন্দ্রের সহায় হইবেন।"

ইন্দ্রনাথ এই সকল কথা শুনিয়া হতজ্ঞান হইলেন,—কিঞ্চিৎ পরে বলিলেন, "যদি যথার্থই সতীশচন্দ্র নির্দ্দোষী হয়েন, তবে আমি আপনার অনুরোধে নিজ শোণিত দিয়া তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিব; কিন্তু আপনার নাম কি বলুন। আপনি কে, কিরূপেই বা আমার উপাসনা, আমার প্রতিজ্ঞার কারণ জানিতে পারিলেন?"

বিমলা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "ইন্দ্রনাথ! যদি অনুমতি করেন, আপনার প্রশ্নের উত্তর করিবার পূর্ব্বে দাসী একটী প্রশ্ন করিবে। আপনার বংশের পরিচয় দেন নাই, কিন্তু কোন বংশে পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বলিবার কি নিষেধ আছে?"

ইন্দ্র। "এখনও আমি কাহারও দাস হই নাই,—আমি অবিবাহিত।"

বিমলার শরীর সহসা পুলকে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কেন হইল,—কে বলিবে কেন হইল,—আশা মায়াবিনী! বিমলা ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—

"আমাকে ভিখারিণী বলিয়া জানিবেন," বলিয়া বিমলা আবার একটু হাসিলেন।

বিমলার সুমধুর হাস্য দেখিয়া ইন্দ্রনাথ অন্য কথা ভুলিয়া গেলেন, বলিলেন—

"ভিখারিণি! এবার বল দেখি তোমার আবার ভিক্ষা কিসের?

ন রত্নমন্বিষ্যতি, মৃগ্যতে হি তৎ।"

বিমলার মুখ লজ্জায় আরও অপরূপ সৌন্দর্য্য ধারণ করিল,—চক্ষুর পাতা দুখানি পড়িয়া গেল,—মুখ আরক্ত হইল। গদ্গদস্বরে বলিলেন—

"একটী ভিক্ষা ত বলিয়াছি,—সতীশচন্দ্রের রক্ষা;—বিধাতা যদি সময় দেন, তবে অন্য ভিক্ষাটী অবকাশমতে বলিব।"

এই বলিয়া বিমলা বেগে প্রস্থান করিলেন। সে সৌন্দর্য্য ইন্দ্রনাথের হৃদয়ে অনেক দিন অঙ্কিত রহিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নাবিক।

How he heard the ancient helmsman
   Chant a song so wild and clear,
That the sailing sea-bird slowly
   Poised upon the mast to hear
Till his soul was full of longing,
   And he cried with impulse strong,—
"Helmsman! for the love of heaven,
   Teach me, too, that wondrous song!"

Longfellow.

গঙ্গানদীর উপর মুঙ্গেরের ভীমকান্ত দুর্গ শোভা পাইতেছে। কল কল শব্দে গঙ্গার তরঙ্গমালা বহিয়া যাইতেছে, এক এক বার দুর্গের উপর বলে আঘাত করিতেছে,—আবার ফেনময় হইয়া দ্রুতবেগে বহিয়া যাইতেছে,—স্থানে স্থানে ভীষণ আবর্ত্ত দেখা যাইতেছে,—সেই আবর্ত্তে তৃণ কাষ্ঠাদি যাহা কিছু আসিতেছে, বেগে মগ্ন হইয়া যাইতেছে। কোথাও কোথাও পাড়ের মৃত্তিকারাশি ভীষণ শব্দে জলে পতিত হইতেছে,—বারিরাশি কিঞ্চিন্মাত্র কলুষিত ও চঞ্চল হইয়া পুনরায় মুহূর্ত্তমধ্যে আপন গম্ভীর রূপ ধারণ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। স্থানে স্থানে শুভ্র বালুকার চর দেখা যাইতেছে,—সেই চরে নানাপ্রকার পক্ষী বিচরণ করিতেছে,—কোথাও বা তরীবাসীগণ অবতরণ করিয়া সায়ংকালের ভোজ্য পাক করিতেছে; সেই তরী হইতে অসংখ্য দ্বীপ তারকজ্যোতিরূপে বহির্গত হইয়া গঙ্গার প্রশস্ত বক্ষে ঝকমক্ করিতেছে। আকাশেও ক্রমে ক্রমে দুই একটী তারা দেখা যাইতেছে,—গঙ্গাতীরে দুই এক জন উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছে,—নগর ক্রমে নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে।

সেই গঙ্গাতীরে একজন যুবাপুরুষ একাকী ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ইন্দ্রনাথ।

ইন্দ্রনাথ অদ্যই মুঙ্গেরে পঁহুছিয়াছেন,—নিবিড় চিন্তায় মগ্ন হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার চিন্তা কি, পাঠক মহাশয় অনায়াসেই অনুভব করিতে পারিবেন।

অনেকদিন হইল গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। যদিও তিনি এইরূপ মধ্যে মধ্যে গৃহত্যাগ করিয়া পর্য্যটন করিয়া থাকেন, তথাপি পিতা তাঁহার জন্য কতই চিন্তা করিতেছেন, সন্দেহ নাই! কবে গৃহে ফিরিয়া যাইবেন?—যেরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কখনও কি গৃহে ফিরিয়া যাইবেন? ইন্দ্রনাথের অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ সাহসী,—তিনি সমস্ত জগৎ-কেই আপন গৃহ বলিয়া মনে করিতেন,—মানবজাতিকে ভ্রাতা বলিয়া মনে করিতেন। তথাপি প্রবাসে আসিয়া পিতৃগৃহের জন্য একবারও চিন্তা হয় না, এমন হৃদয়ই নাই। ইন্দ্রনাথের হৃদয়েও এক এক বার চিন্তা হইত।

কি করিতেই বা আসিয়াছেন? এই প্রশ্নেরও সহসা উত্তর দিতে পারি-লেন না। সমরসিংহের মৃত্যুর প্রতিহিংসা-সাধন-জন্য। সত্য, কিন্তু সে প্রতিহিংসা কিসে সাধন হইবে? আপনি আশ্রয়হীন, সহায়হীন, সম্পত্তিহীন, অপরিচিত লোক হইয়া কিরূপে সে প্রতিহিংসা সাধন করিবেন? রাজা টোডরমল্ল মুঙ্গেরে আছেন, তাঁহার নিকট যাইয়া বিচার প্রার্থনা করিলে হয় না? রাজা টোডরমল্ল এক্ষণে যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়ে মগ্ন, এক্ষণে কিরূপে তিনি অন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন? বঙ্গদেশ এখনও জয় করিতে পারেন নাই,—কিরূপে বঙ্গবাসীদিগের ন্যায় অন্যায় বিচার-করিবেন?

আর যদিই বা সে বিচার করিতে এক্ষণেই সক্ষম হয়েন, মানসও করেন, অপরিচিত লোকের কথায় বিশ্বাস করিবেন কেন? মান্যবর দেওয়ানজীর বিরুদ্ধে একজন অপরিচিত জমীদারপুত্র যাহা বলিবেন তাহা কি বিশ্বাসনীয়? রাজা টোডরমল্ল বিচার করিতে সম্মত হইলেও ইন্দ্রনাথ এমন প্রমাণ কোথায় পাইবেন যে, সতীশচন্দ্রের উপর দোষারোপ হইবে?

আর সহসা দোষারোপ করা কি উচিত? মহেশ্বর-মন্দিরে অপরিচিতা রমণী যাহা বলিয়াছেন, ইন্দ্রনাথ তাহা বিস্মৃত হয়েন নাই। সে রমণী যে মিথ্যা বলিয়াছেন তাহাও বোধ হয় না, কিন্তু তাঁহার কথা যদি সত্য হয়, তবে সতীশচন্দ্র নিরপরাধী। সে কি সম্ভবে? যাহা হউক, নিশ্চয় না জানিয়া কি সতীশচন্দ্রের উপর দোষারোপ করা উচিত?

আর সেই রমণী যাহার নাম করিয়াছিল, সে শকুনিই বা কোথায়? ইন্দ্রনাথ যত ভাবিতে লাগিলেন, ততই অধিকতর ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। অনেকক্ষণ একাকী সেই গঙ্গার তীরে পদচারণ করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে শ্রান্ত হইয়া সেই তীরে উপবেশন করিলেন। ভাবিলেন, "এক্ষণে কোন উপায় দেখিতেছি না। মুঙ্গেরে কিছুদিন অবস্থান করা যাউক, সময় বুঝিয়া কার্য্য করিব।"

এই সকল চিন্তা ক্রমে অবসান হইতে হইতে ইন্দ্রনাথের অন্যরূপ চিন্তা আসিতে লাগিল। বেগপ্রবাহিণী, কল্লোলিনী, অসংখ্য ঊর্ম্মিরাশি-বিভূষিতা গঙ্গানদীর দিকে যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই ইন্দ্রনাথের হৃদয়ে নব নব ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। শাস্ত্রে এই পাবনী নদীর মহিমা শুনিয়াছেন, কাব্যে গঙ্গার সৌন্দর্য্য-বিষয় পাঠ করিয়াছেন, পুরাণে পুরাবৃত্তে সহস্রবার এই সুখদায়িনী, কলুষধ্বংসকারিণী নদীর স্তুতি পাঠ করিয়াছেন, লোকমুখে ও জনশ্রুতিতে এই নদীর অসংখ্য গুণগান শুনিয়াছেন। যখন এই সমস্ত বিষয় ইন্দ্রনাথের হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল, যখন সেই অনন্ত বীচিমালার সুশ্রাব্য গম্ভীর স্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল, যখন সেই অগাধ, অসীম জলরাশির দিকে তাঁহার নয়ন আকৃষ্ট হইতে লাগিল, যখন নিশার আগমনে শশধর উদিত হইয়া সুন্দর ঊর্ম্মি-শ্রেণীকে নবোঢ়া বধূর ন্যায় সস্নেহে চুম্বন করিয়া সুবর্ণরাশি দ্বারা অলঙ্কৃত করিল, তখন ইন্দ্রনাথের হৃদয় এক অভিনব উল্লাসে স্ফীত হইতে লাগিল, অভিনব আনন্দে দ্রবীভূত হইতে লাগিল। হৃদয়ের সমুদয় নীচাশয়, ক্ষুদ্র ভাব অন্তর্হিত হইতে লাগিল; মহদ্ভাব, মহান্ আশয় জাগরিত হইতে লাগিল; সেই সায়ংকালীন অগাধ জলরাশির মহত্ত্ব ইন্দ্রনাথের হৃদয়ে অভিনব মহত্ত্বের ভাব উদ্রেক করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিষ্পন্দ-লোচনে প্রকৃতির শোভা অবলোকন করিতে লাগিলেন।

সহসা এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সঙ্গীতে ইন্দ্রনাথের চিন্তা ভঙ্গ হইল,—চাহিয়া দেখিলেন, সেই বিস্তীর্ণ জলরাশির চন্দ্রালোকোজ্জ্বল বক্ষঃস্থলে একটী ক্ষুদ্র তরী ভাসমান রহিয়াছে,—তাহার একমাত্র আরোহী সেই গান করিতেছে। গান বিশেষ মধুর কি না জানি না, কিন্তু ইন্দ্রনাথের কর্ণে স্বর্গীয় সঙ্গীতের ন্যায় বোধ হইল। তাঁহার হৃদয়-যন্ত্র সেই সময়ে প্রকৃতির অনন্ত-সঙ্গীতে পরিপূর্ণ ছিল, সুতরাং অনুরূপ ভাবোত্তেজক সামান্য সঙ্গীতকেও তিনি স্বর্গীয় সঙ্গীত বলিয়া বোধ করিলেন। সেই নাবিককে ইঙ্গিত করাতে সে নৌকা তীরে আনিল ও ইন্দ্রনাথ তাহাতে আরোহণ করিয়া তাহাকে কিছুক্ষণ তরী সঞ্চালন করিতে বলিলেন, আর সেই গীত গাইতে আজ্ঞা করিলেন।

সেই গান একবার, দুইবার, তিনবার, গীত হইল। গঙ্গার অনন্ত গীতের সহিত মিলিত হইয়া বায়ুপথে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে নাবিক জিজ্ঞাসা করিল—

"মহাশয়! আপনাকে অগ্রে কখন এই নগরে দেখি নাই, আপনি কি সম্প্রতি আসিয়াছেন?"

ইন্দ্র। "আমি অদ্যই আসিয়াছি।"

নাবি। "আপনার নাম কি? নিবাস কোথায়?"

ইন্দ্র। "আমাকে ইন্দ্রনাথ বলিয়া জানিবে, নিবাস অনেক দূরে, নদীয়া জিলায়।"

নাবি। "নদীয়া জিলার কোন্ গ্রামে?"

ইন্দ্র। "ইচ্ছাপুর গ্রামে।"

নাবি। "ইচ্ছাপুর গ্রামে? আপনি কাহার পুত্র জিজ্ঞাসা করিতে পারি?"

ইন্দ্র। "কেন, তুমি ইচ্ছাপুরে গিয়াছিলে না কি?"

নাবিক ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, যেন কোন কথা লুকাইবার চেষ্টা করিল, পরে বলিল, "আমাদের কার্য্যবশতঃ সকল স্থানেই যাইতে হয়,—বৎসর বৎসর বাদা হইতে চাল আনিতে যাইতাম। আপনার পিতার নাম কি? হইতে পারে, আমি তাঁহাকে চিনিলেও চিনিতে পারি।" ইন্দ্রনাথ আপন পরিচয় সকলের নিকট লুকাইয়া রাখিতেন,—গুপ্তভাবেই দেশ-বিদেশ পর্য্যটন করিতেন,—কিন্তু নাবিকের নিকট পিতার নাম লুকাইবার কোন কারণ দেখিতে পাইলেন না,—ভাবিলেন, আমি অনেকদিন পিত্রালয় হইতে আসিয়াছি, যদি এই মাঝি সম্প্রতি সে গ্রাম হইতে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার পিতার কুশল-সংবাদ দিলেও দিতে পারে। বলিলেন, "ইচ্ছাপুরের জমীদার নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী আমার পিতা।" নাবিক শুনিয়া সহসা চমকিত হইল। পুনরায় চিত্তসংযম করিয়া বলিতে লাগিল, "হা নগেন্দ্রনাথ! পুণ্যাত্মা নগেন্দ্রনাথ! তাহার অন্নে আমি কতদিন পালিত হইয়াছি।"

ইন্দ্র। "তুমি তাঁহার বাটীতে চাকর ছিলে না কি?"

নাবি। "অদ্য প্রায় দ্বাদশ বর্ষ হইল আমি তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিয়াছি।"—কিঞ্চিৎ স্মরণ করিয়া আবার বলিতে লাগিল, "আপনার কি তখন ইন্দ্রনাথ নাম ছিল?"

ইন্দ্র। "তোমার নিকট আর লুকাইবার আবশ্যক কি? ইন্দ্রনাথ আমার কখনই নাম নহে, চিরকালই আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ; তবে অজ্ঞাতরূপে দেশবিদেশ পর্য্যটন করিতে হয়, এইজন্য মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রনাথ নাম ধারণ করি।"

"সুরেন্দ্রনাথ!" এই কথামাত্র উচ্চারণ করাতে নাবিকের চক্ষে জল আসিল,—বলিতে লাগিল—

"আমি আপনাকে কত খেলা দিয়াছি, কতবার ক্রোড়ে করিয়া চুম্বন করিয়াছি,—যখন আপনার বয়ঃক্রম ছয় বৎসর, তখন আপনাকে ত্যাগ করিয়া আইসি। আপনার কি আমাকে মনে পড়ে?"

ইন্দ্রনাথের বাল্যাবস্থায় বাড়ীতে যত ভৃত্য ছিল, তাহাদের একে একে স্মরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু নাবিক কখন ভৃত্য ছিল কি না, স্মরণ করিতে পারিলেন না; অথচ নাবিকের মুখ দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়িতে লাগিল। বলিলেন, "আমি স্মরণ করিতে পারিতেছি না।"

নাবি। "এক্ষণে আমার পূর্ব্ব অন্নদাতার সংসারের বিষয় জিজ্ঞাসা করি। নগেন্দ্রনাথ ভাল আছেন?"

ইন্দ্র। "আছেন।"

নাবি। "তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র এক্ষণে কোথায়?"

ইন্দ্র। "আমার জ্যেষ্ঠের অনেকদিন হইল কাল হইয়াছে।"

নাবি। "তাঁহার নাম উপেন্দ্রনাথ ছিল না?"

ইন্দ্র। "হাঁ।"

নাবি। "তাঁহার কাল হয় কিরূপে?"

ইন্দ্র। "ইচ্ছাপুরে বড় ব্যাঘ্রের ভয়, আমার জ্যেষ্ঠকে ব্যাঘ্রে লইয়া যায়। আমার জ্যেষ্ঠকে প্রায় স্মরণ নাই। অনেক বৎসর হইল তাঁহার কাল হইয়াছে।"

নাবি। "মাতাঠাকুরাণী কেমন আছেন?"

ইন্দ্র। "তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যুবার্ত্তা শুনিয়া তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, সেই দুঃখে তাঁহার রোগ হয়, সেই রোগে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।"

নাবিক এই কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল,—দর-বিগলিত অশ্রুধারায় বস্ত্র সিক্ত হইল,—বলিতে লাগিল, "হায় মাতা-ঠাকুরাণী!—আপনি আমাকে যেরূপ স্নেহ করিতেন, মাতা পুত্রকে কখন সেরূপ স্নেহ করে নাই। হা বিধাতঃ! আমার কি মৃত্যু নাই?"

ইন্দ্রনাথের হৃদয়ে সন্দেহ হইতে লাগিল। ভৃত্য কি কখনও প্রভুর জন্য এত ক্ষুণ্ণ হয়? একবার ভাবিলেন অনেক দিনের ভৃত্য, হইলেও হইতে পারে, আরবার ভাবিলেন, নাবিকের ক্রন্দন সমস্তই প্রতারণা, নাবিক নগেন্দ্রনাথকে কখন জানিত না, অধিক অর্থ পাইবার জন্য কপট কৌশলে সকল কথা বাহির করিয়া লইয়া কপট দুঃখ দেখাইতেছে। কখন বা ভাবিলেন, অধিক অর্থ পাওয়া অপেক্ষাও কোন গভীরতর পাপ-অভিসন্ধি

থাকিতেও পারে। তৎক্ষণাৎ আবার মনে হইল, এ মুখ আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি, এ স্বর আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি, নাবিক অবশ্যই পুরাতন ভৃত্য হইবে।

নাবিক সুরেন্দ্রনাথের আন্তরিক ভাব কিছু কিছু বুঝিতে পারিল। কিছু কষ্টে আত্মসংযম করিয়া অন্য কথা আরম্ভ করিল।

অনেকক্ষণ অন্য কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, নাবিক নীচব্যবসায়ী হইয়াও ভদ্রলোকের মত আলাপ পরিচয় শিখিয়াছে,—অনেক বিষয়ে বিলক্ষণ বুদ্ধিও প্রদর্শন করিতেছে ও অনেক প্রকার লোকের সহিত সহবাসে বিলক্ষণ সংসারজ্ঞানও লাভ করিয়াছে। দুই এক ঘণ্টা কথোপকথনে মনুষ্য-হৃদয়ের তলচারি প্রবৃত্তি সকলের বিশেষ জ্ঞান প্রকাশ করিতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ সেই কথোপকথনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন,—মনে যে সংশয় হইয়াছিল তাহা একেবারে দূর করিলেন, নাবিকের উপর যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন।

নাবিক মধ্যে মধ্যে আপনার বিষয়ও দুই একটী কথা বলিতে লাগিল, মানবজাতির আশা ভরসা, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্যের কথা বিস্তর বলিতে লাগিল,—সুরেন্দ্রনাথের কর্ণে যেন সুধাবর্ষণ হইতে লাগিল। নৌকা প্রায় এক ক্রোশ ভাসিয়া গেল, গঙ্গার জল উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে ঝক্‌মক্ করিতেছে, আকাশে দুই এক খণ্ড শুভ্র মেঘ দেখা যাইতেছে, কখন কখন চন্দ্রকে ঈষৎ আবরণ করিতেছে, আবার বায়ুতে তাড়িত হওয়াতে চন্দ্রের পুণ্য-জ্যোতিঃ নদীর প্রশান্ত বক্ষে পতিত হইতেছে। আকাশ গভীর নীলবর্ণ, দুই একটী তারা লজ্জাবতী নববধূর ন্যায় কখন কখন মুখ দেখাইতেছে। জগতে সমস্ত জীব নিস্তব্ধ, কেবল কখন কখন দূর হইতে একটী গীত বায়ুমার্গে ভাসিয়া আসিতেছে, আর সেই বিস্তীর্ণ গঙ্গা-বারিতে ও পার্শ্বস্থ শুভ্র সৈকতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। গঙ্গায় আর একটী নৌকাও চলিতেছে না। কেবল সুরেন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র তরী তর তর শব্দে ভাসিতেছে।

হঠাৎ নাবিক আপন কথোপকথন সাঙ্গ করিয়া একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ সেই দিকে দৃষ্টি করিলেন,—দেখিলেন বৃক্ষের মধ্য হইতে একটী আলোক নির্গত হইতেছে। নাবিক অনেকক্ষণ সেই দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিল, "ঐ যে আলোক দেখিতেছেন, ঐ আমার গৃহ, আর উহার অনতিদূরে যে নিকুঞ্জ দেখিতেছেন, ঐ স্থানে আমার হৃদয় সংস্থাপিত আছে।"

নাবিকের গম্ভীরভাবে চমকিত হইয়া সুরেন্দ্রনাথ তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন তাহার চক্ষুতে অশ্রুবিন্দু টল্ টল্ করিতেছে।

সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে দুঃখের সঞ্চার হইল। স্নেহপূর্ব্বক সেই জল মোচন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাবিক তোমার হৃদয়ের ভাব আমাকে পরিষ্কার করিয়া বল,—যদি আমার সাধ্য থাকে তোমার দুঃখ মোচন করিব। তুমি কে যথার্থ করিয়া বল, সামান্য লোকের হৃদয়ে এরূপ ভাব থাকিতে পারে না,—সামান্য লোকের এরূপ সুবুদ্ধি, এরূপ কথোপকথনের ক্ষমতা সম্ভবে না।"

নাবিক আপন শরীর হইতে উত্তরীয় খুলিয়া ফেলিয়া আপন যজ্ঞোপবীত দেখাইল। বলিল, "আমি এক্ষণে দরিদ্র মাঝি বটে, কিন্তু আমি ব্রাহ্মণতনয়। যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা হইয়া থাকে, অনুগ্রহবোধে আমার কুটীরে আসুন, আমি সমস্ত কথা আপনাকে নিবেদন করিব।"

সুরেন্দ্রনাথ সম্মত হইলেন। তরী তীরে লাগিল। দুইজনে নিঃশব্দে সেই তরীচালকের ক্ষুদ্র কুটীরে গমন করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নাবিকের পূর্ব্বকথা।

How sweet the days that I have spent,
 In yon sequestered bower;
Those citron trees, still sweet of scent,
 Had then some magic power.
Or some fair spirit did reside,
 In that sweet purling brook,
Which runs by yon green mountain side,
 Now haunted by the rook.
No charm was in the spicy grove,
 No spirit in the stream,
O'was the smile of her I love,
 Now vanished like a dream!

I. C. Dutt.

কোন কোন মর্য্যাদাগর্ব্বী লোক বোধ হয় সুরেন্দ্রনাথের উপর রুষ্ট হইবেন। ভ্রুকুটী করিয়া বলিবেন, "কি, সম্ভ্রান্ত জমীদারপুত্র হইয়া সামান্য জেলেমাঝির সহিত বন্ধুত্ব! এই কি তাঁহার মানসম্ভ্রম, এই কি তাঁহার কুলমর্য্যাদা! কোথায় উন্নতিশালী লোকের সহিত যত্নসহকারে আলাপ পরিচয় করিবেন, কোথায় বড় লোকের সহিত আলাপ করিয়া আপনি

দেশের মধ্যে একজন বড় লোক হইতে চেষ্টা করিবেন,—পিতার নাম রাখিবেন, কুলের নাম রাখিবেন, তা নয়, কেবল ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, আর যত চাষা মজুরের সহিত আলাপ করিতেছেন! ছোঁড়া অধঃপাতে গিয়াছে। আর যে তাহার চরিত্রের বিষয় লিখিতেছে, সেও অধঃপাতে গিয়াছে।”

এইরূপে তিরস্কার করিলে আমরা যে কি উত্তর দিব, ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না, ভয়ে একেবারে নিরুত্তর! অগত্যা স্বীকার করিব, আমাদের সুরেন্দ্রনাথের বিষয়বুদ্ধি কিছু অল্প বটে,—বোধ হয় যথার্থই তিনি মর্য্যাদা রাখিতে জানেন না,—নাম কিনিবার যে সহস্র কৌশল আছে তাহা তিনি জানেন না। বড় লোকের মধ্যে গণ্য হইবার জন্য চেষ্টা করিয়া বড় লোকের সহিত আলাপ করা, বড় লোকের সভায় উপস্থিত থাকা, আলাপ না থাকিলেও অন্য লোকের নিকট বড় লোকের পরম বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেওয়া, অন্তরে বিদ্যা বুদ্ধি থাকুক বা না থাকুক, মুখে গাম্ভীর্য্য টুকু ধারণ করা, সমমর্য্যাদার লোকের সহিত কথা না কহা, কিম্বা গর্ব্বিতভাবে কথা কহা, অধিক মর্য্যাদার লোকের সহিত লোকের সম্মুখে সমানের মত কথা কহা, অন্তরালে খোসামোদ করা, ক্ষমতা না থাকিলেও লোকের নিকট ক্ষমতা আছে বলিয়া পরিচয় দেওয়া, মান না থাকিলেও লোকের নিকট মানীর ন্যায় অঙ্গভঙ্গী করা, বিষয় ও ধন না থাকিলেও বিষয়ী ও ধনী বলিয়া পরিচয় দেওয়া, সতর্কভাবে যথার্থ যে সম্পত্তি আছে তাহা গুপ্ত করিয়া তাহার দশগুণ সম্পত্তি আছে, আচার ব্যবহার ইঙ্গিতের দ্বারা প্রকাশ করা, ৪০ টাকা আয় থাকিলে ১১০ টাকা আয় আছে বলিয়া প্রচার করা, ২৫ টাকার দ্রব্যকে নগদ ৪০ টাকায় ক্রীত দ্রব্য বলিয়া জানান,—এইরূপ সহস্র মহা কৌশল সুরেন্দ্রনাথ জানিতেন না। সে নির্ব্বোধ বালক! ভাবিত, সৎকর্ম্ম করিলেই মানবজাতির যথার্থ মর্য্যাদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অতি নির্ব্বোধ! যে সৎকর্ম্ম করিত তাহা লোককে জানান চাই—তাহার দশগুণ অধিক করিয়া লোকের নিকট প্রকাশ করা চাই, তাহা হইলেও কিছু হইত। তা নহে, গোপনে সৎকর্ম্ম করিলে কি হইবে? ছোঁড়া যথার্থ অধঃপাতে গিয়াছেই বটে!

আর আমাদের উপর যে ক্রোধ করিতেছেন, সে অসঙ্গত ক্রোধ। সুরেন্দ্রনাথ যদি নির্ব্বোধ হয়েন, আমাদের কি দোষ? সুরেন্দ্রনাথের আচারব্যবহার দেখিয়া আমরা লজ্জিত, কুণ্ঠিত ও অপ্রস্তুত হইয়াছি,—কিন্তু তজ্জন্য যাহা ঘটিয়াছে তাহার অন্যরূপ লিখিব কিরূপে। যাহা যাহা

ঘটিয়াছে আমরা ঠিক তাহাই লিখিতেছি, সুরেন্দ্রনাথ মাঝির সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, আমরা তাহাই লিখিতে বাধ্য হইলাম। এ যথার্থ ইতিহাসে কি আমরা কাল্পনিক কোন কথা বানাইয়া লিখিতেছি? রাম!

সুরেন্দ্রনাথ ও নাবিক এক্ষণে সেই ক্ষুদ্র কুটীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় জেলেমাঝিদিগের একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল, কিন্তু গ্রামের অন্যান্য কুটীরাবলী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে এই কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাতঃকালের অন্ন ছিল, সেই অন্ন উভয়ে আহার করিলেন, পরে নাবিক আপনার বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন;—

"যুবক! আপনার হৃদয়ে যদি ক্রোধ ও দর্প থাকে, তাহা ত্যাগ করুন,— এই দর্পেই আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। শৈশবাবস্থা হইতে আমি অতিশয় গর্ব্বী ছিলাম। শুনিয়াছি, অতি শৈশবেও আমার কোন বিষয়ে ইচ্ছা যদি না সম্পন্ন হইত, তাহা হইলে আমি এক দিন, দুই দিন অনাহারে থাকিতাম। এই বিজাতীয় ক্রোধেই আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

"বাল্যাবস্থায়ও এইরূপ ছিলাম। আমার মন স্বভাবতঃ পাঠাভ্যাসে রত হইত। কিন্তু কখন যদি গুরুমহাশয় অন্যায় তিরস্কার করিতেন, তাহা হইলে আমার সেই বিজাতীয় ক্রোধের আবির্ভাব হইত; পুস্তক দূরে নিক্ষেপ করিতাম; সহস্র বেত্রাঘাতেও আমি কথা কহিতাম না; ক্রন্দন করিতাম না। গুরুমহাশয় আমাকে ভাল বাসিতেন, কিন্তু সময়ে সময়ে আমার ক্রোধ দেখিয়া আমার উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইতেন। একদা এরূপ রুষ্ট হইয়াছিলেন যে, সমস্ত পাঠশালার ছাত্রের সম্মুখে বলিলেন, 'এই বালক বেত্রাঘাতে ক্রন্দন করে না, কিন্তু অদ্য যদি না ক্রন্দন করাই, তাহা হইলে আমি এ কার্য্য পরিত্যাগ করিব।' এই বলিয়া তিনি আমাকে বেত্রাঘাত প্রভৃতি সহস্ররূপে যাতনা দিলেন, কিন্তু আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম, মুখ দিয়া বাক্য বাহির হয় নাই, চক্ষু হইতে জল বাহির হয় নাই। অবশেষে গুরুমহাশয় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বলিলেন, 'অগ্নি দিয়া উহাকে দাহন কর।' এক খণ্ড অগ্নি আনীত হইয়া আমার শরীরে স্থাপিত হইল, আমি যাতনায় অস্থির হইলাম, তথাপি কথা কহিলাম না,—মুহূর্ত্তমধ্যে অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলাম। তখন গুরুমহাশয়ের সংজ্ঞা হইল। তিনি আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিয়া ক্রোড়ে করিলেন, জলসেচনের দ্বারা আমি শীঘ্রই চেতনা প্রাপ্ত হইলাম। সেই অবধি আমার পড়া সাঙ্গ হইল। গুরুমহাশয় আর আমাকে পড়াইলেন না। আমি জন্মের মত মূর্খ রহিলাম।

আমার মাতাঠাকুরাণী আমাকে কখন নিষ্ঠুর বাক্য বলেন নাই। তিনি আমার হৃদয় জানিতেন ও আমাকে এরূপ ভাল বাসিতেন যে, কখনও তাঁহার একটী কথাতেও মনে বেদনা জন্মে নাই। (বলিতে বলিতে বক্তার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল।) আমিও তাঁহাকে যেরূপ ভাল বাসিতাম, সন্তানে মাতাকে সেরূপ ভালবাসে নাই। আমি পিতার অবাধ্য হইয়াছি; গুরুর অবাধ্য হইয়াছি; কিন্তু কস্মিন্‌কালেও মাতার একটী কথা অবহেলা করি নাই। গৃহের সমস্ত লোকে উপরোধ করিলে, ভয় প্রদর্শন করিলে, প্রহার করিলে, আমি যে কার্য্য না করিতাম, মাতা ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই আমি তাহা করিতাম,—হায়! সে স্নেহের প্রতিমাকে আমি আর দেখিতে পাইব না।" বলিতে বলিতে বক্তার কণ্ঠরুদ্ধ হইল, মুখ নত করিয়া অনবরত অশ্রুবিন্দু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

সুরেন্দ্রনাথ অতিশয় দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, তোমার মাতার কাল হইয়াছে?"

নাবিক উত্তর করিল, "শুনিয়াছি তাঁহার কাল হইয়াছে।"

ক্ষণেক ক্রন্দনের পর হৃদয় কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে পুনরায় বলিতে লাগিল—

"আমার পিতাও আমাকে স্নেহ করিতেন, কিন্তু তাঁহার স্বভাব রুষ্ট ছিল। আমার এ বিজাতীয় ক্রোধ কতক অংশে আমি তাঁহারই নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। বিশেষতঃ সংসার-চিন্তায় জ্বালাতন হইয়া অনেক সময়ে তিনি মিথ্যা ক্রোধ করিতেন। আমাকে যথার্থ ভাল বাসিতেন; আমার সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহার লোচন আনন্দে উৎফুল্ল হইত; আমার নিন্দা শুনিলে তাঁহার মুখ ম্লান হইয়া যাইত; কিন্তু তথাপি তিনি স্বাভাবিক ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিতেন না। এক এক বার তাঁহার নয়ন ক্রোধে আরক্ত হইত; শরীর কম্পিত হইত; অনেক সময় অকারণে প্রহার ও তিরস্কার করিতেন। একদিন আমাকে নির্দ্দোষে নির্দ্দয় হইয়া প্রহার করিলেন ও বলিলেন, 'তোর মুখ আর দেখিতে চাহি না, আমার গৃহ হইতে বাহির হইয়া যা।' 'চলিলাম,' বলিয়া আমি পিতৃগৃহ হইতে নির্গত হইলাম।

"প্রহারে ও তিরস্কারে অনেক বালক শান্ত হয়, কিন্তু আমি ক্রোধে অন্ধ হইলাম; চারিদিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলাম; হৃদয়ে হুতাশন জ্বলিতে লাগিল। সেই হুতাশন পিতৃভক্তি, মাতৃস্নেহ, কনিষ্ঠের প্রতি ভালবাসা, সকলই দগ্ধ করিল। সেই হুতাশনে আমার ভাবী সংসার-সুখ, পিতামাতার আশা ভরসা একেবারে দগ্ধ করিল। পিতা আমাকে দূর হইতে বলিলেন,

আমি সকল রূপ স্নেহ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া দূর হইলাম। সেই অবধি আমি পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছি। তখন আমার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর মাত্র।

"কেবল ইহাও নহে; পিতৃদত্ত কোন দ্রব্যই আমার সঙ্গে লইব না, আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইল। রাত্রিকালে, ছদ্মবেশে ভিক্ষা করিয়া একখানি ছিন্ন বস্ত্র পাইলাম, তাহাই পরিধান করিয়া আপন বস্ত্র পিতৃগৃহের সন্নিকটে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিলাম। মনে করিলাম, পিতার নিকটে আর আমি ঋণগ্রস্ত নহি। রে মূঢ় অন্তঃকরণ! আশৈশব যত্নসহকারে, স্নেহ-সহকারে, অর্থসহকারে পিতা যে মানুষ করিয়াছিলেন, সে ঋণ কোথায় যাইবে?

"তাহার পর দশ বৎসর আমার জীবন যে কিরূপে অতিবাহিত হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন না। মরুভূমিতে প্রচণ্ড বায়ুর ন্যায় আমার জীবনের দশ বৎসর বহিতে লাগিল। প্রচণ্ডতা আছে, কিন্তু ফল নাই, অর্থ নাই, কাহারও উপকার নাই, কাহারও অপকার নাই। নির্জ্জন প্রাণি-শূন্য পর্ব্বতপার্শ্বে সমুদ্রগর্জ্জনবৎ আমার হৃদয়ের দুর্দ্দমণীয় প্রবৃত্তি সমুদয় গর্জ্জন করিয়াছে, কিন্তু সে গর্জ্জনের শ্রোতা নাই;—সে গর্জ্জনে কেহ ভীত হয় নাই, কেহ আনন্দিত হয় নাই, কেহ বিস্মিত হয় নাই। পাতাল-প্রবাহিনী, ভৈরবকল্লোলিনী ভোগবতীর তরঙ্গমালার ন্যায় পাতাল হইতেও অধিক অন্ধকারপরিপূর্ণ আমার হৃদয়কন্দরে কত প্রবৃত্তি প্রবাহিত হইয়াছে, কিন্তু সে প্রবাহ ভোগবতীর ন্যায় মনুষ্যের অদৃশ্য অন্ধকারাচ্ছন্ন।

"দশ বৎসর অতীত হইলে সেই অন্ধকাররাশি সহসা আলোকচ্ছটায় চমকিত ও উদ্দীপ্ত হইল।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া বক্তা ক্ষণেক নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল। যে কথা বলিতে হইবে তাহা যেন একবার হৃদয় মধ্যে আলোচনা করিয়া লইল। সুরেন্দ্রনাথ নিস্পন্দনেত্রে সেই অপূর্ব্ব উন্মত্তপ্রায় লোকের দিকে দেখিতে লাগিলেন, অনন্যমনে তাহার গম্ভীর ও উন্মত্ততার কথা শুনিতে লাগিলেন। সেও ক্ষণেক পর আরম্ভ করিল—

"যে সকল প্রবৃত্তিতে আমার হৃদয় দশ বৎসর কাল ব্যথিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রেম সর্ব্বাগ্রগণ্য। (সুরেন্দ্রনাথ অধিকতর আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতে লাগিলেন।) সামান্য স্ত্রীলোকের প্রেম আমি আকাঙ্ক্ষা করিতাম না, যে প্রেম মানব-হৃদয়কে একেবারে পরিপূর্ণ করিতে পারে,—যে প্রেম জীবনের অংশস্বরূপ, দেহে আত্মার স্বরূপ, যে প্রেম শেষ হইলেই জীবন শেষ হইবে, সেইরূপ প্রেম আমি আকাঙ্ক্ষা করিতাম। কতবার

অন্ধকারে বসিয়া সেই প্রেমের কল্পনা করিতাম; চিন্তাবলে কতবার শূন্য হইতে অলৌকিক স্নেহসম্পন্না প্রেমপ্রতিমাকে জাগরিত করিয়া কখন কখন প্রায় এক প্রহর পর্য্যন্ত তাঁহারই সহিত কালহরণ করিতাম, সে কাল্পনিক জগতে যে অনির্ব্বচনীয় অপরিসীম সুখ, তাহা এ জগতে কোথায় পাইবেন? সে সুখে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া আমি উন্মত্তপ্রায় হইতাম; সহসা সে জগৎ সুন্দর জলবিম্বের ন্যায় ভিন্ন হইয়া যাইত; প্রেমপ্রতিমা পুনর্ব্বার শূন্যে লীন হইত; কল্পনাশক্তি শ্রান্ত হইত; আমার মস্তক ঘূর্ণায়মান হইয়া আমি সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইতাম।

"দিন দিন এইরূপ কল্পনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিবামানে অর্দ্ধেক সময় আমি এ জগতে থাকিতাম না, কাল্পনিক জগতে বিচরণ করিতাম। সে জগতে উজ্জ্বল আকাশ, উজ্জ্বল ক্ষেত্রবৃক্ষ, উজ্জ্বল অট্টালিকা, উজ্জ্বল গৃহদ্রব্যাদি,—তন্মধ্যে সেই উজ্জ্বল প্রেমপ্রতিমা আসীন রহিয়াছেন। নিবিড় কৃষ্ণকেশে জ্যোতির্ম্ময় সুবর্ণকান্তি মুখমণ্ডল বেষ্টন করিয়া রহিযাছে, রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ওষ্ঠ দুটী অল্প প্রেমহাস্যে বিস্ফারিত, ভ্রমর-কৃষ্ণ চক্ষু দুটী প্রেমাশ্রুতে পবিপূর্ণ, সমস্ত মুখমণ্ডল প্রেমে ঢল ঢল করিতেছে। সহসা কল্পনাশক্তি ছিন্ন-তার বীণাসম নীরব হইত। আমিও মূর্চ্ছিত হইতাম।

"সুরেন্দ্রনাথ! কতরূপ যে কল্পনা করিতাম, তাহা বলিতে জীবন শেষ হইবে, অদ্য রাত্রির কথা কি? বলিতে আমার কষ্ট হইবে না, কেননা আমার কল্পনাই জীবন, কিন্তু আপনাকে কিজন্য কষ্ট দিব? একটীমাত্র কথা বলি,—যত কল্পনা করিতাম, নানারূপ ভিন্ন জগতে, ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন অবস্থায় সেই একই প্রেমপ্রতিমা বিরাজ করিত। ক্রমে আমি উন্মত্তপ্রায় হইলাম।

"একদিন নিশাবসানে ঐরূপ কল্পনা ছিন্ন হওয়াতে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া এই গঙ্গাতীরে ঐ নিকুঞ্জবনে শুইয়া রহিয়াছি। কতক্ষণ মূর্চ্ছিত ছিলাম বলিতে পারি না,—বোধ হইল, মস্তকে ও মুখে কে জলসিঞ্চন ও ব্যজন করিতেছেন; বোধ হইল, তুলারাশিতে আমার মস্তক স্থাপিত রহিয়াছে। ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি,—আপনি বিশ্বাস করিবেন না,—সেই প্রেমপ্রতিমা! যাঁহাকে সহস্রবার স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, তিনি আমার মস্তক আপন ক্রোড়ে রাখিয়া আমাকে নিঃশব্দে ব্যজন করিতেছেন।"

উভয়েই অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল। সুরেন্দ্রনাথ এইরূপ অসম্ভব কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। যদিও আপনি সরলার প্রেমপাশে বদ্ধ ছিলেন,

তথাপি এ অসম্ভব কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি বিবেচনা করিলেন, এই নাবিকের কল্পনাশক্তি যেরূপ উত্তেজিত দেখিতেছি, নিশ্চয়ই পরে যে রমণীর প্রেমে বদ্ধ হইয়াছিল, তাহারই প্রতিমার সহিত পূর্ব্বকার প্রেমচিন্তার যোগ করিতেছে। সুরেন্দ্রনাথ এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই অপূর্ব্ব পুরুষের গাম্ভীর্য্য ও চিন্তার বেগ দেখিয়া কিছু বলিলেন না। সেও অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল—

"সুরেন্দ্রনাথ! আমি আর অধিক কথা কহিতে পারি না। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, সেই রমণী ব্রাহ্মণকন্যা ও অবিবাহিতা। পাণিগ্রহণ করিলাম, তাহার পর দুই বৎসর যেরূপ সুখস্বপ্নে অতিবাহিত হইল, সেরূপ পূর্ব্বেও কখন হয় নাই। কিন্তু সে কথা আর কিজন্য বলি? আপনার যেরূপ পবিত্র হৃদয়, অবশ্যই পবিত্র প্রেম কাহাকে বলে জানিয়াছেন, যদি না জানেন, শীঘ্রই জানিবেন,—আপনি ভিন্ন অনেকেই পবিত্র প্রেমের প্রভাব জানিয়াছেন;—কিন্তু আমার মত গাঢ় প্রেম মানবজাতির মধ্যে কেহ কখন জানেন নাই, জানিবেন না।

"ঐ যে নিকুঞ্জবন দেখিতেছেন, ঐ স্থানে আমরা বাস করিতাম। শরৎকালের ঊষা-আকাশে যে পবিত্র বর্ণ বিস্তীর্ণ করে, প্রেম আমাদের হৃদয়-আকাশে তদপেক্ষা পবিত্র বর্ণে চিরকালই রঞ্জিত হইয়া থাকিত। সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকার যেরূপ শান্ত, নিস্তব্ধ, গম্ভীর, আমাদের হৃদয়ে প্রেম তদপেক্ষা নিস্তব্ধ, শান্তভাবে বিরাজ করিত। সেই রমণীকে আমি সন্ধ্যা বলিতাম, কেননা তাহার প্রকৃতি সন্ধ্যার ন্যায় ম্লান, নিস্তব্ধ ও চিন্তাশীল। আমি তাহাকে প্রেমপ্রতিমা বলিতাম, কেননা তাহাকে দেখিবার অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে তাহার প্রতিমা আমার হৃদয়ে জাগরিত ছিল। আমি তাহাকে কুঞ্জবাসিনী বলিতাম, কেননা ঐ যে কুঞ্জবন দেখিতে পাইতেছেন, ঐ স্থানে"——

আর কথা সরিল না। সুরেন্দ্রনাথ দেখিলেন নাবিক উন্মত্তের ন্যায় সেই কুঞ্জবনের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে,—মুখে কোন ভাবই নাই, সংজ্ঞার কোন লক্ষণই নাই। অনতিবিলম্বেই সেই নিস্পন্দ শরীর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সুরেন্দ্রনাথ অনেক যত্নে তাহাকে চৈতন্যদান করিলেন। পরে অন্য কথা কহিতে কহিতে রাত্রি অনেক হইল। দুই ভ্রাতার মত দুইজন এক শয্যায় শয়ন করিলেন, অচিরে নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বঙ্গবিজেতা।

A combination and a form indeed
Where every god did seem to set his seal
To give the world assurance of a man.
Shakespeare.

মুঙ্গেরের প্রকাণ্ড দুর্গের মধ্যে একটী প্রশস্ত গৃহে এক বীরপুরুষ উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। ইনি ক্ষত্রিয়কুলচূড়ামণি রাজা টোডরমল্ল।

তাঁহার নিকটে সে সময়ে অধিক লোক নাই, দুই চারি জন অতি বিশ্বাসী যোদ্ধা আসীন ছিলেন। অতি মৃদুস্বরে যুদ্ধের পরামর্শ হইতেছিল। এমন সময় একজন সৈনিক আসিয়া প্রণিপাত করিয়া বলিল—

"মহারাজ! একজন অশ্বারোহী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক, অনুমতির জন্য দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন।"

টোড। "তাঁহার বক্তব্য কি জিজ্ঞাসা কর।"

সৈন্য। "জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—বলিলেন মহারাজের সহিত দর্শন ভিন্ন বলিতে পারি না, বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

টোড। "হিন্দু কি মুসলমান?"

সৈন্য। "ব্রাহ্মণতনয়।"

টোড। "কোন্ দেশীয়?"

সৈন্য। "জন্ম বঙ্গদেশে।"

টোড। "বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণপুত্র,—অথচ অশ্বারোহী! আসিতে দাও।"

সৈনিক পুরুষ অশ্বারোহীকে আনিতে যাইল।

এই অবসরে আমরা পাঠক মহাশয়কে রাজা টোডরমল্লের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

ক্ষত্রিয়কুলাবতংস টোডরমল্লের মত সর্ব্বগুণবিভূষিত বীরপুরুষ কখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমিতে অনেক পুণ্যাত্মা ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বীরপ্রসূ ক্ষত্রিয়কুলে অনেক সময়ে অনেক বীরপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে অনেক তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু রাজা টোডরমল্ল এই তিন গুণেই বিভূষিত ছিলেন।

হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল, ইতিহাসে তাহার অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। একদা দিল্লীশ্বর আকবরসাহের সহিত পঞ্জাব গমন করিবার সময় দ্রুত ভ্রমণবশতঃ তাঁহার কতকগুলি দেবপ্রতিমা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। টোডরমল্ল প্রাতঃকালে দেবারাধনা না করিয়া কোন কর্ম্মই করিতেন না, জলগ্রহণও করিতেন না। সুতরাং দেবপ্রতিমা নষ্ট হওয়াতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, কোন কার্য্যই করিবেন না ও কয়েক দিন অনাহারে রহিলেন। আকবরসাহ অনেক অনুরোধ করিয়াও তাঁহাকে কোন কার্য্য করিতে লওয়াইতে পারিলেন না। আবুল ফজেল প্রভৃতি আকবরের মুসলমান অমাত্যগণ টোডরমল্লকে "গোঁড়া" হিন্দু বলিয়া সততই নিন্দাবাদ করিত, কিন্তু মহানুভব দিল্লীশ্বর তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। যখন টোডরমল্ল বৃদ্ধ হইলেন, যখন তাঁহার যশে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ হইল, যখন তাঁহার পদ ও গৌরব পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইল, তিনি সেই পদ ও সম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া গঙ্গাতীরে মানবলীলা সম্বরণ করিবেন, এই অভিলাষে দিল্লীশ্বরের অনুমত্যনুসারে রাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হরিদ্বার পর্য্যন্ত গমন করেন। ফলতঃ তাঁহার অপেক্ষা ধর্ম্মপরায়ণ লোক ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তে আর দেখা যায় না।

ক্রমান্বয়ে তিনবার বঙ্গদেশ জয় করিয়া রাজা টোডরমল্ল সাহস ও যুদ্ধকৌশলের যথেষ্ট প্রমাণ দেন। প্রথম বার মনাইম খাঁর ও দ্বিতীয়বার হোসেনকুলীখাঁর অধীনে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারই সাহসে দুইবারই জয়লাভ হয়। এমন কি, প্রথমবার যখন কটকের যুদ্ধে মনাইমখাঁ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন, রাজা টোডরমল্ল অসম্ভব সাহস প্রকাশ করিয়াই জয়লাভ করিয়াছিলেন। তৃতীয়বার, তিনি স্বয়ংই সেনাপতি হইয়া আসিয়াছিলেন। কেবল বঙ্গদেশে নহে, তিনি যেস্থানে যাইয়াছিলেন, সেই স্থানেই অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গুজরাট্ প্রদেশে বিদ্রোহীদিগের সহিত যে সকল যুদ্ধ হয়, তাহাতে টোডরমল্ল সিংহের মত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। ধোলকার-যুদ্ধে সেনাপতি ভিজারখাঁ পলায়নতৎপর হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজা টোডরমল্ল তাঁহাকে নিষেধ করিয়া এরূপ অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রকাশ করিলেন যে, বিজয়লক্ষ্মী অগত্যা তাঁহারই অঙ্কশায়িনী হইলেন। আকবরসাহের অসংখ্য সেনাপতি ছিল, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে টোডরমল্ল অপেক্ষা কোন সেনাপতিই অধিক বীরত্ব ও সাহস দেখাইতে পারেন নাই।

আকবরসাহ সমগ্র ভারতবর্ষের রাজস্ব-স্থিরীকরণ-ভার রাজা টোডরমল্লের উপর ন্যস্ত করেন। সেই দুরূহ কর্ম্ম তিনি যেরূপে সম্পন্ন করেন,

তাহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও রাজনীতি-জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এই অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষ যে যে উপায়দ্বারা বঙ্গদেশের উন্নতিসাধন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে হিন্দুদিগকে পারস্যভাষা শিক্ষা দেওয়াই একটী প্রধান। শাসনকর্ত্তাদিগের ভাষা শিখিলে শাসিতদিগের অবশ্যই উন্নতি হইয়া থাকে; এক্ষণে ইংরাজী শিখিয়া আমাদের যেরূপ উন্নতিসাধন হইতেছে, তৎকালে পারস্য শিখিয়া অনেকাংশে সেইরূপ ফল হইয়াছিল।

রাজা টোডরমল্ল লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবাবস্থাতে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার মাতা দারিদ্র্যজনিত যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করিয়াও শিশুকে অতি যত্নে লালনপালন করেন। শিশুও অল্প বয়সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রকাশ করেন ও প্রথমে কেরাণীর পদে নিযুক্ত হয়েন। স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিবশতঃ এই নীচ কর্ম্ম হইতে তিনি রত্নপরিপূর্ণ আকবরসাহের সভার মধ্যে প্রধান রত্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সমগ্র জীবনচরিত জানিতে চাহেন, তাঁহারা ইতিহাস পাঠ করুন।

তাঁহার বঙ্গদেশে প্রথম ও দ্বিতীয়বার আগমনের বৃত্তান্ত প্রথম ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার তৃতীয়বার আগমনের কথা বিবৃত হইতেছে।

যদিও টোডরমল্ল অনেকবার বিপদাকীর্ণ রণক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি এরূপ বিপজ্জালে কখন বেষ্টিত হয়েন নাই। আরববাহাদুর, শরফুদ্দীনহোসেন, মাসুমী কাবুলী প্রভৃতি অনেক বিদ্রোহী ত্রিংশৎ সহস্র অশ্বারোহী, পঞ্চশত হস্তী ও অনেক রণপোত ও কামান লইয়া মুঙ্গের বেষ্টন করিয়াছিল। টোডরমল্ল যুদ্ধে পারাঙ্মুখ নহেন; কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ সেনাপতিদিগের মধ্যে অনেকেই বিদ্রোহীদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছিল। টোডরমল্ল যুদ্ধক্ষেত্রে বহির্গত হইলেই তাঁহার সৈন্যের অধিকাংশই শত্রুর সহিত যোগ দিবেক, এরূপ আশঙ্কা করিবার বিশেষ কারণ ছিল। বিশেষ মাসুমী ফরঙ্খুদী নামক একজন সেনাপতি সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগ দিবে, রাজা টোডরমল্ল তাহা জানিতেন। এ অবস্থাতে তিনি অগত্যা দুর্গমধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন ও অতিশয় যত্ন ও বুদ্ধিসহকারে দুর্গের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক শত্রুদিগের আচরণ লক্ষ্য করিতেছিলেন। দুর্গের ভিতর প্রচুর খাদ্যও ছিল না, সুতরাং মধ্যে মধ্যে যৎপরোনাস্তি অন্নকষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এই বিপদ্রাশিতে বেষ্টিত হইয়াও রাজা টোডরমল্লের অপূর্ব্ব সাহস ও অসাধারণ

বুদ্ধি এক মুহূর্ত্তের জন্যও হীনজ্যোতিঃ হয় নাই, বরং অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি দিন দিন দুর্গের প্রাচীর দৃঢ়ীভূত করিতে লাগিলেন; দিন দিন সৈনিকদিগকে সাহস দিতে লাগিলেন; দিন দিন আপন নৈসর্গিক বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

সৈনিক পুরুষ সেই অপরিচিত ব্রাহ্মণপুত্রকে রাজার সম্মুখে আনয়ন করিল। তিনি পাঠকের অপরিচিত নহেন। টোডরমল্ল জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবক! তোমার নাম কি?" যুবক উত্তর করিলেন, "ইন্দ্রনাথ শর্ম্মা।"

টোড। "নিবাস কোথায়?"

ইন্দ্র। "নদীয়া জেলার অন্তঃপাতি ইচ্ছাপুর গ্রামে।"

টোড। "তোমার প্রয়োজন কি?"

ইন্দ্র। "অধুনা আপনার অধীনে সৈনিকের কর্ম্ম করা।"

রাজা টোডরমল্ল কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধভাবে যুবকের প্রতি তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিলেন। যুবকের আকারে উদারভাব ভিন্ন কিছু-মাত্র লক্ষিত হইল না। ক্ষণেক পর রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি ইহার অগ্রে কোথায় কতদিন কর্ম্ম করিয়াছিলে?"

ইন্দ্র। "অদ্যই প্রথম অসি হস্তে করিলাম," বলিয়া কোষ হইতে একবার অসি বাহির করিয়া পুনরায় কোষে রাখিলেন।

সাদীক খাঁ নামক সেনাপতি বলিলেন, "যুবক! তুমি যেরূপ অসি ধারণ করিলে, আমার স্থির বিশ্বাস, যুদ্ধে তোমার হস্তে অসির অপমান হইবে না।"

তারসন খাঁ নামক অপর একজন সেনাপতি মৃদুস্বরে রাজাকে বলিলেন, "যুবক যে অদ্য প্রথমে অসি ধারণ করিয়াছে, আমার কথনই বিশ্বাস হই-তেছে না। মহারাজ! এ শত্রুদিগের গুপ্ত চর,—ইহাকে জল্লাদ-হস্তে অর্পণ করুন।"

রাজা টোডরমল্ল কাহারও কথায় উত্তর না দিয়া বার বার যুবকের উপর তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহার আকৃতি বা মুখভঙ্গীতে কোন-রূপ বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাইলেন না। বিশেষ পরীক্ষার জন্য পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

"তুমি কখনও সৈনিকের কার্য্য কর নাই, তুমি ব্রাহ্মণতনয়, তবে এ কর্ম্ম প্রার্থনা করিতেছ কি জন্য?"

ইন্দ্র। "আমার একটী ভিক্ষা আছে, আপনাকে প্রভুভক্তি প্রদর্শনে সন্তুষ্ট করিতে পারি, তবে সে ভিক্ষা করিব, এক্ষণে সে ভিক্ষা করা বৃথা হইবে।"

তারসন খাঁ পুনরায় বলিলেন, "মহারাজ! দেখুন আমার কথা সত্য কি না, আপন কার্য্যের কারণ দর্শাইতে অস্বীকৃত হইতেছে।"

ইন্দ্রনাথের উত্তরে রাজা টোডরমল্লের অন্যরূপ বিশ্বাস হইল। তিনি ভাবিলেন গুপ্তচরের কথায় বা আপন কার্য্যের কারণ দর্শাইতে কখন ক্রটী হয় না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

"শত্রুরা আমাদের সৈন্যমধ্যে বিদ্রোহ উত্থাপন করিবার জন্য অনেক চর প্রেরণ করিতেছে। তুমি তাহাদিগের একজন নহ, আমি কিরূপে জানিব?"

ইন্দ্র। "ভদ্র ব্রাহ্মণপুত্রের সত্য কথার উপর বোধ হয় আপনি নির্ভর করিতে পারেন।"

টোড। "অনেক সময় অভদ্র লোকও ভদ্রলোকের বেশ ধারণ করে; অনেক সময় ভদ্রবংশীয় লোকও কপটাচারী হয়।"

ইন্দ্র। "আমি অনেক পাপ করিয়াছি, কপটাচরণ কখন করি নাই, আমাদের বংশে সে দোষ নাই।" ক্রোধে ইন্দ্রনাথের স্বর বদ্ধ হইল।

সাদীক খাঁ বলিলেন, "মহারাজ! এ লোক যদি বিশ্বাসঘাতক হয়, তাহা হইলে আমি দায়ী হইব, আর কি বলিব। আমাদিগের শিবিরে মাসুমী ফরঙ্খুদীর ন্যায় লোক আছে,—আর আপনি ইহাকে লইতে সন্দেহ করিতেছেন?"

রাজা ওষ্ঠের উপর একটী অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া সাদীকখাঁর উপর তিরস্কারদৃষ্টি করিলেন। সাদীক খাঁ লজ্জিত হইলেন। রাজা পুনরায় ইন্দ্রনাথকে বলিলেন—

"যুবক! তোমার কথা উদারচেতা বীরপুরুষের ন্যায়, কিন্তু অনেক সময় গভীর খলতা বাহ্যিক ঔদাস্য অবলম্বন করে।"

ইন্দ্রনাথের মুখ ক্রোধে রক্তিমা ধারণ করিল, চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "যদি আপনার নিকট কপটাচরণ করিবার জন্য আসিয়াছি বিশ্বাস হয়, তবে বিদায় দিন, আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাই।"

টোড। "যাও।"

ইন্দ্রনাথ প্রস্থান করিলেন। টোডরমল্ল অবিলম্বে তাঁহাকে পুনরায় ডাকাইয়া সম্মানপুরঃসর অশ্বারোহীর পদে নিযুক্ত করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অদৃষ্টপূর্ব্ব বিপদ।

Bruttus.—Do you know them ?
Lucius.—No Sir : their hats are plucked about their ears.
And half their faces buried in their cloaks,
That by no means I may discover them
By any mark of favour.
Bruttus.—Let them enter,
They are the faction. O Conspiracy !
Sham'st thou to shew thy dangerous brow by night,
When evils are most free ? O then by day
Where wilt thou find a cavern dark enough
To hide thy monstrous visage ?

Shakespeare.

এই সম্মান প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রনাথ দিনে দিনে অতি সতর্কতা ও প্রভুভক্তি সহকারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। যখন যে কার্য্য করিতে রাজা আদেশ দিতেন, ইন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্য করিতেন। আপন কায়িক পরিশ্রম বা বিপদ্ বা সময় অসময় কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। একদা রাজার আদেশানুসারে ছদ্মবেশে শত্রুর শিবির পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়া রাজাকে সমস্ত সমাচার জ্ঞাত করাইলে রাজা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রনাথের পদ-বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে পঞ্চশত অশ্বারোহীর সেনানী করিলেন। পরে কথা-চ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"বৎস ইন্দ্রনাথ, তুমি যে এই বয়সে এরূপ নিঃশঙ্ক হইয়াছ, তোমার কি জীবনে কোন সুখ নাই যে জীবন তুচ্ছ জ্ঞান কর।"

ইন্দ্র। "মহারাজ! যেদিন সৈনিক হইলাম, সেই দিনই রাজকার্য্যে জীবন সমর্পণ করিয়াছি, তবে যদি এ যুদ্ধের পরও জীবিত থাকি, তবে সে আপনার আশীর্ব্বাদে আর পিতার পুণ্যবলে।"

টোড। "তোমার পিতা জীবিত আছেন?"

ইন্দ্র। "আছেন।"

টোড। "তোমার ভ্রাতা ভগিনী কয়জন?"

ইন্দ্র। "আমার একজন জ্যেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহার কাল হইয়াছে, এক্ষণে আমিই পিতার একমাত্র সন্তান জীবিত আছি।"

টোডরমল্লের মুখ গম্ভীর হইল। বলিলেন, "বৎস, যদি এই যুদ্ধে তোমার নিধন হয়, তবে তোমার পিতার কি মনঃপীড়া হইবে! আমারও পুত্র আছে, সেই জন্যই এই ভাবনা আসিতেছে। ধারুর বয়ঃক্রম তোমারই মত, তাহার সাহস তোমারই মত, তোমারই মত সে বিপদ্‌কে তুচ্ছ জ্ঞান করে; মরণকে ভয় করে না। যদি সে যুদ্ধে নিধন প্রাপ্ত হয়, তাহার পিতার হৃদয়ে বজ্রাঘাত হইবে। তথাপি রাজকার্য্যে মরণাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় আর কি আছে? তোমার পিতাকে লিখিও যে ধারুর পরমায়ু শেষ হইলে সে যুদ্ধেই নিহত হয়, ইহা অপেক্ষা টোডরমল্লের বাঞ্ছনীয় আর কিছুই নাই।"

ইন্দ্রনাথ নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। টোডরমল্ল আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতা ভিন্ন তোমার আর কে প্রিয় বান্ধব আছেন?"

ইন্দ্রনাথের সরলার কথা মনে আসিল। লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন। একবার ভাবিলেন, এই সময়ে সরলার কথা সমস্ত অবগত করাইয়া বিচার প্রার্থনা করি; সে কথা মুখে আনিতেছিলেন, এমন সময়ে টোডরমল্ল অন্য কথা আনিলেন, ইন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য সফল হইল না।

ক্ষণেক পর রাজা প্রস্থান করিলেন, ইন্দ্রনাথও নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আপন শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

যেদিন এইরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, সেই দিনই সেনাদিগের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের বড় কষ্ট হইয়াছিল। অনেক সৈনিক পুরুষ একেই টোডরমল্লের বৈরাচরণ করিবার মানস করিয়াছিল, তাহাতে আবার এই কষ্ট হওয়াতে সুযোগ পাইবার আশা করিয়াছিল; কিন্তু রাজা টোডরমল্ল এরূপ সতর্কতা ও বুদ্ধিসহকারে কার্য্য করিতে লাগিলেন, যে উপরি উক্ত সৈনিকগণ আপন স্বার্থসাধনের কোন সুযোগই পাইল না। রাজা টোডরমল্ল দিন দিন সেনাদিগকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন; দিল্লী হইতে অর্থ আসিলেই সেনাদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া তাহাদিগকে তুষ্ট করিতে লাগিলেন, সদর্পে সকলের সম্মুখেই বলিতেন,—"আমরা কখনই জঘন্য পাঠানদিগকে জয়লাভ করিতে দিব না, দিল্লীশ্বরের অবশ্যই জয় হইবে।" সেনাপতির এইরূপ আশ্বাসবাক্য শুনিয়া সৈন্যগণ উৎসাহপরিপূর্ণ হইত। বিরুদ্ধাচারী সৈনিকগণ শিবিরমধ্যে বিদ্রোহ ঘটাইবার কোন সুযোগই না পাইয়া একে একে শত্রুর নিকট পলায়ন করিবার মানস করিল।

শত্রুরাও নিতান্ত জঘন্য বা হীনবল নহে। প্রথম পরিচ্ছেদেই বলা হইয়াছে, বঙ্গদেশের সুবাদার মজফর খাঁর নিধনপ্রাপ্তির পর সমস্ত বঙ্গদেশ পাঠানসৈন্যে প্লাবিত হয়। যে দেশ টোডরমল্ল ক্রমান্বয়ে দুইবার জয়

করিয়াছিলেন, তাহাতে দিল্লীশ্বরের কণামাত্র স্থল রহিল না। সেই সমগ্র সৈন্য একীকৃত হইয়া মুঙ্গেরের নিকটে আসিয়াছিল ও দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল। সাগরতরঙ্গের মধ্যে পর্ব্বতশিখরের ন্যায় সেই পাঠান-সৈন্যের সম্মুখে রাজা টোডরমল্ল মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিতেছিলেন,—কিরূপে সেই ক্ষুধাক্লিষ্ট বিদ্রোহোন্মুখ সৈন্য লইয়া সেই শত্রুরাশিকে পরাজয় করিবেন, তাহা টোডরমল্লের বিশ্বাসী সেনাপতিগণও অনুভব করিতে পারিতেন না। কেবলমাত্র রাজা টোডরমল্লই নিঃশঙ্কচিত্তে এই বিপদ্‌রাশি সত্ত্বেও বিজয়-লাভের স্থিরসঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বিপদ্‌রাশিতে মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার স্থৈর্য্যের বৈলক্ষণ্য ঘটাইতে পারে নাই।

ইন্দ্রনাথ শিবিরে আসিয়া নানা বিষয়ের চিন্তা করিতেছিলেন, এমত সময়ে এক ভৃত্য আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। পত্র খুলিয়া একবার, দুইবার, তিনবার পাঠ করিলেন; মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না। পত্রে এইরূপ লিখিতছিল—

"তোমার বুদ্ধিকৌশল দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষে যাহাকে কেহ কৌশলে পরাস্ত করিতে পারে নাই, তুমি তাহার চক্ষে ধূলি দিয়াছ। আমরাও ঐ পথ অবলম্বন করিব, কেননা যে পতনোন্মুখ গৃহ অগ্রে ত্যাগ করে, সেই বুদ্ধিমান। অদ্য এক প্রহর রজনীতে শ্মশানঘাটে দেখা হইবে।"

এ পত্রের কিছুই অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। "ভারতবর্ষে যাহাকে কেহ কৌশলে পরাস্ত করিতে পারে নাই"—সে কে? বোধ হয় রাজা টোডরমল্ল, কিন্তু তাহার চক্ষে ধূলা কে দিয়াছে? পতনোন্মুখ গৃহ কি? ইন্দ্রনাথের বোধ হইতে লাগিল যে, কোন বিদ্রোহীকর্ত্তৃক এই পত্র লিখিত হইয়াছে,—শ্মশানঘাটে যাওয়া কি কর্ত্তব্য? ক্ষণেক বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, যাওয়ায় কোন হানি নাই, বরং কোন গুপ্ত বিষয়ের সন্ধান পাইতেও পারি। নিরূপিত সময় শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে কেহই নাই, অসিই তাঁহার একমাত্র সহায়।

রজনী ঘোর তমসাচ্ছন্ন, আকাশ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন। নীল মেঘ আকাশে উড়িতেছে; এক এক খানি করিয়া সেই মেঘ পশ্চিম দিকে রাশীকৃত হই-তেছে; সেই পশ্চিম দিক্ হইতে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ দেখা দিতেছে; বিদ্যুৎ-আলোকে শ্মশানের ভয়ানক বস্তু সকল এক এক বার দেখা যাইতেছে। কোথাও কোথাও সম্প্রতি শবদাহ হইয়াছে, ভস্মরাশির মধ্যে অগ্নি এক এক বার দেখা যাইতেছে; কোন স্থানে বা শব এখনও দাহ হইতেছে; উজ্জ্বল অগ্নিশিখা চারিদিকের নিবিড় অন্ধকারকে কিঞ্চিৎ উদ্দীপ্ত করিতেছে। সেই

আলোক ও অন্ধকারের দ্বন্দ্বে নানারূপ অপরূপ ছায়া দেখা যাইতেছে, নিকটস্থ বৃক্ষরাশির মধ্য দিয়া বায়ুবেগবশতঃ নানারূপ অদ্ভুত শব্দ শ্রবণ-গোচর হইতেছে। সেই ছায়া দেখিয়া, সেই পৈশাচিক শব্দ শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রনাথের স্বভাবতঃ সাহসী হৃদয়ও এক এক বার স্তম্ভিত হইতেছিল। যত পদচারণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার শরীর ততই কণ্টকিত হইতে লাগিল। কখন কখন দূরে যেন ভয়ানক আকৃতি দেখিতে লাগিলেন, অসি নিষ্কাশিত করিয়া সেই দিকে গমন করিয়া কখনও বা দেখেন ধূমরাশি উত্থিত হইতেছে, কখনও বা বোধ হয় যেন সেই আকৃতি ধীরে ধীরে যাইয়া বৃক্ষের অন্ধকারে লীন হইতেছে। গগনমণ্ডল ক্রমশঃই গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আসিল, বায়ু ক্রমশঃই শ্মশান ও বৃক্ষের উপর দিয়া ভীষণতর শব্দ করিয়া বহিতে লাগিল; গঙ্গার তরঙ্গ ক্রমশঃই ভয়ঙ্কর হইতে লাগিল। আকাশে নক্ষত্র মাত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছে না; দূরে শিবাগণ মুহুর্মুহুঃ বিকট শব্দ করিতেছে; যেন দূর হইতে প্রেত ও পিশাচের অট্টহাসি শ্রুত হইতেছে।

যেদিকে নিবিড় জঙ্গল ছিল, সেই দিকে যেন বোধ হইল, দুইটা ভীষণ অকৃতি অন্ধকারে দেখা যাইতেছে। ইন্দ্রনাথ তাহা প্রথমে গ্রাহ্য করিলেন না; কিন্তু যতবার সেই দিকে নয়নপাত করেন, ততবারই সেই ভীষণ আকৃতি দেখিতে পাইলেন। আর সহ্য করিতে না পারিয়া ইন্দ্রনাথ অসি নিষ্কাশিত করিয়া সেই দিকে আগমন করিলেন; বোধ হইল, যেন সেই আকৃতিদ্বয় সহসা অদৃশ্য হইয়া যাইল। ইন্দ্রনাথ সে দিক্ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, বোধ হইল, যেন জঙ্গলের ভিতর হইতে অট্টহাসি শুনিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ আবার ফিরিয়া দেখিলেন, সেই দুই ভীষণ আকৃতি দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

"ভগবান্ সহায় হউন!" এই কথা বলিয়া ইন্দ্রনাথ অসিহস্তে ধীরে ধীরে সেই দিকে পুনরায় গমন করিলেন। অতিশয় সতর্কতার সহিত আকৃতিদ্বয়ের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জঙ্গলের নিকটে আসিতে না আসিতে আবার সেই অকৃতি-দ্বয় অদৃশ্য হইল। আবার দূর হইতে সেই পৈশাচিক অট্টহাসশব্দ শ্রুত হইল।

"ভগবান্ সহায় হউন!" বলিয়া সেই জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেস্থানে এরূপ নিবিড় অন্ধকার যে, চারি হস্ত দূরে কোন দ্রব্যই লক্ষিত হয় না। ইন্দ্রনাথের সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়াছে; ললাট হইতে ঘর্ম্ম বহির্গত হইতেছে। সর্ব্ব অঙ্গ, হস্তের অসি পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে।

সেই হাসির শব্দ লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার শরীরের উপর যেন কে হস্ত স্থাপন করিল।

ইন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিলেন, প্রেত নহে, তাহারা দুই জন ছদ্মবেশী মনুষ্য। তাহারা ইঙ্গিত করিয়া ইন্দ্রনাথকে সঙ্গে সঙ্গে আসিতে বলিল। ইন্দ্রনাথ তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সেই দুই জন মনুষ্যের সহিত অনেকক্ষণ নীরবে যাইতে লাগিলেন। চতুঃপার্শ্বে নিবিড় অঙ্গল ও নিবিড় অন্ধকার; নিঃশব্দে তিন জনে সেই অন্ধকারময় জঙ্গলের ভিতর দিয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে গঙ্গাতীরে এক নিভৃত স্থানে উপবেশন করিলেন। তখন সেই অপরিচিত ব্যক্তিদ্বয় মুখমণ্ডল হইতে আবরণ তুলিয়া লইল, সেই সময়ে বিদ্যুৎ দেখা দিল। বিদ্যুৎ-আলোকে ইন্দ্রনাথ তাহাদিগকে চিনিতে পারিলেন। হুমায়ুন ও তর্খান নামক রাজা টোডরমল্লের অধীনস্থ দুই জন সেনাপতি।

ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"এত রাত্রিতে এই ভয়ঙ্করবেশে এস্থানে আপনারা কি করিতেছেন ?"

হুমায়ুন কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "সেনানী ইন্দ্রনাথের সাহস পরীক্ষা করিতেছিলাম।"

ইন্দ্রনাথ ঈষৎ রুষ্ট হইয়া উত্তর দিলেন, "আমি আপনাদিগের নিকট পরীক্ষা দিতে যদি অসম্মত হই।"

হুমায়ুন সেইরূপ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "তাহা হইলে বোধ করিব, আমরা যে অসমসাহসিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি, সেনানী ইন্দ্রনাথ তাহা সমাধা করিতে অক্ষম।"

ইন্দ্রনাথ সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, "কার্য্যকালে ইন্দ্রনাথ অক্ষম কি সক্ষম, তাহা অন্য লোক বিবেচনা করিবেন। ভাল, শ্মশানভূমিতে পিশাচের সহিত যুদ্ধ করিলে কি সাহসের পরিচয় পাওয়া যায় ? আপনারা পিশাচের রূপধারণ করিয়া আমাকে ভয় প্রদর্শন করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন কিজন্য ?"

হুমায়ুন আবার সেইরূপ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "সেনানী ইন্দ্রনাথের যে অসাধারণ সাহস আছে, তাহা আমাদের শিবিরে অবিদিত নাই। তাঁহার পৈশাচিক সাহস আছে কি না, তাহারই পরীক্ষা করিতেছিলাম। পৈশাচিক কার্য্যে নিযুক্ত হইলে পৈশাচিক সাহস আবশ্যক হয়।"

ইন্দ্রনাথ অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পৈশাচিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি ?"

হুমায়ুন বলিলেন, "তাহা কি জানেন না? উপহাস করিতেছেন কেন? আপনি যে কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছেন, আপনি গূঢ়মন্ত্রণায় ও চমৎকার কৌশলে যে কার্য্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, সে কার্য্য কি আবার আপনি জানেন না? আপনার কৌশল ও বুদ্ধি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি, রাজা টোডরমল্লকে কেহ বঞ্চনা করিতে পারে নাই, আপনি তাহা করিয়াছেন। আপনি চিরজীবী হউন, একদিন বঙ্গদেশের গৌরবস্থল হইবেন।"

ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া রহিলেন। তর্খান বলিতে লাগিলেন—

"যথার্থই হুমায়ুন ও আমি কতবার অন্তরালে আপনার কৌশলের ধন্যবাদ করিয়াছি। শিবিরে আমাদের মত অনেক জনই বিদ্রোহোন্মুখী সেনানী আছেন। ত্রিংশৎ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি মাসুমী ফরাঙ্খুদীও বিদ্রোহতৎপর। কিন্তু রাজা টোডরমল্ল আমাদিগের সকলের অন্তরের ভাব জানিয়াছেন, আমাদিগের সকলেরই উপর এরূপ সতর্কতার সহিত দৃষ্টি রাখিয়াছেন যে, আমরা কামনা সিদ্ধ করিতে পারি নাই। কিন্তু আপনি কি কুহকে, কি মহাকৌশলযন্ত্রে যে রাজা টোডরমল্লকে অন্ধ করিয়াছেন, কিছুই বুঝিতে পারি নাই। ধন্য আপনার বুদ্ধিবল!"

ইন্দ্রনাথ অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আমি যদি আপনাদিগের কথার বিন্দুবিসর্গও বুঝিয়া থাকি।"

তর্খান পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "আর উপহাস করিতেছেন কেন? আমরা কতবার শিবিরে সমবেত হইয়া আপনার প্রশংসা করিয়াছি; কতবার মদ্যপান করিতে করিতে আপনার জয়ধ্বনি করিয়াছি; কতবার মনে মনে অঙ্গীকার করিয়াছি যে, যেদিন আমরা বিদ্রোহী হইব, সেদিন ইন্দ্রনাথ আমাদের বিদ্রোহ-সেনাপতি হইবেন।"

তর্খান আরও বলিতেছিলেন, কিন্তু ইন্দ্রনাথ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—

"আমি বিদ্রোহী নহি, আপনারা যদি মনে করিয়া থাকেন, আমি গুপ্তচর, কি কপটাচারী, কি বিদ্রোহকামনা করিয়া রাজা টোডরমল্লের অধীনে কর্ম্ম করিতেছি, তাহা হইলে আপনারা ঘোর ভ্রান্তিতে নিমগ্ন হইয়াছেন। আর আপনারা যদি বিদ্রোহী হয়েন, তবে আমাকে বিদায় দিন্। আমার সহিত আপনাদিগের কোন সম্পর্ক নাই। আমি এইক্ষণেই রাজা টোডরমল্লকে সর্ব্ববৃত্তান্ত অবগত করাইব। কুক্ষণে আমার হস্তে আপনাদিগের লিপি পড়িয়াছিল।"

হুমায়ুন দিউয়ানা ও তর্খান ফার্মিলীর মুখ গম্ভীর হইল, উভয়েই ভাবিতে লাগিল, "কি আমরা এতদিন কি ভ্রান্ত ছিলাম, মাসুমী ফরাঙ্খুদী কি এই

হিন্দুর অন্তর বিশেষ জানেন না ?" উত্তরেই কোষ হইতে খড়্গ বহির্গত করিবার উদ্যম করিলেন। ইন্দ্রনাথও শস্ত্রবিষয়ে অপটু ছিলেন না, কোষ হইতে অসি বহির্গত করিলেন। এমত সময়ে হুমায়ুন সহসা একটু হাসিয়া বলিলেন,—

"বুঝিয়াছি, আপনি বোধ হয়, এখনও, আমাদিগকে বিশ্বাস করেন নাই, এইজন্য আমাদিগের নিকট বিদ্রোহ-মন্ত্রণা ব্যক্ত করিতে চাহেন না। তাহা সম্ভব বটে, এতদূর মন্ত্রণা গোপন রাখিবার ক্ষমতা না থাকিলে রাজা টোডরমল্লকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না। কিন্তু আমাদিগের নিকট অবিশ্বাসের কিছুই কারণ নাই ; আমাদিগের নিকট মন্ত্রণা গুপ্ত করিবার আবশ্যক নাই ; আপনি একর্ম্মে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বাবধি আমরা বিদ্রোহোন্মুখ। এই দেখুন, পাঠানদিগের নিকট হইতে আমরা কয়েকখানি পত্র পাইয়াছি।"

ইন্দ্রনাথ ক্রোধে ও বিস্ময়ে অন্ধ হইলেন, বলিলেন, "পামর মুসলমান! কাপুরুষ বিদ্রোহি! তোর পাপের সমুচিত দণ্ড দিব। আমার ইচ্ছা হইতেছে, খড়্গাঘাতে তোর শিরশ্ছেদন করি,—কিন্তু শত্রুর সহিত অন্যায় যুদ্ধ করিব না, তোর অসি বাহির কর।"

দুইজনে তুমুল সংগ্রাম হইল। অসির ঝনঝনাশব্দ সেই নৈশ অন্ধকার বনমধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল ; গঙ্গাতরঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ইন্দ্রনাথ হুমায়ুন অপেক্ষা অনেক বলিষ্ঠ ছিলেন ও অল্প দিনমধ্যে চমৎকার অস্ত্রচালন শিক্ষা করিয়াছিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে হুমায়ুনের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইল ; রক্তে শরীর ভাসিয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে হুমায়ুন ভূতলশায়ী হইলেন। তখন ইন্দ্রনাথ সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পামর! এক্ষণে রাজা টোডরমল্লের নিকট যাইয়া কি ক্ষমা প্রার্থনা করিবি? না এই মুহূর্ত্তে তোর শিরশ্ছেদন করিব?"

এ প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্ত না হইতেই তর্খান হঠাৎ পশ্চাদ্দেশে আসিয়া ইন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিল।

যখন প্রথমে ইন্দ্রনাথ ও হুমায়ুনের সহিত যুদ্ধ হয়, তখন তর্খান কিছু দূরে দণ্ডায়মান ছিলেন। প্রথমেই যুদ্ধ এরূপ ভয়ঙ্কর বেগে আরম্ভ হইয়াছিল যে, তর্খান ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন, কিন্তু সে কেবল মুহূর্ত্তের জন্য। যখন দেখিলেন, হুমায়ুন ভূতলশায়ী হইয়াছেন, তখন একেবারে লম্ফ দিয়া ইন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিলেন। ইন্দ্রনাথ ফিরিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিতে করিতে হুমায়ুন উঠিয়া পুনরায় অসিহস্ত

হইলেন। তিনি নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন, কিন্তু একেবারে অক্ষম হয়েন নাই। সুতরাং দুই জনে একেবারে ইন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিলেন।

এবার ইন্দ্রনাথের বিষম সঙ্কট উপস্থিত। দুই জনের সহিত এক জনের অসিযুদ্ধ করা সম্ভবে না। বিশেষতঃ তর্খান ও হুমায়ুন অসিচালনে নিতান্ত অপটু ছিলেন না। কেবল হুমায়ূনের কাতরতা ও রজনীর অন্ধকার বশতঃই কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা।

ইন্দ্রনাথ এ সকল চিন্তায় ভীত হইলেন না। এ সকল চিন্তা করিবার তাঁহার অবসর ছিল না। তাঁহার অদ্ভুত অস্ত্রশিক্ষাবশতঃ অনেকক্ষণ একাকী দুই জনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; আশ্চর্য্য কৌশলক্রমে একবার ইহাকে একবার উহাকে প্রহার করেন; তাঁহারাও প্রহৃত হইলেই কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ যাইয়া পুনরায় সম্মুখীন হয়েন। হুমায়ুন যেরূপ কাতরতার সহিত অস্ত্রচালন করিতেছিলেন, তাহাতে তিনি যে আর অধিকক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারিবেন, এমন বোধ হইল না। তিনি যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেই ইন্দ্রনাথের জয়।

কিন্তু সে দূরের কথা। যতক্ষণ হুমায়ুন না ক্ষান্ত হয়েন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করা ইন্দ্রনাথের পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিল। সহস্র কৌশল থাকাতেও তিনি একাকী দুই জনের সহিত সমযুদ্ধ করিতে পারিলেন না,—কেহই পারে না। অস্ত্রাঘাতে তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল; রুধিরে অঙ্গ ও বস্ত্র প্লাবিত হইতে লাগিল। শরীর রক্ষার্থ ক্রমশঃ ধীরে ধীরে এক এক পা করিয়া পশ্চাতে আসিতে লাগিলেন। রুধিরাক্ত কলেবরে সিংহবীর্য্য প্রকাশ করিতে করিতে এক এক পা করিয়া পশ্চাতে আসিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতেছে; সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছে; ক্রোধে অধর দংশন করাতে অধর হইতে শোণিত নির্গত হইতেছে; সর্ব্ব অঙ্গ ও বস্ত্র রক্তে প্লাবিত, নয়নে নিমেষমাত্র নাই; অস্ত্রচালনে মুহূর্ত্তমাত্র অবকাশ নাই; সমস্ত অবয়ব দেখিলে বোধ হয়, যেন ক্রোধ মূর্ত্তিমান হইয়া রক্তাক্ত-কলেবরে যুদ্ধ করিতেছে।

বিপদ্ একাকী আইসে না। এই বিপত্তির উপর ইন্দ্রনাথের অন্য বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হইল। হুমায়ুন ক্রমে অবসন্ন শরীর হওয়াতে, শেষে তর্জ্জন করিয়া একবার শেষ আক্রমণ করিলেন। তর্খানও সেই অবসরে সতেজে আক্রমণ করিলেন। এক জন দক্ষিণ দিক্ হইতে ও অন্য জন বাম দিক্ হইতে আক্রমণ করিলেন। দুই জনের সমকালীন সতেজ আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রনাথ হঠাৎ পশ্চাৎ যাইবার মানস

করিলেন, ভাবিলেন হঠাৎ পশ্চাৎ যাইলে তাঁহার দুইজন শত্রু পরস্পরের উপর যাইয়া পড়িবে। তখন তিনি গঙ্গার তীরে দণ্ডায়মান ছিলেন, লম্ফ দিয়া যেই পশ্চাতে যাইবেন, অমনি গঙ্গাসলিলে নিপতিত হইলেন। "মাতঃ পৃথিবি! এই বিপত্তিকালে তুমিও স্থান দিলে না।" এইরূপ মনে ভাবিতে ভাবিতে গঙ্গাসলিলে মগ্ন হইলেন। তর্খান ও হুমায়ুন ইন্দ্রনাথের মৃত্যু স্থির করিয়া আপন কার্য্যে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অদৃষ্টপূর্ব্ব উদ্ধার।

Prisoner! pardon youthful fancies;
Wedded? If you *can*, say no!
Blessed is and be your consort.
Hopes I cherished let them go!

Wordsworth.

হুমায়ুন ও তর্খান যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা বড় মিথ্যা নহে; ইন্দ্রনাথ যেরূপ আহত হইয়াছিলেন, তাহাতে উত্থানশক্তি ছিল না। সন্তরণ করা দূরে থাক, উচ্চ পাড় হইতে পড়িয়া একেবারে অচেতন হইলেন। ভাগ্যক্রমে নিকটবর্ত্তী একখানি নৌকায় একটী যুবক জাগরিত ছিলেন। মনুষ্যকে জলে পড়িতে দেখিয়া তিনিও জলে ঝাঁপ দিয়া কথঞ্চিৎ মৃতপ্রায় ইন্দ্রনাথের প্রাণ বাঁচাইলেন।

সেই নৌকার মাঝি মাল্লা সকলেই সুপ্ত ছিল। সেই যুবক একাকী বাহিরে বসিয়া মেঘের ভয়াবহ সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতেছিলেন। বিদ্যুৎ ও বাত্যায় তাঁহার হৃদয়ে যেন আনন্দ উদ্রেক করিতেছিল; তাঁহার অন্তরের বিদ্যুৎ ও বাত্যা এই প্রকৃতির গর্জ্জন শুনিয়া যেন কিঞ্চিৎ পরিমাণে শান্ত হইতেছিল।

অচেতন ভাসমান শরীরকে জলের উপর টানিয়া লইয়া যাওয়া বড় কঠিন নহে,—যুবক ধীরে ধীরে ইন্দ্রনাথকে নৌকার দিকে লইয়া চলিলেন। শেষে আপনি নৌকায় উঠিয়া ইন্দ্রনাথকে তুলিলেন।

ইন্দ্রনাথের শরীরে রক্ত দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। অতিশয় যত্নসহকারে তাঁহার শরীর ধৌত করিয়া শুষ্কবস্ত্র পরিধান করাইলেন। তাহার পর সেই অস্ত্রাঘাতগুলি একে একে পরীক্ষা করিয়া ঔষধি দিতে লাগিলেন;

দেখিলেন, যদিও অনেকস্থানে ক্ষত হইয়াছে তথাপি কোন ক্ষতই গভীর বা সাঙ্ঘাতিক নহে। তাঁহার স্পষ্টই বোধ হইল, সমস্ত রাত্রি উত্তম নিদ্রা হইলে প্রাতঃকালে শরীরে অধিক বেদনা থাকিবে না।

সমস্ত রাত্রি উত্তম নিদ্রা হইল। প্রাতঃকালে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ইন্দ্রনাথ দেখিলেন, পার্শ্বে এক পরম সুন্দর যুবক বসিয়া রহিয়াছেন। অনিমেষ-লোচনে তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিতেছেন, ইন্দ্রনাথের বোধ হইল যেন এই সুপুরুষকে কখন দেখিয়াছেন, কিন্তু কোথায় দেখিয়াছেন, স্মরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন,—

"যুবক! আপনি আমার প্রাণ দিয়াছেন, আপনি বোধ হয় আমাকে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, আপনি কে বলুন, কি করিলে এ ঋণ শোধ করিতে পারিব বলুন? আপনি আমার জীবনরক্ষা করিয়াছেন, রাজা টোডরমল্ল কিছুই দিতে অস্বীকৃত হইবেন না।"

যুবক উত্তর করিলেন, "আপনার নিকট অন্য পুরস্কার চাহি না কেবল একটী প্রার্থনা আছে। কিন্তু ইন্দ্রনাথ, আমাকে কি ইহার মধ্যে বিস্মৃত হইয়াছ?" এই কথা বলিয়া বক্তা একটু হাসিলেন।

সে সুমিষ্ট অধরে সে সুমিষ্ট হাসি এখনও ইন্দ্রনাথ বিস্মৃত হয়েন নাই; সে কোকিলনিন্দিত কণ্ঠধ্বনি তিনি এখনও ভুলেন নাই। কাতরতা সত্ত্বেও একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন,—

"রমণীরত্ন! ভিক্ষারিণি! আমি জীবিত থাকিতে তোমাকে বিস্মৃত হইব না। কিন্তু এ পুরুষবেশ"—

ইন্দ্রনাথ আরও কিছু বলিতেছিলেন, কিন্তু ভিক্ষারিণী (পাঠক মহাশয়ের পূর্ব্বপরিচিতা বিমলা) ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলী স্থাপন করিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"আমি স্ত্রীলোক এই নৌকায় কেহ জানে না, জানিলে বিপদ হইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে শ্রবণ করুন।"

ইন্দ্রনাথ বিস্ময়ে প্রায় হতজ্ঞান হইয়া সেই রমণীর বদনমণ্ডলের উপর চাহিয়া রহিলেন। সে বদনমণ্ডলের সহসা ভাবান্তর হইল। যে সুহাসিতে চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বলতর হইয়াছিল, ওষ্ঠদ্বয় মিষ্টতর হইয়াছিল, সে সুহাসি শুকাইয়া যাইয়া মুখ অতিশয় গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। অতি গম্ভীর স্বরে বিমলা বলিতে লাগিলেন,—

"ইন্দ্রনাথ! মহেশ্বরমন্দিরে আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, আমার দ্বিতীয় একটী ভিক্ষা আছে। এই ক্ষণেই আমার ভিক্ষা দান করিতে আপনি

প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সে ভিক্ষা এই, আপনি আমাকে জন্মের মত বিস্মৃত হউন।”

ইন্দ্রনাথ চমকিত হইয়া নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। বিমলা আবার বলিতে লাগিলেন।

“সে ভিক্ষা এই যে, আমি কখন প্রেমদৃষ্টিতে আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়াছি, তাহা জন্মের মত বিস্মৃত হউন; আমি কখন আপনার দেবমূর্ত্তিকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছি, তাহা জন্মের মত বিস্মৃত হউন।”

ইন্দ্রনাথ এখনও বিস্মিত ও নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। তাঁহার প্রতি রমণীর প্রেম সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা ইন্দ্রনাথ অগ্রেই দুই একবার অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু এতদূর হইয়াছে তাহা জানিতেন না। আর এক্ষণই বা সেই প্রেম উচ্ছেদ করিবার যত্ন করিতেছেন কেন? ইন্দ্রনাথ কিছু স্থির করিতে না পারিয়া নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। বিমলা আবার বলিতে লাগিলেন—

“আর আমি অভাগিনী! আমার হৃদয়েও আপনার মূর্ত্তি গভীরাঙ্কিত হইয়াছে তাহাও উৎপাটিত করিতে যত্ন করিব,—না পারি হৃদয় উৎপাটন করিয়া জাহ্নবীজলে নিক্ষেপ করিব।”

ইন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার এ অভিপ্রায় কিজন্য হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিতে পারি?”

বিমলা উত্তর করিলেন, “আমি আপনাব প্রণয়ের পত্নী হইব মানস ছিল, প্রণয়ে কাহারও সপত্নী হইবার আকাঙ্ক্ষা করি না। বিধাতা আমার ললাটে দুঃখ লিখিয়াছেন, অন্যের সুখের পথে কাঁটা দিব কি জন্য?”

ইন্দ্রনাথের সরলার কথা মনে পড়িল,—তিনি অবাক্ হইয়া রহিলেন।

সেই দিন প্রাতে শিবিরে রাষ্ট্র হইল যে, হুমায়ুন ও তর্খান পূর্ব্ব রাত্রিতে শিবির পরিত্যাগ করিয়া সসৈন্যে পাঠানদিগের সহিত যোগ দিয়াছেন।

ইন্দ্রনাথ নৌকা হইতে অবরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কমলা।

But hawks will rob the tender joys,
  That bless the little lint white's nest,
And frost will blight the fairest flowers,
  And love will break the soundest rest,
    *   *   *   *
As in the bosom o' the stream,
  The moon-beam dwells at dewy e'en,
So trembling, pure was tender love,
  Within the breast o' bonnie Jean.
And now she works her mammie's work,
  And aye she sighs with care and pain,
Ye wist na what her all might be,
  Or what wad make her weel again.

Burns.

বিমলা কিজন্য সেই অপরূপ পরিচ্ছদে মুঙ্গের যাত্রা করিয়াছিলেন, জানিতে পাঠক মহাশয় উৎসুক হইবেন, কিন্তু সে কথা বলিতে হইলে আমাদের তাহারও পূর্ব্বকথা লইয়া আরম্ভ করিতে হয়। সুতরাং ইন্দ্রনাথ যে আশ্রমে সরলাকে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, সেই আশ্রমের কথা লইয়া আমরা আরম্ভ করিব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইচ্ছামতীতীরস্থ মহেশ্বরমন্দিরের অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। মন্দিরের মহান্ত প্রায়ই দেবালয়ে থাকে, কিন্তু চন্দ্রশেখর মধ্যে মধ্যে এই পল্লীগ্রামে আসিয়া বাস করিতে ভালবাসিতেন। দেবালয়ের মহান্ত সচরাচর যেরূপ স্বার্থপর ও বিষয়লুব্ধ হইয়া থাকেন, চন্দ্রশেখর সেরূপ ছিলেন না। তিনি অতিশয় নির্ম্মলচরিত্র ছিলেন, ও অনেক অনাথা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণকন্যাকে এই পল্লীগ্রামে রাখিয়া ভ্রাতাভগ্নীর মত ব্যবহার করিতেন। দেবালয়ের কার্য্য অন্যান্য বিশ্বস্ত পূজকের হস্তে সমর্পণ করিয়া চন্দ্রশেখর আপন আশ্রিত কয়েক ঘর লোক লইয়া এই গ্রামে মহাদেব উপাসনা করিতে ভালবাসিতেন, আবার আবশ্যক হইলে স্বয়ংও মহেশ্বরমন্দিরে কার্য্য করিতেন। কমলানাম্নী একটী অনাথা কন্যাকে আপন কন্যা বলিয়া গৃহে রাখিয়া লালনপালন করিতেন। কমলা রহস্য করিয়া এই গ্রামকে আশ্রম বা বনাশ্রম বলিত, সেই অবধি সকলেই ইহাকে বনাশ্রম বলিত। আমরাও তাহাই বলিব। অধুনা এই স্থানে একটী বৃহৎ গ্রাম হইয়াছে তাহার নাম বনগ্রাম। চন্দ্রশেখর যেরূপ নির্ম্মলচরিত্র

সেইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহাকে দেখিলে পুরাকালের মুনিঋষির ন্যায় বোধ হইত, তাঁহার গ্রামটীকেও তিনি যথার্থই পুরাকালের আশ্রমের ন্যায় করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি অনেক পুরাতন শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন ও পুরাতন ঋষিদিগের ন্যায় থাকিতে অভিলাষ করিতেন। কতকগুলি শিষ্যের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিয়া অনাথা দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিয়া একাকী যাগযজ্ঞ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন ও সেই গ্রামকে সর্ব্বাংশে পুরাকালের আশ্রমের ন্যায় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

সায়ংকাল উপস্থিত। যে যে আশ্রমবাসিগণ কার্য্যোপলক্ষে দূরে কোথায় যাইয়াছিলেন, তাঁহারা একে একে আশ্রমাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন; আশ্রমের শান্ত লতাপাদপের মধ্য হইতে উত্থিত সায়ংকালের যজ্ঞধূম দেখিতে পাইলেন; দুই একটী কুটীর হইতে সায়ংকালীন প্রদীপালোক দেখিতে পাইলেন। আশ্রমের মধ্যে সকলই শান্ত, নিস্তব্ধ। স্বচ্ছমনা ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যার উপাসনা আরম্ভ করিতেছেন, কোন কোন ব্রাহ্মণপত্নী গৃহকার্য্য সমাধা করিতেছেন, কেহ কেহ বা শিশুদিগকে সমবেত করিয়া মহাভারতের পুণ্যকথা গল্প করিতেছেন। ব্রাহ্মণকন্যাগণ কেহবা হরিণশিশু লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন, কেহ বা হরিণীর নয়নের সহিত স্বীয় বয়স্যার নয়নের বিশালতা ও চঞ্চলতার উপমা দিতেছেন। নদীতীর হইতে রমণীগণ কলস পূরিয়া জল লইয়া আসিতেছেন; কুটীর-প্রাঙ্গণে হরিণ-হরিণীগণ রোমন্থন করিতেছে।

সন্ধ্যার শঙ্খঘণ্টা ধ্বনিত হইল। সেই ধ্বনি আশ্রমের সহস্র পাদপে প্রতিহত হইয়া গগনমণ্ডলে উত্থিত হইতে লাগিল। প্রদোষকালীয় শঙ্খধ্বনি অপেক্ষা মানবহৃদয়ে উপাসনা-উত্তেজক আর কিছুই নাই। সেই পবিত্র ধ্বনিতে যোগীদিগের হৃদয়কবাট উদ্ঘাটিত হইল, তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আরাধনা করিতে লাগিলেন। রোদনপটু শিশুকে ক্ষণেক শান্ত করিয়া ব্রাহ্মণপত্নী সেই গীতে যোগ দিলেন, ক্রোড় হইতে কলস নামাইয়া অর্দ্ধপথে দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণকন্যা গীত গাইলেন, চঞ্চল হরিণশিশুকে ধান্য দিয়া ক্ষণেক শান্ত করিয়া কিশোরবয়স্কা সেই আরাধনায় তৎপর হইলেন, ক্রীড়াতৎপর বালক ক্ষণেক ক্রীড়ায় ক্ষান্ত হইয়া সেই গান গাইল,—মাতার ক্রোড়ে শিশুও মাতার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই গীতে যোগ দিল। আবাল বৃদ্ধ বনিতার কণ্ঠনিঃসৃত এই অনন্ত গীত সায়ংকালের শঙ্খধ্বনি সঙ্গে সঙ্গে নৈশ গগনে উত্থিত হইতে লাগিল। গীত সাঙ্গ হইলে সমস্ত আশ্রম পুনরায় তুষ্ণীভাব ধারণ করিল।

সেই সায়ং কালে দুই জন নদীতীরে আসীন ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত সরলা, অন্য জনের নাম কমলা।

কমলা অনেক দিন অবধি এই আশ্রমে বাস করিতেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকন্যা, বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ হইবে। তিনি কাহার দুহিতা, কাহার বনিতা, তাঁহার স্বামির কত দিন মৃত্যু হইয়াছে, এ সকল কথা কেহ জানিতেন না, জিজ্ঞাসা করিলে কমলা ক্রন্দন করিতেন সুতরাং কেহ জিজ্ঞাসাও করিতেন না।

কমলার স্বভাব ও আচরণ দেখিয়া আশ্রমবাসীগণ বিস্মিত হইতেন। কমলা সততই শান্ত, অন্যমনস্কা ও চিন্তাশীলা। যেস্থানে আশ্রম-পাদপপুঞ্জ অতিশয় নিবিড় ও অন্ধকারময়, যেস্থানে মনুষ্যের শব্দমাত্র নাই, মধ্যাহ্নকালে লোকালয় ত্যাগ করিয়া কমলা সেই নিভৃত স্থানে একাকী চিন্তা করিতে ভালবাসিতেন, মধ্যাহ্নে অতি মৃদুনিঃসৃত ঘুঘুর প্রেমগীত শুনিতে ভালবাসিতেন। যেখানে আম্রবৃক্ষের পদ প্রক্ষালন করিয়া ইচ্ছামতী কুল কুল শব্দে প্রবাহিত হইত, গভীর রজনীতে কমলা সেই স্থানে যাইয়া বসিয়া চিন্তা করিতে ভালবাসিতেন; নদীর অনন্ত কুল কুল ধ্বনি শুনিতে ভালবাসিতেন। সে অনন্ত ধ্বনি শুনিতে শুনিতে কমলা যে অনন্ত চিন্তা করিতেন, সে চিন্তা কিসের? কে বলিবে কিসের? চন্দ্রশেখর কমলাকে আপন গৃহে রাখিয়াছিলেন, আপন কন্যার মত যত্ন করিতেন, কিন্তু কমলা গৃহে থাকিবার সময় সর্ব্বদাই অন্যমনস্কা হইয়া থাকিতেন, অন্যের সহিত কথা কহিতে কহিতে কখন কখন চিন্তায় মগ্ন হইতেন, তাহাতে লোকে হাসিলে আবার লজ্জিত হইয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিতেন। সে কথাবার্ত্তা কি মধুর, কি ভাবপরিপূর্ণ! শ্রোতার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিত।

কমলা নিরুপমা সুন্দরী। তাঁহার নয়ন দুটি অতিশয় প্রশস্ত শান্ত-জ্যোতিঃ ও চিন্তাপ্রকাশক, সমস্ত মুখখানি শান্ত ও গাঢ় চিন্তায় ম্লান। দেহ অতি সুকুমার, বিধবার মলিন বস্ত্রে সে সুকুমার দেহ আবৃত হইয়া শৈবাল-বেষ্টিত পদ্মবৎ শোভা পাইত; কিন্তু সে প্রস্ফুটিত পদ্ম নহে,—সায়ংকালে মুদিতপ্রায় পদ্ম যেরূপ জলহিল্লোলে ঈষৎ কম্পিত হইতে থাকে, সন্ধ্যার স্নিগ্ধ ছায়াতে যেরূপ ধ্যাননিমগ্নের ন্যায় দেখায়, এই কোমলাঙ্গী তপস্বিনী সেইরূপ সততই চিন্তায় মগ্ন, লোকালয়ে সেইরূপ মুদিতপ্রায় হইয়া থাকিতেন। কমলা চন্দ্রশেখরকে পিতা বলিয়া ডাকিতেন, চন্দ্রশেখরের গৃহকার্য্য সমস্ত তিনিই নির্ব্বাহ করিতেন—কার্য্যে অবসর পাইলেই আবার সেই নিভৃত, নিবিড় পাদপাবৃত স্থানে যাইতেন; শিখণ্ডিবাহন

তাঁহাকে উপহাস করিয়া বনদেবী বলিয়া সম্বোধন করিতেন,—তদনুসারে আশ্রমের অনেকেই কমলাকে বনদেবী বলিয়া ডাকিত। ফলতঃ, তিনি যেরূপ একাকী বনে বনে বিচরণ করিতে ভালবাসিতেন, তাহাতে তাঁহাকে সেই শান্ত পবিত্র ছায়ান্বিত আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া বোধ করা কিছুই বিচিত্র নহে।

অদ্য সন্ধ্যার সময় কমলা সরলাকে লইয়া বনবিচরণ করিতেছিলেন,—এক্ষণে দুই জনে নদীতীরে বসিয়া রহিয়াছেন। কমলা সরলাকে ভাল বাসিতেন,—সে সরলচিত্ত বালিকাকে না ভালবাসিয়া কে থাকিতে পারে? সরলাও কমলার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতেন,—আপনার দুঃখ বিস্মৃত হইয়া সেই বিধবার দুঃখে দুঃখী হইতেন—সুতরাং ক্রমশঃ তাঁহাদিগের মধ্যে ভালবাসার সঞ্চার হইয়াছিল।

পাঠক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিবেন, সরলার আবার দুঃখ কি? বালিকার হৃদয়ে চিন্তা কিসের? আমরা উত্তর করিব, সরলা আর বালিকা নাই,—হৃদয়কোরকে প্রণয়কীট প্রবেশ করিয়াছে।

যেদিন হইতে ইন্দ্রনাথ সরলার নিকট বিদায় লইয়াছিলেন, সেইদিন হইতে প্রণয় কাহাকে বলে সরলা বুঝিল, চিন্তা কাহাকে বলে বুঝিল। সরলা এখনও পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহময়ী কন্যা, কিন্তু এক্ষণে মাতার সেবাশুশ্রূষা করিতে করিতে সততই আর একজনের কথা হৃদয়ে জাগরিত হইত, আর একখানি মুখ মনে পড়িত। এখনও সরলা পূর্ব্বের ন্যায় পরিশ্রম করিত, কিন্তু কার্য্য করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে সহসা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিত, মধ্যে মধ্যে সহসা চক্ষে জল আসিত। লজ্জায় অশ্রু মুছিয়া আবার কার্য্যে নিযুক্ত হইত, আবার ধীরে ধীরে চক্ষে জল আসিত। ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সেই জলে চক্ষুর্দ্বয় পরিপূর্ণ হইত,—ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সেই জলে মুখখানি সিক্ত হইত। সে বালিকার মুখে সে জল দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

চিন্তা কি? সরলাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর দিতে পারিত না,—কিন্তু আমরা অনুভব করিতে পারি। রুদ্রপুরে পূর্ণচন্দ্রালোকে যে দেবমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম আবার কি সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইব? যাঁহার কণ্ঠে একবার লীলাক্রমে মালা দিয়াছিলাম, তাঁহাকে কি আবার দেখিতে পাইব? হৃদয়ের ইন্দ্রনাথকে আবার কি দেখিতে পাইব? এই চিন্তা করিতে করিতে সরলা কার্য্যকর্ম্ম ভুলিয়া যাইত, চারিদিক্ শূন্য দেখিত। জ্ঞানচক্ষে সেই রুদ্রপুরের কুটীর দেখিতে পাইত,—সেই কুটীরের পার্শ্বে

সেই উদ্যান,—সে উদ্যানে সেই পুষ্পচারা, উপরে পূর্ণচন্দ্র,—সেই পুষ্পচারার মধ্যে সেই চন্দ্রালোকে সেই হৃদয়ের ইন্দ্রনাথ,—সহসা নয়নজলে সরলার মুখখানি প্লাবিত হইয়া যাইত।

আবার চক্ষু মুছিয়া কার্য্য করিতে বসিত, আবার কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে চিন্তা আসিত। সন্ধ্যার সময় ছায়া যেমন ক্রমে ক্রমে অতি ধীরে ধীরে গগনমণ্ডল ও পৃথিবী আচ্ছন্ন করে,—প্রণয়চিন্তাও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে অতি ধীরে ধীরে সরলার হৃদয় আচ্ছন্ন করিত। ভাবিত একবার যদি তাঁহার দেখা পাই,—এক মুহূর্ত্তের জন্যও যদি তাঁহার দেখা পাই, তাহা হইলে তাঁহাকে বলি,—কি বলি?—না কিছু বলি না,—তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়ে আমার জ্বলন্ত হৃদয় স্থাপন করিয়া, তাঁহার স্কন্ধে আমার মস্তক স্থাপন করিয়া, একবার মনের সাধে ক্রন্দন করিয়া স্বর্গসুখ লাভ করি। অভাগিনী একবার ক্রন্দন ভিন্ন আর কিছু চাহে না।

আবার চিন্তা আসিত। একবার কি ইন্দ্রনাথের সহিত দেখা হইবে না? অবশ্য হইবে; কিন্তু সে কবে হইবে? এক্ষণেই দেখা হয় না কেন? ইন্দ্রনাথ আসিতেছেন না কেন? তিনি কি সরলাকে ভুলিয়া গিয়াছেন? সরলার চক্ষে আবার জল আসিল। ইন্দ্রনাথ কুশলে আছেন ত? নয়নজলে মুখখানি প্লাবিত হইয়া যাইল।

বালিকা প্রেমের কথা কাহাকেও বলিত না, যে পাবকে হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল সে পাবক কাহাকেও দেখাইত না, নীরবে অবারিত অশ্রুবারি দ্বারা সেই পাবক নির্ব্বাণ করিতে চাহিত, ব্যাধবিদ্ধ কপোতীর ন্যায় নীরবে নিভৃত নিকুঞ্জ বনে যাতনা সহ্য করিত। আর আশ্রমবাসীগণ—হায়! তাহাদিগের মধ্যে কয়জন সরলার যাতনা বুঝিত? ব্রাহ্মণগণ ক্রিয়া কর্ম্মেই ব্যস্ত, সরলচিত্ত ব্রাহ্মণকন্যাগণ সরলার পীড়ার কিছুই বুঝিত না, সরলাকে কাতর দেখিলে দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিত, "সরলা! অদ্য তোমাকে এরূপ ম্লান দেখিতেছি,—কোন অসুখ ত হয় নাই? কোন কষ্ট হইয়াছে? কি মনে কোন দুঃখ কি ভাবনা হইয়াছে?" এরূপ প্রশ্নে সরলা অধিকতর লজ্জিত হইত,—সে স্থান হইতে প্রস্থান করিত। এমন বিপত্তির সময় তাহার হৃদয়ের অমলা কোথায়? স্নেহগর্ভ বাক্যে হৃদয় শান্ত করিবে, মিষ্ট হাস্য দ্বারা ভাবনা দূর করিবে, এমন অমলা কোথায়?

আশ্রমের মধ্যে একজনমাত্র সরলার মনের ভাব বুঝিয়াছিল। কমলা সরলাকে কখন কখন আপনার সঙ্গে নিস্তব্ধ নদীকূলে, সুস্নিগ্ধ ছায়াবৃত বৃক্ষতলে লইয়া যাইতেন, সান্ত্বনা করিতেন, আপনার চিন্তার ভাগিনী

করিতেন ; পবিত্র প্রেমের কথা বলিতেন ; দুঃখের কথা বলিতেন সহিষ্ণুতার কথা বলিতেন ; সরলার চক্ষের জল মুছাইয়া দিতেন, কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসিতেন। সরলা সেই গল্প শুনিতে শুনিতে আপন দুঃখ ভুলিয়া যাইত ; সেই মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আপন দুঃখ দূর করিত। যেরূপ জনশূন্য স্থানে যাইতে তাহার ভয় করিত, চিন্তাশীলা কমলার সঙ্গে সে সকল স্থানেও যাইত, যেরূপ গভীর ভাবময় চিন্তা তাহার বালিকাহৃদয়ে কখন স্থান পায় নাই, ভাবিনী কমলার নিকট তাহাও শুনিত। ফলতঃ দুইজনে একত্র হইলে কমলা আপনার হৃদয়ের কবাট উন্মুক্ত করিয়া বালিকার নিকট নানারূপ হৃদয়গ্রাহী কথা ও গল্প করিতেন ও অন্তরের নানারূপ গভীর তলচারী ভাব প্রকাশ করিতেন। সরলা বালিকার মত একমনে সেই সমুদয় শুনিত ;—সে ভাব তাহার বড় ভাল লাগিত ; সে হৃদয়গ্রাহী কথা শুনিতে শুনিতে আপন দুঃখকথা বিস্মৃত হইত।

আজি সন্ধ্যার সময় তাঁহারা দুই জনে নদীতীরে বসিয়া আছেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

কে বল দেখি ?

Manfred.—Oblivion, self-oblivion :——
Byron.

কমলা বলিলেন—"সরলা।"

সরলা উত্তর না করিয়া কমলার মুখের দিকে চাহিল।

কমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমাকে এত ম্লান দেখিতেছি কেন ?"

সরলা মুখখানি নত করিল।

কমলা দেখিলেন আজ দুঃখবেগ প্রবল হইয়াছে। স্নেহসহকারে সরলার নিকটে বসিয়া সরলার হস্ত আপন হস্তে ধারণ করিলেন, পরে স্নেহগর্ভ-বচনে নানাপ্রসঙ্গের কথা আনাতে সরলার মন কিঞ্চিৎ স্থির হইল। তখন তিনি বলিতে লাগিলেন,—

"ভগিনি! পৃথিবীতে তোমা অপেক্ষা হতভাগিনী আছে। তোমার স্নেহময়ী মাতা আছেন, জগৎসংসারে থাকিবার স্থান আছে, হৃদয়েশ্বর জীবিত আছেন, তোমার আশা-ভরসা সকলেই আছে। কিন্তু পৃথিবীতে এরূপ হতভাগিনী আছে যাহার কিছুমাত্র নাই, যাহার ভবিষ্যতের আশা নাই, অতীতের স্মৃতি নাই, ইহজন্মে কেহ নাই, সংসারে সুখ নাই, কেবল অতুল চিন্তাজলে ভাসিতেছে।"

সরলা কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইল, বলিল, "দিদি, তোমার কথা ভাবিলে আমি আপন দুঃখ ভুলিয়া যাই, তুমি কিরূপে এত সহ্য কর?"

কম। "বিধাতা সহ্য করিবার জন্যই নারীজন্ম দিয়াছেন। পুরুষে যত সহ্য করিবে, আমরা তাহার দশ গুণ সহ্য করিব।"

সর। "যদি না পারি?"

কম। "তবে নারীজন্ম গ্রহণ করিলে কেন? দেখ, মনুষ্যের মানসম্ভ্রম আছে, ধনসম্পত্তি আছে, কুলমর্য্যাদা আছে, নামগৌরব আছে, জীবনের সহস্র ভিন্ন ভিন্ন অবলম্বন আছে, সহস্র সুখের কারণ আছে, একটী না হইলে অন্যটী অন্বেষণ করিতে পারে, সেটী না পাইলে অপর একটী অনুসন্ধান করে, সেই অনুসন্ধানে জীবন স্বপ্নবৎ অতিবাহিত হয়। চেষ্টা সফল হউক বা না হউক, যতদিন চেষ্টা থাকে, যতদিন আশা থাকে, ততদিন জীবন দুর্ব্বহণীয় হয় না। আর আশা নাই কোন্ মনুষ্যের? যুবকের প্রেম, উচ্চাভিলাষ, মান, সম্ভ্রম, ক্ষমতা ও খ্যাতি লাভের আকাঙ্ক্ষা; বৃদ্ধের ধন-কামনা, পুত্র-কামনা, বংশবৃদ্ধি কামনা, সহস্র কামনা, সহস্র আকাঙ্ক্ষায় জীবন অতিবাহিত হয়। আর অভাগিনী নারীকুলের কি আছে?"

কমলা ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইলেন। সরলার দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, সরলা একাগ্রচিত্তে শুনিতেছে, আর তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে। তখন আবার বলিতে লাগিলেন—

"অভাগিনী নারীকুলের কি আছে? সংসারস্বরূপ অপার অগাধ সমুদ্রে তাহাদিগের একটীমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর তরী আছে,—সেটী প্রেম। সেই প্রেমের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা অপার সংসারে আইসে, যদি সেই তরীটী ডুবিল, তবে নারীর আর অবলম্বন নাই, আর সুখের কারণ নাই, আর আশা নাই, আর ভরসা নাই, অতল জলে সন্তরণ ভিন্ন আর উপায় নাই।"

সরলা বলিল,—"আমার বোধ হয়, দিদি তুমি বড় দুঃখিনী, কেননা তোমার কেহই নাই, জগতে আশাও নাই।"

কমলা উত্তর করিলেন,—

"তথাপি, সরলা, আমি দুঃখিনী নহি। চিন্তাবলে আমি সকল দুঃখ বিস্মৃত হইতে শিখিয়াছি,—চিন্তাই আমার জীবনস্বরূপ হইয়াছে। ঐ যে গলিত বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরশব্দ শুনিতে পাইতেছ, মধ্যাহ্নে যখন ঐ বৃক্ষতলে বসিয়া ঐ মর্ম্মরশব্দ শ্রবণ করি, আর ঘুঘুর মৃদুনিঃসৃত প্রেমগীত শ্রবণ করি, তখন আমার হৃদয় শান্তিরসে পরিপূরিত হইতে থাকে। ঐ যে আকাশে খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘের ভিতর দিয়া চন্দ্র যাইতেছে দেখিতেছ, ক্ষণেকমাত্র ঈষৎ অন্ধকার করিয়া আবার পরিষ্কার নীল গগনমণ্ডলে বাহির হইয়া আপন জ্যোতিঃ বিস্তার করিতেছে; ঐ চন্দ্র ও ঐ আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমি নিরুপম শান্তি লাভ করি; প্রকৃতির শান্তি ও নিস্তব্ধতা অনুকরণ করিয়া আমার হৃদয়ও শান্তি ও নিস্তব্ধতা গ্রহণ করে। এই সকল দেখিয়া আমার হৃদয়ে যে অনন্ত, অপরিসীম, অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদ্রেক হয় তাহা আর কি বলিব, সেই সকল ভাবেই আমাকে পাগলিনী করিয়াছে,—উদাসিনী করিয়াছে। আমি এ সংসারে নাই,—যে স্থানে স্বভাবের অনন্ত মহিমা বিরাজ করিতেছে, আমার মন সতত্ই সেই স্থানে বিচরণ করিতেছে।"

সরলা ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল—"দিদি, তোমার পূর্ব্বকথা জানিতে আমার বড় ইচ্ছা করে।"

কমলা বলিলেন, "সরলা তুমিও আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে? আশ্রমবাসিদিগের নিকট আমি কিছুই বলি না, কিন্তু ভগিনি! তোমার নিকট আমার লুকাইবার কিছুই নাই; আমি সত্য সত্য বলিতেছি, আমার জীবন কোন অপরূপ মোহজালে জড়িত রহিয়াছে, তাহা আমি ভেদ করিতে পারি না,—আমার কিছুমাত্র স্মরণ নাই।"

সরলা আশ্চর্য্য হইল,—পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কিছুই মনে নাই? তোমার বাড়ি কোথায়?"

কম। "স্মরণ নাই।"

সর। "তোমার পিতার নাম কি?"

কম। "স্মরণ নাই।"

সর। "তোমার বিবাহ হইয়াছিল কোথায়?"

কম। "স্মরণ নাই।"

সর। "তোমার স্বামীর মৃত্যু হয় কবে, কিরূপে?"

কম। "স্মরণ নাই।"

সরলা বিস্মিত হইল। অন্য কেহ হইলে ভাবিত কমলা মিথ্যা কথা কহিতেছে। কিন্তু সরলার মনে সে ভাব উদয় হয় নাই। যাঁহাকে জ্যেষ্ঠার মত ভাল বাসিত, তিনি যে মিথ্যা কথা কহিতেছেন, এরূপ বিশ্বাস সরলার হৃদয়ে কখন উদয় হয় নাই; অথচ জীবনের সমস্ত কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, ইহাও বিশ্বাস করা সহজ নহে; সরলা সত্য সত্যই ভাবিলেন কমলার জীবন কোন মন্ত্রজালে জড়িত, হতভাগিনী কোন ভীষণ শাপে অভিশপ্ত।

কমলা ক্ষণেক পর বলিতে লাগিলেন, "আমার কেবল এইমাত্র স্মরণ আছে যে, কিছুদিন সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিলাম, হৃদয়ে অতিশয় বেদনা বোধ করিয়াছিলাম, যাতনায় অস্থির হইয়াছিলাম। সেই পীড়ার সময় স্বপ্নে একটী দেবমূর্ত্তি দেখিতাম। বোধ হইত যেন অপরিসীম নীল আকাশের মধ্যে চন্দ্রকরোজ্জ্বল একটী ক্ষুদ্র অতি শুভ্র মেঘখণ্ডে সেই দেবমূর্ত্তি বসিয়া রহিয়াছেন। একবার বোধ করিতাম, তিনি ইন্দ্রদেব, কিন্তু তাহার গলায় যজ্ঞোপবীত, হস্তে নৌকার দাঁড়, সেই দাঁড় দিয়া যেন সেই মেঘখানিকে গগনসাগরের মধ্যে সঞ্চালন করিতেছেন। মহাদেবের হস্তে ত্রিশূল থাকে, নারায়ণের হস্তে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম থাকে, দাঁড় কোন্ দেবের হস্তে থাকে আমি জানি না।—আশ্রমবাসী কেহ আমাকে বলিতে পারেন না। যাহা হউক, সেই ভীষণ পীড়া হইতে যখন আমি আরোগ্য লাভ করিলাম, লোকে বলিল, আমি বিধবা হইয়াছি। কিন্তু তখন আর পূর্ব্বকথা কিছুমাত্র মনে ছিল না,—স্বামীর কথা কিছুমাত্র মনে ছিল না, বৈধব্য-যাতনাও কিছুমাত্র বোধ করি নাই।"

সরলা অধিকতর বিস্মিত হইল,—সে অপরূপ কথা শুনিয়া যেন কিছু ভয়েরও সঞ্চার হইল। আশ্রমবাসিগণ উপহাস করিয়া কমলাকে "বনদেবী" বলিত, তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া সরলার যেন যথার্থই বোধ হইতে লাগিল, তিনি মানুষী নহেন, কোন দেবী হইবেন। অতিশয় শোকে যে স্মরণশক্তি এতদূর বিনাশ হয়, তাহা সরলা অনুভব করিতে পারিত না। ক্ষণেক পর সরলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—

"তাহার পর এ আশ্রমে আসিলে কি প্রকারে?"—কমলা উত্তর করিলেন, "যখন আমি ঘোরতর পীড়া সহ্য করিতেছিলাম, তখন সকল লোকেই স্থির করিয়াছিল যে, আমি আর বাঁচিব না। পিতা চন্দ্রশেখর সেই সময়ে তীর্থপর্য্যটন করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হয়েন। পিতার দয়ার শরীর, তিনিই আমাকে যত্ন করিতে লাগিলেন। সে স্থানে আমার জ্ঞাতি-

কুটুম্ব কেহই ছিল না। নিরাশ্রয় বিধবাকে পিতা আশ্রয় দান করিয়া আপন নৌকায় তুলিলেন। তখনও আমার ঘোর পীড়া, গ্রামের সকলেই স্থির করিল যে নৌকাতেই আমার কাল হইবে। অনেক দিন জলপথে আসিতে লাগিলাম, নদীর স্বাস্থ্যজনক বায়ুতে আর পিতার যত্নে আমি পুনরায় আরোগ্যলাভ করিলাম, সংজ্ঞালাভ করিলাম ;—কিন্তু পূর্ব্বকথার স্মৃতি আর লাভ করিলাম না,—আমি কে, কাহার দুহিতা, কাহার স্ত্রী, কিছুই জানিতে পারিলাম না। সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিবার কিছুদিন পরেই নৌকা আসিয়া এই আশ্রমের ঘাটে লাগিল,—সেই অবধি আমি পিতার গৃহেই রহিয়াছি।"

শুনিতে শুনিতে সরলার চক্ষে জল আসিল। সরলা ধীরে ধীরে কমলার নিকটে আসিয়া তাহার হস্তধারণপূর্ব্বক বলিল,—"দিদি, আমি আর আপনার জন্য দুঃখ করিব না, তোমার এ সংসারে কিছু নাই, কেহই নাই, সেই জন্য আমার দুঃখ হইতেছে।" পরদুঃখে সরলার সরল হৃদয় দ্রবীভূত হইতেছিল।

কমলা উত্তর করিলেন, "ভগিনি! আমার জন্য দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। স্মৃতি আমাদের দুঃখের কারণ; যাহার স্মৃতি নাই তাহার দুঃখ কি? আমার যদি পিতার কথা মনে থাকিত, স্বামীর কথা মনে থাকিত, তাহা হইলে কি আমি জীবনধারণ করিতে পারিতাম? এখন আমি বালিকার মত সংসারচিন্তাশূন্য হইয়া এই বনে বিচরণ করি, নানারূপ অপার্থিব চিন্তায় সুখলাভ করি, প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য্য দৃষ্টি করিয়া চরিতার্থতা লাভ করি। প্রকৃতিই আমার পিতাস্বরূপ, প্রকৃতিই আমার স্বামী-স্থানীয়; ইহা ভিন্ন অন্য স্বামী বা অন্য পিতা আমি জানি না।"

দুই জনে অনেকক্ষণ এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইতে চলিল, আকাশ ক্রমশঃ মেঘাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। চন্দ্র মেঘের ভিতর লুকাইলেন, মেঘরাশিও ক্রমে ক্রমে গভীর নীলবর্ণ ধারণ করিল। মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প বিদ্যুৎ দেখা যাইতে লাগিল ও অল্প অল্প বায়ু বহিতে লাগিল। সরলা কুটীরে যাইবার জন্য উৎসুক হইল, কিন্তু কমলা স্থিরনয়নে সেই নীল মেঘরাশির দিকে দেখিতে লাগিলেন, স্থিরচিত্তে সেই নিবিড় বনের ভিতর সেই বায়ুর শব্দ শুনিতে লাগিলেন। হর্ষোৎফুল্ললোচনে তিনি সরলাকে সেই বিদ্যুতালোক দেখাইতে লাগিলেন, ইচ্ছামতীর ফেনচূড় তরঙ্গমালা দেখাইতে লাগিলেন। সরলা অগত্যা তাহাই দেখিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে পশ্চাৎ হইতে একজন লোক আসিয়া সরলার চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কে বল দেখি ?"

সরলা সে স্বর চিনিত, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িল না, একে একে আশ্রম-বাসিনী সঙ্গিনীদিগের নাম করিতে লাগিল।

"নিস্তারিণী"—চক্ষু হইতে হস্ত উঠিল না,

"মনোমোহিনী"—তথাপি হস্ত উঠিল না,

"যোগেন্দ্রমোহিনী"—তবু হইল না,

"তারা"—

"তোর মাথা,—আমাকে ইহার মধ্যেই ভুলেছিস্,—তবু এখনও বিবাহ হয় নাই, না জানি বিবাহের জল গায়ে লাগিলে কি হইবে!"—ইত্যাদি বলিতে বলিতে সরলার প্রিয় সই অমলা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সরলার বিস্ময়ের সীমা থাকিল না—"সই?" "এখানে?" "কবে আসিলে?"—আর মুখ দিয়া কথা সরিল না। সরলার বিস্ময় ক্ষণকাল-স্থায়ীমাত্র,—অনেকদিন পরে দুঃখের সময় প্রাণের সইকে পাইয়া সরলার হৃদয় আনন্দে প্লাবিত হইল, সে অপার আনন্দ হৃদয়ে স্থান পাইল না, উথলিয়া পড়িতে লাগিল। বাষ্পপরিপূর্ণলোচনে সরলা অমলাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার বক্ষে আপন মুখ লুকাইল। অমলাও যখন অনেকদিন পরে সেই প্রেমপুত্তলীটীকে হৃদয়ে স্থান দিল, তখন তাহার চক্ষু নিতান্ত শুষ্ক ছিল না।

ক্ষণেক পর অমলা বলিল, "এই দুই প্রহর রাত্রিতে এই অন্ধকারে এখানে বসিয়া আছ? আমি যে তোমার জন্য আশ্রমে কত অন্বেষণ করিয়াছি বলিতে পারি না।"

সর। "এখানে কমলার সহিত আসিয়াছি, কথায় কথায় রাত্রি অধিক হইয়াছে। সই তুমি অদ্য আসিলে?"

অম। "হাঁ আমি আজই আসিয়াছি, তোমাকে দেখিবার জন্য কতদিন আসিব আসিব মনে করি, তা 'বৃদ্ধস্বামী' কি আমাকে ছাড়ে? আজ কত করিয়া তবে আসিলাম। তুমি আশ্রমে নূতন নূতন বন্ধু পাইয়া তোমার পুরাতন সইকে ভুলে যাও নাই ত?"

সর। "না সই, আমি রাত্রিদিন তোমার কথাই চিন্তা করি, আর সেই"—সরলা হঠাৎ নিস্তব্ধ হইয়া মুখ অবনত করিল।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি অমলার মনে সন্দেহ হইল,—সরলার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া তাহার ম্লান ও প্রফুল্লতাশূন্য মুখমণ্ডল ও কোটরপ্রবিষ্ট নয়ন দুইটী

দেখিয়া অমলার সন্দেহ গাঢ় হইল। ধীরে ধীরে সরলাকে জিজ্ঞাসা করিল—"দিনরাত্রি আর কাহার চিন্তা কর সই?"

সরলা মুখ অবনত করিয়া রহিল,—অমলা নিশ্চয় জানিল, কোরকে কীট প্রবেশ করিয়াছে। অমলার মুখ গম্ভীর হইল,—পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—

"ছি! সইয়ের নিকট তুমি আবার কথা লুকাইতেছ,—তবে বুঝি আমাকে ভালবাস না?"

সর। "হাঁ, সই, ভালবাসি।"

অম। "তবে বল কোন্ পুরুষের চিন্তা দিনরাত্রি তোমার হৃদয়ে জাগরিত রহিয়াছে?"

সরলা আবার নিস্তব্ধ হইল। অমলার নিকট কখনও কোন কথা লুকায় নাই, লুকাইতে পারেও না, অথচ সে প্রিয় নামটী মুখে আসিয়াও বহির্গত হইতেছে না। লজ্জায় সরলার মুখ রুদ্ধ হইয়াছে।

সরলার অন্তরে যে যাতনা হইতেছিল, অমলা তাহা বুঝিল। বুঝিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—

"আচ্ছা, তাঁহাকে কি আমি চিনি?"

সরলা অতি মৃদু, অপরিস্ফুটস্বরে বলিল, "হাঁ।"

অমলা মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া বলিল, "তবে ইন্দ্রনাথ?" এবার সরলাকে আর উত্তর করিতে হইল না। সে প্রিয় নামটী শুনিয়া সরলা শিহরিয়া উঠিল। অমলা বুঝিল, ঠিক অনুভব করিয়াছি।

অমলা নিস্তব্ধ হইয়া ক্ষণেক চিন্তা করিতে লাগিল। পৃথিবীর মধ্যে এরূপ একজন লোক ছিল না, যাহাকে অমলা সরলা অপেক্ষা ভালবাসিত,—সেই সরলা আজ অপার প্রেমসাগরে ভাসিতেছে। সে সাগরের কি কূল আছে? যদি থাকে, বালিকা কি সে কূল প্রাপ্ত হইতে পারিবে? অমলা মনে মনে বলিল, "বিধাতঃ, আমি আপনার জন্য কোন ভিক্ষা চাহি না,—তুমি এই বালিকার প্রতি সদয় হও, আমার প্রাণের সইকে রক্ষা কর।"

ক্ষণেক পর অমলা চিন্তাবেগ সম্বরণ ও আপন নৈসর্গিক প্রফুল্লতা ধারণ করিয়া সরলাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। বলিল—"তা চিন্তা কি জন্য? শুনিয়াছি ইন্দ্রনাথ পশ্চিমে গিয়াছেন। তথা হইতে বোধ হয় শীঘ্রই আসিবেন। তোমার মাতাও বোধ হয় এ বিবাহে অসম্মত হইবেন না, আর ইন্দ্রনাথ একটু পাগলের মত হউক, ছেলে ভাল। তোমার মনের কথা ইন্দ্রনাথ জানেন?"

সর। "জানেন।"

অম। "তিনি সম্মত আছেন?"

সর। "আছেন।"

অম। "ঘরে ঘরে বর দেখা কন্যা দেখা হইয়া গিয়াছে বুঝি,—আমরা ইহার কিছু জানি না?"

সরলা লজ্জিত হইল।

অমলা আবার বলিতে লাগিল, "সইয়ের মনে এত আছে তা কে জানে বল। আমি ভাবি সই আমার বালিকা! ইহার ভিতর এত কাণ্ড কে জানে বল? তা বরটীকে মনে ধরিয়াছে?"

সরলা অধিকতর লজ্জিত হইল,—অথচ ইন্দ্রনাথের কথা হইতেছে বলিয়া তাহার হৃদয়ে আনন্দলহরী উথলিয়া পড়িতেছিল।

অমলা আবার বলিতে লাগিল—"আর কন্যাটীকে ত বরের মনে অবশ্যই ধরিবে,—এ সোণার মুখ দেখিলে কাহার হৃদয়ে প্রেমসঞ্চার না হয়? আমি যদি পুরুষ মানুষ হইতাম, আর যদি ব্রাহ্মণের ছেলে হইতাম, তাহা হইলে তোকে দেখিয়া পাগল হইয়া যাইতাম।"—এই বলিয়া অমলা সরলার অবনত মুখখানি ধীরে ধীরে তুলিয়া তাহার দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সকলেই আশ্রমাভিমুখে যাইতে লাগিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অতিথিদ্বয়।

And wherefore do the poor complain,
The rich man asked of me,
* * * *
You asked me why the poor complain,
And these have answered thee.

Southey.

যখন সরলা ও অমলার সহিত প্রথমে সাক্ষাৎ হইল, তখন কমলা তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে আশ্রমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু সমান ও সরল পথ দিয়া না যাইয়া বন্ধুর, বক্র ইচ্ছামতী-তীর দিয়া যাইতে লাগিলেন। ইচ্ছামতীর তরঙ্গমালা মেঘাচ্ছন্ন আকশের ভয়াবহ

সৌন্দর্য্য অনুকরণ করিতেছে; ভীষণ উচ্ছ্বাসে ক্রীড়া করিতেছে;—ফেন-রাশিতে আবৃত হইয়া সুবর্ণরৌপ্যালঙ্কার-বিভূষিতা শ্যামাঙ্গী উন্মাদিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। সেই অপূর্ব্ব শোভা দেখিবার জন্যই কমলা নিকট পথ পরিত্যাগ করিয়া নদীতীর দিয়া আশ্রমাভিমুখে গমন করিতেছিলেন।

আসিতে আসিতে কমলা সহসা ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। সে ধ্বনি শিশুকণ্ঠজাত বলিয়া বোধ হইল,—এই গভীর রজনীতে নদীতীরে কোথায় শিশু ক্রন্দন করিতেছে। কমলার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। সেই ক্রন্দনধ্বনি অনুসরণ করিয়া অতি দ্রুতবেগে যাইতে লাগিলেন।

ক্ষণেক যাইয়া দেখিলেন, নদীর উপকূলভাগে দুইটী অল্পবয়স্ক বালক একটী বৃক্ষতলে বসিয়া রোদন করিতেছে; তাহাদিগের সমস্ত শরীর ও বস্ত্রাদি আর্দ্র, তাহার উপর সেই প্রচণ্ড শীতল বায়ুতে তাহারা শীতার্ত্ত হইয়া ক্রন্দন করিতেছে।

কমলা অতি সকরুণবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে বাছা, এখানে বসিয়া রহিয়াছ?"

দুইটী বালকই একেবারে কমলার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহাদিগের দুই জনেরই অল্প বয়স হইবে, এক জনের বয়ঃক্রম দশ বৎসর হইবে, অন্যের বয়ঃক্রম তদপেক্ষা এক কি দুই বৎসর অধিক। তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিল,—

"আমরা মাঝি, রুদ্রপুর হইতে নৌকা লইয়া আসিয়াছি, ফিরিয়া যাইবার সময় পথে ঝড় উঠিল। মা, তুমি যেই হও, আমাদের সাহায্য কর, আমাদের কেহই নাই।"

দ্বিতীয় বালকটী বলিল, "আমাদের কেহই নাই, মা, তুমি সাহায্য কর।" দুই জনেরই চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল।

কমলার কোমল হৃদয়ে আরও দয়া ও দুঃখের সঞ্চার হইল, বলিলেন—

"বাছা, তোমরা এই বয়সে এত কষ্ট সহ্য করিতে শিখিয়াছ?—তোমরা রুদ্রপুর হইতে কোথায় আসিয়াছিলে?"

প্রথ, বা। "এই আশ্রমে আসিয়াছিলাম, এখানে বৈকালে খাওয়া দাওয়া করিয়া পুনরায় রুদ্রপুরে যাইতেছিলাম; পথে ঝড় উঠিয়াছে।"

কম। "পুনরায় আশ্রমে চল না কেন? আশ্রম অধিক দূর নহে অদ্য রাত্রি তথায় থাকিয়া কালি বাড়ী যাইও।"

প্রথ, বা। "তাহাই করিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু বাতাস উল্টা হইয়াছে, নৌকা আশ্রমের দিকে আর এক রশীও চলে না।"

কম। "নৌকা কোথায়?"

প্রথ, বা। "এইখানেই আছে," বলিয়া কমলাকে নদীকূলে লইয়া যাইল, নৌকা তথায় বাঁধা ছিল।

কমলা বলিলেন, "নৌকা এই স্থানেই থাকুক, তোমরা আশ্রমে আইস।"

দ্বিতী, বা। "যেরূপ বাতাস হইতেছে, বোধ হয় নৌকার দড়ী ছিঁড়িয়া যাইবে নৌকা ভাসিয়া যাইবে।"

কম। "তবে নৌকা ডাঙ্গায় তুলিয়া রাখ।"

দ্বিতী, বা। "আমরা দুইজনে তুলিতে পারিলাম না।"

কম। "আইস, আমিও ধরিতেছি।"

পরোপকারিণী ব্রাহ্মণকন্যা নৌকার এক দিক্ ধরিলেন, দুইজন বালক নৌকার অপর দিক্ ধরিল। নৌকা অতি ক্ষুদ্র, অনায়াসে ডাঙ্গার উপর উঠিল। তথায় দুইটী আম্রবৃক্ষে সেই নৌকা উত্তমরূপে বদ্ধ হইল। তখন বালকদ্বয় অতি স্নেহগর্ব্বস্বরে বলিল,—"মা, আর অধিক কি বলিব, তুমি আজ আমাদের বাঁচাইলে।"

কমলা বলিলেন, "আইস বাছা আশ্রমে যাই। যেরূপ মেঘ হইয়াছে, শীঘ্রই ভয়ানক বৃষ্টি হইবে।" এই বলিয়া তিন জনই আশ্রমাভিমুখে চলিল। ক্রমে গভীর মেঘরাশি আকাশে জড় হইতে লাগিল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নীলমেঘ পশ্চিমদিকে রাশীকৃত হইতে লাগিল, রহিয়া রহিয়া বায়ু ভীষণ উচ্ছ্বাসে বহিতে লাগিল, আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উজ্জ্বল বিদ্যুল্লতা মুহুর্মুহুঃ দেখা দিতে লাগিল, মেঘের ভীষণ গর্জ্জনে বৃক্ষ, গ্রাম, অটবী, সমস্ত মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। বালকদ্বয় ভয়ে কমলার নিকটে যাইতে লাগিল, কমলা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে স্বভাবের সেই ভীমশোভা অবলোকন করিতে লাগিলেন, অলৌকিক আনন্দে তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে বালকদ্বয়ের দিকে চাহিলেন, সস্নেহবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের এই অল্প বয়স, তোমরা এইরূপ কষ্ট করিয়া জীবন-ধারণ কর? তোমাদের কি পিতামাতা নাই?"

নবীন উত্তর করিল, "আছেন, কিন্তু তাঁহারা অতিশয় বৃদ্ধ, কার্য্য কর্ম্মে অক্ষম। আজ মা আমাদের জন্য কত ভাবনা করিবেন;—ভাবিবেন, এই ঝড়ে আমরা ডুবিয়া গিয়াছি।"

রাখাল বলিল, "দাদার মৃত্যু হওয়া অবধি একটু বাতাস হইলে মা আমাদিগকে বাহির হইতে দেন না। আজ তিনি কত ভাবিতেছেন।" দুই জনে কাঁদিতে লাগিল।

কমলা তাহাদের সান্ত্বনা করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তোমার দাদার কবে মৃত্যু হইয়াছে?"

রাখাল উত্তর করিল, "আজ ছয় মাস হইল, এক দিন মাছ ধরিতে গিয়াছিলেন, ভয়ানক তুফানে নৌকা উল্টিয়া পড়িল, আর দাদাকে দেখিতে পাইলাম না। সেই অবধি পিতা পীড়ায় ও শোকে শয্যাগত, যতক্ষণ আমরা কিছু আনিতে না পারি ততক্ষণ তাঁহার খাওয়া হয় না। আর মাতা ত সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত দিনরাত্রি রোদন করিতেছেন।"

কমলা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কিরূপে রোজগার কর?"

নবীন বলিল, "কখন মাছ ধরি, কখন নদীর শেওলা জড় করিয়া যাহারা চিনি করে তাহাদিগের নিকট বিক্রয় করি, কখন বা যাত্রীদিগকে এস্থান ওস্থানে লইয়া যাইয়া কিছু কিছু পাই। যিনি আজ রুদ্রপুর হইতে এই আশ্রয়ে আসিলেন, তিনি আমাদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করেন, তাঁহার কোথাও যাইতে হইলে আমাদের ভিন্ন আর কাহাকেও ডাকেন না। আর কতদিন আমাদিগের খাইবার কিছু না থাকিলে আমরা উহাঁর স্বামী নবীনদাসের নিকট যাইয়া দাঁড়াই, তিনি আমাদের চাল, ডাল, পয়সা না দিয়া বিদায় করেন না।"

রাখাল বলিতে লাগিল, "কিন্তু তথাপিও আমাদের কখন কখন চলা ভার হয়;—কতবার বৃষ্টি বাদলার দিন এমন হয় যে, আমাদের ঘরে খাবার নাই, আমরা ক্ষুধায় কাঁদি, মা আমাদের দেখিয়া কাঁদেন, পিতা রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়া থাকেন, মুখে একখানি বাতাসা দি, কি এক বিন্দু দুধ দি, এমন উপায় নাই। গ্রামে ধার চাহিলে ধার পাই না, গরিবকে কে ধার দিবে? মা এক একবার বলেন, 'যা নবীনদাসের কাছে কিছু ভিক্ষা করিয়া আন,'— কিন্তু আবার ঘর হইতে বাহির না হইতে হইতে ফিরাইয়া আনেন; বলেন, 'এ বাতাসে কোথাও যেও না, বাঁচিয়া থাক, বাঁচিয়া থাকিলে অন্ন জুটিবে'।"

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে দুইটী বালক কমলার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সে কথার শেষ নাই,—দুঃখীলোক যখন দুঃখের কথা বলিবার লোক পায়, তখন কি তাহার কথার শেষ থাকে?—হৃদয়ে দুঃখও যেরূপ অনন্ত, কথাও সেইরূপ অনন্ত। কিন্তু এ জগতে হতভাগাগন দুঃখের কথা বলিয়া একটু

রোদন করিবে এরূপ সময়ও কত অল্প; হতভাগার দুঃখকথা কে শ্রবণ করিবে? ধনীগণ ধনমদে মত্ত, বিলাসীগণ বিলাসে সংজ্ঞাহীন, কুল-মর্য্যাদা-গর্ব্বী লোক নীচদিগের সহিত কথা কহেন না,—জগতে সকলেই ধনমান-লাভাদি নিজ নিজ অভিপ্রায়ে ব্যতিব্যস্ত। দুঃখীলোক কাহার কাছে রোদন করিবে, হতভাগার দুঃখকথা কে শ্রবণ করিবে?

তিন জনে যাইতে যাইতে পথে মহাশ্বেতার সহিত দেখা হইল। তিনি নদীতীরে শিবপ্রতিমা পূজা করিয়া আশ্রমাভিমুখে যাইতেছিলেন। কমলাকে কিছুদূর হইতে দেখিয়া বলিলেন—

"কে ও কমলা? এস মা আশ্রমে যাই; এই অন্ধকারে ঝড়ের সময় কি তোমার বনে বনে বিচরণ করিবার উপযুক্ত সময়? আর ও দুইটী বালক কে?"

কমলা উত্তর করিলেন, "ও দুইটী নিরাশ্রয় বালক নৌকা লইয়া যাইতে-ছিল, এরূপ সময়ে ঝড় উঠিল, সুতরাং আজ আমাদের আশ্রমে অতিথি হইবে।"

মহা। "আহা! বাছাদের সমস্ত বস্ত্র সিক্ত, আয় শীঘ্র শীঘ্র আশ্রয়ে আয়। আর কমলা তোমার সহিত আমার সরলা গিয়াছিল, সে কোথায়? তুমি আপনি যেমন বনদেবী তাহাকেও তাই করিলে। বাছা রুদ্রপুরে অমলাকে যেমন ভালবাসিত এখানে তোমাকে সেইরূপই ভালবাসে। কিন্তু এখনও অমলাকে ভুলে নাই, তাহার জন্য দিনরাত্রি কাঁদে। এ জগতে বিপদকালে কয় জন বন্ধু হয়? যাহারা হয় তাহাদিগকে কি কেহ কখন ভুলিতে পারে?"

সরলার দিবারাত্রি ক্রন্দনের অন্য কারণ ছিল, তাহা কমলা জানিতেন, তথাপি মহাশ্বেতার সম্মুখে তাহা বলিলেন না। তিনি উত্তর করিলেন,—

"হাঁ, সরলা এক্ষণও অমলাকে বড় ভালবাসে, অমলার সঙ্গে আশ্রমা-ভিমুখে গিয়াছে।"

"আর বনদেবীর বুঝি এক্ষণও আশ্রমাভিমুখে যাইবার সময় হয় নাই, এক্ষণও বনে বনে বিচরণ করিতেছেন,"—এই বলিয়া শিখণ্ডিবাহন সম্মুখে আসিলেন।

কমলা কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন; বলিলেন, "শিখণ্ডিবাহন! তুমি এই রাত্রিতে আশ্রম হইতে কোথায় যাইতেছ?"

শিখ। "পিতা চন্দ্রশেখর আমাকে আপনার অন্বেষণে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সেইজন্য আমি বনাভিমুখে যাইতেছিলাম, বনদেবীকে

আর কোথায় পাওয়া যাইবে! আপনার সঙ্গে এই দুইটী বালক কে?”

এইরূপ নানা কথোপকথন করিতে করিতে মহাশ্বেতা, কমলা, শিখণ্ডিবাহন, আর সেই দুইটী দরিদ্র বালক আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

জমীদারের পূর্ব্বকথা।

But I have woes of other kind,
  Troubles and sorrows more severe,
Give me to ease my tortured mind,
  Lend to my woes a patient ear;
And let me—if I may not find
  A friend to help—find one to hear.

Crabbe.

চন্দ্রশেখর ও শিখণ্ডিবাহন ভিন্ন সে আশ্রমে আর কেহই মহাশ্বেতার প্রকৃত পরিচয় জানিতেন না। তাঁহারাও এ পরিচয়ের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না, বিশেষরূপে প্রতিশ্রুত ছিলেন।

চন্দ্রশেখর যেরূপ অনেক অনাথা ব্রাহ্মণকন্যাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, মহাশ্বেতাকেও সেইরূপ দিলেন। মহেশ্বর-মন্দির হইতে তাঁহার যে আয় হইত, তাহাতে অনায়াসেই সকলের ভরণপোষণ হইত।

আশ্রমের শান্ত, দ্বেষবিদ্বেষশূন্য নিবাসিগণের সহিত একত্র বাস করিতে করিতে মহাশ্বেতার অন্তঃকরণও কিঞ্চিৎ পরিমাণে শান্ত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সে বয়সে স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন কখনই হয় না। মহাশ্বেতার বিজাতীয় মান ও জিঘাংসা অন্তরে সেইরূপই জাগরিত ছিল স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া তিনি সেইরূপই প্রতিরাত্রি বৈরনির্যাতনের জন্য শিবপূজা করিতেন;—সেইরূপই প্রতিদিন বৈরনির্যাতনের আলোচনা করিতেন। শিখণ্ডিবাহন এবিষয়ে তাঁহার সহিত কথা কহিতে সাহস করিতেন না, মনে মনে ভাবিতেন, সিংহপত্নীকে শান্তরসাস্পদ আশ্রমে রাখিলেও তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় না।

আজি রাত্রি অতিশয় দুর্যোগবশতঃ অনেক জন অতিথি আশ্রমে আসিয়াছেন, আশ্রমবাসিগণ অতিথিসেবা অপেক্ষা অধিক আনন্দ জানিত না।

ব্রাহ্মণগৃহিণীগণ অতিথিদিগের জন্য অন্নপাক করিতে লাগিলেন, সহর্ষচিত্তে নানারূপ ব্যঞ্জনপাক করিয়া আপন আপন রন্ধন-কৌশল দেখাইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ সুনৃত বাক্যে অতিথিদিগকে সাদরসম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। গৃহে গৃহে শীত নিবারণার্থ অগ্নি জ্বলিতেছে, তাহার চতুঃপার্শ্বে বন্ধুবান্ধবে উপবেশন করিয়া মিষ্টালাপ করিতেছে; শুদ্ধান্তঃপুর হইতে গৃহিণীদিগের সংসারকথা শুনা যাইতেছে, কখন কখন বা অল্পবয়স্কদিগের সুমিষ্ট রহস্য-হাস্য শুনা যাইতেছে। জগতের মধ্যে এই আশ্রমটী শান্তি ও কুশলের স্থান বলিয়া বোধ হইতেছে।

চন্দ্রশেখরের কুটীরে অদ্য একজন অতি সমৃদ্ধিশালী অতিথি আসিয়াছেন বলিয়া অনেকেই খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ হইলে তথায় যাইয়া সমবেত হইলেন। সে আশ্রমটী এরূপ ক্ষুদ্র যে, তাহার মধ্যে সকলেই সকলকেই এক পরিবারের লোক বলিয়া মনে করিত, রমণীগণও সকল আশ্রমবাসিদিগের সহিত আলাপ সম্ভাষণ করিতে সঙ্কোচ করিত না। সুতরাং অদ্য রাত্রিতে চন্দ্রশেখরের প্রশস্ত কুটিরাভ্যন্তরে অনেক পুরুষ ও অনেক স্ত্রী একত্র হইলেন,—দুই একজন অপরিচিত অতিথি আসিয়াছে বলিয়া আশ্রমের রীতি ভঙ্গ হইল না।

গৃহের মধ্যস্থানে অগ্নি জ্বলিতেছে, অগ্নির ঠিক পশ্চাতে চন্দ্রশেখর বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ বর্ষেরও অধিক হইয়াছে। কিন্তু দিন দিন আশ্রমের শান্ত দেবকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াই হউক, বা মানসিক শান্তি বশতঃই হউক, তাঁহার প্রশস্ত ললাটে একটীমাত্র বার্দ্ধক্যচিহ্ন নাই। নয়ন দুটী জ্যোতিঃপূর্ণ, সমস্ত শরীর তেজঃপূর্ণ, সেই শরীরের উপর যজ্ঞোপবীত লম্বিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার নিজ দক্ষিণ পার্শ্বে সেই সমৃদ্ধিশালী অতিথি বসিয়া আছেন, তাঁহারও বয়ঃক্রম চন্দ্রশেখরের সহিত সমান হইবে, কিন্তু সংসার-চিন্তায় ও পার্থিব দুঃখে তাঁহার শরীর কি শীর্ণ করিয়াছে! মস্তকের কেশ অধিকাংশ পলিত হইয়াছে, ভ্রূযুগলের কেশও দুই একটী শুক্লবর্ণ হইয়াছে। চক্ষুতে জ্যোতিঃ নাই, বদনমণ্ডলে জ্যোতিঃ নাই, শরীরে বল নাই। হস্তপদাদি শীর্ণ হইয়াছে, চর্ম্ম শিথিল হইয়াছে। তাঁহাদিগের দুই জনকে দেখিলে সংসার ও সংসার-চিন্তার অকিঞ্চিৎকারিতা, অনিষ্টকারিতা ও যোগবল ও পুণ্যবলের গৌরব ও মহিমা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এই সমৃদ্ধিশালী অতিথি পাঠক মহাশয়ের নিতান্ত অপরিচিত নহেন,—ইনি ইচ্ছাপুরের জমীদার নগেন্দ্রনাথ।

সেই দুই জনের উভয়পার্শ্বে ও পশ্চাতে অনেক জন আশ্রমবাসী উপবে-

শন করিয়া রহিয়াছেন। চন্দ্রশেখরের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে, ঈষৎ অন্ধকারে মহাশ্বেতা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন,—অন্ধকারে থাকিলেও বিধবার শুভ্র বসনে আবৃত সে উন্নত কায় সকলেই দেখিতে পাইতেছিল, তাঁহার স্থির গম্ভীর ভাব দেখিয়া অবগুণ্ঠনসত্ত্বেও আশ্রমবাসী সকলেই তাঁহাকে চিনিয়াছিল। তাঁহার পার্শ্বে শিখণ্ডিবাহন বসিয়া রহিয়াছেন, মৃদু মৃদু কি কথা কহিতেছেন, এক একবার নগেন্দ্রনাথের দিকে লক্ষ্য করিতেছেন। চন্দ্রশেখরের বামহস্তের নিকট, অগ্নির সন্নিকটে কমলা বিনীত-ভাবে বসিয়া রহিয়াছেন, অগ্নির দিকে স্থির লক্ষ্য করিয়া কি চিন্তা করিতে-ছেন। এক একবার তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী সেই দুইটী নিরাশ্রয় বালকের প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন, স্নেহসহকারে তাহাদিগকে অগ্নিনিকটে বসাইতে-ছেন,—তাহাদিগের সিক্ত বসন উত্তপ্ত করিতেছেন, এক একবার তাহা-দিগের সংসারকথা, দুঃখকথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কুটীরের একপার্শ্বে অমলা ও সরলা বসিয়া রহিয়াছেন,—আজ তাহাদিগের আনন্দ অপার, তাহাদিগের গল্প শেষ হইতেছে না, তাহাদিগের সুমিষ্ট ওষ্ঠে সুহাসি শুকাই-বার সময় পাইতেছে না। অপর একটী পার্শ্বে নিস্তারিণী, মনোমোহিনী, যোগেন্দ্রমোহিনী ও তারাসুন্দরী ইত্যাদি অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মণকন্যাগণ আমোদ ও রহস্য করিতেছে, তাহাদিগেরও কথার শেষ নাই, আমোদের শেষ নাই,—এক একবার মুখে বসন দিয়া হাসি সম্বরণ করিবার চেষ্টা পাইতেছে, আবার এক একবার নিস্তব্ধ হইয়া চন্দ্রশেখর ও নগেন্দ্রনাথের কথা শুনিতেছে। ইহা ভিন্ন অপরাপর ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণকন্যা অগ্নির চারিপার্শ্বে বসিয়া কখন কখন আপনাদিগের মধ্যে কথা কহিতেছে, কখন নগেন্দ্রনাথের কথা শুনিতেছে।

নগেন্দ্রনাথ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রশেখরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মহাত্মন্! আমি আপনার বিস্তীর্ণ মহেশ্বর-মন্দির ও এই সুরম্য পুণ্যাশ্রম দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলাম। যদি আপনার মত মোহময় সংসার ত্যাগ করিয়া এই ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতাম, তাহা হইলে এই বার্দ্ধক্যে আমি অসীম দুঃখসাগরে ভাসিতাম না।" চন্দ্রশেখর উত্তর করি-লেন,—"মহাশয়, কেবলই কি আশ্রমে পুণ্যকর্ম্ম করা যায়, সংসারের মধ্যে থাকিয়া কি পুণ্যকর্ম্ম সম্ভবে না? শাস্ত্রে বলে দান, ধর্ম্ম ও পরোপ-কারিতায় যত পুণ্য, যাগযজ্ঞে তত নাই। যে জমীদার পরোপকারিতা ও প্রজাবাৎসল্যের জন্য সর্ব্বত্রই সমাদৃত হয়েন, তাঁহার কি আশ্রমবাসের জন্য আক্ষেপ উচিত?"

নগে। "মহাশয়! আপনি আমাকে অতিশয় সম্মান করিলেন, আমি সে সম্মানের যোগ্য নহি। যদি যোগ্য হইতাম, যদি মহাপাপী না হইতাম, তবে আজ পাপ প্রশমনার্থ মহাত্মা চন্দ্রশেখরের নিকট আসিতাম না।"

চন্দ্র। "এজগতে সহস্রগুণসত্ত্বেও কে মহাপাপী নহে? কে বলিতে পারে আমি পাপ করি নাই,—কে বলিতে পারে আমি নিষ্কলঙ্ক, নিরপরাধী?"

দুইজনে অনেকক্ষণ এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। অবশেষে নগেন্দ্রনাথ আপনার আসিবার কারণ বলিতে লাগিলেন; বলিলেন;—

"মহাত্মন্, আমার মত পাপী এজগতে আর কেহই নাই, আমার মত দুঃখীও আর কেহই নাই, আমার দুঃখকথা শ্রবণ করুন,—

"আমার সহধর্ম্মিণী আমাকে বলিতেন যে, যেদিন তাঁহার জন্ম হয়, সেদিন আকাশে অপরূপ তিথি-নক্ষত্র দেখা গিয়াছিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতে গণিয়া বলিয়াছিলেন যে, শিশুকন্যা ঘোর উন্মাদিনী হইবেন। সে ভ্রম, আমার সহধর্ম্মিণী উন্মাদিনী হয়েন নাই, কিন্তু তাঁহার কতকগুলি সুকুমার মনোবৃত্তি অতিশয় বেগবতী ছিল, সেজন্য আমি তাঁহাকে পাগলিনী বলিতাম। আজি দ্বাদশ বর্ষ হইল, সে স্নেহময়ী পাগলিনীর কাল হইয়াছে।

"পাগলিনীর গর্ব্ভে আমার দুইটী পুত্র জন্মে। তাহাদিগের গর্ব্ভধারিণীর মত দুই জনই পাগল। জ্যেষ্ঠটী চিন্তায় পাগল, কনিষ্ঠটী কার্য্য কর্ম্মে পাগল। সে দুইটী পুত্র আমার দুইটী নয়নের তারা ছিল,—আজ তাহারা কোথায়? হায় দারুণ বিধি! বার্দ্ধক্যে কি আমার কপালে এই লিখিয়াছিলে? আমার দুইটী নয়নই গিয়াছে, আমি অন্ধ হইয়াছি, দুইটী রত্ন হারাইয়াছি, আমি কাঙ্গালী হইয়াছি।"

সে দুঃখবচনে সকলেরই হৃদয় দ্রবীভূত হইল। ক্ষণেক পরে নগেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন—

"আমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে অল্প বয়সে ব্যাঘ্রে লইয়া যায়। তাহারই শোকে তাহার মাতা কালগ্রাসে পতিত হয়। কনিষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনাথের মুখ চাহিয়া আমি সে শোক সহ্য করিয়াছিলাম। আহা! সেরূপ বীরপুত্র কেহ কখনও দেখে নাই। দয়া, ধর্ম্ম, বিদ্যালোচনা, বল ও বিক্রমে সুরেন্দ্রনাথের মত কে ছিল? বৎস নবীনবয়সে সিংহবল ধারণ করিত, মল্লযুদ্ধে শত শত যোদ্ধাকে পরাস্ত করিয়াছে, অসীম বাহুবলে সকলকে বিস্মিত করিয়াছে, অশ্বচালনায় তাহার সমকক্ষ এদেশে কাহাকেও দেখি নাই। যে দেখিত,

সুরেন্দ্রনাথকে দয়াধর্ম্মে দাতাকর্ণ বলিত, বলবিক্রমে ভীমাবতার বলিত। বাল্যকালে সমরসিংহের নিকট যুদ্ধবার্ত্তা শুনিতে ভাল বাসিত, শুনিতে শুনিতে বালকের মুখ শু ত, নয়নদ্বয় তেজে অগ্নিবৎ প্রজ্জ্বলিত হইত, শিশু সমরসিংহের খড়্গ ধারণ করিত ও যুদ্ধে যাইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিত; রাজা সমরসিংহ অশ্রুপূর্ণলোচনে বালককে চুম্বন করিতেন। বাল্যকালেই তাহাকে রাজা সমরসিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে য়া যাইতেন। রাজা সর্ব্বদাই লিতেন, 'পাঠানেরা যথার্থই বাঙ্গালীদিগকে ভীরু বলিয়া ভৎসনা করে, কিন্তু সেই বাঙ্গালীর মধ্যেও মধ্যে মধ্যে বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ আমি মরিলে তুই আমার তরবারি লইবি, তোর হস্তে এ খড়্গের অপমান হইবে না।' আজি সে ব ক কোথায়! বিধাতঃ এক্ষণে আর কে আছে যাহার মুখ চাহিয়া আমি সুরেন্দ্রনাথের বিচ্ছেদ সহ্য করিব।"

বৃদ্ধ পুনরায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখর শোকার্ত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"সুরেন্দ্রনাথের কোন অমঙ্গল সমাচার শ্রবণ করিয়াছেন?"

নগেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "তাহা যদি শ্রবণ করিতাম, তাহা হইলে আর এতক্ষণ জীবিত থা তাম না, সেইক্ষণেই জীবন ত্যাগ করিতাম।"

চন্দ্র। "তবে এত চিন্তিত হইতেছেন কেন? সুরেন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্য বিদেশে গিয়াছেন, ঈশ্বর-ইচ্ছায় অবশ্যই কুশলে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।'

নগে। "আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাহাই হয়। কিন্তু আমি কল্য রাত্রিযোগে অতিশয় কুস্বপ্ন দেখিয়াছি, সেই জন্যই ব্যাকুল হইয়াছি,—সেই জন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি। বোধ হইল যেন ভীষণ সেনারাশির মধ্যে আমার পুত্রকে দেখিলাম, যেন যুদ্ধের ভীষণ কোলাহলে উন্মত্ত হইয়া আমার পুত্র শ্বেত অশ্বে আরোহণ করিয়া সাগর-তরঙ্গের ফেনচূড়ের ন্যায় সেনা-তরঙ্গের সর্ব্বাগ্রে ধ ত হইতেছে। আহা! বৎস অল্প বয়স হইতেই যুদ্ধে যাইয়া যশোলাভ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত, কিন্তু এখনকার ভীষণ মোগল পাঠানদিগের যুদ্ধে যদি লিপ্ত হইয়া থাকে, তবে কি আর তাহাকে ফিরিয়া পাইব? মুনিশ্রেষ্ঠ! এ স্বপ্নের অর্থ করিয়া দেন, যদি কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে তবে আমি এইক্ষণেই প্রাণত্যাগ করিব।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "শান্ত হউন" বলিয়া ক্ষণেক ধ্যান করিতে লাগিলেন। কুটীরের সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সরলা প্রিয় সইয়ের

স্কন্ধে মস্তকস্থাপন করিয়া উপবেশনাবস্থাতেই নিদ্রা যাইতেছিল, নিদ্রাতেও তাহার অধরে হাস্যকণা বিরাজমান রহিয়াছে। যেন প্রিয়সখীর স্পর্শসুখে নিদ্রাতেও আনন্দস্বপ্ন দেখিতেছে। অমলা অনন্যমনে জমীদারের কথা শুনিতেছিল, সুরেন্দ্রনাথ কে, তাহা জানিত না। মহাশ্বেতার শরীর ভয়ে কণ্টকিত হইয়াছিল।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহারই কার্য্যের জন্য যাইয়াছেন, সে কার্য্যও বিপদরাশিবেষ্টিত। মহাশ্বেতা ভাবিলেন, "আমি অভাগিনী যদি সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকি, তবে আপন শোণিত দিয়া ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব। ভগবান্! রক্ষা কর।"

অনেকক্ষণ পরে চন্দ্রশেখর চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া নগেন্দ্রনাথকে বলিলেন,—

"নিশ্চিন্ত হউন, আপনার সন্তান কুশলে আছেন।" নগেন্দ্রনাথের শরীরে যেন জীবন আসিল,—এ বিশাল বিপদাকীর্ণ সংসারে একমাত্র পুত্রবিয়োগের ন্যায় আর কি বিপদ্ আছে? তথাপি বোধ হয় মহাশ্বেতা চন্দ্রশেখর অপেক্ষাও অধিকতর আরাম বোধ করিলেন,—পুণ্যাত্মার হৃদয়ে মহাপাতকের ভয়, পুত্রবিয়োগের ভয় অপেক্ষাও গাঢ়তর ও ভীষণতর।

এ আশঙ্কা হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া নগেন্দ্রনাথ অন্যান্য কথা কহিতে লাগিলেন। পুত্র কবে গৃহে আসিবেন, এক্ষণও আসিলেন না কেন, অনেকবারত ভ্রমণ করিতে বাহির হয়েন; কিন্তু কখনও এতদিন বিলম্ব করেন নাই,—স্নেহবান্ পুত্র হইয়া পিতাকে ছাড়িয়া এতদিন কিরূপে আছেন, ইত্যাদি নানারূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পর চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন—

"মহাশয়, আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করি,—এবার আপনার পুত্রের এতদিন বিলম্ব করিবার বিশেষ কারণ আপনি কিছু জানেন, যাইবার সময় আপনাকে বিশেষ করিয়া কিছু বলিয়াছিলেন?"

নগেন্দ্রনাথ ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে বলিলেন,—

"আপনার নিকট আর আমি পাপ কথা লুকাইব কেন? আমার পুত্রের দোষ কিছুই নাই। বাছা যদিও পাগলের মত কখন কখন গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিত, তথাপি আমাকে ছাড়িয়া ক্রমান্বয়ে পাঁচ সাত দিন কখন থাকিতে পারিত না। এবার যে দুই মাস রহিয়াছে, সে কেবল আমারই পাপে।

"যখন আমার সুরেন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ, তখন আমি সপুত্রে রাজা সমরসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। আপনি জানেন রাজা সমরসিংহ আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত ভালবাসিতেন; আমাকে অতিশয় সম্মানপুরঃসর আলিঙ্গন করিতেন। আমরা দুইজনে কথা কহিতেছি আমাদের পার্শ্বে সুরেন্দ্রনাথ আর সমরসিংহের একটী দুহিতা ক্রীড়া করিতেছিল। ক্রীড়াচ্ছলে সেই দুহিতা একটী পুষ্পমাল্য লইয়া সুরেন্দ্রনাথের গলায় পরাইয়া দিল। রাজা কন্যাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন,—কন্যার এই কার্য্যটী দেখিয়া আনন্দে তাঁহার চক্ষুতে জল আসিল। আমাকে বলিলেন, 'নগেন্দ্রনাথ, অনেক রাজপুত্রের সহিত আমার এই কন্যার সম্বন্ধ হইতেছে; কিন্তু কন্যা যাহাকে আপনি বরণ করিয়াছে তাহারই সহিত আমি উহার বিবাহ দিব। তোমার পুত্রের সহিত আমার একমাত্র দুহিতার বিবাহ হইবে।' আমার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। বঙ্গচূড়ামণি রাজা সমরসিংহ আপনি একমাত্র দুহিতাকে যে এই অকিঞ্চিৎকর জমীদারের পুত্রের হস্তে অর্পণ করিবেন, তাহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর। সেইদিনই আমরা শপথ করিয়া অঙ্গীকারে বদ্ধ হইলাম,—সে শপথ আমি ভঙ্গ করিয়াছি।"

মহাশ্বেতা অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে তীক্ষ্ণ সকোপ কটাক্ষপাত করিতেছিলেন, তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইতেছিল। তিনি নগেন্দ্রনাথের মুখে এই কথা শুনিবার জন্যই সেদিন আসিয়া তথায় বসিয়াছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ আবার বলিতে লাগিলেন,—"আমি সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছি। সমরসিংহের মৃত্যুর পর আমি নিরাশ্রয় বিধবার কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিতে অসম্মত হইলাম। তখন আমি অন্য সমৃদ্ধিশালিনী পাত্রী স্থির করিতে লাগিলাম। অবশেষে এক উপযুক্ত পাত্রী পাইলাম। কিন্তু যদিও আমি অঙ্গীকারভঙ্গে তৎপর হইয়াছিলাম, আমার ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র তাহাতে অসম্মত হইল। একদিন আমাকে বলিল, 'পিতা, আমি আপনার কোন কথায় অবাধ্য হইতে পারি না, কিন্তু একটী বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করিবেন, আপনি রাজা সমরসিংহের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা ভঙ্গ করিতে দিব না।' এই যথার্থ কথায় আমি রুষ্ট হইলাম, তৎক্ষণাৎ নূতন পাত্রীর সহিত বিবাহের দিন স্থির করিলাম, বলপূর্ব্বক তাহার সহিত সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ দিবার উপক্রম করিলাম। কিন্তু আমার পুত্রের কথাই রহিল, ধর্ম্মের জয় হইল,—আমার পুত্র গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল,—বাছাকে সেই অবধি আর দেখি নাই।"

সুরেন্দ্রনাথ যে কেবল একটা পুরাতন প্রতিজ্ঞা রক্ষাহেতু পিতার অবাধ্য হয়েন নাই, তাহা পাঠক মহাশয় অবগত আছেন।

নগেন্দ্রনাথ আবার বলিতে লাগিলেন, "সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছি, কত পাপ করিয়াছি, সেই জন্য এই বৃদ্ধ বয়সে আমার এই যাতনা। কোথায় এই বয়সে আমার অশ্বিনী-কুমারের ন্যায় দুই পুত্র আমার হস্ত হইতে জমীদারীর ভার লইবে, কোথায় চন্দ্রাননা পুত্রবধূ বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবা শুশ্রূষা করিবে, তাহা না হইয়া আমার পুত্র নাই, পুত্রবধূ নাই, স্নেহময়ী সহধর্ম্মিণী নাই, অগাধ সমুদ্রে ভাসিতেছি,—মহাশয়! কি পাপে আমার এই অদৃষ্ট হইয়াছে,— কি করিলে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, তাহা আপনি বিধান করুন।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন,—"আমি আপনার জন্য পূজা দিতে ক্রটী করিব না; যাহাতে আপনার মঙ্গল হয় সেরূপ বিধান করিতে ক্রটী করিব না।"

শিখণ্ডিবাহন মহাশ্বেতার সহিত কথা কহিতেছিলেন,—তিনি নগেন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

"প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া যদি পাপ করিয়া থাকেন, সে প্রতিজ্ঞা পুনরায় পালন করিতে যত্নবান্ হউন।"

নগেন্দ্রনাথ কহিলেন, "শিখণ্ডিবাহন! আমি প্রতিজ্ঞা পালন করিব। রাজা সমরসিংহের অনাথা দুহিতাকে আনিয়া দাও, আমার সুরেন্দ্রনাথের সহিত অবশ্যই বিবাহ দিব। আর আমার পূর্ব্ববৎ গর্ব্ব নাই, পূর্ব্ববৎ অভিমান নাই। বার্দ্ধক্যে ও শোকদুঃখে আমার উচ্চ মস্তক নম্র করিয়াছে। এবার যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি, তাহা হইলে যেন আমি আর পুত্রের মুখ কখন না দেখিতে পাই। ইহা অপেক্ষা অভিশাপ আমি আর জানি না।"

শিখণ্ডিবাহন কোন উত্তর না করিয়া মহাশ্বেতার সহিত পুনরায় কথা কহিতে লাগিলেন। সে কি কথা হইতেছিল, পাঠক মহাশয় অনায়াসে অনুভব করিতে পারিবেন।

শিখণ্ডিবাহন বলিতেছিলেন, "ভগিনি! আর বিলম্বে আবশ্যক কি, আপনার পরিচয় দিন্।"

মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন, "যদি বিধাতা আমাদিগকে পূর্ব্বমত উন্নতি-সম্পন্ন না করেন, তাহা হইলে এজন্মে পরিচয় দিব না, এজন্মে কন্যার বিবাহ দিব না।"

শিখ। "কেন?"

মহা। "প্রথম কারণ আমার ব্রতভঙ্গ কখনই করিব না; 'কিন্তু তাহা অপেক্ষাও গুরুতর কারণ আছে।"

শিখ। "সে কি?"

মহা। "পরের নিকট অনুগ্রহ গ্রহণ করা আমার স্বামীর রীতি ছিল না। তিনি অপরকে অনুগ্রহ বিতরণ করিতেন, কাহারও নিকট গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার বিধবা নিরাশ্রয় হইয়াও সেই রীতি পালন করিবে।

শিখ। "আমি আপনার কথা বুঝিতেছি না, স্পষ্ট করিয়া বলুন।"

মহা। "আমি নিরাশ্রয় বিধবা,—নগেন্দ্রনাথ আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া, দয়া প্রকাশ করিয়া আমার কন্যার সহিত আপন পুত্রের বিবাহ দিবেন, ইহা আমি মরিলেও সহ্য করিব না। লোকে আমার কন্যার প্রতি অঙ্গুলি নিদর্শন করিয়া বলিবে, 'ইহার মাতা সূতা কাটিয়া খাইত, নগেন্দ্রনাথ অনুগ্রহ করিয়া ইহার সহিত আপন পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন।' আমি মরিলেও একথা সহ্য করিব না। শিখণ্ডিবাহন! মানিনী মৃত্যুভয় করে না, কিন্তু পরের নিকট দয়া বা অনুগ্রহ গ্রহণ করিতে ভয় করে।"

শিখণ্ডিবাহন অবাক্ হইয়া রহিলেন, বলিলেন—"তবে আপনি আমাকে নগেন্দ্রনাথের নিকট প্রতিজ্ঞাপালনের প্রস্তাব করিতে বলিলেন কেন?"

মহা। "এ অবস্থায় উনি প্রতিজ্ঞাপালনে সম্মত আছেন কি না দেখিবার জন্য,—আমি সম্মত নহি।"

এই কথোপকথন অতি অপরিস্ফুটস্বরে হইতেছিল, সুতরাং আর কেহই শুনিতে পায় নাই।

নগেন্দ্রনাথ আবার আপন দুঃখকথা বলিতে লাগিলেন। বৃদ্ধের কথা শীঘ্র শেষ হয় না; বিশেষ, দুঃখের কথা পরকে জানাইলে মনের দুঃখ কিছু শান্ত হয়।

নগেন্দ্রনাথের সামান্য দুঃখ নহে, যখন আপন অবস্থা চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন চারিদিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন, সংসার শূন্য দেখিতে লাগিলেন। স্ত্রী নাই, পরিবার নাই, পুত্র নাই, কন্যা নাই, জগৎসংসার অন্ধকার; বৃদ্ধ পুনঃ পুনঃ আপন দুঃখকথা বলিতে লাগিলেন, পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন।

অবশেষে চন্দ্রশেখর বলিলেন, "মহাশয়! আপনার মত জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যদি দুঃখশোকে সংজ্ঞাশূন্য হইবে, তবে অপর লোক কি করিবে?

আপনার পুত্র জীবিত আছেন, কুশলে আছেন। আমার বংশে কেহই নাই, আপনি যদি এইরূপ শোকবিহ্বল হইবেন, তবে আমি কি করিব ?"

নগেন্দ্রনাথ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি যে কখন বিবাহ করিয়াছিলেন তাহা আমি জানিতাম না। আপনার কি পুত্র-কন্যা কিছু হইয়াছিল ?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "পূর্ব্বকথা স্মরণ করা কেবল বিড়ম্বনামাত্র,—কিন্তু দুঃখীর দুঃখকথাই ভাল লাগে। আপনি আমার দুঃখকথা শ্রবণ করুন।"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

মহান্তের পূর্ব্বকথা।

To gather life's roses, unscathed by the brier,
Is given alone to the bare-footed friar.

Scott.

কুটীরে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, একে একে তাঁহারা প্রায় সকলেই উঠিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণপত্নী ও ব্রাহ্মণ কন্যাগণ সকলেই আপন আপন গৃহে গমন করিলেন, কমলা বালকদ্বয়কে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া একটী ঘরে শয়ন করিতে বলিলেন, আপনিও নিজ শয্যাগৃহে যাইয়া শয়ন করিলেন। শিখণ্ডিবাহনও উঠিয়া আপন আশ্রমে গমন করিলেন। কুটীরে নগেন্দ্রনাথ ও চন্দ্রশেখর ভিন্ন কেবল মহাশ্বেতা বসিয়াছিলেন, আর অমলা প্রিয়সখীর মস্তক আপন হৃদয়ে ধারণ করিয়া বসিয়াছিল। অমলা এতক্ষণ কিজন্য বসিয়াছিল, পাঠক মহাশয় জানিতে ইচ্ছা করিবেন।—অমলার কিসের ঔৎসুক্য যে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া থাকে ? অমলা ভাবিতেছে,—"নগেন্দ্রনাথের পুত্র পাগল, মধ্যে মধ্যে বাড়ী ছাড়িয়া গ্রামে গ্রামে বেড়ায়, লুকাইয়া কৃষকদিগের সঙ্গে বাস করে, আজ দুই মাস হইল কোন সন্ধান নাই, বলিষ্ঠ বীরপুরুষ, অশ্বিনীকুমারের ন্যায় সুন্দর; যদি ইন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথের পুত্র না হয়, তবে আমি কৈবর্ত্তের মেয়ে নহি। স্থির হও, বাপ যাহাকে বলে তাহাকে বিবাহ করিবে না, সমরসিংহের মেয়েকে বিবাহ করিবে,—সমরসিংহের বিধবা এক্ষণে নিরাশ্রয়; ছদ্মবেশে আছে, তাহার মেয়েকে বিবাহ করিবার জন্য ইন্দ্রনাথ পাগল হইয়াছে। ইন্দ্রনাথকে

বিবাহ করিবার জন্য ত সরলা পাগল হইয়াছে,—সই বলিল, 'ইন্দ্রনাথ তাহাকে সম্মত আছে,'—হরি হরি! আমার সই কি সমরসিংহের কন্যা? মহাশ্বেতাকে দেখিলেও রাজরাণীর মত বোধ হয়, সামান্য ব্রাহ্মণীর মত বোধ হয় না,—কাহারও সহিত অধিক কথা কহেন না, প্রত্যহ শ্বেত প্রস্তরের শিব পূজা করেন, বৃদ্ধ বয়সেও মুখে স্বর্গীয় মহিমা বিরাজ করিতেছে। আর সরলা,—সই আমার বক্ষের উপর গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। আমার বোধ হয় উহার মন ইহা অপেক্ষাও গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত,—আপনি রাজ-কন্যা হইয়াও আপনাকে রাজকুমারী বলিয়া জানে না। রাজকুমারীর সহিত আমি বন্ধুত্ব করিতে সাহস করিয়াছি। রাজকুমারীর পদবিক্ষেপে রুদ্রপুর ও বনাশ্রমের পথ ও ঘাট পবিত্র হইয়াছে। ভগবন্! তুমিই জান, আমি কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না।"—অমলা এইরূপ চিন্তায় অভিভূত হইয়া নিদ্রা ভুলিয়া গিয়াছিল।

চন্দ্রশেখরের পূর্ব্বকথা বলিতে লাগিলেন,—

"আমি অতি অল্প বয়স অবধি শিবপূজাভক্ত ছিলাম। ত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত সংসারাশ্রম গ্রহণ করি নাই; গুরুসেবায়, শাস্ত্রালোচনায় ও দেব-পূজায় কাল অতিবাহিত করিয়াছিলাম। অবশেষে বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলাম।

"মায়াজালে জড়িত হইয়া সংসারের সুখদুঃখ ভোগ করিতে লাগি-লাম,—যে সমস্ত অনির্ব্বচনীয় সুখ পূর্ব্বে কখন ভোগ করি নাই, এক্ষণে তাহা ভোগ করিতে লাগিলাম। যে সমস্ত কষ্ট ও ক্লেশ পূর্ব্বে কখন জানিতাম না, এক্ষণে তাহা অনুভব করিতে লাগিলাম। সংসার কি মোহ-জালে জড়িত! মায়া, প্রেম, বাৎসল্য, দয়া, এ সকল কি স্বর্গীয় সুখের আকর, আবার এই সকল হইতে কি অচিন্তনীয় দুঃখ উৎপন্ন হয়! গুরু-সেবায় ও দেবপূজায় যে শান্তিলাভ করিয়াছিলাম, এই মোহজালে জড়িত হইয়া এক্ষণে তাহা ভুলিলাম। সমভূমির উপর স্বচ্ছ নদী যেরূপ নিঃশব্দে শান্তভাবে বহিতে থাকে, আমার জীবন গুরুর আশ্রমে সেইরূপ বহিতে-ছিল, সহসা নিম্নভুমি পাইলে সেই প্রবাহিণী ঘোর গর্জ্জনসহকারে যেরূপ জলপ্রপাতস্বরূপ পতিত হয়, সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবামাত্র আমার জীবন সেইরূপ সহস্ররূপে বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইতে লাগিল। সে কয় বৎসর এক্ষণে আমার স্বপ্নসম বোধ হয়।

"অনেকদিন পর্য্যন্ত আমার পুত্র কন্যাদি কিছু হয় নাই। তাহাতে আমার পত্নী ও আমি দেবতার নিকট মানিলাম যে, প্রথমে আমার যে

সন্তান হইবে তাহাকে গঙ্গাসাগরে বিসর্জ্জন দিব। তাহারই দুই এক বৎসর পরে দেবকন্যার ন্যায় রূপলাবণ্য-সম্পন্ন আমার একটী কন্যা হইল। সে কন্যার মুখাবলোকন করিয়া আমরা পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা ভুলিলাম, পিতামাতার সাধ্যে ছিল না যে, সেই সুন্দর পুত্তলীটীকে বিসর্জ্জন দেয়।

"সে কন্যার মুখ আমি এক্ষণও বিস্মৃত হই নাই। চক্ষু দুইটী নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ ও শান্ত, চিত্তও নিরুপম শান্ত, প্রায় ক্রন্দন করিত না। যদি কখনও ক্রন্দন করিত, তাহার মাতা তাহাকে গৃহের বাহিরে লইয়া যাইয়া চন্দ্র দেখাইত বা কল্লোলিনী নদীর কলকলধ্বনি শুনাইত,—শিশু তাহাতেই একেবারে নিস্তব্ধ হইত। অল্প বয়সে কি হৃদয় স্বভাবের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে পারে?

"মায়ায় প্রতিজ্ঞা ভুলিলাম, কিন্তু সে পাপের ফল ফলিল। তিন বৎসর বয়ঃক্রমের সময় আমার কন্যার সঙ্কটজনক পীড়া হইল, জীবনের আশা রহিল না। তখন আমরা পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিলাম। দেবতার নিকট আবার মানিলাম, যদি কন্যা এই পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করে, তবে গঙ্গাসাগরে বিসর্জ্জন দিব। সে পীড়া আরাম হইল, হৃদয় হইতে মায়া উৎপাটিত করিয়া আমরা কন্যাকে গঙ্গাসাগরে বিসর্জ্জন দিলাম।

"বিসর্জ্জন দিবার অগ্রে তাহার বক্ষঃস্থলে এক অপরূপ চিহ্ন দিলাম—শিবের প্রতিমা অনপনেয় অঙ্কে অঙ্কিত করিয়া দিলাম, মানস ছিল, যদি বাছা সাগর হইতে পরিত্রাণ পায়, যদি তাহাকে কখন আবার দেখি, তবে আপন কন্যা বলিয়া চিনিব। বৎস পরিত্রাণ পাইয়াছিল,—এক দরিদ্র ব্রাহ্মণী তাহাকে জলরাশি হইতে তুলিয়া লইল,—কিন্তু সে কন্যাকে আর পাইলাম না।

"গৃহে আসিয়া দেখিলাম, আমার সহধর্ম্মিণী কন্যাশোকে বিহ্বল হইয়াছেন,—সেই শোকে তাঁহার পীড়া হইল, সেই পীড়াতেই তাঁহার কাল হইল। তাঁহার শব শ্মশানে সৎকার করিতে লইয়া যাইলাম। অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল, আমি সংজ্ঞাশূন্য পাগলের ন্যায় সেইদিকে দেখিতে লাগিলাম। সে সময় আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান থাকিলে আমি সে দুঃখভার বহন করিতে পারিতাম না,—জ্ঞান থাকিলে সেই অগ্নিরাশিতে মানবলীলা সম্বরণ করিতাম। অজ্ঞানের মত সেই চিতার দিকে চাহিয়া রহিলাম। অগ্নি জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিবিল,—আমার চারিদিকে ঘোর অন্ধকার হইল।

"তখন মায়াজাল সহসা ছিন্ন হইল। যে কুহা এতদিন জীবন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, সহসা তিরোহিত হইল। সংসারে আপনার বলিয়া সম্বোধন

করি এরূপ আর কেহই ছিল না। চারিদিকই শূন্য, ধূ ধূ করিতেছে ; যেদিকে চাই সেইদিক্ শূন্য দেখি,—সেইদিকেই মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে! পিতা নাই, মাতা নাই, বন্ধুবান্ধব কেহ নাই, জ্ঞাতিকুটুম্ব কেহ নাই। প্রণয়িনী কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন,—একমাত্র কন্যা অতল জলে ভাসিতেছে— এইরূপ পূর্ব্বস্মৃতিতে আমার হৃদয় ব্যথিত ও বিদীর্ণ হইতে লাগিল,—নদী-তীরে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম।

"সে দুঃখ রোদনে শান্ত হইল না,—প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রোদন করিলাম। সন্ধ্যার সময় আর সহ্য না করিতে পারিয়া আত্মহত্যার স্থির সংকল্প করিলাম। যাহার এ পৃথিবীতে কেহ নাই, যে মরিলে শোক করিবার কেহ নাই, অথচ নিজ অসহ্য শোক বিস্মৃত হইতে পারে, তাহার আত্মহত্যার বাধা কি?

"জলে মগ্ন হইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে স্কন্ধে কে হাত দিলেন। ফিরিয়া দেখিলাম, আমার প্রাচীন গুরু দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

"অতি গম্ভীরস্বরে বলিলেন—

"'এক্ষণও মায়াজাল ছিন্ন হয় নাই?—এক্ষণও জ্ঞান বিকাশ হয় নাই?—চন্দ্রশেখর অজ্ঞানের কার্য্য করিও না, আমার সঙ্গে আইস।'

"আমি সঙ্গে সঙ্গে এই মহেশ্বর-মন্দিরে আসিলাম। পুনরায় যোগ উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলাম, গুরুর মৃত্যুর পর অবধি আমিও মহেশ্বর-মন্দিরের মহান্ত হইয়াছি।"

এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে সহসা একজন বালক আসিয়া মহাশ্বেতাকে মৃদুস্বরে বলিল, "বিশ্বেশ্বরী পাগলিনী আপনার সহিত দেখা করিবার জন্য দণ্ডায়মান আছে।" মহাশ্বেতা অতি দ্রুতবেগে সেইদিকে চলিলেন, কিছু পথ যাইয়া পাগলিনীকে দেখিতে পাইলেন। তাহার ভীষণ আকার অধিকতর ভীষণ হইয়াছে, সমস্ত শরীর ভয়ে কাঁপি-তেছে, বলিল, "মহাশ্বেতা, এইক্ষণেই পলায়ন কর, শত্রু এই আশ্রমে আসিয়াছে।"

মহাশ্বেতা বলিলেন, "পাগলিনি! তুমি বিপদ্‌কালে চিরকালই আমার বন্ধু, তোমার ঋণ কিরূপে শোধ করিব?"

পাগ। "এক্ষণে আপন বিপদ্ হইতে উদ্ধারের চেষ্টা দেখ।"

মহা। "কোথায় পলাইব?"

পাগ। "রুদ্রপুরে বা ইচ্ছাপুরে, যথায় ইচ্ছা,—শীঘ্র পলায়ন কর।"

মহা। "আশ্রমবাসীদিগের নিকট বিদায় লইব না,—তাঁহাদের দয়া-দাক্ষিণ্যের জন্য একবার ধন্যবাদ দিব না?"

পাগ। "আর এক দণ্ড কাল এস্থানে থাকিলে নিশ্চয় মৃত্যু,—চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের চর আপনার সন্ধানে আশ্রমে বেড়াইতেছে।"

মহাশ্বেতা বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "আমার হৃদয়েও সেই সন্দেহ হইয়াছিল। সে কালসর্প না হইলে এ নিরাশ্রয় বিধবাকে দংশন করিতে কে ইচ্ছা করে? হায়! আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াও তোর মানস সম্পূর্ণ হয় নাই, আমাদের প্রাণে বধ করিবি? মৃত্যু!—মৃত্যুকে কে ভয় করে, যদি এই প্রাণের কন্যা না থাকিত, তবে আর কাহাকে ভয় করিতাম?"

পাগলিনী পুনরায় বলিল, "চিন্তার সময় নাই।"

মহা। "আমি যদি আপন পবিচয় দিয়া আশ্রমবাসীদিগের শরণাগত হই, তাহা হইলে কি পরিত্রাণ নাই?"

পাগ। "আশ্রম শুদ্ধ, মহেশ্বর-মন্দির শুদ্ধ উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারে এত লোক আসিয়াছে,—মহাশ্বেতা শীঘ্র পলায়ন করুন।"

মহা। "আমিই বা আপনার জন্য আশ্রমবাসীদিগের কেন দুর্ঘটন ঘটাইব?—আমার যাহা কপালে আছে হউক, মহেশ্বর! কন্যাকে রক্ষা কর। পাগলিনি! আমি চলিলাম, কিন্তু তুমি যে আপদ্ বিপদ্‌কালে আমাদের সহায়তা করিয়াছ, তোমার কি পবিচয় পাইব না?"

পাগ। "অন্য সময়, এখন শীঘ্র পলায়ন কর।" এই বলিয়া পাগলিনী অদৃশ্য হইল।

মহাশ্বেতা দ্রুতবেগে আপন গৃহে যাইয়া শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত ক্ষুদ্র শিব-প্রতিমা ও কিছু অর্থ লইয়া নদীতীরে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে ভাবিলেন, "এই রাত্রিতে কি নৌকা পাইব,—মাঝিরা কি কেহ ঘাটে আছে?"—ভাবিতে ভাবিতে নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, যথার্থই চিন্তা করিয়াছিলেন, দুই একখানি নৌকা ঘাটে আছে, কিন্তু এক-জনও মাঝি নাই। ইতস্ততঃ যাইতে যাইতে দেখিলেন, একখানি নৌকায় অনেক মাঝি আছে ও সকলেই জাগিয়া রহিয়াছে। কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন,—জিজ্ঞাসা করিলেন—

"বাপু, তোমরা রুদ্রপুরে যাইবে?"

নৌকারোহীগণ মহাশ্বেতা ও সরলার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্ষণেক পর বলিল, "যাইব, আসুন।"

মহাশ্বেতা আরও বিস্মিত হইলেন, কিন্তু চিন্তার সময় নাই, "ভগবান্ সহায় হও," বলিয়া মাতা কন্যা নৌকায় উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ নৌকা ছাড়িল।

মহাশ্বেতা আপনা হইতে শত্রুহস্তে আসিয়া পড়িলেন। সেই নৌকায় চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের চর আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে একজন আশ্রমে সন্ধান করিয়া মহাশ্বেতা ও সরলাকে চিনিয়াছিল, সেই বলিয়াছিল, "যাইব, আসুন।"

নৌকা চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গাভিমুখে চলিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

কারাবাস।

In low dark rounds the arches hung,
From the rude rock the side walls sprung,
* * * *

A cresset in an iron chain,
Which served to light this drear domain,
With damp and darkness seemed to strive
As if it scarce might keep alive,
* * * *

Fixed was her look, and stern her air,
Back from her shoulders streamed her hair,
The locks that wont her brow to shade,
Started up erectly from her head.

Scott.

প্রাতঃকালের স্বর্ণবর্ণ সূর্য্যরশ্মি চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের (আধুনিক চৌবেড়ে) শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। প্রাচীর, স্তম্ভ, গবাক্ষ, কক্ষ, ছাদ, সকলই আলোকময় করিতেছে, দুর্গপদচারিণী শান্তপ্রবাহিনী যমুনার উপর ঝক্‌মক্ করিতেছে। নদী-বক্ষে প্রকাণ্ড দুর্গের ছায়া প্রতিফলিত রহিয়াছে, আর দুই একখানি ক্ষুদ্র তরী ভাসিতেছে। শীতল সমীরণ ক্ষেত্রস্থিত শিশিরবিন্দুতে সিক্ত হইয়া অধিকতর শীতল হইয়া বহিতেছে ও ঘাটে যে সকল রমণী স্নান করিতে বা জল লইতে আসিয়াছে, তাহাদিগের শরীর পুলকিত করিতেছে। কৃষকগণ গরু লইয়া মাঠে যাইতেছে ও রহিয়া রহিয়া আনন্দে গান করিতেছে;— পক্ষীগণও তরুণ অরুণ-কিরণে পুলকিত হইয়া সেই

গানে যোগ দিতেছে। সমস্ত জগৎ আলোকময় ও আনন্দময়। এরূপ হতভাগিনী কে আছে, যে এই আনন্দের সময় শোকবিহ্বলা হইয়া রহিয়াছে?—মনুষ্যই মনুষ্যের দুঃখের কারণ।

সেই প্রকাণ্ড দুর্গের মধ্যে একটী ঘর ছিল, তথায় আনন্দদায়ী সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিতে পারিত না। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে একটী ভীষণ প্রকোষ্ঠ ছিল, তথায় শকুনি ইচ্ছামত বিদ্রোহী প্রজা বা পরম শত্রুকে কখন কখন বদ্ধ করিয়া রাখিতেন। সে গৃহের ভিত্তি আনন্দ বা হাস্যের ধ্বনিতে কখন প্রতিধ্বনিত হয় নাই,—সে গৃহের অভ্যন্তরে সুখ অথবা ভরসা কখন প্রবেশ করে নাই, তথায় কেবলমাত্র হতভাগ্য বন্দীদিগের ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইত, অশ্রুবিন্দু দৃষ্ট হইত। গৃহতল মৃত্তিকাময়, অন্ধকার নিবারণার্থ একটী হীনজ্যোতিঃ প্রদীপ দিবারাত্রি জ্বলিত। সেই প্রদীপালোকে সেই অসুখজনক গৃহতলে মহাশ্বেতা ও সরলা শয়ন করিয়া রহিয়াছে।

সরলা নিদ্রিত;—মাতৃক্রোড়ে শিশুর ন্যায় মহাশ্বেতার পার্শ্বে বালিকা নিদ্রিত রহিয়াছে, সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর সরলা নিদ্রিত রহিয়াছে। সরলার শরীর ক্ষীণ হইয়াছে; চক্ষু দুইটী কোটরে প্রবিষ্ট হইয়াছে; মুখমণ্ডলে পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্লতা বা বালিকাভাব দেখা যাইতেছে না, সরলা আর বালিকা নাই,—সহসা অসীম শোকসাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়া বালিকাসুলভ সুখস্বপ্ন হইতে জাগরিত হইয়াছে। সে জাগরণ কি ক্লেশদায়ী! সুখের আশা-ভরসা একেবারে দূর হয়, মানব-জীবনের প্রকৃত অবস্থা একেবারে সম্মুখীন হয়।

সরলার পার্শ্বে মহাশ্বেতা শয়ন করিয়া রহিয়াছেন,—অনিদ্র হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। সে ভীষণ স্থানে তাঁহার মুখে যে ভীষণ ভাব লক্ষিত হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত,—সে ভাব ভয়ের নহে, দুঃখের নহে, কেবল চিন্তার নহে। তাঁহার হৃদয়ের অমানুষিক অভিমান অদ্য ভীষণ কারাগারে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল, নয়ন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল; যেন অবারিত অগ্নিকণা বহির্গত হইতেছে;—সূক্ষ্ম ওষ্ঠের উপর দন্ত চাপিয়া রহিয়াছে; সমস্ত মুখমণ্ডলে উন্মত্ততার চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। ললাটের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, নয়ন নিমেষশূন্য, হৃদয় পূর্ব্বস্মৃতি ও চিন্তাতরঙ্গে প্লাবিত হইতেছে।

ক্ষণেক পর সরলা জাগিল। উঠিয়া মাতার মুখমণ্ডলে অপরূপ ভীষণভাব লক্ষ্য করিয়া ভীত হইয়া বলিল, "মা, সমস্ত রাত্রি তোমার নিদ্রা হয় নাই?"

মহাশ্বেতার চিন্তা-শৃঙ্খল সহসা ছিন্ন হইল, সরলার দিকে চাহিলেন, চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া মুখের বিকৃতভাব লীন হইল, চক্ষুতে জল আসিল। মনে মনে ভাবিলেন, "ভগবান্, এই মৃত্তিকাশয্যা যদি অগ্নিশয্যা হইত, তাহাও সহ্য করিতে পারিতাম, কিন্তু প্রাণের সরলাকে এ অবস্থায় দেখিয়া চক্ষুতে শূল বিঁধিতেছে।"

সরলা আবার বলিল,—

"মা, তোমার জন্য কল্য যে অন্ন রাখিয়া গিয়াছে, তাহা এক্ষণও স্পর্শ কর নাই, যেরূপ ছিল সেইরূপ আছে?"

মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন, "আহারে রুচি নাই।"

সরলা পুনরায় বলিল, "না খাইলে শরীর কতদিন থাকিবে?"

মহাশ্বেতা বলিলেন, "বাছা, আর শরীর থাকার আবশ্যক কি? ভগবান্ যদি অনুগ্রহ করিয়া ইহার অগ্রেই আমার মৃত্যু ঘটাইতেন, তাহা হইলে তোমাকে এ অবস্থায় দেখিতে হইত না।"

সরলা বলিল—"মা, তুমি না থাকিলে আমি কাহার মুখ চাহিয়া থাকিব, জগতে আর আমার কে আছে যে, তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে?"

মহাশ্বেতা সজলনয়নে উত্তর করিলেন, "না মা, হতভাগিনীর এখনও যাইবার সময় হয় নাই।"

যখন মহাশ্বেতা চিন্তা করিতেছিলেন, সরলাও চিন্তাশূন্য ছিল না। মাতার দুরবস্থা, আপনার দুর্দ্দশা, ইন্দ্রনাথের চিন্তা, এ সকলই সরলার দুঃখের কারণ। কিন্তু তাহার সরল হৃদয়ে এক সময়ে একটীর অধিক চিন্তা স্থান পাইত না। বালিকার হৃদয় অধিক দুঃখ কখন অনুভব করে নাই, অধিক দুঃখ সহ্য করিতে পারিত না,—একটী চিন্তায়, একটী দুঃখে সে হৃদয় পরিপূর্ণ হইত। বনাশ্রমে ইন্দ্রনাথের চিন্তায় সরলা দিবারাত্রি নিমগ্ন থাকিত,—এক্ষণে সে চিন্তা ও আপন দুঃখচিন্তা সকলই বিস্মৃত হইল, কেবল মাতার দুঃখ দেখিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইল। যে সময় মহাশ্বেতা চিন্তামগ্ন ছিলেন, সরলা একপার্শ্বে বসিয়া একদৃষ্টিতে মাতার দিকে অবলোকন করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে আপন নিবিড় কৃষ্ণ ভ্রূযুগল এক একবার কুঞ্চিত হইতেছিল, বিশাল নয়ন দুইটী জলে পরিপূর্ণ হইতেছিল, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাসে বক্ষঃস্থল স্ফীত হইতেছিল। মাতার দুঃখ দেখিয়া বালিকার হৃদয়ে যে কি যাতনা হইতেছিল, তাহা সেই বালিকাই জানে।

এমন সময়ে ঝন্‌ঝনা শব্দে কারাগারের দ্বার খুলিল। মহাশ্বেতা দ্বারের দিকে একবার চাহিয়াও দেখিলেন না। সরলা মুখ ফিরাইয়া দেখিল, একজন নিরুপমা সুন্দরী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন;—বলা আবশ্যক নাই যে, সে সুন্দরী বিমলা।

বিমলা কারাগারের ভিতর যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় একেবারে দুঃখে অধীর হইল। দেখিলেন, পূর্ব্বদিনের খাদ্যদ্রব্য এখনও স্পর্শ করা হয় নাই, একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক প্রায় উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছেন, পার্শ্বে একটী তাহার বালিকা বসিয়া নীরবে রোদন করিতেছে।

বিমলা আপন চক্ষু মুছিয়া, মহাশ্বেতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মাতঃ, আপনাদিগের কষ্ট দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, আপনারা বাহিরে আসুন।"

রমণীকণ্ঠনিঃসৃত করুণাসূচক কথা শুনিয়া মহাশ্বেতা সেইদিকে চাহিলেন,—জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" বিমলা উত্তর করিলেন, "এই দুর্গাধিপতি সতীশচন্দ্রের দুহিতা, আমার নাম বিমলা।"

ক্রোধে মহাশ্বেতা শিহরিয়া উঠিলেন। ক্ষণেক পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "তোমার পিতাকে বলিও, আমাদের আর অধিক দিন বাঁচিবার নাই,—যে কয়দিন আছি, আমাদিগকে নির্জ্জনে থাকিতে দাও, তোমরা আসিয়া বিরক্ত করিও না।"

অন্য সময় এরূপ উত্তর পাইলে মানিনী বিমলা ক্রুদ্ধ হইতেন, কিন্তু বন্দীদিগের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে ক্রোধের লেশমাত্র উদিত হয় নাই। তিনি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—

"আমার পিতার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিতেছেন, তিনি এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানেন না। আমি আপনাদিগকে বিরক্ত করিতে আইসি নাই, *এই জঘন্য ঘর হইতে অন্য ঘরে লইয়া যাইতে আসিয়াছি।*"

মহাশ্বেতা পুনরায় বলিলেন—

"বন্দীর এইরূপ ঘরে থাকাই ভাল,—যাহার চরণে শিকল, তাহার সে শিকল সুবর্ণের না হইয়া লৌহের হওয়াই উপযুক্ত! যাও, আর দয়াপ্রকাশে আবশ্যক নাই, হতভাগিনীদিগের কষ্টের উপর আর উপহাস করিও না।"

বিমলা সজলনয়নে উত্তর করিলেন—

"মাতঃ, আমি যে আপনাদিগকে উপহাস করিতে আইসি নাই, জগদীশ্বর জানেন"—

বিমলা আরও বলিতেন, কিন্তু মহাশ্বেতা ভীষণস্বরে বলিলেন—

"জগদীশ্বরের নাম করিও না,—তোমার পিতা যেন সে পবিত্র নাম কখনও গ্রহণ না করেন, নরাধমের বংশে যেন সে নাম কেহ গ্রহণ করিয়া অপবিত্র না করে।"

বিমলা গম্ভীরস্বরে বলিলেন—

"মাতঃ আপনি আমাদিগকে অন্যায় তিরস্কার করিতেছেন। আপনি যেরূপ হতভাগিনী, আমিও সেইরূপ,—হতভাগিনীর জগদীশ্বরের নাম ভিন্ন আর কি আছে?—মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেই নাম স্মরণ করিব,—এই দুঃখপরিপূর্ণ সংসারে হতভাগিনীর সেই নামই একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র সুখ।"

সে পবিত্র নাম শুনিয়া মহাশ্বেতার ক্রোধ একেবারে লীন হইল। বিমলার ঈশ্বর-ভক্তি দেখিয়া মহাশ্বেতা একদৃষ্টে তাঁহার দিকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, দেবকন্যার মত সেই উন্নতপ্রকৃতি রমণীরত্ন দণ্ডায়মান আছেন। নয়নে অশ্রুজল; মুখে স্বর্গীয় প্রেম ও ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হইতেছে না।

মহাশ্বেতা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—

"বিমলা, ক্ষমা কর; না জানিয়া তিরস্কার করিয়াছি, দুঃখে বিবেচনা-শক্তির লোপ হয়।"

বিমলা মহাশ্বেতাকে আর কথা বলিতে দিলেন না। নিকটে আসিয়া হস্তধারণ করিয়া বলিলেন—

"মাতঃ, ক্ষমা প্রার্থনার কিছুই কারণ নাই;—আপনিও দুঃখিনী, আমিও অল্পদুঃখিনী নহি, আমার অবস্থা জানিলে আপনি আমার প্রতিও দয়া করিবেন।"

মহাশ্বেতা বিমলাকে সস্নেহ আলিঙ্গন করিলেন, দুই জনে নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন;—হতভাগিনী সরলাও রোদন করিতে লাগিল। ক্ষণেক পর মহাশ্বেতা বলিলেন—

"বিমলা তোমার দুঃখ আমি বুঝিতে পারিতেছি। পিতার পাপকর্ম্ম দেখিয়া কোন্ ধর্ম্মপরায়ণা কন্যার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়?"

বিমলা উত্তর করিলেন, "মাতঃ আপনি এখনও ভ্রান্ত। আমরা যেরূপ হতভাগা, আমার পিতাও সেইরূপ হতভাগা, তাঁহার জীবন মরণ এখনও স্থির নাই। যে পামর আপনাকে ও আমাকে কষ্ট দিতেছে, সে পিতাকেও হতভাগ্য করিয়াছে,—আমি আশঙ্কা করি, সে পিতার মৃত্যু সঙ্কল্প করিতেছে।"

মহাশ্বেতা বিস্মিত হইলেন, ভাবিলেন, "সে কি,—সতীশচন্দ্র ভিন্ন ইহার ভিতর আর কে আছে?"

বিমলা মহাশ্বেতার চিন্তা দেখিয়া বলিলেন, "মাতঃ, উপরে আসুন, আমি সকল কথা আপনাকে অবগত করাইব।"

তিন জনে ধীরে ধীরে সেই জঘন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। বিমলা সরলাকে ভগিনী মত স্নেহ করিয়া লইয়া যাইলেন। তাঁহাদিগের আহারাদি সাঙ্গ হইলে বিমলা শকুনিসংক্রান্ত সমস্ত কথা মহাশ্বেতাকে অবগত করাইলেন। কেবল বিমলা আপনি যে সেই পামরের নিকট কত অনুনয় কত কষ্ট করিয়া তাঁহাদিগের কারামুক্তির অনুমতি পাইয়াছিলেন, সেই কথা লুকাইয়ার াখিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

এ স্বপ্ন নহে,—পূর্ব্বস্মৃতি।

O! these new tenants dare me call
Intruder in my father's hall!
Wall of my Sires, if ye could speak,
If ye could have a tongue,
Save by the owlet's awful shriek
Or raven's uncouth song,
Fain would I ask of days gone by
And o'er each tale would heave a sigh.

J. C. Dutt.

পৃথিবীতে এপ্রকার একরূপ লোক আছে যে, তাহাদিগের মুখ দর্শনমাত্রেই নির্দ্দয়ের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হয়, নিষ্প্রেমের হৃদয়ে প্রেমের উদ্রেক হয়, সকলেরই হৃদয়ে ভালবাসার উদ্রেক হয়। মুখের সে ভাব কেবল সৌন্দর্য্য নহে, কেননা সৌন্দর্য্য সকল হৃদয়কে সমরূপে আকৃষ্ট করিতে পারে না,—কতক সৌন্দর্য্য, কতক অমায়িকতা, কতক বালিকার লজ্জা, কতক বালিকার নির্দ্দোষিতা। এক একখানি মুখের সরলতা ও কিশোরভাব দেখিলে ইচ্ছা হয় যে, তাহাকে হৃদয়ে স্থান দিই, তাহার সন্তোষার্থে জগৎসংসার ত্যাগ করি; তাহার সুখসাধনের জন্য চিরকাল দাস হই। এক একখানি মুখের অনির্ব্বচনীয় শান্ত স্বাভাবিক মধুরিমা দর্শনে হৃদয়ে

সহসা শান্ত প্রগাঢ় ভালবাসার উদয় হয়,—কৃষ্ণ ভ্রূযুগলের বক্র শোভা, বিশাল শান্ত নয়নের স্থির জ্যোতিঃ, ওষ্ঠ দুখানির পরিমলসুধা, সমস্ত বদনমণ্ডলের বালিকাভাব দর্শনে হৃদয় একেবারে দ্রবীভূত হয়,—সেই বিশুদ্ধ প্রেমের প্রতিমাটীকে হৃদয়ে স্থান দিতে ইচ্ছা করে। সরলা পরমা সুন্দরী নহে, অথচ তাহার মুখে এইরূপ অনির্ব্বচনীয় ভাব ছিল, হৃদয়ও মুখের অবিকল প্রতিকৃতি। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যে বিমলা যে তাহাকে কনিষ্ঠা ভাগিনীর মত ভালবাসিবেন, আশ্চর্য্য নহে।

আর এক প্রকার আকৃতি আছে, যাহাকে নিরুপম সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিবার জন্য প্রকৃতি আপন ভাণ্ডার শূন্য করিয়াছেন। সে জ্যোতিঃপূর্ণ মুখমণ্ডল, জ্যোতিঃপূর্ণ নয়নযুগল, সূক্ষ্ম ওষ্ঠদ্বয়, উন্নত ললাট, তুলিকাচিত্রিতবৎ সূক্ষ্ম ভ্রূযুগল, তনু অঙ্গ, সুগঠিত সুদীর্ঘ অবয়ব, ধীর গম্ভীর পদবিক্ষেপ দেখিলে হৃদয়ে প্রেমের উদ্রেক হইবার অগ্রে ভক্তির উদয় হয়। সে উজ্জ্বল নয়নদ্বয়ে, সে উন্নত প্রশস্ত ললাটে হৃদয়ের উন্নত ভাব প্রকাশ পায়, সে সূক্ষ্ম ওষ্ঠদ্বয়ে হৃদয়ের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা বিরাজ করে। বিমলার এইরূপ সৌন্দর্য্য ছিল, তাঁহারও হৃদয় মুখের অবিকল প্রতিকৃতি। এইরূপ দেবীর অবয়ব দেখিয়া সরলা যে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় ভক্তি করিবে, দেবীর ন্যায় পূজা করিবে, তাহাও আশ্চর্য্য নহে।

সরলার হৃদয় হইতে দুঃখ দূর করিবার জন্য বিমলা তাহাকে দুর্গের চারিদিক্ দেখাইতে লাগিলেন। প্রথমে দুর্গের পশ্চাতে উদ্যানে লইয়া গেলেন। তথায় আম্রবৃক্ষের নিবিড় ছায়া দিবা দুই প্রহরকেও সন্ধ্যার ন্যায় সুস্নিগ্ধ করিয়াছে। দুইজনে সেই ছায়ায় ক্ষণেক বসিলেন, দুই প্রহরের মৃদু বায়ুতে অল্প অল্প পত্রের মর্ম্মর শুনা যাইতেছে, মধ্যে মধ্যে ঘুঘুর অতি মৃদুপ্রায় অপরিস্ফুট শব্দ শুনা যাইতেছে,—দুই প্রহরে এইরূপ সুস্নিগ্ধ স্থানে যে সেই রব শুনিয়াছে, তাহারই হৃদয় মোহিত ও শান্তিপরিপূর্ণ হইয়াছে।

উভয়ে উদ্যান হইতে সরোবরসমীপে গমন করিলেন। তাহার জল অতি বিস্তীর্ণ, চারি পার্শ্বের আম্রচ্ছায়া আপন স্থির বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। দুইজনে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সরোবরের ঘাটে বসিয়া রহিলেন, স্বভাবের নিস্তব্ধ শোভা দেখিয়া হৃদয় নিস্তব্ধ হইল। বিমলা মধ্যে মধ্যে কথা কহিতেছেন, সরলার মুখে কথা নাই, নিস্তব্ধ হইয়া শ্রবণ করিতেছে। ক্ষণেক পর বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"সরলা, অত মৌন হইয়া রহিয়াছ কেন? এক্ষণও কি দুঃখচিন্তা করিতেছ? ছি, সে সকল চিন্তা দূর কর।"

সরলা উত্তর করিল, "কৈ না, আমি ত আর সে চিন্তা করিতেছি না।"

সরলা সত্য কথাই বলিল,—তাহার হৃদয়ে প্রাতঃকালের দুঃখের চিন্তা ছিল না, অথচ বিমলার বোধ হইল, সরলার হৃদয় চিন্তাশূন্য ছিল না। স্নেহসহকারে তাহাকে একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় উঠাইলেন, আপনি তাহার দাঁড় ধরিয়া সেই বিস্তীর্ণ সরোবরে তরী চালন করিতে লাগিলেন।

সূর্য্য অস্ত যাইবার অনেক পূর্ব্বেই সেই ঘনচ্ছায়ান্বিত আম্রবেষ্টিত সরোবরে অন্ধকার হইতে লাগিল। বিমলার বোধ হইল, যেন তাঁহার প্রিয়সখীর সরলান্তঃকরণেও কোন দুঃখ-তিমির ঘনীভূত হইতেছে। সরলা আন্তরিক ভাব গোপন করিতে জানিত না, কখন চেষ্টাও করে নাই; বিমলা অনায়াসেই বুঝিতে পারিলেন যে, সরলার হৃদয়ে কোন খেদচিন্তা ঘনীভূত হইতেছে। তিনি যে সকল কথা বলিতেছিলেন সরলার তাহাতে মন নাই,—এক মুহূর্ত্ত মনোনিবেশপূর্ব্বক শুনিতেছে, আবার পরমুহূর্ত্তে চারিদিকে চাহিতেছে, আর কি চিন্তা করিতেছে। বিমলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"সরলা, আমার নিকট কেন লুকাইলে,—তুমি আবার সেই দুঃখচিন্তা করিতেছ। তুমি চারিদিকে অবলোকন করিতেছ, অদ্য সমস্ত দিনই অন্যমনস্কা হইয়া রহিয়াছ। ছি, সে দুঃখচিন্তা ত্যাগ কর, আইস, আমার নিকটে আইস।"

এই বলিয়া বিমলা অতি স্নেহসহকারে সরলাকে আপন পার্শ্বে বসাইয়া আপন হস্তে তাহার হস্ত ধারণ করিলেন।

সরলা উত্তর করিল, "তোমার কাছে লুকাইব কিজন্য,—সত্য, আমার মন কেমন কেমন করিতেছে, কিন্তু যথার্থ বলিতেছি, আমি সে দুঃখচিন্তা করিতেছি না।"

বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি চিন্তা করিতেছ?"

সরলা উত্তর করিল, "জানি, জানি না,—চিন্তা কিছুই নাই,—এক একবার মন কেমন কেমন করিতেছে।"

সরলা সম্পূর্ণ সত্যকথাই কহিয়াছিল। মন কিজন্য চঞ্চল হইতেছিল, তাহা বুঝিতে পারে নাই,—পাঠক মহাশয় যদি পারেন, অনুভব করুন।

সন্ধ্যা হইল, বিমলা ও সরলা উদ্যান হইতে পুনরায় দুর্গাভ্যন্তরে আসিলেন। তথায় আসিয়া বিমলা সরলাকে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে লইয়া যাইতে লাগিলেন ও নানারূপ অপরূপ ও বহুমূল্য সামগ্রী দেখাইতে লাগিলেন। আপনার শয়নাগারে লইয়া যাইলেন, তথায় একটী টিয়াপাখি ছিল, সে কথা কহিতে পারিত।

বিমলা সরলাকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "বল দেখি এ কে ?" পাখি বলিল, "এ কে ?"

বিম। "তুই বল্ না, আমি বল্‌ব কেন।"

পাখি। "বল্‌ব কেন।"

বিম। "তবে বুঝি তুই জানিস্ না।"

পাখি। "তুই জানিস্ না।"

বিম। "আমি জানি, তুই বল্ দেখি, সরলা বাহিরের কোন লোক, না এই বাড়ীর মেয়ে ?"

পাখি। "বাড়ীর মেয়ে।"

বিম। "পারিলিনি, দূর বাঁদী।"

পাখি। "দূর বাঁদী।"

সে গৃহ হইতে দুই জনে গৃহান্তরে গমন করিলেন। সরলা পাখীর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল। ভাবিল, "আমি কি এই বাড়ীর মেয়ে ?"

বিমলা পাখীর কথায় কিছুমাত্র বিস্মিত হয়েন নাই, পাখীর কতদূর বিদ্যা তাহা তিনি জানিতেন,—সে পাখীকে যে কথাগুলি বলা যাইত, কিছু না বুঝিয়া তাহার শেষ দুইটী কথা উচ্চারণ করিতে পারিত। বিমলাও এইরূপ করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, শেষ দুইটী কথা উচ্চারণ করিলে একরূপ উত্তর হয়।

তাহার পর বিমলা সরলাকে অন্য একটী কক্ষে লইয়া যাইলেন। কক্ষ দেখিবামাত্র সরলার বিষণ্ণতা দ্বিগুণ হইল, হঠাৎ অন্যমনস্কা হইয়া ভাবিতে লাগিল। বিমলা স্নেহভরে বলিলেন, "আইস, আবার চিন্তা কেন ?"

সরলা উত্তর করিল, "আমার মন আরও কেমন করিতেছে, যেন স্বপ্ন দেখিতেছি,—মা কোথায় ?"

বিমলা চাহিয়া দেখিলেন, সরলার চক্ষুতে জল,— নিস্তব্ধে তাহাকে মাতার নিকট লইয়া গেলেন। সরলা দ্রুতবেগে মাতার নিকট যাইয়া অশ্রুপরিপূর্ণনয়নে মাতার বক্ষঃস্থলে লুকাইল।

মহাশ্বেতা অতিশয় ঔৎসুক্য ও স্নেহের সহিত সরলাকে চুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কি মা, কি হইয়াছে ?"

সরলা উত্তর করিল, "মা, আমি জানি না, এ বাটীতে কি আছে, আমি আজ সমস্ত দিন যেন জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছি। সকল দ্রব্যই যেন দেখিয়াছি বোধ হইতেছে। একটা ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র যেন এক বীরমূর্ত্তি—

দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। মা, আমি পাগলিনী, সহসা সেই মূর্ত্তিকে পিতা বলিয়া ডাকিলাম। মা, আমি অজ্ঞান,—কিম্বা স্বপ্ন দেখিতেছি।”

মহাশ্বেতা আর শুনিতে পারিলেন না,— উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন,—অজ্ঞান বালিকার কথায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল।

শোকের প্রথম বেগ সম্বরণ হইলে মহাশ্বেতা কন্যাকে পুনরায় আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “সরলা, এ স্বপ্ন নহে, পূর্ব্বস্মৃতি তোমার হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে, যে কথা আমি এতদিন লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, যে কথা তুমি এতদিনে ভুলিয়া গিয়াছ বোধ করিয়াছিলাম, সে কথা আপনা হইতেই তোমার অন্তরে উদয় হইতেছে, আর আমি তোমার নিকট কিছু লুকাইব না।”

এই বলিয়া মহাশ্বেতা আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা সরলার নিকট বলিলেন। সরলার জন্মকথা, সমরসিংহের সম্মান ও গৌরবের কথা, তাঁহার অন্যায় মৃত্যুর কথা, আপনাদিগের পলায়ন ও ছদ্মবেশের কথা; এ সমস্ত কথা বালিকার সম্মুখে ভাঙ্গিয়া বলিলেন। সেই সকল কথা প্রথমে সরলার স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে মোহজাল অন্তরিত হইতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে দুই একটী কথা স্মরণ হইতে লাগিল। ঘর, দালান, স্তম্ভ দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বকথা জাগরিত হইতে লাগিল।

মহাশ্বেতার লৌহহৃদয়ও অদ্য দ্রবীভূত হইতেছিল, মাতা কন্যায় পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

বিমলা পার্শ্বে বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত, ওষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপিত, নয়ন হইতে বিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। তাঁহার মনের ভাব পাঠক মহাশয় অনায়াসে অনুভব করিবেন। শকুনি যে কতদূর পামর, পিতাকে যে কতদূর পাপকর্ম্মে লিপ্ত করিয়াছে, কিজন্য মহাশ্বেতাকে বন্দী করিয়াছে; এ সমস্ত চিন্তা মহা-বাত্যার ন্যায় ঘোর গর্জ্জনে তাঁহার হৃদয় আহত ও ব্যথিত করিতেছিল।

বিমলা সহসা চিন্তাস্বপ্ন হইতে জাগরিত হইয়া গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন,—“মাতঃ, পামর শকুনির পাপ আমি এতদিনে জানিলাম,— এ বিশ্বসংসারে উহার মত পাতকী আর নাই, নরকেও উহার মত কীট নাই। কিন্তু উপরে ভগবান্ আছেন, এ ভীষণ পাপের ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত আছে।”

এই গম্ভীর কথা শুনিয়া মহাশ্বেতা আপন চিন্তা ভুলিয়া গেলেন, বলিলেন,—“বৎস বিমলা, ভগবানের উপর আমার অচলা ভক্তি আছে, কিন্তু

তাঁহার অভিপ্রায়, তাঁহার লীলাখেলা আমরা বুঝিতে পারি না। না হইলে পাপের জয় কিজন্য ?"

বিমলা পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিলেন, "মাতঃ, আমার কথা অবধারণা করুন। পাপের জয় ক্ষণস্থায়ী মাত্র, পাপের ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত অধিক দূর নাই। আমি এই পামরের মৃত্যুর উপায় দেখিতে পাইতেছি,—আপনার স্বামীর মৃত্যুর প্রতিহিংসার বিলম্ব নাই।" এই বলিয়া বিমলা দ্রুতবেগে সে কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভিখারিণীর রত্ন।

Has sorrow thy young days shaded
  As clouds o'er the morning fleet ?
Too fast have those young days faded
  That even in sorrow were sweet !
Does time with his cold wings wither
  Each feeling that once was dear ?
Come, child of misfortune ! come hither,
  I'll weep thee tear for tear !

Moore.

সন্ধ্যার সময় মহাশ্বেতা পূজার্থ যমুনাতীরে গমন করিলেন, শকুনির তাহাতে আপত্তি ছিল না। যে দুর্গে তাঁহার যৌবনাবস্থা, তাঁহার সুখের দিন গত হইয়াছিল, যথায় তিনি বঙ্গকুলচূড়ামণি সমরসিংহের রাজমহিষী হইয়া কালযাপন করিয়াছিলেন,—আজি সেই দুর্গের পার্শ্বে হীন, নিরাশ্রয় বিধবা বন্দী হইয়া উপাসনা করিতেছেন। পূর্ব্বে দুর্গপার্শ্বে যে তরঙ্গময়ী যমুনা কলকল শব্দে প্রবাহিত হইত, আজিও সেই নদী সেইরূপ ভ্রুকুটী করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন নাই, কিন্তু মহাশ্বেতা পূর্ব্বে যে ভাবে ঐ নদীর প্রতি অবলোকন করিতেন, অদ্য কি সেই ভাবে অবলোকন করিতেছেন ? দূরে যে পল্লীস্থ বৃক্ষশ্রেণী দেখা যাইত, পার্শ্বে যে আম্রকানন দেখা যাইত, সম্মুখে যে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র দেখা যাইত, তাহাতে কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই, কিন্তু মানবহৃদয়ে কি ভীষণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে ! আজি সে পূর্ব্বগৌরব কোথায়, সে দুর্গাধিপতি কোথায়, সে বীরশ্রেষ্ঠ কোথায় ? গ্রীষ্মকালের প্রবল বাত্যায় যেরূপ শুষ্কপত্র দূরে নিক্ষিপ্ত হয়,

সমুদ্রের তরঙ্গমালার মধ্যে বারিবিন্দু যেরূপ লীন হয়,—অতীতকালরূপ অনন্ত সাগরে সেইরূপ গৌরব লীন হইয়াছে।

অনেকক্ষণ উপাসনা করিতে লাগিলেন। তিনি ছয় বৎসরকাল পর্য্যন্ত যে ব্রত ধারণ করিয়াছেন, আজিও সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কিছুমাত্র শৈথিল্য হয় নাই। সে ভীষণ ব্রত, সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, সে জিঘাংসা, তাঁহার জীবনের, তাঁহার ধর্ম্মের এক অংশ হইয়াছিল; স্বামীর মৃত্যুকালে তাঁহার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা আজি পর্য্যন্ত সততই তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত ছিল। পূর্ব্বপরিচিত অট্টালিকা, দুর্গ, নদী দেখিয়া সে কালাগ্নি দ্বিগুণ তেজে বিধবার হৃদয়ে জ্বলিতে লাগিল। সে কালাগ্নি যেন অন্য কাহারও হৃদয়ে না জ্বলে, জিঘাংসা যেন কাহারও ব্রত না হয়, কোন নরাধম প্রতিহিংসার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে যেন সাহসী না হয়। হৃদয় হইতে ক্রোধ, দর্প, অভিমান উৎপাটিত কর,—কেবল পরোপকার ও ধর্ম্মসঞ্চয়ের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর,—এ সংসারে কয়দিনের জন্য আসিয়াছ?

এদিকে বিমলা সরলাকে আপনার ঘরে লইয়া গিয়া দুই সহোদরার ন্যায় এক শয্যায় শয়ন করিলেন। বিমলা সরলাকে দেখিয়া অবধি তাহাকে ভাল বাসিতেন, কিন্তু যখন জানিলেন যে, শকুনি ও আপন পিতার পরামর্শে সরলা অনাথা হইয়াছেন, তখন আর তাহার প্রতি যত্নের সীমা ছিল না। পিতা যে অন্যায়, যে ঘোর পাপ করিয়াছেন, তাহার যদি পরিশোধ থাকে, বিমলা, মহাশ্বেতা ও সরলার প্রতি গাঢ় যত্ন ও স্নেহের দ্বারা তাহার পরিশোধ করিতে লাগিলেন। দুইজনে একত্র শয়ন করিয়া অনেকক্ষণ অবধি কথোপকথন করিতে লাগিলেন, দুইজনই অল্পবয়স্কা ও অবিবাহিতা, দুইজনের মধ্যে শীঘ্রই প্রগাঢ় ও পবিত্র ভালবাসার সঞ্চার হইল।

বিমলা বার বার সরলা ও মহাশ্বেতার অজ্ঞাতবাস ও কষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, বার বার পল্লীগ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সরলার মুখ হইতে সেই সকল গল্প শুনিতে শুনিতে বিমলার চক্ষু বার বার জলে পরিপূর্ণ হইল, পিতার পাপকর্ম্মে হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক বেদনা হইতে লাগিল, শকুনির চক্রান্তে তাঁহার শরীর কোপে কণ্টকিত হইতে লাগিল, চক্ষু রক্তবর্ণ হইতে লাগিল। সে সকল কথা বলিতে সরলার কিছুমাত্র দুঃখ হয় নাই,—চিরকালই আপনাকে সামান্য কৃষককন্যা বলিয়া জানিত, সে কথা বলিতে তাহার কষ্ট হইবে কেন? কিন্তু সরলা

যে কিছুমাত্র কষ্ট বা দুঃখ অনুভব না করিয়া দারিদ্র্য ও দুঃখের গল্প করিতেছে, ইহাতেই বিমলার উন্নত হৃদয় অধিকতর বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি অতি স্নেহসহকারে দুই বাহুদ্বারা সরলাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার ওষ্ঠের নিকট আপন ওষ্ঠ আনিয়া বার বার সেই সরলচিত্ত বালিকার মুখে সেই দারিদ্র্যের কথা, সেই পল্লীগ্রামে নিবাসের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, বার বার সেই এক কথা শুনিতে লাগিলেন, বার বার চক্ষুজলে সরলার নয়ন ও বদনমণ্ডল ও কেশরাশি সিক্ত করিলেন।

বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তোমরা যখন রুদ্রপুরে ছিলে, তখন তোমাদের বন্ধু কে ছিল? কৃষকপত্নীরাই কি তোমাদের বন্ধু ছিল?"

সরলা বলিল, "মা কাহারও সহিত অধিক কথা কহিতেন না, দিবাভাগে প্রায় চিন্তায় লিপ্ত থাকিতেন, সন্ধ্যার সময় উপাসনা করিতেন। আমার সহিত দুই এক জন গ্রাম্য স্ত্রীলোকের আলাপ ছিল। অমলা নামে এক মহাজনের স্ত্রী ছিল, তাহারই সহিত অধিক সময় আমার কথাবার্ত্তা হইত।"

বিম। "সে কি জাতি?"

সর। "জাতিতে কৈবর্ত্ত।"

বিম। "সে তোমাকে ভালবাসিত, তোমাকে যত্ন করিত?"

সর। "বোধ হয়, আমার মাতা ভিন্ন আর কেহ আমাকে সেরূপ ভালবাসিতে পারে না, তাহার কথা মনে হইলে এখনও চক্ষে জল আসে।"

বিম। "আচ্ছা, তোমারা কি ব্যবসায় করিতে?"

সর। "আমি বাড়ীতে সূতা কাটিতাম, চিত্র আঁকিতাম, আমাদের বাড়ীতে বাগান ছিল, তাহার ফল হইত, সুতরাং আমাদের কষ্ট হইত না।"

বিম। "সরলা, তোমাদের প্রতি যে কি অন্যায় হইয়াছে আমি বলিয়া শেষ করিতে পারি না। আমার সাধ্যে যদি থাকে, আপনি ভিখারিণী হইয়াও তোমাদের পূর্ব্বাবস্থা বজায় রাখিব।"

সর। "আমি সত্য বলিতেছি, পল্লীগ্রামে সেরূপ অবস্থায় আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইত না, কিন্তু মাতা দিবারাত্রি চিন্তা করিতেন, সেইজন্য আমার দুঃখ হইত। মাতাকে সুখে রাখ এই আমার ভিক্ষা।"

বিম। "সরলা, আমারও সেই ইচ্ছা, প্রাণ দিয়াও যদি তোমার মাতাকে সুখে রাখিতে পারি, তাহাতেও সম্মত আছি।"

সর। "কেন, তোমার অসাধ্য কি?—তোমাদের এত ধন, মানসম্ভ্রম!"

বিম। "সরলা, তুমি আমার সকল কথা জান না, যদি জানিতে, তবে আমাকে তোমা অপেক্ষাও হতভাগিনী বোধ করিতে। এ ধন, মান আর আমাদের নহে।"

সর। "কেন?"

বিম। "আমি প্রাতঃকালেই বলিয়াছিলাম যে, পামর শকুনি আমার পিতার প্রাণসংহার করিয়া এই দুর্গ ও জমীদারী হস্তগত কর্‌বার উদ্যোগ করিতেছে। আমার দিবারাত্রি পিতার চিন্তায় নিদ্রা হয় না। কিন্তু কেবল সেই দুঃখ নহে।"

সর। "আর কি?"

বিম। "সরলা, তোমার নিকট কিছু লুকাইব না। এই পামর আমাকে বিবাহ করিতে চাহে, তাহা হইলে পিতার মৃত্যুর পর অনায়াসে উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে। সরলা, আমার বলিতে লজ্জা করে, এই পামর নরাধম কয়েকদিন অবধি প্রত্যহই বিবাহের প্রস্তাব করিতেছে। আমি অস্বীকার করাতে বলপূর্ব্বক পাণিগ্রহণ করিতে চাহে। আজ তিন দিন হইল, আমাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল। আমি উপায়ান্তর না দেখিয়া সময় চাহিলাম, অতি কষ্টে তিন দিনের সময় পাইলাম। আজি রাত্রিশেষে সেই তিন দিন শেষ হইবে, কল্য প্রত্যূষে সেই নরঘাতক যমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। সরলা, আমা অপেক্ষা হতভাগিনী আর কে আছে?"

সরলা বিস্মিত হইল, ক্ষণেক পরে জিজ্ঞাসা করিল, "কাল পরিত্রাণ পাইবে কিরূপে?"

বিমলা অতি গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন,—

"কল্য জগদীশ্বর আমাকে উদ্ধার করিবেন, তাঁহার কৃপায় কল্য পরিত্রাণের অব্যর্থ উপায় পাইয়াছি। কল্য দিন গত হইলে নিশিযোগে পিতার নিকট পলায়ন করিব, তাহারও উপায় স্থির হইয়াছে। তাহার পর স্ত্রীলোকের হস্তে পামরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, তাহারও উপায় পাইয়াছি। ভগবান্, এই দুরূহ কার্য্যে অবলার সহায় হও।"

সরলা বিস্মিত হইয়া রহিল, বিমলা আপনার চিন্তায় অভিভূত হইয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "হাঁ,—মুঙ্গের যাইয়া পিতার পরিত্রাণ করিব,—হত্যার প্রতিহিংসা হইবে, পাপীর শাস্তি হইবে।—তাহার পর পিতার নিকট প্রার্থনা করিয়া এই দুর্গ মহাশ্বেতাকে পুনরায় দান করিব। আমি পিতার অন্তঃকরণ জানি, শকুনির পরামর্শ হইতে মুক্ত হইলে তিনি

ন্যায় কর্ম্ম করিতে অস্বীকার করিবেন না। আর তাহার পর জগদীশ্বরের যদি ইচ্ছা হয়, আমার হৃদয়েশ্বর মুঙ্গেরে আছেন,—সরলা, তুমি কখন প্রেমে পড়িয়াছ? তুমি বালিকা, সে চিন্তা, সে যাতনা এক্ষণও জান না।”

সরলা কোন উত্তর করিবে মনে করে নাই, কিন্তু তাহার মুখ হইতে হঠাৎ একটী কথা বাহির হইল—“জানি।” বিমলা চাহিয়া দেখিলেন, সরলার চক্ষে একবিন্দু জল!

বিমলা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “সরলা, এ কথা আমাকে এতক্ষণ বল নাই।” এই বলিয়া সরলার নিকট সমস্ত কথা বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সরলা লজ্জায় অভিভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত কথাই ব্যক্ত করিল।

বিমলা বুঝিতে পারিলেন, প্রগাঢ় প্রেমে বালিকার হৃদয় পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সে প্রেমের সীমা নাই, তল নাই। ভাবিতে ভাবিতে একবার গম্ভীর হইলেন, আর এক একবার হাসি আসিতেও লাগিল। ভাবিলেন, “সরলা আমারই মত বিপদে পড়িয়াও রমণীর প্রধান ধর্ম্ম বিস্মৃত হয় নাই;—আমারই মত উহার হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ;—আমারই মত অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়াছে;—হৃদয়েশ্বরের ঘর, বাড়ী, বংশ, কুল, কিছুই জানে না, পরমেশ্বর সরলার মনস্কামনা পূর্ণ করুন।”

পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “সরলা, তাঁহার নাম কি?”

সরলা মুখ লুকাইয়া বলিল, “ইন্দ্রনাথ!”

বলিবামাত্র বিমলা বজ্রাহতের ন্যায় শিহরিয়া উঠিলেন। সরলা দেখিয়া বিস্মিত হইল, বলিল, “কি হইয়াছে?”

বিমলা উত্তর করিলেন, “কিছু নহে,”—স্মরণ করিলেন, জগতে সহস্র ইন্দ্রনাথ থাকিতে পারে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাঁহার সহিত কবে তোমার শেষ দেখা হইয়াছে?”

সরলা বলিল,—“অদ্য দুই মাস হইবে তিনি কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য পশ্চিমে যাত্রা করিয়াছেন।”

বিমলা আরও বিস্মিত হইলেন,—ঠিক দুইমাস পূর্ব্বে তাঁহার ইন্দ্রনাথও পশ্চিম যাত্রা করিয়াছিলেন। পরে ইন্দ্রনাথের অবয়ব আকৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সরলা যে বর্ণনা করিল, ইন্দ্রনাথের প্রকৃত আকৃতি নহে, কেননা ইন্দ্রনাথ যেরূপ সুপুরুষ, সরলা তাহার দশ গুণ অধিক করিয়া ব্যাখ্যা করিল। কিন্তু বিমলার হৃদয়ে যে আকৃতি অঙ্কিত

ছিল, তাহার সহিত এই বর্ণনা মিলিল,—কেননা বিমলা ও সরলা দুই-জনেই ইন্দ্রনাথকে প্রেমচক্ষে অবলোকন করিয়াছিলেন,—দুই জনেরই হৃদয়ে একরূপ আকৃতি অঙ্কিত ছিল। বিমলার হৃৎকম্প হইতে লাগিল; শরীরে ঘর্ম্ম হইতে লাগিল, নিশ্বাস প্রশ্বাস গাঢ় হইয়া আসিল। অবশেষে তিনি সরলাকে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তাঁহার শরীরে কোন্ স্থানে কোন্ চিহ্ন আছে?"—নিষ্পন্দ শরীরে নির্নিমেষ নয়নে বিমলা এই প্রশ্নের উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সরলা বলিল, "তাঁহার বামহস্তের পৃষ্ঠদেশে একটী নিবিড় কৃষ্ণ যৌতুক আছে।"

বিমলা চীৎকার করিয়া শয্যায় বদন লুকাইলেন,—তিনি সে চিহ্ন মহেশ্বর-মন্দিরে বার বার লক্ষ্য করিয়াছিলেন,—তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে-ছিল।

সরলা বিমলার দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

"না," বলিয়া বিমলা সরলার হস্ত সজোরে নিক্ষেপ করিল।

সরলা বিস্মিত হইয়া আবার হস্ত প্রসারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথাও ব্যথা পাইয়াছ?"

বিমলা পুনরায় হস্ত সরাইয়া দিয়া উত্তর করিল, "না"—"হাঁ পাইয়াছি, হৃদয়ে"—"না, পাই নাই।"

সরলা অধিকতর বিস্মিত হইয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। সেইক্ষণে বিমলার হৃদয়ে বজ্রের আঘাত হইতেছিল।

ক্ষণেক পর সরলা অতি কাতর করুণস্বরে বলিল,—

"বিমলা, আমার উপর রাগ করিয়াছ? আমি কোন দোষ করিয়া থাকি ক্ষমা কর, আমি অতি অজ্ঞান, হতভাগিনী।"

সে করুণস্বরে কাহার হৃদয় দ্রবীভূত না হয়?—বিমলার হৃদয়ও দ্রবী-ভূত হইল; বলিলেন,—

"না সরলা, তুমি আমার কোন দোষ কর নাই,—আমাকে ক্ষমা কর, আমার শিরঃপীড়া আছে। নিদ্রা যাও, আমিও নিদ্রা যাই, তাহা হইলেই ব্যথা আরাম হইবে।"

সরলা আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া বিমলাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া আপনি ফিরিয়া শুইল। তাহার পূর্ব্বরাত্রির অনিদ্রাবশতঃ মুহূর্ত্ত-মধ্যেই নিদ্রায় অভিভূত হইল।

বিমলার নিদ্রা হইল না,—সে রাত্রিতে বিমলার যাতনা কে বর্ণনা করিতে পারে? যে ভীষণ বাত্যায় তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইতেছিল, তাহা ক্ষণকাল পরে নীরব হইল; কিন্তু শান্ত, নীরব, অথচ মর্ম্মভেদী শোকের প্রবাহ থামিল না। হৃদয়ে যে ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছিল, সরলার শান্ত বদনমণ্ডল ও মুদিত নয়নের দিকে দেখিতে দেখিতে তাহা ক্রমে লীন হইয়া গেল।

"এই নির্দ্দোষী বালিকা—এই নিরাশ্রয় অনাথা, ইহার কি দোষ, ইহার উপর কি আমি রাগ করিতে পারি। আমরাই সরলাকে অনাথা করিয়াছি, আমরাই মহাশ্বেতাকে বিধবা করিয়াছি, আমরাই তাঁহাদিগকে গ্রামে গ্রামে ভিখারিণীর মত বাস করিতে ও ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিতে বাধ্য করিয়াছি। সেই গ্রামে বাস করিয়া যে সরলা এত কষ্ট সহ্য করিয়াছে,—করিয়া জীবন ধারণ করিয়া আছে, সে কেবল একমাত্র আশায়,—সে প্রেমের আশা। দরিদ্রাবস্থায় সেই পল্লীগ্রামে যে রত্ন পাই-য়াছে, ভিখারিণীর সে রত্ন কি আমি কাড়িয়া লইতে পারি?—

"ভিখারিণী কে?—আমাকেই হৃদয়েশ্বর ভিখারিণী বলিয়া জানেন, সরলা, তুমিই সে ভিখারিণীর রত্ন কাড়িয়া লইতেছ। সরলা,' তোমাদের মান, সম্ভ্রম, সম্পত্তি, জমীদারী আমরা কাড়িয়া লইয়াছি, সে সকল ফিরাইয়া লও,—আরও চাহ, আরও আমাদিগের যাহা কিছু আছে কাড়িয়া লও, সকল সহ্য হইবে;—কিন্তু ভিখারিণীর এ রত্ন কাড়িয়া লইও না,—এ রত্ন কাড়িয়া লইলে হৃদয় বিদীর্ণ হইবে।" বিমলা দুঃখে অভিভূত হইয়া দুঃখিনীর ক্রন্দন কান্দিতে লাগিলেন,—দরবিগলিত অশ্রুধারায় শয্যা সিক্ত করিলেন।

আজি যথার্থই তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। তিনি শোকের প্রবাহে, যাতনায় অস্থির হইয়াছিলেন;—"হৃদয়েশ্বর! তুমি কাহার হইবে? সরলা! তোমার নিকট আমি কাড়িয়া লইব না,—পাপে আমা-দের বংশ পরিপূর্ণ আছে, আজি হৃদয়-রত্ন তোমাকে দিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।—হায়! বৃথা চেষ্টা, এ রত্ন হৃদয়ের অংশ হইয়াছে, এ প্রেম উৎপাটন করিলে হৃদয় উৎপাটিত হইবে।" পুনরায় অবিরল অশ্রু-ধারায় শয্যা সিক্ত করিলেন।

আবার ভাবিতে লাগিলেন, "সরলা! এ রত্ন তুমি কোথায় পাইয়া-ছিলে? দরিদ্র হইলে কি এ রত্ন পাওয়া যায়? পল্লীগ্রামে কুটীরে বাস করিলে কি এ রত্ন পাওয়া যায়? ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিলে কি

এ রত্ন পাওয়া যায়? আমি দরিদ্র হইব, কুটীরে বাস করিব, আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিব, আমাকে এ রত্নটী দাও। চিরকাল তপস্যা করিলে কি এ রত্ন পাওয়া যায়, সাগরে ঝাঁপ দিয়া প্রাণবিসর্জ্জন করিলে কি এ রত্ন পাওয়া যায়? আমি ভস্ম মাখিয়া তপস্বিনী হইব, আমি সাগরে ঝাঁপ দিব,—আমাকে এ রত্নটী দাও।—না সরলা, তোমার এ রত্ন আমি লইব না, পরের দ্রব্যে লোভ করিব না, পরমেশ্বর সহায় হউন, আমা হইতে সরলার যেন আর কষ্ট না হয়, আমি যেন পাপীয়সী না হই। না সরলা, আমি তোমার ইন্দ্রনাথকে লইব না, আমি আপন প্রেম বিসর্জ্জন করিলাম,—প্রেম উৎপাটন করিতে যদি হৃদয় উৎপাটন করিতে হয়, তাহাতেও স্বীকার আছি,—দেখিবে নারীর হৃদয়ে কত সহ্য হয়। আমি দিব্য করিতেছি, তোমার প্রণয়ে সপত্নী হইব না, সরলা! পরমেশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন।”

পরমেশ্বরের পবিত্র নাম স্মরণ করিলে কোন্ অভাগিনীর দুঃখ শান্তি না হয়। বিমলা পরমেশ্বরের নাম লইয়া হৃদয় সুস্থ করিলেন; প্রতিজ্ঞা করিলেন, হৃদয়ে যাহাই থাকুক, বাহ্যে ইন্দ্রনাথের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইবেন না।

প্রতিজ্ঞা করিলেন বটে, হৃদয় কথঞ্চিৎ শান্ত করিলেন বটে, কিন্তু একেবারে শোক নিবারণ করা তাঁহার সাধ্য ছিল না। যে নারী কখনও মুহূর্ত্তমধ্যে হৃদয়ের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বক্ষঃস্থল হইতে হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি বিমলার যাতনা বুঝিয়াছেন। রজনী অধিক হইল, বিমলার চিন্তার শেষ হইল না। এক একবার সরলার চিন্তাশূন্য মুখখানি ও মুদিত নয়ন দুইটী দৃষ্টি করেন, এক একবার চিন্তায় অভিভূত হয়েন, আর এক একবার চক্ষু দিয়া নীরবে জলধারা পড়িতে থাকে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—চক্ষুতে অশ্রু ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হইতে থাকে, ক্রমে ক্রমে চক্ষু পরিপূর্ণ হয়, শেষে ধীরে ধীরে সেই জল বদনমণ্ডল দিয়া বহিয়া শয্যায় পতিত হয়। আবার অশ্রু সঞ্চিত হয়, আবার চক্ষু পরিপূর্ণ হয়, আবার ধারা বহিতে থাকে। সেই গভীর রজনীতে সেই নীরব অশ্রুবিন্দু যে একের পর অন্যটী নিপতিত হইতেছিল, তাহা কে লক্ষ্য করিতেছিল? এই জগৎসংসারে রজনীযোগে যে কত নীরব অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়, তাহা কে লক্ষ্য করে?

ক্রমে রজনী প্রভাতপ্রায় হইল, আকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিল; ঘরের ভিতর আলোক প্রবেশ করিতে লাগিল। রজনীযোগে অশ্রুবর্ষণে

বিমলার হৃদয় শান্ত হইয়াছে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। বিমলা দেখিলেন, সরলা তখনও নিদ্রিত রহিয়াছে, গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ বদন-মণ্ডল আবৃত করিয়াছে, ওষ্ঠ দুইটী ঈষৎ ভিন্ন, তাহার ভিতর দিয়া মুক্তা-ফলের ন্যায় দন্ত দেখা যাইতেছে। বিমলা প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের আরাধনা করিলেন, তাহার পর সরলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ আমি তোমা অপেক্ষাও দরিদ্র ভিখারিণী হইলাম,—পরমেশ্বর তোমাকে সুখী করুন।" এই বলিয়া সস্নেহে সরলার ওষ্ঠে চুম্বন করিয়া সে কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

শেষ অবলম্বন।

"O! do not tempt," she said;
"O! do not add to my distress.
I have tasted much of bitterness."
* * *
But ah, fair maid, thou plead'st in vain,
His heart is proof to prayers.
Albeit like darksome floods of rain
Thou shedst they scalding tears.
* * *
One cry she gave, one shrink of wail;
Her hands, her tresses roved among,
Thence drew her mother's parting blade,
Now let the tyrant have his meed,
Now dagger do they deed.

S. C. Dutt.

উপরের পরিচ্ছেদে যাহা লিখিত হইল, তাহা পাঠ করিয়া কোন কোন পাঠিকা হাসিবেন,—বলিবেন, "স্ত্রীলোকে কি কখন সপত্নীর জন্য ইচ্ছা-পূর্ব্বক আপন প্রেম বিসর্জ্জন করিতে পারে? এমন অন্যায় লিখিলে বিশ্বাস করিব কেন,—লেখক স্ত্রীলোকের হৃদয় জানে না।"

আমরা স্বীকার করিতেছি, আমাদিগের সাধ্য কি যে স্ত্রীলোকের হৃদয় জানিব,—সে গভীর চক্রান্তে আমরা দন্তস্ফুট করিতে পারি, এরূপ সাহস করিয়া বলিতে পারি না। তবে বিমলার সম্বন্ধে আমাদের এইমাত্র বক্তব্য

যে, তাঁহার হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা যেরূপ দৃঢ় ও অভঙ্গুর ছিল, পুরুষের হৃদয়েও সেরূপ প্রায় দেখা যায় না। পরের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, ন্যায়ের জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার মুখে "হৃৎপিণ্ড উৎপাটন" করিবার কথাও আমরা দুই এক-বার শুনিয়াছি। আমাদের বোধ হয়, আবশ্যক হইলে তিনি তাহাও করিতে পারিতেন। এ কথাতে যদি পাঠিকাগণ সন্তুষ্ট না হয়েন, তবে আমরা নাচার!

ইন্দ্রনাথের প্রতি বিমলা যে উন্মত্তের ন্যায় আসক্ত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছে। যেদিন দুর্গে চারি চক্ষুর মিলন হইয়াছিল, সেই দিনই বিমলা পাগলিনী হইয়াছিলেন। কিন্তু গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অবধি সেই প্রেম গাঢ়ভূত হইবারও অনেক কারণ ছিল।

গৃহে যদি বিমলার অনেক সঙ্গী বা সঙ্গিনী থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া কালক্রমে মহেশ্বর-মন্দিরের কথা বিস্মৃত হইতে পারিতেন। কিন্তু গৃহে অনেক পরিবার থাকিলে সতীশ-চন্দ্রেরও শকুনির চক্রান্ত সাধনে ব্যাঘাত হইতে পারে, এইজন্য সে গৃহে অধিক লোক থাকিতে পাইত না। সচরাচর হিন্দু জমীদারের বাটী যেরূপ জ্ঞাতি, কুটুম্ব, কুটুম্বিনীতে পরিপূর্ণ থাকে, সতীশচন্দ্রের বাটী সেরূপ ছিল না। সুতরাং বিমলা অনেক সময়ে একাকী বসিয়া থাকিতেন,—সে সময়ে প্রথম প্রেমের চিন্তার মত আর কোন্ চিন্তা ভাল লাগে? দিন গত হইতে লাগিল; মাস গত হইতে লাগিল; সেই চিন্তা গাঢ়ভূত হইতে লাগিল;—তাহার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে প্রেম গাঢ়ভূত হইতে লাগিল।

গৃহে যদি বিমলার সুখের কারণ থাকিত, ভালবাসার পাত্র কেহ থাকিত, তাহা হইলে সেই সুখে অভিভূত হইয়া বা সেই পাত্রকে (ভ্রাতাই হউক, ভগিনীই হউক) ভালবাসিয়া বিমলা মহেশ্বর-মন্দিরের চিন্তা কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইতে পারিতেন। কিন্তু সতীশচন্দ্রের বংশের মধ্যে বিমলা একাকী, প্রাণের সহিত ভালবাসিবেন এরূপ একজনও লোক তথায় ছিল না। আর সুখ,—বিমলার সুখ কি, জগতে বিমলার সুখের কারণ কিছুই ছিল না। পিতা দূরে গিয়াছেন,—যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন সকল সময়েই অনিশ্চিত, তাহাতে আবার শকুনির যেরূপ ধূর্ত্ততা, বিমলার পিতার জন্য সর্ব্বদাই ভয় হইত। আর গৃহে সেই পিশাচ শকুনি বিমলাকে বিবাহ করিবার জন্য দিবারাত্রি জ্বালাতন করিতেছে। তাঁহার উন্নত চরিত্র ও স্থির সহিষ্ণুতা সত্ত্বেও তিনি এত কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেন না, এত দুঃখচিন্তা সহ্য করিতে

পারিতেন না। ভীষণ মেঘের অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুতালোক দেখা দেয়, মানবজাতির ঘোর দুঃখ-দুর্দ্দিনেও মায়াবিনী আশা দেখা দেয়।—কেবল দুঃখচিন্তায় মগ্ন হইয়া থাকে, মনুষ্যের প্রকৃতি এরূপ নহে। বিমলার দুঃখ-মেঘের মধ্যে বিদ্যুতালোক কি? বিমলার দুঃখ-দুর্দ্দিনে একমাত্র আশা কি?—ইন্দ্রনাথের প্রেমের চিন্তা,—রমণীর আর কি হইতে পারে? সেই দুঃখ ও চিন্তার্ণবে পতিত হইয়া বিমলা প্রেমস্বরূপ একমাত্র ধ্রুব-নক্ষত্রে স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া জীবনধারণ করিতেছিলেন,—দুঃখের মধ্যেও সুখ অনুভব করিতেছিলেন।

বিমলা যদি সামান্য বালিকার ন্যায় চঞ্চলচিত্তা হইতেন, তাহা হইলে দুঃখের সময় বাটীতে যে কয়জন স্ত্রীলোক থাকিত, তাহাদিগের নিকট দুঃখকথা বলিয়া তাহাদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া নিজ দুঃখ বিস্মৃত হইতে পারিতেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিমলা গম্ভীর-চিত্তা, উন্নতচরিত্রা, মানিনী স্ত্রীলোক ছিলেন,—আপনার সুখ দুঃখ নীরবে অনুভব করিতেন; আপনার পরামর্শ আপনিই করিতেন। এমন কি, সতীশচন্দ্রও কখন কখন আপন ধর্ম্মপরায়ণা মানিনী কন্যাকে ভয় করিতেন, কখন কখন তাঁহার নিকট পরামর্শ লইতেন। এরূপ স্থিরচরিত্রে কোন প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইলে প্রস্তরে অঙ্কিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় শীঘ্র বিলীন হয় না। মহেশ্বর-মন্দিরে বিমলার হৃদয়ে যে প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন অনপনেয়।

এই সকল ও অন্যান্য নানাবিধ কারণবশতঃ বিমলার হৃদয়ে যে প্রেম-সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা কালক্রমে অপনীত হইতে পারে নাই, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহেশ্বর-মন্দিরে যে বীর-মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, সে বীর-মূর্ত্তি, সে দেব-মূর্ত্তি সর্ব্বদাই তাঁহার নয়নের সম্মুখে জাগরূক ছিল, সর্ব্বদাই তাহার হৃদয়ে গভীরাঙ্কিত ছিল। সেই প্রেমের আশায় জলাঞ্জলি দেওয়া কি দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার কার্য্য, কি বীরত্বের কার্য্য, পাঠক মহাশয় এক্ষণে আলোচনা করুন। রমণী-হৃদয়ে ইহার অধিক বীরত্ব সম্ভবে না।

আজি বিমলার পক্ষে ভীষণ দিন। কিন্তু বিমলা বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে বিমলা শয্যাগৃহ হইতে অন্য একটী গৃহে যাইয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন,—অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উপাসনা করিতে লাগিলেন,—অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা কপোলদেশ প্লাবিত করিয়া বহিতে লাগিল।

উপাসনা সাঙ্গ হইলে বিমলা বাহিরে আসিলেন, আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে হাসিও আসিল, কান্নাও আসিল। দেখিলেন, সরলা একটী মৃণ্ময়-কলস কক্ষে লইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সরলা বলিল, "বিমলা, তোমার কলস কই? অনেক বেলা হইয়াছে, ঘাটে যাইবে না?"

বিমলা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? একি সরলা, কলস কেন?"

সর। "ঘাটে জল আনিতে যাইতেছি। বেলা হইয়াছে, এক্ষণও জল আনিলাম না, রান্না হইবে কখন্? আমি তোমার জন্যই দাঁড়াইয়া আছি।"

বিম। "রান্না অনেকক্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। আমরা ঘাটে যাইব কেন, আমরা জল আনিব কেন?"

সর। "তবে কে আনিবে? রুদ্রপুরে ত আপনারাই জল আনিতাম।"

বিমলার চক্ষে জল আসিল। সরলার হস্ত হইতে কলস লইয়া রাখিয়া দিয়া তাহাকে সস্নেহে বলিলেন,—

"আমাদের দাস-দাসী আছে, তাহারা সব কার্য্য করিবে, আমাদের কিছু করিতে হইবে না। যাও, তুমি মার কাছে যাও, তিনি এতক্ষণ উঠিয়াছেন।"

সরলা অতিশয় লজ্জিত হইয়া মাতার নিকট গমন করিল;—বিমলা আপন কক্ষে প্রস্থান কবিলেন। দেখিলেন, শকুনি তথায় অপেক্ষা করিতেছেন। দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, গাত্রের রক্ত শুকাইয়া গেল।

শকুনি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বিমলার দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সর্প যেরূপ ভেককে ভক্ষণ করিবার অগ্রে নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ শকুনি বিমলার দিকে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

বিমলাও নিষ্পন্দশরীরে দণ্ডায়মান হইয়া ভূমিদিকে একদৃষ্টে চাহিতেছিলেন। তাঁহার হৃদয় ভয়ে ও ক্রোধে জর্জ্জরীভূত হইতেছিল। পূর্ব্বরাত্রির কথা স্মরণ করিলেন, আজি দুই মাস অবধি জগতে যে একমাত্র সুখের আশা করিয়াছিলেন, সে আশা দূর হইয়াছে,—নারী-জীবনের একমাত্র আরাধ্য যে প্রেমের আশা করিয়াছিলেন, সে প্রেমে জন্মের মত জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন,—হৃদয়ের হৃদয়ে যে প্রতিমাকে স্থান দিয়াছিলেন, সে প্রতিমা চূর্ণ হইয়াছে, তাহার সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ও একেবারে চূর্ণ হইয়াছে। সেই সকল চিন্তা করিতে করিতে বিমলা অস্থির হইলেন, চক্ষে একবিন্দু জল আসিল, প্রকাশ্যে বলিলেন;—

"শকুনি, আমি হতভাগিনী,—আমার মত হতভাগিনী আর নাই, আমাকে আর দুঃখ দিও না, ক্ষমা কর।"

সে দুঃখের বচনে পাষাণও দ্রবীভূত হইত, শকুনির হৃদয় হইল না। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"এইজন্য বুঝি তিন দিন সময় চাহিয়াছিলে?"

বিম। "আমাকে সময় দিয়াছিলে বলিয়া তোমাকে ধন্যবাদ করিতেছি,—কিন্তু আমাকে ক্ষমা কর, আমার হৃদয়ে যে কষ্ট হইতেছে, তাহা তুমি জান না, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। শকুনি, আমাকে ক্ষমা কর।"

শকু। "বিবাহের আগে সকল স্ত্রীলোকেই ঐরূপ করে, শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় সকলেই কাঁদে, কিন্তু একবার গেলে আর বাপের বাড়ী আসিতে চাহে না।"

বিম। "শকুনি, উপহাস করিও না, আমি হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইতেছি,—উপহাস ভাল লাগে না।"

শকুনি ঈষৎ ক্রোধ সহকারে বলিলেন,—"আমি উপহাস করিতে আইসি নাই। তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা পালন করিতে সম্মত আছ, কি না?"

বিমলা দুঃখের স্বর ত্যাগ করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আমি কোন প্রতিজ্ঞা করি নাই।"

শকু। "প্রতিজ্ঞা না করিয়া থাক,—আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছ, কি না?"

বিম। "জীবন থাকিতে সম্মত হইব না।"

শকু। "আর আমার দোষ নাই, এক্ষণে বলপ্রকাশ করা ভিন্ন আর উপায় নাই।"

বিম। "আমার পিতা থাকিলে তুমি এরূপ কথা বলিতে পারিতে না। পিতার অবর্ত্তমানে, রক্ষাকর্ত্তার অবর্ত্তমানে নিরাশ্রয় অবলার উপর অত্যাচার করা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নহে।"

শকু। "আমি বালিকার নিকট ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম শিখিতে আইসি নাই।"

বিম। "তথাপি আমার কথা অবধারণা কর। দেখ, আমার পিতা তোমাকে কত অনুগ্রহ করেন;—তোমাকে দরিদ্রাবস্থা হইতে পুত্রের মত লালনপালন করিয়াছেন; তোমাকে অদ্যাপি পুত্রের মত যত্ন করেন। তাঁহার কন্যার প্রতি অত্যাচার করা তোমার বিধেয় নহে।"

শকুনি আপনার পূর্ব্বকার দরিদ্রাবস্থার কথা শ্রবণে আরও ক্রুদ্ধ হইলেন, বলিলেন,—

"তোমার পিতা সহস্র পাপ করিয়াও যে আজ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছেন, সে আমার অনুগ্রহ।"

পিতাব নিন্দাবাদে বিমলা আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না—আরক্ত নয়নে কহিলেন,—

"পামর তুমিই আমার পিতার সর্ব্বনাশ করিয়াছ, তুমি আবার তাঁহাকে তিরস্কার কর। কুক্ষণে ভৃত্যের বেশে এই দুর্গে আসিয়াছিলে, এক্ষণে প্রভু হইতে চাহ? ভৃত্যের সহিত বিবাহে বিমলা কখনও সম্মত হইবে না।"

শকু। "কাহার সম্মুখে এরূপ কথা বহিতেছ জান?—তোমার জীবন মরণ, তোমার পিতার জীবন মরণ আমার হস্তে তাহা জান?"

বিম। "জানি,—সতীশচন্দ্রের কন্যা সতীশচন্দ্রের ভৃত্যের সহিত কথা কহিতেছে, সে দিন যে নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণপুত্র অন্নের জন্য পিতার নিকট আশ্রয় লইয়াছে, তাহারই সহিত আমি কথা কহিতেছি।"

বিমলা স্বভাবতঃ মানিনী, পিতার নিন্দা কথা শুনিয়া তাঁহার ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার নয়নদ্বয় কোপে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল,—আলুলায়িত কেশ কপোলে ও উন্নত বক্ষঃস্থলের উপর পড়াতে তাঁহাকে উন্মত্তের ন্যায় দেখাইতেছিল। সে অপরূপ আকৃতি দেখিয়া শকুনিও কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন ও ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; মুহূর্ত্ত মধ্যে বিমলা কথঞ্চিৎ ক্রোধ সম্বরণ করিলেন ও ধীরে ধীবে বলিলেন,—

"আমার মিথ্যা রাগ, শকুনি, আমি জানি আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার অধীনে আছি। তোমাকে যে ভর্ৎসনা করিলাম সে কেবল ক্রোধে অন্ধ হইয়া, পিতৃনিন্দা আমি সহ্য করিতে পারি না,—আমার নিকট পিতার নিন্দা করিও না।"

শকু। "আমি তোমার পিতার নিন্দা করিতে আইসি নাই; তোমার পিতা আমার প্রতি যে দয়া করিয়াছেন তাহা আমি বিস্মৃত হই নাই; এক্ষণে যাহার জন্য আসিয়াছি তাহার উত্তর কি?"

বিম। "আমি জীবন থাকিতে তোমাকে বিবাহ করিতে পারিব না।"

শকু। "বিমলা, তুমি অতিশয় বুদ্ধিমতী, আমার হৃদয়ে দয়া, ক্রোধ, দুঃখ, প্রভৃতি নানারূপ প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া আমার মনস্কামনা হইতে বিরত হইতে চেষ্টা করিতেছ;—বিমলা, তাহা পারিবে না। আমি যে কর্ম্মে যখন দৃঢ়ব্রত হইয়াছি, জগৎসংসারে কোন লোকই আমাকে তাহা হইতে

নিরস্ত রাখিতে পারে নাই। তুমি বালিকা হইয়া যে এত দিন আমাকে এই বিবাহ হইতে নিরস্ত রাখিয়াছ, তাহাতে তোমার বুদ্ধি ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেছি; কিন্তু আর পারিবে না। অদ্যই তোমার সহিত আমার বিবাহ হইবে, আমি এতক্ষণ তোমাকে বলি নাই, সকল আয়োজনই প্রস্তুত আছে। পুরোহিত নীচে অপেক্ষা করিতেছেন, দিনের মধ্যে অন্য সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া রাত্রিতে আমাদিগের বিবাহ দিবেন। বিমলা, তুমি বুদ্ধিমতী, বিবেচনা করিয়া দেখ, আর বাধা দেওয়া নিরর্থক। তুমি বাধা দিলেই বলপ্রকাশ করিব, তবে মিথ্যা আর কি জন্য আপত্তি কর, আইস, দুইজনে নীচে যাই।"

এই কথা শুনিয়া বিমলা একেবারে জ্ঞানশূন্য হইলেন। কালসর্পে দংশন করিলেও এত চমকিত হইতেন না, তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞাও মুহূর্ত্তের জন্য যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। অজ্ঞানের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া বলিলেন,—

"পিতা, এ বিপত্তির সময় সহায় হও।"

শকু। "তোমার পিতা মুঙ্গেরে, তোমাব বৃথা প্রার্থনা।"

বিম। "তবে জগৎপিতা জগদীশ্বর আমার সহায় হও।" এই বলিয়া বিমলা হস্ত জোড় করিয়া উন্মত্তের ন্যায় আকাশের দিকে চাহিতে লাগিলেন। কেশরাশিতে বদনমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়াছে, বেশভূষা বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে; নয়নদুটী জলে পরিপূর্ণ অথচ অপার্থিব জ্যোতিতে জ্বলিতেছে; কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হইয়াছে, উন্মত্তের ন্যায় ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন,—

"জগৎপিতা জগদীশ্বর আমার সহায় হও।"

সে আকৃতি দেখিয়া শকুনি আবার নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। একদৃষ্টে সেই অপরূপ সৌন্দর্য্যরাশির দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিমলা ধীরে ধীরে তাঁহাকে বলিলেন,—

"শকুনি, তুমি জগদীশ্বরকে ভয় কর, এ পৃথিবীতে এত পাপ করিয়াছ, অবশ্যই জগদীশ্বরকে ভয় কর। আমি তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার ভ্রাতাস্বরূপ, আমি তোমার ভগিনীস্বরূপা, তুমি আমার পুত্রের স্বরূপ, আমি তোমার মাতার স্বরূপা,—আমাকে বিবাহ করিতে চাহিও না।"

জগদীশ্বরের পবিত্র নামে কোন্ পাপীর হৃদয় কম্পিত না হয়?—শকুনি আর সহ্য করিতে পারিল না। বলিল,—"হতভাগিনি! নির্ব্বোধ!

দেখিব, কে তোর সহায় হয়।” এই বলিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে কক্ষ হইতে বাহির করিবার উপক্রম করিল।

বিমলা উত্তর করিলেন,—

“পামর, নরাধম! এই বিপত্তিকালে ভগবান আমার সহায় হইবেন।”—এই বলিয়া শেষ উপায় অবলম্বন করিলেন, গত তিন দিন চিন্তা করিয়া যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বন করিলেন। বস্ত্রের ভিতর হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিলেন, নবজাত সূর্য্যরশ্মিতে সে ছুরিকা ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। ভীরু শকুনি বিস্মিত হইয়া আট হস্ত দূরে যাইয়া দাঁড়াইল।

বিমলা গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন,—

“আমি এই পণ করিলাম, যদি তুমি বা অন্য কেহ আমাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ দিবার চেষ্টা কর,—সেই মানসে যদি এই কক্ষের ভিতর প্রবেশ কর, তাহা হইলে আমি আপন বক্ষঃস্থল এই ছুরিকা দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া একেবারে সকল কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইব। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ বলহীনা, কিন্তু এ পণ হইতে আমাকে কে বিরত করিতে পারে দেখিব!”

শকুনি ক্ষণেক চিন্তা করিতে লাগিলেন,—“এ বাঘিনীর হস্ত হইতে ছুরিকা কাড়িয়া লওয়া সহজ ব্যাপার নহে। সেরূপ উদ্যোগ করিলে হঠাৎ হত্যাকাণ্ড হইতে পারে। থাক্, অদ্য থাক্,—নিদ্রাযোগে বিমলাকে বশ করা অনায়াসে সিদ্ধ হইবে, তাহার পর আর একদিনও শুভকার্য্যে বিলম্ব করিব না, অদ্য পরিত্রাণ পাইল, কল্য পরিত্রাণ পাইবে না।” এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শকুনি ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

নির্ব্বাসন।

And shall my life in one sad tenour run,
And end in sorrow as it first begun.

Pope.

সকল স্থির হইল। বিমলাকে অদ্য না হয় কল্য বিবাহ করিবেন, কিন্তু মহাশ্বেতার মুখ কিরূপে রুদ্ধ করা যায়? শকুনি তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল। সরলাকেও বিবাহ করিবে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। তাহার

পর মহাশ্বেতা ভীষণ ক্রোধপরবশ হইলেও আপন জামাতার উপর প্রতি-হিংসা লইয়া আপন একমাত্র কন্যাকে বিধবা করিতে সাহস করিবেন না।

এইরূপ প্রস্তাব শুনিয়া মহাশ্বেতা ক্রোধে অন্ধ হইলেন, কিন্তু যাহার ক্ষমতা নাই, তাহার ক্রোধ করা বৃথা। সরলা ভয়ে অস্থির হইল, কিন্তু শকুনি যে প্রতিজ্ঞা করে, তাহা অন্যথা করা কখনও কাহারও সাধ্য ছিল না। বিমলার পরামর্শানুসারে সরলা কিছু দিনের অবসর চাহিল,—যে পুর্ণিমা তিথিতে ইন্দ্রনাথের সহিত পুনরায় মিলন হইবার ভরসা ছিল, সেই দিন পর্য্যন্ত অবসর চাহিল। শকুনির তাহাতে কোন আপত্তি ছিল না, মনে মনে ভাবিলেন, যত বিলম্ব হউক না কেন, সিংহ-হস্ত হইতে মেষশাবকের উদ্ধারের উপায় সম্ভাবনা নাই।

সন্ধ্যাকাল সমাগত। বিমলা গোপনে মহাশ্বেতা ও সরলার নিকট বিদায় লইয়া ছদ্মবেশে একখানি নৌকায় আরোহণ করিলেন, সে নৌকা মুঙ্গেরাভিমুখে যাইতেছিল। দুর্গের অতি গুপ্ত স্থান হইতে কতকগুলি কাগজাদি লইয়া যাইলেন, শকুনির জীবন মরণ তাহার উপর নির্ভর করিত।

তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী বিমলা মুঙ্গেরনিবাসী পুরুষ বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া পুরুষের বেশধারণ করিয়া অন্য যাত্রীদিগের সহিত যাইয়া মিশিলেন।

আকাশ অন্ধকারময়, যত দূর দৃষ্ট হয়, সম্মুখে ও পশ্চাতে নদীর জল ধূ ধূ করিতেছে, রাশি রাশি মেঘ সেই নীল জলে প্রতিফলিত হইতেছে, অল্প বায়ুতে নদীর জল উচ্ছ্বসিত হইতেছে, তরঙ্গমালা ও ফেনরাশির মধ্য দিয়া নৌকা কল কল শব্দে চলিতেছে। উভয় পার্শ্বে কোথাও বা আম্র-কানন নিশাচরশ্রেণীর ন্যায় নিবিড় অন্ধকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ও বায়ুতে গম্ভীর শব্দ করিতেছে, কোথাও বা যতদূর শুভ্র বালুকারাশি বিস্তৃত রহিয়াছে, আকাশে দুই একটী নক্ষত্র দেখা যাইতেছে, মেঘ ক্রমাগত উড়িতেছে, কৃষ্ণবর্ণ মেঘের পর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ পশ্চিমদিকে রাশীকৃত হইতেছে;—নৌকা কল কল শব্দে চলিতেছে।

বিমলা নৌকার পশ্চাদ্ভাগে বসিয়া চতুর্বেষ্টিত দুর্গের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে হৃদয়ে কত যে চিন্তার আবির্ভাব হইতে লাগিল, কে বলিবে? ছয় বৎসর কাল যে দুর্গে অতিবাহিত করিয়াছেন, স্নেহময়ী মাতার যে দুর্গে মৃত্যু হইয়াছে, যথায় বাল্যকাল হইতে যৌবনকাল প্রাপ্ত হইয়াছেন, আজি সেই দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত সংসার-সাগরে ঝাঁপ দিলেন। সে সাগরের কি কূল আছে, বিমলা কি সেই কূল পাইবেন, আশ্রয়হীনা রমণী কি পিতাকে ফিরিয়া পাইবেন,—

সে দুর্গ কি আর কখন দেখিতে পাইবেন? এইরূপ সহস্র চিন্তাতরঙ্গে বিমলার নারীহৃদয় প্রতিহত হইতে লাগিল।

যিনি কখন অনেক দিনের জন্য দেশত্যাগী হইবার মানসে যাত্রা করিয়াছেন, পোতে আরোহণ করিয়া মাতৃভূমির দিকে সতৃষ্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, নিরীক্ষণ করিতে করিতে একেবারে সহস্র সুখদুঃখের কথা স্মরণ করিয়াছেন, সহস্র চিন্তায় অভিভূত হইয়াছেন, পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু প্রিয় ও সুখকর আছে, সজলনয়নে সকলের নিকট বিদায় লইয়াছেন, অল্প বয়সে সহায়হীন, বন্ধুহীন প্রবাসী হইয়া অনন্ত সংসার-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন, তিনিই বিমলার সে রাত্রির ঘোর চিন্তা ও ঘোর দুঃখ অনুভব করিতে পারেন। একাকী নৌকার পশ্চাদ্ভাগে ব'সয়া সেই গভীর অন্ধকার রজনীতে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের দিকে দেখিতে লাগিলেন। জলের কল কল শব্দ শুনিতেছিলেন না, আম্রকাননে গম্ভীর শব্দ শুনিতেছিলেন না, তরঙ্গমালার উচ্ছ্বাস ও ফেনরাশির খেলা দেখিতেছিলেন না, ঘোর মেঘের ছটা দেখিতেছিলেন না, কেবল চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ দেখিতেছিলেন, আর সহস্র গভীর চিন্তায় অভিভূত রহিয়াছিলেন। সে ভাবনার শেষ নাই, আকাশ যেরূপ অনন্ত, নদীর স্রোত যেরূপ অবারিত, সে চিন্তাস্রোতও সেইরূপ অনন্ত ও অবারিত। ভাবিতে ভাবিতে বিমলা চারিদিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার স্বভাবতঃ বীরান্তঃকরণ অদ্য দ্রবীভূত হইতে লাগিল,—যখন চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া আর সে দুর্গ দেখিতে পাইলেন না, কেবল দুর্ভেদ্য তিমিররাশি দেখিতে লাগিলেন, তখন হস্তদ্বয়ে মুখ আবরণ করিয়া দরবিগলিত অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিলেন, অনেক শোক, অনেক আঘাত না হইলে তাঁহার ন্যায় সর্ব্বসহ অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হয় না;—এতক্ষণ ও এত অধিক ক্রন্দন করিলেন যে, তাঁহার অঙ্গুলীর মধ্য দিয়া অশ্রুজল বাহির হইয়া হস্তদ্বয় ও বক্ষঃস্থল একেবারে সিক্ত হইয়া গেল।

হা সংসার! হা অসার জগৎ! তোমার মধ্যে বিমলার ন্যায় কত উন্নতচরিত্রা, ধর্ম্মপরায়ণা, অভাগিনী অন্ধকারে একাকিনী বসিয়া দিন দিন রোদন করিতেছে, সে রোদন কেহ দেখে না, কেহ শুনে না, কেহ জানে না, সে রোদন অলক্ষিত, অবারিত, অশান্তিপ্রদ! কত নির্ম্মলচরিত্রা অনাথার জীবন জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত কেবল শোক-দুঃখে পরিপূর্ণ, সে দুঃখ কেহ জানে না, যদি জানে, তবে মোচন করে না, সে দুঃখিনীর সমদুঃখিনী কেহ হয় না, কেবল অকূল নদীর জল কল কল শব্দে ও অনন্ত আম্রকানন মর্ম্মর শব্দে সে দুঃখের জন্য রোদন করে! হা অসার জগৎ! তোমার মধ্যে

কত পাপিষ্ঠ, পাপপরায়ণ ধনে, মানে, গৌরবে জীবন অতিবাহিত করিতেছে, লোকের প্রশংসাভাজন হইতেছে। যদি আমাদের ইচ্ছাধীন হইত, কে এ জগতে জন্মগ্রহণ করিত?

বিমলা যে নিরাপদে মুঙ্গের পঁহুছিয়াছিলেন, তাহা পাঠক মহাশয় জানেন। যে দিন পঁহুছেন সেই দিনই ইন্দ্রনাথের প্রাণরক্ষা করেন। তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ।

অপরূপ বূহ।

Yet though thick the shafts as snow,
Though charging knights like whirlwinds go,
Through billmen ply their ghastly blow,
  Unbroken was the ring.
The stubborn spearmen still made good,
Their dark impenetrable wood,
Each stepping where his comrade stood,
The moment that he fell.

Scott.

শক্ররা এক্ষণও মুঙ্গের অবরোধ করিয়া বসিয়া আছে, টোডরমল্ল এক্ষণও অসাধারণ যুদ্ধকৌশল প্রকাশ করিয়া দুর্গ রক্ষা করিতেছিলেন। ইন্দ্রনাথ দিন দিন খ্যাতিলাভ করিতেছিলেন, সুযোগ পাইলেই আপনার পঞ্চশত অশ্বারোহী লইয়া শক্রদিগকে আক্রমণ করিতেন,—অল্পসংখ্যক্ শক্র-সৈন্য কোথাও আছে এরূপ সংবাদ পাইলেই মহারাজের অনুমতি লইয়া তাহা-দিগকে আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিতেন, অধিক শক্র আসিবার পূর্ব্বেই দুর্গে প্রবেশ করিতেন। বার বার এইরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া শক্ররা ব্যতি-ব্যস্ত হইল,—দুর্গবাসিগণ নব সেনাপতির রণকৌশল, সাহস ও বীরত্ব দেখিয়া সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন, দিন দিন তাঁহার বীরত্বের যশ বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল।

এক দিন সূর্য্য অস্ত যাইবার সময় রাজা টোডরমল্ল শক্রদিগের শিবির দর্শনার্থ দুর্গের প্রাচীর ছাড়িয়া প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে গিয়াছিলেন। শক্রর শিবির সে স্থান হইতে অনেক দূরে, সুতরাং কোন ভয়ের কারণ ছিল না।

বিশেষ মহারাজ ছদ্মবেশে গিয়াছিলেন ও তাঁহার সঙ্গে পঞ্চাশৎ জন অশ্বারোহী ছিল। অশ্বারোহীগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, রাজা এক-দৃষ্টে শত্রুর দিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সহসা শত্রুপক্ষীয় চারি জন অশ্বারোহী পার্শ্বস্থ বনের ভিতর হইতে বাহির হইয়া রাজাকে আক্রমণ করিল। রাজার অনুচরগণ না আসিতে আসিতেই শত্রুপক্ষীয়দিগের মধ্যে একজন খড়্গ উত্তোলন করিয়াছিল, এমন সময় নিকটস্থ আম্রকানন হইতে সহসা অপর একজন অশ্বারোহী তীরবেগে বহির্গত হইয়া নিমেষ-মধ্যে সেই খড়্গধারীর মস্তকচ্ছেদন করিলেন। সকলেই চাহিয়া দেখিল, ইন্দ্রনাথ! শত্রুগণ বেগে পলায়ন করিল।

ইন্দ্রনাথের বীরত্বের সাধুবাদ করিবার অবকাশ ছিল না। সকলেই বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, দূরে ধূলিরাশি দেখা যাইতেছে। আরও দেখিলেন, একজন অশ্বারোহী বায়ুবেগে রাজার দিকে ধাবমান হইতেছে,—দেখিলে বোধ হয়, যেন অশ্ব ভূমি স্পর্শ করিতেছে না। সে অশ্বারোহী মুহূর্ত্তমধ্যে নিকটবর্ত্তী হইল, সকলেই চিনিলেন; সে মহারাজের একজন চর। রাজার নিকটবর্ত্তী হইয়া সে লম্ফ দিয়া ঘোটক হইতে অবতীর্ণ হইল, অশ্ব এত বেগে দৌড়াইয়া আসিয়াছিল যে, অশ্বারোহী অবতীর্ণ হইবামাত্র ঘোটক পড়িয়া গেল ও দুই চারিবার চীৎকার ও শূন্যে পদবিক্ষেপ করিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিল।

ঘোটকের দিকে দেখিবার কাহারও অবকাশ ছিল না। চর প্রণাম করিয়া ভীতচিত্তে বলিল, "মহারাজ! আমাদের শিবিরস্থ কোন বিদ্রোহো-ন্মুখ সেনার নিকট হইতে শত্রুরা সংবাদ পাইয়াছিল যে, অদ্য মহা-রাজ সন্ধ্যার সময় দুর্গ প্রাচীরের বহির্গত হইবেন। এই সংবাদ পাইয়া আপনার প্রাণনাশের জন্য এই আম্রকাননে চারি জন অশ্বারোহী লুকাইয়া-ছিল। আর অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে দুই সহস্র অশ্বারোহী অপেক্ষা করিয়াছিল,—সেই দুই সহস্র অশ্বারোহী এক্ষণে আসিতেছে।" চর এইমাত্র বলিয়া শ্রান্তিবশতঃ ভূমিতে পড়িল।

রাজার অনুচরেরা আশঙ্কায় জ্ঞানশূন্য হইল, রাজা আজ্ঞা দিলেন,—

"তোমরাও অশ্বারোহী, দুর্গের দিকে ধাবমান হও, শত্রুরা আসিবার অনেক পূর্ব্বেই আমরা দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিব।"

সকলেই বেগে দুর্গাভিমুখে অশ্বচালন করিলেন।

প্রত্যুৎপন্নমতি ইন্দ্রনাথ দূরে ধূলি দেখিয়াই আপন রণভেরী বাজাইয়া-ছিলেন, তাঁহার পঞ্চশত অশ্বারোহীও সেই আম্রকাননের এক অংশে কোন

কারণবশতঃ স্থাপিত ছিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহারা আসিয়া মিলিত হইল। তখন ইন্দ্রনাথ রাজাকে বলিলেন,—

"মহারাজ! যদি আজ্ঞা পাই, আমার পঞ্চশত অশ্বারোহী লইয়া শক্রদিগকে ক্ষণেক বাধা দিতে পারি। ততক্ষণে আপনারা স্বচ্ছন্দে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন।"

রাজা গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন,—

"অজ্ঞান বালক! যুদ্ধের উচিত সময় হইলে টোডরমল্ল কখনও পলায়নতৎপর হয় না। বৃথা প্রাণ নষ্ট করা যুদ্ধ নহে, নরহত্যা মাত্র।"

ইন্দ্রনাথ আবার বলিলেন,—

"মহারাজ! ক্ষমা করুন, দিল্লীশ্বরের অধীনের পঞ্চশত অশ্বারোহী বিদ্রোহীদিগের দুই সহস্রের সহিত সমতুল বলিয়া গণ্য হইতে পারে।"

রাজা সরোষে উত্তর করিলেন,—

"সেনাপতির আজ্ঞার উপর উত্তর করিলে প্রাণদণ্ড হয়,—এবার তোমাকে ক্ষমা করিলাম।" কিঞ্চিৎ পরে মৃদুস্বরে বলিলেন, "ইন্দ্রনাথ! আমার দুর্গের মধ্যে সেনাগণ যেরূপ অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহোন্মুখ হইয়াছে, তোমার অধীন পঞ্চশত অশ্বারোহীই আমার প্রধান সম্বল, তাহাদিগকে আমি অন্যায় যুদ্ধে প্রেরণ করিতে পারি না।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে সকলে দুর্গের নিকট উপস্থিত হইলেন। দুর্গের সম্মুখে পরিখা; সকলে বিস্মিত ও ভীত হইয়া দেখিলেন, পরিখার উপরিস্থ সেতু ভগ্ন হইয়াছে! যে নরাধম শক্রদিগকে গোপনে সংবাদ দিয়াছিল, সেই সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল; সুতরাং অশ্বারোহী-দিগের দুর্গে প্রবেশ করিবার উপায় নাই!

সকলেই সন্তরণ করিয়া পরিখা পার হইবার প্রস্তাব করিল। রাজা শক্রদিগকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"পার হইতে না হইতে শক্র আসিয়া পড়িবে, তখন কাপুরুষের ন্যায় শক্রকর্ত্তৃক সকলে আহত হইয়া জলমগ্ন হইবে। বীরপুরুষের কার্য্য কর, শক্রদিগের সহিত যুদ্ধ দাও, এইক্ষণেই কাষ্ঠের নূতন সেতু নির্ম্মিত হউক, যতক্ষণ নির্ম্মিত না হয়, শক্রর সহিত যুদ্ধ করিব। ইন্দ্রনাথ, তুমি সেনাপতি, এবার সেনাপতির কার্য্য কর।"

"ভৃত্য সাধ্যমত কার্য্য করিবে," বলিয়া ইন্দ্রনাথ ব্যূহনির্ম্মাণে তৎপর হইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্যূহ নির্ম্মিত হইল। ব্যূহ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ও পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রতি শ্রেণীতে এক শত অশ্বারোহী। প্রথম শ্রেণীর

পশ্চাতে দ্বিতীয় শ্রেণী দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার পশ্চাতে তৃতীয় শ্রেণী, ইত্যাদি। সুতরাং যুদ্ধের সময় প্রথম শ্রেণী পরিশ্রান্ত হইলে দ্বিতীয় শ্রেণী অগ্রসর হইতে পারিবে, তাহাদের পর আবার তৃতীয় শ্রেণী সম্মুখীন হইবে, এইরূপে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক শ্রেণীই এক একবার করিয়া বিশ্রাম করিতে পারিবে। সম্মুখে শত্রুর আক্রমণ রুদ্ধ হইবে, পশ্চাতে পরিখার জল, সেদিক্ হইতে আক্রমণের সম্ভাবনা নাই,—সেই পরিখার নিকট কয়েক জন দুই চারিটী নারিকেল ও অন্যান্য বৃক্ষ কর্ত্তন করিয়া সেতু বন্ধন করিতেছিল। মুহূর্ত্তমধ্যে শত্রু আসিয়া পড়িল, ইন্দ্রনাথের হৃদয় উৎসাহে পরিপূর্ণ হইল!

আজি প্রায় তিন চারি মাস পর্য্যন্ত মুঙ্গের নগর বেষ্টিত ছিল, কিন্তু অদ্য যেরূপ দুই পক্ষই ভীষণ সাহস প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, এরূপ কখনও দেখা যায় নাই। ব্যূহ ভেদ করিতে পারিলেই রাজা টোডরমল্ল পরাস্ত হইবেন, এই জ্ঞানে শত্রুরা সাগর-তরঙ্গের ন্যায় বার বার ভীষণ আক্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু সে ব্যূহ ভাঙ্গিবার নহে,—পর্ব্বতশেখরের ন্যায় বার বার শত্রুদলের তরঙ্গমালা দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শত্রুরা অধিক সংখ্যক্ বলিয়া তাহাদিগের বড় উপকার হইল না, কেননা ইন্দ্রনাথ যেরূপ কৌশলে ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে একেবারে এক শত জনের অধিক শত্রু আসিয়া সে ব্যূহ আক্রমণ করিতে পারিল না, বরং সেই অল্প স্থানের মধ্যে দুই সহস্র সৈন্যের চলাচলের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। তথাপি শত্রুরা অদ্য বার বার সিংহ-গর্জ্জন করিয়া সিংহবিক্রম প্রকাশ করিতেছিল, বীরমদে উন্মত্ত হইয়া বার বার ভীষণ শব্দ করিয়া সেই ব্যূহ-ভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিল। ইন্দ্রনাথের সৈন্যেরাও সাহসে হীন ছিল না। অদ্য তিন চারি মাস অবধি ইন্দ্রনাথের অধীনে যুদ্ধ করিয়া যে যুদ্ধকৌশল শিখিয়াছিল, তাহা অদ্য প্রকাশ করিতে লাগিল। বিশেষ অদ্য স্বয়ং রাজা টোডরমল্লের দ্বারা চালিত হইয়া তাহাদিগের উৎসাহ ও উল্লাসের সীমা ছিল না। ইন্দ্রনাথ তীরের মত ব্যূহের এ পার্শ্ব হইতে ও পার্শ্বে, এদিক্ হইতে ওদিকে অশ্বচালন করিতে লাগিলেন। যেখানে যেখানে শত্রুরা অতিশয় পরাক্রম প্রকাশ করিতেছিল, দেখিয়া দেখিয়া সেই সেই স্থানে সম্মুখীন হইতে লাগিলেন এবং আপনার বিচিত্র অস্ত্রচালনা দ্বারা শত্রুপক্ষকে কম্পিত করিতে ও স্বপক্ষকে উৎসাহে পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আজি মহারাজ স্বয়ং তোমাদের যুদ্ধ দেখিতেছেন," "আজি মহারাজের রক্ষার ভার তোমাদের হস্তে," "আজি

দিল্লীশ্বরের নাম ও গৌরব তোমরা রক্ষা করিবে।" এইরূপ উৎসাহবচন শ্রবণ করিয়া তাঁহার সৈন্যগণ উল্লাসে পরিপূর্ণ হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল, সে ভৈরব গর্জ্জনে আকাশ ভিন্ন হইতে লাগিল, শত্রুর হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল।

তথাপি দুই সহস্র সৈন্যের সহিত পঞ্চশত সৈন্যের যুদ্ধ সম্ভবে না,—ইন্দ্রনাথের সেনাগণ একে একে নিহত হইতে লাগিল, শত্রুদিগেরও অনেক জন হত ও আহত হইল, কিন্তু দুই সহস্রের মধ্যে এক শত কি দুই শত যুদ্ধে অক্ষম হইলে ক্ষতি নাই, দেখিয়া রাজা চিন্তিত হইলেন, সেতু নির্ম্মাতা-দিগকে শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য সমাধা করিতে বলিলেন ও আপনি সিংহবীর্য্য প্রকাশ করিয়া সেনাদিগকে সাহস দিতে লাগিলেন। একবার ইন্দ্রনাথকে অন্তরালে ডাকিয়া বলিলেন,—

"ইন্দ্রনাথ তুমি আপন সৈন্যদিগকে যেরূপ রণশিক্ষা দিয়াছ, তাহাতে আমি চমৎকৃত হইলাম। কিন্তু যেরূপ সেনাগণ হত ও আহত হইতেছে, ভয় হয় রণে ভঙ্গ দিবে।"

ইন্দ্রনাথের মুখ রক্তবর্ণ হইল,—বলিলেন,—

"মহারাজ, আমার সৈন্যদিগকে সম্মুখ যুদ্ধ করিতেই শিখাইয়াছি, রণে ভঙ্গ দিতে কখনও শিখাই নাই। যতক্ষণ একজন অশ্বারোহী থাকিবে, ততক্ষণ সম্মুখ যুদ্ধ হইবে।"

রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বেগে অশ্বধাবন করাইয়া সকল সৈন্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া শত্রুর সম্মুখীন হইলেন ও আপন নৈসর্গিক সিংহতেজ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সৈন্যেরা উল্লাসে গর্জ্জন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথও লম্ফ দিয়া পুনরায় সম্মুখে গমন করিলেন। উচ্চৈঃস্বরে আবার বলিতে লাগিলেন, "আজি আমাদের উৎসবের দিন, নিজের শোণিতস্রোত প্রবাহিত করিয়া প্রভুকে রক্ষা করিব; দিল্লীশ্বরের নাম, গৌরব বর্দ্ধন করিব। যোদ্ধার ইহা অপেক্ষা আর কি আনন্দ আছে? বীরগণ, অগ্রসর হও।"

সন্ধ্যার ছায়ায় ক্রমে ক্রমে যুদ্ধক্ষেত্র আবৃত হইতে লাগিল, কিন্তু সে চমৎকার ব্যূহ ভঙ্গ হইল না! একজন অশ্বারোহী হত হয়, তাহার স্থানে অপর একজন অশ্বারোহী আসিয়া দণ্ডায়মান হয়; সে হত হয়, আর একজন আসিয়া তথায় দণ্ডায়মান হয়। শ্রেণী যত ক্ষীণ হইতে লাগিল, সৈন্যদিগের উৎসাহ ও উল্লাস যেন ততই বর্দ্ধন হইতে লাগিল। ইন্দ্রনাথ

যথার্থই বলিয়াছিলেন, পলায়ন কাহাকে বলে, তাঁহার সৈন্যেরা শিখে নাই। আজি রাজার জীবনরক্ষার ভার আমাদের হস্তে; সকলেরই এই কথা স্মরণ ছিল, সকলেই সম্মুখে দৃষ্টি করিতেছে, কেহই পশ্চাতে দেখিতে জানে না। ক্রমে ক্রমে রজনীর অন্ধকার সেই যুদ্ধক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন করিল, যোদ্ধা ও প্রতিযোদ্ধাদিগকে আচ্ছন্ন করিল, হত ও আহতদিগকে আচ্ছন্ন করিল, অশ্ব ও অশ্বারোহীকে আচ্ছন্ন করিল; কিন্তু সে অপরূপ যুদ্ধ সাঙ্গ হইল না, সে আশ্চর্য্য ব্যূহ ভঙ্গ হইল না। শত্রুগণ হতাশ হইয়া একবার বেগে শেষ আক্রমণ করিল, ভীষণ গর্জ্জন করিয়া একবার শেষ আক্রমণ করিল। দুই সহস্র অশ্বারোহীর সে ভীষণ গর্জ্জন চারিদিকে একক্রোশ পর্য্যন্ত শ্রুত হইল, আকাশের মেঘ পর্য্যন্ত কম্পিত হইল,—দুই সহস্র অশ্বের যুগপৎ পদবিক্ষেপে মেদিনী কম্পিত হইল, কিন্তু সে শব্দে ও সে পদবিক্ষেপে ইন্দ্রনাথের ব্যূহ কম্পিত হইল না। সে ভীষণ গর্জ্জন ভীষণতর গর্জ্জন দ্বারা প্রতিধ্বনিত করিল, সে আক্রমণকারীদিগকে আবার তাহারা দূরে নিক্ষেপ করিল। যুদ্ধ সাঙ্গ হইল না, সে অপরূপ ব্যূহ ভঙ্গ হইল না।

অবশেষে সেতু নির্ম্মিত হইল। রাজা পরিখা পার হইলেন, রাজা নিরাপদে আসিয়াছেন শুনিয়া ইন্দ্রনাথের সৈন্যগণ একেবারে সিংহ-গর্জ্জন করিল,—সে গর্জ্জন এক ক্রোশ দূরে শত্রু-শিবির প্রবেশ করিল। তখনই তাহারা জানিল, যে জন্য দুই সহস্র সৈন্য পাঠান হইয়াছিল, তাহা বৃথা হইয়াছে।

আক্রমণকারিগণ ভগ্নোদ্যম হইয়া নীরবে নিজ শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিল, যতক্ষণ রাজা টোডরমল্ল সেতু পার হইতেছিলেন, ইন্দ্রনাথ একদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে দেখিতে লাগিলেন। যখন দেখিলেন, রাজা নিরাপদে দুর্গে প্রবেশ করিয়াছেন, ইন্দ্রনাথ সহসা আপন অশ্ব হইতে পতিত হইলেন। শত্রুর বর্শাতে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভিন্ন হইয়াছিল, শোণিতে তাঁহার শরীর প্লাবিত হইয়াছিল। বলশূন্যতাবশতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন।

ইন্দ্রনাথের সৈন্যেরা অনেকেই সেতু পার হইয়াছিলেন। শত্রুগণ যাইবার সময় দেখিল, ইন্দ্রনাথ আহত হইয়াছেন। উল্লাসে চীৎকার করিয়া ইন্দ্রনাথকে ভূমি হইতে তুলিয়া লইয়া শিবিরাভিমুখে চলিল। ইন্দ্রনাথ বন্দী হইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্দী।

The soldier's hope, the patriot's zeal,
For ever dimmed, for ever crossed,
Oh! who shall say what heroes feel,
When all but life and honor's lost.

The last sad hour of freedom's dream,
And valor's task moved slowly by,
While mute they watched till morning's beam,
Should rise and give them light to die.

There's yet a world where souls are free,
Where tyrants taint not nature's bliss,
If death that world's bright opening be,
Oh! who would live a slave in this.

Moore.

রাজা টোডরমল্ল যখন শুনিলেন, যে ইন্দ্রনাথ আহত হইয়া শত্রুদিগের বন্দী হইয়াছেন, তখন আর তাঁহার দুঃখ ও ক্ষোভের সীমা থাকিল না। বলিতে লাগিলেন, "আজি দিল্লীশ্বরের যথার্থই পরাজয় হইয়াছে! ইন্দ্রনাথ, তুমি আমার জন্য বন্দী হইলে? তোমার পিতা যখন আমার নিকট একমাত্র পুত্রকে ফিরিয়া চাহিবেন, আমি কি বলিব?" ইন্দ্রনাথের জন্য শিবিরের সকলেই যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। গৌরব ও সম্পদের দিনে ইন্দ্রনাথ সকলের সহিত সদাচরণ করিতেন, সামান্য সেনার প্রতিও অতিশয় বাৎসল্য ও দয়ার সহিত আচরণ করিতেন, সকলের সহিত আত্মনির্ব্বিশেষে কথা কহিতেন। সুতরাং আজি ইন্দ্রনাথের বিপদের দিনে সকলেই তাঁহার জন্য আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

রাজার দুই এক জন বিশ্বস্ত সেনাপতি রাজাকে বলিলেন,—

"মহারাজ! আর আমাদের দুর্গের ভিতর থাকিবার আবশ্যক নাই। আজ্ঞা করুন, শত্রুকে আক্রমণ করি। তাহা হইলে এক্ষণও ইন্দ্রনাথকে পাইব,—আমাদের অবশ্যই জয় হইবে।"

রাজা উত্তর করিলেন, "ইন্দ্রনাথকে হারাইয়াছি, ভগবান্ জানেন, পুত্রশোকেও আমার এরূপ দুঃখ হইত না, কিন্তু এক্ষণে যুদ্ধে গমন করিলে তোমাদের মত বিশ্বাসী আর দুই চারি জন যে সেনাপতি আছেন, তাঁহাদেরও হারাইব।"

সেনা। "কেন? আপনি পরাজয় আশঙ্কা করিতেছেন কিজন্য?"

রাজা। "আমাদের সৈন্যেরা যদি যুদ্ধ করে, তাহা হইলে অবশ্য জয়লাভ হইবে। কিন্তু তোমাদের মত কয়জন বিশ্বাসী সেনাপতি আছে? আমি আশঙ্কা করি, যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেই আমার অধিকাংশ সৈন্য শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিবে।"

সেনা। "আপনি এরূপ আশঙ্কা কিজন্য করিতেছেন?"

রাজা। "সেনাপতি! টোডরমল্ল কখনই অমূলক আশঙ্কা করে না। কল্য যখন আমরা দুর্গের বাহিরে গিয়াছিলাম, কি প্রকারে আমাদের পশ্চাতে সেতু ভগ্ন হইয়াছিল? কিরূপে শত্রুরা আমাদিগের গূঢ় বিষয়ের সংবাদ পাইয়াছিল? এক প্রহর কাল আমরা যুদ্ধ করিতেছিলাম, কিজন্যই বা তাহার মধ্যে দুর্গ হইতে কেহই পরিখা পার হইল না, আমাদিগের সাহায্যার্থ আইসে নাই?"

সেনা। "মহারাজ, আমাদের সৈন্যেরা জানিতে পারে নাই, জানিলে অবশ্যই আপনার সাহায্যে যাইত। তাহারা সকলেই দুর্গের অপর পার্শ্বে ছিল, কল্য একটা মহোৎসব হইয়া গিয়াছে, তাহাতেই সকলে রত ছিল।"

রাজা। "সত্য, অধিকাংশ সৈন্য উৎসবে মত্ত ছিল, আমাদিগের যুদ্ধ-কথা কিছুই জানিতে পারে নাই। কিন্তু আমি জানি, একজন সেনাপতি ত্রিংশৎ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া পরিখার অপর পার্শ্বেই অবস্থিতি করিতেছিল। পামর গোপনে যেরূপ বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে, আমার সমক্ষে যদি সেইরূপ বিদ্রোহাচরণ করিতে সাহস করিত, তাহা হইলে কল্যই আমাদের বিপদের সময় বিপক্ষ সৈন্যের সহিত যোগ দিত। সেনাপতি! এইরূপ সৈন্য লইয়া তুমি আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে উপদেশ দাও? তাহা হইলে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক শত্রুর কৌশলজালে পতিত হইতে হইবে।"

ইন্দ্রনাথের জন্য সকলেই দুঃখিত হইলেন, কিন্তু হতভাগিনী বিমলা একেবারে হতজ্ঞান হইলেন। বিমলা যেদিন নদী হইতে ইন্দ্রনাথকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে ইন্দ্রনাথ বিমলাকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। সরলার প্রতি ইন্দ্রনাথের প্রগাঢ় প্রেম ছিল; ছয় বৎসর কাল হইতে যে বালিকাকে ভালবাসিয়াছিলেন, তাহাকে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নহে। বিশেষ সরলার পূর্ব্বগৌরব, এক্ষণকার দারিদ্র্য ও নিরাশ্রয়তা, সরলার সুন্দর অকপট বদনমণ্ডল ও সরল অকপট অন্তঃকরণ, সরলার রুদ্রপুরে কুটীরে বাস ও তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় প্রেম,—এ সকল কথা যখন ইন্দ্রনাথের হৃদয়ে জাগরিত হইত, তখন লৌহবর্ম্মের ভিতরও তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইত,

তখন যুদ্ধসজ্জায়ও ইন্দ্রনাথের চক্ষু শুষ্ক থাকিত না। যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণ পরিশ্রমের পরও ইন্দ্রনাথ নিশিযোগে সেই নিস্তব্ধ শান্ত পাদপাচ্ছাদিত রুদ্রপুর স্বপ্নে দেখিতে পাইতেন,—সেই সরলচিত্ত বালিকা ঘাটে জল আনিতে যাইতেছে, অথবা বৃক্ষতলে বসিয়া সূতা কাটিতেছে, অথবা চন্দ্রালোকে উদ্যানে দাঁড়াইয়া সজলনয়নে ইন্দ্রনাথের সহিত কথা কহিতেছে! সে কথা কি সুধাময়—ইন্দ্রনাথ মুহূর্ত্তের জন্য স্বর্গসুখ ভোগ করিতেন, স্বপ্নে যেরূপ সুখ অনুভব করা যায়, জগতে কি সেরূপ সুখ আছে?

কিন্তু যদিও সরলার প্রতি তাঁহার অবিচলিত প্রেম ছিল, তথাপি বিমলাকে দেখিয়া অবধি তাঁহার হৃদয়ে নূতন ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল। এ রমণী কে? অদৃষ্টপূর্ব্বা, অসীম রূপরাশিসম্পন্না, এ অল্পবয়স্কা যুবতী কে? মহেশ্বর-মন্দিরে সহসা দেখা দিয়াছিলেন, ভিখারিণী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন, দুই চারিটি সুধাপরিপূর্ণ কথায় ইন্দ্রনাথের হৃদয় আনন্দিত করিয়াছিলেন। আবার সহসা একদিন অপরূপ বেশে দেখা দিয়া ইন্দ্রনাথকে মৃত্যু হইতে বাঁচাইয়াছিলেন, আপনাকে প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন, অথচ প্রেমাশায় জলাঞ্জলি দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। এ অপরূপ কন্যা কে? মানুষী না দেবকন্যা? যেরূপ উজ্জ্বল লাবণ্যবিভূষিতা, তাহাতে দেবকন্যা বা বিদ্যাধরী বলিয়া বোধ হয়,—সেরূপ উজ্জ্বল রূপরাশি ইন্দ্রনাথ কখনও দেখেন নাই, সরলার স্তিমিত সৌন্দর্য্য তাহার সহিত তুলনা হয় না।

আর বিমলা! হতভাগিনী, দগ্ধহৃদয়া বিমলা মুঙ্গেরে পিত্রালয়ে কিরূপে ছিলেন? তিনি প্রেমের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রেমের চিন্তায় জলাঞ্জলি দেওয়া রমণীর সাধ্য নহে। সে গূঢ় চিন্তা কোরকের ভিতর কীটের ন্যায়, বস্ত্রের ভিতর অগ্নির ন্যায় নিভৃত রহিল।—নিভৃত রহিল, কিন্তু হৃদয়কে স্তরে স্তরে দগ্ধ করিতে লাগিল। আশ্রয়হীনা সরলা যেরূপ ইন্দ্রনাথের প্রেমে নিমগ্ন হইয়াছিল, হতভাগিনী বিমলাও সেইরূপ হইলেন। তথাপি বাহ্যিক ভাবভঙ্গী ও কার্য্যে সরলার ও বিমলার প্রেমে অনেক বৈলক্ষণ্য ছিল। বনাশ্রমের শান্ত বৃক্ষতলে দিবারাত্রই বালিকার নয়ন দুইটী অশ্রুতে আপ্লুত হইত,—সরলা সময় পাইলেই কমলা বা অমলার নিকট দুঃখ-কথা বলিয়া শান্তিলাভ করিত। বিমলাকে কেহ কখন প্রেমের নাম উচ্চারণ করিতে শুনে নাই, কেহ কখন নয়নবারি বর্ষণ করিতে দেখে নাই। প্রেমচিন্তারূপ অগ্নিশিখায় হৃদয় স্তরে স্তরে দগ্ধ হইতেছিল, কিন্তু মুখে তাহার চিহ্নমাত্র ছিল না, কার্য্য-কর্ম্মে সকল সময়ে মনোযোগী, ধীর,

শান্ত। দিন গেল, সপ্তাহ অতীত হইল, মাস অতিবাহিত হইল, বিমলার আকৃতিতে কেহ কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিল না, কেবলমাত্র বদনমণ্ডল দিনে দিনে ঈষৎ রক্তশূন্য হইল ও পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল, কেবলমাত্র তাঁহার উজ্জ্বল নয়ন দিনে দিনে এক অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ধারণ করিতে লাগিল, তাহা ভিন্ন দৈনিক কার্য্যে বিমলার দাসদাসীরাও কোন বৈলক্ষণ্য দেখিল না। বিমলার পিতা রাজা টোডরমল্ল কর্ত্তৃক কোন বিশেষ কার্য্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন, সুতরাং বিমলার মুখমণ্ডলে যে অল্প পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল, দাসদাসীরা স্থির করিল, পিতার চিন্তাই তাহার কারণ।

এরূপ সময়ে বিমলা একদিন সহসা শুনিলেন, ইন্দ্রনাথ আহত হইয়া শত্রুদিগের বন্দী হইয়াছেন! রমণীর হৃদয়ে অনেক সহ্য হয়, সকল সহ্য হয় না—বিমলার হৃদয়ে বজ্রাঘাত হইল। তথাপি সে মর্ম্মান্তিক ব্যথাও কাহাকে বলিলেন না, নীরবে সহ্য করিতে লাগিলেন, নীরবে রজনী দুই প্রহরের সময় সপ্তদশবর্ষীয়া কামিনী একাকী অসহায় পিতৃগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, অসহায় সংসার-সাগরে ঝাঁপ দিলেন।

পরদিন প্রাতে দাসদাসীগণ বিমলাকে আর দেখিতে পাইল না। বিমলা কোথায়? হতভাগিনী কি আর জীবিত আছে, পাগলিনী কি আত্মহত্যা দ্বারা অসহনীয় দুঃখাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়াছে, উৎক্ষিপ্ত হৃদয়কে শান্তিদান করিয়াছে?—ভীষণ চিন্তা!—কিন্তু না করিবে কিজন্য? যাহার ইহকালে সুখ নাই, সুখের আশা নাই, যাহাকে ভগবান্ কেবলমাত্র দুঃখভার বহন করিবার জন্য জীবন দান করিয়াছেন, সে যদি সে জীবন বহন করিতে অস্বীকৃত হয়,—সে যদি সেরূপ জীবনকে উপলখণ্ডের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর বোধ করিয়া সেই দুঃখভারের সহিত স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কালের অতল সমুদ্রে নিক্ষেপ করে,—কে বলিবে সে পাপাত্মা বা অকৃতজ্ঞ,—কে বলিবে তাহার সে কার্য্যে দোষ স্পর্শে?

এদিকে শত্রুরা ইন্দ্রনাথকে অচেতন অবস্থায় বন্দী করিয়া শিবিরে লইয়া চলিল। অনেকক্ষণ পর পুনরায় ইন্দ্রনাথের চেতনা সঞ্চার হইল। তখন যাহা দেখিলেন, তাহাতে সামান্য লোক হইলে ভয়ে হতজ্ঞান হইত।

দেখিলেন তাঁহার চারিদিকে শত্রুসমূহ আসীন রহিয়াছে। সম্মুখে এক উচ্চ সিংহাসনে মাসুমী কাবুলী উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার দুই পার্শ্বে মহামান্য পাঠান ওমরাহ ও অমাত্যগণ বসিয়া রহিয়াছে। ইন্দ্রনাথ তাঁহাদিগের মধ্যে টোডরমল্লের বিদ্রোহী সেনাপতি তর্খান ও হুমায়ুনকে দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্রনাথের পশ্চাতে নিষ্কোষিত অসিহস্তে একশত

সেনা দণ্ডায়মান রহিয়াছে,—যদিও ইন্দ্রনাথ এক্ষণে হীনবল, তথাপি শত্রুরা তাঁহাকে বিশ্বাস করে না, আহত সিংহও লম্ফ দিয়া ব্যাধদিগকে সংহার করিতে পারে, এই ভয়ে শত খড়্গাধারী ইন্দ্রনাথকে রক্ষা করিতেছিল। ইন্দ্রনাথের নিকটে ভীষণাকৃতি জল্লাদ কুঠারহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, প্রভুর দিকে নিমেষশূন্য লোচনে চাহিয়া রহিয়াছে, আজ্ঞা বা ইঙ্গিত পাইলেই এই ভীষণ বৈরীর শিরশ্ছেদন করিবে। ইন্দ্রনাথ কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত হইলেন না। তীব্রদৃষ্টিতে মাসুমীর প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

মাসুমীও ইন্দ্রনাথকে চেতনাবস্থায় দেখিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—

"হিন্দু! তুমি বীরপুরুষ, কিন্তু বিদ্রোহাচরণ করিয়াছ,—বিদ্রোহাচরণের দণ্ড শিরশ্ছেদন!"

ইন্দ্রনাথ ভীষণস্বরে উত্তর করিলেন, "যোদ্ধা মৃত্যু আশঙ্কা করে না, তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, যাহা ক্ষমতায় থাকে কর, আমি বিদ্রোহাচরণ করি নাই।"

মাসুমী ইন্দ্রনাথের উগ্রভাবে কিছুমাত্র কুপিত না হইয়া বলিলেন,—

"টোডরমল্লের সহিত যোগ দিয়া বঙ্গদেশের প্রাচীন শাসনকর্ত্তাদিগের সহিত যুদ্ধ করা বিদ্রোহাচরণ নহে?"

ইন্দ্রনাথ পুনরায় সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, "বঙ্গদেশের অধীশ্বর, সমস্ত ভারতবর্ষের অধীশ্বর আকবরসাহের জন্য আমি বিদ্রোহী পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছি।"

সকলেই ভাবিলেন, ইন্দ্রনাথ আপনি আপনার মৃত্যু ঘটাইতেছেন, সকলেই ভাবিলেন, মাসুমী সেইক্ষণেই ইন্দ্রনাথের শিরশ্ছেদনের আদেশ দিবেন। কিন্তু মহানুভব, সাহসী মাসুমী হীনবল, অসহায় হিন্দুর এরূপ নির্ভীকতা দর্শনে কুপিত হইলেন না, বরং আহ্লাদিত হইলেন। ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন,—

"বীর! তুমি যেপ্রকারে আমার সহিত আচরণ করিতেছ, অন্য কেহ হইলে তাহার সমুচিত দণ্ড দিত, আমি এবার তোমার উগ্রতা ক্ষমা করিলাম, তোমার বীরত্ব দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, কিন্তু তুমি বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজবংশকে আর কখন বিদ্রোহী বলিও না। যাঁহারা ক্রমান্বয়ে চারি শত বৎসর এই বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছেন,—বখ্‌তীয়ার খিলিজীর সময় হইতে যে পাঠানেরা একাধীশ্বর হইয়া হিন্দুদিগকে শাসন করিয়াছেন, তোমার পিতা, তোমার পিতামহ, তোমার প্রপিতামহ যে রাজবংশের অধীনে বাস করিয়াছেন, সেই পাঠান বিদ্রোহী, না অদ্য যে অন্যায়াচারী

দিল্লীর অধীশ্বর চাতুরী ও প্রতারণা দ্বারা আমাদের পুরাতন সাম্রাজ্য লইতে চাহে, সে বিদ্রোহী ?"

ইন্দ্রনাথ পূর্ব্ববৎ সগর্ব্বে উত্তর করিলেন,—

"পাঠানরাজ! আপনারা বঙ্গদেশের পুরাতন অধিপতি আমি অস্বীকার করি না। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা আপনাদিগের অধীনে বাস করিতেন অস্বীকার করি না; কিন্তু কোনও জাতির জয় পরাজয় চিরস্থায়ী নহে, কোনও জাতির সুদিন বা দুর্দ্দিন চিরস্থায়ী নহে; উন্নতি অবনতি চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যদি তাহা না হইত, যদি পুরাতন রাজাদিগের শাসন চিরস্থায়ী হইত, তাহা হইলে মুসলমানেরা কোথায় থাকিত, তাহা হইলে আজি হিন্দুরাজ্যের গৌরব-সূর্য্য চিরান্ধকারে অস্ত যাইত না; তাহা হইলে আমি অদ্য দিল্লীশ্বরের জন্য যুদ্ধ না করিয়া রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি চির-স্মরণীয় ভারতবর্ষের একাধিপতি রাজাদিগের অধীনে যুদ্ধ করিতাম। কিন্তু সে পুরাতন হিন্দু-গৌরব অস্তমিত হইয়াছে, পাঠানরাজ! আপনাদিগের গৌরবও তিরোহিত হইয়াছে, বিধির নির্ব্বন্ধের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কেন শোণিতস্রোতে সুন্দর বঙ্গদেশ প্লাবিত করিতেছেন ?"

ইন্দ্রনাথের সগৌরব কথা শুনিয়া সকলেই নিস্তব্ধ ও বিস্মিত হইয়া রহিলেন, অনিমেষলোচনে সেই হীনবল আহত যোদ্ধার দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। মাসুমীর বীরান্তঃকরণে মর্ম্মান্তিক পীড়া জন্মিয়াছিল। ইন্দ্রনাথ যখন তাঁহার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন তিনি অধিক বিরক্ত হয়েন নাই, কিন্তু স্বজাতীয়দিগের গৌরব অস্তে গিয়াছে, এ কথায় তাঁহার হৃদয়ে শূল বিঁধিতে লাগিল। যে স্বজাতির পুনরুন্নতির জন্য তিনি দিবানিশি চিন্তা করিতেছিলেন, যে পাঠানরাজ্য স্থাপনার জন্য তিনি মহাপরাক্রান্ত দিল্লীশ্বরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাদিগের নিন্দা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে কোপের সঞ্চার হইতেছিল, শরীরে উষ্ণ শোণিত সঞ্চারিত হইতে লাগিল। কিন্তু সে কোপ প্রকাশ না করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "হিন্দু! তোমরা বিধির নির্ব্বন্ধের উপর প্রত্যয় করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাক, সাহসী পাঠানেরা জীবন থাকিতে নিশ্চেষ্ট হইবে না, অধীনতা স্বীকার করিবে না। পাঠান-গৌরব-সূর্য্য এক্ষণও অস্ত যায় নাই।"

ইন্দ্রনাথ পুনরায় বলিলেন, "যেদিন কটকের মহাযুদ্ধে দায়ুদ খাঁ পরাজিত হয়েন, সেই দিনই পাঠানের গৌরব-সূর্য্য অস্তে গিয়াছে। যে দিন সন্ধিকথা বিস্মৃত হইয়া দায়ুদ খাঁ পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন, সেই

দিন পাঠানদিগের বিদ্রোহাচরণ আরম্ভ হয়। দায়ুদ খাঁ নিজ শোণিতে সে বিদ্রোহিতার প্রায়শ্চিত্ত করেন;—সেই অবধি যে যে পাঠান সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন, সেই সেই পাঠানই সেইরূপ কর্ম্মের ফল ভোগ করিবেন।"

মাসুমী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, নয়নদ্বয় হইতে অগ্নিকণা বাহির হইতে লাগিল। ভীষণস্বরে বলিলেন,—

"হিন্দু! তোমার জীবন মৃত্যু আমার হস্তে, তোমার কি জীবনের অভিলাষ নাই, যে আমার সম্মুখে এইরূপ কথা কহিতেছ?"

নির্ভীক ইন্দ্রনাথ সেইরূপ সগর্ব্বে উত্তর করিলেন,—

"আমার জীবনের সুখের দ্রব্য, মায়ার দ্রব্য, ভালবাসার দ্রব্য, এক্ষণও সকলই আছে;—কিন্তু এসকল থাকিতেও যখন তোমাদের হস্তে পড়িয়াছি, তখন জীবনের আশা রাখি না।"

মাসুমী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

ইন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "সাহসী পুরুষ শত্রুকে ক্ষমা করিতে পারে,—যাঁহারা জয় নিশ্চয় জানেন, তাঁহারা শত্রুকে ক্ষমা করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা ভীরু, যাঁহারা নিজের জয় সংশয় করেন, তাঁহারা শত্রুকে কখনও ক্ষমা করিতে পারেন না, পাঠানের হস্তে আমি ক্ষমার প্রত্যাশা করি না।"

অনেকক্ষণ কথা কহিতে কহিতে ইন্দ্রনাথের হীনবল শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইতেছিল, বিশেষতঃ শেষে যে কথা কহিতেছিলেন তাহাতে বক্ষঃ হইতে পুনরায় শোণিত-স্রোত নির্গত হইতে লাগিল।

মাসুমী ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিলেন, "পামর! কৌশল-বাক্যের দ্বারা ক্ষমা পাইবার প্রত্যাশা করিও না।"

ইন্দ্রনাথ পুনরায় সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, "আমি কোন প্রত্যাশা করি না,—কেবল এই প্রত্যাশা করি যে, জল্লাদ আপন কার্য্য শীঘ্রই নিষ্পন্ন করিবে। আমার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, বিলম্ব করিলে যোদ্ধা কিরূপে মরে তাহা দেখিতে পাইবে না।"

মাসুমী উত্তর করিলেন, "তাহাই হইবে; জল্লাদ! বিলম্বে কার্য্য নাই।"

কিন্তু জল্লাদকে সে ভীষণ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইল না। ইন্দ্রনাথের ক্ষত হইতে রক্তস্রোত ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ত্বরায় শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, পুনরায় চেতনশূন্য হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

মাসুমীর হৃদয় স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর নহে। আহত, বলহীন, চৈতন্যহীন যোদ্ধার শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা দিলেন না। বলিলেন, “অধুনা কারাগারে লইয়া যাও।”

ইন্দ্রনাথ কারাগারে প্রেরিত হইলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

রমণীর বীরত্ব।

The midnight passed, and to the massy door
A light step came—it paused—it moved once more;
Slow turns the grating bolt and sullen key—
'Tis as his heart foreboded—that fair she!
Whate'er her sins to him a guardian saint,
And beauteous still as hermit's hope can paint;
* *
"Why shouldst thou seek at outlaw's life, to spare
"And change the sentence I deserve to bear?"
* *
"Why should I seek?—Hath misery made thee blind,
"To the fond workings of a woman's mind?
"And must I say? Albeit may heart rebel
"With all that woman feels but should not tell—
* *
"Reply not, tell not now thy tale again,
"Thou lov'st another—and I love in vain;
"Though fond as mine her bosom, form more fair,
"I rush through peril which she would not dare."

Byron.

একটী ক্ষুদ্র অন্ধকারময় কারাগারে একজন বীরপুরুষ তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। কারাগারের একটী ক্ষুদ্র বাতায়ন দিয়া প্রাতঃকালের তরুণ রৌদ্র আসিতেছে, অন্ধকাররাশির মধ্যে সেই রৌদ্রের রেখা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ সেই রৌদ্ররেখায় খেলা করিতেছে,—উঠিতেছে—নামিতেছে—একবার রৌদ্ররেখায় দেখা যাইতেছে, আবার অন্ধকাররাশিতে লীন হইতেছে। দুই একটী ক্ষুদ্র পক্ষী সেই বাতায়নে আসিয়া বসিতেছে, আবার ক্ষণেক পর উড়িয়া যাইতেছে,—সে বন্দী নহে,—পক্ষবিস্তার করিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষশাখায় বিচরণ করিতে পারে, জগৎ-সংসারে ও আকাশমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে পারে। বীরপুরুষ

সেই তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া সেই বাতায়নের দিকে একদৃষ্টিতে দেখিতেছেন,—অন্ধকারস্থিত লতাপল্লব যেরূপ বাহুবিস্তার করিয়া আলোকের দিকে ধায়, বন্দীর নয়ন সেইরূপ বাতায়নের দিকে রহিয়াছে। বন্দী কি চিন্তা করিতেছেন? রৌদ্ররেখায় পতঙ্গসমূহের খেলা দেখিয়া ও নিজ অবস্থা স্মরণ করিয়া কি খেদ করিতেছেন? পতঙ্গগণ একদিনমাত্র কি একপ্রহর মাত্র জীবিত থাকে,—বন্দী কি সেই এক প্রহর বা এক দিনের নিশ্চিন্ত সুখের জীবন অভিলাষ করিতেছেন? বাতায়নাগত পক্ষীগণ যখন পুনরায় পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া যাইতেছে, বন্দীও কি তাহার সঙ্গে সঙ্গে মানসপক্ষ বিস্তার করিয়া সুন্দর জগৎসংসার ও অনন্ত নীল আকাশে পর্য্যটন করিতেছেন?

ইন্দ্রনাথ এ সকল চিন্তা করিতেছেন না। তাঁহার হৃদয়কন্দরে ইহা অপেক্ষা দুঃখজনক চিন্তার উদ্রেক হইতেছে। তাঁহার আর জীবনের আশা নাই,—পাঠানেরা যদি সেই সময়েই তাঁহাকে হত্যা করিত, তাহাতে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু নিষ্ঠুর পামরেরা তাঁহাকে কারাবাসে রাখিয়া চিন্তাগ্নিতে দগ্ধ করিতেছে। ইন্দনাথ যোদ্ধা,—যোদ্ধার মৃত্যুতে ভয় নাই। কিন্তু তিনি মরিলে অন্যের কি ক্লেশ হইবে, সেই চিন্তায় তিনি অস্থির হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পুণ্যাত্মা, নগেন্দ্রনাথ এই বার্দ্ধক্যে একমাত্র পুত্রের মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিলে জীবন ত্যাগ করিবেন। নগেন্দ্রনাথের আর কেহই নাই, ভার্য্যা নাই, কন্যা নাই, অন্য পুত্র নাই, বৃদ্ধ একমাত্র পুত্রের উপর চাহিয়া জীবনধারণ করিতেছিলেন, সেই পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিলে নগেন্দ্রনাথের গৃহ শূন্য হইবে, হৃদয় শূন্য হইবে, বৃদ্ধ প্রাণত্যাগ করিবেন। পিতার কথা স্মরণ করিতে করিতে ইন্দ্রনাথের চক্ষুতে জল আসিল, যোদ্ধা চক্ষুর জল মোচন করিলেন।

আর সেই অজ্ঞান বালিকা, সেই প্রেমবিহ্বলা সরলা, সেই সহায়হীনা, সম্পত্তিহীনা, কুটীরবাসিনী সরলা, তাহারই বা কি দশা ঘটিবে? সপ্তম পূর্ণিমার মধ্যে যাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,—সে সপ্তম পূর্ণিমা অতীত হইবে, বালিকা আশা নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে নয়ন মুদিত করিবে, জীবন অভাবে অপরিস্ফুট পুষ্পের ন্যায় নীরবে অসময়ে শুকাইবে। চিন্তা করিতে করিতে ইন্দ্রনাথের মস্তক ঘুরিতে লাগিল, নয়ন দৃষ্টিশূন্য হইল,—বলিলেন, "ভগবন্! তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর, বিধির নির্ব্বন্ধে যাহা আছে হউক, আমি আর এ চিন্তাযাতনা সহ্য করিতে পারি না।"

পাঠানদিগের মধ্যে ইন্দ্রনাথকে পাড়ার সময় যত্ন করে এরূপ কেহই

ছিল না। কারাগারের পার্শ্বে প্রহরীগণ নিঃশব্দে খড়্গহস্তে দিবারাত্রি দণ্ডায়মান থাকিত। সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একজন ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে আহারীয় দ্রব্য আনয়ন করিয়া দিত,—আহার সাঙ্গ হইলে একমাত্র দাসী নিঃশব্দে সেই স্থান পরিষ্কার করিয়া যাইত। ইহা ভিন্ন আর কেহই সেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারিত না। মধ্যে মধ্যে কোন নিষ্ঠুর পাঠান সেনাপতি ইন্দ্রনাথের এই দুর্দ্দশায় উপহাস করিতে আসিতেন, অথবা কোন যথার্থ সাহসী, উন্নতচরিত্র সেনাপতি, শত্রুপক্ষীয় বীরপুরুষের হীনাবস্থা দেখিয়া যথার্থ শোকাশ্রু বর্ষণ করিতে আসিতেন। শত্রুর উপহাসে ইন্দ্রনাথের হৃদয়ে কিছুমাত্র বেদনা হইত না,—যাহার যথার্থ গুণ আছে, সে কবে সামান্য লোকের উপহাসে কাতর হয়?—কিন্তু শত্রু হইয়াও ইন্দ্রনাথের দুঃখে যথার্থ দুঃখ প্রকাশ করিলে ইন্দ্রনাথের হৃদয় দ্রবীভূত হইত।

পাঠানশিবিরের মধ্যে ইন্দ্রনাথের কেবল একমাত্র বন্ধু ছিল। যে দাসী প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় সেই কারাগৃহ পরিষ্কার করিতে আসিত, সেই ইন্দ্রনাথের দুঃখে যথার্থ দুঃখিনী। দাসী স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের পাঠান মোগল জ্ঞান নাই, শত্রু মিত্র জ্ঞান নাই, পরের দুঃখে চিরকালই দুঃখিনী। আমাদের সুখের সময়, সম্পদের সময়, আহ্লাদের সময় রমণী কতবার দ্বেষ করেন, কতবার ক্রোধ করেন, কতবার মুখরা হইয়া কলহ করেন; কিন্তু যখন জীবনাকাশে দুঃখরূপ মেঘরাশি সঞ্চিত হইতে থাকে, যখন আমাদের আশা-প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলে আমরা ভীষণ নৈরাশ-তিমিরে আচ্ছন্ন হই, যখন ক্লেশ বা শোকে বা পীড়ায় আমরা বিহ্বল হই, তখনই রমণী যথার্থ আপন ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তখন রমণীর মত আমাদের দুঃখে কে দুঃখিনী হয়, আমাদের পীড়ায় কে শুশ্রূষা করে, আমাদের শোকে কে ভরসা দান করে, আমাদের বিপদে কে আশ্বাস দেয়? পীড়ার শয্যায় অনিদ্র, অবিশ্রান্ত হইয়া দিবানিশি কে উপবেশন করিয়া পীড়িতের শুষ্ক ওষ্ঠে জল, দুগ্ধ দান করে? শোকের সময় আপনার হৃদয়-কবাট উদ্ঘাটন করিয়া কে অবারিত অশ্রুবর্ষণে আপন বসন সিক্ত করিয়া আমাদের সমদুঃখিনী হয়? বিপদের সময় কে অনন্ত মায়ার ভাণ্ডার হইতে অনন্ত অজস্র মায়াস্রোত দ্বারা আমাদের সান্ত্বনা দেয়? জগতে রমণীরত্নের মত রত্ন নাই। স্বর্গে কি আছে?

ইন্দ্রনাথের দুঃখে সেই দাসীই যথার্থ দুঃখিনী। প্রত্যহ নীরবে আসিয়া নীরবে প্রস্থান করিত বটে, কিন্তু সেই সুপুরুষের দুঃখ দেখিয়া অন্তরালে অশ্রুবিন্দু বর্ষণ করিত। নির্দ্দয় পাঠান বন্দীকে অতিশয় কষ্টে রাখিয়াছিল,—শয়নের জন্য ভূমিতে কেবলমাত্র তৃণশয্যা রচিত হইয়াছিল,—

দাসী ইন্দ্রনাথের জন্য আপন বস্ত্র দ্বারা সেই তৃণশয্যা মণ্ডিত করিয়া যাইত। পাঠানেরা ইন্দ্রনাথকে দিনের মধ্যে কেবল একবার মাত্র অপকৃষ্ট আহার দিত, দাসী আপনি অনাহারে থাকিয়া ইন্দ্রনাথকে নানাপ্রকার সুপথ্য আনিয়া দিত, ইন্দ্রনাথ তাহা জানিতে পারিতেন না। ইন্দ্রনাথের পীড়ার সময় পাঠানেরা কোন চিকিৎসক পাঠায় নাই। দাসী, ইন্দ্রনাথ সুপ্ত বা পীড়ায় জ্ঞানশূন্য থাকিলে তাঁহার ক্ষতগুলি জলে ধৌত করিয়া পুনরায় পরিষ্কার বস্ত্রে বাঁধিয়া দিত। সেই করুণা-জলসেচনে ইন্দ্রনাথের ক্ষত আরাম হইতে লাগিল, তিনি দিন দিন আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রনাথ প্রায় আপন চিন্তায় ব্যস্ত থাকিতেন, তথাপি সময়ে সময়ে দাসীর দুঃখ এক একবার লক্ষ্য করিতেন। অন্ধকারে দাসীকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন না, সস্নেহে কথা কহিতে চাহিলে দাসী ধীরে ধীরে প্রহরীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিত। ইন্দ্রনাথ আবার নিস্তব্ধ হইয়া আপন চিন্তায় অভিভূত হইতেন।

প্রহরীগণ দাসীর এই স্বাভাবিক করুণা দেখিয়া কখন কখন উপহাস করিত, বলিত, "এ বিবি, এ হিন্দু কি তোমাকে সাদী করিবে?" এরূপ উপহাসে দাসী বিরক্ত হইত না, কখন কখন উত্তর দিত; কখন কখন প্রহরীদিগকে সুরাপান করিতে দিত। সুতরাং সকল প্রহরীই দাসীর উপর অতিশয় সন্তুষ্ট ছিল। সমস্ত রাত্রি দণ্ডায়মান হইয়া চৌকী দিবার সময় সেই নবপ্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় সুন্দরী দাসীর কথা ভাবিত,—নিদ্রার সময়ে স্বপ্নে সাকী ও সুরাপেয়ালার কথা ভাবিত।

অদ্য রজনীতে দাসী রক্ষকদ্বয়কে সুরাপান করিতে দিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। রজনী প্রায় এক প্রহর হইয়াছিল, দাসী সুরা লইয়া উপস্থিত হইল। দেখিয়া প্রহরীদ্বয়ের মন একেবারে আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল। একে সেই স্বর্গীয় সুরা তাহার উপর কুরঙ্গনয়না সাকী স্বহস্তে ঢালিয়া দিতেছে,—প্রহরীদ্বয় কখন কখন দুই একটী বায়েৎ শুনিয়াছিল, সুরাদেবীর প্রভাবে সেই বায়েৎ মনে পড়িতে লাগিল। ক্রমে সুরা মস্তকে উঠিতে লাগিল, রজনী দ্বিপ্রহরের মধ্যে প্রহরীদ্বয় অজ্ঞানাবস্থায় শয়ন করিয়া পেয়ালা ও সাকীর স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। দাসী কারাগারে প্রবেশ করিল।

রজনী দ্বিপ্রহর হইয়াছে। আজি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। গভীর নীল আকাশে সহস্র মেঘ রাশীকৃত হইতেছে, দূরে কিছুই দেখা যায় না। দূরে গঙ্গানদী অতি শান্ত মৃদু কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। তাহার

অপর পার্শ্বে অনন্ত বৃক্ষাবলী সেই অনন্ত বারিরাশির উপর লম্বিত হইয়া রহিয়াছে। জগতে শব্দমাত্র নাই—কেবল মধ্যে মধ্যে বৃক্ষকোটর হইতে পেচক ভীষণ শব্দ করিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে প্রহরীগণ ভীষণতর স্বরে শিবির রক্ষা করিতেছে।—আর সমস্ত জগৎই সুষুপ্ত।

ঘরের ভিতর তৃণশয্যায় বীরপুরুষ শয়ান রহিয়াছেন। আজি ইচ্ছাপুর নগরস্থ তাঁহার বহুমূল্য পালঙ্ক কোথায়? পিতার স্নেহ, সরলার ভালবাসা, রাজা টোডরমল্লের বাৎসল্যভাব এ সমস্ত কোথায়? বীরপুরুষ সেই তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত রহিয়াছেন। জগৎ তাঁহার পক্ষে অন্ধকারময়, জীবন শোকপরিপূর্ণ, নিদ্রাই তাঁহার পক্ষে ক্ষণস্থায়ী আরাম।

ইন্দ্রনাথের ললাট পরিষ্কার, ওষ্ঠে হাসির চিহ্ন,—এ দুঃখসাগরে তিনি কি স্বপ্ন দেখিতেছেন? দেখিতেছেন, যেন আজি সপ্তম পূর্ণিমা,—যেন অদ্য তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পুনরায় রুদ্রপুরে গিয়াছেন,—যেন বহুদিন পরে হৃদয়ের সরলাকে পাইয়া হৃদয়ে স্থান দিতেছেন,—যেন তাঁহার নয়নজলে সরলার কৃষ্ণ কেশরাশি সিক্ত হইতেছে, যেন সরলার আনন্দাশ্রুতে তাঁহার হৃদয় সিক্ত হইতেছে। নিদারুণ বিধি! যে হতভাগার পক্ষে কিছুই নাই, জগতে সুখ নাই তাহাকে এমন স্বপ্ন হইতে কেন জাগরিত কর,—এমন সুখের নিদ্রা থাকিতে থাকিতে কেন সে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হয় না?

সরলার অশ্রুজলে যেন ইন্দ্রনাথের হৃদয় অধিকতর সিক্ত হইতে লাগিল, ক্রমশঃ অধিক শীতল হইতে লাগিল। শীত বোধ হওয়াতে ইন্দ্রনাথ জাগিয়া উঠিলেন, দেখিলেন, যথার্থই শ্রাবণ মাসের বারিধারার ন্যায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে অশ্রুধারা পড়িতেছে—নিকটে দাসী বসিয়া নীরবে দরবিগলিত অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতেছে!

ইন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিলেন। দাসীর মায়া ও দুঃখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল, আপনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "দাসী! হতভাগার দুঃখে তুমি কি জন্য দুঃখিনী, আমার জন্য ক্রন্দন করিও না, আমার আর জীবনের আশা নাই,—পরমেশ্বর তোমাকে সুখী করুন। তুমি আমার দুঃখ বিস্মরণ হও;—আমি আমার কারাবাসের একমাত্র বন্ধুকে জন্মান্তরেও বিস্মৃত হইব না।"

দাসী উত্তর করিল না,—নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ আপন দুঃখবেগ সম্বরণ করিয়া আবার বলিলেন,—"দাসি! আমি তোমাকে কিছু দিয়া পুরস্কার করি এরূপ আমার কিছুই নাই, যাহা

আছে তাহা তোমাকে দিলাম।" এই বলিয়া আপন বাহু হইতে স্বর্ণ বলয় দাসীকে দিতে উদ্যত হইলেন।

দাসী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উত্তর করিলেন,—

"ইন্দ্রনাথ! আমি ভিখারিণী বটে, কিন্তু অর্থভিক্ষা করি না।"

বিমলার কণ্ঠধ্বনি যে একবার শুনিয়াছে সে কদাচ বিস্মৃত হইতে পারে না। ইন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন,—

"একি ভিখারিণি! তুমি আমার জন্য এত কষ্ট সহ্য করিয়াছ, দাসীবেশ ধারণ করিয়াছ,—শত্রু শিবিরে আগমন করিয়াছ?"

বিমলা গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন,—"জগতে কোন্ স্থান আছে,—নরকে কোন্ স্থান আছে, যথায় প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির জন্য নারী যাইতে ভয় করে?"

ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া একদৃষ্টিতে বিমলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বিমলা বলিলেন, "ইন্দ্রনাথ! আমি আপনার উদ্ধারের উপায় সংকল্প করিয়াছি,—প্রহরীগণ চৈতন্যশূন্য হইয়াছে,—আপনি রমণীর বেশ করিয়া চলিয়া যাউন, পথে জিজ্ঞাসা করিবার কেহ নাই,—যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে বলিবেন, 'আমি ভিখারিণী দাসী।'"

ইন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "আমি শত্রুর হস্ত হইতে, মৃত্যুর হস্ত হইতে অন্ধকারে রমণীর বেশ ধারণ করিয়া পলাইব না,—সে পুরুষের কার্য্য নহে।"

মানিনী বিমলার বদনমণ্ডল আরক্তবর্ণ হইল, ক্রোধ সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"স্ত্রীজাতি আপনাদিগের ঘৃণার পাত্র, বীরপুরুষ তাহাদিগের বেশ ধারণ করিতে স্বীকার করিবে কিজন্য?"

ইন্দ্রনাথ মর্ম্মান্তিক ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "ভিখারিণি! আমাকে ক্ষমা কর, আমি তাহা বলি নাই। রমণী আমাদিগের প্রেমের পাত্র, আমাদিগের জীবনের জীবন। বিশেষ তুমি আমার একদিন জীবন রক্ষা করিয়াছ, অদ্য আমার রক্ষার জন্য দাসীবৃত্তি স্বীকার করিয়াছ, যে দিন আমি এ উপকার বিস্মৃত হইব, যে দিন তোমাকে তাচ্ছল্য করিব, ভগবান্ যেন সেই দিন আমার নিধন সাধন করেন।"

বিমলা ধীরস্বরে বলিলেন, "তবে রমণীর বেশ পরিধান করিতে সঙ্কোচ করিতেছেন কিজন্য?"

ইন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন,—

"রমণী কোমলা, প্রেমবিহ্বলা, ক্লেশসহনে অক্ষমা! এগুলি রমণীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে, কিন্তু কোমলতা ও অসহিষ্ণুতা যোদ্ধার পক্ষে খাটে না,—যোদ্ধা এই জন্যই রমণীর বেশ ধারণ করিতে সঙ্কোচ করে।"

বিমলার বদনমণ্ডল আবার রক্তবর্ণ হইল,—বলিলেন, "ইন্দ্রনাথ! আপনি রমণীজাতিকে জানেন না, রমণীজাতির সহিষ্ণুতা কখনও আপনি দেখেন নাই। গত কয়েক মাস হইতে আপনার যশে মুঙ্গের পরিপূরিত হইয়াছে, আপনি বন্ধুবান্ধব ত্যাগ করিয়া, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কেবল যুদ্ধকার্য্যে যে সহিষ্ণুতা দেখাইতেছেন, সমস্ত বঙ্গদেশে তাহা রাষ্ট্র হইয়াছে! কিন্তু আমি এই অন্ধকার নিশি সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, এই মুঙ্গেরে একজন রমণী আছেন, যে আপনা অপেক্ষাও দুর্ব্বহণীয় ভার, ভীষণতর যাতনা, আপনা অপেক্ষা অপরূপ সহিষ্ণুতার সহিত নীরবে বহন করিয়াছে,—আহতা কপোতীর ন্যায় নীরবে আপন হৃদয়ের ক্ষত সহ্য করিয়াছে! ইন্দ্রনাথ! ভগবান আপনাকে অনেক দিন নিরাপদে রাখুন, কিন্তু বিধির ইচ্ছা কেহই জানিতে পারে না।—কল্য যদি আপনি সিংহবিক্রম প্রকাশ করিয়া বিজয়লক্ষ্মীর ক্রোড়ে সমরশায়ী হয়েন, আর আপনাকে উদ্ধার করিয়াছি বলিয়া নিষ্ঠুর পাঠানগণ যদি আমাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া হত্যা করে, জানিবেন যে, আপনি যেরূপ ভয়শূন্য উল্লাস-পরিপূর্ণ হৃদয়ে যোদ্ধার মরণ স্বীকার করিবেন,—আপনার উদ্ধার সাধন করিয়া জীবনের সার্থকতা লাভ করিয়াছি, এই বিশ্বাসে এই অভাগিনী তদপেক্ষা উল্লাসের সহিত মরিতে সম্মত হইবে! সে অগ্নিরাশি দর্শনে মস্তকের একটী কেশও কম্পিত হইবে না, নয়নে একবিন্দু জলও লক্ষিত হইবে না! যখন অগ্নিতে হৃদয় দগ্ধ হইবে, তখন পর্য্যন্ত ওষ্ঠে উল্লাস ও সহিষ্ণুতার হাস্য বিরাজমান থাকিবে,—পাঠানগণ রমণীর শরীর ভস্মীভূত করিতে পারে, কিন্তু রমণীর বীরত্ব জয় করিতে পারিবে না। ইন্দ্রনাথ, নারীজাতিকে সহিষ্ণুতায় অক্ষম বলিও না,—সহিষ্ণুতার জন্যই নারীজাতি জন্মগ্রহণ করে।"

এই কথা শুনিয়া ইন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন,—অনিমেষলোচনে সেই বীরাঙ্গণার প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, সেই গম্ভীর আকৃতি, সেই উন্নত প্রশস্ত ললাট, সেই কুঞ্চিত ভ্রূযুগলে সেই অনলবিক্ষেপী নয়নদ্বয়, সেই রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল, সেই কম্পিত হৃদয় লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন,—অনেকক্ষণ পর বিমলা আবার অতি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন,—

ইন্দ্রনাথ, ক্ষমা করুন, আমি প্রেমের পরিচয় দিতে আইসি নাই, আপন অহঙ্কারার্থও আইসি নাই, যাহা বলিলাম, বিস্মরণ হইবেন।"

ইন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন,—"ভিখারিণি! আজি যাহা দেখিলাম, জন্মান্তরেও বিস্মৃত হইব না,—স্ত্রীলোকের বীরত্ব নাই, একথা আর আমি কখনও বলিব না;—কি করিতে হইবে বল, আমি তোমার বেশ ধরিতে সম্মত আছি—কিন্তু আমি গেলে কিরূপে তোমার উদ্ধার হইবে?"

বিমলা বলিলেন, "আমার জন্য চিন্তা করিবেন না, আমার উদ্ধারের উপায় আছে,—উদ্ধার না হইলেও অধিক ক্ষতি নাই। ভিখারিণীর জন্য চিন্তা করিবে, ভিখারিণীর জন্য শোক করিবে, জগতে এরূপ কেহ নাই। অনন্ত সাগরের মধ্যে একটী জলবিম্ব যেরূপ লীন হইয়া যায়, তদ্রূপ এই জগৎসংসারে একজন হতভাগিনীর মৃত্যু অশ্রুত, অলক্ষিত ও অচিন্তিত থাকিবে। ভগবান্ আমার স্থানে জগতে যাহাকে পাঠাইবেন, তাহাকে যেন আমা অপেক্ষা সুখী করেন।"

ইন্দ্রনাথ বিমলার প্রতি তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অবশেষে ধীরভাবে বলিলেন, "ভিখারিণি! তুমি আমার উদ্ধারে যত্নবতী হইয়াছ, তাহার জন্য আমি আজন্মকাল তোমার নিকট বাধিত রহিলাম; কিন্তু তোমাকে এই স্থানে রাখিয়া আমি কারাগার ত্যাগ করিব না,—উপরোধ করিও না।"

এবার বিমলা পরাস্ত হইলেন। অনেক অনুরোধ করিলেন, অনেক কারণ দর্শাইতে লাগিলেন,—কিছুতেই বীরপুরুষের প্রতিজ্ঞা বিচলিত করিতে পারিলেন না। ইন্দ্রনাথের একই উত্তর,—"যিনি আমাকে একবার প্রাণদান করিয়াছেন, তাঁহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া আমি উদ্ধার প্রার্থনা করি না;—এরূপ উদ্ধারে, এরূপ জীবনে আমার কায নাই।"

বিমলা পরাস্ত হইলেন, বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন; অবশেষে বলিলেন,

"ইন্দ্রনাথ, আপনাকে দুঃখ দেওয়া আমার সঙ্কল্প নহে, কিন্তু আর উপায়ান্তর নাই,—আমি আর একটী কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ করুন, আপনার উদ্ধার বাঞ্ছনীয় কি না, বিচার করুন।"

ইন্দ্রনাথ শুনিতে লাগিলেন;—বিমলা অনেকক্ষণ পর অতি কষ্টে বলিলেন,—

"আপনার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী সরলা আজি চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে আবদ্ধ রহিয়াছেন। আগামী পূর্ণিমার পরপূর্ণিমার মধ্যে যদি আপনি তাঁহার উদ্ধার না করেন, তবে পামর শকুনি তাঁহাকে বিবাহ করিবে।"

ইন্দ্রনাথ সহসা বজ্রাহতের ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল,—ললাট হইতে স্বেদবিন্দু নির্গত হইতে লাগিল, নয়নে নিমেষ নাই, স্পন্দ নাই! বিমলা তাঁহাকে অনেক আশ্বাস দিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। ইন্দ্রনাথ নীরবে শুনিলেন,—নীরবে হস্তের উপর ললাট ন্যস্ত করিয়া অধোবদনে রহিলেন। মস্তকে শিরা স্ফীত হইতেছিল, নয়ন হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল, হৃদয়ের ভিতর মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যেন বজ্রাঘাত হইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর ইন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে মস্তকোত্তোলন করিয়া বলিলেন,—

"ভিখারিণি! তোমার কথাই থাকিবে, আমি পলায়ন করিব,—কিন্তু একটী প্রতিজ্ঞা কর।"

বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রতিজ্ঞা?"

ইন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন, "যদি কল্য উদ্ধারের অন্য উপায় না দেখ,—যদি নৃশংস পাঠানেরা তোমার বধের আজ্ঞা দেয়, অঙ্গীকার কর মাসুমীর নিকট এক দিবসের সময় প্রার্থনা করিও! আমি মাসুমীকে বিলক্ষণ জানি,—অবলার এ যাচ্ঞায় কখনই অস্বীকৃত হইবেন না—এক দিনের মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটিতে পারে।"

বিমলা প্রতিশ্রুত হইলেন।

তখন বিমলা ইন্দ্রনাথকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া দিলেন। ইন্দ্রনাথ আপনার নূতন রূপ দেখিয়া হাসিলেন। আবার বিমলার দিকে চাহিলেন,—সে হাসি শুকাইয়া গেল। অশ্রুপূর্ণলোচনে বিমলার হস্ত দুইটী আপনার দুই হস্তে ধারণ করিয়া বলিলেন,—

"ভিখারিণি! দুইবার তুমি আমার প্রাণরক্ষা করিলে, আমি চিরকাল তোমার নিকট ঋণী রহিলাম।" নয়নের অশ্রু বেগে বহিতে লাগিল, বিমলার হস্ত সিক্ত হইল, ইন্দ্রনাথ বেগে বহির্গত হইলেন। বিমলা তখন বাক্‌শূন্য হইয়া রহিলেন, তাহার হৃদয়ে বিদ্যুৎ ছুটিতেছিল, অপার্থিব সুখে তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইতেছিল! ইন্দ্রনাথের মধুর বাক্যে তাঁহার কর্ণ পরিতৃপ্ত হইতেছিল, ইন্দ্রনাথের প্রীতিসূচক নয়নজলে তাঁহার হস্ত সিক্ত হইতেছিল,—বিমলা স্ত্রীলোক,—মুহূর্ত্তের জন্য একবার বীরপ্রতিজ্ঞা ভুলিলেন,—মুহূর্ত্তের জন্য ইন্দ্রনাথকে লইয়া সুখী হইবেন, এইরূপ আশা জাগরিত হইল! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ভুলিলেন,—মুহূর্ত্তের জন্য সেই প্রেমময় বীরপুরুষকে মনে মনে আপন স্বামী বলিয়া সম্বোধন করিলেন। অভাগিনি! তোমার স্বামি কে? বিমলা সহসা সুখস্বপ্ন হইতে জাগরিত

হইলেন,—তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল,—ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিলেন,—ইন্দ্রনাথ নাই,—হৃদয় শূন্য হইল,—মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

ঊনত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

পুরুষের বীরত্ব।

Heard ye the din of battle bray,
Lance to lance and horse to horse.
Grey.

ইন্দ্রনাথকে সহসা শিবিরে দেখিয়া তাঁহার অধীনস্থ সেনাদিগের বিস্ময় ও আহ্লাদের সীমা ছিল না! কিন্তু ইন্দ্রনাথ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না, আমার অধীনস্থ পঞ্চশত অশ্বারোহী ও এক সহস্র পদাতিক বর্ম্ম পরিধান ও অস্ত্র শস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হও,—এই-ক্ষণেই নিঃশব্দে শত্রুশিবির আক্রমণ করিব।"

সৈন্যেরা বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া রণসজ্জা করিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ এই অবসরে নিকটস্থ এক শিবমন্দিরে যাইলেন। ক্ষণেক উপাসনা করিলেন, পরে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, "ভগবন্! অদ্যকার মত অসংসাহসী কার্য্যে আমি কখনও লিপ্ত হই নাই, অদ্য প্রসন্ন হইয়া আমাকে বিজয়লাভ করিতে দিন, বিজয়লাভ করিয়া যদি প্রাণহানি হয়, ক্ষতি নাই,—পিতাকে কুশলে রাখুন—পিতার সঙ্গে সঙ্গে আর একটী নাম ইন্দ্রনাথ উচ্চারণ করিলেন,—আর একজনের কুশল প্রার্থনা করিলেন,, নিঃশব্দে সকলে শিবির হইতে বহির্গত হইলেন।

রজনী দুই প্রহর অতীত হইয়াছে, চন্দ্র অস্ত গিয়াছে, চারিদিকে গভীর অন্ধকার। আকাশে দুই একটী তারা দেখা যাইতেছে, আবার মেঘরাশিতে আবৃত হইতেছে, মধ্যে মধ্যে পেচকের ভীষণ শব্দ ও নিশার ভীষণ রব শুনা যাইতেছে ও নিকটস্থ গঙ্গার ভীম কল্লোল শ্রুতিগোচর হইতেছে। সে গভীর অন্ধকারে ইন্দ্রনাথের সেনা নিঃশব্দে শত্রু-শিবিরাভিমুখে চলিল।

ক্ষণেক যাইতে যাইতে দূর হইতে একটা আলোক দৃষ্টিগোচর হইল, সে আলোক একবার দেখা যায়, অন্যবার নির্ব্বাণপ্রায় হয়। ইন্দ্রনাথ দাঁড়াইলেন,

একজন দূতকে অগ্রে প্রেরণ করিলেন। দূত নিঃশব্দে যাইয়া নিঃশব্দে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, বলিল, "শত্রুপক্ষের চারিজন শিবিররক্ষক ঐ স্থানে পাহারা দিতেছে, অন্ধকারে কেহ না যাইতে পারে বলিয়া অগ্নি জ্বালাইতেছে।" ইন্দ্রনাথ দশ জন তীরান্দাজকে অগ্রে যাইতে বলিলেন ও আদেশ করিলেন, "যদি ঐ চারিজনের মধ্যে একজনও পালাইয়া যাইয়া শিবিরে সংবাদ দেয়, তবে তোমাদের দশ জনের প্রাণসংহার করিব।" তীরান্দাজগণ ধীরে ধীরে যাইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে চারি জনকেই ভূতলশায়ী করিল। ইন্দ্রনাথের সেনা অগ্রসর হইতে লাগিল।

আরও দুই তিন স্থানে ঐরূপ পাহারা ছিল, রক্ষকগণ ঐরূপে নিহত হইল। এক স্থানের একজন রক্ষক পলায়ন করিল। ইন্দ্রনাথ চিন্তিত হইলেন, আদেশ দিলেন, "অশ্ব ধাবিত করিয়া আইস, রক্ষক শিবিরে পঁহুছিবার অগ্রে আমরা যাইব।"

ইন্দ্রনাথ অল্প সময়ের মধ্যেই পাঠানদিগের পরিখার নিকটবর্ত্তী হইলেন, তাঁহার অশ্বারোহীরা তাঁহার সঙ্গে ছিল, পদাতিকেরা পশ্চাতে পড়িয়াছিল। পরিখার বাহিরেও প্রায় তিন চারি সহস্র পাঠানসেনা রণসজ্জা করিয়াছিল, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

শত্রুরা সম্মুখে তিন রেখায় সজ্জিত ছিল, প্রথম রেখার সৈন্যেরা উপবেশন করিয়া অশ্বারোহীদিগের গতিরোধের জন্য বর্শা উত্তোলন করিয়াছিল,—দ্বিতীয় রেখার সৈন্যেরা কিঞ্চিৎ নত হইয়া সেইরূপ বর্শা ধারণ করিয়াছিল ও কিঞ্চিৎ দূরে তৃতীয় শ্রেণীর সৈন্যেরা দণ্ডায়মান হইয়া বর্শা ধারণ করিয়াছিল। তাহাদের আকৃতি দেখিলে বোধ হয় যে, যদি ভীষণ পর্ব্বতরাশি আসিয়া তাহাদিগের মস্তকে পতিত হয়, তাহারা সেই পর্ব্বতরাশির গতিরোধ করিতেও প্রস্তুত ছিল, কিন্তু ইন্দ্রনাথের গতিরোধ করিতে পারিল না।

ইন্দ্রনাথ আদেশ করিলেন, "এস্থানে যুদ্ধের আবশ্যক নাই, অগ্রসর হও।" অশ্বারোহীগণ কাহারও উপর অস্ত্রক্ষেপ না করিয়া অশ্ব ধাবিত করিলেন।

বর্ষাকালে পর্ব্বতশেখর হইতে নদী যেরূপ বেগে অবতরণ করিয়া নিম্নস্থ বৃক্ষ, কুটীর, গ্রাম একেবারে ভাসাইয়া লইয়া যায়, পঞ্চশত অশ্ব সেইরূপ সৈন্য রেখাত্রয়ের উপর আসিয়া পড়িল। কাহার সাধ্য সে বেগগতি রোধ করে, নদীর বেগ কে ফিরাইতে পারে? তিন রেখা ভগ্ন ও ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, অশ্বের পদাঘাতে অনেক সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল, অনেক সৈন্যের

উপর দিয়া অশ্ব লম্ফ দিয়া উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইল, কতকগুলি অশ্ব ও অশ্বারোহী শত্রুর অনিবার্য্য বর্শাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল, কিন্তু ইন্দ্রনাথের কার্য্য সাধন হইল, সে রেখা উত্তীর্ণ হইলেন। পাঠানগণ ভঙ্গ দিয়া চারিদিকে পলাইল, ইন্দ্রনাথের পদাতিক সৈন্যগণ আসিয়া তাহাদের শিবিরে অগ্নিদান করিল।

তখন ইন্দ্রনাথ একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, শত্রুর চিহ্নমাত্র নাই, শত্রুদের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ দুঃখ হইল। দেখিলেন, নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন করা যায়। সম্মুখে দেখিলেন শত্রুসেনা রাশি রাশি সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে ও পরিখা রক্ষা করিতেছে। মনে মনে ভাবিলেন, "এ পর্য্যন্ত আমাদের অধিক ক্ষতি হয় নাই, বোধ হয়, অশ্বারোহী ও পদাতিক এক শত মাত্র হত হইয়াছে, শত্রুরা পরিখার বাহিরে যে তিন সহস্র ছিল সমস্তই প্রায় হত হইয়াছে। সম্মুখে নিশ্চয় বিনাশ, এই স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ভিখারিণি! দুইবার আমার জীবনরক্ষা করিয়াছ, তোমার জীবনরক্ষা করিব অথবা প্রাণত্যাগ করিব।" "পরিখা পার হও" এই বলিয়া বেগে অশ্ব ধাবিত করিলেন।

কিন্তু এবার তাঁহার গতিরোধ হইল। পরিখার অপর পার্শ্বে সৈন্যরাশি সজ্জিত ছিল, অশ্বারোহীগণ উঠিতে উঠিতে তাহারা আসিয়া গতিরোধ করিল, মুহূর্ত্তমাত্র ভীষণ যুদ্ধ হইল, অশ্ব ও অশ্বারোহীগণ বেগে নীচে নিক্ষিপ্ত হইল, অনেকের প্রাণসংহার হইল। সতর্ক পাঠানেরা স্বয়ং নীচে না থাকিয়া পুনরায় উপরে যাইয়া পুনরায় আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অশ্বারোহীদিগের মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত শোণিত ও কর্দ্দমে আপ্লুত হইয়াছে। নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তাঁহারা উঠিলেন। ইন্দ্রনাথ মনে মনে স্থির করিলেন, "এই পরিখা পার হইব কিম্বা এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিব।"

দ্বিতীয়বার ভীষণ বেগে অশ্বারোহীগণ পরিখা পার হইবার চেষ্টা করিলেন,—দ্বিতীয়বার ভীষণ যুদ্ধ হইল, দ্বিতীয়বার অশ্ব ও অশ্বারোহী নীচে নিক্ষিপ্ত হইল। ক্ষতি নাই। তৃতীয়বার ভীষণতর বেগে অশ্ব ধাবিত করিলেন, এবার সৈন্যদিগের মস্তকের উপর লম্ফ দিয়া অশ্বগণ উঠিল,—পরিখা পার হইল। ইন্দ্রনাথ ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন। পঞ্চ শত অশ্বারোহীর মধ্যে তখন কেবল তিন শত জীবিত, আর অন্য দুই শত পরিখায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

ইন্দ্রনাথের অশ্বারোহী ও তৎপরে পদাতিক সৈন্য পরিখা পার হইল বটে, কিন্তু সম্মুখে সহস্র সহস্র পাঠান সৈন্য সজ্জিত রহিয়াছিল; ইন্দ্রনাথ সসৈন্যে বিনাশ ভিন্ন অন্য উপায় দেখিলেন না। অচিরাৎ ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

কাহার সাধ্য সে ভীষণ যুদ্ধ বর্ণনা করে? চারিদিকে ঘোর অন্ধকার, আকাশে ভীষণ মেঘরাশি বায়ুতে ধাবিত হইতেছে, ইন্দ্রনাথের চতুর্দ্দিকে ভীষণতর সৈন্যমেঘ প্রধাবিত হইতেছে। সেনা ভয় কাহাকে বলে জানে না, ইন্দ্রনাথ যতক্ষণ আছেন, অবশ্য জয় হইবে। সেই সেনাগণের বীরত্ব কে বর্ণনা করিবে। চক্ষুতে নিমেষ নাই, অস্ত্রসঞ্চালনে বিশ্রাম নাই, সহস্র সহস্র সৈনিক চারিদিকে আঘাত করিতেছে, অনায়াসে প্রতিহত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে,—ভীষণ বায়ুপ্রপীড়িত সমুদ্রের মধ্যে পর্ব্বত-শেখরবৎ ভীষণ বাত্যার মধ্যে লৌহ স্তম্ভবৎ তাঁহারা অচল অটল হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছেন। একজন, দুই জন, দশ জন হত হইলেন,—ক্ষতি নাই,—চারিদিকে সেনাতরঙ্গ ভীম কলরবে "আল্লা হু আকবর" শব্দ করিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বার বার আক্রমণ করিতেছে,—ক্ষতি নাই, শত্রুসৈন্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, বর্ষার মেঘের মত জড় হইতেছে, বর্ষার বজ্রের মত গর্জ্জন করিতেছে,—ক্ষতি নাই, নিঃশব্দে নিঃশঙ্কে বঙ্গীয় যোদ্ধা যুদ্ধ করিতেছেন। ধন্য যুদ্ধ-কৌশল! ধন্য বীরত্ব!

অপার্থিব রাক্ষসের মত বলিষ্ঠ ও ভীষণ শত্রুগণ অপার্থিব সাহস ও তেজে আক্রমণ করিতেছে,—ক্ষতি নাই। অসুর তুল্য পাঠানেরা তরঙ্গে তরঙ্গে আসিয়া আঘাত করিতেছে, দেবতুল্য অশ্বারোহীগণ নিঃশব্দে তাহাদিগকে প্রতিহত করিতেছেন, শীঘ্রই সেই রণস্তম্ভের চতুর্দ্দিকে মৃত-দেহের প্রাচীর হইয়া উঠিল, কিন্তু রণস্তম্ভ ভগ্ন হইল না! ধন্য বীরত্ব!

সহসা সহস্র বজ্রের অধিক শব্দ হইয়া উঠিল। পাঠানদিগের শিবিরে যে অগ্নি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা কোনরূপে যাইয়া বারুদে পড়িয়াছিল, একেবারে কত শত মণ বারুদ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। যে বৃহৎ অট্টালিকায় বারুদ ছিল, তাহা চূর্ণ হইয়া আকাশে উঠিল, মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল, আকাশ ও পৃথিবী আলোকে ঝল্‌সাইয়া যাইল। সে তেজ ও সে ভীষণ রবের সম্মুখে মনুষ্যের তেজ স্তব্ধ হইল, সহসা যুদ্ধ থামিয়া যাইল, সকলেই সেই দিকে একদৃষ্টিতে চাহিল। ইন্দ্রনাথ এই অবসরে কেবল দুইজন মাত্র, অতি বিশ্বাসী অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া সহসা বিদ্যুতের ন্যায় তেজে একদিক্ ভেদ করিয়া চলিয়া যাইলেন। পাঠানেরা তাঁহার গতিরোধ

করিবার চেষ্টা না করিয়া সম্মুখের সহস্র মোগল পদাতিক ও অশ্বারোহীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া যাইয়া কারাগারের নিকট পঁহুছিলেন, তিন চারি জন সেনা বর্শার আঘাতে তাহার লৌহ কবাট ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ইন্দ্রনাথ বিদ্যুতের মত সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন।

"ভিখারিণি!" "ভিখারিণি!" "ভিখারিণি!" কৈ! ভিখারিণী তথায় নাই। ইন্দ্রনাথের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, সহসা শরীর অবসন্ন হইল।

তৎক্ষণাৎ স্মরণ করিলেন, স্ত্রীলোকদিগের জন্য ভিন্ন কারাগার আছে। তৎক্ষণাৎ সেই কারাগারে দৌড়াইয়া যাইলেন। ভরসা ও ভয়ে হৃদয় দুরু দুরু করিতে লাগিল, ঘন ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাস করিতে লাগিলেন, হৃদয় এরূপ স্ফীত হইতে লাগিল, বোধ হয় যেন অস্থি চর্ম্ম ও উপরিস্থিত লৌহ বর্ম্ম বিদীর্ণ হইবে।

স্ত্রীলোকের কারাগারের কবাট সহসা উৎপাটিত হইল। ইন্দ্রনাথ দ্রুতবেগে যাইয়া ডাকিলেন, "ভিখারিণি!" "ভিখারিণি!"—ভিখারিণী নাই, ইন্দ্রনাথের মুখে আর কথা নাই, ধীরে ধীরে মুখ অবনত করিলেন, হস্ত দিয়া চক্ষু আচ্ছাদন করিলেন, ললাট, ভ্রূযুগল ও সমস্ত বদনমণ্ডল ভীষণ বিকৃতি ধারণ করিল। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আকা-শের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভগবন্! এই কি তোমার মনে ছিল, আমার সকল যত্ন বিফল করিলেন!"

সহসা একটা কথা মনে পড়িল, নিষ্কোষিত তরবারিহস্তে কারাগারের রক্ষককে যাইয়া ধরিলেন, বলিলেন, "যে রমণীকে ইন্দ্রনাথের কারাগারে পাওয়া গিয়াছিল, সে কোথায়? বলিতে বিলম্ব করিলে মস্তক ছেদন করিব।"

রক্ষক ভীত হইয়া বলিল, "বধ্যভূমি," ভয়ে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়াছিল, কথা বাহির হইল না।

তৎক্ষণাৎ পঞ্চজন অশ্বারোহী বিদ্যুৎ-বেগে বধ্যভূমিতে যাইলেন। ইন্দ্রনাথ সভয়ে দেখিলেন চারিদিকে পাঠান সেনা জড় হইতেছে, অলক্ষিত-রূপে অন্ধকারে বধ্যভূমিতে যাইয়া পঁহুছিলেন। তাঁহার হৃদয় তখনও ভরসা ও ভয়ে স্ফীত হইতেছে। যাইয়া দেখিলেন, চারিদিকে ঘোর অন্ধকার! "ভিখারিণি!" "ভিখারিণি!" "ভিখারিণি!" একবার, দুইবার, তিনবার ডাকিলেন, উত্তর নাই,—অন্ধকার বধ্যভূমি হইতে সেই নাম প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রোষে, খেদে ইন্দ্রনাথ জ্ঞানশূন্য হইলেন,

লৌহমণ্ডিত হস্ত দ্বারা আপন ললাটে আঘাত করিলেন, ঝনৃঝনা করিয়া শব্দ হইল, ললাট হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল।

আবার ডাকিলেন, "ভিখারিণি!" "ভিখারিণি!" "ভিখারিণি!" কোন উত্তর নাই, এক পার্শ্বে দেখিলেন, অগ্নিরাশি নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। নৃশংস পাঠান ভিখারিণীকে কি দাহ করিয়াছে? ইন্দ্রনাথের হৃৎকম্প হইল, ভূমিতে পতিত হইলেন। আকাশের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন,—সহসা নিকটস্থ তরুকোটর হইতে যেন সেই দীর্ঘনিশ্বাস প্রতিধ্বনিত হইল।

ইন্দ্রনাথ লম্ফ দিয়া উঠিলেন, সেই বৃক্ষের অন্তরালে যাইয়া দেখিলেন, কোথাও কিছু নাই, কেবলমাত্র রজনী-বায়ু এক একবার ভীষণ উচ্ছ্বাসে বহিতেছে, কেবলমাত্র দূর হইতে ভীষণ যুদ্ধ-শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে, চারিদিকের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে এক একবার ভীষণ অগ্নিশিখা দেখা যাইতেছে—ইন্দ্রনাথ হতাশ হইয়া আবার ভূমিতে পতিত হইলেন, সহস্র শত্রুকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া সেইস্থানে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন,—ভিখারিণীর দশা চিন্তা করিয়া আবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

আবার সে নিশ্বাস যেন প্রতিধ্বনিত হইল। ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন, আবার চারিদিক্ দেখিতে লাগিলেন, সহসা অন্ধকারে এক মানবাকৃতি দেখিতে পাইলেন,—হরি হরি! একি ভিখারিণী!

ভিখারিণীকে যে অবস্থায় দেখিলেন, তাহাতে পাষাণ-হৃদয় বিগলিত হয়। বিমলা দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, কিন্তু সেই বৃক্ষে আপাদমস্তক বদ্ধ রহিয়াছে। হস্তদ্বয় পশ্চাদ্দিকে বৃক্ষের সহিত বদ্ধ রহিয়াছে, পদদ্বয় বৃক্ষের সহিত বদ্ধ রহিয়াছে, কক্ষ ও বক্ষঃস্থল রজ্জুদ্বারা এরূপ সজোরে বদ্ধ রহিয়াছে, যে সেই সেই স্থান হইতে শোণিত নির্গত হইতেছে, কেশপাশ কতক পশ্চাতে বৃক্ষের সহিত বদ্ধ রহিয়াছে, কতক শরীরের উপর লম্বিত রহিয়াছে। মুখের উপর এক খণ্ড বস্ত্র বদ্ধ রহিয়াছে, কথা কহিবার উপায় নাই। কটীদেশে কেবল একখানি জীর্ণবস্ত্র ছিল, তদ্ভিন্ন মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ শরীর উলঙ্গ, কেবল নিবিড় কেশরাশি জানু পর্য্যন্ত লুটাইয়া পড়িয়া শরীর আবৃত করিতেছে। বিমলা স্বর্গের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছিলেন, বাহ্যিক বস্তুতে তাঁহার মন নাই, বিমলা পরমেশ্বরের পবিত্র নাম জপ করিতেছিলেন, তাঁহার ক্লেশ নাই, খেদ নাই, ভয় নাই, লজ্জা নাই, তাঁহার বদনমণ্ডলে কেবল পবিত্র শান্তি বিরাজ করিতেছিল।

ইন্দ্রনাথের নয়নে শূল বিদ্ধ হইতে লাগিল। বলিলেন, "ভগবন্! আজি পাঠানদিগের যাতনা দেখিয়া একবার আমি দুঃখ করিয়াছিলাম,— আর করিব না, নরকেও তাহাদিগের পাপের উপযুক্ত যাতনা নাই।"

নিঃশব্দে বিমলার শরীরের রজ্জু খণ্ডন করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পর বিমলার একবার চেতনা হইল,—ইন্দ্রনাথকে চিনিতে পারিলেন, বলিলেন, "ইন্দ্রনাথ, কি জন্য আমার উদ্ধারের জন্য আসিয়াছ? আমার জীবনের কার্য্য সমাধা হইয়াছে, ভগবানের ইচ্ছায় আমি এ পাপ প্রাণ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।" এইমাত্র বলিয়া আবার প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হইলেন।

যে স্বরে একথা উচ্চারিত হইল, ইন্দ্রনাথ শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। অতি ক্ষীণ মৃদু পবিত্র স্বর শুনিয়া ইন্দ্রনাথ মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলেন। ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "ভিখারিণি! কথার সময় নাই, তোমার জন্য এক্ষণে বস্ত্র কোথায় পাইব, আমি একবার তোমার বেশ ধারণ করিয়াছিলাম, তুমি একবার আমার বেশ ধারণ কর।" এই বলিয়া ইন্দ্রনাথ আপন শরীর হইতে লৌহবর্ম্ম খুলিয়া বিমলাকে পরাইয়া দিতে লাগিলেন। বিমলার সংজ্ঞা নাই, বস্ত্রহীন হইয়াছিলেন, স্মরণ ছিল না। ইন্দ্রনাথ যাহা পরাইলেন, অজ্ঞান সংজ্ঞাশূন্যের ন্যায় তাহাই পরিলেন।

ইন্দ্রনাথ সমস্ত লৌহবর্ম্ম বিমলাকে দিয়া আপনি কেবল শরীরে যে বস্ত্র ছিল তাহাই রাখিয়া অশ্বারোহণ করিলেন। তাঁহার আদেশে একজন অশ্বারোহী বিমলাকে আপনার পশ্চাতে উঠাইয়া লইলেন, না পড়িয়া যান্ এই জন্য একটা পেটী দিয়া বিমলার শরীর আপনার শরীরের সহিত বদ্ধ করিলেন। পরে পঞ্চ অশ্বারোহী, যে দিকে যুদ্ধ হইতেছিল, সেই দিকে অশ্ব ধাবিত করিলেন। বিমলা তখনও সংজ্ঞাশূন্য অচেতনপ্রায়।

পাঠান-সেনা-সমুদ্র ভেদ করিয়া কিরূপে শিবিরে ফিরিয়া যাইবেন, তাহা ইন্দ্রনাথ স্থির করিতে পারিলেন না। কেবল ভগবান ও আপন খড়্গের উপর বিশ্বাস করিয়া যুদ্ধশ্রেণীতে পুনরায় প্রবেশ করিলেন। সেনাপতিকে পাইয়া মোগল সৈন্যগণ পুনরায় জয়রব করিয়া উঠিল, সে জয়রব আকাশ ভেদ করিয়া উঠিল।

বারুদে যে অগ্নি লাগিয়াছিল, তাহা হইতেই ইন্দ্রনাথের অদ্য পরিত্রাণ হইল ও পাঠানদিগের সর্ব্বনাশ হইল। সে অগ্নি নিবৃত্ত না হইয়া ক্রমশঃ অন্যান্য তাম্বু ও অট্টালিকাকে ভস্মসাৎ করিতে লাগিল। পাঠানেরা ভগ্নচেতা হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল, সেই জন্য এক সহস্রমাত্র মোগল সেনা

এতক্ষণ অধিক সংখ্যক্ পাঠান সেনার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অগ্নি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, পরে যে দিকে সেনাদিগের স্ত্রীপরিবার ছিল, সেই দিকে অগ্নি লাগিল। পাঠানেরা ব্যাকুলচিত্ত হইল, এই সময়ে ইন্দ্রনাথের আগমনে মোগল সৈন্যেরা জয় জয় করিয়া উঠিল। ভীত পাঠানেরা স্থির করিল, পুনরায় অধিক মোগল সৈন্য আসিয়াছে, একেবারে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

ইন্দ্রনাথের আদেশে মোগল সৈন্য পরিখা পুনরায় পার হইয়া শিবিরাভিমুখে চলিল। প্রাতঃকাল প্রায় হইয়া আসিয়াছে,—ইন্দ্রনাথ ভাবিলেন, "যদি এখনও শত্রুরা জানিতে পারে, যে আমরা কেবল সহস্র জনমাত্র আসিয়াছি, তাহা হইলে এক্ষণও ফিরিয়া আসিয়া আমাদের ধ্বংস করিতে পারে, আর বিলম্বে আবশ্যক নাই।"

ইন্দ্রনাথ পাঠান শিবিরের এক অংশ মাত্র ভেদ করিয়া বিমলার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, সে অংশে কেবল ৯ কি ১০ সহস্র সেনা ছিল। এক্ষণে দেখিলেন, পাঠানদিগের সমস্ত শিবিরের সেনা জাগরিত হইয়া যুদ্ধসজ্জা করিয়া আসিতেছে, প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র কি তদধিক পদাতিক ও অশ্বারোহী ইন্দ্রনাথের অল্প সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিতে আসিতেছে। ইন্দ্রনাথ সসৈন্যে দ্রুতবেগে দুর্গাভিমুখে চলিলেন, পাঠান সেনা নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই মুঙ্গেরে পঁহুছিলেন।

সমস্ত শিবির জয় জয় রবে পরিপূরিত হইল। "ইন্দ্রনাথ কারামুক্ত হইয়াছেন,—হইয়াই শত্রুদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন। মোগলদিগের সহস্র সৈন্যে পাঠানদিগের পরিখা উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বনাশ করিয়া আসিয়াছেন, মোগলদিগের পঞ্চশত সেনা মাত্র হত হইয়াছে, পাঠানদিগের ন্যূনকল্পে পঞ্চ সহস্র সেনা হত হইয়াছে ও অনেক তাম্বু, বারুদ, খাদ্যদ্রব্য দাহ হইয়াছে।" এরূপ সংবাদ পাইয়া মোগল সৈন্যগণ উল্লাসে উন্মত্তপ্রায় হইল। টোডরমল্ল স্নেহসহকারে ইন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন করিলেন,—তিনি কিরূপে উদ্ধার পাইলেন জিজ্ঞাসা করিবার কাহারও অবসর রহিল না।

কয়েক জন অশ্বারোহী ভিন্ন বিমলার কথা কেহ জানিল না। বিমলা রজনীযোগে আপন বস্ত্র পরিধান করিয়া ধীরে ধীরে পিত্রালয়ে যাইলেন।

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

Out ! Out ! brief candle !
Shakespeare.

উপরি উক্ত ঘটনার দুই তিন দিন পরে এক দিন সন্ধ্যার সময় রাজা টোডরমল্ল ও ইন্দ্রনাথ দুই জন দুর্গের প্রাচীরোপরি পদচারণ করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকক্ষণ কথোপকথন হইতেছিল। রাজা বলিলেন,—

"তুমি বালক বলিয়া এরূপ বলিতেছ, যুদ্ধে কেবল সাহস আবশ্যক করে না, রণকৌশলও আবশ্যক।"

ইন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "কিন্তু আপনি কি বোধ করেন, যদি আমরা দুর্গ ছাড়িয়া সম্মুখরণে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমরা পরাস্ত হইব ?"

রাজা। "যুদ্ধ করিলে পরাস্ত হইব না, কিন্তু কয় জন যুদ্ধ করিবে ?"

ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন। ক্ষণেক পর বলিলেন, "মহারাজ, তবে আমরা কয় দিন এই অবস্থায় দুর্গের ভিতর থাকিব ?"

রাজা। "আর অধিক দিন নহে। ঐ যে একখানি শিবিকা আসিতেছে, উহার আরোহী আমাদিগকে এইক্ষণেই সংবাদ দিবেন, যে আর অল্প দিনের মধ্যে শত্রুর বিনাশ হইবে,—আমাদের বিনা যুদ্ধে জয় হইবে!"

ইন্দ্রনাথ যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন, বলিলেন,—

"মহারাজ! আপনার যুদ্ধকৌশল জগৎ-বিখ্যাত। কিন্তু আপনি মন্ত্রবলে ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন, তাহা আমি জানিতাম না।"

সেই শিবিকা নিকটে আসিলে তাহার ভিতর হইতে দেওয়ানজী সতীশচন্দ্র অবতরণ করিলেন। ইন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেখিয়া আরও বিস্মিত হইলেন।

সতীশচন্দ্রের সহিত রাজা টোডরমল্লের যে যে কথা হইল, তাহা বিস্তারিত বিবরণ করিবার আবশ্যক নাই, সংক্ষেপে, সতীশচন্দ্র রাজা টোডরমল্ল কর্তৃক বঙ্গদেশীয় প্রধান প্রধান হিন্দু জমীদারের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। সতীশচন্দ্র কার্য্যদক্ষ, বাক্‌পটু ও বুদ্ধিমান্। সেই সকল জমীদারের নিকট নানারূপ কারণ দর্শাইয়া তাঁহাদিগকে একে একে পাঠানপক্ষ ত্যাগ করিয়া মোগলপক্ষ অবলম্বন করিতে লওয়াইয়াছিলেন।

পাঠানেরা চারিশত বৎসরাবধি হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার করিতেছে, আকবরসাহ হিন্দুদিগের পরমবন্ধু; হিন্দুদিগের উপর অন্যায় করসমূহ উঠাইয়া দিয়াছেন; হিন্দুদিগের শাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন; হিন্দুরমণী বিবাহ করিয়াছেন; হিন্দুদিগের আচারব্যবহার কোন কোন অংশে অবলম্বন করিয়াছেন ও বঙ্গদেশে জাতিবিদ্বেষ রহিত করিবার জন্য হিন্দুসেনাপতি ও শাসনকর্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন; বিজয়লক্ষ্মী স্বয়ং সে সেনাপতির পত্নী-স্বরূপ, ছায়াস্বরূপ, কখনও তাঁহাকে ত্যাগ করেন না; তিনি দুইবার বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন, এবারও অবশ্য করিবেন; জয় করিলে বিদ্রোহী জমীদারদিগকে শাস্তি দিবেন। কিন্তু এক্ষণে তঁহার সহায়তা করিলে সে ক্ষত্রিয় মহাত্মা কখন সে ঋণ বিস্মৃত হইবেন না—ইত্যাদি নানারূপ প্রলোভন ও ভয় প্রদর্শন করিয়া, সতীশচন্দ্র অনেক জমীদারকে মোগলপক্ষাবলম্বী করিয়াছিলেন। সেই জমীদারগণ এক্ষণে পাঠান সৈন্যদিগকে খাদ্যদ্রব্য পাঠাইবেন না স্বীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং আর পাঁচ সাতদিনের মধ্যে পাঠান সৈন্যের পরাজয়ের আর সংশয় রহিল না।

রাজা সতীশচন্দ্রকে বহু সম্মানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন, ইন্দ্রনাথের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "ইন্দ্রনাথ, আমার কথা সত্য কি না?"

ইন্দ্র। "মহাশয়, আমি অদ্যাবধি আপনাকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া জানিলাম। কিন্তু—

রাজা। "কিন্তু কি?"

ইন্দ্র। "আমি কাহারও বিপক্ষে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু আমার একটী কথা ক্ষমা করিবেন,—সতীশচন্দ্রের সমস্ত কথা আপনি বিশ্বাস করিবেন না।"

রাজা। "তরুণ সেনাপতি কি টোডরমল্লকে রাজনীতি শিক্ষা দিতে চাহেন? কাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে, কাহাকে অবিশ্বাস করিতে হইবে, তাহা ইন্দ্রনাথ কি আমা অপেক্ষা ভাল জানেন?"

ইন্দ্র। "মহারাজ! আমার অপরাধ লইবেন না, কিন্তু হইতে পারে এই সতীশচন্দ্রের সম্বন্ধে আপনি যাহা জানেন, আমি তাহা অপেক্ষা অধিক জানি।"

রাজা। "হইতে পারে ইন্দ্রনাথ যতদূর জানেন, আমিও ততদূর জানি;—হইতে পারে ইন্দ্রনাথের মনে এইক্ষণে কি চিন্তা হইতেছে, তাহাও আমি জানি।"

ইন্দ্রনাথ বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রাজার দিকে চাহিয়া রহিলেন; রাজা পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এই সতীশচন্দ্র রাজা সমরসিংহকে হত্যা করিয়াছে, ইন্দ্রনাথ তাহাই চিন্তা করিতেছেন।"

ইন্দ্রনাথ বিস্ময়ে নিঃসংজ্ঞের ন্যায় হইলেন, বলিলেন, "মহারাজ! ক্ষমা করুন, আপনি অন্তর্যামী।"

রাজা গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "বৎস এরূপ কথা বলিও না, কেবল ভগবানই অন্তর্যামী; কিন্তু দিল্লীশ্বরের সেনাপতি চারিদিকের সন্ধান না রাখিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, কেবল এইমাত্র তোমাকে দেখাইলাম।"

ইন্দ্রনাথ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। রাজা আবার বলিতে লাগিলেন,—

"এক্ষণে তোমাকে বলি, আমি কেবল সতীশচন্দ্রের কথায় কখন প্রত্যয় করিতাম না, কিন্তু যেরূপ সতীশচন্দ্রকে পাঠাইয়াছিলাম, সেইরূপ আরও দশ জনকে দশ দিকে পাঠাইয়াছিলাম। তাহারা সকলেই ফিরিয়া আসিয়া এই কথাই বলিয়াছে, সুতরাং সন্দেহের স্থল নাই। সেই জন্যই সতীশচন্দ্রের শিবিকা দেখিয়াই তাঁহার কামনা সিদ্ধ হইয়াছে, অগ্রেই বলিতে পারিয়াছিলাম। ইন্দ্রনাথ! আমি ভবিষ্যদ্বক্তাও নহি, অন্তর্যামীও নহি, কিন্তু যুদ্ধব্যবসায়ে আমার কেশ শুক্ল হইয়াছে, ভগবানের ইচ্ছায় যুদ্ধকৌশল কিছু শিখিয়াছি।"

ইন্দ্রনাথ ক্ষণেক মৌনভাবে থাকিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"মহারাজ! আর একটী কথা নিবেদন করি;—আপনি কি তবে রাজা সমরসিংহের হত্যাকারীকে ক্ষমা করিলেন?"

রাজা গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন,—"আমার পুত্রকে হত্যা করিলে হত্যাকারীকে ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু রাজা সমরসিংহের হত্যাকারীকে ক্ষমা করিতে পারি না,—সে অপরাধের মার্জ্জনা নাই। সমরসিংহ! সমরসিংহ! তোমার ন্যায় দুর্দ্দমনীয় বীর আমি জীবনে কখনও দেখি নাই; অথবা বাল্যকালে কেবল একজন দেখিয়াছিলাম। তাঁহারও সমরের ন্যায় বিশাল শরীর, সমরের ন্যায় অসুরবলসম্পন্ন অঙ্গ, সমরের ন্যায় অপ্রতিহত তেজ ছিল। রাঠোর তিলকসিংহকে এ জীবনে আর দেখিব না!" টোডরমল্ল ক্ষণেক মৌন হইয়া রহিলেন।

ইন্দ্র। "তিনিও কি প্রভুর ন্যায় সম্রাটের অধীনে কোনও দেশ শাসন করিতেছেন?"

টোডরমল্লের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল; তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "তিলক আকবরের অধীনতা স্বীকার করেন নাই; আকবরের বিরুদ্ধে চিতোর রক্ষার্থ প্রাণ দিয়াছেন।

নিস্তব্ধে চিন্তা করিতে করিতে টোডরমল্ল শিবিরাভিমুখে যাইলেন; ইন্দ্রনাথ গঙ্গাতীরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

নিশীথ সময়ে সতীশচন্দ্র গঙ্গাতীরে পদচারণ করিতেছেন। আজি তিনি রাজার নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন,—তাঁহার হৃদয় উল্লাসে পরিপূরিত হইয়াছে,—মায়াবিনী আশা তাঁহার কাণে কাণে বলিতেছে, "তুমি এক দিন পাপের দণ্ডের ভয় করিয়াছিলে,—সে পাপ কে জানিতে পারিয়াছে? দণ্ড কোথায়? এখন দিন দিন তোমার সম্মান বৃদ্ধি হউক, পদ বৃদ্ধি হউক।" সূর্য্য অস্তে যাইবার সময় অবধি কুহকিনী আশা তাঁহার কাণে কাণে এই প্রকারে বলিতেছিল,—সেই সূর্য্য পুনরায় উদয় হইবার অগ্রে সতীশচন্দ্র বুঝিলেন, আশা মায়াবিনী, কুহকিনী, মিথ্যাবাদিনী।

অর্দ্ধরাত্রে চন্দ্রালোকে সতীশচন্দ্র একটী ভীষণ আকৃতি দেখিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে সেই আকৃতি ছুরিকা হস্তে সতীশচন্দ্রের দিকে দৌড়াইয়া আসিল। সতীশচন্দ্র চীৎকার শব্দ করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে বৃথা, সেই হত্যাকারী খড়্গহস্তে সতীশচন্দ্রের উপর আসিয়া পড়িল।

হটাৎ বৃক্ষপার্শ্ব হইতে একজন সৈনিক পুরুষ আসিয়া সতীশচন্দ্রের উদ্ধার সাধন করিলেন। দূর হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া আসিলেন,—এক আঘাতে দস্যুকে ভূতলশায়ী করিলেন।

তখন সতীশচন্দ্র শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সেই সৈনিক পুরুষকে আলিঙ্গন করিতে গমন করিলেন। সৈনিক আপন দুই হস্ত বক্ষের উপর স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে পশ্চাদ্গামী হইলেন।

সতীশচন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আপনি আমার মহৎ উপকার করিয়াছেন, এক্ষণে কোপ প্রকাশ করিতেছেন কিজন্য?"

সৈনিক উত্তর করিলেন, "আমি আপনার উপকার করিতে আইসি নাই। দস্যুর প্রাণদণ্ড করা সৈনিকের ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মপালনে আসিয়াছিলাম। সে দস্যু হত হইয়াছে,—আমি বিদায় হইলাম।"

সতীশচন্দ্র অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আপনি কে বলুন,—আপনার উদ্দেশ্য যাহাই হউক, আপনি আমাকে প্রাণদান করিয়াছেন।"

সৈনিক উত্তর করিলেন, "আমি রাজা সমরসিংহের বিধবা ও অনাথা কন্যার বন্ধু! দস্যুহস্ত হইতে আপনার প্রাণরক্ষা করিলাম, কেননা বিচারে আপনার প্রাণদণ্ড হইবে, এই আমার মানস।"

এই বলিয়া ইন্দ্রনাথ বেগে প্রস্থান করিলেন।

সতীশচন্দ্রের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল;—একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন, চারিদিক্ অন্ধকার দেখিলেন, সভয়চিত্তে পাপী অগত্যা নৈশগগনের দিকে চাহিল। হঠাৎ মৃতপ্রায় দস্যু বলিল,—

"সতীশচন্দ্র তোমার মৃত্যু সন্নিকট।"

ভীতচিত্ত পাপী আরও ভীত হইয়া সেইদিকে চাহিলেন,—সে আবার বলিল, "আমি যে আঘাত করিয়াছি, তাহা হইতে আপনার নিস্তার নাই।"

তখন সতীশচন্দ্রের মুখ হইতে কথা বাহির হইল,—বলিলেন, "নরাধম! ভগবান্ আমাকে রক্ষা করিয়াছেন,—তোর আঘাতে সামান্য মাত্র রক্ত পড়িয়াছে।"

দস্যু বলিল, "সেই সামান্য আঘাতে আপনার প্রাণনাশ হইবে,—আমার ছুরিকা বিষাক্ত। প্রভু! আপনি আমাকে কি জানেন না?"

সতীশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ আপনার পুরাতন ভৃত্যকে চিনিলেন, বলিলেন,—"নরাধম! তোকে কে এরূপ প্রভুভক্তি শিখাইয়াছিল?"

ভৃত্য অতি ক্ষীণ ও স্খলিত স্বরে উত্তর করিল, "পা—পা—পাপিষ্ঠ শকুনি।"

সতীশচন্দ্র তখন ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, "আমিও ভাবিয়াছিলাম সেই পামরেরই এই কার্য্য। পৃথিবীতে তাহার মত ভীষণ পাপী আর নাই,—নরকেও নাই। কিন্তু তুই আমার পুরাতন ভৃত্য তুই আমার বধের সঙ্কল্প করিয়াছিলি?"

ভৃত্য আরও ক্ষীণস্বরে উত্তর করিল, "শ—শ—শকুনি অনেক লোভ দেখাইয়াছিল,—লো—লোভে পড়িলে জ্ঞান থাকে না, লোভে পড়িয়া পাপ করিলাম, প্রাণ হারাইলাম—প্র—প্র—প্রভু ক—ক্ষমা।"

আর কথা বাহির হইল না, শরীর হইতে প্রাণ বহির্গত হইল, ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে কাঁপিতে স্থির হইল; নয়ন দুইটী আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। চন্দ্রালোকে সে আকৃতি ভীষণ দেখাইতে লাগিল, বিশেষ সতীশচন্দ্রের হৃদয় যেরূপ ভয়ে ও চিন্তায় প্রপীড়িত হইতেছিল, তিনি সে দর্শন সহ্য করিতে পারিলেন না, মৃতদেহের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভৃত্য! তোর অপেক্ষা জ্ঞানী লোকও লোভে পড়িয়া জ্ঞান হারাইয়াছে,—তোর অপেক্ষা ভীষণ

ভ

পাপ করিয়াছে,—তোর মত প্রাণ হারাইবারও বিলম্ব নাই। পরমেশ্বর তোকে ক্ষমা করুন,—আমার পাপের ক্ষমা নাই।"

প্রাতঃকালে রাজার নিকট সংবাদ আসিল, দেওয়ানজী সতীশচন্দ্র মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। রাজা তৎক্ষণাৎ সতীশচন্দ্রের গৃহে গমন করিলেন, ইন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

তথায় যাইয়া দেখিলেন, সতীশচন্দ্র শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, চারিদিকে চিকিৎসক বসিয়া রহিয়াছে, কিন্তু যে ভীষণ বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে পরিত্রাণ নাই। রাজা এই অদ্ভুত ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, পার্শ্বস্থ অনুচরগণ সবিশেষ অবগত করাইল। তখন সতীশচন্দ্র অতি ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! আমি পাপী, পাপিষ্ঠকে ক্ষমা করুন।"

রাজা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন,—সতীশচন্দ্র পুনরায় বলিলেন, "আমি ভীষণ দোষ করিয়াছি—সে অপরাধ ক্ষমা করুন।"

রাজা তথাপি নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন—সতীশচন্দ্র পুনরায় বলিলেন, "মহারাজ! আমি নরহত্যাকারী মৃতুশয্যায় ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে ক্ষমা করুন।"

সে কাতরস্বর শ্রবণ করিয়া রাজা আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "রাজা সমরসিংহের হত্যাকারীকে আমি কখনও ক্ষমা করিব ভাবি নাই, কিন্তু জগদীশ্বর তোমাকে শাস্তি দিয়াছেন, আমি ক্ষমা করিলাম, তোমার জীবিত থাকিবার আর অধিক কাল নাই, ভগবানের নাম গ্রহণ কর, তিনি দয়ার সাগর, মৃত্যুকালে তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিলে জীবনের পাপ খণ্ডন হয়।"

সতীশচন্দ্র জগতের আদিপুরুষের নাম লইলেন, পাপীর নয়নযুগল হইতে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল। সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে সতীশচন্দ্র আবার রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"মহারাজ! তবে আপনি সমরসিংহের মৃত্যুর কারণ সবিশেষ অবগত আছেন?"

রাজা উত্তর করিলেন, "আছি।"

সতীশচন্দ্র বিস্মিত হইলেন,—আবার নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পর আবার বলিলেন, "মহারাজ! আমার আর একটী নিবেদন আছে। আমি পাপী বটে, কিন্তু জন্মাবধি পাপী ছিলাম না, যৌবনে আমার জীবন পবিত্র ছিল, উচ্চ মতি, উচ্চ আশয়, উচ্চ প্রবৃত্তি

ছিল। লোভে, মহালোভে পড়িয়া সে সকল হারাইয়াছি, জীবন পাপে কলুষিত হইল, আজি প্রাণ হারাইলাম”—

সতীশচন্দ্রের ক্ষীণস্বর অধিকতর ক্ষীণ হইয়া আসিল,—আর কথা নিঃসৃত হইল না। রাজা সস্নেহে ওষ্ঠে দুগ্ধ দিলেন, রসশূন্য ওষ্ঠ পুনরায় সিক্ত হইল। সতীশচন্দ্র পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “আমি পাপী বটে, কিন্তু আমার অপেক্ষাও ঘোরতর ভীষণতর পাপী আছে। মহারাজ! আমার ভৃত্য শকুনিই যথার্থ সমরসিংহকে বধ করিয়াছে,—সেই অদ্য আমাকে বধ করিল,” আবার কণ্ঠরোধ হইল।

ক্রোধে রাজা টোডরমল্লের নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইল। কিন্তু তিনি ক্রোধ সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “চিন্তা নাই, জগদীশ্বর পাপীর দণ্ড দিবেন।”

আবার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সকলে নীরব হইয়া রহিল। সতীশচন্দ্রের আয়ু নিঃশেষিত হইয়া আসিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে সতীশচন্দ্র অধিকতর ক্ষীণ ও কাতরস্বরে বলিলেন, “কন্যা,—স্নে—স্নেহময়ী—ধর্ম্ম-পরায়ণা কন্যা”—সহসা বাক্ রুদ্ধ হইল।

রাজা পুনরায় অঙ্গুলি দ্বারা ওষ্ঠে দুগ্ধ দান করিলেন। ক্ষণেক পর আবার বলিতে লাগিলেন, “হতভাগিনী কন্যা,—তোমার মা—মা—মাতা নাই,”—বলিতে বলিতে পার্শ্বের গৃহ হইতে হৃদয়বিদারক রমণীকণ্ঠজাত ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল, সে ধ্বনি শুনিয়া সতীশচন্দ্রের স্পন্দনহীন নয়নদ্বয় জলে পরিপূর্ণ হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে বিমলা বেগে পিতার নিকটে আসিলেন,—ঘর লোকে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু সে সময়ে সে জ্ঞান কোন্ রমণীর থাকে?

ইন্দ্রনাথ পূর্ব্বপরিচিত ভিখারিণীকে সতীশচন্দ্রের কন্যা বিমলা বলিয়া জানিতেন না—আজি তাহা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন।

সতীশচন্দ্র কন্যাকে দেখিয়া বলিলেন, “আলিঙ্গন।—তোমাকে পরমেশ্বর”—আর কথা সরিল না।

বিমলা পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার পদবন্দনা করিলেন। বোধ হইল যেন সেই পবিত্র আলিঙ্গনে সতীশচন্দ্রের হৃদয় উদ্বেগশূন্য হইল, মুখমণ্ডল শান্তিভাব ধারণ করিল, নয়ন দুইটী চিরনিদ্রায় মুদ্রিত হইল।

তখন বিমলা বার বার সেই মৃতদেহকে আলিঙ্গন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আজ বিমলার নয়নের আলোক নির্ব্বাণ হইল, আজি চারিদিক্ অন্ধকার হইল, আজি হৃদয় বিদীর্ণ হইল, আজি জগৎ শূন্য হইল।

সে দর্শন দৃষ্টি করিয়া রাজা নয়নদ্বয় আবরণ করিয়া বেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, ইন্দ্রনাথ খড়্গের উপর ভর দিয়া বালিকার ন্যায় অবারিত নয়নধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

* * * * * *

ইতিহাসে লিখিত আছে যে, বঙ্গদেশের জমীদারগণ রাজা টোডরমল্লের দলভুক্ত হইয়া বিদ্রোহীদিগকে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ বন্ধ করিলেন। তজ্জন্য ও অন্যান্য কারণবশতঃ বিদ্রোহী সৈন্য অবশেষে মুঙ্গের পরিত্যাগ করিয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। বিদ্রোহী সেনাপতির মধ্যে আরববাহাদুর পাটনা হস্তগত করিবার মানসে সহসা তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজা টোডরমল্ল তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সেই নগর রক্ষার্থ পূর্ব্বেই তথায় কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, সুতরাং আরববাহাদুর বিফলমানস হইলেন। মাসুমী কাবুলী নামক পাঠান বীর বিহারদেশ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু টোডরমল্ল স্বয়ং সাদীকখাঁর সহিত যাইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত কবিলেন, মাসুমী মোগলের অধীনতা স্বীকার না করিয়া বরং উড়িষ্যা দেশের রাজার নিকট শরণাপন্ন হইলেন। রাজা টোডরমল্ল অল্প দিনের মধ্যে দিল্লীর সম্রাটকে লিখেলেন যে, সমগ্র বিহার দেশ জয় হইয়াছে।

ইন্দ্রনাথ এ সকল যুদ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন না। সরলার বিষয় যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বিলম্বের আর সময় ছিল না। যেদিন মুঙ্গেরের সম্মুখে শত্রুর শিবির ভঙ্গ হইল, সেই দিনই তিনি রাজা টোডর-মল্লের নিকট বিদায় লইতে গেলেন। সে প্রার্থনা করাতে রাজা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। বলিলেন,—

"সে কি ইন্দ্রনাথ! কি হইয়াছে?"

ইন্দ্র। "মহারাজ! যুদ্ধকার্য্য সমাধা করিয়া আমাদের পৈতৃক ভদ্রাসনে পদধূলি দিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।"

রাজা। "যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলাম তাহা করিব, তাহার জন্য ব্যাকুল হইতেছ কেন?"

ইন্দ্র। "মহারাজ, যদি আজ্ঞা করেন তবে আমি অগ্রে যাই।"

রাজা। "আমাদের এক্ষণও যুদ্ধ সমাধা হয় নাই, আমার ইচ্ছা ছিল তোমাকে আমার সঙ্গে লইয়া তোমার পিত্রালয়ে যাইব, কিন্তু যদি তোমার বিশেষ আবশ্যক থাকে, অগ্রে যাইতে পার।"

ইন্দ্র। "মহারাজের নিকট আমার আর একটী ভিক্ষা আছে।"

রাজা। "নিবেদন কর, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই।"

ইন্দ্র। "আপনি শকুনিকে ধরিবার জন্য চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে লোক পাঠাইতেছেন,—আদেশ করুন আমি সে কার্য্য সম্পাদন করিব।"

রাজা। "কেন, ইন্দ্রনাথ কি আমাদের অন্য সৈন্যের উপর প্রত্যয় করেন না?"

ইন্দ্র। "মহারাজ! সে জন্য নহে, অন্য কারণ আছে," বলিয়া ইন্দ্রনাথ লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন।

রাজা। "আমাদের কোন কথাই আমরা ইন্দ্রনাথের নিকট গোপন রাখি না, ইন্দ্রনাথের কি আমাদিগের নিকট গোপন রাখিবার কোন কথা আছে?"

ইন্দ্রনাথ অধিকতর লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "মুঙ্গের আসিবার সময় এক জনের নিকট পূর্ণিমা তিথিতে বিদায় লইয়া আসিয়াছিলাম,—প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সপ্তম পূর্ণিমার মধ্যে পুনরায় দেখা করিব। তিনি এক্ষণে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে আছেন, সেই জন্য আমার এই ভিক্ষা।"

রাজা। "কাহার নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ আছ, যে তাঁহার কার্য্যের জন্য এরূপ ব্যাকুল হইতেছ?"

ইন্দ্রনাথ অধিকতর লজ্জিত হইয়া অধোবদনে রহিলেন। রাজা সহাস্য-বদনে বলিলেন—"আচ্ছা যাও, কিন্তু আমরা আকবরসাহকে পত্র লিখিব, যে একজন নবীন সেনাপতি বিদ্রোহী হইয়াছেন—দিল্লীশ্বরের কার্য্য পরি-ত্যাগ করিয়া আপন হৃদয়েশ্বরীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।"

ইন্দ্রনাথ সম্মতি পাইয়া সেইদিনই মুঙ্গের ত্যাগ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু নাবিকের নৌকায় উঠিলেন। ইন্দ্রনাথের অনুরোধে, অনাথা নিরাশ্রয়া বিমলাও অপর একটী নৌকায় উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

বিমলা এক্ষণে আর পূর্ব্বমত নাই। তাঁহার বদনমণ্ডল রক্তশূন্য ও পাণ্ডু-বর্ণ হইয়াছিল, চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট, অথচ নয়নের তারা অনৈসর্গিক উজ্জ্বল-তায় ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। তাঁহার কথার স্বর শুনিয়া ইন্দ্রনাথ চমকিত হইলেন, শ্মশানের নৈশবায়ুর ন্যায় ভীষণ ও নৈরাশ-প্রকাশক! আজি বিমলার হৃদয়ের আশা ভরসা সকলই দগ্ধ হইয়াছে,—ইন্দ্রনাথের প্রতি যে অনুরাগ ছিল, তাহাও সেই ঘোর সন্তাপাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিল, হৃদয় প্রকৃত দগ্ধ শ্মশান হইয়াছে। এ অনন্ত জগতে কত অভাগিনীর মায়ার সমস্ত বস্তুই একে একে কালগ্রাসে পতিত হয়,—কত অভাগিনীর হৃদয় শূন্য শ্মশানের ন্যায় হয়, তাহা কে বলিবে?

একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

সপ্তম পূর্ণিমা।

If after every tempest come such calms,
May the winds blow till they have
wakened death.
Shakespeare.

আজি পূর্ণিমা তিথি, কিন্তু আকাশ দেখিলে কে বলিবে আজি পূর্ণিমা? গভীর ধূম্রবর্ণ মেঘরাশিতে আকাশ অদ্য আচ্ছন্ন রহিয়াছে, জগৎ ভীষণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ-লতার ভীষণ আলোকে সেই অন্ধকার মুহূর্ত্তের জন্য উদ্দীপ্ত হইতেছে। আবার পূর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতর অন্ধকার হইতেছে। আশার ক্ষণস্থায়ি জ্যোতি লীন হইলে, হতভাগ্যের পক্ষে সংসার যেরূপ পূর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতর তিমিরাচ্ছন্ন বোধ হয়, বিদ্যুৎ-আলোকের পর জগৎ সেইরূপ অধিকতর ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখাইতেছিল। মুষলধারা বৃষ্টিতে ক্ষেত্র, গ্রাম, পথ, ঘাট সকল ভাসিয়া যাইতেছিল, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যেন সেই বৃষ্টি বৃদ্ধি পাইতেছে বোধ হইতেছিল। বায়ু রহিয়া রহিয়া অতিশয় ভীষণ শব্দে প্রবাহিত হইতেছিল, নদীতে কোন কোন নৌকা, ছিন্নবন্ধন হইয়া মগ্ন হইতেছিল, কোন কোন থান বা ঘূর্ণিত হইতেছিল, বৃক্ষের শাখা, ঘরের চাল ভীষণবেগে উড়িয়া যাইতেছিল। সেই বায়ুর শব্দের মধ্যে মধ্যে ভীষণতর মেঘের অনেকক্ষণস্থায়ী গর্জ্জন জগৎসংসার ত্রস্ত ও কম্পিত করিতেছিল।

এরূপ ভীষণ বাত্যায় সরলা একাকী চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের অন্ধকারাচ্ছন্ন উদ্যানের মধ্যস্থ একটী জনশূন্য কুটীরাভ্যন্তরে বসিয়া আছে, কিজন্য? বালিকার হৃদয়ে কি ভয় নাই, এই অন্ধকারে এই ভয়াবহ মেঘগর্জ্জনে বালিকার হৃদয়ে কি শঙ্কা হইতেছে না?

না, অদ্য সরলার চিত্তে আর ভয় নাই, অদ্য সরলা কাহাকেও ভয় করে না। সুখের আশা, জীবনের আশা অদ্য শেষ হইয়াছিল, যাহার আশা নাই, তাহার ভয় কিসের? আকাশে যে ভীষণ বিদ্যুৎ ক্ষণে ক্ষণে নয়ন ঝলসিতেছিল, সরলা স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে অবলোকন করিতেছিল। তাহার পর যে ভয়ানক মেঘগর্জ্জন হইতেছিল, সরলা স্থিরচিত্তে তাহাও শ্রবণ করিতেছিল। ভয়শীলা, বিহ্বলা বালিকা অদ্য ভয়শূন্যা হইয়াছে, কেননা

জীবনে আর তাহার আশা ভরসা নাই। আজি সপ্তম পূর্ণিমা, ইন্দ্রনাথ অদ্যও আসিলেন না, সরলার জীবনের আশা অদ্য ফুরাইল।

একবার বাল্যাবস্থার কথা মনে আসিল। মহামান্য সমরসিংহের একমাত্র দুহিতা এই প্রশস্ত দুর্গে এই বিস্তীর্ণ উদ্যানে বেড়াইত, পিতার ক্রোড়ে উঠিয়া শাখা হইতে ফুল পাড়িত, মাতার ক্রোড়ে উঠিয়া এক দিন একটা পাখী ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল। পাখী উড়িয়া গেল, নির্ব্বোধ শিশু কাঁদিল, নির্ব্বোধ শিশু জানিত না যে, জীবনের আশা ভরসা সকলই সেই পাখীর মত একে একে উড়িয়া যাইবে।

তাহার পর ছয় বৎসর কাল রুদ্রপুরে অতিবাহিত হইয়াছে। দরিদ্র পল্লীগ্রামে দরিদ্র কুটীরে সেই ছয় বৎসর কাটিয়াছে—কিন্তু ধন হইলেই সুখ হয় না, দরিদ্রতা হইলেই দুঃখ হয় না। সরলার অন্তঃকরণে সেই ছয় বৎসর পরম সুখের কাল বলিয়া বোধ হইল। প্রাণের সখী অমলা! তাহাকে কি আর দেখিতে পাইবে! প্রাতঃকালে সেই অমলার সহিত প্রত্যহ ঘাটে জল আনিতে যাইত, সন্ধ্যার সময় সেই অমলার সহিত অনন্ত উপকথা, অনন্ত প্রণয়ের কথা হইত। সুখের সময় সেই অমলা নিকটে থাকিলে সুখ দ্বিগুণ হইত, দুঃখের সময় অমলার প্রবোধবাক্যে দুঃখ শান্তি হইত। আজি সে অমলা কোথায়? পাখীর মত উড়িয়া গিয়াছে!

আর সেই ইন্দ্রনাথ! যাহার চিন্তায় আজি ছয় মাস সরলার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, যাহার আশায় আজি ছয় মাস সরলা জীবনধারণ করিয়া রহিয়াছে, সে হৃদয়ের ইন্দ্রনাথ কোথায়? বাল্যকালে ইচ্ছামতীতীরে যাহার ক্রোড়ে বসিয়া বালিকা গল্প শুনিত, গল্প শুনিত আর একদৃষ্টে সেই মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত; যৌবনের প্রারম্ভে যে প্রেমময় মুখখানির কথা সদাই ভাবিত, ভাবিত আবার রহিয়া রহিয়া সেই মুখখানি দেখিয়া হৃদয় শীতল করিত, সে ইন্দ্রনাথ কোথায়? রুদ্রপুরের কুটীর পার্শ্বে চন্দ্রালোকে যে ইন্দ্রনাথ বিদায় লইয়াছিলেন, সেই অবধি যে ইন্দ্রনাথের চিন্তা দিবারাত্রি সরলার হৃদয়ে জাগরিত রহিয়াছে, সে ইন্দ্রনাথ কোথায়? হায়! তিনিও পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া গিয়াছিলেন, অনন্ত সংসারাকাশে বিচরণ করিতেছেন!

সরলা ভাবিয়া ভাবিয়া হতজ্ঞান হইল। মাথা ঘুরিতে লাগিল, কিন্তু চক্ষুতে জল নাই। বালিকার হৃদয়ে আজি যে যাতনা কে জানিবে? যতদিন জীবনে একটী আশা থাকে, ততদিন জীবন সহনীয় হয়, কিন্তু সরলার পক্ষে এক একটী করিয়া সকল আশাই তিরোহিত হইয়াছিল। পৃথিবী

শূন্য হইয়াছিল, সংসার তমোময় হইয়াছিল। এক একটী করিয়া নাট্যশালার দীপ নির্ব্বাণ হইল, সরলা ধীরে ধীরে সেই নাট্যশালা হইতে বিদায় হইবার উদ্যোগ করিল।

"আজি হৃদয়েশ্বরের আসিবার শেষ দিন, আজি তিনি আসিলেন না কেন? তিনি কি হতভাগিনীকে ভুলিয়া গিয়াছেন? তিনি কি জীবিত আছেন? ভগবান্ তুমিই জান, তোমার অচিন্তনীয় মানস কে বুঝিতে পারে? তোমার যাহা মনে লয় কর। ইন্দ্রনাথ! তোমার নিকট ইহজন্মে বিদায় লইলাম, তুমি যদি আমাকে ভুলিয়া থাক, হতভাগিনী তোমাকে ভুলে নাই, হতভাগিনী মৃত্যুর সময় তোমার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মরিবে,—তোমার কথা ভাবিতে ভাবিতে মরিবে, তোমার দেবমূর্ত্তি জ্ঞানচক্ষুতে দেখিতে দেখিতে মরিবে। আর তুমি যদি জীবিত থাক, যে অভাগিনী তোমার জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে, একবার তাহার কথা ভাবিও,—যে ভিখারিণী বিপদে, দুঃখে, দারিদ্র্যে মুহূর্ত্তমাত্র তোমার নাম, তোমার চিন্তা বিস্মৃত হয় নাই, একবার তাহার কথা মনে স্থান দিও। আমার আর ভিক্ষা নাই,—পরমেশ্বর তোমাকে ধন দিবেন, মান দিবেন, ক্ষমতা দিবেন, লক্ষ্মীর মত পত্নী দিবেন; কিন্তু ইন্দ্রনাথ! সরলার মত তোমাকে কেহ ভাল বাসিতে পারিবে না। দুঃখিনীর ধন! ভিখারিণীর রত্ন! জীবনের বায়ু! নয়নের মণি! পরমেশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন, আর আমার কিছু প্রার্থনীয় নাই!" সরলার কষ্ট হইল, অজস্র বিগলিত অশ্রুধারায় শুষ্ক বদনমণ্ডল প্লাবিত হইল।

এক্ষণও প্রবল বেগে ঝড় বৃষ্টি হইতেছে, তাহার মধ্যে সরলার বোধ হইল যেন এক অপরূপ ঝন্ঝনা শব্দ হইল। সরলা ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া চারিদিকে দেখিল, কিন্তু সে নিবিড় অন্ধকারে কিছুমাত্র দেখিতে পাইল না। অন্য দিন হইলে সরলা ভীত হইত, কিন্তু আজি বালিকার হৃদয়ে ভয় ছিল না,—হতভাগিনীর আর কি হইতে পারে? যাহা হইবার হউক!

এমত সময়ে উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-আলোক দেখা দিল। সে আলোকে সরলা সম্মুখে কি দেখিতে পাইল? হরি হরি! একি ইন্দ্রনাথ!

চারিচক্ষুর মিলন হইল, মুহূর্ত্তমধ্যে পরস্পর পরস্পরের আলিঙ্গনে বদ্ধ হইল।

অনেকক্ষণ দুইজনই বাক্শূন্য হইয়া নীরবে রহিলেন, সে সময়ে তাঁহাদের হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হইতেছিল, তাহা আমরা বর্ণনা করিতে অক্ষম,

যাঁহারা পারেন অনুমান করুন। তাঁহারা স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল বিস্মৃত হইলেন; জগৎসংসার বিস্মৃত হইলেন; বৃষ্টি, বায়ু, মেঘগর্জ্জন বিস্মৃত হইলেন; চিন্তা, দুঃখ, বিপদ্ বিস্মৃত হইলেন; স্থান, কাল, বিস্মৃত হইলেন। কেবলমাত্র পরস্পরের আলিঙ্গনসুখ ভিন্ন তাঁহাদের পক্ষে জগৎসংসারে যেন আর কিছুই নাই!

ইন্দ্রনাথ সরলার অশ্রুপ্লাবিত কপোলদ্বয় পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন, ললাট ও ওষ্ঠদ্বয় পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। সরলা প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া বৃক্ষোপরি বল্লরীর ন্যায় ইন্দ্রনাথের শরীরের উপর গলিয়া পড়িল।

তাঁহাদিগের সুখ বর্ণনাতীত। এ জগতে সেরূপ সুখের মুহূর্ত্ত অতি বিরল,—সেরূপ অসীম আনন্দ যাহার জীবনে একবার ঘটে সেই ভাগ্যবান, অধিকবার কাহারও ঘটে না।

অনেকক্ষণ পর ইন্দ্রনাথ বলিলেন, "সরলা তোমার জন্য আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি।"

সরলা উত্তর করিতে পারিল না, জলে নয়ন ভাসিয়া গেল। সে অশ্রুপরিপূর্ণ লোচন চুম্বন করিয়া ইন্দ্রনাথ আবার বলিলেন, "সরলা তুমি আমার জন্য ভাবিতে?"

এ কথায় সরলা কি উত্তর দিবে? মনে মনে ভাবিল, "ভাবিতাম কি না ভগবান্ জানেন।" প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারিল না। আবার নয়নজলে বদনমণ্ডল ভাসিয়া গেল।

কাহার অধিক কথা নাই, কিন্তু তাঁহাদিগের মনের কি ভাব, পরস্পরের প্রতি সেই অবারিত আনন্দাশ্রুর বিন্দুতে তাহা প্রকাশ পাইতেছিল।

আবার অনেকক্ষণ উভয়ে নীরবে রহিলেন। পরে ইন্দ্রনাথ পুনরায় বলিলেন, "সরলা, এ ছয়মাস তোমাকে না দেখিয়া যে আমার কিরূপে কাটিয়াছে, স্মরণ করিলে হৃৎকম্প হয়। যুদ্ধের সময়, বিশ্রামের সময়, কার্য্যের সময়, নিদ্রার সময়, তোমার নির্ম্মল মুখচন্দ্রিমা আমার হৃদয়দর্পণে প্রতিবিম্বিত থাকিত।"

সরলা উত্তর করিল,—"ইন্দ্রনাথ"——————

কথা আপনা হইতেই রুদ্ধ হইল, ছয় মাসের পর ইন্দ্রনাথের নিকট তাহার এই প্রথম কথা, একটী কথা কহিতেই লজ্জায় কণ্ঠ রুদ্ধ হইল! মুখে কথা আসিয়াছে, ওষ্ঠ কম্পিত হইতেছে, কিন্তু কথা বাহির হইতেছে না, লজ্জায় অধোবদন হইল।

সে অমৃতবর্ষী পূর্ব্বপরিচিত স্বর শুনিয়া ইন্দ্রনাথের হৃদয়কন্দর পর্য্যন্ত বিলোড়িত ও কম্পিত হইল। সে অপরিস্ফুট "ইন্দ্রনাথ" কথাটী ছয় মাস পরে শুনিয়া ইন্দ্রনাথের নয়নে আনন্দাশ্রু আসিল। ধীরে সরলার বদনখানি তুলিয়া গাঢ় চুম্বনে সেই কম্পিত ওষ্ঠ একেবারে রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

সে সুখের রাত্রিতে কেহ নিদ্রা যায় নাই। সমস্ত রাত্রি সেই গৃহে বসিয়া দুইজনে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সরলা কত দুঃখের কথা কহিল,—আশায় হতাশ, ভরসায় নৈরাশ, চিন্তায় দুঃখ এই সকল কথা কহিতে লাগিল। সে কাহিনী কি শেষ হয়,—জগতের মধ্যে যাহাকে হৃদয়ের স্পর্শমণি বলিয়া গণ্য করি, তাহার নিকট যখন মনের কবাট খুলিয়া মনের কথা বলিতে আরম্ভ করি, সে কথার কি শেষ আছে? ইন্দ্রনাথও সেই অনন্ত কথা শুনিতে লাগিলেন, সরলার সেই সরল মুখখানির দিকে চাহিতে লাগিলেন,—চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইল না।

প্রাতঃকালে ইন্দ্রনাথ আপন নৌকা হইতে কয়েক জন সৈনিক পুরুষকে ডাকাইলেন। পরে রাজা টোডরমল্লের আজ্ঞানুসারে শকুনিকে বন্দী করিয়া লইয়া ইচ্ছাপুরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। মহাশ্বেতা, সরলা ও বিমলা এক নৌকায় যাত্রা করিলেন। সেই দিন সন্ধ্যার সময় ইচ্ছাপুরে পহুছিলেন। ইন্দ্রনাথ পিতার চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার চিন্তা দূর করিলেন।

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

পুনর্ম্মিলন।

When wild war's deadly blast was blown,
 And gentle peace returning
With many a sweet babe fatherless,
 And many a widow mourning,
I left the lines and tented field,
 Where long I'd been a lodger.

Burns.

বহুকালের পর পরস্পরের সহিত পরস্পরের মিলনে যে কি অপর্য্যাপ্ত সুখলাভ করিলেন, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। নগেন্দ্রনাথ বহুকাল পরে পুত্রকে পাইয়া অপার আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। পুত্রকে বার বার আলিঙ্গন করিয়া সহস্র আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

বনাশ্রম হইতে চন্দ্রশেখর আপন কন্যাকে সঙ্গে করিয়া ইচ্ছাপুরে আসিলেন। রুদ্রপুর হইতে অমলা বৃদ্ধ স্বামীকে সঙ্গে করিয়া আনিল। রাজা টোডরমল্ল আসিবেন শুনিয়া সকলেই সকল দিক্‌ হইতে ইচ্ছাপুরে আসিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ যে জমীদার নগেন্দ্রনাথের পুত্র তাহা সকলেই জানিতে পারিল। সরলা একদিন গোপনে সুরেন্দ্রনাথকে কহিল, " আমি তোমাকে দরিদ্র ব্রাহ্মণপুত্র বলিয়া ভাল বাসিতাম, জমীদারপুত্র জানিলে ভয়ে কথা কহিতাম না।"

ইন্দ্রনাথ সহাস্যবদনে উত্তর করিলেন, " দোহাই ধর্ম্ম! সেজন্য এখন যেন পুরাতন ভালবাসা ভুলিও না।"

সরলা বলিল, " পারিব কেন?" বলিয়াই বেগে পলায়ন করিল।

অমলা অধিকতর লজ্জিত হইল! রুদ্রপুরে ইন্দ্রনাথকে সামান্য ব্রাহ্মণ-পুত্র বলিয়া কত তামাসা কবিত, এক্ষণে তাঁহাকে জমীদারপুত্র জানিয়া লজ্জায় কথা কহিতে পারিল না, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ অল্পে ছাড়িবার লোক নহেন। একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া নবীনদাসের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। অমলা তাঁহাকে দেখিয়া দেড়হাত ঘোম্‌টা টানিল।

ইন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, " বটে, এই বুঝি পুরাতন ভাল-বাসা?"

অমলা লজ্জিত হইল, অথচ তামাসা ছাড়িল না, অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে বলিল,—

" আপনি পরের বাড়ীর ভিতর গিয়া এইরূপ মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করেন, আমি সবলাকে বলিয়া দিব।"

ইন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, " অমলা তুমি আমাকে পর মনে কর,—আমি তোমাকে পর মনে করি না।"

অমলা এবার অপ্রতিভ হইল। অবগুণ্ঠন তুলিয়া বলিল, " ইন্দ্র—— সুরেন্দ্রনাথ আমায় ক্ষমা কর, আর আমি তোমার নিকট লজ্জা করিব না।"

সেই অবধি অমলার লজ্জা ভঙ্গ হইল।

মহাশ্বেতা যে রাজা সমরসিংহের বিধবা, তাহা জানিয়া লোকে অধিকতর বিস্মিত হইল। এখন আর মহাশ্বেতা দরিদ্রা নহেন, রাজা টোডরমল্লের আজ্ঞানুসারে সমরসিংহের বিস্তীর্ণ অধিকার তাঁহার বিধবা প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন, সুতরাং এক্ষণে মহাশ্বেতা আপন কন্যার সহিত সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ দিতে অসম্মত ছিলেন না।

একদিন অমলা আসিয়া সরলাকে বলিল, "সই, এখন তোমরা বড় মানুষ হইলে, এবার আমাদের ভুলিয়া যাইবে।"

সরলার চক্ষুতে জল আসিল, বলিল, "সই জীবন থাকিতে আমি তোমাকে ভুলিতে পারিব না।"

অমলা সরলার চক্ষুর জল মুছাইয়া দিয়া বলিল, "ছি সই, তামাসা বুঝ না, আমি তোমাকে কেবল তামাসা করিয়াছিলাম, তাহাতেই চক্ষুতে জল? তুমি আমাকে কখনও ভুলিবে না তাহা জানি,—কিন্তু পৃথিবীতে কয়জন আছে যে বড়লোক হইলে আপন পুরাতন বন্ধুদিগকে ভুলে না? সকল স্ত্রীলোক যদি সরলার মত হইত, আর সকল পুরুষ যদি সুরেন্দ্রনাথের মত হইত, তাহা হইলে সংসার স্বর্গ হইত।"

সকলের সুখ দেখিয়া বিমলাও আপনার দুঃখ কিয়দংশ বিস্মৃত হইলেন। সরলার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহ হইয়াছিল, সেই সরলা আজি বিস্তীর্ণ জমীদারির উত্তরাধিকারিণী, পাপাত্মা শকুনি এক্ষণে বন্দী, এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া আপন মনের ক্লেশ কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

চিন্তাশীলা কমলাও তাঁহাদিগের সহিত থাকিতেন, কিন্তু পূর্ব্বের মত সততই চিন্তায় অভিভূতা। যখন কথা কহিতেন তাঁহার সারগর্ভ কথা শুনিয়া সকলেই চরিতার্থ হইতেন, সকলেই একাগ্রচিত্তে আরও শুনিতে চাহিতেন। এইরূপে চারিজন বয়স্যা সুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

পাঠক মহাশয়! আমাদের উপন্যাস প্রায় শেষ হইল। আপনি যদি আমাদের উপর সন্তুষ্ট না হইয়া থাকেন, তবে আইসুন এইস্থানেই বিদায় লই, আর যদি আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়া থাকি, তবে আপনার একটী মনের কথা বলুন দেখি; এই কথাটী কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিব, আপনি কাণে কাণে উত্তর করিবেন, অপর লোকে যেন কেহ টের পায় না। বলুন দেখি, এই চারিটী সমবয়স্যার মধ্যে কোন্‌টীকে আপনার মনে ধরে?

সৌন্দর্য্যে বিমলা সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই উজ্জ্বল রূপরাশি দেখিয়া বোধ হয়, কোন কোন পাঠক তাঁহাকেই মনোনীত করিবেন। বিশেষ বিমলা তেজস্বিনী, উন্নতচরিত্রা, ধর্ম্মপরায়ণা, বীরপুরুষের যোগ্যা বীরাঙ্গণা। কিন্তু না! অনেকেই বোধ হয় তাঁহাতে নারাজ অনেকেই বলিবেন, "বীরাঙ্গণায় আমাদের কাজ নাই, রূপে কাজ নাই, তেজে কাজ নাই, একেই গৃহিনীর মুখঝামটায় প্রাণ অস্থির, তার উপর তেজ! শেষকালে প্রাণ লইয়া টানাটানি হইবে! বাবা! ও মেয়েকে রেখে দাও, বরং আর কাহাকেও দাও।"

পাঠক মহাশয়, কমলাকে লইতে সম্মত আছেন? কমলা সুন্দরী, শান্ত, চিন্তাশীলা। গ্রীষ্মের দিন গত হইলে শীতল সায়ংকাল যেরূপ শান্ত, নিস্তব্ধ, সুখপ্রদায়িচিন্তা-উত্তেজক, কমলা সেইরূপ শান্ত, গম্ভীর, সুখদায়িনী, চিন্তাশীলা। হৃদয়ে কোন উৎপাত নাই, নয়ন দুইটী প্রশস্ত, শান্ত ও নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ, কেশরাশিও নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ,, অধিক সময়েই আলুলায়িত হইয়া পৃষ্ঠে লম্বিত হইয়া থাকে, বদনমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়া থাকে। সমস্ত অবয়বে শান্তভাব লক্ষিত হইতেছে। বোধ হয় এরূপ নায়িকা পাইলে অনেকেরই মনে ধরিবে। কিন্তু কোন কোন পাঠক বলিবেন, "না, অত চিন্তা করিলে চলে না। বাঙ্গালীর মেয়ে, ঘরের কায করিতে হইবে, অত চিন্তা করিলে হবে কেন? খোলায় মাছ দিয়া উনি যে চিন্তা করিতে বসিবেন, আর আমাকে যে প্রত্যহ চোঁয়া মাছ খেতে হবে, তা পারিব না। চন্দ্রশেখর যোগীপুরুষ, ওঁর খাওয়ায় ভাল মন্দ আইসে যায় না, কিন্তু আমার ভাল খাওয়া টুকু না হইলে চলে না। চিন্তাশীলায় আমার কায নাই, অন্য এক জনকে দেখ।"

সরলচিত্তা প্রেমবিহ্বলা সরলাকে বোধ হয় অনেক পাঠকেরই মনে ধরিবে। আমাদের ত ইচ্ছা মনে ধরে, কিন্তু পাঠক মহাশয় তাহাতে সম্মত হয়েন কই। কোন কোন পাঠক বলিবেন, "না বাপু, ও প্যান্‌পেনে ভ্যান্‌ভেনে মেযেকে আমার কায নাই। উপন্যাসে পড়িতে ভাল, কিন্তু কাযের সময় কিছু নয়। একটু বুদ্ধি শুদ্ধি থাকে, একটু চালাক চতুর হয়, দুই একটা ঠাট্টা তামাসা করিবে, দুই একবার মুখনাড়া দিবে, তবে বাড়ীর গৃহিণী বলিয়া বোধ হয়। তা নয় এ কোথাকার বোবা মেয়ে, কথাবার্ত্তা জানে না, ওকে আমার কায নাই।"

চঞ্চলহৃদয়া, প্রখরনয়না, চতুরা, রূপলাবণ্যসম্পন্না অমলাকে বোধ হয় অনেক পাঠক মহাশয়েরই মনে ধরিবে। তবে কৈবর্ত্তের মেয়ে বলিয়া যদি কেহ কেহ ঘৃণা করেন, আর——বৃদ্ধস্বামী বর্ত্তমান! বিধবা হইলেও বরং বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ডাকাইয়া কোন রকম চেষ্টা দেখা যাইত। কিন্তু বুড় এখনও মরে নাই।

তবে হইল না, পাঠক মহাশয়! আপনার কপালে নাই! আমাদের দোষ নাই। অন্য উপন্যাসে একটী করিয়া নায়িকা থাকা রীতি, আমরা আপনার মনোরঞ্জনার্থ চার চারিটী নায়িকা আনাইয়াছিলাম। তাহাতেও যদি মন না উঠে, তবে আর আমাদের দোষ কোথায়। "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধ্যতি কোঽত্র দোষঃ?"

ত্রয়স্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

অপরূপ পুনর্ম্মিলন।

She gazed—she reddened like a rose,
Sine pale like ony lily ;
She sank within my arms and cried,
"Art thou my ain dear Willie ?"
"By Him who made you, sun and sky,
By whom true love's regarded ;
I am the man ; and thus may still
True lovers be rewarded"

Burns.

সন্ধ্যাকাল আগত। কমলা একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে ইচ্ছাপুর হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িলেন। একাকী যমুনার তীরে বসিয়া স্বভাবের নিস্তব্ধ ভাব অবলোকন করিতেছিলেন, ঘন বৃক্ষাবলির মধ্যে পুঞ্জ পুঞ্জ খদ্যোৎমালা খেলা করিতেছে, তাহাই দেখিতেছিলেন। নীল আকাশে দুই একটী শুভ্র মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে, তাহাই দেখিতেছিলেন। শান্ত নদীর উপর একখানি মাত্র ক্ষুদ্র তরী ভাসিতেছে তাহাই দেখিতেছিলেন। নদীজলে দুই একটী তারা প্রতিফলিত হইয়া কম্পিত হইতেছে, দূরস্থ গ্রামের মধ্য হইতে দুই একটী প্রদীপ দেখা যাইতেছে।

কমলা সততই চিন্তাশীলা, কিন্তু অদ্য বোধ হইতেছে, যেন কোন বিশেষ চিন্তায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন। সেই নদীতীরে বসিয়া শান্ত নয়ন দুইটী ফিরাইয়া আকাশের দিকে একদৃষ্টিতে দেখিতেছেন। তারার শান্ত জ্যোতি সেই শান্ত নয়ন ও মুখমণ্ডলের উপর পড়িতেছে। আলুলায়িত কেশ পৃষ্ঠদেশে লম্বিত রহিয়াছে, বা বদনমণ্ডল ঈষৎ আবৃত করিয়া উন্নত বক্ষঃস্থলের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। বাহুর উপর বদনমণ্ডল স্থাপিত রহিয়াছে। আজি এই গম্ভীরভাবে কমলা কি চিন্তা করিতেছেন?

কমলা আজি পূর্ব্বকালের কথা স্মরণ করিতেছেন। স্বামীর মৃত্যুর কথা তাঁহার স্মরণ নাই, কিন্তু তাহার পর পীড়ার সময় যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, কমলা তাহাই স্মরণ করিতেছেন। স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যেন গভীর নীল আকাশে একখানি শুভ্র মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে;—চাহিয়া দেখিলেন, অদ্য যথার্থই সেইরূপ গভীর নীল আকাশে সেইরূপ একখানি শুভ্র মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে। আরও স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, সেই মেঘের

উপর কোন দেবপুরুষ একখানি ক্ষেপণী হস্তে করিয়া অনন্ত আকাশে সেই মেঘখানি চালনা করিতেছেন। চাহিয়া দেখিলেন, মেঘের উপর কোন দেবপুরুষ নাই, কিন্তু নদীর উপর সেইরূপ দেবাকৃতি একজন মনুষ্য এক-খানি তরী চালন করিতেছে। স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, সেই দেবপুরুষের স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত, বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সেই নৌকাচালক নাবিকের স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত লম্বিত রহিয়াছে। পাঠক মহাশয়কে বলা বাহুল্য যে, সে পূর্ব্বপরিচিত মুঙ্গেরের নাবিক।

কমলা বার বার সেই দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয়ে সহস্র চিন্তা জাগরিত হইতে লাগিল। "এ নাবিক কে? জাতিতে ব্রাহ্মণ! ব্যবসায়ে নাবিক! আর আমি যে দেবপুরুষকে স্বপ্নে দেখিয়া-ছিলাম, আকৃতি অবয়ব সেইরূপ! সেইরূপে দাঁড় ধরিয়াছে, সেইরূপ গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতেছে! ইনি কি সেই দেবপুরুষ অবতীর্ণ হইয়া-ছেন?"

সহসা চন্দ্রোদয় হইল, সেই নীল আকাশ, সেই অনন্ত বৃক্ষাবলী সেই নদী আলোকে পরিপূর্ণ করিয়া চন্দ্রোদয় হইল। সেই চন্দ্রালোকে নাবিকের মুখমণ্ডল স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইল। দেখিবামাত্র পূর্ব্বস্মৃতি অবারিত সহস্র সাগর-তরঙ্গের ন্যায় বেগে কমলার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। কমলা ক্ষণেক উন্মত্তার ন্যায় কম্পিতকলেবরে সেই মুখমণ্ডলের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া পরে চীৎকার শব্দে "উপেন্দ্রনাথ" এইমাত্র উচ্চারণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া জলে নিপতিত হইলেন!

নাবিকও অনেকক্ষণ অবধি সেই রমণীর দিকে দৃষ্টি করিতেছিলেন, নবোদিত চন্দ্রালোকে সহসা সেই রমণীর মুখমণ্ডল দেখিতে পাইয়াছিলেন। দেখিবামাত্র তাঁহার হৃদয়ে যেন বজ্রাঘাত হইল! রমণী জলে পড়িবামাত্র তিনিও ঝাঁপ দিয়া জলে পড়িলেন। "হৃদয়ের কমলা, তোমাকে কি আবার পাইলাম, না স্বপ্ন দেখিতেছি!" এই বলিয়া সেই চৈতন্যশূন্য শরীর নদী-তীরে তুলিলেন।

সেই চন্দ্রালোকে, সেই জনশূন্য নদী-তীরে, সেই নিবিড় বৃক্ষশ্রেণীর পার্শ্বে, নাবিক যত্নসহকারে কমলার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনিমেষ লোচনে সেই মনোহর বদনমণ্ডলের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সুন্দর ললাট, সেই নিবিড় কৃষ্ণ ভ্রূযুগল, সেই স্নেহপরিপূর্ণ চিন্তাপ্রকাশক নয়ন, সেই মধুর ওষ্ঠ, ও সেই নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাশি, সেই উন্নত হৃদয় ও সুসৌষ্ঠব বাহুযুগল আবরণ করিতেছে।

উপেন্দ্র দেখিতে দেখিতে পাগলের ন্যায় হইয়া সেই হৃদয়ের প্রতিমাকে চুম্বন করিতে লাগিলেন। যখন কমলা পুনরায় চৈতন্য লাভ করিয়া নয়ন উন্মীলন করিলেন, দেখিলেন, স্বামীর আলিঙ্গনে রুদ্ধ রহিয়াছেন, স্বামীর ওষ্ঠে আপনার ওষ্ঠ, স্বামীর হৃদয়ে আপনার হৃদয়!

চিরবিরহের পর পুনর্ম্মিলনে প্রেমিকযুগলের হৃদয়ে যে অতুল আনন্দ, যে অনির্ব্বচনীয় সুখলহরী উথলিয়া পড়িতেছিল, কাহার সাধ্য তাহা অনুভব করে? পরস্পরের মুখ দেখিয়া বহুকালের প্রেমতৃষ্ণা নিবারণ করিয়া তাঁহারা যেরূপ উন্মত্তের ন্যায় অপরিসীম আনন্দসাগরে ভাসিতেছিলেন, কে তাহা অনুভব করিতে পারে? পরস্পরের হৃদয়ে হৃদয় সংস্থাপন করিয়া যে স্বর্গীয় শান্তি লাভ করিতেছিলেন, কে অনুভব করিতে পারে! সেরূপ সুখ জগতে নাই, স্বর্গেও বিরল!

অনেকক্ষণ পরে উপেন্দ্র বলিলেন, "নিকুঞ্জবাসিনী কমলা! আমি মরি নাই, কিন্তু তোমাকে আর পাইব, আমার আশা ছিল না, গ্রামের লোকে আমাকে বলিয়াছিল, তোমার পীড়ায় কাল হইয়াছে।"

কমলা বলিলেন, "হৃদয়েশ্বর! আমার সঙ্কট পীড়া হইয়াছিল, কিন্তু অনেক দিন পরে নিস্তার পাইয়াছিলাম।

যখন নিস্তার পাইলাম তখন আমি বনাশ্রমে। কিন্তু তুমি যে নৌকায় গিয়াছিলে, লোকে আমাকে বলিল, সে নৌকা ঝড়ে উল্টাইয়া সকলের মৃত্যু হইয়াছে।

উপে। "সকলের মৃত্যু হইয়াছিল, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের উপর সদয়, অদ্যকার রজনীর পুনর্ম্মিলনের জন্য আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। প্রাণরক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু আর কিছু রক্ষা করেন নাই, পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত আমার ছিল না। ভিক্ষা করিতে করিতে অনেক দিন পর মুঙ্গেরে পঁহুছিলাম। তথায় যাইয়া তোমার সম্বন্ধে যে কথা শুনিলাম, ইচ্ছা হইল, নৌকার অন্যান্য লোকের সহিত আমারও মৃত্যু হইলে ভাল হইত।"

কম। "ভগবানের কি বিচিত্র লীলা। বহুদিন হইল তুমি একবার মূর্চ্ছিত হইয়াছিলে, চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া আমাকে পাইলে ও পাণিগ্রহণ করিলে। আজি আমি মূর্চ্ছা হইতে চৈতন্য লাভ করিয়া তোমাকে পাইলাম।"

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে উভয়ে ইচ্ছাপুরাভিমুখে গমন করিলেন। উভয়ই পূর্ব্বকালের কথা কহিতে লাগিলেন, সে কথা কহিতে কহিতে কমলার বাল্যকালাবধি সমস্ত কথা হৃদয়ে জাগরিত হইল।

দ্রুতবেগে চন্দ্রশেখরের নিকট আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে আপন মুখ লুকাইয়া কমলা রোদন করিয়া উঠিলেন। চন্দ্রশেখর বিস্মিত হইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। কমলা বলিলেন,—

"পিতা, এতদিন আপনাকে পিতা বলিতাম, আপনিও আমাকে কন্যার অধিক স্নেহ করিয়াছেন, অদ্য জানিলাম আপনি যথার্থই আমার জন্মদাতা।"

সকলেই বিস্মিত হইল। চন্দ্রশেখর কমলাকে ক্রোড়ে লইয়া চুম্বন করিয়া সবিশেষ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

কমলা অনেক কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আপনি অনেকবার আমাকে বলিয়াছেন, আপনি আপন কন্যাকে শৈশবাবস্থায় গঙ্গাসাগরে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন,—তথা হইতে তাহাকে কে তুলিয়া লয় জানেন?"

চন্দ্র। "নবদ্বীপনিবাসী হরিদাস ভট্টাচার্য্য।"

কম। "তবে আর সন্দেহ নাই, আমি সেই নবদ্বীপের হরিদাস ভট্টাচার্য্যের দ্বারা পালিত, তিনিও সর্ব্বদা আমাকে বলিতেন, আমি চন্দ্রশেখর নামক যোগী পুরুষের কন্যা।"

চন্দ্রশেখরের বদনমণ্ডল আনন্দাশ্রুতে ভাসিয়া গেল। বলিলেন, "ভগবান কি আমার এই বৃদ্ধ বয়সে আমার প্রতি এত অনুগ্রহ করিবেন, আমার প্রাণের কন্যাকে কি ফিরিয়া পাইলাম," এই বলিয়া কমলাকে পুনরায় বক্ষে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন; পরে বলিলেন,—"কমলা আর একটী কথা আছে,—তোমার শরীরে কোন স্থানে কোন চিহ্ন আছে?"

কমলা পিতাকে নিভৃত স্থানে লইয়া গেলেন। তথায় বক্ষঃস্থল হইতে বস্ত্র অপসারিত করিলে চন্দ্রশেখর দেখিলেন, স্তনদ্বয়ের মধ্যে শিবের আকৃতি এক্ষণও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

তখন চন্দ্রশেখর আনন্দে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। কমলাকে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন, বার বার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন, "আজি আমার কি সুখের দিন, আজি যদি আমার অভাগিনী গৃহিণী জীবিত থাকিত, প্রাণের দুহিতাকে একবার আলিঙ্গন করিয়া হৃদয় শান্ত করিত।"

তখন চন্দ্রশেখর কমলাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এতদিন কোথায় ছিলে, আর অদ্য এ সুখের সংবাদ কোথা হইতে পাইলে?

ইত্যাদি নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কমলা বলিলেন, "পিতা, শ্রবণ করুন—

"হরিদাস ভট্টাচার্য্য আমাকে পাইবার কিছুদিন পর সপরিবারে দেশত্যাগ করিয়া ৺ কাশীধামে যাত্রা করিলেন ও তথায় অনেকদিন বাস করিতে লাগিলেন। যখন আমার বয়ঃক্রম ৮।৯ বৎসর হইবে তখন হরিদাসের একটী পুত্র সন্তান হইল। এতদিন নিঃসন্তান থাকিয়া আমাকেই যত্ন করিয়া কন্যার মত লালনপালন করিতেন, এক্ষণে বৃদ্ধ বয়সে পুত্র হওয়াতে আনন্দের আর সীমা রহিল না।

"পুত্র প্রসব হইবার কয়েক মাস পরে হরিদাসের গৃহিণীর কাল হইল, সুতরাং সেই পুত্রকে লালনপালন করিবার ভার আমার উপর পড়িল। আমি সেই অল্প বয়সে যথাসাধ্য সেই পুত্রকে লালনপালন করিতে লাগিলাম, দিনরাত্রি তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া থাকিতাম, আপনার ভ্রাতা অপেক্ষা ভালবাসিতাম।

"সেই শিশুপুত্রের প্রতি আমার এইরূপ যত্ন দেখিয়া হরিদাস প্রথমে আমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু পুত্র যেমন বড় হইতে লাগিল, হরিদাসের আমার উপর স্নেহেরও তেমনি হ্রাস হইতে লাগিল। অবশেষে আমি পরিচারিকারূপে সেই গৃহে থাকিতে লাগিলাম। গৃহের অন্য পরিচারিকাকে বিদায় দিলেন, আমাকে সকল কার্য্য করিতে হইত;—হরিদাস ও তাহার পুত্র আমাকে দাসী বলিয়া ডাকিতেন।

"আমার অতিশয় মনঃপীড়া হইতে লাগিল, একাকী বসিয়া কখন কখন ক্রন্দন করিতাম, কিন্তু যাহার জগৎসংসারে কেহ নাই, তাহার ক্রন্দন কে শ্রবণ করে, তাহার মনপীড়ায় কি ফল হয়? পিতা, আপনাকে স্মরণ করিতে পারিতাম না, কিন্তু কতবার মনে মনে ইচ্ছা হইত যে, অগাধ গঙ্গাসাগরে যখন আমি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম, তখনই আমার মৃত্যু হইত।

"কেবল ইহাই নহে। পিতা আপনি জানেন, আমি জন্মাবধি কিছু অন্যমনস্কা, কিছু চিন্তাশীলা। সে জন্য আমি যে হরিদাসের নিকট কত তিরস্কার, কত ভর্ৎসনা সহ্য করিয়াছি বলিতে পারি না। সমস্ত দিন অবিশ্রামে গৃহের সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতাম, ইহাতে যদি কোন কার্য্যে কোন প্রাকারে দোষ থাকিত হরিদাস আমাকে গালি দিতেন, কখন কখন সম্মার্জ্জনীদ্বারা প্রহার করিতেন। আমি নীরবে ক্রন্দন করিতাম।

"বয়স যত অধিক হইতে লাগিল, হরিদাসের নিষ্ঠুরতা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অন্যান্য দোষ জন্মাইতে লাগিল। যৌবনে যে সমস্ত

দোষ হয়, হরিদাসের পত্নীর মৃত্যুর পর সেই সকল দোষ হইতে লাগিল; ক্রমে তাঁহার গৃহ নানাপ্রকার লোকের সমাগমস্থান হইয়া উঠিল।

"সুতরাং আমি তাঁহার গৃহ হইতে পলাইবার উদ্যোগ দেখিতে লাগিলাম;—কিন্তু একটী কারণের জন্য সহসা পলাইলাম না। আমার বোধ হইল যেন হরিদাসের আমার প্রতি নিষ্ঠুরতা হ্রাস পাইতে লাগিল। আর আমাকে কখন প্রহার করিতেন না,—বিশেষ কারণ না থাকিলে আমাকে গালিও দিতেন না। যখন গালি দিতেন তখনও সহাস্যবদনে দুই একটী কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেন। তাঁহার সহস্র দোষ থাকিলেও আমি তাঁহাকে প্রভু বলিয়া মান্য করিতাম, ভাবিলাম, উনি সৎলোক হউন আর অসৎ লোকই হউন, আমি দাসী, যতদিন থাকিতে পাইব, ততদিন সেবা করিব।

"হতভাগিনীর বৃথা আশা! এক দিন সমস্ত দিন কার্য্যের পর প্রায় দুই প্রহর রজনীর সময় আপন গৃহে শয়ন করিতে গেলাম, দেখিলাম,—— পিতা আপনার নিকট আমার সকল কথা বলিতে লজ্জা করে,—সংক্ষেপে, সেই পামর হরিদাস আমার সতীত্ব হরণে চেষ্টা পাইল; আমি তখন বুঝিতে পারিলাম, কি জন্য তিনি ইদানীং আমার প্রতি দয়ালু হইয়াছিলেন, কি জন্য আমাকে দেখিলেই হাসিতেন। চীৎকার করিয়া আমি ঘর হইতে বহির্গত হইলাম। সেই দিন, সেই দুইপ্রহর রজনীতে তরুণ বয়সে অসহায় হইয়া সংসারসাগরে ঝাঁপ দিলাম।

"পিতা আপনি যে গঙ্গাসাগরে আমাকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার কূল আছে, কিন্তু আমি যে সংসার-সাগরে ঝাঁপ দিলাম, তাহার কূল নাই। কিছু দিন নগর হইতে নগরে ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিতাম, অবশেষে,"—

কমলা লজ্জায় একেবারে মুখ অবনত করিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ লজ্জা সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "অবশেষে মুঙ্গের নগরে এক ব্রাহ্মণপুত্র আমাকে বিবাহ করিলেন। পিতা আমি বিধবা নহি, আপনার জামতা এক্ষণও জীবিত আছেন।"

এই বলিয়া যথায় উপেন্দ্রনাথ ছিলেন, কমলা সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন,—কিন্তু উপেন্দ্রনাথ তথায় নাই।

এরূপ সময়ে সহসা রোদননিনাদ শ্রুত হইল। সকলে চাহিয়া দেখিল, উপেন্দ্রনাবিক নগেন্দ্রনাথের পদতলে পড়িয়া রোদন করিতেছেন, ও সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া দুই হস্তে চক্ষু আবরণ করিয়া

রোদন করিতেছেন। সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল ও যৎপরোনাস্তি উৎসুক হইল।

উপেন্দ্র নাবিক বলিলেন, "পিতা ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে এই বৃদ্ধ বয়সে যে কষ্ট দিয়াছি, স্মরণ করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ব্যাঘ্রে খায় নাই, হতভাগ্য এখন জীবিত আছে। আর আমি আপনাকে ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইব না।"

আনন্দাশ্রুতে বৃদ্ধ নগেন্দ্রনাথের বদনমণ্ডল প্লাবিত হইল, বলিলেন, "উপেন্দ্রনাথ! তোমার দোষ নাই, আমিই পাপ করিয়াছিলাম, আমিই পাপাত্মা, তোমাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু ভগবান জানেন, সে পাপের ফল আমি অনুভব করিয়াছি তুমি যাইবার পরই আমার গৃহশূন্য হইল, তোমার মাতা দুঃখে প্রাণত্যাগ করিলেন। হতভাগিনি! যদি আজ জীবিত থাকিতে, অশ্বিনীকুমারের ন্যায় দুই পুত্রকে ক্রোড়ে করিতে পারিতে!" এই বলিয়া বৃদ্ধ আবার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। উপেন্দ্রনাথও মাতার কথা স্মরণ করিয়া শোকে ব্যাকুল হইলেন।

আজি ইচ্ছাপুর নগর আনন্দলহরীতে ভাসিয়া গেল। প্রজারঞ্জক জমিদার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়াছেন, চন্দ্রশেখর আপন কন্যাকে ফিরিয়া পাইয়াছেন, সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রে ও সেই কন্যার বিবাহ হইয়াছে। এই আনন্দের বার্ত্তা সেই রজনীতেই ইচ্ছাপুরে সকলেই জানিতে পারিল। পথে পথে, গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল, আনন্দের ঢাক বাজিতে লাগিল, পুরবাসিগণ বৃদ্ধ নগেন্দ্রনাথও তাঁহার পুত্রের উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল,—পথ ঘাট আনন্দে ভাসিয়া গেল, প্রভাত হইবার পূর্ব্বে সেই সুখসংবাদ নগেন্দ্রনাথের জমীদারীর সকল গ্রামে রাষ্ট্র হইল।

প্রাতঃকালে সুরেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠের চরণযুগলে প্রণিপাত করিয়া সাশ্রুলোচনে বলিলেন, "ভ্রাতঃ! আপনার অজ্ঞাতবাসে আমি আপনার প্রতি কত অশ্রদ্ধা দেখাইয়াছি, তাহা ক্ষমা করিবেন,—আমি জানিতাম না, ভ্রমবশতঃ করিয়াছি।"

উপেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "সুরেন্দ্রনাথ! তোমার ক্ষমা চাহিবার আবশ্যক নাই জগৎসংসারে আমি তোমার মত ভ্রাতা পাইব না, তোমার সাহস, বীরত্ব ও যুদ্ধকৌশলের যশে বঙ্গদেশ যেরূপ পরিপূর্ণ হইয়াছে, দরিদ্রের প্রতি দয়া, প্রজাবাৎসল্য ও অমায়িকতা প্রভৃতি সদ্গুণেও তুমি সেইরূপ ভূষিত আছ। আজি যেন আমি নগেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়াছি, কিন্তু যখন তুমি আমাকে দরিদ্র নাবিক বলিয়া জানিতে, তখনও আমার

সহিত ভ্রাতার মত স্নেহপূর্ব্বক কথা কহিয়াছ, একত্রে শয়ন করিয়াছ। যাঁহাদের হাতে ক্ষমতা ও ধন থাকে, তাঁহারা সকলেই যদি তোমার মত অমায়িক হয়েন, তাহা হইলে এ জগৎসংসার স্বর্গ হইত।"

চতুস্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

বিচার।

Behold where stands
The usurper's cursed head.
Shakespeare.

রাজা টোডরমল্ল ইচ্ছাপুরে আসিয়াছেন, আজি আনন্দে ইচ্ছাপুরবাসিগণ মত্ত হইয়াছে।

বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে রাজার সভা হইয়াছে, সে সভার শোভা বর্ণনা করা যায় না। উপরে অতি বিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপ লম্বিত রহিয়াছে, সেই পট্টবস্ত্রনির্ম্মিত চন্দ্রাতপ জরীতে ঝল্‌মল্ করিতেছে। চন্দ্রাতপের পার্শ্ব হইতে সুন্দর ও সুগন্ধ পুষ্পমাল্য ভূমি পর্য্যন্ত লম্বিত রহিয়াছে; শুভ্র রক্তবর্ণ নীল পীত প্রভৃতি নানাপ্রকার পুষ্পে সেই চন্দ্রাতপ অধিকতর শোভিত হইয়াছে। চন্দ্রাতপের নীচে বিস্তীর্ণ শয্যা রচিত হইয়াছে, সে শয্যা রক্তবর্ণ মকমলে মণ্ডিত, ও তাহার উপর অতি সুন্দর বিচিত্র স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারুকার্য্য শোভা পাইতেছে। সেই মকমলের স্থানে স্থানে সুন্দর পুষ্প, সুন্দর লতা ও অপরূপ পত্র চিত্রিত রহিয়াছে, এরূপ সুন্দর যে সহসা কেহ আসিলে সেই পুষ্পলতার উপর পদবিক্ষেপ করিতে সঙ্কোচ করে। সভার মধ্যস্থলে একটী দ্বিরদরদ ও রৌপ্যনির্ম্মিত সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে। তাহার চারি পার্শ্বে ক্ষমতা ও ধনসম্পন্ন যোদ্ধা ও জমীদারগণ সমবেত রহিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে স্তূপাকারে সুগন্ধ পুষ্প সজ্জিত রহিয়াছে, চতুর্দ্দিকে ভৃত্যগণ বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করিয়া চামর ব্যজন করিতেছে; জমীদার ও যোদ্ধাগণ সকলেই সুবর্ণ ও রৌপ্যখচিত বহুমূল্য বস্ত্রে শোভা পাইতেছিলেন।

সভার তিন দিকে পদাতিগণ রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার পশ্চাতে অশ্বারোহীগণ নিষ্কোষিত অসিহস্তে প্রস্তরপুত্তলীর ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে,—তাহার পশ্চাতে আবার মাতঙ্গশ্রেণী

দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এইরূপে তিন দিক্ সৈন্য সামন্তে বেষ্টিত। সম্মুখে রাজার আসিবার জন্য প্রশস্ত ও অতিদীর্ঘ একটী পথ, সে পথও রক্তবর্ণ মকমল দিয়া মণ্ডিত, তাহার দুই পার্শ্বে আবার সৈন্যগণ সেইরূপে সন্নিবেশিত, নিকটে ধ্বজবহ পদাতিক পতাকা হস্তে দণ্ডায়মান, তাহার পশ্চাতে অশ্বারোহী কৃপাণপাণি হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার পশ্চাতে হস্তী-শ্রেণী। তরুণ-অরুণকিরণে সেই নিষ্কোষিত খড়্গ ঝকমক্ করিয়া উঠিল, প্রাতঃকালের শীতল বায়ুতে সেই উচ্চ পতাকা সকল পতপত শব্দে উড্ডীন হইতে লাগিল। শত শত যুদ্ধক্ষেত্রে যে জয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল, আজি ইচ্ছাপুরে সেই জয়পতাকা উড্ডীন হইতেছে, দেখিয়া নিবাসিগণ আনন্দে নিমগ্ন হইতে লাগিল,—যোদ্ধাগণের হৃদয় সাহসে ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

সূর্য্যোদয় হইবার পরই রাজা টোডরমল্ল সভায় শুভাগমন করিলেন, তদ্দর্শনে সভাসদ্ সকলেই একবাক্যে "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া উঠিলেন। তাঁহারা নিস্তব্ধ হইলে সৈন্যগণ ক্রমান্বয়ে সেই জয়স্তুতি উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে লাগিল। সে জয়নাদ চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রাম পর্য্যন্ত শ্রুত হইল, বোধ হইল যেন ভীষণ দিগন্তব্যাপী মেঘগর্জ্জন গিরিগুহায় বার বার প্রতিধ্বনিত হইল।

রাজা ধীরে ধীরে সভার দিকে আসিতেছিলেন। তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে নরেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ, অপর পার্শ্বে সুরেন্দ্রনাথ, সাদীক খাঁ ও তারশন খাঁ যাইতেছেন। পশ্চাতে আর কতিপয় খ্যাতিসম্পন্ন জমীদার ও সৈনিক পুরুষ ধীরে ধীরে যাইতেছেন। রাজা ধীরে ধীরে যাইয়া সিংহাসনোপরি উপবেশন করিলেন।

তখন একেবারে সহস্র জয়ঢাক হইতে ভীষণ রণবাদ্য আরম্ভ হইল;—সে সুশ্রাব্য গম্ভীর দিগন্তব্যাপী রণবাদ্য গ্রামে গ্রামে শ্রুত হইতে লাগিল, নির্ম্মল প্রাতঃকালের নীল গগনমণ্ডলে উত্থিত হইতে লাগিল। সে শব্দ শুনিয়া অশ্ব, গজ আস্ফালন করিতে লাগিল, সৈনিকদিগের রণক্ষেত্রের কথা মনে পড়িল, একেবারে সহস্র অসি কোষ হইতে ঝন্ ঝন্ শব্দে বহির্গত হইয়া রবিকরে ঝকমক্ করিতে লাগিল।

সে বাদ্য নিস্তব্ধ হইল, তাহার পর কতরূপ দর্শন ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইল, তাহা বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। আজি দিল্লীশ্বরের সেনাপতি ও প্রতিনিধি বঙ্গদেশ জয় করিয়া ইচ্ছাপুরে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন,—আজি কত শত বৎসরের পর একজন হিন্দু সেনাপতি বঙ্গদেশ শাসন করিতে

আসিয়াছেন ; সুতরাং বঙ্গদেশের মধ্যে যেস্থানে যে কোন আশ্চর্য্য বস্তু ছিল, তাহা রাজার সম্মুখে প্রদর্শিত হইবার জন্য সমানীত হইয়াছিল। দূর-দেশ হইতে খ্যাতিসম্পন্ন নিপুণ বাদ্যকর আপনার বাদ্য শুনাইয়া রাজা ও সভাসদ্গণকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিল, দেশ দেশ হইতে সুন্দর গায়কগণ সুললিত গীতধ্বনিতে সকলের মন মুগ্ধ করিতে লাগিল। নর্ত্তকীগণ আপন অতুল্য রূপরাশি বিস্তার করিয়া ও নানা অঙ্গভঙ্গী ও সুললিত স্বরে সকলের হৃদয় অপহরণ করিতে লাগিল। ঐন্দ্রজালিকগণ বিচিত্র ইন্দ্রজাল দেখাইয়া, যোদ্ধাগণ অদ্ভুত মল্লযুদ্ধ প্রদর্শন করাইয়া, ধানুষ্কগণ বিস্ময়কর তীর বিক্ষেপ করিয়া, সকলেই আপনাপন অপরূপ কৌশল দেখাইয়া সভাসদ্গণকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল।

অবশেষে কবির যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বঙ্গদেশে তৎকালে যাঁহারা কবি-শক্তিতে পারদর্শী ছিলেন, সকলেই রাজার নিকট আপনাপন গুণের পরিচয় দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। একে একে সকলেই আপনাপন রচিত কবিতা পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা ও অঙ্গভঙ্গী করিয়া দর্শক ও শ্রোতাদিগের হৃদয় নানারূপ ভাবে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। কেহ বা যুদ্ধের বর্ণনা দ্বারা সকলকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, যোদ্ধাদিগের খড়্গ যেন স্বতঃই কোষ হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। কেহ বা দেবদেবীর স্তুতি পাঠ করিয়া সকলের মন ভক্তি-পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন, কেহ বা প্রেমের কথা আনিয়া শ্রোতাদিগের হৃদয় দ্রবীভূত করিতে লাগিলেন, আবার কেহ দুঃখের কথা বলিয়া সভাসদ্গণের চক্ষু জলে প্লাবিত করিতে লাগিলেন। কবিতার মোহিনী শক্তিতে যোদ্ধার হৃদয়ও গলিতে লাগিল, যোদ্ধার নয়নেও জল আসিল।

সেই কবিমণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, বিচার করা অতিশয় দুরূহ হইল। সভাসদ্গণও সকলেই একবাক্যে দুই জনকে শ্রেষ্ঠ স্থির করিলেন, একজন যুবক ও অপর বৃদ্ধ। কিন্তু তাহাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট কে, বিবেচনা করিয়া স্থির করা সহজ হইল না। অবশেষে রাজা টোডরমল্ল আদেশ করিলেন,—"আপনারা আর একবার আপনাপন রচিত এক একটী কবিতা পাঠ করুন।"

যুবক উমার একটী স্তুতি পাঠ করিলেন, সে স্তুতি কি অপূর্ব্বভাব কি ভক্তিরস-পরিপূর্ণ! শুনিতে শুনিতে সভাসদ্গণ জগৎ-সংসার ভুলিয়া গেলেন, ঐহিক বাসনা ভুলিয়া গেলেন, এই সংসারের মায়া ভুলিয়া গেলেন। একেবারে ভক্তিরসে অভিভূত হইলেন। রহিয়া রহিয়া কবি যখন "মা"

বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, সভাসদ্গণ যেন সাক্ষাৎ সেই জগৎ-বিমোহিনী বিশ্বেশ্বরী জগৎ-মাতা দুর্গাকে দেখিতে লাগিলেন। কবির কবিতা যখন সাঙ্গ হইল, শ্রোতাগণের কর্ণে সেই সুমধুর কবিতা তখনও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

রাজা টোডরমল্লের হিন্দুধর্ম্মে গাঢ় ভক্তি ছিল। এই ধর্ম্মসঙ্গীত শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ে যে কিপর্য্যন্ত ভক্তিরসের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। কবিতা সাঙ্গ হইলে ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিলেন, ক্ষণেক পরে বলিলেন, "আপনার জন্ম সার্থক, চণ্ডী যথার্থই আপনার হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিতেছেন, আমরা কেবল বৃথা মায়াজালে জড়িত হইয়া রহিয়াছি, রাজ্যশাসন ত্যাগ করিয়া আপনার মত ভিক্ষা করত জীবন ধারণ করিয়াও ঐ অপরূপ কবিতা শিখিতে ইচ্ছা হয়। আপনার নাম কি, নিবাস কোথায়?" এই বলিয়া গলদেশ হইতে সুবর্ণ হার উন্মোচন করিয়া কবিকে প্রদান করিলেন।

কবি উত্তর করিলেন, "মহারাজ, বর্দ্ধমান জেলায় দামুন্যা গ্রাম আমার নিবাস, আমার পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র, পিতার নাম হৃদয় মিশ্র, আমার নাম মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। এক্ষণে বাঁকুড়ার জমীদারের অধীনে আছি, তিনিই আমাকে প্রতিপালন করিতেছেন,—আমি তাঁহার পুত্রকে শিক্ষা দান করি।"

রাজা বলিলেন, "আমি তোমার কবিতায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার চণ্ডীর প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তি দেখিতেছি, একখানি 'চণ্ডীকাব্য' রচনা কর, তোমার নাম চিরস্মরণীয় হইবে।" এই বলিয়া দ্বিতীয় কবিকে পাঠ করিতে আদেশ করিলেন।

সকলেই ইঙ্গিত করিয়া বৃদ্ধ কবিকে কবিতা পাঠ করিতে নিষেধ করিলেন। বলিতে লাগিলেন, "মুকুন্দরামকে রাজা যেরূপ প্রশংসা করিলেন, আর তোমার কবিতা পাঠ করা বৃথা, কি জন্য অপদস্থ হইবে,—অগ্রেই পরাজয় স্বীকার কর, মানে মানে গৃহে প্রত্যাগমন কর।" কিন্তু কবি কাহারও কথা শ্রবণ না করিয়া কবিতা পাঠ করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্রের শোকে রাজা দশরথের মৃত্যু বর্ণনা করিতে লাগিলেন। পাঠারম্ভ করিবার পূর্ব্বে সকলেই স্থির করিয়াছিলেন, মুকুন্দরাম জয় লাভ করিবেন, কিন্তু যখন সেই প্রাচীন কবি গম্ভীরস্বরে, অশ্রুপরিপূর্ণলোচনে সেই দুঃখবার্ত্তা গাইতে আরম্ভ করিলেন, সকলেই একেবারে চমকিত হইলেন। ভাষাসাগর মন্থন করিয়া সুচিক্কণ বাক্যরত্ন সমুদায় নির্ব্বাচন করত যখন

কবি আপনার গান আরম্ভ করিলেন, তাহার উপর যখন আপনার অশ্রুতপূর্ব্ব সঙ্গীত ও স্বরমাধুর্য্য প্রদান করিলেন, প্রদান করিয়া যখন প্রাণপ্রিয় রামলক্ষ্মণবিরহে বৃদ্ধ রাজা দশরথের শোক বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সকল সভাসদ্গণের হৃদয় একেবারে দ্রবীভূত হইয়া গেল। কবির নিরানন্দ শুষ্ক মূর্ত্তি, শীর্ণ বাহু, শীর্ণ কলেবর ও মস্তকে শুক্ল কেশ, অথচ জ্যোতিঃপরিপূর্ণ নয়নদ্বয় দেখিয়া সকলের হৃদয় অধিকতর দ্রবীভূত হইতে লাগিল। নগেন্দ্রনাথ আপনার পুত্রদ্বয়ের অবর্ত্তমানে যে শোক অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাই স্মরণ করিলেন, সে কথা স্মরণ হইবামাত্র সহসা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন,—তাঁহার রোদন শুনিয়া ও কবির গীতের মহিমাতে সভাসদ্গণের মধ্যে অনেকেই রোদন করিলেন, সকলেরই চক্ষুতে জল আসিল। রাজা টোডরমল্লও চক্ষুর জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "মহাশয়, আর আবশ্যক নাই, আপনারা দুই জনই সমতুল, দুই জনই অতুল্য। আপনার নাম কি?" বলিয়া আপন হস্ত হইতে সুবর্ণ-বলয় লইয়া কবির হস্তে পরাইয়া দিলেন। কবি উত্তর করিলেন, "আমি নবদ্বীপজেলার অন্তঃপাতী ফুলিয়া গ্রামের মুরারি ওঝার পৌত্র, নাম কীর্ত্তিবাস ওঝা।"

রাজা বলিলেন,—

"কীর্ত্তিবাস! আপনার কীর্ত্তি বঙ্গদেশে চিরকাল বাস করিবে, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আপনার কবিতা পাঠ করিবে, আজি যেরূপ সভাসদ্গণ আপনার কবিতা শুনিয়া ক্রন্দন করিলেন, যুগযুগান্তরেও কি বৃদ্ধ, কি বালক, কি পুরুষ, কি অন্তঃপুরবাসিনী কুলকামিনী, সকলেই আপনার কবিতা পাঠ করিয়া ক্রন্দন করিবে।" রাজা সকলকেই কিছু কিছু পুরস্কার দিয়া বিদায় দিলেন।

পরে রাজা আদেশ দিলেন, "আর আমোদপ্রমোদে আবশ্যক নাই, এখনও আমাদিগের প্রধান কার্য্য করিতে আছে, বন্দীকে লইয়া আইস।"

চারি জন সৈনিক পুরুষ শকুনিকে লইয়া আসিল। শকুনি আসিয়া রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। মলিন পরিচ্ছদ, দুই হস্ত বদ্ধ, বন্দী ভূমির দিকে একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন। তখন সুরেন্দ্রনাথ কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, আমি মহাত্মা সমরসিংহের নিরাশ্রয়, বিধবা ও অনাথা কন্যার পক্ষ হইতে অভিযোগ করিতেছি, এই নরাধম রাজা সমরসিংহের নামে মিথ্যা অভিযোগ করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড করাইয়াছিল। রাজা সমরসিংহ দিল্লীশ্বরের অনুগত দাস ছিলেন,—

দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি ও সেনাপতির নিকট আমি সেই বীরপুরুষের হত্যার নিমিত্ত বিচার প্রার্থনা করিতেছি।" এই বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ রাজার হস্তে কতিপয় খণ্ড কাগজ দিলেন। বিমলা চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ হইতে নৌকাযোগে পলায়ন করিবার সময় এই কাগজ লইয়া গিয়াছিলেন।

শকুনির দোষের প্রমাণের অভাব ছিল না। শকুনি যে কাগজ জাল করিয়াছিলেন, তাহা রাজার হস্তেই ছিল, তাহা বার বার পাঠ করিয়া দেখিলেন, সেই পত্র সকল সমরসিংহের দ্বারা পাঠান সেনাপতিদিগকে লিখিত হইয়াছিল, এইরূপ অভিযোগে সমরসিংহের প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু সে সকল পত্রে শকুনির হস্তাক্ষর, আর সমরসিংহের মোহর; সেই মোহরের প্রতিকৃতি একটী শকুনির নিজ কক্ষে পাওয়া গিয়াছে। তাহাও বিমলা দুর্গ হইতে লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।

তাহার পর ছয় বৎসর কাল মহাশ্বেতা যেরূপে ছিলেন, শকুনির সহস্র চর যেরূপে মহাশ্বেতাকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে তাড়না করিয়াছিল, যেরূপে মহাশ্বেতা কন্যার সহিত পরিশেষে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের অভ্যন্তরে রুদ্ধ হয়েন, কোন বিষয়েই প্রমাণের অভাব ছিল না। আর সতীশচন্দ্রের হত্যার কথা রাজা আপনিই জানিতেন।

তখন রাজা টোডরমল্ল সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "পামর! তোর জীবন পাপরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণও জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, পরকালে ভাল হইতে পারে, ইহকালে তোর পাপের ক্ষমা নাই।"

শকুনি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "আমি নির্দ্দোষী।" রাজা আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "জল্লাদ! আর বিলম্বে কায নাই।"

শকুনি তখন বলিলেন, "মহারাজ! আপনি আমার শত্রুদিগের সকল কথা শুনিয়াছেন,—আমার একটী নিবেদন আছে।"

রাজা বলিলেন, "শীঘ্র নিবেদন কর, তোর আর অধিক পরমায়ু নাই।"

শকুনি গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমার দোষ যদি প্রমাণ হইয়া থাকে, তথাপি আমি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ অবধ্য! আপনি হিন্দুধর্ম্মের পরম ভক্ত, হিন্দুশাস্ত্রে বিশারদ, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ অবধ্য! শত সহস্র দোষ করিলেও ব্রাহ্মণ অবধ্য! আমি নিরাশ্রয় বন্দী, হস্তদ্বয় বদ্ধ রহিয়াছে, যে দিকে নিরীক্ষণ করি, সেই দিকেই আমার শত্রু। সুতরাং আপনার আজ্ঞায় বাধা দিবার কেহ নাই, আমাকে সহায়তা করিবার কেহ নাই।

এক্ষণে আপনি আমাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিলে বধ করিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলে শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন। প্রায় চারি শত বৎসর অবধি মুসলমানে বঙ্গদেশ শাসন করিতেছে,—তাহারা অপকৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ও ম্লেচ্ছ, তথাপি তাহাদের মধ্যেও, বোধ হয়, কেহ ব্রাহ্মণকে বধ করে নাই। আজি ঈশ্বর-ইচ্ছায় এক জন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী পরম ধার্ম্মিক রাজা বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন,—শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করা, ব্রাহ্মণ বধ করা কি তাঁহার শাসনের প্রথম কার্য্য হইবে? মহারাজ! সাবধান! আজি আপনি যে পুণ্যকর্ম্ম করিবেন, চিরকাল তাহার যশ থাকিবে, আজি আপনি যে পাপ-কর্ম্ম করিবেন, চিরকাল তাহার অপযশ থাকিবে! আমি নিরাশ্রয় বন্দী, আমাকে বধ করা মুহূর্ত্তের কার্য্য, কিন্তু রাজা টোডরমল্লের শুভ্র নিষ্কলঙ্ক যশোরাশির মধ্যে সে কর্ম্ম কলঙ্কের স্বরূপ হইবে,—রাজা টোডরমল্লের জীবনচরিত হইতে সে দুরপনেয় কলঙ্ক শত শতাব্দীতেও বিলীন হইবে না। সমস্ত ভারতক্ষেত্রে সে কলঙ্ক রটিবে;—আমাদের কাল হইলে আমা-দিগের পুত্রেরা, তাহাদিগের পর আমাদের পৌত্রেরা এ কথা স্মরণ করিয়া রাখিবে,—সহস্র বৎসর পরেও বালকগণ পুরাবৃত্তে পাঠ করিবে যে, রাজা টোডরমল্ল বঙ্গদেশে আগমনের পর প্রথমেই এক ব্রাহ্মণপুত্রকে হত্যা করিয়াছিলেন। সহস্র বৎসর পরেও বৃদ্ধেরা গল্প করিবে যে, মুসলমানদিগের সময়েও যাহা হয় নাই, রাজা টোডরমল্লের শাসনকালে ব্রাহ্মণহত্যা হইয়া-ছিল। মহারাজ! সাবধান! আমাকে দণ্ড দিতে পারেন, কিন্তু দেশ দেশান্তরে, যুগ যুগান্তরে আপনার এ কলঙ্ক অপনীত হইবে না, ব্রহ্মহত্যারূপ মহাপাপে আপনার বিস্তীর্ণ যশোরাশি মলিন হইয়া যাইবে।"

শকুনি নিস্তব্ধ হইলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া রাজা চিন্তাশীল হইয়া মস্তক অবনত করিলেন। শকুনি তাহা দেখিলেন। যদি কেহ সে সময়ে শকুনির মুখ বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করিত, তাহা হইলে ওষ্ঠের নিকট অল্প হাস্যকণা দেখিতে পাইত। শকুনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন।

"যাহার যেমন তাহার তেমন। বালককে মিষ্টান্ন দিয়া বশ করিতে হয়, যুবতীকে রূপ দেখাইয়া বশ করিতে হয়, আজি যোদ্ধা ও ধর্ম্মপরায়ণ রাজাকে অপযশ ও অধর্ম্মের ভয় দেখাইয়া বশ করিয়াছি। যে মোহজাল বিস্তার করিয়াছি, তাহা ছিন্ন করা রাজার সাধ্য নাই। বুদ্ধির চিরকালই জয়।"

রাজা টোডরমল্ল অতিশয় হিন্দুধর্ম্মপরায়ণ। "ব্রাহ্মণ অবধ" কথা হিন্দুশাস্ত্রের পত্রে পত্রে লিখিত আছে। শাস্ত্রের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে

রাজা টোডরমল্ল অক্ষম। মৌনভাবে মস্তক নত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সাদীক খাঁ বলিলেন, "মহারাজ আপনি সেনাপতি, সেনাপতির ধর্ম্ম ভুলিবেন না, আপনি শাসনকর্ত্তা, শাসনকর্ত্তার ধর্ম্ম ভুলিবেন না, দোষীকে দণ্ডবিধান করুন।"

রাজা ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "ব্রাহ্মণ অবধ্য।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এই বিধবা ও অনাথার আপনি ভিন্ন আর কেহ নাই, ইহাদের বিচার করুন, দোষীকে দণ্ড দিন্।"

রাজা ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "ব্রাহ্মণ অবধ্য।"

সভাসদ্গণ বলিল, "মহারাজ, আপনি শিষ্টের পালন করিবেন, দুষ্টের দমন করিবেন, আপনি না দিলে এই মহাপাপীর দণ্ড কে দিবে?"

রাজা ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "ব্রাহ্মণ অবধ্য।"

ইতিমধ্যে সেই সভার কিছু দূরে একটা অতিশয় গোলমাল হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে একজন দীর্ঘকায়, শীর্ণকলেবর, কৃষ্ণবর্ণ, মলিনবেশ পাগলিনী সেই সভার নিকট দৌড়াইয়া আসিল! চীৎকার শব্দ করিয়া ভূমিতে পতিত হইল! সে বিশ্বেশ্বরী পাগলিনী।

শকুনি এতক্ষণ স্থিরভাবে ছিলেন, যখন তাঁহার মৃত্যুর আজ্ঞা হইয়াছিল, তখনও স্থিরভাবে ছিলেন, কিন্তু পাগলিনীকে দেখিয়া একেবারে কম্পিত-কলেবর হইলেন। বলিতে লাগিলেন,—"আমি দোষী, আমি দোষী, আমার প্রাণবধ করুন, কিন্তু এ পাগলিনীর কথা শুনিবেন না।"

সকলেই বিস্মিত হইল। পাগলিনী পুনরায় দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিল,—

"মহারাজ! আমাকে রক্ষা করুন! পামর আমার মাতাকে বধ করিয়াছে, আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আমার মাতার বিকট আকৃতি এক্ষণও দেখিতে পাইতেছি, ঐ দেখুন তাঁহার ভীষণ আকৃতি, ঐ দেখুন আরক্ত নয়ন, ঐ"—আর কথা বাহির হইল না, শকুনির দিকে তাহার নয়ন পতিত হওয়াতে সহসা চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সকলে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল। রাজার আজ্ঞায় অনেক জল-সেচনের পর পাগলিনীর সংজ্ঞা হইল। তখন তাহাকে পুনরায় সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করায় পাগলিনা রহিয়া রহিয়া আত্মবিবরণ কহিতে লাগিল। সেরূপ প্রকারে বলিতে হইলে অনেক বিলম্ব হইবে, সুতরাং আমরা পাগলিনীর কথা সংক্ষেপে বলিব।

পাগলিনী গোপকন্যা, তাহার মাতা পরমা সুন্দরী ছিল, তাহার স্বামীর কাল হইবার পর, বিধবা গোপীকে দেখিয়া একজন ব্রাহ্মণ মোহিত হয়েন। তাঁহার ঔরসে সেই গোপস্ত্রীর গর্ভে শকুনির জন্ম হয়।

শকুনির পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন এই গোপবনিতা ও তাহার পূর্ব্বস্বামীর ঔরসজাত কন্যা বিশ্বেশ্বরীকে লালনপালন করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার মৃত্যুর পর শকুনি অল্প বিষয়ের উত্তরাধিকারী হয়েন। সকলে তাঁহাকে জারজ বলাতে শকুনি অল্প বয়সে অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন। একদিন ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া আপনার মাতাকে বিষসেবন দ্বারা হত্যা করিলেন! বিশ্বেশ্বরী পলাইল, কিন্তু সেই হত্যা দেখিয়া অবধি পাগলিনী হইল। শকুনি এই মহাপাতকের পর দেশত্যাগ করিয়া সতীশচন্দ্রের গৃহে ব্রাহ্মণপুত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দিলেন।

বিশ্বেশ্বরী প্রাণভয়ে অনেকদিন অবধি দেশদেশান্তরে লুকাইয়া বেড়াইত। অবশেষে যেদিন বনাশ্রম হইতে মহাশ্বেতা ও সরলা চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে বন্দীরূপে নীত হয়েন, সেই দিনেই বিশ্বেশ্বরীও বন্দীরূপে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে নীত হয়। পাছে বিশ্বেশ্বরী শকুনির জন্মের কলঙ্কের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করে, সেই জন্য তাহাকে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের মধ্যে এক অতি অন্ধকার কারাগারে এতদিন বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল।

এক্ষণে শকুনি বন্দী হইলে পর বিশ্বেশ্বরী সেই কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু কারাবাসে তাহাকে যে কষ্টে রাখা হইয়াছিল, তাহাতে তাহার শরীরে কেবল অস্থিচয় অবশিষ্ট ছিল। আপনার এই সমস্ত বিবরণ বলিতে বলিতে তাহার চক্ষুদ্বয় কপালে উঠিল ও রক্তবর্ণ হইল, ললাটে শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল। সহসা পার্শ্বস্থ একটী সৈনিক পুরুষের নিকট হইতে একটী তীক্ষ্ণ ছুরিকা লইয়া সজোরে শকুনির বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। ছিন্ন তরুর ন্যায় শকুনির মৃতদেহ ভূতলে পতিত হইল।

"সমরসিংহের মৃত্যুর প্রতিহিংসা হইল," "সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর প্রতিহিংসা হইল," "মাতৃহন্তার উপযুক্ত শাস্তি," "কপটচারীর উচিত দণ্ড,"—এইরূপ নানাপ্রকার কথা বলিয়া সকলেই গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

বিশ্বেশ্বরীর জীবনের কার্য্যও অদ্য শেষ হইল;—সেই শীর্ণ দেহ হইতে ধীরে ধীরে প্রাণ নির্গত হইল। ভ্রাতার মৃতদেহের দিকে দেখিতে দেখিতে হাসিতে হাসিতে অভাগিনী পাগলিনী প্রাণত্যাগ করিল।

পঞ্চত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

প্রতিমা বিসর্জ্জন।

Why let the stricken deer go weep,
The hart ungalled play,
While some must watch, while some must sleep,
Thus runs the world away.

Shakespeare.

উপরি উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরেই রাজা টোডরমল্ল ইচ্ছাপুর পরিত্যাগ করিয়া প্রতিগমন করিলেন। নগেন্দ্রনাথ পুত্রদিগকে জমিদারীর ভার দিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু কোন পুত্র ভার লইতে ইচ্ছা করিলেন না। উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার জমিদারী লইয়া কিছু আবশ্যক নাই, জমিদারীর কার্য্য আমার পক্ষে বিরক্তিজনক বোধ হইবে,—আমি আশ্রমে যাইয়া নীরবে বাস করিতে ইচ্ছা করি, তাহার অধিক আমার আর সুখ নাই।" জ্যেষ্ঠের অসম্মতি দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথও অনিচ্ছুক হইলেন, কিন্তু পিতার অনুরোধে অবশেষে সেই ভার গ্রহণ করিলেন।

উপেন্দ্রনাথ কমলাকে লইয়া বনাশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় তাঁহারা কৌতুকবশতঃ একখানি নৌকা রাখিলেন, উপেন্দ্রনাথ সততই কমলাকে সেই নৌকায় বসাইয়া আপনি দাঁড় বাহিতেন—পরস্পর পরস্পরের প্রেমে অপরিসীম সুখলাভ করিতে লাগিলেন, এ সংসারে তাঁহাদিগের অপেক্ষা সুখী ও নিশ্চিন্ত কেহ জীবন ধারণ করেন নাই।

নগেন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত হইয়া ইচ্ছাপুরে বাস করিতে লাগিলেন, বৃদ্ধ বয়সে গুণবান্ পুত্র দেখিয়া সুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ সরলাকে বিবাহ করিয়া দুইটী বিস্তীর্ণ জমিদারীর একাধীশ্বর হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বের মত প্রজাবাৎসল্য, পূর্ব্বের মত অমায়িকতা এক্ষণও রহিল। এক্ষণও ছদ্মবেশে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া প্রজাদিগের অবস্থা জানিতেন, সাধ্যমতে সে অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে যত্নবান্ হইতেন।

সুরেন্দ্রনাথ আপন পুরাতন বন্ধু নবীনদাসকে আপনার দেওয়ান করিলেন,—রুদ্রপুরে বিশেশ্বরী পাগলিনী অমলার হাত দেখিয়া যাহা বলিয়া দিয়াছিল, তাহা যথার্থ হইল,—অমলা দেওয়ানের গৃহিণী হইলেন। অমলা

সরলাকে সেইরূপ ভগ্নীর ন্যায় ভালবাসিতে লাগিলেন,—তাঁহার পুরাতন বন্ধু "ইন্দ্রনাথের" সহিত সেইরূপ আমোদ-রহস্য করিতেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথকে কখনও সুরেন্দ্রনাথ বলিতেন না, "ইন্দ্রনাথ" ভিন্ন অন্য নামে ডাকিতেন না। সুরেন্দ্রনাথ তাহাতেই সম্মত,—তাহাতেই মহাহৃষ্ট।

আমাদের ইচ্ছা এই স্থানেই আখ্যায়িকা শেষ করি, কিন্তু জগতে সকলের কপালে সুখ ঘটে না, কাহারও কপালে সুখ থাকে, কাহারও ললাটে দুঃখ থাকে,—দুই একটী দুঃখের কথা না বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

পাঠক মহাশয়, জানেন, প্রতিহিংসা মহাশ্বেতার জীবনের গ্রন্থিস্বরূপ হইয়াছিল। বৃদ্ধাবস্থায় যে চিন্তায় ছয় বৎসর কাল অভিভূত ছিলেন, সে চিন্তা তাঁহার জীবনের প্রতিকৃতিস্বরূপ, জীবনের অবলম্বনস্বরূপ হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে সে চিন্তা শেষ হইল, জীবনের গ্রন্থি শিথিল হইল, সরলার বিবাহের কয়েকদিন পর কোন রোগ কি পীড়া বিনা মহাশ্বেতা কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

আর বিমলা! উন্নতচরিত্রা, ধর্ম্মপরায়ণা, রূপলাবণ্যসম্পন্না বিমলার কি হইল! হায়! যে দিন বিমলার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল, সেই দিন তাঁহার হৃদয় শূন্য হইয়াছিল, সেই দিন অবধি বিমলার পক্ষে জগৎসংসার অন্ধকারময় হইয়াছিল। সে দিন অবধি বিমলার কোন আশা ছিল না, কোন ভরসা ছিল না, কোন সুখের অভিলাষ ছিল না, কোন দুঃখের ভয় ছিল না। সেই দিন অবধি বিমলা উদাসীনা, হৃদয়ে পূর্ব্বে যে সকল প্রবৃত্তি ছিল, সকলই সেই দিন হইতে বিলীন হইয়াছিল, মানবজাতি যে মায়াজালে জড়িত হইয়া জগতে সুখ দুঃখ অনুভব করে, বিমলার সে মায়াজাল ছিন্ন হইয়াছিল!

বিমলা ভাবিলেন, "আমার হৃদয় শূন্য হইয়াছে।" সেটী ভুল, এক্ষণও একটী প্রবৃত্তি ছিল, নারীর মৃত্যু পর্য্যন্ত যে প্রবৃত্তি জাগরুক থাকে, বিমলার হৃদয়ে সে প্রবৃত্তিটী জাগরিত ছিল। যে দিন সরলার বিবাহ হইবে, সহসা বিমলার মনে অপরূপ ভাবের উদয় হইতে লাগিল; পূর্ব্বের কথা, পূর্ব্বের স্মৃতি, পূর্ব্বের ভাব, পূর্ব্বের প্রেম জাগরিত হইতে লাগিল।

সেই দিন সুরেন্দ্রনাথ একবার বিমলার সহিত দেখা করিলেন, বলিলেন, বিমলা, বিপদ্‌কালে তুমিই আমার সাহায্য করিয়াছিলে,—আপন প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া দুই বার আমাকে মৃত্যুর করালগ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়াছ, আমার আর একটী ভিক্ষা আছে, সেটীও পূরণ কর,—যতদিন

তোমার বিবাহ না হয়, পাটেশ্বরী হইয়া আমার গৃহে অবস্থান কর, সরলা তোমার চরণসেবা করিবে, জীবনের ঋণ যদি পরিশোধ করা যায়, আমি যত্ন ও শুশ্রূষা দ্বারা তাহা শোধ করিব। পরে যখন তোমার বিবাহ হইবে, সে দিন প্রস্থান করিও।"

শেষ কথাটী শুনিয়া বিমলা বলিলেন, "সে কবে?" বলিয়া একটু হাসিলেন। সে হাসি বিকট ও অস্বাভাবিক, উন্মাদিনীর মর্ম্মান্তিক বেদনা হইলে ওষ্ঠে যেরূপ হাস্য থাকে, এ সেইরূপ;—সুরেন্দ্রনাথ দেখিয়া চমকিত হইলেন।

ক্ষণেক পর সুরেন্দ্রনাথ বিমলার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া অতিশয় স্নেহের সহিত বিমলার হস্তদ্বয় আপনার হস্তে লইয়া করুণবচনে বলিতে লাগিলেন—

"বিমলা, তোমাকে দুঃখিনী দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, আমার জীবনধারণ করিতে আর ইচ্ছা হইতেছে না। জগতে ধর্ম্মপরায়ণা পরোপকারিণীদিগের যদি এ অবস্থা হয়, তাহা হইলে এ অসার সংসারে কে বাস করিবে? তুমি আমার জন্য এরূপ কষ্ট পাইয়াছ, আমাকে এত বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছ, তোমার দুঃখ যদি দেখিতে হইল, তখন আর এ সংসারে আমার সুখ নাই; মানে, ঐশ্বর্য্যে, সম্ভ্রমে, প্রেমে আমার সুখ নাই; পিতা, পিত্রালয়, সকল ত্যাগ করিয়া বনবাস করাই বিধেয়। বিমলা শান্ত হও, আমাকে চিরকালের জন্য দুঃখী করিও না, আপনাকে চিরদুঃখী করিও না।"

বিমলা শান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার উন্মত্ততার আর কিছুই চিহ্ন নাই, নীরবে বসিয়া রহিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের করস্পর্শে তাঁহার হস্তদ্বয় ঘর্ম্মে আপ্লুত হইতেছিল, সুরেন্দ্রনাথের অঙ্গে সংস্পৃষ্ট তাঁহার অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া সমস্ত বসন সিক্ত করিতেছিল, আর সুরেন্দ্রনাথের শোকপরিপূর্ণ করুণ মধুর বচনে তাঁহার নয়নধারা অবারিত বহির্গত হইয়া বক্ষঃস্থলের বসন একবারে সিক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ অতিশয় দুঃখিত হইলেন, কিঞ্চিৎ আশ্বাসও পাইলেন, কেননা যে ক্রন্দন করিতে পারে, ক্রমশঃ তাহার দুঃখের লাঘব হয়। পুনরায় সস্নেহ-বচনে বলিতে লাগিলেন;—

"বিমলা, শান্ত হও; এ জগতে কেবল সুখের জন্য কয় জন আইসে, কেবল দুঃখের জন্য কয় জন আইসে? চিরকাল কাহারও সুখ তিষ্ঠে না। পতি বা পত্নীবিয়োগ, ধনক্ষয়, মানহানি, আশায় নৈরাশ, প্রিয়তমের বিচ্ছেদ,

পুত্রের মৃত্যু, আত্মীয় কুটুম্বের যাতনা, এইরূপ সহস্র বিপদের একটী না একটীতে অতি সুখী লোকেরও সুখ নাশ করে, অতিশয় আনন্দের গৃহকেও শোকে পরিপূর্ণ করে, মানবজাতিকে ইহকালে সকলই মায়া ও ভ্রমময়, এই-রূপ শিক্ষা দেয়। সেইরূপ কাহারও দুঃখ চিরকাল থাকে না। অতিশয় হত-ভাগিনী অনাথারও শোকনিশার প্রভাত আছে, করুণাময় পরমেশ্বর সকল পীড়ার ঔষধ দিয়াছেন, সকল বিপদেরই উদ্ধারের উপায় দিয়াছেন, সকল শোকেরই শান্তি দিয়াছেন। আমাদিগের সকলকেই নিজ নিজ দুঃখভার বহন করিতে হয়। বিমলা সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর, অদ্যকার দুঃখ কল্য থাকিবে না।"

বিমলা নীরবে বসিয়াছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ মনে করিতেছিলেন যে, বিমলা তাঁহার কথা শ্রবণ করিতেছেন, কিন্তু বিমলার সে দিকে মন ছিল না, কেবলমাত্র সুরেন্দ্রনাথের নিকটে বসিয়া আছেন এইমাত্র জ্ঞান ছিল, কেবলমাত্র সুরেন্দ্রনাথের প্রবোধবাক্যের সঙ্গীত ও মধুরতা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ে কোন মধুর চিন্তার উদ্রেক করিতেছিল। বিমলা সেই মধুর সুখের চিন্তায় একাগ্রচিত্তে লিপ্ত ছিলেন, স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া প্রেমের সফলতার কোন স্বপ্নে লিপ্ত ছিলেন,—এক্ষণেই তিনি যথার্থ সংজ্ঞাশূন্যা ও পাগলিনী হইয়াছিলেন। যখন সুরেন্দ্রনাথের বচনের শেষ হইল, তখন সেই মধুর চিন্তাসূত্র সহসা ছিন্ন হইল, স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় সুরেন্দ্রনাথের দিকে দেখিলেন, সহসা পাগলিনীর ন্যায় সুরেন্দ্রনাথের দিকে হস্ত প্রসারণ করিলেন, তৎক্ষণাৎ বিমলার সম্পূর্ণ চৈতন্য হইল, অমানুষিক মানসিক চেষ্টার দ্বারা হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিলেন। সহস্র স্পন্দন সুমিষ্ট ভাবে মুখ একবার রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, আবার সহস্র বিকট নৈরাশ্যজনক ভাবে মুহূর্তের মধ্যে সে রক্ত অপসারিত হওয়ায় বদনমণ্ডল একেবারে পাণ্ডুবর্ণ হইল;—"সুরেন্দ্রনাথ, আমি চলিলাম, অভাগিনীকে স্মরণ রাখিও।" এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইলেন।

সুরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ জলসেচন ও ব্যজন করিয়া তাঁহাকে চৈতন্যদান করিবার চেষ্টা করিলেন,—সে চেষ্টা বৃথা, বিমলার জীবনগ্রন্থি ছিন্ন হইয়া-ছিল,—কয়েক মাস হইতে প্রেমের জ্বলন্ত পাবক নিভৃত রাখিবার চেষ্টায় হৃদয় স্তরে স্তরে দগ্ধ হইতেছিল,—আজি সে বীরান্তঃকরণ বিদীর্ণ হইল।

সন্ধ্যাকাল সমাগত। শঙ্খধ্বনিতে গ্রাম পরিপূর্ণ হইল, শুভকার্য্যো-পলক্ষে স্ত্রীলোকের কণ্ঠধ্বনি নৈশ গগনে উত্থিত হইতে লাগিল, জমীদার-পুত্রের বিবাহোপলক্ষে চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামবাসী ও গ্রামবাসিনী একত্র হইয়া

আনন্দধ্বনিতে গ্রাম পরিপূর্ণ করিল। সরলা (বিমলার মৃত্যুবার্ত্তা তাহাকে কেহ অবগত করায় নাই।) অপরিসীম আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিল,—কেবল সুরেন্দ্রনাথের ভ্রূকুঞ্চিত ললাট নৈরাশের অনপনেয় অঙ্কে অঙ্কিত হইয়া রহিল। সেইদিন আপন জীবনদাত্রীকে চিতায় স্থাপিত হইতে দেখিয়াছিলেন, ধূ ধূ করিয়া অগ্নিশিখা প্রহরৈক সময়ের মধ্যে সেই শরীরকে ভস্মসাৎ করিল, তাহা দেখিয়াছিলেন,—সেই দর্শন দৃষ্টি করিয়া তিনি বিবাহ-গৃহে প্রবেশ করিলেন। চতুর্দ্দিকে আনন্দের দৃশ্যে তিনি কেবল সেই অগ্নিরাশি দেখিতে লাগিলেন, আনন্দের শব্দে কেবল সেই দাহের শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। বিজ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, এ সংসারে যত দম্ভ, যত আনন্দ, যত গর্ব্ব, যত ঘোরঘটা, যত হাস্যধ্বনি, সকলই সেই ভীষণ চিতা-শব্দের প্রারম্ভ ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না।

তিনশত বৎসর অতীত হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের বিপুল বংশ এক্ষণে লোপ হইয়াছে। বিস্তীর্ণ সমুদ্রে বীচিমালার ন্যায় নূতন বংশ ও নূতন লোক এক্ষণে তাঁহাদের স্থানে অবস্থিতি করিতেছে।

সমাপ্ত।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Street, Calcutta.

জীবন-সন্ধ্যা।

স্বদেশপ্রিয়, অমায়িক, উদারচরিত্র,

জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত।

প্রিয় ভ্রাতঃ!

এই সংসার-স্বরূপ ভীষণ কার্য্যক্ষেত্রে তোমার স্নেহ, তোমার অমায়িক ভালবাসা, আমার জীবনের শান্তিস্বরূপ হইয়াছে। শৈশবে ঐ পবিত্র স্নেহে আমি পুষ্ট হইয়াছিলাম, বাল্যকালে ঐ ভালবাসায় আমি চিরস্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল হইয়াছিলাম। এখনও জীবনের নানা উদ্যম, নানা আকাঙ্ক্ষায়, যখন ক্লান্ত হই, বহুদূরে, প্রবাসে, জীবনের অনন্ত চেষ্টা-পরম্পরায়, যখন শ্রান্ত হই, প্রণয়ের অলীকতায় বা সংসারের বাহ্যাড়ম্বরে যখন বিরক্ত হই,—তখন ঐ আদর্শরূপ নির্ম্মল চরিত্র, ঐ অকৃত্রিম, অমায়িক স্নেহের কথা চিন্তা করি, আমার হৃদয় শীতল হয়,—আমি শান্তি লাভ করি।

জগৎ এ সমস্ত কথা জানেন না, একথা কাহাকে বলিব, কে বুঝিবে? জগতে নানা আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিতে পাই; ধন, মান, খ্যাতি, ক্ষমতার জন্য অনন্ত চেষ্টা ও উদ্যম দেখিতে পাই; এই চেষ্টায় ভ্রাতাকে ভ্রাতা ঠেলিয়া যাইতেছে, পিতাকে পুত্র ঠেলিয়া যাইতেছে! এ ভীষণ কার্য্যক্ষেত্রে তোমার ন্যায় ঋষিতুল্য, অমায়িক লোক অলক্ষিত, অপরিচিত, অনাদৃত!

শৈশব ও বাল্যকালের একমাত্র সহচর! জীবনের প্রথম ও প্রিয়তম সুহৃদ্! ত্রিংশৎ বৎসর যে তোমার অতুল স্নেহে প্রফুল্লতা ও শান্তি লাভ করিয়াছে, অদ্য সে তোমাকে এই সামান্য উপহার দান করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিল।

কাটওয়া,
১লা জুলাই, ১৮৭৯।

তোমার চিরস্নেহাভিলাষী
শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

জীবন-সন্ধ্যা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আহেরিয়া।

১৫৭৬ খৃঃ অব্দের ফাল্গুন মাসের প্রথম দিবসে মেওয়ার প্রদেশের অভ্যন্তরে সূর্য্যমহলনামক পর্ব্বতদুর্গে মহাকোলাহল শ্রুত হইয়াছিল। একটী উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গে এই দুর্গ নির্ম্মিত, দুর্গের প্রাচীর হইতে নিম্নে ও চারিদিকে কেবল পাদপপূর্ণ পর্ব্বতশ্রেণী ও নিবিড় বৃক্ষাচ্ছাদিত উপত্যকা বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইত। প্রাতঃকালের বালসূর্য্য-কিরণ এই অনন্ত পর্ব্বত ও বৃক্ষশ্রেণীকে সুবর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে এবং প্রাতঃকালের মন্দ মন্দ বায়ু হিল্লোলে সেই অনন্ত পাদপশ্রেণী হইতে সুন্দর মর্ম্মর শব্দ নিঃসৃত হইতেছে। পত্রে পত্রে শিশির বিন্দু মুক্তাসৌন্দর্য্য অনুকরণ করিতেছে, বসন্তের পক্ষীগণ ডালে ডালে গান করিতেছে, এবং সেই দুর্গপ্রাচীর হইতে যতদূর দেখা যায়, পর্ব্বত ও উপত্যকা সূর্য্যকিরণে নবস্নাত হইয়া শোভা পাইতেছে। ঝন্‌ঝনা শব্দে দুর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, শত অশ্বারোহী বর্শা, অসি ও ঢাল লইয়া বজ্রনাদে দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন। তীরবেগে সেই অশ্বারোহিগণ সেই দুর্গের পর্ব্বত অধিরোহণ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের নিষ্কোষিত অসি ও শাণিত বর্শাফলা সূর্য্যকিরণে ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল, অশ্বখুরাহত শিলাখণ্ড হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল। মৃগগামী অশ্বগণ দুই একটী জলপ্রপাতের উপর দিয়া হেলায় লম্ফ দিয়া ছুটিল। অচিরে অশ্বারোহিগণ পর্ব্বততলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, একেবারে হুহুঙ্কারনাদে বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সে নাদ পর্ব্বত হইতে পর্ব্বত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইল।

অদ্য আহেরিয়া; অর্থাৎ বসন্ত প্রারম্ভে বাৎসরিক মৃগয়ার দিন, অদ্যকার মৃগয়ার ফলাফল দ্বারা বৎসরের যুদ্ধের ফলাফল পরিগণিত হইবে

সূর্য্যমহলের দুর্গেশ্বর দুর্জ্জয়সিংহ শত অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় বহিষ্কৃত হইয়াছেন। মেওয়ার প্রদেশে চন্দাওয়ৎকুল আহবে ও বিপদে অগ্রগামী, সেই প্রসিদ্ধ বংশমধ্যে দুর্জ্জয়সিংহ অপেক্ষা দুর্দ্দমনীয় সাহসী যোদ্ধা বা ভীষণপ্রতিজ্ঞ সেনানী কেহ ছিল না। তিনিই অশ্বারোহিদিগের মধ্যে অগ্রগামী। দেখিলে বয়স ত্রিংশৎ বৎসর বলিয়া বোধ হয়, আকৃতি দীর্ঘ, নয়নদ্বয় জলন্ত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল, শরীর অসুর-বলে বলিষ্ঠ। দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ বর্শা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; তাঁহার প্রত্যেক পেশী স্ফীত ও যেন লৌহনির্ম্মিত। দুর্জ্জয়সিংহের সহচরগণও সেই চন্দাওয়ৎ-বংশোদ্ভূত এবং দুর্জ্জয়সিংহের অযোগ্য সহচর নহে।

মেওয়ার প্রদেশের সহিত দিল্লীশ্বরের সহিত অচিরে মহাযুদ্ধ সম্ভব। মহারাণা এই জন্য সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিতেছিলেন। চন্দাওয়ৎ-কুলপতি সালুম্ব্রার অধীশ্বর রাওয়ৎকৃষ্ণসিংহ রাণার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন, তিনিই দুর্জ্জয়সিংহকে অচিরে আপন সৈন্য লইয়া সালুম্ব্রায় উপস্থিত হইতে আদেশ করিয়াছিলেন। সালুম্ব্রার অধীশ্বরের আদেশ সমস্ত চন্দাওয়ৎ যোদ্ধার শিরোধার্য্য; অদ্য আহেরিয়া; অদ্য মৃগয়া সমাপন করিয়া কল্য প্রাতে দুর্জ্জয়সিংহ সসৈন্যে সালুম্ব্রাভিমুখে যাত্রা করিবেন।

একদণ্ড কালের মধ্যে অশ্বারোহিগণ একটী নিবিড় বনের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থান অতিশয় নিস্তব্ধ।

কয়েক জন পাইককে পূর্ব্ব দিবস পশুর সন্ধানে এই স্থানে পাঠান হইয়াছিল; দিনের আহারের জন্য কিছু খাদ্যদ্রব্যও এই স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। অশ্বারোহিগণ ধীরে ধীরে আরও নিবিড় কাননে প্রবেশ করিতে লাগিলেন; খাদ্যদ্রব্য ও ভৃত্য সমস্ত এই স্থলেই রহিল।

পাইকগণ একে একে আসিয়া বনচর পশুর কোনও অনুসন্ধান না পাওয়ার সংবাদ দিল, কিন্তু অশ্বারোহিগণ তাহাতেও ভগ্নোৎসাহ না হইয়া ক্রমে বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। সে বনের সৌন্দর্য্য অতিশয় মনোহর। কোথায় বা সূর্য্যকর পত্রের ভিতর দিয়া আসিয়া বনপুষ্প বা দূর্ব্বার সহিত ক্রীড়া করিতেছে; কোথায় বা বন এরূপ নিবিড় যে দিবাভাগেই অন্ধকারের ন্যায় বোধ হইতেছে। কখন পর্ব্বত ও শিলা-খণ্ডের উপর দিয়া, কখন সুন্দর ঝর্ণার পার্শ্ব দিয়া, কখন অন্ধকার ঝোপের ভিতর দিয়া, কখন বা পরিষ্কার প্রান্তর দিয়া অশ্বারোহিগণ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখন দ্রুতবেগে, কখন ধীরে ধীরে, কখন নিঃশব্দে ও কখন উচ্চগীত বা হাস্যরবে বন শব্দিত করিয়া যাইতে লাগিলেন। বসন্তকালের

প্রারম্ভে ক্ষেত্র, বৃক্ষ, পর্ব্বত, উপত্যকা সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে। অশ্বারোহিগণও জীবনের বসন্তকালের উদ্বেগ ও বীরমদে মত্ত হইয়া মৃগয়ার বাহির হইয়াছেন, অশ্বগণও যেন অশ্বারোহীর ন্যায় গর্ব্বিত ও তেজস্বী। সকলই উৎসাহে পূর্ণ, সকলই গর্ব্বিত, সকলই আনন্দময়। মৃগয়ার ন্যায় উৎসাহপূর্ণ ব্যবসায় রাজস্থানে আর নাই, আহেরিয়ার ন্যায় আনন্দময় দিন আর নাই।

কতক্ষণ বনের ভিতর বিচরণ করিয়া অশ্বারোহিগণ একটী প্রান্তরে পড়িলেন; সেই প্রান্তরের সম্মুখে একটী পর্ব্বতদুর্গ প্রায় বৃক্ষ-আবৃত রহিয়াছে। দুর্জ্জয়সিংহ অমাত্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"ঐ না পাহাড়জী ভূমিয়ার দুর্গ দেখা যায়?"

অমাত্য বলিলেন, "হাঁ!" দুর্জ্জয়সিংহ সেই নাম শুনিয়া ঘৃণাসূচক হাস্য করিলেন। অমাত্য সে হাস্যের অর্থ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "এরূপ দুর্গ যদি নিকৃষ্ট ভূমিয়াদিগের হস্তে না থাকিয়া প্রকৃত যোদ্ধাদিগের হস্তে থাকিত, তাহা হইলে মহারাণা এই যুদ্ধকালে অধিক সহায়তা পাইতেন।"

দুর্জ্জয়। ভূমিয়াগণ রণশিক্ষা করে নাই, কিন্তু সময়ে সময়ে আপন দুর্গ ও আবাসস্থল শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিতে যথোচিত সাহস প্রকাশ করে।"

অমাত্য। "সত্য, কিন্তু বর্শাচালন অপেক্ষা লাঙ্গল চালনেই অধিক তৎপর।"

সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। আর একজন অশ্বারোহী কহিলেন, "এবং দুর্গ রক্ষা হইতে ভূমি রক্ষায় অধিক তৎপর। যোদ্ধা কখন কখন আপন দুর্গচ্যুত হয়েন, কিন্তু ভূমিয়ার ভূমি পুরুষানুক্রমে তাহার সন্তানসন্ততি ভোগ করে; শত্রুতেও লইতে পারে না, রাণাও লইতে পারেন না।"

অমাত্য। "ইঁদুর মৃত্তিকায় একবার প্রবেশ করিলে তাহাকে বাহির করা দুঃসাধ্য।" পুনরায় সকলে হাস্য করিয়া উঠিলেন।

এইরূপ আনন্দ ও উৎসাহে অশ্বারোহিগণ অনেকক্ষণ বিচরণ করিলেন; জঙ্গল, ঝোপ, পর্ব্বত, গহ্বর, সমস্ত অন্বেষণ করিলেন; যে যে স্থানে পূর্ব্ব বৎসরে বরাহ দেখা গিয়াছিল, সমস্ত দৃষ্টি করিলেন। নিবিড় অন্ধকারময় বন, সুন্দর পর্ব্বত-তরঙ্গিণীর তীর, শান্ত শব্দশূন্য হ্রদতট, সমস্ত বিচরণ করিলেন।

প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে, কিন্তু বনচর কোনও পশুর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পাইকগণ নিবিড় জঙ্গলের ভিতর হইতে একে একে ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কেহই একটী পশুও দেখিতে পায় নাই। সূর্য্যের উত্তাপ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে, অশ্বগণের শরীর ফেণপূর্ণ হইয়াছে, আরোহিগণও ললাটের স্বেদ মোচন করিয়া পরস্পরের দিকে চাহিতেছেন। "অদ্য বন কি বরাহশূন্য?" "একটী মৃগও দেখিতে পাইলাম না।" "এ বৎসর কি সূর্য্যমহলের অমঙ্গলের জন্য?" এইরূপ নানা কথা হইতে লাগিল। ক্ষণেক চিন্তা করিয়া তুর্জ্জয়সিংহ কহিলেন,—"বন্ধুগণ! আমাদের অশ্বগণ শ্রান্ত, এক্ষণ আর বৃথা উদ্দেশ আবশ্যক নাই। চল অশ্বগণকে কিছু বিশ্রাম দি, আমরাও বিশ্রাম করি; পরে যদি এই প্রশস্ত বনপ্রদেশে একটীও বরাহ লুক্কায়িত থাকে, দুর্জ্জয়সিংহ তাহা হনন করিবে, নচেৎ আর বর্শা ধারণ করিবে না।" সকলেই এই কথায় সম্মতি প্রকাশ করিয়া পূর্ব্ববিবৃত নিবিড় নিকুঞ্জবনের দিকে গমন করিলেন।

সে স্থলটী অতিশয় রমণীয়। পাদপশ্রেণী এরূপ নিবিড় পত্রপুঞ্জে আবৃত রহিয়াছে যে, দ্বিপ্রহরের সূর্য্যরশ্মি তাহা ভেদ করিতে পারিতেছে না; কেবল স্থানে স্থানে পত্ররাশির মধ্য দিয়া যেন এক একটী সুবর্ণরেখা ভূমি পর্য্যন্ত লম্বিত রহিয়াছে। ভূমি পরিষ্কৃত হইয়াছে, নবদূর্ব্বাদল সেই শ্যামল সুস্নিগ্ধ ছায়াতে অতিশয় কমনীয় রূপ ধারণ করিয়াছে। সেই নিবিড় বনে শব্দমাত্র নাই, দ্বিপ্রহর দিবাস সেই নিকুঞ্জবন শান্ত, শব্দশূন্য, নিস্তব্ধ। এরূপ নিস্তব্ধ যে, বৃক্ষ হইতে দুই একটী শুষ্কপত্র পতিত হইলে তাহার শব্দ শুনা যাইতেছে, দুই একটী বনবিহঙ্গিনীর দ্বিপ্রহরের স্তিমিত রব শুনা যাইতেছে, এবং দূরে একটী নির্ঝরিণীর সুদুরশ্রুত সুস্বর অনন্ত সঙ্গীত ধীরে ধীরে কর্ণে পতিত হইতেছে! শ্রান্ত অশ্বারোহিগণ ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া সেই স্থানের শোভা সন্দর্শন করিলেন। বোধ হইল, যেন কোন বনদেবীর পূজার জন্য প্রকৃতি অনন্ত স্তম্ভসারস্বরূপ পাদপশ্রেণী দ্বারা এই শান্ত হরিদ্বর্ণ মন্দির প্রস্তুত করিয়াছেন,—নির্ঝরিণী স্বয়ং বীণাবাদ্য করিতেছেন।

যোদ্ধাগণ অধিরোহণ করিয়া সেই শ্যামল দূর্ব্বাদলের উপর উপবেশন করিলেন। ক্ষণেক শ্রমদূর করিয়া নির্ঝরের জলে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিলেন; অচিরে সকলে একত্র বসিয়া আহার আরম্ভ করিলেন।

সেই দূর্ব্বাদলের উপর দুর্গেশ্বর ও তাঁহার যোদ্ধাগণ সানন্দে আহার করিতে বসিলেন। পুরাতন রীতি অনুসারে দুর্গেশ্বর সাহসী যোদ্ধাদিগকে "দোনা," অর্থাৎ আপন পাত্র হইতে আহার পাঠাইতে লাগিলেন, তাঁহা-

রাও এই সম্মানচিহ্ন সাদরে গ্রহণ করিলেন। নানারূপ কথা ও হাস্যধ্বনিতে বন ধ্বনিত হইল। পূর্ব্বঘটনার, পূর্ব্বযুদ্ধের কথা হইতে লাগিল। কিরূপে উপস্থিত যোদ্ধাগণ দুর্গপ্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, কিরূপে শত্রুকে হনন করিয়াছিলেন, সালুম্ব্রার প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, স্বয়ং রাণার সাধুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সমস্ত কথা হইতে লাগিল। এবার মেওয়ার প্রদেশের বহু শত্রু, স্বয়ং দিল্লীশ্বর আসিতেছেন। মাড়ওয়ার, অম্বর, বিকানীর ও বুন্দির রাজাগণ ম্লেচ্ছের সহিত যোগ দিয়া মেওয়ার আক্রমণে আসিতেছেন। কিন্তু রাণার অবশ্য জয় হইবে। অথবা যদি পরাজয় হয়, চন্দাওয়ৎকুল সেই যুদ্ধভূমিতে প্রাণদান করিবে, চন্দাওয়ৎকুল পলায়ন জানে না। দুর্জ্জয়সিংহ একথা বলিতে না বলিতে যোদ্ধারা উৎসাহে ও উল্লাসে সাধুবাদ করিলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ বলিলেন,—"আট বৎসর পূর্ব্বে যখন এই আকবরসাহ চিতোর হস্তগত করেন, রাণা উদয়সিংহ দুর্গত্যাগ করিযাছিলেন, কিন্তু সালুম্ব্রাপতি সাহীদাস দুর্গত্যাগ করেন নাই, চন্দাওয়ৎকুলেশ্বর দুর্গত্যাগ করেন নাই। চরণদেব! সেদিনকার কথা একবার যোদ্ধাগণকে শুনাও, চন্দাওয়ৎকুল কিরূপে যুদ্ধ করে একবার শ্রবণ করি।"

আহেরিয়ার দিনে আহারের সময় চরণদেব অনুপস্থিত থাকেন না। দুর্গেশ্বরের অভিপ্রায়মতে চরণদেব সাহীদাসের বীরত্ব-গীত আরম্ভ করিলেন।

"যোদ্ধাগন! আপনারা কেহ কেহ সেদিনকার যুদ্ধ দেখিয়াছেন, দুর্জ্জয়সিংহ সালুম্ব্রার দক্ষিণহস্ত ছিলেন, সাহীদাসের বীরত্ব দেখিয়াছেন। চিতোরের সূর্য্যদ্বারই চন্দাওয়ৎদিগের রণস্থল, সেই সূর্য্যদ্বার সাহীদাস সে দিন ত্যাগ করেন নাই, সেই সূর্য্যদ্বার চন্দাওয়ৎকুল ত্যাগ করে নাই।

"বায়ু-তাড়িত হইয়া উদয় সাগরের ক্ষিপ্ত তরঙ্গ যখন কূলে আঘাত করে তাহা দেখিয়াছ, তুর্কীদিগের অগণ্য সৈন্য সেইরূপ সূর্য্যদ্বারে বার বার আঘাত করিতে লাগিল; ভীষণরবে সেই সৈন্যতরঙ্গ দুর্গের দিকে ধাবমান হইল, কিন্তু চন্দাওয়ৎরেখায় আহত হইয়া বার বার প্রতিহত হইল। চিতোরের সূর্য্যদ্বারই চন্দাওয়ৎকুলের রণস্থল, চন্দাওয়ৎ সে দ্বার ত্যাগ করে নাই, সালুম্ব্রা সে দ্বার ত্যাগ করেন নাই।

"বনে অগ্নি লাগিলে কিরূপে লেলিহমান অগ্নিজিহ্বা আকাশপথে আরোহণ করে, তাহা দেখিয়াছ; তুর্কীদিগের সৈন্য সেইরূপ দুর্গকে পরিবেষ্টন করিয়া সেইরূপ বার বার দুর্গোপরি ধাবমান হইতে লাগিল।

চন্দাওয়ৎ অল্পসংখ্যক, কিন্তু চন্দাওয়ৎ হীনবল নহে, বার বার সেই ভীষ আক্রমণকারীদিগকে প্রতিহত করিল, সূর্য্যদ্বার ত্যাগ করিল না। চিতোরের সূর্য্যদ্বারই চন্দাওয়ৎকুলের রণস্থল, চন্দাওয়ৎ সে দ্বার ত্যাগ করে নাই, সালুম্‌ব্রা সে দ্বার ত্যাগ করেন নাই।

"বর্ষাকালের মেঘরাশি অপেক্ষা তুর্কীদিগের সৈন্য অধিক। রাশি রাশি হত হইল, পুনরায় রাশি রাশি সেই দ্বার বজ্রনাদে আক্রমণ করিল। চন্দাওয়ৎকুল অসুরবীর্য্য প্রকাশ করিয়া সেই পর্ব্বতচূড়ায় চিরনিদ্রায় শয়িত হইল, কিন্তু চন্দাওয়ৎকুল প্রতিহত হইল না। সাহীদাস তখনও একাকী শতের সহিত যুঝিতেছিলেন, সাহীদাস চিতোরের জন্য হৃদয়ের শেষ রক্তবিন্দু দান করিয়া ছিন্নতরুর ন্যায় পতিত হইলেন। দুর্জ্জয়সিংহ সালুম্‌ব্রা রক্ষার্থ যুঝিতেছিলেন, আহত ও অচেতন হইয়া পতিত হইলেন। যোদ্ধাগণ! দুর্জ্জয়সিংহের ললাটে তুর্কীর খড়্গ-অঙ্ক এখনও দেখিতে পাইতেছ; চন্দাওয়ৎকুল সমস্ত হত বা আহত হইল, কিন্তু সেই সূর্য্যদ্বার ত্যাগ করে নাই। চিতোরের সূর্য্যদ্বার চন্দাওয়ৎকুলের রণস্থল, চন্দাওয়ৎকুল সে দ্বার ত্যাগ করে নাই, সালুম্‌ব্রা সে দ্বার ত্যাগ করেন নাই।"

এই গীত হইতে হইতে চন্দাওয়ৎ যোদ্ধাদিগের নয়ন হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতেছিল। গীত শেষ হইলে সকলে হুহুঙ্কারনাদে বন পরিপূরিত করিল। তন্মধ্যে দুর্জ্জয়সিংহ ভীষণনাদে কহিলেন, "যোদ্ধাগণ! অদ্য আমাদিগের চারিদিকে বিপদ্‌রাশি, কিন্তু চন্দাওয়ৎকুল বিপদের অপরিচিত নহে। অদ্য আমাদিগের চিতোর নাই, কিন্তু সহস্র পর্ব্বতশেখর ও পর্ব্বতগহ্বর শিশোদিয়ার হস্ত হইতে কে লইতে পারে? মহারাণা উদয়সিংহ হত হইয়াছেন, কিন্তু মহারাণা প্রতাপসিংহ দুর্ব্বলহস্তে অসিধারণ করেন না। মহারাণা প্রতাপসিংহের জয় হউক, শিশোদিয়া জাতির জয় হউক, চন্দাওয়ৎকুলের জয় হউক।"

ভীষণনাদে শত যোদ্ধা এই কথা উচ্চারণ করিলেন, সে নাদ বন অতিক্রম করিয়া মেওয়ারের অনন্ত পর্ব্বতে প্রতিধ্বনিত হইল।

ভোজন সাঙ্গ হইল, সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। দুর্জ্জয়সিংহ পুনরায় বলিলেন—

"চরণদেব! আমরা এক্ষণে পুনরায় মৃগয়ায় যাইব; একটী আহেরিয়ার গীত শুনাও,—যেন অদ্য আমাদিগের আহেরিয়া নিষ্ফল না হয়।" চরণদেব পুনরায় বীণা হস্তে লইলেন, ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া ক্ষণেক চিন্তা করিলেন, পরে আরম্ভ করিলেন—

"যোদ্ধাগণ! আট বৎসর হইল দিল্লীশ্বর চিতোর লইয়াছেন, কিন্তু দিল্লী ও শিশোদিয়ার এই প্রথম বিবাদ নহে। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে আর একজন দিল্লীশ্বর আর একবার চিতোর লইয়াছিলেন, কিন্তু চিতোর শিশো-দিয়ার কণ্ঠমণি, চিতোর তুর্কীহস্তে কতদিন থাকে? সেবার হামির এই কণ্ঠরত্ন তুর্কীদিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন; এবার প্রতাপসিংহ লইবেন। হামিরের জন্মকথা শ্রবণ কর, আহেরিয়ার একটী গীত শ্রবণ কর।

"লক্ষ্মণসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র উরুসিংহ। চিতোর আক্রমণের সময় সময় যুবরাজ উরুসিংহ প্রথমে দুর্গরক্ষার জন্য প্রাণদান করেন, তাহা শিশো-দিয়ার মধ্যে কোন্ বীর না জানেন? চিতোর আক্রমণের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই উরুসিংহ একদিন আহেরিয়ায় বহির্গত হইয়াছিলেন; শত যোদ্ধা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মৃগয়ায় বহির্গত হইয়াছিলেন। আহেরিয়ার তুল্য রাজপুতের আর কি আনন্দ আছে?

"অন্দাত্তয়া কানন যুবকদিগের বীরনাদে প্রতিধ্বনিত হইল,—তাঁহারা একটী বরাহের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন। পর্ব্বতগহ্বর, নির্ঝর, তুঙ্গ-শৃঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া বরাহ ধাবমান হইল, মহানাদে যোদ্ধাগণ ধাবমান হই-লেন; আহেরিয়ার তুল্য রাজপুতের আর কি আনন্দ আছে?

"অনেকক্ষণ পর সেই বরাহ এক শস্যক্ষেত্রের ভিতর লুকাইল, শস্য দ্বাদশ হস্ত উচ্চ, বরাহ আর দেখা গেল না। একজনমাত্র দরিদ্র রমণী একটী মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া শস্য রক্ষা করিতেছিলেন; রমণী বীরদিগের নৈরাশ দেখিয়া বলিলেন—'সম্বরণ করুন, আমি বরাহ শস্যক্ষেত্র হইতে বাহির করিয়া দিতেছি।' যোদ্ধাগণ দেখিতে লাগিলেন।

"একি মানুষী না নগবালা মহিষমর্দ্দিনী? নারী-বাহুতে কি এ বল সম্ভবে? নারী-হৃদয়ে কি এ বীর্য্য সম্ভবে? রমণী একটী শস্য উৎপাটন করিয়া তাহার অগ্রভাগ সূচির ন্যায় শাণিত করিলেন, সেই অপূর্ব্ব বর্শা-দ্বারা বরাহকে বিদ্ধ করিয়া যোদ্ধাদিগের সম্মুখে আনিয়া দিলেন; বিস্মিত যোদ্ধাগণ বাক্যশূন্য হইয়া রহিলেন।

"যোদ্ধাগণ আহারে বসিয়াছেন, সহসা পার্শ্বস্থ একটী অশ্বের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন, দেখিলেন, অশ্বের একটী পদ একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। সেই দরিদ্র রমণী মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া শস্যক্ষেত্র হইতে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিয়া পক্ষী তাড়াইতেছিলেন, তাহার এক টুকরা মৃত্তিকা অশ্বপদে লাগিয়াছিল, কিন্তু সে বাহু নিক্ষিপ্ত মৃত্তিকায় অশ্ব আহত ও মৃতপ্রায় হইয়াছিল।

"যোদ্ধাগণ আহারাদি সমাপন করিয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে যাইতেছেন, দেখিলেন, সেই দরিদ্র রমণী মস্তকে দুগ্ধপূর্ণ পাত্র লইয়া যাইতেছেন ও দুই হস্তে দুইটী মদমত্ত মহিষকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। বিস্মিত উরুসিংহ রমণীর বল পরীক্ষার জন্য একজন যোদ্ধাকে সেই রমণীর দিকে বেগে অশ্বধাবন করিতে বলিলেন; সেই অশ্ব তাহার উপর আসিয়া পড়িবে, রমণী বুঝিতে পারিলেন; কিছুমাত্র ভীত না হইয়া দুগ্ধ মস্তক হইতে না নামাইয়া কেবল একটী মহিষকে অশ্বের শরীরের উপর ঠেলিয়া দিলেন; মুহূর্ত্তমধ্যে অশ্ব ও অশ্বারোহী ভূমিসাৎ হইল।

"উরুসিংহ অনুসন্ধানে জানিলেন যে, সে কুমারী চোহানজাতির চন্দানবংশের এক দরিদ্র লোকের কন্যা। উরুসিংহ সেই কন্যাকে বিবাহ করিলেন, সেই কন্যার পুত্র বীরচূড়ামণি হামির। আলাউদ্দীন যখন চিতোর অধিকার করেন, তখন যুবরাজ উরুসিংহপিতা লক্ষ্মণসিংহ জীবিত থাকিতেও প্রথমে জীবনদান করেন, পরে রাণা লক্ষ্মণসিংহ স্বয়ং প্রাণদান করেন; কিন্তু চিতোর রক্ষা হইল না, যবনেরা চিতোর পাইল। দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক হামির তখন মাতার সহিত মাতুলালয়েই ছিলেন; চিতোর তুর্কীহস্তে কতদিন থাকে? বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া হামির চিতোর উদ্ধার করিলেন।

"বীরগণ! উরুসিংহের আহেরিয়ার ফল চিতোর উদ্ধার। অদ্য দুর্জ্জয়সিংহ আহেরিয়ায় বহিষ্কৃত হইয়াছেন, সকলে দৃঢ়হস্তে বর্শা ধারণ কর,—আহেরিয়ায় সফল হও, পুনরায় চিতোর উদ্ধারেও সফল হইবে।"

লম্ফ দিয়া যোদ্ধাগণ অশ্বে আরোহন করিলেন, তীরবেগে বর্শাহস্তে শত যোদ্ধা ধাবমান হইলেন। এবার যোদ্ধাগণ নিরাশ হইলেন না; তিন চারি দণ্ড পর্ব্বত, বন ও উপত্যকা অন্বেষণ করিতে করিতে একটী ঝোপ হইতে একটী প্রকাণ্ড বরাহ দেখা দিল। বরাহের বৃহৎ আকৃতি ও অসাধারণ বল দেখিয়া আরোহিদিগের আনন্দের সীমা রহিল না; নিমেষমধ্যে বরাহ প্রাণভয়ে জঙ্গলের মধ্যে পলাইল। মহা-উল্লাসে ও তীরবেগে অশ্বারোহিগণ পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

সে উৎসাহ বর্ণনা করা যায় না। বরাহকে বহুদূর হইতে দেখিবামাত্র অশ্বারোহিগণ বেগে সেই দিকে ধাবমান হইলেন; অশ্বগণ যেন সেই পর্ব্বত পদভরে কাঁপাইয়া ছুটিল,—পথের মধ্যে উন্নত শিলাখণ্ড বা পর্ব্বততরঙ্গিণী লম্ফ দিয়া অতিক্রম করিল, কণ্টকময় ঝোপ বা বৃক্ষ অগ্রাহ্য করিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া ছুটিল। আরোহিদিগের জ্বলন্ত নয়ন সেই বরাহের দিকে

স্থিরীকৃত রহিয়াছে, তাঁহাদিগের উন্নত দক্ষিণ হস্ত শূন্যে বর্শা ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাঁহাদিগের হৃদয় উল্লাসে ও উৎসাহে উৎক্ষিপ্ত রহিয়াছে। 'অদ্য শুভক্ষণে যাত্রা করিয়াছি, অদ্য মহিষমর্দ্দিনী গৌরী এই বলি পাইয়া সন্তুষ্ট হইবেন ;' এই চিন্তা করিতে করিতে পর্ব্বত ও শিলাখণ্ড, নদী ও তরঙ্গিণী, ঝোপ ও কণ্টকবৃক্ষ অতিক্রম করিয়া অশ্বারোহিগণ বায়ুবেগে ধাবমান হইলেন।

বরাহ ক্ষণেক দৌড়াইয়া দেখিল অশ্বারোহিগণ নিকটে আসিতেছে ; একবার স্থির হইয়া যেন তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার চিন্তা করিল, কিন্তু শত যোদ্ধার হস্তে শত বর্শার শাণিত ফলা দেখিয়া সম্মুখরণচিন্তা ত্যাগ করিল, লম্ফ দিয়া একটী নিবিড় ও বিস্তীর্ণ ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিল। নিমিষমধ্যে শত অশ্বারোহী সেই ঝোপ চারিদিকে পরিবেষ্টন করিলেন।

চীৎকার শব্দ করিয়া বরাহকে ঝোপ হইতে বাহির করিবার প্রয়াস পাইলেন ; কিন্তু বরাহ প্রাণভয়ে লুকাইয়াছে, বাহির হইবে না। কেহ কেহ প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলেন, কেহ বা সেই বিস্তীর্ণ ঝোপের কোন অংশে পত্রের শব্দ শুনিয়া অনুমান করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিলেন। অনেকক্ষণ সময় নষ্ট হইল, অনেক উদ্যম ব্যর্থ হইল, বরাহ ঝোপ হইতে বাহির হইল না।

তখন দুর্জ্জয়সিংহ বলিলেন—"বন্ধুগণ, আর এরূপ বৃথা উদ্যমে আবশ্যক কি ? দেখ, সূর্য্য অস্তাচলে বসিয়াছেন, আর অধিক সময় নাই। সতর্কভাবে সকলে ধীরে ধীরে অগ্রসর হও। বরাহ এই ঝোপের মধ্যে আছে, আমরা চারিদিক্ হইতে মধ্যভাগে অগ্রসর হইলে বরাহ অবশ্য একদিক্ হইতে পলাইবার চেষ্টা করিবে, অথবা মধ্যদেশেই শত বর্শাঘাতে মরিবে।"

যোদ্ধাগণ ইহা ভিন্ন অন্য উপায় দেখিলেন না। চারিদিকে পরিবেষ্টন করিয়া সকলে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তীক্ষহস্তে বর্শা ধারণ করিয়া রহিলেন, তীক্ষনয়নে দেখিতে লাগিলেন ; কেননা এবার বরাহ অবশ্যই বাহির হইবে, অশ্ব বা অশ্বারোহীকে সহসা আক্রমণ করিতে না পাবে, এই জন্য সতর্কভাবে সম্মুখে ও চারিদিকে সকলে দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বরাহ বোধ হয় আরোহিদিগের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল। সহসা লম্ফ দিয়া একদিক্ হইতে বাহির হইল ; বিদ্যুৎ-বেগে নিকটস্থ অশ্বের উদর ও অশ্বারোহীর পদ ভীষণ দন্তে বিদীর্ণ করিল ; অশ্ব ও অশ্বারোহী ভূতলে পতিত হইল, বরাহ নিমিষমধ্যে দূরে পলাইল।

দুই একজন অশ্বারোহী আহতের সেবার জন্য রহিলেন, অবশিষ্ট সকলে পুনরায় বরাহের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন, পুনরায় পর্ব্বত ও শিলাখণ্ড কম্পিত করিতে লাগিলেন, বায়ুবেগে জলপ্রপাত ও গহ্বর, কণ্টক ও তরঙ্গিনী অতিক্রম করিতে লাগিলেন, মহানাদে বন পরিপূরিত করিতে লাগিলেন। ঝোপ অন্ধপ্রায় হইল, দুর্জ্জয়সিংহ উন্মত্তের ন্যায় অশ্ব ছুটাইলেন, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ বর্শা কম্পিত হইতেছিল।

পুনরায় বরাহ লুকাইল, পুনরায় বাহির হইয়া পলাইল, আবার লুকাইল। দিবা অবসান হইল, সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইতে লাগিল; অশ্বারোহিগণ শ্রেণীভঙ্গ হইয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। কেহ নিকটে, কেহ দূরে, কেহ প্রান্তরে, কেহ নিবিড় বনে, বরাহ অনুসন্ধান করিতেছেন। সকলে অনুমান করিয়া এক এক পথে যাইলেন, অন্ধকারে আর কিছু স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না।

দুর্জ্জয়সিংহ একাকী একটী বনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার অশ্বের শরীর ফেণময়, তাঁহার ললাট হইতে ঘর্ম্ম পড়িতেছে, কিন্তু তাঁহার নয়ন স্থির, শত যোদ্ধামধ্যে তিনিই কেবল বরাহের গতি অবিচলিত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। অন্ধকারে বরাহ সকলের পক্ষে নিরুদ্দেশ হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে হয় নাই, তিনি যে জঙ্গলের দিকে স্থির নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, বাস্তবিক তথায়ই বরাহ নিহিত ছিল।

এবার বরাহও রুষ্ট হইল। অদ্য একপ্রহর কাল জঙ্গল হইতে জঙ্গলে, গহ্বর হইতে গহ্বরে লুকাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে, তথাপি একজন যোদ্ধা তাহার অব্যর্থ নয়নে পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। সন্ধ্যার সময় ঝোপের ভিতর লুকাইয়াছে, সেই একজন যোদ্ধা তাহাকে হনন করিবার জন্য দণ্ডায়মান আছে। একেবারে বিদ্যুতের ন্যায় ভীষণাকৃতি বরাহ দুর্জ্জয়সিংহকে আক্রমণ করিতে আসিল।

দুর্জ্জয়সিংহ বামহস্তে ললাটের স্বেদ মোচন করিয়া লম্বমান কেশ সরাইলেন, তীব্রদৃষ্টি করিয়া দক্ষিণ হস্তের কম্পিত বর্শা ছাড়িলেন। ভ্রান্তি-বশতঃ বা অন্ধকারবশতঃ সে বর্শা ব্যর্থ হইল, একটী বৃহৎ শিলাখণ্ডে লাগিয়া সে শিলাখণ্ড চূর্ণ করিল, বরাহ নিমিষমধ্যে অশ্বের উদর বিদীর্ণ করিল।

প্রত্যুৎপন্নমতি দুর্জ্জয়সিংহ পতনশীল অশ্ব হইতে লম্ফ দিয়া দশ হস্ত দূরে পড়িলেন। বরাহ মৃত অশ্বকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার দিকে ধাবমান হইল।

মৃত্যু অনিবার্য্য! রাজপুত যোদ্ধা অকম্পিত-নয়নে মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মৃত্যু আসিল না।

অদৃষ্ট-হস্ত-নিক্ষিপ্ত একটী বর্শা আসিল, বরাহের মুখের উপর লাগাতে দন্ত চূর্ণ হইল, রক্তধারা বাহির হইল। সে আঘাতে বরাহ মরিল না, কিন্তু দুর্জ্জয়সিংহকে ত্যাগ করিয়া একেবারে জঙ্গলের মধ্যে পলাইল; রজনীর অন্ধকারে আর বরাহকে দেখা গেল না।

রজনীর অন্ধকারে দুর্জ্জয়সিংহ দেখিলেন, পর্ব্বত হইতে একজন দীর্ঘাকার যুবক অবতরণ করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তেজসিংহ।

আহেরিয়ার দিন বরাহ পলায়ন করিল; দুর্জ্জয়সিংহ-হস্তনিক্ষিপ্ত বর্শা ব্যর্থ হইল, অপরের সাহায্যে অদ্য দুর্জ্জয়সিংহের জীবন রক্ষা হইল;—এইরূপ শত চিন্তা শত বৃশ্চিকের ন্যায় দুর্জ্জয়সিংহকে দংশন করিতে লাগিল। দুর্জ্জয়সিংহ রোষে, অভিমানে জীবনদাতাকে ধন্যবাদ দিতে বিস্মৃত হইলেন। ঈষৎ কর্কশস্বরে কহিলেন—

"আমি আপনাকে চিনি না, বোধ করি আপনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন।"

অপরিচিত যুবক ধীরে ধীরে বলিলেন—"মনুষ্যমাত্রই মনুষ্যের জীবন রক্ষা করিতে চেষ্টা করে; দুর্জ্জয়সিংহের জীবনরক্ষা করা বিশেষ কর্ত্তব্য, কেননা তিনি যোদ্ধা, মেওয়ারের এই বিপদ্‌কালে তিনি স্বজাতির উপকার করিতে পারেন।"

সামান্যপরিচ্ছদ অপরিচিত লোকের নিকট এইরূপ বাক্য শুনিয়া দুর্জ্জয়সিংহ ঈষৎ বিস্মিত হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি?"

যুবক বলিলেন, "পরে জানিবেন, এক্ষণে শ্রান্ত হইয়াছেন, কুটীরে আসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন।"

দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ যুবক ধীরে ধীরে অগ্রে যাইতে লাগিলেন, দুর্জ্জয়সিংহ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অন্ধকার রজনীতে বনপথের ভিতর দিয়া দুইজন যোদ্ধা নিস্তব্ধে যাইতে লাগিলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ দুর্ব্বল পুরুষ ছিলেন না, কিন্তু অপরিচিত দীর্ঘ ও ঋজু অবয়ব, বিশাল বক্ষঃস্থল, দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ বাহু এবং ধীর-গম্ভীর-পদবিক্ষেপ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এরূপ উন্নতকায় পুরুষ তিনি দেখেন নাই, অথবা কেবল আট বৎসর পূর্ব্বে একজনকে দেখিয়াছিলেন।

ক্ষণেক পর যুবক সহসা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "এক্ষণে আমার একটী অনুরোধ আছে, কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন না, প্রতিরোধ করিবেন না। আপনার উষ্ণীষ দিয়া আপনার নয়ন আবৃত করুন, পরে আমি আপনার হস্তধারণ করিয়া লইয়া যাইব। যদি অস্বীকৃত হয়েন, এই স্থানে বিদায় হইলাম।"

দুর্জ্জয়সিংহ আরও বিস্মিত হইলেন, কিন্তু যুবকের মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলেন, অস্বীকার করা বৃথা। বিবেচনা করিলেন, যুবক কখনই তাঁহার অনিষ্ট করিবেন না, এইক্ষণেই তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। যুবকের সহায়তা ভিন্নও এই নিবিড় বন হইতে বাহির হইবার উপায় নাই। ক্ষণেক এইরূপ চিন্তা করিয়া উষ্ণীষ খুলিয়া নিঃশব্দে যুবকের হস্তে দিলেন, নিঃশব্দে যুবক দুর্জ্জয়সিংহের নয়ন রুদ্ধ করিলেন।

তাহার পর যুবক দুর্জ্জয়সিংহের হস্ত ধরিয়া প্রায় একক্রোশ পথ লইয়া যাইলেন; এ পথের মধ্যে দুইজনের মধ্যে একটী কথাও হইল না। দুর্জ্জয়-সিংহ কোন্ দিকে যাইতেছেন কিছুই জানিলেন না, কেবল বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরশব্দ শুনিতে লাগিলেন। কখন পর্ব্বত আরোহণ করিলেন, কখন অধিরোহণ করিলেন, কখন ঋজুভাবে যাইলেন, শেষে গহ্বরের ভিতর যাইতে হইবে বলিয়া প্রায় বসিয়া যাইতে হইল। সেই গুহার ভিতর অনেক দূর যাইলেন, কখন দক্ষিণদিকে, কখন বামদিকে, কখন উচ্চে, কখন নীচে যাইলেন। শেষে যুবক সহসা দণ্ডায়মান হইলেন, দুর্জ্জয়সিংহও দাঁড়াইলেন। যুবক বলিলেন, "উপবেশন করুন।" দুর্জ্জয়সিংহ উপবেশন করিলেন, তাঁহার চক্ষুর বস্ত্র উন্মোচিত হইল।

রজনী এক প্রহরের সময় দুর্জ্জয়সিংহ আপনাকে এক অন্ধকারময় পর্ব্বতগহ্বরে অপরিচিত লোক-বেষ্টিত দেখিলেন। গহ্বরে একটীমাত্র দীপ জ্বলিতেছে, সেই দীপালোকে দুর্জ্জয়সিংহ আপনার চতুর্দ্দিকে কেবল অসভ্য ভীলজাতির লোক দেখিতে পাইলেন। তাহারা পরস্পরে কথা কহিতেছে, দুর্জ্জয় তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তাহারা কখন গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, পরক্ষণেই বাহিরে যাইতেছে, তাহার কারণও জানিতে পারিলেন না। তিনি শিশোদিয়া ভাষায় কথা কহিলেন, পার্শ্বস্থ যুবক ভিন্ন কেহ

সে কথা বুঝিতে পারিল না। যুবক তাঁহার প্রাণ বাঁচাইয়াছে, যুবক তাঁহাকে বিশ্রামের জন্য এই গুহায় আনিয়াছে, যুবক এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সম্মানের সহিত ব্যবহার করিয়াছে, তথাপি দুর্জ্জয়সিংহ সেই যুবকের দিকে চাহিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন কিজন্য? দুর্জ্জয়সিংহ জানেন না, কিন্তু সেই অন্ধকার গুহা, সেই ভীলযোদ্ধা, সেই অল্পভাষী যুবকের দিকে যত দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে সন্দেহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

একজন দাস একটী ঝরণা হইতে জল আনিয়া দিল, দুর্জ্জয়সিংহ তাহাতে হস্তপদ প্রক্ষালন করিলেন। পরে সেই ভৃত্য কতকগুলি ফলমূল ও আহারীয় সামগ্রী দুর্জ্জয়ের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। দুর্জ্জয়সিংহের সন্দেহ দূরীভূত হইল; তিনি ধীরে ধীরে চারিদিকে চাহিলেন সে যুবক নাই। ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—

"আমি অপরিচিত যুবকের অতিথি হইয়াছি; অতিথির সম্মুখে স্বয়ং খাদ্য স্থাপন করা রাজপুতের ধর্ম্ম; বিবেচনা করি, ভীলদিগের মধ্যে থাকিয়া যুবক রাজপুতধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াছেন।"

এ কর্কশ বাক্যে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ভৃত্য স্থিরভাবে উত্তর করিল—

"প্রভু রাজপুত-ধর্ম্ম বিস্মৃত হয়েন নাই, কিন্তু কোন ব্রতবশতঃ আপাততঃ চন্দ্রাবংকুলের সহিত তাঁহার আহার নিষিদ্ধ, এইজন্য এইক্ষণ আসিতে পারেন নাই।"

দুর্জ্জয়সিংহের সন্দেহ দূরীভূত হইল; কিন্তু তিনি কোন কথা না কহিয়া আহার করিলেন।

পরে সেই অপরিচিত যুবক পুনরায় দর্শন দিলেন; ধীরে ধীরে বলিলেন, "আতিথেয় ধর্ম্মে অশক্ত হইয়াছি, তাহার কারণ ভৃত্য নিবেদন করিয়াছে; এক্ষণে আপনার বিশ্রামের জন্য শয্যারচনা করা হইয়াছে।"

দুর্জ্জয়সিংহ চারিদিক্ চাহিলেন; একে একে বহুসংখ্যক ভীলযোদ্ধা একবার গুহায় প্রবেশ করিতেছে, একবার বাহির হইতেছে; সকলের হস্তে ধনুর্ব্বাণ, সকলে নিস্তব্ধ, অপরিচিত রাজপুত যুবকের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, যেন রাজপুত একটী আজ্ঞা দিলে, একটী ইঙ্গিত করিলে তাহারা দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণনাশ করিতে প্রস্তুত; রাজপুত সে ইঙ্গিত করিলেন না।

দুর্জ্জয়সিংহ সাহসী, যুদ্ধ বা বিপদ্‌কালে তাঁহা অপেক্ষা সাহসী কেহ ছিল না; কিন্তু এই অপূর্ব্ব স্থানে অপূর্ব্ব অসংখ্য অসভ্য যোদ্ধা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় একবার স্তম্ভিত হইল। তিনি অপরিচিত পর্ব্বতগুহার

মধ্যে একাকী, অসহায়, নিরস্ত্র, তাঁহার চারিদিকে শত যোদ্ধা বেষ্টন করিয়াছে, সকলে তীক্ষ্ণনয়নে অপরিচিত রাজপুতের দিকে চাহিতেছে, সকলে নিস্তব্ধ! এ সমস্ত ধুমধাম কিজন্য? দুর্জ্জয়সিংহ সেই অপরিচিত রাজপুতের দিকে পুনরায় চাহিলেন, তাঁহার গম্ভীর মুখমণ্ডল ও স্থির নয়ন দেখিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

যুবক পুনরায় বলিলেন, "শয্যা রচনা হইয়াছে।

যুবক দুর্জ্জয়ের মিত্র না শত্রু? যদি শত্রু হয়েন, তবে অদ্য বিপদের সময় দুর্জ্জয়ের প্রাণ বাঁচাইলেন কেন, শ্রান্তির সময় আপন আবাসস্থলে আহ্বান করিলেন কেন, ফলমূল ও আহারীয় দানে শ্রান্তি দূর করিলেন কেন; এই বহুসংখ্যক্ ধনুর্দ্ধর ভীল হইতে এখনও তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন কেন? দুর্জ্জয়সিংহ কিজন্য মিথ্যা সন্দেহ করিতেছেন? অবশ্যই যুবক কোন বিপদগ্রস্ত হইবেন, স্বস্থানচ্যুত হইয়া ভীলদিগের আশ্রয় লইয়াছেন, অদ্য রাজপুতধর্ম্ম অনুসারে দুর্জ্জয়সিংহের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন, দুর্জ্জয় কেন তাহার প্রতি সন্দেহ করিতেছেন?

দুর্জ্জয়সিংহ জানেন না, কিন্তু যখন সেই উন্নতকলেবর, সেই স্থিরনয়ন, সেই অল্পভাষী যোদ্ধার দিকে নিরীক্ষণ করেন, তখনই তাঁহার মনে সন্দেহ হয়; আহবক্ষেত্রে শত শত্রু মধ্যে যাঁহার হৃদয় বিচলিত হয় নাই, অদ্য এই যুবককে দেখিয়া কিজন্য সে বীরহৃদয় বিচলিত হইতেছে? সালুম্ব্রাধিপতি ও স্বয়ং মহারাণার নয়নের দিকে যে যোদ্ধা স্থিরনয়নে চাহিয়াছেন, অদ্য একজন বন্য যুবকের নয়নের দিকে কিজন্য তিনি চাহিতে অক্ষম।

আপনার প্রতি ঘৃণা করিয়া, সন্দেহ দূর করিয়া দুর্জ্জয়সিংহ যুবকের সহিত একবারে সহজভাবে বাক্যালাপ করিবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন, "যুবক! এইপর্য্যন্ত আমি এই অপরূপ গুহা ও আপনার অপরূপ সঙ্গী দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রহিয়াছি, আপনি আমার যে মহৎ উপকার করিলেন, তাহার জন্য একবার ধন্যবাদ দিতেও বিস্মৃত হইয়াছি;—

"ধন্যবাদ আবশ্যক নাই, আমি স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্যমাত্র সাধন করিয়াছি।" সেইরূপ স্থির অবিচলিত হাস্যশূন্য স্বরে উত্তর করিলেন। দুর্জ্জয়সিংহের বিশেষ আলাপ করিবার যত্ন ব্যর্থ হইল।

পুনরায় উদ্যম করিলেন। বলিলেন, "তথাপি এ ঋণ কিরূপে শোধ করিতে পারি?"

"আপনাকে অদ্য যেরূপ অসহায় অবস্থায় দেখিয়াছিলাম, সেইরূপ অসহায় পাইয়া কোন পতিহীনা নিরাশ্রয় অবলা কোন পিতাহীন নিরাশ্রয়

বালকের প্রতি যদি অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহাদের প্রতি এখন ধর্ম্মাচরণ করুন, তাহা হইলেই আমি পরিতৃপ্ত হইব ;—আমার নিজের কোন যাচ্ঞা নাই।”

দুর্জ্জয়সিংহ সহসা বজ্রাহতের ন্যায় চকিত হইলেন ;—ক্ষণেক দুর্জ্জয়সিংহ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন ;—দুর্জ্জয়সিংহ অনিমিষ, অবাক্! যুবক কি পূর্ব্বকথা জানেন ; অদ্য কি এই শত ভীলযোদ্ধার দ্বারা পূর্ব্ব অত্যাচারের প্রতিফল লইবেন ? সভয়ে সেই ভীলযোদ্ধাদিগের দিকে দেখিলেন, সকলের হস্তে ধনুর্ব্বাণ প্রস্তুত! সভয়ে যুবকের দিকে চাহিলেন ; যুবক সেইরূপ গম্ভীর, নিশ্চেষ্ট। দুর্জ্জয়সিংহের অসমসাহসিক হৃদয়ে অদ্য প্রথম ভয়ের সঞ্চার হইল ; এ যুবক কে ?

পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে! নচেৎ দুর্জ্জয়সিংহের এ যাতনা কেন ? নচেৎ দুর্জ্জয়সিংহের হৃদয়ে ভয়সঞ্চার কেন ? বিপদ্ ? দুর্জ্জয়সিংহ কি শতবার ইহা অপেক্ষা অধিক বিপদ তুচ্ছজ্ঞান করেন নাই ? পূর্ব্বকৃত মহাপাতকের কথা অদ্য হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে,—এইজন্য ভয়! এইজন্য সভয়ে মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ যুবক কে ?

যুবক পুনরায় সেই ধীর-হাস্যশূন্য স্বরে বলিলেন,“শয্যা রচনা হইয়াছে।”

দুর্জ্জয়সিংহ হৃদয়ের উদ্বেগ দমন করিয়া সদর্পে উত্তর দিলেন, “অদ্যই সূর্য্যমহলে প্রত্যাগমন করিব, অন্যের আবাসে বাস করা দুর্জ্জয়সিংহের অভ্যাস নাই।”

যুবক—“যেরূপ রুচি হয় সেইরূপ করিতে পারেন,—কিন্তু আমার বোধ ছিল, অন্যের আবাসস্থলে গোপনে প্রবেশ করা আপনার অভ্যাস ছিল।”

এবার দুর্জ্জয়সিংহ তিরস্কারে রুষ্ট হইয়া বলিলেন, “আপনি কে জানি না ; ইচ্ছা হয়, এই অসভ্য যোদ্ধাদ্বারা দুর্জ্জয়সিংহকে হনন করিতে পারেন, কিন্তু দুর্জ্জয়সিংহ মিথ্যা অপবাদ সহ্য করিবে না। রাঠোর তিলকসিংহের বংশের সহিত আমার বংশের বংশানুগত বিরোধ, সেই বিরোধের বশবর্ত্তী হইয়া আমি সম্মুখসমরে তাঁহার দুর্গ সূর্য্যমহল কাড়িয়া লইয়াছি ; এ ক্ষত্রধর্ম্মমাত্র!”

“সম্মুখসমরে আপনি সুপটু, সন্দেহ নাই, সেই জন্যই চিতোর রক্ষার্থ তিলকসিংহের মৃত্যু হইলে পর আপনি তাঁহার নিরাশ্রয় বিধবার সহিত সম্মুখরণে বীরত্ব প্রকাশ করিয়া নারীকে হত্যা করিয়াছিলেন। আপনি ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞ, সন্দেহ নাই

দুইজনে ক্ষণেক নিস্তব্ধ রহিলেন। প্রধান প্রকাশ্যে বলিতে সাহস করিলেন না, কিন্তু মনে মনে প্রভুর কথা বিশ্বাস করিলেন না; বিবেচনা করিলেন, রজনীতে অদ্য কাহারও অসুরবীর্য্য দেখিয়া দুর্জ্জয়সিংহের ভ্রম হইয়াছে। দুর্জ্জয়সিংহ ক্ষণেক পর কহিলেন, "আরও একটী কথা আছে।"

প্রধান। "কি?"

দুর্জ্জয়। "তেজসিংহ অদ্য আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে!"

ঘরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; দুর্জ্জয়সিংহ একাকী ছাদে পদচারণ করিতেছেন; অদ্য তাঁহার মুখের ভঙ্গি দেখিলে তাঁহার প্রধান যোদ্ধাগণও চমকিত হইত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পুত্রশোক।

প্রাতঃকাল হইতে সূর্য্যমহলের সৈন্যসামন্ত সসজ্জ হইতে লাগিল। পূর্ব্বদিক্ হইতে নবজাত সূর্য্যরশ্মি সৈন্যদিগের বর্শা ও খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণের উপর প্রতিফলিত হইতে লাগিল; সৈন্যগণ উৎসাহ ও আনন্দে কোলাহল করিয়া দুর্গসম্মুখে একত্রীকৃত হইল।

দুর্জ্জয়সিংহ এখনও ছাদে একাকী পদচারণ করিতেছিলেন, নীচে শব্দ শুনিয়া সৈন্যগণকে দেখিবার নিমিত্ত ছাদের একপার্শ্বে আসিলেন, তাঁহাকে দেখিবামাত্র সৈন্যগণ "চন্দ্রাওয়ৎকুলের জয়" বলিয়া উল্লাসরব করিল, দুর্জ্জয়সিংহ সে উল্লাসরব শুনিলেন, কিন্তু তাঁহার ললাট হইতে চিন্তারেখা অপনীত হইল না।

অনেকক্ষণ পর ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া নিঃশব্দে যুদ্ধসজ্জা করিলেন, অচিরে অশ্বে আরোহণ করিয়া সৈন্যগণের মধ্যে আসিলেন; পুনরায় সহস্র সৈন্যের জয়নাদে সেই পর্ব্বতদেশ পরিপূরিত হইল।

সে জয়নাদ শুনিয়া দুর্জ্জয়সিংহের মুখে হাস্য দেখা দিল না; যাঁহারা তাঁহার কুঞ্চিত ভ্রূযুগল ও ললাট লক্ষ্য করিলেন, তাঁহারা বুঝিলেন এবার যুদ্ধে রক্ষা নাই। দুর্জ্জয়সিংহ দুর্গদ্বার অতিক্রম করিলেন, সৈন্যগণ মহানাদে দুর্গদ্বার অতিক্রম করিল।

আনন্দময় বসন্তের প্রাতঃকালে সৈন্যগণ পর্ব্বত, উপত্যকা ও ক্ষেত্রের উপর দিয়া গমন করিতে লাগিল। বৃক্ষ হইতে বসন্ত-পক্ষী এখনও গান করিতেছে, শাখা ও পত্র হইতে শিশিরবিন্দু এখনও সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল দেখাইতেছে, প্রভাত-সমীরণ যোদ্ধাদিগের পতাকা লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। চারিদিকে বসন্তের শোভা অনির্ব্বচনীয়। পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত-শৃঙ্গ যেন নিষ্কম্প নির্ব্বাক্ প্রহরীর ন্যায় সেই সুন্দর দেশ রক্ষা করিতেছে। পর্ব্বতের ক্রোড়মধ্যে সুন্দর হ্রদ আপন স্বচ্ছ বক্ষে আকাশ ও মেদিনীচ্ছবি ধারণ করিয়াছে। সে হ্রদের জল কি নির্ম্মল, নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ! যোদ্ধাগণ সেই হ্রদের পার্শ্ব দিয়া যাইতে লাগিলেন, মুহূর্ত্তের জন্য সেই হ্রদতটে সমর-বাদ্য ও লোক-কোলাহল শ্রুত হইল। মুহূর্ত্তের জন্য সেই হ্রদবক্ষে উড্ডীন পতাকা ও সৈন্যসার প্রতিফলিত হইল। অচিরে সৈন্যসার বনের ভিতর প্রবেশ করিল। হ্রদের বক্ষ হইতে সমরচ্ছায়া অপসৃত হইল, হ্রদের তটে সমরবাদ্যের প্রতিধ্বনি লীন হইল। পর্ব্বত, হ্রদ পুনরায় নির্জ্জন, শান্ত, নিস্তব্ধ!

বনের আনন্দনীয় শোভা দেখিয়া অশ্বারোহিদিগের হৃদয় উল্লাসে পূর্ণ হইল। নিবিড় বনের ভিতর সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না, অথবা দুই এক স্থলে পত্রের ভিতর দিয়া দুই একটী রশ্মিরেখা দেখা যাইতেছে। বসন্তের সহস্র পক্ষী প্রাতঃকালে কি সুন্দর গীত আরম্ভ করিয়াছে, যেন সে নির্জ্জন বনস্থলী তাহাদিগের উৎসবগৃহ—উৎসবের দিন! বিহঙ্গকুল কুতূহলে গীত আরম্ভ করিয়াছে। সেই নির্জ্জন ছায়াপূর্ণ বনস্থলী একবার সৈন্যরবে পরিপূরিত হইল। বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে সৈন্যকোলাহল প্রতি-ধ্বনিত হইল। অচিরে সৈন্যগণ বন পার হইয়া যাইল, পুনরায় বন নির্জ্জন, নিঃশব্দ, অথবা কেবল বিহঙ্গ বিহঙ্গিনীদিগের আনন্দনীয় কলরবে জাগরিত।

বন পার হইয়া সৈন্যগণ একটী বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল; চারিদিকে কেবল পর্ব্বতসার দেখা যাইতেছে, মধ্যে সমতল ভূমিতে সুপক্ক যবধান্য বায়ুতে হ্রদের লহরীর ন্যায় দুলিতেছে। কোন কোন স্থলে অহিফেনের রক্তপুষ্প সমুদয় সেই হরিদ্র যবশস্যের মধ্যে শোভা পাইতেছে। নীল নির্ম্মেঘ আকাশ হইতে বসন্তের সূর্য্য সেই আনন্দময় ক্ষেত্রচয়ের উপর সুবর্ণরশ্মি বর্ষণ করিতেছে।

এইরূপে সৈন্যগণ পর্ব্বত, উপত্যকা, বন ও ক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। পথের মধ্যে কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই, কেবলমাত্র একটী শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হইল। সূর্য্যমহল হইতে কিয়দ্দূরে পর্ব্বততলে

চন্দ্রপুর প্রভৃতি কয়েকটী "বসী" গ্রাম ছিল। যুদ্ধ ও বিপদ্‌কালে কোন কোন গ্রামের লোক আপনাদিগের জীবন, শস্য ও সম্পত্তি রক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া কোন কোন পরাক্রান্ত যোদ্ধার দাসত্ব স্বীকার করিত। সেই অবধি উক্ত যোদ্ধা তাহাদিগকে রক্ষা করিতেন, কিন্তু তাহারা ঐ যোদ্ধার "বসী" অর্থাৎ অধীন-নিবাসী হইয়া থাকিত। পূর্ব্ববৎ তাহারা কৃষিকার্য্যে লিপ্ত থাকিত, কিন্তু এক্ষণে তাহারা পূর্ব্ববৎ স্বাধীন নহে, তাহারা যোদ্ধার দাস; যোদ্ধার ভূমি ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না, যোদ্ধার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে না।

এইরূপে চন্দ্রপুর প্রভৃতি কয়েকটী গ্রামের প্রজাগণ মেওয়ারের অনন্ত যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত হইয়া আপনাদিগের জীবনধারণের অন্য উপায় না দেখিয়া বহুকালাবধি সূর্য্যমহলেশ্বরদিগের "রাথওয়ালী" অর্থাৎ দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিল।

যতদিন রাঠোরগণ দুর্গের অধীশ্বর ছিলেন, ততদিন চন্দ্রপুরের প্রজা-দিগের অধিক কষ্ট হয় নাই; কিন্তু তিলকসিংহের মৃত্যুর পর প্রজাগণ নিষ্ঠুর দুর্জ্জয়সিংহের হস্তে পতিত হইল। সেই অবধি তাহারা বিশ্রাম কাহাকে বলে জানিত না। দুর্জ্জয়সিংহ অতিশয় ক্রোধস্বভাব, চন্দ্রপুরনিবাসীদিগের মৃত তিলকসিংহের প্রতি অনুরাগ দেখিয়া আরও ক্রোধী হইলেন। "বসী" প্রজাদিগকে যৎপরোনাস্তি শাস্তি দিতেন, সর্ব্বদা অবমাননা করিতেন; অতিশয় অধিক কর চাহিতেন, সময়ে সময়ে সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতেন। চন্দ্রপুরের বৃদ্ধ সর্দ্দার গোকুলদাস সর্ব্বদা পুত্র কেশবদাসকে কহিত, "যে দিন দয়ালু প্রভু তিলকসিংহের মৃত্যু হইল, সেইদিন কেন না সপরিবারে হত হইলাম, কেন চন্দাওয়তে বশীভূত হইলাম?" গ্রামস্থ সকল লোকে এইরূপ আক্ষেপ করিত।

দিন দিন দুর্জ্জয়সিংহের অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিল। দুর্জ্জয়সিংহ ও চন্দ্রপুরের বসীদিগের অসন্তোষ দৃষ্টি করিয়া আরও ক্রুদ্ধ হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদিগের অবমাননা করিতে লাগিলেন। শেষে গ্রামের লোক আর সহ্য করিতে পারিল না; পরামর্শ করিতে লাগিল—"আমরা কিজন্য দুর্জ্জয়সিংহের দাস হইব? তিলকসিংহ আমাদিগের প্রভু হত হইয়াছেন;—দুর্জ্জয়সিংহ কি তাহার উত্তরাধিকারী? পথের দস্যু কি দুর্গের অধীশ্বর? ঐ দস্যুর বিরুদ্ধাচরণ করিলে কি আমাদের 'স্বামীধর্ম্মের' কোন ক্ষতি আছে? আমাদের 'বাপতা' (পৈতৃক ভূমিতে প্রজার অক্ষয় স্বত্ব) আমরা ত দুর্জ্জয়ের নিকট বিক্রয় করি নাই। তিলকসিংহের উত্তরাধিকারী আইসুন—

আমরা তাঁহার বন্দী, অন্য কাহারও নহি।” এইরূপ কথা ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্র হইতে লাগিল,—দুর্জ্জয়সিংহের লোকের অসাক্ষাতে ঘরে ঘরে এই সকল কথা হইতে লাগিল।

গ্রামের লোকদিগের মধ্যে এইরূপ ভাব ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছিল। অদ্য প্রাতঃকালে দুর্জ্জয়সিংহ আপন সৈন্যসামন্ত লইয়া সেই গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন। তিলকসিংহের প্রতি গ্রামস্থ প্রজার অনুরাগ, তাঁহার প্রতি বিরাগ, এই সকল বিষয় তিনি আলোচনা করিতেছিলেন, এবং ক্রোধে তাঁহার শরীর জর্জ্জরিত হইতেছিল। ক্ষেত্রের মধ্যে যাইতে যাইতে শস্যের মধ্যে একজন দীর্ঘাকার যুবককে দেখিতে পাইলেন; চিনিয়া সঘৃণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোর পিতা সেই বৃদ্ধ শৃগাল কোথায়? কর দিবার চেষ্টা করিতেছে না, জাতীয় ধর্ম্ম অনুসারে কুমন্ত্রণা করিতেছে?”

কেশবদাস সৈন্য দেখিয়া দূরে দণ্ডায়মান ছিল, দুর্গেশ্বর দ্বারা এইরূপ তিরস্কৃত হইয়া ক্রুদ্ধ হইল, কিন্তু প্রভুর বিরুদ্ধে দাস কি করিবে; ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া প্রণত হইল।

পুনরায় দুর্জ্জয়সিংহ কর্কশস্বরে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কেশবদাস বালক;—কেশবদাস এখনও মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে গোপন করিতে শিখে নাই। দুর্জ্জয়সিংহের কথায় উষ্ণ শোণিত তাহার মুখমণ্ডল রঞ্জিত করিল, কিন্তু তথাপি ধীরে ধীরে কেবল এইমাত্র বলিল;—

“প্রভু, কুমন্ত্রণা আমাদের বংশের অভ্যাস নহে।”

“তবে ভীরু শৃগালের বংশে সুমন্ত্রণা অভ্যাস কতদিন হইয়াছে? বন্দী দাসবংশে সাধু আচরণ আছে তাহা জানিতাম না।”

দুর্জ্জয়সিংহ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

কেশবদাস সেইরূপ ক্রোধ সম্বরণ করিয়া স্থিরস্বরে কহিল—“প্রভু, আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা বন্দী বটে, কিন্তু দাসত্বের সহিত এখনও ভীরুতা অভ্যাস করি নাই, আমরা রাজপুত।”

অন্যান্য অশ্বারোহিগণ দেখিলেন, নির্ব্বোধ বালক কেশবদাস আপনি আপনার মৃত্যু ঘটাইতেছে। দুর্জ্জয়সিংহের নয়ন অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি কেশবদাসকে পদাঘাত করিয়া বলিলেন—“বালক! এখনও প্রভুর প্রতি আচরণ শিখিলি নাই, দুর্জ্জয়সিংহ এইরূপ দাসকে আচরণ শিখায়।”

এবার কেশবদাস অবমাননা সহ্য করিতে পারিল না; কম্পিতস্বরে কহিল—

“তিলকসিংহ দাসের প্রতি এরূপ আচরণ করিতেন না।”

বজ্রনাদে দুর্জ্জয়সিংহ কহিলেন, "তিলকসিংহকে পরাজয় করিয়া দুর্জ্জয়-সিংহ এক্ষণে সূর্য্যমহলের অধীশ্বর হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার আজ্ঞা পালন হইবে, নতুবা চন্দ্রপুর অচিরে ভস্মসাৎ হইবে।"

বালক স্থান কাল বিস্মৃত হইল, প্রভুত্ব দাসত্ব বিস্মৃত হইল।—উগ্রস্বরে উত্তর করিল—

"তিলকসিংহ চিতোর রক্ষার্থ হত হইয়াছিলেন, তাঁহার নিরাশ্রয় বিধবা ও বালককে তুমি হত্যা করিয়াছ; তুমি আমাদিগের প্রভু নহ, পথের দস্যুমাত্র।" নির্ভয়ে বালক বক্ষ বিস্তার করিয়া দিল।

দুর্জ্জয়সিংহের মুখমণ্ডল ক্রোধে একেবারে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। কল্য রজনীর অবমাননা-কথায় একেই তাহার শরীর অদ্য প্রাতঃকাল অবধি জর্জ্জরিত হইতেছিল, তাহাতে বালক তিলকসিংহের নাম করাতে ক্রোধাগ্নি যেন আহুতি পাইল। এক্ষণে তিনি যে বিধবার সহিত অন্যায় যুদ্ধ করিয়াছিলেন, বালক-মুখে সেই অবমাননা-কথা শুনিয়া ক্রোধে একেবারে অন্ধ হইলেন। সহসা তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল, বিদ্যুৎ-জ্যোতিতে তাঁহার কোষ হইতে অসি বহির্গত হইল;—নিমেষ মধ্যে নির্ব্বোধ বালকের ছিন্ন মস্তক ভূমিতে লুটাইল।

সকলে নির্ব্বাক্ হইয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিল! কেবল দুর্জ্জয়সিংহের "প্রধান" বুঝিলেন, কল্য তেজসিংহ দুর্গেশ্বরকে যে অবমাননা করিয়াছিলেন,—তাহারই ফল কেশবদাসের মৃত্যু!

নির্ব্বাক্ হইয়া সেস্থান হইতে সৈন্যগণ চলিয়া গেল, ক্ষেত্র পুনরায় নিস্তব্ধ, পুনরায় জনশূন্য।

না, জনশূন্য নহে। মৃতদেহের পার্শ্বে একজন শ্বেতশ্মশ্রু দীর্ঘাকার বৃদ্ধ পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে,—সেও নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ।

বৃদ্ধ মৃতদেহের দিকে দেখিল, ধীরে নীল নভোমণ্ডলের দিকে চাহিল, পুনরায় স্থিরদৃষ্টিতে সেই ছিন্ন মস্তকের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

বৃদ্ধ পুত্রশোকে চীৎকারশব্দে আর্ত্তনাদ করিল না, বৃদ্ধ নির্ব্বাক্—নিস্তব্ধ। পুত্রশোকে তাহার নয়নে অশ্রুবিন্দু দেখা দেয় নাই, পুত্রশোকে তাহার নয়ন জলন্ত অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সালুম্ব্রা।

অদ্য সালুম্ব্রার পর্ব্বতদুর্গ কি মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে! পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে চন্দাওয়ৎকুলের উন্নত পতাকা যেন আকাশমধ্যে উড্ডীন হইতেছে, দুর্গের স্থানে স্থানে অসংখ্য পতাকা উড়িতেছে, অসংখ্য তোরণ নির্ম্মিত ও সুশোভিত হইয়াছে। চন্দাওয়ৎকুলের যত সেনানী আছেন, তাঁহারা সালুম্ব্রায় উপনীত হইয়াছেন, কেহ দ্বিশত, কেহ পঞ্চশত, কেহ সহস্র, কেহ দ্বিসহস্র সৈন্য লইয়া চন্দাওয়ৎকুলাধিপতি রাওয়ৎ কৃষ্ণসিংহের সদনে আসিয়াছেন। সেনানীগণ প্রাসাদে রাজসাক্ষাৎ অপেক্ষা করিতেছেন, সৈন্যগণ পর্ব্বতের নীচে সমতল ক্ষেত্রে অসংখ্য শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছে। শিবিরের উপর হইতে চন্দাওয়ৎ-পতাকা উড়িতেছে, শিবিরের চারিদিক্ হইতে চন্দাওয়ৎকুলের বিজয়বাদ্য বাজিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধাদিগের হাস্যধ্বনি ও উল্লাসরব শ্রুত হইতেছে। প্রাতঃকালের সূর্য্যরশ্মি সেই শিবিরের উপর সেই উৎসাহপূর্ণ সৈন্যদলের উপর খেলা করিতেছে, প্রাতঃকালের শীতল বায়ু সেই অসংখ্য চন্দাওয়ৎ-পতাকা লইয়া খেলা করিতেছে অথবা চন্দাওয়ৎ রণবাদ্য চারিদিকে ক্ষেত্রে, গৃহে, উপত্যকায় বা পর্ব্বতশৃঙ্গে বিস্তার করিতেছে। চন্দাওয়ৎকুলের রণবাদ্য ভারতক্ষেত্রে ইহার পূর্ব্বেই অনেকবার শব্দিত হইয়াছে, অনেক পর্ব্বতে, অনেক উপত্যকায়, অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুহৃদয় স্তম্ভিত করিয়াছে।

রণবাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে অন্য বাদ্যও শ্রুত হইতেছে। ফাল্গুন মাস হোলির মাস; পথে, ঘাটে, গৃহদ্বারে নাগরিকগণ দলে দলে গীত গাইতেছে, পরস্পর পরস্পরের দিকে আবীর নিক্ষেপ করিতেছে, উল্লাসে ও আনন্দে মেওয়ারের আসন্ন বিপদ্ বিস্মৃত হইতেছে। বসন্তকাল ও উৎসব দিনের প্রভাবে অদ্য নানারূপ অশ্রাব্য গীতও গীত হইতেছে, নানারূপ অশ্রাব্য কৌতুকে নাগরিকগণ বিমোহিত হইতেছে। সে কৌতুক সে আবীর-নিক্ষেপ হইতে অদ্য কাহারও পরিত্রাণ নাই। উৎসবের দিনে নীচ ও উচ্চ সকলেই সমান, সালুম্ব্রার প্রধান সেনানী বা প্রধান মন্ত্রীও পথ অতিবাহনকালে নাগরিকদিগের আবীরে রঞ্জিত ও ব্যতিব্যস্ত হইলেন, নাগরিকদিগের কৌতুকে বিরক্ত হইলেন না। অদ্য কাহারও পরিত্রাণ নাই। অল্পবয়স্ক

বালকগণ বৃদ্ধের শ্বেত শ্মশ্রু রক্তবর্ণ করিয়াছিল, বৃদ্ধ প্রহার করিতে আসিলে বালকগণ তাহার নয়নে আবীর দিয়া করতালি দিয়া অন্ধকে উপহাস করিতে লাগিল। অদ্য কাহারও পরিত্রাণ নাই। বাস্তবিক কৃষ্ণসিংহের প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইল, দলে দলে বালক ও বৃদ্ধগণ পথে পদচারণ করিতে লাগিল, দলে দলে লোক পথে ঘাটে গৃহদ্বারে, কামদেবের কমনীয় গীত উচ্চারণ করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধগীতও গাইতে লাগিল, শীঘ্র যুদ্ধ হইবে, রাণা প্রতাপসিংহ তুর্কীদিগকে দূরে তাড়াইয়া দিবেন; চিতোর উদ্ধার করিবেন, মেওয়ারের সিংহাসন উজ্জ্বল করিবেন, মেওয়ারের নাগরিক ও কৃষকদিগের বিপদ্ দূর করিবেন, এইরূপ গীতে নাগরিক ও সৈন্যগণের হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইতে লাগিল

বেলা দুই তিন দণ্ডের সময় রাওয়ৎ কৃষ্ণসিংহ দরীশালায়, অর্থাৎ সভা-গৃহে আসিলেন; কৃষ্ণসিংহের সম্মুখে গায়ক চন্দাওয়ৎকুলের গৌরবগান গাইতে গাইতে গৃহে প্রবেশ করিলেন; দুই পার্শ্বে দুর্জ্জয়সিংহ প্রভৃতি অধীনস্থ যোদ্ধাগণ ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইয়া "মহারাজ দীর্ঘজীবী হউন" বলিয়া অভিবাদন করিলেন। কৃষ্ণসিংহ মস্তক নত করিয়া মঙ্গলেচ্ছু যোদ্ধাদিগের সম্মান করিলেন ও গৃহে প্রবেশ করিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধা-গণও গৃহে প্রবেশ করিলেন।

রাওয়ৎ কৃষ্ণসিংহ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন;—তাঁহার দক্ষিণে ও বামদিকে যোদ্ধাগণ রেখাকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; প্রত্যেকের হস্তে খড়্গ ও ঢাল। বীরদিগের উপর সানন্দে নয়নক্ষেপ করিয়া কৃষ্ণসিংহ তাহা-দিগকে বসিবার আদেশ করিলেন,— যোদ্ধাগণ নিজ নিজ স্থানে বসিলেন; ঢালের সহিত ঢালের সঙ্ঘটন-শব্দ সেইপ্রশস্ত সভামন্দিরে প্রতি-ধ্বনিত হইল।

সকলে উপবেশন করিলে পর প্রাচীন কৃষ্ণসিংহ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "বীরগণ! অদ্য সমবেত হইবার কারণ আপনারা অবগত আছেন। চিতোর তুর্কীদিগের হস্তে; মেওয়ারের উর্ব্বরা ক্ষেত্রচয়, সমস্ত সমতল ভূমি তুর্কী-দিগের হস্তে; কেবল পর্ব্বত ও জঙ্গল-পরিপূর্ণ প্রদেশখণ্ডে মেওয়ারের স্বাধীনতা-লক্ষ্মী লুক্কায়িত রহিয়াছেন, তথা হইতে তাঁহাকে হরণ করিতে ম্লেচ্ছদিগের ইচ্ছা।

"উত্তরে কমলমীর হইতে দক্ষিণে রিকুমনাথ পর্য্যন্ত, পূর্ব্বে শাতোলা হইতে পশ্চিমে মীর পর্য্যন্ত পর্ব্বতপ্রদেশমাত্র মহারাণার অধীন; অবশিষ্ট

প্রশস্ত ভূমি সমস্ত মোগলের করকবলিত। কিন্তু এই প্রশস্ত ভূমি হইতে মোগলের কোন লভ্য নাই; মহারাণার আদেশে এ মোগলকরকবলিত প্রদেশ জনশূন্য অরণ্য। এ স্থানে এক্ষণে কৃষকে চাষ করে না, গোরক্ষক গো রক্ষা করে না, মনুষ্য বাস করে না। মহারাণার আদেশে এ প্রদেশের সমস্ত নিবাসী পর্ব্বতপ্রদেশের মধ্যে আসিয়া বাস করিতেছে; বুনাস ও বরীনদীর কূলস্থ উর্ব্বরা ক্ষেত্রচয় এক্ষণে জঙ্গলময় ও হিংস্রক পশুর আবাস; আরাবলি পর্ব্বতের পূর্ব্ব সমস্ত মেওয়ার প্রদেশ প্রদীপশূন্য।

"মহারাণার আদেশ কে লঙ্ঘন করিতে পারে? মহারাণা স্বয়ং সতত এই প্রদেশ দর্শন করিতে যান; সালুম্ব্রা সতত মহারাজের সঙ্গে গিয়াছে, সমস্ত প্রদেশে অরণ্যের নির্জ্জনতা দর্শন করিয়াছে, অরণ্যের নিস্তব্ধতা শ্রবণ করিয়াছে, শস্যের স্থানে উচ্চ তৃণক্ষেত্র দর্শন করিয়াছে, গমনাগমনের পথে কণ্টকময় বাবুল বৃক্ষ ও নিবিড় জঙ্গল দেখিয়াছে, মানব-গৃহে হিংস্রক পশুকে বাস করিতে দেখিয়াছে। একজন ছাগরক্ষক বুনাস-নদী-তীরে নিভৃতে ছাগ-রক্ষা করিতেছিল, তাহার মৃতদেহ এখনও বৃক্ষে লম্বমান রহিয়াছে; অন্য কেহ মহারাজের আজ্ঞা লঙ্ঘন করে নাই।

"মোগলগণ বুঝিবে, মেওয়ারের উদ্যানখণ্ড এক্ষণে অরণ্য ও অফলপ্রদ। তাহারা জানিবে, মহারাণার সহিত যুদ্ধ করিতে এক্ষণে অরণ্য পার হইতে হইবে; তথায় মনুষ্য নাই, সৈন্যের খাদ্য নাই, আবাসস্থল নাই। তাহারা আরও জানিবে, সুরাট্ প্রভৃতি পশ্চিম-সাগরের বন্দরের সহিত দিল্লীর যে বাণিজ্য ছিল তাহা এক্ষণে নিষিদ্ধ। এক্ষণে অরণ্যের ভিতর দিয়া তথায় যাইতে হইবে, গমনের সময় আমরা সুষুপ্ত থাকিব না।

"বীরগণ! এইরূপে আমরা মেওয়ারের বহির্দ্বার রক্ষা করিয়াছি। পর্ব্বত-প্রদেশের ভিতরে প্রতি দুর্গে, প্রতি উপত্যকায় সৈন্য আছে, চন্দাওয়ৎ-কুল শীঘ্রই মহারাণার নিকট উপস্থিত হইবে; অন্যান্য কুল চারিদিক্ হইতে আসিতেছে, সম্মুখরণের জন্য মহারাণার সৈন্যের অপ্রতুলতা হইবে না। যাহারা যুদ্ধ জানে না, ভূমিয়াগণ নিজ নিজ উপত্যকা, নিজ নিজ আবাস-পর্ব্বত রক্ষা করিবে। বন্যজাতিগণও ধনুর্ব্বাণহস্তে যুদ্ধ দান করিবে। দক্ষিণে ভীলগণ, পূর্ব্বে মীরগণ, পশ্চিমে মীনাগণ, তুর্কীদিগকে সমর-উৎসবে আহ্বান করিবে। শুনিয়াছি, মহারাজা মানসিংহ দিল্লীশ্বরের পুত্রের সহিত বড় ধুমধামে আসিতেছেন; আমরাও তাঁহাকে আহ্বান করিতে প্রস্তুত আছি।

"বীরগণ! এক্ষণে হোলীর সময় নাগরিকগণ হইতে আপনাদিগেরও পরিত্রাণ নাই, আমারও পরিত্রাণ নাই। আপনাদিগের মস্তকে, বক্ষে, বাহুতে, পরিচ্ছদে আবীর দেখিতেছ, দুষ্ট নাগরিকগণ আমারও শুক্লকেশ ও শ্বেতশ্মশ্রু রক্তবর্ণ করিয়া দিয়াছে। প্রাসাদ, কুটীর, পথ, ঘাট, সমস্ত রক্তবর্ণ করিয়া দিয়াছে। আর এক হোলীর দিন আসিতেছে, সে যোদ্ধার প্রকৃত আনন্দের দিন; যোদ্ধার মস্তক, বক্ষ ও বাহুদ্বয় হইতে শোণিত-রূপ আবীর নির্গত হইবে; এই পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশের প্রত্যেক গিরি ও উপত্যকা মনুষ্য-শোণিতে রঞ্জিত হইবে। ঐ নাগরিকদিগের গীত ও বাদ্য শুনিতেছ; সেদিন মেওয়ারে অন্যরূপ বাদ্য হইবে, অন্যরূপ গীত গগনে উত্থিত হইবে। সেই আনন্দের দিনের জন্য কোন্ যোদ্ধার হৃদয় উৎসাহে না নৃত্য করিয়া উঠে?"

সালুম্ব্রাধিপতির এই উৎসাহ-বাক্যে যোদ্ধাগণ বীরমদে হুঙ্কার করিয়া উঠিল; ঝনঝনাশব্দে কোষ হইতে অসি বহির্গত হইল,—সে শব্দ সে হুঙ্কাররব সভামন্দিরে প্রতিধ্বনিত হইল, সালুম্ব্রার পর্ব্বতশিখর অতিক্রম করিয়া গগনে উত্থিত হইল।

এই উল্লাসরব না থামিতেই সেই প্রশস্ত সভাগৃহে উন্নত গীতধ্বনি শ্রুত হইল, সালুম্ব্রার বৃদ্ধ চরণদেব পূর্ব্বকালের গীত আরম্ভ করিয়াছেন।

"যোদ্ধাগণ! আপনারা যুবক, আপনাদিগের দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে; আশা, উৎসাহ, প্রতিজ্ঞা ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান হয়। বৃদ্ধের দৃষ্টি অতীতে; সেই অতীতকাল কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালার ন্যায় আমার মানস-চক্ষু আচ্ছাদন করিতেছে; আমি বহির্জগৎ দেখিতেছি না, কিন্তু সেই মেঘমালার মধ্যে অন্য একটী জগৎ দেখিতেছি; অন্য বীর-আকৃতি দেখিতেছি; শ্রবণ করুন—

"অদ্য আমাদের মহারাণা চিতোরে নাই, মহারাণা পর্ব্বতকন্দরে বাস করেন, মহারাণা বৃক্ষতলে শিশুদিগকে লালনপালন করেন; শব্দশূন্য নিবিড় জঙ্গলে মহারাণার শুদ্ধান্তপুর। বাল্যকালে আমি আর একজনকে এইরূপ দেখিয়াছিলাম, তিনিও পর্ব্বতগহ্বরে বাস করিতেন; পর্ব্বতশিখর তাঁহার উন্নত প্রাসাদ ছিল। সুদূরশ্রুত সঙ্গীতের ন্যায় পূর্ব্বকথা হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে, হৃদয় আলোড়িত করিতেছে, সে কথা শ্রবণ করুন—

"সেই বালক একদিন ভ্রাতার সহিত চরণীদেবীর পর্ব্বতে গিয়াছিলেন; নির্ভীক বালক অন্য আসন ত্যাগ করিয়া সিংহচর্ম্মের উপর বসিলেন, চরণীদেবী শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন, 'যিনি সিংহচর্ম্মের উপর বসিলেন,

একদিন তিনি সিংহাসনে বসিবেন।' রোষে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালককে আক্রমণ করিল; কেননা উভয়ে রাজপুত্র। বালক আঘাতে জর্জ্জরিত-কলেবর হইয়া এক চক্ষু অন্ধ হইয়া পলাইল; কোথায় পলাইল?

"ছাগরক্ষকদিগের নিকট অন্বেষণ কর। তাহাদিগের ঐ মলিনপরিচ্ছদ অথচ তেজঃপূর্ণ ভৃত্যটী কে? ছাগরক্ষকগণ জানে না, জানিলে কি ছাগ-রক্ষণে অপটু বলিয়া বালককে অবমাননা করিয়া দূর করিয়া দিত? অবমানিত দূরীকৃত বালক কোথায় যাইল?

"জঙ্গলের ভিতর অন্বেষণ কর। শ্রীনগরের বীর করিমচাদের একজন সামান্য সেনা পরিশ্রান্ত হইয়া কি সুখে নিদ্রা যাইতেছে। বটবৃক্ষ, সুন্দর চন্দ্রাতপ; তৃণ, সুন্দর শয্যা; খড়্গ, সুন্দর উপাধান। বৈকালিক সূর্য্যকিরণ সেই পত্ররাশি ভেদ করিয়া বালকের মুখের উপর পড়িয়াছে, একটী বৃহৎ সর্প চক্র বিস্তার করিয়া সেই রৌদ্র নিবারণ করিতেছে। করিমচাঁদের সামান্য সেনার জন্য কি সর্প চক্র বিস্তার করিযাছে? এ সামান্য সেনা নহে, এ বালক গুপ্তবেশে রাজপুত্র! এ বালক একদিন চরণীদেবীর মন্দিরে সিংহা-সনে বসিয়াছিলেন। অদ্য সর্প বালকের রাজচ্ছত্রধারী।

"দিন গেল, মাস অতীত হইল, বৎসর অতিবাহিত হইল—সেই বালক সিংহাসনে বসিলেন, রাজচ্ছত্রধারী তাঁহার উপর ছত্র ধরিল। ঐ শুন বজ্রনাদ! ঐ দেখ, সংগ্রামসিংহের অশীতি সহস্র অশ্বারোহীতে মেদিনী কম্পিত করিতেছে! ঐ দেখ, তাঁহার অসংখ্য জয়পতাকায় আকাশ রক্তবর্ণ হইতেছে! ঐ দেখ, শতদ্রু হইতে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত ও সিন্ধু হইতে যমুনা পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে;—অষ্টাদশ যুদ্ধে জয়ী হইয়া তিনি ঐ রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন! পুনরায় কি পৃথুরায়ের ন্যায় আর্য্যাবর্ত্ত একচ্ছত্র করিবেন? না! ভারতবর্ষের পশ্চিমদিকে মেঘরাশি জড় হইতেছে, সে তুমুল ঝটিকা ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িল, নূতন আগন্তুক বাবরের মোগল সৈন্য ভারতক্ষেত্র আচ্ছন্ন করিল! ঐ শুন, ভীষণ যুদ্ধনাদ! সিংহবল প্রকাশ করিয়াও সংগ্রামসিংহ পরাস্ত হইলেন; কিন্তু বীরের বীরপ্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর,—যত দিন বাবরকে পরাস্ত না করিব, তত দিন চিতোর প্রবেশ করিব না; চিতোরের দ্বার রুদ্ধ কর, মরুভূমি আমার শয্যা,—আকাশ আমার চন্দ্রাতপ! সংগ্রামসিংহ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করেন না; পৃথুরায়ের সিংহাসনে কি আবার হিন্দুরাজা উপবেশন করিবেন? আমি বৃদ্ধ হইয়াছি আর দেখিতে পাই নাই; সংগ্রামসিংহ কোথায় গেলেন? তাঁহার অধীনস্থ ষোড়শ রাজা ও রাওয়ৎ, শতাধিক রাওয়ৎ ও রাওয়ল কোথায় গেলেন, পঞ্চশত

হস্তী অশীতি সহস্র অশ্বারোহী কোথায় গেল?—সে আলোক নির্ব্বাণ হইয়াছে, সে মহাতেজ চিরকালের জন্য লীন হইয়াছে!" চরণের বীণা এক-বার নীরব হইল, সভাস্থ সকলে নীরব ও নিস্পন্দ! সহসা উচ্চানাদে পুনরায় গীতশব্দ উঠিল।

"লীন হয় নাই! যোদ্ধাগণ সবল হস্তে খড়্গ ধারণ কর, তীক্ষ্ণ বর্শা মস্তকের উপর উত্তোলন কর,—হুঙ্কাররবে যুদ্ধে ধাবমান হও, বায়ু-তাড়িত তৃণবৎ তুর্কীদিগকে দূরে তাড়াইয়া দাও—চিতোর-নগর জয়জয়নাদে পরি-পূরিত কর। বৃদ্ধের পূর্ব্বস্মৃতি কেবল স্বপ্ন নহে, মেওয়ারের পূর্ব্বদিন আসিবে, পর্ব্বতকন্দর ও নিবিড় বন ত্যাগ করিয়া সংগ্রামসিংহের ন্যায় প্রতাপসিংহও সিংহাসন আরোহণ করিবেন; সংগ্রামসিংহের ন্যায় প্রতাপ-সিংহের নামও দিল্লীর দ্বার পর্য্যন্ত, সমুদ্রের তীর পর্য্যন্ত, হিমাচলের তুষারাবৃত উন্নত শেখর পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইবে।"

বৃদ্ধ নীরব হইল। ক্ষণমাত্র সভাস্থল নীরব, সহসা শত যোদ্ধার বজ্রনাদ ও ভীষণ হুহুঙ্কার শব্দে সালুম্ব্রার পুরাতন পর্ব্বত কম্পিত হইল। পর্ব্বতের নীচে সৈন্যগণ সে শব্দ শুনিল; শতগুণ উচ্চরবে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত করিল।

চরণদেব নিজস্থানে উপবেশন করিলে পর সালুম্ব্রাধিপতি যোদ্ধাদিগের সহিত দেশের অবস্থা ও যুদ্ধকৌশল সম্বন্ধে নানারূপ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কথোপকথনের পর পরামর্শ স্থির হইল পরে কৃষ্ণরাও বলিলেন—

"বীরগণ যুদ্ধের অধিক বিলম্ব নাই। যুদ্ধসময়ে সালুম্ব্রা সর্ব্বদাই রাণার দক্ষিণে থাকেন, আমি কেবল সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। চন্দাওয়ৎকুলের প্রধান প্রধান বীরগণ সসৈন্যে উপস্থিত হইয়াছেন। চল কল্যই আমরা মহারাণার আধুনিক রাজধানী কমলমীরাভি-মুখে যাত্রা করি।"

সকলেই এ কথায় অনুমোদন করিলেন: পরে কৃষ্ণসিংহ বলিলেন, "বীরগণ! আমাদের সভা ভঙ্গ হইল, বন্ধুগণ! অদ্য হোলীর দিন, চল একবার বাৎসরিক আনন্দে মগ্ন হই,—আগামী বৎসরে পুনরায় হোলী দেখিব, কে বলিতে পারে?" সকলেই এই কথায় মুগ্ধ হইয়া সভাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

প্রাসাদের সম্মুখে প্রশস্ত ছাদে যোদ্ধাগণ অশ্বারোহণে হোলী খেলিতে লাগিলেন, অশ্বচালনে ও আবীর নিক্ষেপে নিপুণতা দেখাইতে লাগিলেন,

পরস্পরের কুম্‌কুমে পরস্পরের মস্তক দেহ ও অশ্বদেহ রঞ্জিত হইল, অশ্বের পদশব্দ ও যোদ্ধাদিগের আনন্দরব চারিদিকে শ্রুত হইল, বাৎসরিক আনন্দের দিনে যোদ্ধাগণ অন্য চিন্তা বিস্মৃত হইলেন। অশ্বগণ কখন তীব্র-গতিতে যাইতেছে, কখন সহসা দণ্ডায়মান হইতেছে, কখন লম্ফ দিয়া পলাইতেছে, যেন তাহারাও এই ক্রীড়ায় উন্মত্ত। অশ্বারোহিগণ অসাধারণ নিপুণতার সহিত অশ্বচালনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষা ও অপরের উপর আবীর নিক্ষেপ করিতেছেন। নীচে সৈন্যগণ, নগরে নাগরিকগণ এই ক্রীড়ায় লিপ্ত হইল; সাম্বৎসরিক আনন্দরবে সালুম্ব্রা-পর্ব্বত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেনানী ও সৈন্যগণের মধ্যে কয় জন পরবৎসরে পুনরায় এই ক্রীড়া করিবে? আর কত সহস্র জন তাহার পূর্ব্বে হল্দীঘাটার ভীষণ পর্ব্বততলে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রতাপসিংহ।

কয়েক দিবস মধ্যে চন্দাওয়ৎকুলেশ্বর সালুম্ব্রাধিপতি সমস্ত চন্দায়ৎকুলের সৈন্য লইয়া কমলমীরে মহারাণার সহিত যোগ দিলেন। অন্যান্য কুলের যোদ্ধাগণ দলে দলে আসিতে লাগিল। দেবগড় হইতে সঙ্গাওয়ৎকুলেশ্বর দ্বিসহস্র সৈন্য লইয়া আসিলেন; তাঁহারাও চন্দাওয়ৎকুলের এক শাখা-মাত্র। বেদ্‌নোরের মৈর্ত্তাকুলেশ্বরগণ বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আসিলেন; তাঁহারা রাঠোরবংশীয়; মেওয়ারে তাহাদিগের অপেক্ষা সাহসী যোদ্ধা ছিল না। এই বংশের জয়মল্লই আকবর কর্ত্তৃক চিতোর আক্রমণকালে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া স্বয়ং আকবরহস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন; তাঁহার পুত্রেরা সে কথা বিস্মরণ হন নাই, পিতার বীরত্ব অনুকরণ করিতেই মহারাণার নিকট আসিয়াছেন। কৈলওয়া হইতে জগাওয়ৎকুল বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া কমলমীরে আসিলেন, তাহারাও চন্দাওয়ৎকুলের শাখামাত্র। এই কুলের পত্ত চিতোরধ্বংসকালে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, পত্তের মাতা ও বনিতা খড়্গহস্তে সম্মুখরণে প্রাণ দিয়া-ছিলেন; ষোড়শবর্ষীয় পত্ত সালুম্ব্রার মৃত্যুর পর চিতোর-দ্বার রক্ষা করেন,

অকম্পিত হৃদয়ে সম্মুখযুদ্ধে মাতা ও বনিতার মৃত্যু দেখেন, অকম্পিত হৃদয়ে সেই দ্বারদেশে সম্মুখযুদ্ধে প্রাণদান করেন। তাঁহারই উত্তরাধিকারিগণ জগাত্তয়ৎকুলেশ্বর, জগাত্তয়ৎকুলের নাম রাখিতে কৈলওয়া হইতে আসিয়া এক্ষণে মহারাণার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। দৈলওয়ারা হইতে ঝালাকুল; বৈদ্‌লা ও কোটারিও হইতে চোহানকুল, বিজলী হইতে প্রমরকুল; অন্যান্য স্থান হইতে অন্যান্য কুলের যোদ্ধাগণ, মেঘরাশির ন্যায় বীর-শ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহের চতুর্দ্দিকে জড় হইতে লাগিল। অচিরে দ্বাবিংশ সহস্র সৈন্য কমলমীরে উপস্থিত হইলেন;—সমগ্র ভারতক্ষেত্রে এরূপ দ্বাবিংশসহস্র বীরাগ্রগণ্য দেশানুরাগী যোদ্ধা আর ছিল না; সমগ্র জগতে কি ছিল?

অদ্য ফাল্গুন মাসের শেষ দিন, বসন্তোৎসবের শেষ দিন, সুতরাং রজনী দ্বিপ্রহরেও সেনাগণ এই উৎসবে মত্ত রহিয়াছে! পর্ব্বতশিখরে, উপত্যকায়, নগরের পথে, ঘাটে, গৃহস্থের বাটীতে অসংখ্য অগ্নিকুণ্ড দেখা যাইতেছে, রজনীর অন্ধকারকে প্রদীপ্ত করিতেছে, সেই কৃষ্ণ পর্ব্বতরাশিকে উদ্দীপ্ত করিতেছে। সেই অগ্নিকুণ্ডে সেনাগণ আবীর ও অন্যান্য দ্রব্য নিক্ষেপ করিতেছে; হোলীকে দগ্ধ কবিতেছে। গীতরবে ও হাস্যধ্বনিতে নৈশ নিস্তব্ধতা বিদূরিত করিতেছে। পর্ব্বতশেখর হইতে সেই অন্ধকারময় উপত্যকা যতদূব দেখা যায়, স্থানে স্থানে বৃক্ষরাশির ভিতর দিয়া এইরূপ অগ্নিকুণ্ড দৃষ্ট হইতেছে; এইরূপ আনন্দরব শ্রুত হইতেছে। কল্ কল্ রবে পর্ব্বত-নদী সেই উপত্যকার মধ্য দিয়া বহিয়া যাইতেছে ও আপন স্বচ্ছবক্ষে এই নৈশ উৎসবের ছবি, এই অসংখ্য অগ্নিশিখার প্রতিবিম্ব ধারণ করিতেছে। বসন্ত গীতের মধ্যে মধ্যে চরণদিগের যুদ্ধগীত স্থানে স্থানে শ্রুত হইতেছে; মেওয়ারের পূর্ব্বগৌরব, মেওয়ারের বিপদ্‌রাশি, মেওয়ারেব আসন্ন বিজয়, এই সমস্ত বিষয়ের গীত সৈন্যমণ্ডলীকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিল, আনন্দ-গীতের সঙ্গে সঙ্গে সেই নৈশ গগনে উত্থিত হইতে লাগিল।

এ সমস্ত উৎসব-ব্যাপার হইতে বহুদূরে একটী অন্ধকারময় পর্ব্বতশিখরে একজন যোদ্ধা একাকী পদচারণ করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে সহসা দণ্ডায়মান হইতেছিলেন, কিন্তু উৎসবের গীত শুনিবার জন্য নহে; মধ্যে মধ্যে সেই উপত্যকার মধ্যে যতদূর দেখা যায়, দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, কিন্তু উৎসবের অগ্নিকুণ্ড দেখিবার জন্য নহে।

কখন কখন কমলমীরের অপূর্ব্ব শৈলদুর্গের উপর নয়ন নিক্ষেপ করিতেছিলেন; কখন ভূমির দিকে চাহিয়া চিন্তায় অভিভূত ছিলেন; কখন বা

আপন হৃদয়ে হস্ত স্থাপন করিয়া সেই নক্ষত্রবিভূষিত অন্ধকারময় নভোমণ্ডলের দিকে দৃষ্টি করিতেছিলেন। ইনি মহারাণা প্রতাপসিংহ।

প্রতাপসিংহের কোষে অসি লম্বমান রহিয়াছে, নিকটে তৃণশয্যা রচিত হইয়াছে; চিতোর পুনরায় হস্তগত না করিয়া যোদ্ধা অন্য শয্যায় শয়ন করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই ব্রত যতদিন না সিদ্ধ হয়, ততদিন সুবর্ণ, রৌপ্য, স্পর্শ করিবেন না; জটা, শ্মশ্রু বিমোচন করিবেন না; বৃক্ষপত্র ভিন্ন অন্য পাত্রে ভোজন করিবেন না; আহার, ব্যবহার, বেশভূষায় সামান্য দ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছু স্পর্শ করিবেন না। পুরাতন মুনি ঋষিগণও ইষ্টসাধনার্থ প্রতাপসিংহ অপেক্ষা কঠোর ব্রত ধারণ করেন নাই; জগতের বীরাগ্রগণ্যগণও নিজ নিজ অভীষ্ট সাধনার্থ প্রতাপসিংহ অপেক্ষা ভীষণ উদ্যম করেন নাই।

সমগ্র ভারতভূমির ঐশ্বর্য্য, বীরত্ব, বুদ্ধিবল, বাহুবল, অস্ত্রবল, প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে একত্রিত হইয়াছে; তাহার সঙ্গে রাজস্থানের অসাধারণ বীরত্ব, মাড়ওয়ার, অম্বর, বিকানীর, বুন্দী প্রভৃতি প্রদেশের যুদ্ধবল একত্রিত হইয়াছে। ঐ নির্জ্জন পর্ব্বতশিখরে যে যোদ্ধা এই নির্জ্জন অন্ধকার রজনীতে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, উনি সমগ্র ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে একাকী যুঝিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, অথবা স্বদেশ ও স্বাধীনতার জন্য শেষ রণস্থলে মেওয়ারের শেষ উপত্যকায় বা পর্ব্বতশিখরে হৃদয়ের শোণিত দিবেন, স্থিরসঙ্কল্প করিয়াছেন!

রজনী দ্বিপ্রহরের পর মহারাণার কয়েকজন প্রধান সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; মহারাণা তাহাদিগের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া রাণার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল, তিনি সাদরে তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন।

সেই পর্ব্বতশিখরে প্রস্তরের উপরই সকলে উপবেশন করিলেন; পরে প্রতাপসিংহ বলিলেন—

"বীরগণ! আপনাদিগের সাহস, আপনাদিগের উৎসাহ দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। এই শিখর হইতে এই অসংখ্য সৈন্য দেখিয়া আমি উল্লাসিত হইয়াছি, সেই জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতে এই নির্জ্জন স্থানে আহ্বান করিয়াছি।"

সালুম্ব্রাধিপতি রাওয়ৎ কৃষ্ণসিংহ রাণার দক্ষিণদিকে বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "মহারাণা, যুদ্ধের সময়, বিপদের সময় কবে মেওয়ারের যোদ্ধাগণ মেওয়ারের মহারাণার পার্শ্ব ত্যাগ করে? ঐ যে অসংখ্য সৈন্য

দেখিতেছেন, উহাদের হৃদয়ের শোণিত, আমাদের হৃদয়ের শোণিত মহারাণার। আজ্ঞা করুন, সে শোণিত বহিতে।"

প্রতাপ। "সালুম্ব্রা! আপনার ঋণ আমি কখনও পরিশোধ করিতে পারি না। যেদিন পিতার মৃত্যু হয়, যেদিন ভ্রাতা যোগমল্ল সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, সেদিন সভার মধ্যে আপনিই তাহাকে বলিয়াছিলেন, মহারাজ! আপনার ভ্রম হইয়াছে; ঐ স্থান আপনার ভ্রাতার।' সেই দিন আপনিই আমার কোষে এই অসি ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন; যতক্ষণ অসি আমার হস্তে থাকিবে ততক্ষণ সালুম্ব্রা আমার দক্ষিণে থাকিবেন।"

সালুম্ব্রা। "সালুম্ব্রা ইহা ভিন্ন অন্য পুরস্কার চাহে না, স্বামী-ধর্ম্মই সালুম্ব্রার পুরুষানুগত ধর্ম্ম, স্বামীধর্ম্মই সালুম্ব্রার পুরুষানুগত পুরস্কার।"

পরে রাঠোর জয়মল্ল ও জগাওয়ৎ পত্তের সন্ততি ও আত্মীয়গণকে আহ্বান করিয়া মহারাণা বলিলেন—

"চিতোর ধ্বংসের সময় জয়মল্ল ও পত্ত জীবন দান করিয়া যে যশ ক্রয় করিয়াছেন, পুনরায় চিতোর অধিকার করিয়া আপনারাও কি সেই যশ ক্রয় করিতে অভিলাষ করেন।"

তাঁহারা উত্তর করিলেন, "সাধন জগদীশ্বরের হস্তে, দাসগণ চেষ্টার ক্রটী করিবে না।"

পরে কোটারির চোহানকুলেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া মহারাণা কহিলেন, "পিতা যখন হত্যাকারক রণবীরের করকবল হইতে গোপনে আনীত হইয়া এই কমলমীরে গোপনে বাস করিতেছিলেন, যখন পিতাকে সকলে সন্দেহ করিয়াছিলেন, চোহনকুলেশ্বরই পিতাকে ক্রোড়ে লইয়াছিলেন, চোহানকুলেশ্বরই তাঁহার সহিত আহার করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করেন। চোহানকুল সে স্বামীধর্ম্ম এখনও ভ্রান্ত হয়েন নাই।"

চোহান। "চোহানকুল স্বামীধর্ম্ম ভ্রান্ত হয়েন নাই।"

প্রতাপ। "বিজলীপতি! আপনার পিতাই পিতার সেই দুরবস্থায় কন্যাদান করিয়াছিলেন। মাতুল! আপনি প্রতাপের প্রতি যত্ন ভুলিবেন না, কিন্তু এই আসন্ন যুদ্ধে প্রতাপ অপেক্ষাও জন্মভূমি ও শিশোদিয়ের গৌরব আপনার যত্নের দ্রব্য, সে গৌরব রক্ষার্থ প্রতাপ সানন্দে জীবন-দান করিবে।"

উল্লাসে বিজলীপতি কহিলেন, "সে গৌরব রক্ষার্থ প্রমরকুল সানন্দে জীবনদান করিবে।"

পরে দৈলওয়ারার অধীশ্বরের দিকে চাহিয়া মহারাণা কহিলেন,—ঝালাকুল মেওয়ারের স্তম্ভস্বরূপ, আসন্ন বিপদে বোধ হয় স্তম্ভস্বরূপই থাকিবেন।"

দৈলওয়ারা উত্তর করিলেন, "ঝালা স্বামীধর্ম্ম জানে, যুদ্ধকালে মহারাণার পার্শ্বত্যাগ করে না।"

এইরূপ সকল যোদ্ধার সহিত ক্ষণেক কথোপকথন হইলে পর মহারাণা কহিলেন—

"বীরগণ! আপনাদিগকে আহ্বান কবিবার কারণ আপনাদিগের নিকট অজ্ঞাত নাই। সমগ্র ভারতক্ষেত্রের সৈন্যবল মেঘরাশির ন্যায় একত্রিত হইতেছে;—বর্ষাকালের প্রারম্ভেই মেওয়ারভূমির উপর আসিয়া পড়িবে।

"বন্ধুগণ! শত্রুগণ আমাদিগকেও সুষুপ্ত দেখিবে না। মেওয়ারের উর্ব্বরা ক্ষেত্র জঙ্গলময় দেখিবেন, মেওয়ারের পর্ব্বতবেষ্টিত প্রদেশে তাঁহাদিগের প্রবেশ নাই।

"বাপ্পা রাওয়ের বংশ কি বিদেশীয়েব নিকট শির নত করিবে? সমরসিংহ ও সংগ্রামসিংহের সন্তানগণ কি তুর্কীর দাস হইবে?—তাহা অপেক্ষা জগৎ হইতে শিশোদিয়কুল একবারে বিলুপ্ত হউক; সুন্দর মেওয়ার দেশের পর্ব্বত ও উপত্যকা সাগরজলে মগ্ন হউক।

"প্রতাপসিংহ মাতৃদুগ্ধ উজ্জ্বল করিবে। প্রতাপসিংহ একাকী তুর্কীদিগের সহিত যুঝিবে; পূর্ব্বপুরুষদিগের বাহুবল এ বাহুতে আছে কি না, দেখিবে। যোদ্ধাগণ, আমরা কন্দরে ও পর্ব্বতগুহায় বাস করিব, চিতোর ধ্বংসের অবমাননা শত যুদ্ধক্ষেত্রে ভুলিব! বাপ্পা রাওয়ের কুল স্বাধীন রাখিব; সমরসিংহ ও সংগ্রামসিংহের সন্ততিগণ দাসত্ব জানে না,—কখনও জানিবে না।

"উৎসবের দিন অদ্য শেষ হইল, আমাদিগের কার্য্যের দিবস উদয় হইতেছে। যোদ্ধাগণ, সে কার্য্যে ব্রতী হও, দৃঢ়হস্তে অসি ধারন কর, এখনও মানসিংহ ও আকবরসাহ দেখিবেন, মেওয়ারের হিন্দুগৌরব বিলুপ্ত হয় নাই।"

উল্লাসে সেনানীগণ হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধসম্বন্ধে অন্যান্য কথা কহিতে লাগিল। আক্রমণকারীগণ কত সহস্র সেনা আনিবেন, কোথায় যুদ্ধ দান করা শ্রেয়ঃ, কোন্ কোন্ দুর্গ রক্ষা করা যাইতে পারে, চিতোর উদ্ধার হইবে কি না, এই সমস্ত বিষয়ে অনেকক্ষণ কথোপকথন হইতে লাগিল। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রতাপসিংহ বলিলেন,

"যদি পিতা উদয়সিংহ কখনও না জন্মাইতেন, যদি পিতামহ সংগ্রামসিংহের পরই আমি জন্মাইতাম, তবে চিতোর তুর্কী-হস্তগত হইত না, রাজস্থানে তুর্কীগণ পদবিক্ষেপ করিতেন না।"

পূর্ব্বদিকে দিবা দেখা দিতেছে এরূপ সময়ে সেই সভা ভঙ্গ হইল। রাণা বলিলেন—"বন্ধুগণ, এক্ষণে আপনারা যাইয়া বিশ্রাম করুন; প্রতাপ-সিংহের এই শয্যা; যতদিন চিতোর উদ্ধার না হয়, ততদিন অন্য শয্যা নাই।"

সেনানীগণ উত্তর করিলেন—"মহারাণার যথায় শয্যা, দাসদিগের তথায় শয্যা।"

সেই পর্ব্বতশিখরে মহাবীর প্রতাপসিংহ ও প্রধান প্রধান সেনানীগণ সেই তৃণশয্যায় শয়ন করিলেন। দূর্ব্বাদল তাঁহাদিগের রাজগদী, নীল নভোমণ্ডল তাঁহাদিগের চন্দ্রাতপ। কেবল সেই দিন নহে, পঞ্চবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত মহারাণা, মহারাজ্ঞী ও রাজপুত্রদিগের অন্য শয্যা ছিল না। এ কঠোর তপস্যার কি ফল ফলিয়াছিল? এ তপস্যার ফল এ জগতে ফলে না।

পরদিন এক প্রহর পর্য্যন্ত সেনাদিগের বসন্তোৎসব চলিতে লাগিল; তৎপরে অগ্নি নির্ব্বাণ হইল, গীতরব ও হাস্যধ্বনি শেষ হইল; সৈন্যগণ দলে দলে নদীতে স্নান ও পূজা করিয়া আপন আপন কার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল।

বসন্তোৎসব শেষ হইল, বসন্তের ধুমধাম ও গীতধ্বনি লীন হইয়া গেল। উৎসবদিবসান্তে কার্য্যের দিন উদয় হইল; সেনাগণ সেই ভীষণ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মানসিংহ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর দুই তিন মাস অতিবাহিত হইল। এই কয়েক মাস প্রতাপসিংহ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি যে পর্ব্বতবেষ্টিত প্রদেশখণ্ড রক্ষা করিবার মানস করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রত্যেক দুর্গ, প্রত্যেক উপত্যকা, প্রত্যেক পর্ব্বত-কন্দর শতবার দর্শন করিলেন। দুর্গে খাদ্য সঞ্চয় করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, সৈন্যগণকে, সমস্ত মেওয়ারবাসীদিগকে

উৎসাহিত করিলেন। যোদ্ধা দুর্গেশ্বরগণ সসৈন্যে রাণার সহিত যোগ দিলেন, ভূমিয়াগণ সম্মুখরণ জানে না, কিন্তু নিজ নিজ ভূমি রক্ষার্থ প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইল; দলে দলে একীকৃত হইয়া শত্রুর অপেক্ষা করিতে লাগিল। মেওয়ারের অসভ্য জাতিগণও এরূপ বীরাগ্রগণ্য মহারাণার উৎসাহে উৎসাহিত হইল। দক্ষিণে ভীলগণ, পূর্ব্বে মীরগণ, পশ্চিমে মীনাগণ, ধনুর্ব্বাণ-হস্তে আসিয়া আর্য্য রাজপুত যোদ্ধাদিগের সহিত যোগ দিল। সমস্ত প্রদেশ রণরঙ্গে উন্মত্ত হইল।

সর্ব্বদাই মহারাণা অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া পর্ব্বতপ্রদেশ হইতে নির্গত হইতেন। দেখিতেন, তাঁহার আদেশ অনুসারে মেওয়ারের সমভূমি ও "উদ্যানস্থল" এক্ষণে জনশূন্য ও অরণ্যময়। মনুষ্যালয়ের স্থানে হিংস্রক জীবজন্তু বাস করিতেছে, শস্যক্ষেত্রে অরণ্য হইয়াছে, বুনাস ও বরীনদীর উপকূলে মনুষ্য-আকৃতি দৃষ্ট হয় না, মনুষ্যরব শ্রুত হয় না। প্রতাপের সৈন্য দেখিয়া অরণ্যবিচারী পক্ষী কুলায় ছাড়িয়া চীৎকারশব্দে আকাশের দিকে উড্ডীন হইল, অরণ্যবাসী জন্তুগণ দূরে নিবিড় অরণ্যের মধ্যে পলাইল। যতদূর দৃষ্টি হয়, যেন দৈবসম্পাতে এই মনুষ্যের আবাসস্থল নির্জ্জন, নিঃশব্দ অরণ্য হইয়া গিয়াছে। কণ্টকময় বাবুলবৃক্ষে ও জঙ্গলে এই বিস্তীর্ণ জনপদ আচ্ছাদিত হইয়াছে। নিঃশব্দে এই বন বিচরণ করিয়া প্রতাপসিংহ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন; বলিতেন, "সমগ্র মেওয়ারদেশ এইরূপ নির্জ্জন, নিঃশব্দ অরণ্যভূমি হউক, কিন্তু সে পবিত্র ভূমি তুর্কী-পদবিক্ষেপে যেন কলঙ্কিত না হয়।"

সমস্ত দিন এইরূপ যুদ্ধের আয়োজনে অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার সময় আপন পর্ব্বতকন্দরে বা সামান্য কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন; দেখিতেন, পাটেশ্বরী স্বহস্তে অগ্নি জ্বালিয়া রন্ধন করিতেছেন, পুত্রগণ চারিদিকে হীন-পরিচ্ছদে ক্রীড়া করিতেছে। রণপরিচ্ছদ ত্যাগ করিতে করিতে সস্নেহে কহিতেন, "জগদীশ্বর! যেন অমরসিংহ ও অমরসিংহের মাতা চিরকাল এই আবাসে বাস করে, কিন্তু তুর্কীর করপ্রদ হইয়া প্রাসাদ বাস না করে।"

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। অবশেষে সম্রাট্ আকবরের পুত্র যুবরাজ সলীম মানসিংহের সহিত অসংখ্য সৈন্য লইয়া মেওয়ার আক্রমণ করিতে আসিলেন। সাগরতরঙ্গের ন্যায় এই অসংখ্য সেনা মেওয়ারের বহির্ভাগ অধিকার করিল; সতর্ক প্রতাপসিংহ কোন প্রতিরোধ করিলেন না। ক্রমে মোগলসৈন্য সুরক্ষিত পর্ব্বতপ্রদেশের নিকট আসিল; দেখিল, সে দুর্গম প্রদেশের দ্বার রুদ্ধ। সেই দ্বার, সেই একমাত্র প্রবেশ-

স্থল—হল্‌দীঘাটা। দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত সেই দ্বারের প্রহরী! মানসিংহ চিন্তাকুল হইয়া নিকটে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন; সমগ্র মোগলসৈন্য যুদ্ধার্থে একীভূত ও প্রস্তুত করিলেন।

পাঠক! যুদ্ধের প্রাক্কালে চল, আমরা একবার মোগলশিবির প্রবেশ করি। সে মহাবীর অম্বরাধিপতি দিল্লীর দাসত্ব স্বীকার করিয়া দিল্লীর বিজয়পতাকা বঙ্গদেশ হইতে কাবুল পর্য্যন্ত উড্ডান করিয়াছিলেন, সেই বীরাগ্রগণ্য মহারাজা মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করি। হায়! জাতি-বিরোধের ন্যায় আর বিরোধ নাই,—জাতিবিরোধের জন্য অদ্য রাজপুত-কুলতিলক মানসিংহ রাজপুতকুলতিলক প্রতাপসিংহের ভীষণ শত্রু!

রজনীতে বহুসংখ্যক মোগলশিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে; শিবিরের আলোকে সেই অন্ধকারময় পর্ব্বতপ্রদেশ উদ্দীপ্ত হইয়াছে। স্থানে স্থানে সৈন্যগণ একত্র হইয়া কলরব করিতেছে। মেওয়ারীদিগের যেরূপ প্রতিজ্ঞা, কল্য কিম্বা পরশ্ব ভীষণ যুদ্ধ হইবে, সে যুদ্ধ হইতে কয়জন পুনরায় দূর দিল্লী প্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে?

এই শিবিরশ্রেণীমধ্যে রক্তবস্ত্র-মণ্ডিত অসংখ্য দীপ ও পতাকা-বিভূষিত যুবরাজের শিবির দৃষ্ট হইতেছে; প্রশস্ত শিবিরের মধ্যে যুবরাজ সলীম প্রফুল্লচিত্তে গীত শুনিতেছেন; সম্মুখে সুরাপাত্র, নিকটে কলকণ্ঠা প্রৌঢ়-যৌবনা কয়েকজন গায়কী। যুবরাজের অবয়ব দীর্ঘ, বলিষ্ঠ ও অতিশয় সুন্দর; সেই দেবকান্তি দেখিয়া প্রসিদ্ধ নূরজাহান বিমোহিত হইয়াছিলেন। কল্য যুদ্ধ হইবে, কিন্তু অদ্য সেই প্রশস্ত ললাট চিন্তাশূন্য,—সেই সুন্দর আনন নিরুদ্বেগ ও হাস্যরঞ্জিত।

শিবির হইতে এখনও আনন্দের শব্দ উত্থিত হইতেছে, এরূপ সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "জাহাঁপনা, রাজা মানসিংহ আসিয়াছেন। বিশেষ প্রয়োজনজন্য সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।"

যুবরাজ বুঝিলেন, রাজা যুদ্ধপরামর্শ করিতে আসিয়াছেন। গীত ক্ষান্ত হইল, যুবরাজ সকলকে বিদায় দিলেন।

ক্ষণেক পর বীরশ্রেষ্ঠ অম্বরাধিপতি মানসিংহ শিবিরে প্রবেশ করিয়া যুবরাজকে তসলীম করিলেন। সহাস্যবদনে সলীম তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। দ্বার রুদ্ধ করিয়া দুইজনে নিঃশব্দে উপবেশন করিলেন।

মানসিংহ ও সলীম উভয়েই যুবক, উভয়েই সাহসী যোদ্ধা, উভয়েই যৌবনোচিত উৎসাহে উৎসাহী। কিন্তু সলীম সম্রাট্‌পুত্র, সুতরাং সুখ-প্রিয় ও বিলাসী, তাঁহার ন্যায় বিলাসী কখনও দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ

করেন নাই। তাঁহার স্বভাব সরল ও উদার; যৌবনেই কার্য্যপ্রিয়তা অপেক্ষা সুখপ্রিয়তা প্রবল হইয়াছিল। পরে এই সুখপ্রিয়তা এইরূপ প্রবল হয়, যে সুর্জাহান ঐ রাজ্য শাসন করেন, দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর বন্ধু ও অমাত্য, রমণী ও মদিরা লইয়া কালযাপন করিতেন। এ সকল দোষ থাকিলেও সলীম নির্গুণ ছিলেন না, উদারতা ও সরলতা সুখপ্রিয়তার সহিত তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই বিরাজ করিত।

মানসিংহ অসাধারণ ধীসম্পন্ন, অসাধারণ স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও কার্য্যপটু, অসাধারণ যোদ্ধা। দিল্লী হইতে নির্গত হইয়া অবধি মানসিংহই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেন, সলীম মানসিংহের উপরই নির্ভর করিতেন।

সলীম কহিলেন, "রাজন্, শত্রুদিগের রণসজ্জা আপনি দেখিয়াছেন? কবে যুদ্ধ শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন?"

মানসিংহ। "এ দাস কল্যই যুদ্ধদান উচিত বিবেচনা করে, বর্ষাকালের বিলম্ব নাই; যত শীঘ্র দিল্লীশ্বরের কার্য্য সমাধা হয়, ততই ভাল।"

সলীম। "আমারও সেই মত, দিল্লীশ্বরের সেনার সম্মুখে এপর্য্যন্ত মেওয়ারীগণ দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই, কল্যও পারিবে না।"

মান। "তাহার সন্দেহ নাই; তথাপি আজ্ঞা দিলে ইহাও নিবেদন করি, যে কল্য প্রকৃত যুদ্ধ হইবে। এতদিন আমরা যে শ্রম সহ্য করিয়াছি, কল্যকার কার্য্যের সহিত তুলনা করিলে সে কেবল বাল্যক্রিড়া মাত্র।"

সলী। "প্রকৃত যুদ্ধই তৈমুরলঙ্গবংশীয়দিগের রঙ্গস্থল, কিন্তু কতক্ষণ সে যুদ্ধ স্থায়ী, মৃগ ও ব্যাঘ্রে কতক্ষণ যুদ্ধ সম্ভবে? পিতার সেনার সম্মুখে ভীরু প্রতাপ দূরে পলাইবে।"

মান। "আপনার পিতার সেনার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে এরূপ সেনা ভারতক্ষেত্রে নাই, তথাপি প্রতাপসিংহ সহসা পলাইবে না; এ দাস তাহাকে জানে।" মানসিংহ শির নত করিলেন।

সলী। "মানসিংহ! আপনি আরও কি বলিতেছিলেন, সহসা থামিলেন কেন? এই প্রতাপের সাহসের কথা আমিও শুনিয়াছি, তাহা ভিন্ন আর কি অবগত আছেন?"

মান। "প্রতাপসিংহের সহিত পূর্ব্বে একবার এ দাসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেইজন্যই বিশেষ করিয়া তাহাকে জানি।"

সলী। "কি জানেন?"

মান। "প্রতাপ ঘোর বিদ্রোহী, দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধাচারী; কল্য ভীষণ যুদ্ধ হইবে, কেবল এই কথা দাস নিবেদন করিতে আসিয়াছিল। আবার মস্তক নত করিলেন।

সলী। "সে কথা ত আমিও অবগত আছি, আপনার কি আর কিছু বক্তব্য নাই? মানসিংহ! দিল্লী ত্যাগ করিয়া অবধি আপনি আমার দক্ষিণ-হস্তের স্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন; আপনার উপর সকল কার্য্য নির্ভর করিয়াছি, আপনার নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিয়াছি; আপনি কি আমার নিকট হইতে কোন পরামর্শ গোপন করিতে ইচ্ছা করেন?"

মান। "প্রভুর নিকট কোন পরামর্শ এ দাস গোপন করে নাই; কেবল প্রতাপের নিকট আমার একটী ঋণ আছে, সেই কথার স্মরণ হওয়ায় আমার সহসা বাক্‌রোধ হইয়াছিল।"

সলী। "প্রতাপও হিন্দু, আপনিও হিন্দু, ঋণ ও সৌহৃদ্য থাকা সম্ভব। আপনি যদি সুহৃদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হয়েন, দূরে থাকিবেন; সলীম একাকী যুদ্ধদান করিবে, দেখিবে প্রতাপ বাহুতে কত বল ধারণ করে।"

মানসিংহের নয়ন অগ্নিবৎ প্রজ্জ্বলিত হইল, তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন, "প্রতাপের নিকট যে ঋণ আছে তাহা তাহার হৃদয়ের শোণিতে পরিশোধ হইবে। আপনার নিকট গোপন করিবার আমার কিছুই নাই, পূর্ব্ব-অবমাননা-কথাও গোপন করিব না। আপনার পিতার নিকট কহিয়াছি, আপনাকেও কহিব, শ্রবণ করুন—

"যখন শোলাপুর হইতে আমি হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলাম, মহারাণা প্রতাপসিংহের সাক্ষাতাভিলাষে আমি মেওয়ারে আসিয়াছিলাম। মেওয়ারের রাণা সূর্য্যবংশীয় ও রাজপুতকুলের মধ্যে অগ্রগণ্য; সুতরাং রাজস্থানের সকল রাজার পূজনীয়। প্রতাপসিংহ সম্প্রতি রাণা হইয়াছেন, এইজন্য আমি তাঁহার সহিত দর্শন করিতে আসিয়াছিলাম।

"চিতোরধ্বংসের পর উদয়সিংহ উদয়পুর রাজধানী করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রতাপ পিতার প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া কমলমীরের পর্ব্বতদুর্গে থাকেন। আমার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া আমাকে আহ্বান করিবার জন্য কমলমীর হইতে উদয়সাগর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন।

"উদয়সাগরের কূলে মহা সমারোহে ভোজনাদি প্রস্তুত হইল। আমি ভোজনে বসিলাম, কিন্তু রাণা দেখা দিলেন না। প্রতাপের পুত্র অমরসিংহ বলিলেন, যে তাঁহার পিতার শিরোবেদনা হইয়াছে, তিনি সেই হেতু

আসিতে না পারিয়া আতিথেয় করিবার জন্য সন্তানকে প্রেরণ করিয়াছেন ; সেজন্য আমি যেন দোষ গ্রহণ না করিয়া ভোজন আরম্ভ করি।

"মানসিংহ জগৎ দেখিয়াছে, মানবচরিত্র পাঠ করিয়াছে, এ শিরোবেদনার কারণ বুঝিল। দিল্লীশ্বরের সহিত কুটুম্বত্ব করিয়াছি বলিয়া গর্ব্বিত বিদ্রোহী প্রতাপসিংহ আমার আতিথেয় করিতে অস্বীকার করিলেন।"

মানসিংহের স্বর ক্রোধে রুদ্ধ হইল।

সলীম বলিলেন—"তাহার পর?"

মান। "আমি অমরকে বলিলাম, রাণাকে জানাইবেন, আমি শিরোবেদনার কারণ অবগত আছি;—যাহা হইয়াছে তাহা খণ্ডাইবার উপায় নাই; সেজন্য মহারাণা যদি আমার সম্মুখে কাংশ না দেন, কে দিবেন?

"প্রতাপসিংহ আমার সে ভদ্র অভ্যর্থনায় যে অভদ্র উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা মানসিংহ এ জীবনে ভুলিবে না;—অথবা কল্য রণস্থলে ভুলিবে!"

সলীম। "কি উত্তর দিয়াছিল?"

মান। "প্রতাপ বলিয়া পাঠাইলেন, তুর্কীকে যে রাজপুত ভগিনী সম্প্রদান করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তুর্কীর সহিত যাঁহার আহার হয়, তাঁহার সহিত রাণা খাইতে পারেন না।"

সলীমের নয়ন এবার রোষে জ্বলিয়া উঠিল, বলিলেন, "তাহার পর?"

মান। "তাহার পর আমি অস্পৃষ্ট অন্ন রাখিয়া উঠিলাম; কেবল কয়েকটী দানা অন্নদেবের নাম করিয়া উষ্ণীষে রাখিলাম; সেই দিন পণ করিলাম, যদি সেই গর্ব্বিতের গর্ব্ব নাশ না করি, আমার নাম মানসিংহ নহে। সেই অবমাননা-ঋণ—প্রতাপের হৃদয়ের শোণিতে কল্য পরিশোধ করিব।"

মানসিংহের সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছিল, নয়ন হইতে যেন জ্বলন্ত অগ্নি বহির্ভূত হইতেছিল।

সলীমও অবিচলিত ছিলেন না, সরোষে বলিলেন, "বীরপ্রবর! আপনার যে অবমাননা করিয়াছে; আমাদের তদপেক্ষা অধিক অবমাননা করিয়াছে; সলীম তাহার পরিশোধ দিতে সক্ষম। আমাদিগের একই অবমাননা, একই পরিশোধ; কল্য একত্র সেই অবমাননার পরিশোধ করিব, অদ্য ব্যস্ত হইবেন না।"

সলীমের এই প্রতিজ্ঞায় মানসিংহের হৃদয়ের জ্বালা কিঞ্চিৎ শান্ত হইল; চক্ষুতে একবিন্দু জল আসিল, সলীমকে নিস্তব্ধে আলিঙ্গন করিয়া নিঃশব্দে শিবির হইতে বহির্গত হইলেন।

সে রজনীতে যুবরাজের শিবিরে আর গীত বা বাদ্যধ্বনি বা আনন্দরব শুনা গেল না। প্রভাত না হইতে হইতেই অন্য বাদ্য শ্রুত হইল, অন্য রবে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হলদীঘাটার যুদ্ধ।

তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল, একদিকে অসহ্য অবমাননার প্রতিশোধ-বাঞ্ছা; অপর দিকে শিশোদিয়কুলের চিরস্বাধীনতা রক্ষার স্থিরপ্রতিজ্ঞা। একদিকে মোগল ও অম্বরের অসংখ্য ও সুশিক্ষিত সৈন্য, অপর দিকে মেওয়ারের অতুল ও অপরিসীম বীরত্ব। তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

হলদীঘাটার উপত্যকায় ও উভয় পার্শ্বের পর্ব্বতের উপর দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত সজ্জিত রহিয়াছে; দলে দলে যোদ্ধাগণ আপন আপন কুলাধিপতির চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া অপূর্ব্ব রণ দিতেছে; কখনও বা দূর হইতে তীর বা বর্শা নিক্ষেপ করিতেছে, কখনও বা কুলাধিপতির ইঙ্গিতে বর্ষাকালের তরঙ্গের ন্যায় দুর্দমনীয় তেজে শত্রুসৈন্যের মধ্যে পড়িয়া ছারখার করিতেছে।

পর্ব্বতের শিখরের উপর অসভ্যজাতিগণ ধনুর্ব্বাণহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বর্ষার বৃষ্টিবিন্দুর ন্যায় তীর নিক্ষেপ করিতেছে, অথবা সুবিধা পাইলেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড শত্রুসৈন্যের উপর গড়াইয়া দিতেছে।

অদ্য তুমুল উৎসবের দিন; সে উৎসবে কেহ পরাঙ্মুখ হইলেন না। চোহান ও রাঠোর, ঝালা, চন্দাওয়ৎ ও জগাওয়ৎ সকল কুলের যোদ্ধাগণ ভীষণনাদে শত্রুর উপর পড়িতে লাগিল। এক দল হত হয়, অন্য দল অগ্রসর হয়; অসংখ্য সৈন্যের শবরাশির উপর দিয়া অসংখ্য সৈন্য অগ্রসর হইতেছে। এ ঘোর উৎসবে যেন বিপদই বাঞ্ছনীয়, যেন মৃত্যুই জয়লাভ।

কিন্তু দিল্লীর অসংখ্য সৈন্যের বিরুদ্ধে এ বীরত্ব কি করিবে; দিল্লীর ভীষণ কামানশ্রেণী হইতে ঘন ঘন মৃত্যুর আদেশ বহির্গত হইতে লাগিল, দলে দলে রাজপুতগণ আসিয়া জীবন দান করিলেন।

এই বিঘোর উৎসবে প্রতাপসিংহ পশ্চাতে ছিলেন না। যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে অম্বরাধিপতির দিকে ধাবমান হইলেন, কিন্তু দিল্লীর অসংখ্য সেনা

ভেদ করিয়া তথায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না। অসাধারণ চেষ্টা ব্যর্থ দেখিয়া রোষে বলিলেন, "কাপুরুষ! দিল্লীর দাস! দিল্লীর সৈন্য-বলে অদ্য জীবন রক্ষা পাইলে। রাজপুতকুলাঙ্গার! রাজপুতগণ নিজ খড়্গের উপর নির্ভর করে, সে ধর্ম্ম অদ্য ভুলিলে?" মানসিংহ বহুদূরে তীব্রনয়নে সৈন্যরচনায় ব্যস্ত ছিলেন, এ তিরস্কার-কথা শুনিতে পাইলেন না।

তৎপরে প্রতাপসিংহ সলীম যথায় হস্তী আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেইদিকে নিজ অশ্ব ধাবমান করিলেন। এবার ভীষণনাদে রাজপুতগণ মোগলসৈন্য বিদীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইল। স্তরে স্তরে মোগলসৈন্য সজ্জিত ছিল। বর্ষাকালের পর্ব্বততরঙ্গের ন্যায় সমস্ত প্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া প্রতাপসিংহ ও তাঁহার সৈন্যগণ অগ্রসর হইলেন; বর্শা ও অসি-আঘাতে সৈন্যরেখা লণ্ডভণ্ড করিয়া অগ্রসর হইলেন; কাহার সাধ্য সে গতি রোধ করে? সলীম ও প্রতাপসিংহ সম্মুখীন হইলেন।

দুই পক্ষের প্রসিদ্ধ যোদ্ধাগণ নিজ নিজ প্রভুর রক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন। অচিরে যে তুমুল হত্যাকাণ্ড, যে ভীষণ জয়নাদ ও আর্ত্তনাদ আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। রাজপুত ও মোগলদিগের বিভিন্নতা রহিল না; শত্রু ও মিত্রের বিভিন্নতা রহিল না। দুই পক্ষের পতাকার চারিদিকে শব রাশীকৃত হইল।

প্রতাপের অব্যর্থ খড়্গাঘাতে সলীমের রক্ষকগণ ভূতলশায়ী হইল, তখন প্রতাপ সলীমকে লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘ বর্শা নিক্ষেপ করিলেন; হাওদার লৌহে সেই বর্শা প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় সলীম সেদিন জীবন রক্ষা পাইলেন। রোষে গর্জ্জন করিয়া প্রতাপ অশ্ব ধাবমান করাইলেন, অশ্ববর চৈতকও প্রতাপের যোগ্য; লম্ফ দিয়া হস্তীর শরীরের উপর সম্মুখের পদ স্থাপন করিল। প্রতাপের অব্যর্থ আঘাতে হস্তীর মাহুত হত হইল; হস্তী তখন প্রভুর বিপদ্ জানিয়াই যেন সলীমকে লইয়া পলায়ন করিল; তুমুল শব্দে দুর্দ্দমনীয় ও অপ্রতিহত রাজপুত পশ্চাদ্ধাবন করিলেন; মোগলসৈন্যের শ্রেণী বিদীর্ণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রতাপসিংহের সে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া হিন্দুগণ আর্জ্জুনির কথা স্মরণ করিল; মুসলমানগণ মুহূর্ত্তের জন্য মনে মনে প্রমাদ গণিল।

তখন মুসলমানগণ নিজের বিপদ্ দেখিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। মুসলমান যোদ্ধাগণ ভীরু নহে, পঞ্চ শত বৎসর ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছে, অদ্য হিন্দুর নিকট অবমাননা স্বীকার করিবে না; একবার "আল্লাহ আকবর" শব্দে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিয়া প্রতাপকে চারিদিকে বেষ্টন

করিল। রাজপুতগণ পলায়ন জানে না, প্রভুর চারিদিকে অন্যায় সমরে হত হইতে লাগিল। প্রতাপসিংহ প্রায় একাকী শত শত্রুর মধ্যে অপূর্ব্ব যুদ্ধ করিতেছেন। শরীরের সপ্তস্থানে আহত হইয়াছেন,* কিন্তু তথনও বিপদ্ জানেন না, তথনও সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন!

পশ্চাৎ হইতে রাজপুতগণ মহারাণার বিপদ্ দেখিলেন, তখন হুঙ্কারশব্দ করিয়া বীরগণ শিশোদিয়ার পতাকা লইয়া অগ্রসর হইলেন, পতাকা দেখিয়া সৈন্যগণ অগ্রসর হইল, মোগলসৈন্য বিদীর্ণ করিল; প্রতাপ যেস্থানে প্রায় একাকী যুদ্ধ করিতেছিলেন, তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল, সজোরে প্রভুর অনিচ্ছায় প্রভুকে সেই নিশ্চয় মৃত্যু হইতে সরাইয়া আনিল, সে উদ্যমে শত রাজপুত প্রাণদান করিলেন। রাজপুতের হৃদয়ের শোণিত রাণার;—রাণার জন্য সে শোণিত বহিল।

একবার নহে, সেইদিন ক্রমান্বয়ে তিনবার প্রতাপসিংহ যুদ্ধমদে সংজ্ঞা হারাইয়া মোগলরেখার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলেন; তিনবার তাঁহার রাজচ্ছত্র শত্রুবেষ্টিত দেখিয়া রাজপুতগণ পশ্চাৎ হইতে অগ্রসর হইয়া সমরোন্মত্ত বীরকে নিশ্চয় মৃত্যুর কবল হইতে সবলে উদ্ধার করিয়া আনে। যে বাহু একাকী ভারতবর্ষের বলবীর্য্যের সহিত যুঝিতে সাহস করিয়াছিল, অদ্য ভারতবর্ষের একীকৃত সৈন্যগণ সে বাহুর বিক্রমের পরিচয় পাইল।

তখনও প্রতাপের উন্মত্ততার শান্তি হয় নাই। চারিদিকে রাজপুত হত ও আহত হইয়াছে দেখিয়া রোষে পুনরায় অগ্রসর হইলেন। সে তেজ কে প্রতিহত করিতে পারে? পুনরায় শত্রুসেনা ভেদ করিয়া শত্রুকটকে সসৈন্যে প্রবেশ করিলেন।

এবার মোগলগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইল;—রোষে হুঙ্কার করিয়া শত শত সেনা প্রতাপকে বেষ্টন করিল; প্রতাপের বহির্গমনের আর পথ নাই। এবার মোগলগণ এই কাফের বীরকে হত করিয়া দিল্লীশ্বরের হৃদয়ের কন্টকোদ্ধার করিবে; মানসিংহের অবমাননার পরিশোধ দিবে।

এবার রাজপুতদিগের মহা বিপদ্ উপস্থিত। প্রতাপের সঙ্গী যোদ্ধাগণ একে একে হত হইতে লাগিলেন; শত্রুকে হত করিতে লাগিলেন; কিন্তু শত্রুসংখ্যা অগণ্য; একজন হত হয়, দশ জন তাহার স্থানে উপস্থিত হয়। প্রতাপসিংহ আপন বিপদ্ জানেন না, কিন্তু তাঁহার সঙ্গিগণ ক্রমে অল্প

---

* এক স্থানে গুলির আঘাত, তিন স্থানে বর্শার আঘাত, অপর তিন স্থানে খড়্গের আঘাত।

হইতেছে, শত্রুরাশি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রতাপসিংহ উন্মত্ত! তথনও অগ্রসর হইতেছেন।

পশ্চাতে রাজপুতগণ মহারাণার বিপদ্ দেখিয়া বার বার তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মোগলসৈন্য অসংখ্য, রাজপুতদিগের প্রধান প্রধান বীর হত হইয়াছে, রাজপুতগণ হীনবল হইয়াছে, প্রভুর উদ্ধার অসম্ভব।

বার বার দলে দলে রাজপুতগণ প্রভুর উদ্ধারচেষ্টা করিল, দলে দলে কেবল অসংখ্য শত্রুকে বিনাশ করিয়া আপনারা বিনষ্ট হইল, মোগলরেখা অতিক্রম করিতে পারিল না, প্রভুর উদ্ধার করিতে পারিল না।

দূর হইতে দৈলওয়ারার মল্ল এই ব্যাপার দেখিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করিলেন, ইষ্টদেবতা স্মরণ করিলেন; পরে আপনার ঝালাবংশীয় যোদ্ধা লইয়া সম্মুখে ধাবমান হইলেন।

মেওয়ারের কেতন স্বুবর্ণসূর্য্য একজন সৈনিকের হস্ত হইতে আপনি লইলেন, মহা কোলাহলে সেই কেতন লইয়া ঝালাকুলের সহিত অগ্রসর হইলেন।

সে তেজ মোগলগণ প্রতিরোধ করিতে পারিল না, বীরপ্রবর মল্ল শত্রুরেখা বিদীর্ণ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে ঝালাকুল, যথায় প্রতাপ উন্মত্ত রণকুঞ্জরের ন্যায় যুদ্ধ করিতেছিলেন, তথায় উল্লাসরবে উপস্থিত হইল।

মল্ল সবলে প্রভুকে রক্ষা করিলেন,—সেই উদ্যমে সম্মুখরণে আপনার প্রাণদান করিলেন।

পতনশীল দেহের দিকে চাহিয়া মহানুভব প্রতাপ বলিলেন, "দৈল-ওয়ারা! অদ্য আপনার জীবন দিয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ।"

দৈলওয়ারা ক্ষীণস্বরে উত্তর করিলেন, "ঝালা স্বামী-ধর্ম্ম জানে; বিপদ্-কালে মহারাণার পার্শ্ব ত্যাগ করে না।" জীবনশূন্য দেহ ভূতলে পতিত হইল।

প্রতাপসিংহ স্মরণ করিলেন, ফাল্গুন মাসের শেষ দিন রজনীতে দৈলওয়ারা এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত যোদ্ধার মধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র সেদিন ভূতলশায়ী হইলেন;—অবশিষ্ট আট সহস্রমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিল; প্রতাপসিংহ অগত্যা হলদীঘাটার যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। মোগলগণ জয়লাভ করিল, কিন্তু সে যুদ্ধকথা সহসা বিস্মৃত হইল না। বহু বৎসর পরে দিল্লীতে, দাক্ষিণাত্যে বা বঙ্গদেশে প্রাচীন মোগলযোদ্ধাগণ যুবক সেনাদিগের নিকট হলদীঘাটা ও প্রতাপসিংহের বিস্ময়কর গল্প বলিয়া সন্ধ্যা বা সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতৃদ্বয়।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রতাপ পলায়ন করিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহার বিপদ্ শান্তি হয় নাই ; দুই জন মোগল, একজন খোরাসানী, অপর জন মুলতানী, তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন। প্রতাপের তেজস্বী অশ্ব চৈতক লম্ফ দিয়া একটী পর্ব্বতনদী পার হইয়া গেল ; মোগলগণের সেই নদী পার হইতে বিলম্ব হইল। কিন্তু চৈতকও আহত, প্রতাপও আহত। পশ্চাদ্ধাবক সন্নিকটে আসিতেছে, তাহাদিগের অশ্বের পদশব্দ সেই পর্ব্বতরাশিতে শব্দিত হইতেছে, প্রতাপ শুনিতে পাইলেন। এবার রক্ষা নাই জানিলেন, কিন্তু বীরের ন্যায় মরিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন।

সহসা পশ্চাৎ হইতে স্বর শুনিলেন, "হো নীলা ঘোড়ারা আসওয়ার।" পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, কেবল একজন অশ্বারোহী। সেই অশ্বারোহী তাঁহার বিষম শত্রু ও সহোদর ভ্রাতা শক্ত!

রোষে প্রতাপসিংহ কহিলেন, "সংগ্রামসিংহের পৌত্র হইয়া মোগলের দাস হইয়াছ, ইহাতেও যথেষ্ট কলঙ্ক হয় নাই ; এক্ষণে ভ্রাতাকে বধ করিতে পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছ? কুলকলঙ্ক! প্রতাপসিংহ অদ্য সংগ্রামসিংহের বংশ নিষ্কলঙ্ক করিবে।" শক্ত প্রতাপের কথায় ভীত হইলেন না, রুষ্ট হইলেন না, ধীরে ধীরে প্রতাপের নিকটে আসিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ, একদিন আপনার প্রাণনাশে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম, অদ্য সে ভাব তিরোহিত হই-য়াছে। ভ্রাতার দোষ মার্জ্জনা করুন, কুলকলঙ্ককে পবিত্র কুলে আশ্রয় দিন, আর সে কুলের অবমাননা করিবে না। রাজন্! আপনি জ্যেষ্ঠ, আপনি না মার্জ্জনা করিলে কে মার্জ্জনা করিবে?"

প্রতাপসিংহ দেখিলেন, শক্তের নয়নে জল। বহুদিনের বৈরভাব দূরে গেল, ভ্রাতৃস্নেহে উভয়ের হৃদয় উথলিল, উভয়ে উভয়কে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন।

প্রতাপের মহত্ব, প্রতাপের বীরত্ব দেখিয়া অদ্য শক্তের বৈরভাব তিরো-হিত হইয়াছে, বহু বৎসরের ভ্রাতৃবিরোধ তিরোহিত হইয়াছে, ভ্রাতার নিকট ভ্রাতা ক্ষমা যাচ্ঞা করিতেছে ; স্নেহ যাচ্ঞা করিতেছে ; প্রতাপ কি সেই

স্নেহদানে বিরত হইবেন? প্রতাপ পূর্ব্বদোষ বিস্মৃত হইলেন, সাশ্রুনয়নে হৃদয়ের ভ্রাতাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন।

যে দুই জন মোগল প্রতাপকে পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, তাহারা কোথায়? শক্ত দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন; ভ্রাতার প্রাণনাশের সম্ভাবনা দেখিয়াছিলেন; অব্যর্থ বর্শায় সে মোগলদিগের প্রাণনাশ করিয়াছিলেন; পরে ভ্রাতার নিকট ভ্রাতৃস্নেহ যাচ্ঞা করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার ছায়া সেই নির্জ্জন উপত্যকায় অবতীর্ণ হইতে লাগিল, পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিতে লাগিল, জগৎকে ব্যাপ্ত করিতে লাগিল; সেই নির্জ্জন নিঃশব্দ উপত্যকায় দুই ভ্রাতা অনেক দিনের অপহৃত ভ্রাতৃস্নেহ পাইলেন, অনেক দিনের হারাধন পাইলেন। স্নেহ হৃদয়ে লীন হয়, একেবারে শুষ্ক হয় না, সেই লীন স্নেহধারা অদ্য বীরদ্বয়ের হৃদয়কে প্লাবিত করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর প্রতাপসিংহ কহিলেন, "ভাই শক্ত! আজি প্রতাপের পরাজয়ের দিন নহে, আজি বিজয়ের দিন;—আজি যে অপহৃত ধন ফিরিয়া পাইলাম, যুদ্ধে পরাজয় তাহার নিকট কি তুচ্ছ? ভাই! যেন আমরা পূর্ব্বের বিদ্বেষ চিরকাল বিস্মৃত হই, যেন আমাদের চিরকাল এইরূপ স্নেহ থাকে, তাহা হইলে ভাইয়ে ভাইয়ে স্বদেশ রক্ষা করিব। মানসিংহকে ভয় করি না, দিল্লীশ্বরকে ভয় করি না।"

নবম পরিচ্ছেদ।

নাহারা মগ্‌রো।

যেদিন রজনীতে তেজসিংহ দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণরক্ষা করিয়া আপন গহ্বরে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, আমরা এক্ষণে সেইদিনকার কথা পুনরুত্থাপন করিব।

রজনী দ্বিপ্রহরে দুর্জ্জয়সিংহের নিকট বিদায় লইয়া তেজসিংহ গহ্বরাভিমুখে যাইলেন না; অন্ধকার নিশীথে, কেবল তারকালোকে, নিস্তব্ধ কানন ও তমসাচ্ছন্ন পর্ব্বতপথ একাকী অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

যাইতে যাইতে কখন কখন গভীর বনের ভিতরে আসিয়া পড়িতেন। একে অন্ধকারময় রজনী, তাহাতে পাদপশ্রেণী অতিশয় নিবিড়, সুতরাং সে অন্ধকারে আপন হস্তও দেখা যায় না। কিন্তু সে পর্ব্বতপ্রদেশে কোনও স্থান, কোনও গহ্বর, কোনও উপত্যকা তেজসিংহের অজ্ঞাত ছিল না; অদ্য আট বৎসর অবধি গৃহচ্যুত হইয়া ভীলদিগের সহিত পর্ব্বতে বিচরণ করিতেন, গহ্বরে শয়ন করিতেন, কাননে লুকাইয়া থাকিতেন। সেই আলোকশূন্য, শব্দশূন্য নৈশকানন একাকী অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

কানন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সম্মুখে উন্নত পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে পাইলেন। পর্ব্বতপথ অতিশয় দুস্তর, কিন্তু পার্ব্বতীয় বরাহ শার্দ্দূলও তেজসিংহ অপেক্ষা পর্ব্বত অতিক্রমে সক্ষম নহে। নিঃশব্দে সেই তারকালোকে সেই পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন,—অপর পার্শ্বে সুন্দর প্রশস্ত পর্ব্বত-হ্রদ দেখিতে পাইলেন; হ্রদের জল গতিশূন্য ও শব্দশূন্য,—যেন এই নিস্তব্ধ অন্ধকারময় রজনীতে সুপ্ত রহিয়াছে। সমস্ত জগৎ শব্দশূন্য ও সুপ্ত,—তেজসিংহ নিঃশব্দে সে হ্রদের কূল দিয়া যাইয়া পুনরায় একটী কাননে প্রবেশ করিলেন। সে কাননও তমসাচ্ছন্ন ও বন্যজন্তুপূর্ণ;—তেজসিংহের দক্ষিণ হস্তে সেই দীর্ঘ বর্শা, সেই বর্শাধারীর দীর্ঘ উন্নত অবয়ব দেখিলে ভীষণ বন্য জন্তুও ধীরে ধীরে পথ হইতে সরিয়া যাইত।

প্রায় এক প্রহর কাল এইরূপে ভ্রমণ করিয়া তেজসিংহ অবশেষে একটী পর্ব্বততলে উপস্থিত হইলেন। তখন মুহূর্ত্তের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। ললাট হইতে দীর্ঘ কেশ পশ্চাতে নিক্ষেপ করিলেন, স্থিরনয়নে আকাশের দিকে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিলেন, কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ধীরে ধীরে প্রণত হইলেন,—পরে পুনরায় নিঃশব্দে একাকী সেই পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিলেন।

প্রায় এক দণ্ডের মধ্যে সেই পর্ব্বতচূড়ায় আরোহণ করিলেন। চূড়ার অনতিদূরে একটী অতিশয় অন্ধকারময় গভীর গহ্বর ছিল, সেই গহ্বরমুখে উপস্থিত হইয়া তেজসিংহ আর একবার দণ্ডায়মান হইলেন। স্থিরনয়নে গগনের নক্ষত্রের দিকে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিলেন, পরে নীচে সেই আলোকশূন্য শব্দশূন্য সুপ্ত জগতের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার মনে কি গভীর চিন্তার উদ্রেক হইতেছিল কে বলিতে পারে? কতক্ষণ পর চিন্তা সম্বরণ করিয়া নিঃশব্দে সেই গহ্বরে প্রবেশ করিলেন।

ক্ষণেক যাইতে যাইতে সহসা তেজসিংহের গতি রুদ্ধ হইল, সম্মুখে কবাট আছে, সে কবাট রুদ্ধ!

সবলে সেই কবাট নাড়িলেন, সে দীর্ঘ বাহুর অমানুষিক বলে কবাট ঝনঝনা শব্দ করিয়া উঠিল ; সে শব্দ পর্ব্বতগহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইয়া লীন হইয়া গেল ; পর্ব্বতগহ্বর পুনরায় নিস্তব্ধ !

পুনরায় শব্দ করিলেন, পুনরায় প্রতিধ্বনি হইল, কিন্তু কোনও উত্তর নাই, পুনরায় গহ্বর নিস্তব্ধ !

সেই নিস্তব্ধ রজনীতে সেই ভয়াকুল পর্ব্বতগহ্বরে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া তেজসিংহ নির্ভয়ে তৃতীয়বার কবাটে শব্দ করিলেন ; সে বাহুর আঘাতে এবার কবাট ও সমস্ত গহ্বর শুদ্ধ কম্পিত হইল।

এবার ভিতর হইতে একটী গম্ভীর শব্দ আসিল,—

"নিশীথে নাহারা মগ্‌রোতে কে ?"

যুবক উত্তর করিলেন—"তিলকসিংহের পুত্র গহ্বরবাসী তেজসিংহ।" দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল।

অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করিয়া তেজসিংহ ক্ষণেক নিস্তব্ধে দণ্ডায়মান রহিলেন। গহ্বরেব ভিতর আলোক নাই, শব্দ নাই ; কেবল বোধ হইতেছে যেন পর্ব্বতগর্ভস্থ একটী জলপ্রপাতেব গম্ভীর নাদ বহির্গত হইতেছে। তেজসিংহ সেই অন্ধকারে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেই অনন্ত গম্ভীর নাদ শুনিতে লাগিলেন।

কতক্ষণ পরে গহ্বরের অভ্যন্তর হইতে একটী দীপ দেখা যাইল ; ক্রমে আলোক নিকটে আসিল। দীর্ঘকায়া, শুক্লকেশী চরণীদেবী তেজসিংহের নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন ও অঙ্গুলীনির্দ্দেশপূর্ব্বক তেজসিংহকে একটী ব্যাঘ্র-চর্ম্মের উপর বসিতে আদেশ করিলেন। তেজসিংহ উপবেশন করিলেন ও সেই শীর্ণ দীর্ঘ অবয়বের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন।

চরণীদেবীব বয়ঃক্রম অশীতি বর্ষেরও অধিক হইবে ; শরীর শীর্ণ, দীর্ঘ ও তেজঃপূর্ণ ; মস্তকের সমস্ত কেশ শুক্ল ; ললাট চিন্তারেখায় অঙ্কিত ; নয়নদ্বয় স্থির ও দৃষ্টিহীন ! সময়ে সময়ে সেই স্থির নেত্র ঊর্দ্ধদিকে চাহিত, সমস্ত শরীর নিশ্চেষ্ট হইত, তখন বোধ হইত যেন চরণীদেবী এ জগতে থাকিতেন না, যেন এ জগৎ তাঁহার নিকট অন্ধকারময় হইলেও সেই দৃষ্টিহীন নয়ন ভবিষ্যৎ জগৎ বিদীর্ণ করিতে পারিত, ক্ষুদ্র নশ্বর মানবজাতিসম্বন্ধে বিধির লিখন পাঠ করিতে পারিত ! সবিস্ময়ে তেজসিংহ সেই দীর্ঘকায়া চরণীদেবীর দিকে চাহিয়া রহিলেন !

কতক্ষণ পরে চরণীদেবী আদেশ করিলেন, "রাঠোরপ্রবর তিলকসিংহের নাম মেওয়ারে অবিদিত নাই, তাঁহার পুত্র কি কামনায় চরণীর সাক্ষাতে আকাঙ্ক্ষী ?"

তেজসিংহ। তিলকসিংহের নাম চিরস্মরণীয়, কেননা চিতোর রক্ষার্থ তিনি প্রাণদান করিয়াছেন ; কিন্তু এক্ষণে নাম আছে মাত্র ; তাঁহার সূর্য্যমহলে চন্দাওয়ৎকুলের দুর্জ্জয়সিংহ বাস করিতেছেন, তিলকসিংহের বিধবা হত, তিলকসিংহের পুত্র ভীলপালিত ও গহ্বরনিবাসী।"

চরণী গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "চন্দাওয়ৎ ও রাঠোরকুলের বহুকালপ্রচলিত 'ওয়েরী' চরণীর অবিদিত নাই। সূর্য্যমহল পূর্ব্বে চন্দাওয়ৎদিগের ছিল ; বালক! তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ মাড়ওয়ার হইতে অসিহস্তে আসিয়া সে দুর্গ কাড়িয়া লইয়াছিল ; সেই অবধি দুই কুলে যে বিরোধ চলিতেছে, যতদিন রাজস্থানে বীরত্ব থাকিবে ততদিন সে 'ওয়েরী' নির্ব্বাণ হইবে না। চন্দাওয়ৎগণ দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করে না, তাহারা সহজে এ দুর্গ ত্যাগ করিবে না।

রোষে তেজসিংহের ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল ; কহিলেন, দেবি! রাঠোরগণও দুর্ব্বলহস্তে অসি ধারণ করে না; অনুমতি দিন, একবার চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহের সহিত যুঝিব, যদি পরাস্ত হই তবে সূর্য্যমহল আর চাহি না, পুনরায় মাড়ওয়ারে প্রত্যাগমন করিব, অথবা চিরকাল বন্য ভীলদিগের সহিত বাস করিব!"

ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া চরণীদেবী স্থিরভাবে বলিলেন, "মেওয়ার শিশোদীয়বংশের আদিম স্থান ; চন্দাওয়ৎকুল শিশোদীয়ের শাখামাত্র, মেওয়ার সে কুলের আদিম স্থান। তিলকসিংহের পুত্র! তোমরা শিশোদীয় নহ ; রাঠোর! মাড়ওয়ার তোমাদিগের আদিম স্থান ; কি অধিকারে অদ্য চন্দাওয়তের শোণিতপাত করিতে চাহ ; চন্দাওয়তের দুর্গ অধিকার করিতে বাঞ্ছা কর?"

তেজ। "যে অধিকারে ভীলদিগকে দূর করিয়া মাড়ওয়ারে রাঠোরগণ বাস করে, মেওয়ারে শিশোদীয়গণ বাস করে, রাঠোরবংশ সেই অধিকারে সূর্য্যমহল অধিকার করিয়াছে। তিলকসিংহের পূর্ব্বপুরুষগণ অসিহস্তে মেওয়ারে আপনাদিগের স্থান পরিষ্কার করিয়াছে ; পরে পুরুষানুক্রমে মেওয়ার রক্ষার্থ নিজ প্রাণদান করিয়া, হৃদয়ের শোণিত দান করিয়া, নিজ অধিকার স্থিরীকৃত করিয়াছে। এক্ষণে মেওয়ার-ভূমিতে কি রাঠোর অপেক্ষা চন্দাওয়ৎদিগের প্রবলতর অধিকার আছে? মেওয়ার রক্ষার্থ রাঠোর অপেক্ষা কোন্ চন্দাওয়ৎ-বীর অধিক বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন? আকবর কর্ত্তৃক চিতোর ধ্বংসকালে রাঠোর জয়মল্ল ও পিতা তিলকসিংহ অপেক্ষা কোন্ বীর অধিক সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন? তাঁহারা সেই

আহবে প্রাণ দিয়াছেন; তাঁহাদিগের শোণিতে মেওয়ারে রাঠোর-অধিকার স্থিরীকৃত হইয়াছে, রাঠোরবংশ অন্য অধিকার জানে না, রাজস্থানে অন্যরূপ অধিকার বিদিত নাই।"

সেই গহ্বরে তেজসিংহের উন্নত রব এখনও কম্পিত হইতেছে, এমত সময় পূর্ব্ববৎ ধীর গম্ভীরস্বরে চরণীদেবী উত্তর করিলেন,—"বালক! ভীলদিগের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম তোমার নিকট অবিদিত নাই; যথার্থই বীরদিগের ও নদীসমূহের আদি ও উৎপত্তি কেহ সন্ধান করে না; বীর্য্যই তাহাদিগের ভূষণ, বীর্য্যই তাহাদিগের অধিকার। সেই অধিকারে চন্দাবৎ যদি সূর্য্যমহল পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তিলকসিংহের পুত্র তাহার প্রতি রুষ্ট কেন?"

এবার রোষে গর্জ্জন করিয়া তেজসিংহ কহিলেন, "বীর্য্যবলে যদি দুর্জ্জয়সিংহ সূর্য্যমহল পাইত, সে পরম শত্রু হইলেও তেজসিংহ তাহাকে ক্ষমা করিত। কিন্তু নরাধম রাজধর্ম্ম জানে না; পিতার মৃত্যুর পর অনাথা বিধবার নিকট দুর্গ লইয়াছে, মাতার সহিতও যুদ্ধে অক্ষম হইয়া তস্করের ন্যায় দুর্গে প্রবেশ করিয়াছিল। সেই তস্কর মাতার প্রাণবধ করিয়াছে। সে ভীষণ পাতকের যদি শাস্তি থাকে, দেবি! অনুমতি দিন, তেজসিংহ নরাধমকে শাস্তিদান করিবে।" রোষে তেজসিংহের কণ্ঠরুদ্ধ হইল, নয়ন হইতে একবিন্দু উত্তপ্ত অশ্রু বিশাল বক্ষঃস্থলে পতিত হইল।

নয়নের জল মোচন করিয়া ধীরস্বরে তেজসিংহ পুনরায় বলিলেন—

"বালকের উদ্বেগ মার্জ্জনা করুন, স্নেহময়ী বীর্য্যবতী মাতার কথা স্মরণ হইলে আমি ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারি না; নচেৎ এ দাস চরণীদেবীর প্রতি অসম্মান কখনই প্রদর্শন করিবে না।" পূর্ব্ববৎ স্থিরস্বরে দেবী উত্তর করিলেন, "তিলকসিংহের বালক! তোমার রোষের কারণ আমার নিকট অবিদিত নাই, রাঠোরের বীরত্ব আমার নিকট অবিদিত নাই। তবে তুমি নবাগত, এতক্ষণ তোমার পরিচয় গ্রহণ করিতেছিলাম, এক্ষণে জানিলাম, তিলকসিংহের পুত্র তিলকসিংহের অযোগ্য নহে, রাঠোরবংশের অযোগ্য নহে। তোমার বাক্যে আমি রুষ্ট বা অসম্মানিত হই নাই, তোমার পিতাকে জানিতাম, তাঁহার পুত্রকে তাঁহার উপযুক্ত দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে তোমার কি প্রার্থনা নিবেদন কর, তিলকসিংহের পুত্রকে চরণীর কিছুই অদেয় নাই।"

তেজসিংহ দেবীকে পুনরায় প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, "দেবি! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান আপনার কিছুই অবিদিত নাই। বিধির নির্ব্বন্ধ

নশ্বর মানবের নিকট লুকায়িত, কিন্তু দেবীর দূরবিচারী দৃষ্টি হইতে বিধির লিখন লুকায়িত নহে। একদিন বালক সংগ্রামসিংহ এই নাহারামগ্‌রোতে (অর্থাৎ ব্যাঘ্রপর্ব্বতে) আপন ললাটের লিখন জানিতে আসিয়াছিলেন; অদ্য তিলকসিংহের পুত্র,—দুর্গচ্যুত, ভীলপালিত, অনাথ তেজসিংহ সেই নাহারামগ্‌রোতে আপন ললাটের লিখন জানিতে আসিয়াছে। মাতার হত্যা ও বংশের অবমাননার প্রতিহিংসার কতদিন বিলম্ব আছে, দেবীর চরণে তাহাই জানিতে আসিয়াছে। যদি আজ্ঞা হয়, তবে সেই কথা বলিয়া এ তাপিত হৃদয়কে শান্তিদান করুন।"

পূর্ব্ববৎ ধীরস্বরে চরণীদেবী কহিলেন, "তিলকসিংহের বালক! ভবিষ্যতের যবনিকা উত্তোলন করিবার আকাঙ্ক্ষা করিও না, এ দুরাশা ত্যাগ কর; নশ্বর মানবজীবন ক্লেশপরিপূর্ণ, চিন্তাপরিপূর্ণ, কিন্তু তথাপি দুর্ব্বহণীয় নহে। কেননা মিষ্টভাষিণী আশা সঙ্গে সঙ্গে আপন ঐন্দ্রজালিক দীপ জ্বালিয়া সম্মুখে নানা সুন্দর দ্রব্য পরিদর্শন করে; ক্লেশের শান্তি, চিন্তার অপনয়ন, সুখের আবির্ভাব, এই সমস্ত মরীচিকা পরিদর্শন করিয়া হৃদয় শান্ত রাখে। তেজসিংহ! ভবিষ্যৎ-যবনিকা উত্তোলন করিও না, তাহা হইলে মায়াবিনী আশার দীপ নির্ব্বাণ হইবে, সুন্দর মরীচিকা অদৃশ্য হইবে। জীবন আশাশূন্য, আলোকশূন্য, ভোগশূন্য হইবে। ভবিষ্যৎ জানিতে পারিলে কোন্ নশ্বর এই দুঃখক্ষেত্রে জীবনবহন করিতে চাহিত? বালক! এখনও ক্ষান্ত হও, ভবিষ্যৎ জানিতে চাহিও না, আর কোন যাচ্ঞা থাকে নিবেদন কর।"

ক্ষুদ্ধস্বরে তেজসিংহ কহিলেন, "দেবি! এই নাহারামগ্‌রোর চরণীদেবী সংগ্রামসিংহের ভবিষ্যৎ কহিয়াছিলেন, সেই সংগ্রামসিংহ দেবীর আদেশে অবশেষে সিন্ধু নদী হইতে যমুনা পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। দেবী আদেশ করিলে তিলকসিংহের পুত্রের যত্নও কি সফল হইতে পারে না?"

চরণী। "সংগ্রামসিংহের রাজ্যবিস্তার ললাটের লিখন, দেবীর আদেশের ফল নহে। দেবীর নিকট ভবিষ্যৎ জানিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ভ্রাতৃকর্ত্তৃক আহত ও এক চক্ষু অন্ধ হইলেন, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন,—বহুদিন অবধি সামান্য মেষপালকদিগের সঙ্গে বাস করিয়া অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন। বালক! সংগ্রামসিংহের কথা স্মরণ করিয়া ললাটের লিখন জানিবার উদ্যম হইতে নিরস্ত হও। তিলকসিংহের পুত্রের জন্য চরণী আর কি করিতে পারে নিবেদন কর।"

তেজ। "অন্যায় সময়ে যাহার মাতা হত হইয়াছেন, তস্করে যাহার দুর্গ কাড়িয়া লইয়াছে, ভীলদিগের দয়ায় যাহার জীবন রক্ষা হইয়াছে, ভীলদিগের ভিক্ষায় যে প্রতিপালিত, তাহার জীবনে আর কি অসহ্য ক্লেশ হইতে পারে? দেবি! নিষেধ করিবেন না, প্রতিহিংসা ভিন্ন এ দাসের অন্য আশা নাই, অন্য সুখ নাই, ভবিষ্যৎ জানিলে কোন্ আশা, কোন্ সুখ বিলুপ্ত হইবে? দেবি! আপনার নিকট কিছুই অবিদিত নাই, তথাপি যদি অনুমতি করেন, একবার এ জীবনের কাহিনী নিবেদন করি, সমস্ত শুনিয়া আজ্ঞা করুন, ভবিষ্যৎ জানিলে আমার পক্ষে অধিক ক্লেশ কি হইতে পারে?"

শান্ত ধীরস্বরে চরণীদেবী উত্তর করিলেন, "জীবনের ভীষণ গণ্ডগোল হইতে চরণী অপসৃত হইয়াছে, সে গণ্ডগোলের কথা শুনিলে এক্ষণে স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়! তথাপি তিলকসিংহের পুত্র যাহা বলিতে চাহেন, চরণী তাহা শুনিবেন।"

তেজ। "দেবীর অনুমতি দ্বারা চিরবাধিত হইলাম; শ্রবণ করুন।"

তেজসিংহ পূর্ব্বকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বকথা স্মরণে মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয় আলোড়িত হইল, রোষে, বিষাদে ঘন ঘন শ্বাস বহির্গত হইতে লাগিল। কম্পিতস্বরে কাহিনী আরম্ভ করিলেন, সে স্বর সেই পর্ব্বতগুহায় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

দেবীর আদেশ।

"দেবি! আমি চিরকাল এরূপ ছিলাম না, তেজসিংহের চিরদিন এরূপে যায় নাই! দিবস যামিনী জিঘাংসা-চিন্তা ছিল না; যশের চিন্তা, বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল; ভীলদিগের ভিক্ষাভোজী ছিলাম না, রাজপুতদিগের মধ্যে রাজপুত্র ছিলাম!

"রাঠোরকুলে তিলকসিংহের নাম কে না শুনিয়াছে? সূর্য্যমহলের গৌরব কে না শুনিয়াছে? রাঠোরকুলেশ্বর জয়মল্ল স্বয়ং তিলকসিংহকে দক্ষিণহস্তে স্থান দিতেন; স্বয়ং সূর্য্যমহলে আসিয়া তিলকসিংহের বীরত্বের

সাধুবাদ করিয়াছিলেন। দেবি! আমি তখন অনাথ পর্ব্বতবাসী ছিলাম না; আমি তখন তিলকসিংহের পুত্র, সূর্য্যমহলের যুবরাজ ছিলাম!

"চন্দাওয়ৎকুলের দুর্জ্জয়সিংহের পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত রাঠোর তিলক-সিংহের পূর্ব্বপুরুষদিগের চিরকাল বিরোধ। বংশানুক্রমে 'ওয়েরী' চলিয়া আসিতেছে; বংশানুক্রমে তুমুল সংগ্রাম হইয়া আসিতেছে। যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবে, ততদিন সে বিরোধ, সে ক্রোধাগ্নি জীবিত থাকিবে। এই নির্ব্বাসিতের শরীরে সেই বংশানুগত রোষ দিবারাত্রি জ্বলিতেছে, দুর্জ্জয়-সিংহের হৃদয়-শোণিতে সে অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে।

"রাঠোরদিগের নিবাসস্থল মাড়ওয়ার; সেই স্থান হইতেই তিলক-সিংহের পূর্ব্বপুরুষগণ অসিহস্তে আসিয়া চন্দাওয়ৎদিগের নিকট হইতে সূর্য্যমহল কাড়িয়া লইয়াছে, বংশানুক্রমে তথায় বাস করিতেছে, তাহা দেবীর অবিদিত নাই। পুনরায় অসিহস্তে রাঠোরকুল সেই দুর্গ লইবে, চন্দাওয়ৎদিগকে দূরে তাড়াইয়া দিবে।

"পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন দুর্জ্জয়সিংহের সহিত বার বার মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু সিংহের আবাসে শৃগাল কবে স্থান পাইয়াছে। যতবার সে পামর সূর্য্যমহল আক্রমণ করিয়াছিল, ততবার পিতা তাহাকে দূরে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

"অদ্য আট বৎসর হইল তিলকসিংহ রাঠোরপতি জয়মল্লের সহিত চিতোর রক্ষার্থ গিয়াছিলেন। চিতোর রক্ষা হইল না; কিন্তু, দেবি! জয়মল্ল ও তিলকসিংহের বীরত্ব স্বয়ং আকবরসাহের নিকট অবিদিত নাই। কিরূপে সালুম্ব্রার মৃত্যুর পর তাঁহারা চিতোর-দ্বার রক্ষা করিয়াছিলেন, কিরূপে স্বয়ং দিল্লীশ্বরের সহিত সম্মুখযুদ্ধে প্রাণদান করিয়াছেন, চারণগণ সে গীত এখনও দেশে দেশে গাইতেছে, সে গীত শুনিয়া সূর্য্যমহলে নব বিধবা মাতার হৃদয় কম্পিত হইল, এ বালকের হৃদয় কম্পিত হইল। উল্লাসে মাতা কহিলেন, 'হৃদয়েশ্বর সশরীরে স্বর্গধামে গিয়াছেন; দাসীগণ, চিতা প্রস্তুত কর, তিনি দাসীর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন; কেননা জীবনে এ দাসী তাঁহার বড় সোহাগিনী ছিল'।"

সহসা তেজসিংহের স্বর রুদ্ধ হইল; নয়ন হইতে একবিন্দু জল সেই বিশাল বক্ষঃস্থলে পতিত হইল! পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

"দেবি! ক্ষমা করুন, তেজসিংহ ক্রন্দন অনেক দিন ভুলিয়া গিয়াছে; অদ্য স্নেহময়ী মাতার কথা স্মরণ করিয়া সম্বরণ করিতে পারিল না। যখন চিতারোহণে স্থিরসঙ্কল্প করিলেন, তখন বাটীর সকলে আসিয়া নিষেধ করি-

লেন, আমাকে কে প্রতিপালন করিবে, এইরূপ যুক্তি দেখাইতে লাগিলেন। মাতা তাহা শুনিলেন না, তিনি স্বামীর অনুমৃতা হইবার স্থিরসঙ্কল্পা হইয়াছিলেন।

"আত্মীয় কুটুম্ব সকলে নিষেধ করিল, সে নিষেধ শুনিলেন না, কেননা স্থিরসঙ্কল্পা হইয়াছিলেন।

"শেষে আমি আসিয়া বলিলাম, 'মাতা এখনও আমার হস্ত দুর্ব্বল, তুমি যাইলে সূর্য্যমহল কে রক্ষা করিবে? দুর্জ্জয়সিংহের সহিত কে যুদ্ধদান করিবে?' এবার তিনি স্থিরসঙ্কল্প ভুলিলেন, বলিলেন, 'দাসীগণ! আমার চিতারোহণে বিলম্ব আছে। শুনিয়াছি চিতোর রক্ষার্থ পত্তের মাতা ও বনিতা না কি স্বহস্তে যুদ্ধ করিয়াছিল। আর একজন রাজপুত-রমণী স্বহস্তে যুঝিবে, সূর্য্যমহল রক্ষা করিবে'।

"পিতার অস্ত্রাগার অন্বেষণ করিলেন, তিনি সমস্ত অস্ত্র যুদ্ধে লইয়া গিয়াছিলেন; তাঁহার ব্যবহৃত কেবল একটী ছুরিকা পাইলেন, সেই অবধি ছুরিকা মাতার কণ্ঠমণি হইয়াছিল।

"দুর্জ্জয়সিংহ মাতার এ পণ শুনিল; নারী-রক্ষিত দুর্গ আক্রমণ করিতে ভীরুও ভীত হইল, অর্থবলে দুর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, তস্করের ন্যায় রজনীযোগে দুর্জ্জয়সিংহ সূর্য্যমহল প্রবেশ করিল।

"তথাপি যোদ্ধাগণ বিনা যুদ্ধে দুর্গ ত্যাগ করে নাই। তোরণে, সিংহদ্বারে, গৃহের ভিতর, সেই অন্ধকার রজনীতে তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল; তস্করেরা বুঝিল, রাঠোরেরা মৃত্যুকে ডরে না, শত শত্রু হত্যা করিয়া উল্লাসে প্রাণদান করে।

"ছাদের উপর যে গবাক্ষ আছে, মাতা তথায় দণ্ডায়মান ছিলেন, বামহস্তে আমাকে ধরিয়াছিলেন, দক্ষিণহস্তে সেই ছুরিকা!

"ক্রমে আমাদিগের যোদ্ধাগণ হত হইল; ক্রমে যুদ্ধতরঙ্গ ও ভীষণ যুদ্ধনাদ সেই দিকে আসিতে লাগিল; শেষে সেই গৃহের কবাট ভগ্ন হইল, চন্দাওয়ৎগণ সেই গৃহে মহাকোলাহলে প্রবেশ করিল; সর্ব্বাগ্রে রক্তাপ্লুত দুর্জ্জয়সিংহ।

সেই রুধিরাক্ত কলেবর দেখিয়া মাতা কম্পিত হইলেন না; সেই প্রচণ্ড যুদ্ধনাদ শুনিয়া মাতা নয়ন মুদিত করেন নাই! স্বর্গীয় স্বামীর নাম লইয়া মাতা তীক্ষ্ণ ছুরিকা উত্তোলিত করিলেন, জলন্তনয়নে সেই নরাধমের দিকে চাহিলেন। নারীর তীব্রদৃষ্টির সম্মুখে বিজেতার গতি সহসা রোধ হইল; তস্কর সেই ছুরিকার অগ্রে স্তব্ধ হইয়াছিল। মাতা সেই ছুরিকা-

হস্তে দুর্জ্জয়সিংহের দিকে বেগে ধাবমান হইলেন। সেই মুহূর্ত্তে এই জগৎ হইতে সেই রাজপুতকলঙ্ক অন্তর্হিত হইত, কিন্তু তাহার একজন সৈনিক আপন প্রাণ দিয়া প্রভুর প্রাণ বাঁচাইল,—মাতার ছুরিকা সৈনিকের হৃদয়ের শোণিত পান করিল! তৎক্ষণাৎ দশ জন সৈনিক অসহায় বিধবাকে হত্যা করিল!"

তেজসিংহ ক্ষণেক স্তব্ধ হইলেন, তাঁহার নয়ন হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল। ক্ষণেক পর আত্মসম্বরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "আমি তখন দশ বর্ষের বালকমাত্র, কিন্তু মাতার হস্ত হইতে সেই ছুরিকা লইয়া দুর্জ্জয়-সিংহকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিলাম। বালকের সম্মুখে ভীরু সরিয়া গেল, আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। তখন পদাঘাতে গবাক্ষ ভাঙ্গিয়া লম্ফ দিয়া হ্রদে পড়িলাম। সেই ভীরুকে আর একদিন দেখিতে পাইব, মাতার হত্যার পরিশোধ করিব, বংশের কলঙ্ক অপনয়ন করিব, কেবল এই আশায় সেই অবধি আট বৎসর জঙ্গলে ও গহ্বরে জীবনধারণ করিয়াছি।"

রোষে, উদ্বেগে তেজসিংহের শরীর কম্পিত হইতেছিল, নয়নদ্বয় ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল, দক্ষিণ হস্ত স্বতঃ বার বার সম্মুখস্থ বর্শা ধারণ করিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে আত্মসংযম করিয়া কহিলেন, "দেবি! তাহার পর বিজন বনে ও পর্ব্বতকন্দরে বাস করিয়াছি, রাঠোর হইয়া ভীলদিগের শরণাগত হইয়াছি, হৃদয়ের দুরন্ত জ্বালায় জীবনধারণ করিয়াছি, কেবল আর একদিন দুর্জ্জয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইবে এইজন্য! অনুমতি দিন, আর একবার দুর্জ্জয়সিংহের সহিত যুঝিব,—এবার যদি সে পলাইতে পারে, তেজসিংহ আর কিছু প্রার্থনা করিবে না।" স্বর পুনরায় কম্পিত, নয়নদ্বয় সেই অন্ধকার গহ্বরমধ্যে দীপালোকে ধক্ ধক্ করিতেছে।

অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিলেন না, তেজসিংহের গম্ভীর স্বর বার বার সেই গহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইয়া লীন হইয়া গেল, অনেকক্ষণ সেই গহ্বর নিস্তব্ধ!

পরে চরণীদেবী শান্ত ধীরস্বরে কহিলেন, "বংশানুগত শত্রুতা ও 'ওয়েরী' রাজপুতধর্ম্ম; তিলকসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহের বংশের মধ্যে 'ওয়েরী' এ জগৎ থাকিতে নির্ব্বাণ হইবে না; অথবা যখন রাজপুত-তেজঃ ও জীবন নির্ব্বাণ হইবে, তখনই নির্ব্বাণ হইবে! এই ক্রোধানলে তিলকসিংহের পুত্রের হৃদয় জ্বলিবে তাহাতে বিস্ময় নাই। কিন্তু বিদেশীয় যোদ্ধার বর্ত্তমানে

মেওয়ারে গৃহ-কলহ ক্ষান্ত হয়, মেওয়ারের এই চিরপ্রথা। তিলকসিংহের পুত্র এই চিরপ্রথা পালন করুন।"

তেজসিংহ কহিলেন, "বিদেশীয় যুদ্ধসত্ত্বেও কি পামর দুর্জ্জয়সিংহ তস্করের ন্যায় সূর্য্যমহল হস্তগত করে নাই?"

ধীরস্বরে চারণী উত্তর করিলেন, "আকবরকর্ত্তৃক চিতোর ধ্বংসের পর রাণা উদয়সিংহের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ক্ষান্ত হইয়াছিল; উদয়পুরে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া রাণা নির্ব্বিঘ্নে ছিলেন; সেই সময়ে দুর্জ্জয়সিংহ সূর্য্যমহল হস্তগত করিয়াছিলেন।"

তেজ। "এখনও কি যুদ্ধ ক্ষান্ত নাই? মানসিংহ রোষে দিল্লীতে গিয়াছেন বটে, মহারাণা যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন বটে, কিন্তু শত্রু কোথায়?"

চারণী। "বর্ষা প্রারম্ভে বালকে সেইরূপ জিজ্ঞাসা করে, মেঘ কোথায়? বালক! বর্ষার মেঘ অপেক্ষা অধিক সমারোহে শত্রু আসিতেছে। যে খড্গদ্বারা দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণবধ করিতে চাহ, সেই খড্গহস্তে হল্‌দীঘাটায় যাইয়া উপস্থিত হও। চারণীর কথা গ্রাহ্য কর, হল্‌দীঘাটায় অচিরে অনেক খড্গ ও অনেক বীরের আবশ্যক হইবে, দুর্জ্জয়সিংহ ও তেজসিংহের আবশ্যক হইবে। বিদেশীয় যুদ্ধ বর্ত্তমানে গৃহ-কলহ রাজস্থানের প্রথানুগত নহে।"

তেজ। "দেবি! মেওয়ার রক্ষার্থ যদি যুদ্ধদান আবশ্যক হয়, রাঠোর সে যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকিবে না। কিন্তু সে পর্য্যন্ত যে পামর রাজধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াছে, তস্করের ন্যায় দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে, অসহায় বিধবাকে হত্যা করিয়াছে, পিতার কুল কলঙ্কিত করিয়াছে, সে রাজপুতকলঙ্ক জীবিত থাকিবে?"

স্থির অকম্পিতস্বরে চারণী বলিলেন, "বিদেশীয় যুদ্ধ বর্ত্তমানে ওরেরী' নিষিদ্ধ, গৃহ-কলহ নিষিদ্ধ।"

উভয়ে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন; অনেকক্ষণ চিন্তার পর ঊর্দ্ধনেত্রা চারণী অতিশয় গম্ভীরস্বরে বলিলেন—

"বালক। অদ্য তুমি সেই দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণরক্ষা করিয়াছ।"

তেজসিংহ চমকিত হইলেন; কহিলেন, "দেবীর নিকট কিছুই অবিদিত নাই। স্বহস্তে সে পামরকে নিধন করিব, এইজন্য বরাহের আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছি।"

সেইরূপ গম্ভীরস্বরে চারণী বলিলেন, "পরে দুর্জ্জয়কে আপন আবাসস্থানে আশ্রয়দান করিয়াছিলে, তখনও তাহার প্রাণনাশ কর নাই।"

স্থিরস্বরে তেজসিংহ উত্তর করিলেন, "পরিশ্রান্তের সহিত যুদ্ধ রাজধর্ম্ম নহে; বিশেষ পৈতৃক দুর্গে তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার প্রাণনাশ করিব, দাসের এই পণ। অনুমতি দিন্ সূর্য্যমহল আক্রমণ করিব, তস্করের হস্ত হইতে পৈতৃক দুর্গ কাড়িয়া লইব,—সেই সম্মুখ-আহবে তস্কর দুর্জ্জয়সিংহকে উচিত শাস্তি দিব।"

চরণী। "শত্রুকে বরাহ হইতে রক্ষা করিয়া রাজধর্ম্ম পালন করিয়াছ; পরিশ্রান্তের সহিত যুদ্ধ না করিয়া রাজধর্ম্ম পালন করিয়াছ; যাও, তেজ-সিংহ! বিদেশীয় যুদ্ধের সময় গৃহ-কলহ বিস্মরণ হইয়া রাজধর্ম্ম পালন কর; তিলকসিংহের পুত্র। তিলকসিংহের বীরত্ব তোমার আননে অঙ্কিত রহিয়াছে; বিজয়ের টীকা তোমার ললাটে শোভা পাইতেছে; রাজপুত-ধর্ম্ম পালন কর; দশ বৎসরের মধ্যে বিদেশীয় যুদ্ধ ক্ষান্ত হইবে, পরে সূর্য্যমহলে রাঠোর-সূর্য্য পুনরায় উদীয়মান হইবে।"

সহসা গহ্বরের দীপ নির্ব্বাণ হইল, অন্ধকারময় গহ্বরে চরণীর শেষ গম্ভীর আদেশ বার বার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

অন্ধকার গহ্বর হইতে তেজসিংহ নিষ্ক্রান্ত হইলেন; সেইদিনই মহারাণা প্রতাপসিংহের সৈন্যের সহিত যোগ দিলেন; পরে হলদীঘাটার যুদ্ধের দিনে রাঠোর খড়্গ নিশ্চেষ্ট ছিল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বালিকা।

হলদীঘাটার যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তেজসিংহ পুনরায় ভীলদিগের গহ্বরে আসিয়াছেন;—পাঠক, দুর্জ্জয়সিংহের সহিত একদিন নিশীথে সে গহ্বর দৃষ্টি করিয়াছেন।

সেই গহ্বরের বাহিরে একটী তুঙ্গ প্রস্তররাশির উপর সন্ধ্যার সময় তেজ-সিংহ উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, তাঁহার পদতলে একটী ভীল-বালিকা তেজসিংহের উরুদেশে আপন মস্তক ন্যস্ত করিয়া বসিয়াছিল, ও পার্শ্বস্থ একটী ক্ষুদ্র জলপ্রপাতের জল দুই হস্তে ধরিবার চেষ্টা করিতে-ছিল; তেজসিংহ অন্যমনস্ক হইয়া ভীল-বালার [illegible] লইয়া খেলা

করিতেছিলেন; দূরে অন্যান্য ভীলগণ আপন আপন আবাসস্থলে আপন আপন কার্য্যে রত ছিল।

ভীলকন্যা ভীলদিগের ন্যায়ই কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু নয়ন দুটী উজ্জ্বল, মুখকান্তি মন্দ ছিল না। চঞ্চলা ভীল-বালিকা পর্ব্বত আরোহণে বন্যবিড়াল অপেক্ষাও পটু; আজন্ম অন্যান্য ভীলদিগের ন্যায় চতুরতা ও সতর্কতা শিখিয়াছিল। একটী শব্দ, একটী ছায়া, একটী স্থানান্তরিত বস্তু দেখিলেই কারণ অনুভব করিত। মস্তকে কৃষ্ণকেশ সর্ব্বদাই দুলিতেছে; নয়ন দুইটী সর্ব্বদাই চঞ্চল। তেজসিংহ বালিকাকে আপন কন্যা বা কনিষ্ঠা সহোদরার ন্যায় ভাল-বাসিতেন। বালিকা সর্ব্বদাই চঞ্চল ও ক্রীড়াপটু;—কখন উপলখণ্ড লইয়া খেলা করিত, কখন পরের উপর পর্ব্বতচূড়া হইতে উপল নিক্ষেপ করিত; কখন জল লইয়া ক্রীড়া করিত, কখন অপরের সর্ব্বাঙ্গ ভিজাইয়া দিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিত। তথাপি তেজসিংহকে চিন্তাকুল দেখিলে আবার তাঁহার পার্শ্বে কখন কখন দুই তিন দণ্ড পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসিত। কি ভাবিত, কে বলিবে? বালিকার কখন স্থির চিন্তাশীল ভাব, কখন অতিশয় চঞ্চলতা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইত; সকলেই বলিত—"বালিকা, দেখিতেও বালিকা, নামও বালিকা; কিন্তু বয়স ঠিক বুঝা যায় না।"

তেজসিংহ কি চিন্তা করিতেছিলেন? বর্ষাগমনে শত্রুগণ মেওয়ার ত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং তেজসিংহ যুদ্ধচিন্তা করিতেছিলেন না। বিদেশীয় যুদ্ধ থাকিতে গৃহ-কলহ নিষিদ্ধ, সুতরাং তিনি সূর্য্যমহলের চিন্তা করিতে-ছিলেন না। তেজসিংহ কি চিন্তা করিতেছিলেন?

ভীলবালিকা অনেকক্ষণ নিশ্চেষ্ট হইয়া নির্ঝরের জলে আপন হস্ত সিক্ত করিতেছিল ও তেজসিংহের উরুদেশে মস্তক রাখিয়া তেজসিংহের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। তীক্ষ্ণনয়না ভীলবালা তেজসিংহের হৃদয়ের ভাব পাঠ করিতেছিল।

অনেকক্ষণ তেজসিংহের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বালিকা মৃদুস্বরে একটী গীত আরম্ভ করিল।

বাল্যকালের স্বপন কখন কখন হৃদয়ে জাগরিত হয়, বাল্যকালের দুই মুখচ্ছবি কখন কখন নয়নপথে আবির্ভূত হয়, বাল্যকালের প্রেম নিহিত অগ্নির ন্যায় কখন কখন জ্বলিয়া উঠে, এই মর্ম্মের একটী সরল গীত বালিকা গাইতে লাগিল।

তেজসিংহ সহসা চমকিয়া উঠিলেন; তিনি বাল্যকালের একটী স্বপ্ন

চিন্তা করিতেছিলেন, ভীলবালিকা কি তাঁহার মনের কথা জানিল? ডাকিলেন, "বালিকা!"

বালিকা জলখেলা ছাড়িয়া তেজসিংহের দিকে চাহিল, কৈ বালিকার মুখে ত কোনও চিন্তাই নাই, তেজসিংহ সে বালিকার মুখ দেখিয়া বিচার করিলেন, "বালিকা আমার মনের কথা কি জানিবে? আপন মনে যে গীত জানে তাহাই গাইতেছে!"

বালিকা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, পুনরায় জল লইয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিল।

তেজসিংহ সন্দিগ্ধমনা হইযা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আমি বাল্যস্বপ্নের কথা ভাবিতেছিলাম; তোকে কে বলিল?"

হাসিয়া ভীলবালা বলিল, "এই তুমি বলিলে, না হইলে আমি কিরূপে জানিব তুমি কি ভাবিতেছিলে? কি স্বপ্নের কথা ভাবিতেছিলে, পুষ্পের?"

এবার তেজসিংহের মুখ গম্ভীর হইল, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"বালিকা, আমি পুষ্পের কথা ভাবিতেছিলাম, তোমাকে কে বলিল?"

ভীলবালা বাল্যোচিত সরলতার সহিত সভয়ে তেজসিংহের দিকে চাহিয়া উত্তর করিল, "তাহা আমি কি প্রকারে জানিব? তবে বাল্যকালে লোকে ফল-ফুলের কথা স্বপ্ন দেখে না ত আর কিসের স্বপ্ন দেখে?"

তেজসিংহ বালিকার মুখেব দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি করিলেন, বালিকার সরলতা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না, মনে মনে ভাবিলেন, "আমি মিথ্যা সন্দেহ করিয়াছিলাম;" হাসিয়া সস্নেহে বলিলেন,—

"আমি বাল্যকালে সত্য সত্যই পুষ্পের স্বপ্ন দেখিতাম, তাহাই ভাবিতেছিলাম; তুই যথার্থই সন্দেহ করিয়াছিস্।"

ভীল। "ভীল অনেক বিষয় দেখিতে পায়, অনেক কথা শুনিতে পায়; তুমি যদি ভীল হইতে——"

তেজ। "তাহা হইলে কি হইত?"

তেজসিংহের হাতে বালিকার হাত ছিল, বালিকা নিঃশব্দে তাহাই দেখাইল।

তেজসিংহ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলে কি হইত?"

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ভীল কহিল, "তুমি কি অন্ধ? বিভিন্নতা দেখিতে পাও না? তাহা হইলে তোমার হাত কি শ্বেত হইত, না আমার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইত?"

ভীলবালা যথার্থই বালিকা, গম্ভীরভাবে বর্ণবিভেদের কথা ভাবিতে-ছিল, তেজসিংহ এই সিদ্ধান্ত করিলেন।

তেজসিংহ পুনরায় সস্নেহে কহিলেন, "বালিকা! মেঘ হইয়াছে, শীঘ্র বাড়ী যা; এইক্ষণেই বৃষ্টি হইবে।"

বালি। "আমি যাইব না।"

তেজ। "কেন?"

বালি। "আমি মেঘ দেখিতে ভালবাসি।"

তেজ। "কেন?"

বালি। "কেমন সাদা বিদ্যুতের সঙ্গে কাল মেঘ একত্রে খেলা করে! পৃথিবীতে কি সেরূপ হয়?"

চকিত হইয়া তেজসিংহ পুনরায় বালিকার দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, সারল্যের সহিত বালিকা সাদা বিদ্যুৎ ও কৃষ্ণবর্ণ মেঘের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

অস্পষ্টস্বরে তেজসিংহ বলিলেন,—"বালিকা, তুই কি সরলা বালিকা, না গভীর চিন্তাশীলা নারী; আমি তোকে কখনই ভাল করিয়া চিনিতে পারিলাম না।"

অস্পষ্টস্বরে উত্তর হইল, "বালিকারও সেই দুঃখ!" তেজসিংহ সেই-দিকে চাহিলেন,—বালিকা নাই, পর্ব্বত ও শিলারাশির মধ্যে চঞ্চলা বালিকা অন্ধকারে লীন হইয়া গিয়াছে। দূর হইতে খিল খিল্ হাস্যধ্বনি শ্রুত হইল; বালিকা সত্যই বালিকা!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ভীলকুটীরে।

তেজসিংহ গাত্রোত্থান করিয়া বালিকার পিতার কুটীরে যাইলেন। ভীলসর্দ্দার ভীমচাঁদই দশমবর্ষীয় বালক তেজসিংহকে গহ্বরে লুকাইয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল; ভীমচাঁদের দয়া ও প্রভুভক্তিগুণে অদ্য তেজসিংহ অষ্টাদশবর্ষীয় যোদ্ধা হইয়াছেন।

সে কুটীরে অগ্নি জ্বলিতেছে,—সম্মুখে ভীমচাঁদ বসিয়াছেন, তাঁহার উভয় পার্শ্বে অন্যান্য ভীলযোদ্ধা বসিয়াছে। সে অগ্নির আলোকে

ভীলদিগের বিকৃত মুখ ও বিকৃত অবয়ব অধিকতর বিকৃত বোধ হইতেছে। বাস্তবিক সে সভায় যাইলে ও সেই আলোকদীপ্ত দীর্ঘ আকৃতি ও বিকৃত মুখমণ্ডলসমূহ দেখিলে মনে সহসা ভয়ের সঞ্চার হয়।

ভীমচাঁদের সমস্ত শরীর প্রায় উলঙ্গ, কেবল মধ্যদেশ ও বক্ষঃস্থল বস্ত্রাবৃত, বাহু ও পদদ্বয় অনাবৃত ও সুবদ্ধ পেশী-বিজড়িত। মুখমণ্ডল দেখিলে ভয় হয়; নয়নদ্বয় উজ্জ্বল। শরীর দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, কিন্তু বাল্যকাল অবধি নৃশংস আচরণে মনের সুকুমার কোমল প্রবৃত্তি সমস্ত শুকাইয়া গিয়াছে, সে পর্ব্বত অপেক্ষাও ভীমচাঁদের হৃদয় কঠিন! তথাপি সে উন্নত ললাটে দুই একটী গুণের পরিচয় পাওয়া যাইত। বিপদের সময় ভীমচাঁদ যেরূপ সাহসী সেইরূপ উপায় উদ্ভাবনে তৎপর, তাঁহার তীক্ষ্ণ নয়ন বহুদূর হইতে বিপদের চিহ্ন লক্ষ্য করিতে পারিত। স্বামীধর্ম্ম ভীমচাঁদ জানিতেন, মিত্রের মধ্যে সত্যপালন করিতেন। একমাত্র দুহিতার জন্য সে কঠিন হৃদয়েও মমতা ছিল।

ভীমচাঁদের উভয় পার্শ্বে অন্যান্য যে ভীল বসিয়াছিল, তাহাদিগের শরীর আরও অনাবৃত, কেবল এক একখানি কৌপান ভিন্ন অন্য বস্ত্র ছিল না।

সেই ভীলকুটীরে অদ্য দুই জন আগন্তুক উপস্থিত ছিলেন। পাহাড়জী ভূমিয়া ও চন্দ্রপুরের গোকুলদাস যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত হইয়া ভীমচাঁদ ও তেজসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। পাহাড়জী উন্নত-বংশীয় রাজপুত; কিন্তু ভূমিয়া, ভূমিকর্ষণ করা তাঁহার ব্যবসা। নয়নে ও ললাটে যোদ্ধার দর্প নাই, কিন্তু শরীর বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমে দৃঢ়বদ্ধ। ভূমিয়াগণ সম্মুখযুদ্ধ জানে না, কিন্তু যুদ্ধকালে নিজ নিজ দুর্গ, নিজ নিজ ভূমি প্রাণপণে রক্ষা করিত, দেশের ভিতর শত্রুর গতিরোধ করিত। ফলতঃ মেওয়ারের ভূমিয়া রাজপুতগণ "মিলিশীয়া" বিশেষ ও অন্যান্য রাজপুতের ন্যায় বিদেশীয় আক্রমণ হইতে দেশরক্ষায় যৎপরোনাস্তি তৎপর থাকিত। গোকুলদাস "বৃদ্ধ,"—পাঠক, পূর্ব্বেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। অনেক বয়সে, অনেক ক্লেশে শরীর শীর্ণ হইয়াছে; কিন্তু নয়নের উজ্জ্বলতা বা হৃদয়ের উদ্যম ও উৎসাহ এখনও অপনীত হয় নাই। তাঁহার পুত্র হত হইয়াছে,—হত্যাকারীকে দণ্ড দিবে, কেবল এই আশায় বৃদ্ধ জীবনধারণ করিয়া আছে।

ভীলকুটীরে অস্থির আলোকের চতুর্দ্দিকে এই সকল লোকে বসিয়া আছেন, এরূপ সময় প্রায় ৪।৬ দণ্ড রজনীতে তেজসিংহ সেই কুটীরে প্রবেশ করিলেন। সকলে তাঁহাকে আহ্বান করিল।

সেই নৈশ অগ্নির আলোকে তেজসিংহের অসাধারণ দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ শরীর ও তেজঃপূর্ণ মুখকান্তি দেখিয়া সকলে তিলকসিংহের কথা স্মরণ করিল,—পুনর্ব্বার সূর্য্যমহল রাঠোর-হস্তগত হইবে স্থির করিল।

পরস্পরে অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। মহারাণা প্রতাপসিংহের কথা হইল, হল্‌দীঘাটার যুদ্ধের কথা হইল, দুর্জ্জয়সিংহ ও সূর্য্যমহলের কথা হইল। পরে তেজসিংহ কবে সূর্য্যমহল আক্রমণ করিবেন, সকলে তাহাই জিজ্ঞাসা করিল। পাহাড়জী নিজ ভূমিয়া সৈন্যসহিত, ভীমচাঁদ আপন ভীলদিগের সহিত, গোকুলদাস বণীদিগের সহিত, তেজসিংহের সহায়তা করিবে, তেজসিংহকে পিতার রাজগদীতে বসাইবেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন। তেজসিংহ কহিলেন, "আপনাদিগের নিকট আমি চিরকাল ঋণী থাকিব, এক্ষণে কবে যুদ্ধ শ্রেয়ঃ আপনারা পরামর্শ দিন্।

"লোকালয় ত্যাগ করিয়া দশম বৎসর অবধি তিলকসিংহের পুত্র পর্ব্বত-গহ্বরে বাস করিতেছে। সর্দ্দার ভীমচাঁদের অনুগ্রহে সে দুর্জ্জয়সিংহের বিজাতীয় ক্রোধ হইতে লুক্কাইত রহিয়াছে; সর্দ্দার ভীমচাঁদের অনুগ্রহে সে এই আট বৎসর গিরালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছে। ভীমচাঁদের পিতা আমাদের মহরাণার পিতা রাণা উদয়সিংহকে বিপদের সময় রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা অবগত আছেন; ভীমচাঁদ এক্ষণে আমাদিগের উপর সেই অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। ভীলগণ শত যুদ্ধে, শত বিপদে রাজপুতদিগের সহযোদ্ধা ও প্রকৃত বন্ধু।

"ভীমচাঁদের অনুগ্রহে অদ্য বালক অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ করিয়াছে, রাজপুতোচিত রণশিক্ষা করিয়াছে, বর্শা ও খড়্গচালনে শিক্ষা পাইয়াছে।"

ভীমচাঁদ কহিলেন, "আমি তিলকসিংহকে জানিতাম; সেরূপ রাজপুত আর দেখিব না। তিলকসিংহের পুত্রের জন্য ভীমচাঁদের যাহা সাধ্য তাহা করিবে, ভীমচাঁদের ভীলগণ ধনুর্ব্বাণহস্তে সূর্য্যমহল আক্রমণ করিবে। রাজপুত ভীলদিগের প্রভু, রাজপুতদিগের সহায়তা করা ভীলদিগের প্রধান ধর্ম্ম। গৃহাগতদিগকে আশ্রয়দান করা ভীলদিগের জাতিধর্ম্ম।"

পাহাড়জী কহিলেন, "আমিও তিলকসিংহকে বিশেষ জানিতাম, ভূমিয়ার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ সে এখনও বিস্মৃত হয় নাই। এক্ষণে সেদিন নাই, সূর্য্যমহলের গদীতে অন্য যোদ্ধা উপবেশন করিয়াছেন, তিনি ভূমিয়াগণকে পথের কুকুর অপেক্ষা ঘৃণা করেন। ভূমিয়াগণ সম্মুখরণ জানে না, কিন্তু ভূমিয়াগণ কি রাজপুত নহে? তাহারা কি রাজপুতের প্রধান ধর্ম্ম স্বদেশরক্ষা জানে না? দিল্লীশ্বর চিতোর কাড়িয়া লইয়াছেন, অর্দ্ধেক

মেওয়ার কাড়িয়া লইয়াছেন, কিন্তু পাহাড়জী ভূমিয়া পৈতৃক দুর্গ ও ভূমি রক্ষা করিয়াছে, দিল্লীশ্বরের সৈন্য যতবার একদিকে প্রবেশচেষ্টা করিয়াছে, পাহাড়জী ততবার প্রবেশ রুদ্ধ করিয়াছে, আপন দুর্গ রক্ষা করিয়াছে, মহারাণার কার্য্যসাধন করিয়াছে। পাহাড়জীর অধীনে সহস্র কৃষক বাস করে, তাহারা কৃষিকার্য্য করে ও স্ব স্ব ভূমিতে অক্ষয় দূর্ব্বার ন্যায় কৃষকের অক্ষয় সত্ত্ব রক্ষা করে; জীবনদান করিবে, কিন্তু সেই ভূমিতে অন্য রাজপুত বা শত্রুকে প্রবেশ করিতে দিবে না। এই যুদ্ধসময়ে সেই সহস্র কৃষক ধনুর্ব্বাণ ও বর্শাহস্তে ভূমি রক্ষা করিতেছে, শত্রুর আগমনে পাহাড়জীর দুর্গে প্রবেশ করিয়া দুর্গ রক্ষা করিতেছে, এই দশ বৎসরের যুদ্ধে সে দুর্গ শত্রু হস্তগত হয় নাই, সেদিক্ দিয়া শত্রুর প্রবেশ নাই। ভূমিয়াও মহারাণার দেশ রক্ষা করে, শিশোদীয়ার কার্য্যসাধন করে, ভূমিয়াও রাজপুত, তাঁহারা কি যোদ্ধাদিগের ঘৃণার পদার্থ? পাহাড়জী সম্মুখযুদ্ধ জানে না, হলদীঘাটার যুদ্ধে যায় নাই, কিন্তু পাহাড়জীর শরীরে যতদিন রাজপুতশোণিত প্রবাহিত হইবে, ততদিন রাজপুতধর্ম্ম পালন করিবে; যেরূপে যে সক্ষম, মহারাণার কার্য্যসিদ্ধ করিবে।"

রোষে, বিষাদে নয়ন হইতে একবিন্দু অশ্রুজল মোচন করিয়া পাহাড়জী ভূমিয়া কহিলেন, "তেজসিংহ! পিতার গদীতে আরোহণ কর, পাহাড়জী আর এ অবমাননা সহ্য করিতে পারে না, এ অবমাননার পরিশোধ করিবে, দুর্জ্জয়সিংহের সহিত রণ দিবে, সূর্য্যমহল আক্রমণ করিবে। আমার লোক রণ বিশেষ জানে না, কিন্তু তিলকসিংহের পুত্রের দ্বারা নীত হইলে তাহারা অবশ্য জয়লাভ করিবে। তিলকসিংহের পুত্র! পিতার গদীতে আরোহন কর, তাহার পর ভূমিয়ার প্রতি তোমার পিতা যেরূপ আচরণ করিতেন সেইরূপ আচরণ করিও। তাহারাও রাজপুত, তাহারাও যথাসাধ্য স্বদেশ রক্ষা করে।"

বৃদ্ধ পাহাড়জীর এই কথায় তেজসিংহ অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না. সস্নেহে বৃদ্ধের হস্তধারন করিয়া কহিলেন, "পাহাড়জী! তেজসিংহ যদি কখনও পিতৃগদীতে আরোহণ করে, সে ভূমিয়ার সমুচিত সম্মান জানিবে।"

পরে বৃদ্ধ গোকুলদাস কহিল, "দুর্জ্জয়সিংহের অত্যাচারে যখন পাহাড়জী ভূমিয়া এরূপ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, তখন ক্ষুদ্র "বসীগণ" কতদূর উৎপীড়িত হইবে, আপনারা বিবেচনা করিতে পারেন। চন্দ্রপুরে এরূপ বৎসর নাই, এরূপ মাস নাই, এরূপ সপ্তাহ নাই, যে দুর্জ্জয়সিংহের অত্যাচারে প্রজাগণ

উৎপীড়িত না হইতেছে। তাহারা "বশী," তাহাদের স্বাধীনতা নাই, তাহারা কি করিবে, কেবল স্বর্গীয় তিলকসিংহের কথা স্মরণ করে, তাঁহার পুত্র জীবিত আছে কি না জিজ্ঞাসা করে! পূর্ব্বে আপনার জীবিত থাকার কথা তাহারা জানিত না, সম্প্রতি না কি দুর্জ্জয়সিংহের সহিত আহেরীয়ার দিন আপনার দেখা হইয়াছিল, এইরূপ জনশ্রুতি শুনিতে পায়; মনে মনে দিন গণে, মাস গণে, কবে পিতার গদীতে আপনি বসিবেন সেই প্রার্থনা করে। তেজসিংহ, আমরা "বশী," আমরা যুদ্ধ জানি না, কিন্তু তথাপি রাজপুতমাত্রই খড়্গ ধরিতে জানে। তিলকসিংহের পুত্র! আদেশ করুন, চন্দ্রপুর প্রভৃতি গ্রামের আবালবৃদ্ধ দুর্জ্জয়সিংহের বিরুদ্ধে অসি নিষ্কোষিত করিবে। বৃদ্ধ আর কি বলিবে; তাহার নিজের উপর এ বৃদ্ধ বয়সে যে অত্যাচার হইয়াছে, জগদীশ্বর তাহার বিচার করুন; কেবল চন্দ্রপুরের প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার আপনি নিবারণ করুন।"

বৃদ্ধের পুত্রের হত্যাকথা সকলে জানিতেন, সকলে বৃদ্ধের কথা শুনিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। তেজসিংহ কহিলেন, "পিতার পুরাতন ভৃত্য! তোমার দুঃখ কেবল জগদীশ্বরই সান্ত্বনা করিতে পারেন; কিন্তু আমি অঙ্গীকার করিলাম, চন্দ্রপুর প্রভৃতি গ্রামের বশীদিগকে আমি সুখী করিব।"

আরও অনেকক্ষণ কথার পর সকলেই এইক্ষণেই যুদ্ধ শ্রেয়ঃ, এইরূপ স্থির করিলেন।

এরূপ সময় গম্ভীরস্বরে তেজসিংহ কহিলেন, "আর একটী কথা আছে, আমি আহেরীয়ার দিন নাহারামগ্‌রোতে গিয়াছিলাম।"

সে ভয়ানক স্থলের নাম শুনিয়া সকলে নিস্তব্ধ হইলেন, চরণীদেবীর নিকট তেজসিংহ কি জানিয়াছেন, জানিবার জন্য সকলে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

তেজসিংহ কহিলেন, "চরণীদেবীর আদেশ, 'বিদেশীয় যুদ্ধ বর্ত্তমানে মেওয়ারের গৃহকলহ ক্ষান্ত হয়, মেওয়ারের এই চিরপ্রথা। তিলকসিংহের পুত্র এই চিরপ্রথা পালন করুন।' যোদ্ধাগণ, এক্ষণে আপনাদিগের কি মত? দেবীর আদেশ শিরোধার্য্য, কিন্তু তেজসিংহের হৃদয় শান্তি মানে না; যতদিন সে পামরকে শাস্তি না দিব, দিবানিশি তিলকসিংহের পুত্রের হৃদয় ক্রোধানলে দগ্ধ হইবে।" উদ্বেগে তেজসিংহের কণ্ঠরুদ্ধ হইল।

সভাস্থল পুনরায় স্তব্ধ; দেবীর আদেশ শ্রবণ করিয়া সকলে ভগ্নোৎসাহ ও নীরব!

অনেকক্ষণ পর বৃদ্ধ গোকুলদাস বলিল, "ভগবান্ জানেন, জিঘাংসায় এ বৃদ্ধের শরীর দগ্ধ হইতেছে; পুত্রশোক অপেক্ষা বিষম শোক এ সংসারে নাই। তথাপি বৃদ্ধের মতে চরণী মাতা যথার্থ আদেশ করিয়াছেন, যতদিন দিল্লীশ্বরের সহিত মহারাণার যুদ্ধ হয়, ততদিন গৃহকলহ ক্ষান্ত হউক।"

সকলে নীরবে সেই মত সমর্থন করিলেন, ধীরে ধীরে বিষাদে নিশ্বাস ফেলিয়া তেজসিংহ নিজ গহ্বরাভিমুখে যাইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রাঠোর-দুর্গে।

রজনী এক প্রহর হইয়াছে; তেজসিংহ ভীলকুটীর ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে রাঠোর যোদ্ধা দেবীসিংহের ভীমগড় দুর্গাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

তিলকসিংহের যাবতীয় যোদ্ধার মধ্যে দেবীসিংহ অপেক্ষা বিশ্বাসী অনুচর বা সাহসী সহযোদ্ধা আর কেহ ছিল না। বহুকাল পূর্ব্বে, যখন তিলকসিংহের পূর্ব্বপুরুষ সূর্য্যমহল প্রথম হস্তগত করিয়াছিলেন, দেবীসিংহের পূর্ব্বপুরুষ তাঁহার দক্ষিণ হস্তের ন্যায় সকল বিপদে সহায়তা করিয়াছিলেন। সূর্য্যমহলের বিজেতা সন্তুষ্ট হইয়া নিকটস্থ একটী পর্ব্বতে ভীমগড় নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া অনুচরকে সেই দুর্গ প্রদান করিলেন।

সেই অবধি পুরুষানুক্রমে ভীমগড়ের যোদ্ধাগণ সূর্য্যমহলের অধীশ্বরদিগের অধীনে যুদ্ধ করিত ও শত আহবে আপনাদিগের শোণিত দান করিয়া "স্বামীধর্ম্ম" প্রদর্শন করিয়াছিল।

দুর্জ্জয়সিংহকর্ত্তৃক সূর্য্যমহল অধিকারসময়ে সেই নৈশ যুদ্ধে তিলকসিংহের অধিকাংশ সৈন্য হত হইয়াছিল, কিন্ত সকলে হত হয় নাই। যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা সে দুর্গ ত্যাগ করিয়া বহুদিন অবধি জঙ্গলে ও পর্ব্বতগুহায় বাস করিতে লাগিল; অবশেষে ভীমগড়ের দেবীসিংহের অধীনে কর্ম্ম করিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বালক তেজসিংহকে সেই রজনীতে সন্তরণ দিয়া হ্রদ পার হইতে দেখিয়াছিল, সুতরাং বালক এখনও

জীবিত আছে, এইরূপ স্থিরনিশ্চয় করিয়াছিল। অনেক বৎসর বৃথা অনুসন্ধান করিয়া শেষে দুই একজন পুরাতন ভৃত্য ভীলবেশধারী তিলকসিংহের পুত্রকে চিনিল;—সানন্দে সেই দরিদ্র ভীল ভিক্ষাহারীকে রাজা বলিয়া অভিবাদন করিল।

তখন পুরাতন সৈন্যগণ একে একে তেজসিংহের চতুর্দ্দিকে জড় হইতে লাগিল ও বালককে পিতার ন্যায় বিক্রমশালী ও দীর্ঘাকার দেখিয়া আনন্দিত হইল। ক্রমে ক্রমে এ সংবাদ তিলকসিংহের সমস্ত অনুচরদিগের মধ্যে রাষ্ট্র হইল; তাহারা সকলে বালককে পুনরায় পাইয়া আনন্দে ও উল্লাসে গর্জ্জন করিয়া উঠিল;—অন্য কার্য্য ত্যাগ করিয়া একবাক্যে কহিল, "আমরা তেজসিংহের লবণ আস্বাদন করিয়াছি; আমাদের খড্গ, আমাদের জীবন তিলকসিংহের পুত্রের! আদেশ করুন, পুনরায় সূর্য্যমহল অধিকার করিয়া আপনাকে পিতার গদাতে উপবেশন করাই।"

প্রাচীন যোদ্ধা দেবীসিংহ সানন্দে প্রভুপুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া ভীমগড়ে আসিয়া বাস করিবার অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তেজসিংহ উত্তর করিলেন, "দুর্দ্দিনে ভীলগণ আমাকে আশ্রয়দান করিয়াছেন; আমি যতদিন সূর্য্যমহল জয় না করি, ততদিন ভীলকুটীরেই থাকিব।"

অদ্য রজনীতে সেই রাঠোরগণ দুর্গের উপর একটী প্রশস্ত ময়দানে উপবেশন করিয়াছিল। নিকটে বৃক্ষ বা ঘর নাই; পরিষ্কার অন্ধকার নীল আকাশ চন্দ্রাতপের ন্যায় সেই বীরমণ্ডলীর উপর লম্বিত রহিয়াছিল। পরিষ্কার আকাশে অসংখ্য তারা দেখা যাইতেছে; নীচে স্থানে স্থানে অগ্নি জ্বলিতেছে; এক এক অগ্নির চতুর্দ্দিকে দুই চারি জন রাঠোর উপবেশন করিয়া অগ্নিসেবন করিতেছে। যোদ্ধাদিগের কথাবার্ত্তা বা হাস্যধ্বনি বা গীতরব সেই নিশার নিস্তব্ধতায় বহুদূর পর্য্যন্ত শ্রুত হইতেছে। স্থানে স্থানে দুই একজন যোদ্ধা অগ্নি পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; স্থানে স্থানে কোন চরণকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া চারিদিকে রাঠোরগণ চরণের গীত, রাঠোরের পূর্ব্বগৌরবগীত শুনিতেছে; সে গীত নৈশ নিস্তব্ধ গগনে উত্থিত হইতেছে। তিলকসিংহের পুত্রকে সহসা আগত হইতে দেখিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিল ও একেবারে পঞ্চশত রাঠোর উল্লাসে গর্জ্জন করিয়া উঠিল; সে উৎসাহ দেখিয়া তেজসিংহ আনন্দিত হইলেন।

দীপালোক সেই প্রাচীন যোদ্ধাদিগের ললাট ও মুখমণ্ডলের উপর পতিত হইয়াছে। বাল্যাবস্থা হইতে যুদ্ধব্যবসায়ে শরীর দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে, শত যুদ্ধে রাঠোরগণ উল্লাসরব করিয়া বর্ষার স্রোতের ন্যায় আপনাদিগের

শোণিত দান করিয়াছেন। কাহারও ললাটে, কাহারও বদনমণ্ডলে, কাহারও বক্ষঃস্থলে বা বাহুতে, খড়্গচিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। কেশপাশ কাহারও শুক্ল, কাহারও ঈষৎ শুক্ল; নয়ন সকলেরই উজ্জ্বল; বিশাল বক্ষঃস্থল রাঠোরদিগের নৈসর্গিক বীর্য্য ও সাহসে স্ফীত। সকলেই রাঠোর শ্রেষ্ঠ তিলকসিংহের অধীনে শতবার যুদ্ধ করিয়াছেন, আকবর কর্তৃক চিতোর ধ্বংস স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, এক্ষণে প্রাচীন, কিন্তু এখনও তেজসিংহকে সেনাপতি করিয়া প্রথমে সূর্য্যমহল, তৎপরে চিতোর উদ্ধার করিবার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। তেজসিংহ যখন পিতার প্রাচীন সেনাদিগকে আপন চতুর্দ্দিকে দেখিলেন, তাহাদিগের উল্লাসরব ও আনন্দধ্বনি শুনিলেন; যখন সেই দীপালোকে প্রাচীন রাঠোরদিগের যুদ্ধাঙ্কিত বদনে ও উজ্জ্বল নয়নে কেবল স্বামীধর্ম্ম ও উৎসাহের লক্ষণ পাঠ করিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় উৎসাহে প্লাবিত হইল, তিনি সজলনয়নে পিতার যোদ্ধাদিগকে একে একে আলিঙ্গন করিলেন। তিলকসিংহের পুত্রের এই সৌজন্য দেখিয়া পুরাতন রাঠোরগণ পুনরায় উল্লাসে গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

তেজসিংহ বলিলেন, "বীরগণ! তোমরাই যথার্থ স্বামীধর্ম্ম প্রদর্শন করিলে, রাঠোরকুল তোমাদের স্বামীধর্ম্মে গৌরবান্বিত হইবে; তেজসিংহ তোমাদের স্বামীধর্ম্ম বিস্মৃত হইবে না।"

গর্জ্জন করিয়া রাঠোরগণ উত্তর করিল, "আমরা তিলকসিংহের প্রতিপালিত, আমাদিগের জীবন, আমাদিগের রক্ত তেজসিংহের।"

প্রাচীন দেবীসিংহ বলিলেন, (শুক্ল কেশে তাঁহার প্রশস্ত ললাট আবরণ করিয়াছে, কিন্তু নয়নের দীপ্তি আবৃত করিতে পারে নাই।) "এ দাস তিলকসিংহকে সূর্য্যমহলের গদীতে আরোহণ করিতে দেখিয়াছে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তেজসিংহকে সেই গদীতে বসাইবার বাসনা করে; বৃদ্ধের জীবনে অন্য আকাঙ্ক্ষা নাই।"

তেজ। "দেবীসিংহ! পিতার রাঠোরদিগের মধ্যে তোমার ন্যায় প্রাচীন কেহই নাই; অথচ হলদীঘাটার যুদ্ধে বীরাগ্রগণ্য রাঠোরদিগের মধ্যে তোমা অপেক্ষা অধিক বীরত্ব কেহ প্রদর্শন করে নাই। তথাপি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইতে বিলম্ব আছে।"

দেবীদাস ঈষৎ ক্ষুন্ন হইয়া কহিলেন, "প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য; কিন্তু প্রভু কি বিজয় সন্দেহ করেন। শুনিয়াছি, চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহের এক সহস্র সেনা আছে; পঞ্চশত রাঠোর কি এক সহস্র চন্দাওয়ৎদিগের সহিত যুদ্ধদানে অসমর্থ?"

তেজ। "রাঠোরের বীরত্ব আমি সন্দেহ করি না; বিশেষ পিতার অন্যান্য বন্ধুও আমার সহায়তা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। পাহাড়জী ভূমিয়ার প্রায় এক সহস্র ভূমিয়া আছে, ভীমচাঁদের প্রায় দ্বিশত ধনুর্দ্ধর ভীলযোদ্ধা আছে, চন্দ্রপুরে প্রায় দ্বিশত বলী প্রজা আছে, তাঁহারা সকলেই তিলকসিংহের পুত্রের জন্য জীবনদানে প্রস্তুত।"

দেবী। "তবে যুদ্ধের বিলম্ব কি?"

তেজ। "সূর্য্যমহল আক্রমণ করিলে বিজয়লাভ করিতে পারি, কিন্তু পিতার যোদ্ধাগণ! তোমাদিগের অধিকাংশকে হারাইব।"

দেবী। "প্রভুর জন্য জীবনদান ভিন্ন রাঠোরের আর কি গৌরব আছে? রাঠোর কি মৃত্যু ডরে?"

গম্ভীরস্বরে তেজসিংহ উত্তর করিলেন, "রাঠোর মৃত্যু ডরে না,—পিতা চিতোর রক্ষার্থ প্রাণ দিয়াছিলেন। কিন্তু সূর্য্যমহলে তোমরা প্রাণদান করিলে পুনরায় হলদীঘাটায় কে যুঝিবে? গৃহকলহে আমরা জীবনদান করিলে ম্লেচ্ছদিগকে কে যুদ্ধদান করিবে? বীরগণ! মাতার হত্যা, কুলের অবমাননার কথা তেজসিংহ বিস্মৃত হয় নাই, ধমনীতে যতদিন শোণিত থাকিবে ততদিন বিস্মৃত হইবে না; কিন্তু বিদেশীয় যুদ্ধ বর্ত্তমানে 'ওদেরী' নিষিদ্ধ! রাজপুত-গণ! রাজপুতধর্ম্ম পালন কর।"

সকলে নিস্তব্ধ! প্রাচীন রাঠোর-যোদ্ধাগণ সকলে নতশির ও নির্ব্বাক্!

অনেকক্ষণ পর দেবীসিংহ গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "তিলকসিংহের পুত্র যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাই রাঠোরমাত্রের শিরোধার্য্য; বিদেশীয় শত্রু বর্ত্তমানে রাঠোর চন্দাওয়তের ভ্রাতা, চন্দাওয়ৎ রাঠোরের ভ্রাতা; ম্লেচ্ছ ভিন্ন রাজপুতের আর শত্রু নাই! কিন্তু এ যুদ্ধের পরিণাম পর্য্যন্ত যদি দেবী-সিংহ জীবিত থাকে, চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহ! সাবধান!"

সকল রাঠোর গর্জ্জিয়া উঠিল, "চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহ! সাবধান!" সে উচ্চরব নৈশ বায়ুতে চারিদিকে বিস্তৃত হইল, ভীমগড় দুর্গ অতিক্রম করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত শ্রুত হইল!

পরে অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর আগামী বৎসরের যুদ্ধের কথা স্থির হইল; বর্ষার শেষেই সকলে পুনরায় মহারাণার শিবিরে যাইবেন স্থির করিলেন।

তখন তেজসিংহ পূর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীরস্বরে কহিতে লাগিলেন,—"পিতার বন্ধুগণ, দেবীসিংহ যথার্থই বলিয়াছেন; মুসলমান শত্রু বর্ত্তমানে চন্দাওয়ৎ রাঠোরের ভ্রাতা, রাঠোর চন্দাওয়তের ভ্রাতা! মহারাণা যে ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন, তাহা কবে ক্ষান্ত হয় কে কহিতে পারে? কত মনুষ্য-

শোণিতে পর্ব্বত ও উপত্যকা রঞ্জিত হইবে, কত দুর্গ ধ্বংস বা শত্রু-হস্তগত হইবে, কত পুরাতন রাজপুতবংশ নিঃশেষ হইবে, কে কহিতে পারে? কিন্তু সকল যুদ্ধে, সকল বিপদে রাঠোরকুল বোধ হয় রাঠোরের নাম রাখিবেন, জীবনে ও মৃত্যুতে বোধ হয় রাঠোরের জাতিধর্ম্ম বিস্মৃত হইবেন না।"

এই উৎসাহবাক্য শুনিয়া সকলে গর্জ্জন করিয়া কহিল, "স্বর্গীয় তিলকসিংহ মেওয়ারের জন্য জীবন দিয়াছেন; রাঠোরকুলে বালকবৃদ্ধবণিতা কে আছে, যে সেইরূপে মেওয়ারের জন্য প্রাণ দিতে না প্রস্তুত? রাঠোরকুল যতদিন জীবিত থাকিবে, মহারাণার জন্য যুঝিবে। আমাদিগের হৃদয়ের শোণিত মহারাণার;—তাঁহার জন্য বহিবে।"

এইরূপ উৎসাহবাক্য চারিদিকে শ্রুত হইতেছে, ইহার মধ্যে দেবীসিংহের চতুর্দ্দশবর্ষীয় পুত্র চন্দনসিংহ ধীরে ধীরে তেজসিংহের সম্মুখে অগ্রসর হইল। বালকের সুন্দর ললাটে গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ নৃত্য করিতেছে, কৃষ্ণনয়নে বাল্যের চপলতা বিরাজ করিতেছে, ওষ্ঠ দুটী রক্তবর্ণ, কিন্তু অবয়ব দীর্ঘ ও শরীর এই বয়সেই বলিষ্ঠ ও দৃঢ়বদ্ধ। বালক ধীরে ধীরে তেজসিংহের সম্মুখে আসিয়া নতশির হইল।

বালককে দেখিয়া তেজসিংহের একবার পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল; একবিন্দু অশ্রু মোচন করিয়া কহিলেন, "চন্দন! বাল্যকালে সূর্য্যমহলে তুমি আমার ক্রীড়ার সঙ্গী ছিলে, তোমার কি মনে পড়ে? আমার দেখাদেখি ছয় বৎসর কালের সময় তুমি তীর ও বর্শা নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতে, তাহা কি মনে পড়ে? পিতা একদিন তোমার ললাট দেখিয়া কহিয়াছিলেন, 'চন্দন দেবীসিংহ অপেক্ষা বীর হইবে,' তাহা কি মনে পড়ে?"

সক্কতজ্ঞস্বরে চন্দন কহিলেন, "প্রভুই আমার বাল্যগুরু ছিলেন, প্রভুই আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ছিলেন, তাহা কি বিস্মৃত হইতে পারি? প্রভুই আমাকে প্রথম রণশিক্ষা দিয়াছেন, এক্ষণে এই তুর্কীদিগের সহিত যুদ্ধকালে যদি প্রভু আমাকে যুদ্ধযাত্রায় অনুমতি দান করেন, তবেই কৃতার্থ হই।"

তেজ। "চন্দন, তোমার বয়স অল্প, এক্ষণে দুর্গে রণশিক্ষা কর, যথাসময়ে তোমার পিতা তোমাকে যুদ্ধে লইয়া যাইবেন।"

বিষণ্ণভাবে চন্দন কহিল, "চতুর্দ্দশবর্ষীয় রাঠোর কি তুর্কীদিগের সহিত যুঝিতে সক্ষম নহে?"

হাস্য করিয়া তেজসিংহ কহিলেন, "সিংহের ঔরসে সিংহশাবকই জন্মগ্রহণ করে;—দেবীসিংহের পুত্র কেন না যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত হইবে?"

পরে গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "চন্দনসিংহ! অচিরেই ভীষণ যুদ্ধ হইবে, সম্ভবতঃ আমাদিগের সকলেরই যুদ্ধের সাধ মিটিবে। তোমার পিতা সর্ব্বদা মহারাণার সহিত থাকিবেন, তুমি এস্থানে না থাকিলে ভীমগড় কে রক্ষা করিবে? বালক! এই অল্প বয়সেই তুমি বীর,—এই অল্প বয়সেই তোমাকে আমি ভীমগড় দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত করিলাম; তোমার হস্তে রাঠোর-অসির অবমাননা হইবে না।"

ধীরে ধীরে চন্দনসিংহ কোষ হইতে অসি বাহির করিল, সেই অসি স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে আকাশের দিকে চাহিয়া অল্পবয়স্ক বীর কহিল,—"তাহাই হউক! চন্দনসিংহ প্রভু-আদেশে ভীমগড় অদ্য হইতে রক্ষা করিবে; ভগবান্ সহায় হউন, যতক্ষণ চন্দনসিংহ জীবিত থাকিবে, যতক্ষণ দুর্গে একজন রাঠোর জীবিত থাকিবে, ততক্ষণ এ দুর্গে তুর্কীর প্রবেশ নাই।"

বালকের এই পণ শুনিয়া রাঠোরমণ্ডলী সাধুবাদ দিতে লাগিল, প্রাচীন দেবীসিংহের নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল।

কিন্তু রাঠোরগণ জানেন না, প্রাচীন দেবীসিংহ জানেন না, কিরূপ ভয়ঙ্কর শোণিতস্রোত ও অগ্নিরাশির মধ্যে এই বিষম পণ একদিন রক্ষা হইবে!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গ অপহরণের গীত।

পাঠক! চল আমরা ভীমগড় ত্যাগ করিয়া একবার সূর্য্যমহলে গমন করি, তথায় সূর্য্যমহলেশ্বর দুর্জ্জয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করি।

হল্দীঘাটার যুদ্ধান্তে দুর্জ্জয়সিংহ সূর্য্যমহলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। প্রাতঃকালে সূর্য্যমহল পর্ব্বত-চূড়া হইতে চন্দাওয়ৎ-পতাকা উড্ডীন হইতেছে ও চন্দাওয়ৎ-রণবাদ্য চারিদিকে শব্দিত হইতেছে। "দরীখালায়" অর্থাৎ সভাগৃহে দুর্জ্জয়সিংহ উপবেশন করিয়াছেন, উভয় পার্শ্বে তাঁহার সহযোদ্ধাগণ ঢাল ও খড়্গহস্তে উপবেশন করিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে দুর্গবাসিগণ দুর্গেশ্বরকে দেখিতে আসিয়াছে; নাগরিকগণ পরস্পরে হল্দীঘাটার ও তুর্কীদিগের ও রাজা মানসিংহের বিষয় কথোপকথন করিতেছে; পুরনারীগণ "সুহেলীয়া" অর্থাৎ মঙ্গলগীত গাইয়া যুদ্ধপ্রত্যাবৃত্ত চন্দাওয়ৎ-বীরদিগকে আহ্বান করিতেছে।

সভাগৃহের ভিতর দুর্জ্জয়সিংহের উভয় পার্শ্বে তাঁহার যোদ্ধাগণ বসিয়াছেন; কয়েক মাস পূর্ব্বে এই সভাস্থলে যে সমস্ত বীর উপবেশন করিয়াছেন, হায়! তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ অদ্য আর এ জগতে নাই। তাঁহাদিগের বীরত্ব, তাঁহাদিগের অকালমৃত্যু স্মরণ করিয়া সকলেই শত ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন; বীরগণ সেইরূপ সম্মুখযুদ্ধে স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে পারেন, এই আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন। অদ্য যাঁহারা সভায় বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকে যুদ্ধাঙ্ক শরীরে বহন করিতেছিলেন; কাহারও ললাট, কাহারও দীর্ঘ বাহু, কাহারও বিশাল বক্ষঃস্থল, খড়্গ বা বর্শা বা গুলির অনপনেয় অঙ্কে অঙ্কিত হইয়াছে। যোদ্ধাগণে সগৌরবে সেই বীরত্ব-চিহ্ন প্রদর্শন করিতেছিলেন ও হল্‌দীঘাটার তুমুল সংগ্রামের কথা বার বার সভাস্থলে আন্দোলন করিতেছিলেন।

সভাগৃহের একপ্রান্তে দুর্জ্জয়সিংহের "গোলা" অর্থাৎ দাসগণ দণ্ডায়মান হইয়াছিল। ইহারাও যুদ্ধকালে প্রকৃত যোদ্ধা, প্রভুর পার্শ্ব কখনও পরিত্যাগ করে না। হল্‌দীঘাটার যুদ্ধে দুর্জ্জয়ের সঙ্গে প্রায় এক শত "গোলা" গমন করিয়াছিল, তাহার মধ্যে পঞ্চাশত জনও ফিরিয়া আইসে নাই। গোলাগণ চিরদাস, তাহাদিগের "গোলী" ভিন্ন আর কাহারও সহিত উদ্বাহ নিষিদ্ধ; তাহাদিগের পুত্রকন্যাও দাসদাসী। গোলাদিগের জীবন মরণ প্রভুর হস্তে; তাহারাও প্রভুভক্তি ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম জানিত না। গৃহপ্রান্তে দুর্জ্জয়ের ত্রিংশৎ কি চত্বারিংশৎ "গোলা" বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহাদিগের দক্ষিণ পদে রৌপ্যনির্ম্মিত বলয়।

অনেকক্ষণ এইরূপ যুদ্ধকথা হইতে লাগিল। বর্ষার শেষে যুবরাজ সলীম ও তুর্কীগণ কি পুনরায় আসিবে? রাজা মানসিংহ কি স্বদেশবাসিদিগের শোণিতপাতে এখনও তুষ্ট হয়েন নাই? যদি না হইয়া থাকেন, মেওয়ারের শিশোদীয়গণ আরও শোণিতদানে সম্মত আছেন; তুর্কীগণ পুনরায় আসিলে শিশোদীয়গণ পুনরায় রণরঙ্গে তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন! যতদিন শিশোদীয়ের একজন বীর জীবিত থাকিবে, যতদিন চন্দ্রাওয়ৎ-ধমনীতে শোণিত প্রবাহিত হইবে, ততদিন বীরপ্রসবিনী মেওয়ারভূমি পরাধীনতার কলঙ্করেখা ললাটে ধারণ করিবেন না।

দুর্জ্জয়সিংহের এইরূপ উৎসাহবাক্যে যোদ্ধাগণ তুষ্ট হইলেন,—আনন্দে, উল্লাসে, উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

তখন দুর্জ্জয়সিংহের অনুমতিক্রমে চরণদেব হল্‌দীঘাটার একটী গীত আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধ চরণ স্বয়ং সেই যুদ্ধ অবলোকন করিয়াছিলেন,

প্রতাপসিংহের দুর্দ্দমনীয় সাহস অবলোকন করিয়াছিলেন, চন্দাওয়ৎকুলের অপ্রতিহত বীর্য্য অবলোকন করিয়াছিলেন,—তাহাই গাইলেন। বাক্য-সাগর মন্থন করিয়া গর্ব্বিত ভাষায়, গর্ব্বিতস্বরে হল্‌দীঘাটার গর্ব্বিত গীত গাইলেন; উল্লাসে তাঁহার নয়ন জ্বলিতে লাগিল, তাঁহার সমস্ত দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। সভা নিস্তব্ধ ও শব্দশূন্য, চরণের উন্নত গীত সভাগৃহে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; শেষে যখন চরণদেব চন্দাওয়ৎদিগের বীরত্ব গাইতে লাগিলেন, যখন বর্শাধারী রক্তাপ্লুত দুর্জ্জয়সিংহের ভীষণ মূর্ত্তি ও দুর্দ্দমনীয় বীরত্ব কম্পিতস্বরে বর্ণনা করিয়া গীত সমাপ্ত করিলেন, তখন একেবারে সভাগৃহ যোদ্ধাদিগের উল্লাসরবে ও ভীষণ উৎসাহনাদে পরি-পূরিত হইল। চারিদিকে নাগরিকগণ সে নাদ প্রতিধ্বনিত করিল; সূর্য্যমহলের চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত সে যুদ্ধনাদ বিস্তৃত হইল।

সেই উল্লাসরব শান্ত হইবার অনতিবিলম্বে সভাগৃহের দ্বারদেশে একটী গোলযোগ উপস্থিত হইল। একজন দ্বারী সভায় উপস্থিত হইয়া সমাচার দিল, "মহারাজ! চরণদেবের গীত শুনিয়া আর একজন যুবা চরণ ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়াছেন, তিনিও রাজসভায় প্রবেশ করিয়া একটী গীত শুনাইবার ইচ্ছা করিতেছেন, আমাদিগের বাধা মানেন না, এক্ষণে মহারাজের যেরূপ আজ্ঞা হয়।"

দুর্জ্জয়সিংহ উত্তর করিলেন, "চরণদিগের পথ সর্ব্বস্থানেই অবারিত, অপরিচিত চরণকে আসিতে দাও।"

অপরিচিত চরণ সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার দীর্ঘ অবয়ব ও বাহু, বিশাল বক্ষঃস্থল ও অসীম বলবান শরীর দেখিয়া সকলে ঈষৎ বিস্মিত হইলেন। চরণের ললাট ও সমস্ত মুখমণ্ডল রক্তচন্দনে আবৃত।

দুর্জ্জয়সিংহের দিকে লক্ষ্য করিয়া চরণ কহিলেন, "চন্দাওয়ৎ-বীর! রাজচরণ যে গীত গাইলেন, আমি সেরূপ গাইব এরূপ সাধ্য নাই। তথাপি সভাস্থ সকলে যদি প্রসন্ন হয়েন, তবে আকবরকর্ত্তৃক চিতোরদুর্গ অপহরণের একটী গীত গাইব। আকাশের যে বৃষ্টিতে শাল, তমাল, অশ্বত্থ, প্রভৃতি বৃহৎ বৃক্ষ পুষ্ট হয়, তৃণ দূর্ব্বাও কি তাহাতে পুষ্ট হয় না? সাধুদিগের অনুমতি হইলে এ ক্ষুদ্র কবিও একটী কবিতা রচনা করিতে সক্ষম; সাধুগণ কি সে অনুমতি দান করিবেন?"

দুর্জ্জয়। "চরণদেব! তোমার বিনীত ভাব দেখিয়া তুষ্ট হইলাম। তুমি আমাদিগের অপরিচিত, তুমি চন্দাওয়ৎকুলের চরণ কি না জানি না। তথাপি বীর ও কবিদিগের গুণই পরিচয়, গীত আরম্ভ কর।"

তীব্রস্বরে কবি গীত আরম্ভ করিলেন ; সভাস্থ সকলে সবিস্ময়ে শুনিতে লাগিলেন।

গীত।

"সে উন্নত দুর্গ কাহার ?

যাঁহারা বংশানুক্রমে রক্ষা করিয়াছেন তাঁহাদিগের?

না, যে তস্করের ন্যায় কাড়িয়া লইয়াছে তাহার ?

তস্করের অবমাননা হইবে! তস্করের হৃদয়শোণিতে রাজপুত-খড়্গ রঞ্জিত হইবে!

"সে উন্নত দুর্গ কাহার ?

যে কুলের নারী দুর্গরক্ষার্থ যুদ্ধদান করে তাহাদিগের? না, যে নারী-হত্যা* করিয়া দুর্গ অধিকার করে তাহার?

নারী-হত্যাকারী অবমানিত হইবে! নারী-হত্যাকারীর হৃদয়-শোণিতে রাজপুত-খড়্গ রঞ্জিত হইবে!

"সে উন্নত দুর্গ কাহার ?

যে বালকের সম্পত্তি অপহরণ করে তাহার? না, যে বীর-বালক † অদ্য পর্ব্বতকন্দরে বাস করিতেছেন, তাঁহার ?

বালক এখন খড়্গধারণ করিয়াছেন, হলদীঘাটার ভীষণ যুদ্ধে যুদ্ধস্নাত হইয়াছেন! তস্করের হৃদয়-শোণিতে তাঁহার খড়্গ রঞ্জিত হইবে!

"সে উন্নত দুর্গ কাহার ?

দুর্গরক্ষার্থ যে বীরগণ হত হইয়াছেন, তাহাদিগের; দুর্গচ্যুত হইয়া যাঁহারা পর্ব্বতে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের!

সময়ে সে রাজপুতগণ দুর্গ আক্রমণ করিবে, শত্রুরক্তে অসি রঞ্জিত করিয়া দুর্গ অধিকার করিবে!"

---

* চিতোরদুর্গ-বিজয়ের সময় পত্তের মাতা ও বনিতা স্বহস্তে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধদান করিয়া হত হয়।

† চিতোরদুর্গ-বিজয়ের সময় প্রতাপসিংহের পিতা জীবিত ছিলেন, সুতরাং প্রতাপ যুবরাজ ছিলেন মাত্র। হলদীঘাটার যুদ্ধের সময় প্রতাপ পর্ব্বতে ও কন্দরে সপরিবারে বাস করিতেন।

গীত ক্ষান্ত হইল;—যুবকের জ্বলন্ত নয়ন দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন; সকলে উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন, "তুর্কী-রক্তে অসি রঞ্জিত করিয়া রাজপুতগণ চিতোর-দুর্গ অধিকার করিবেন!"

দুর্জ্জয়সিংহ উৎসাহবাক্য দিলেন না, দুর্জ্জয়সিংহ সাধুবাদ করিলেন না। ভ্রূকুটিপূর্ব্বক ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ক্ষণেক পর পুনরায় চরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; চরণ সভাস্থলে নাই!

সভাভঙ্গ হইল; নিঃশব্দে দুর্জ্জয়সিংহ শুদ্ধান্তে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মনের ভাব অনুভব করিতে আমরা সাহস করি না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

গীতের অর্থ কি?

রজনী একপ্রহরের সময় দুর্জ্জয়সিংহ ছাদে শয়ন করিয়া রহিয়াছিলেন, তাঁহার মস্তক একজন গোলীর অঙ্কে স্থাপিত, অন্য একজন গোলী তাঁহার পদসেবা করিতেছে; উভয়ে প্রৌঢ়যৌবনসম্পন্না, উভয়েই রূপবতী, কিন্তু তাহাদের সেবায় অদ্য দুর্জ্জয়সিংহের চিন্তা দূর হইতেছে না।

"গোলীগণ" ক্রীত বা জাত দাসী, "গোলা" (গোলাম) ক্রীত অথবা জাত দাস। প্রতি রাজপুত যোদ্ধার সম্পত্তির মধ্যে বহুসংখ্যক্ গোলা ও গোলী পরিগণিত হইত। গোলীগণ বিলাসের বস্তু, গোলাগণ গৃহভৃত্য, যুদ্ধকালে সহযোদ্ধা ও প্রকৃত বন্ধু। দুর্জ্জয়সিংহের সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক্ গোলা সর্ব্বদা থাকিত, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে; যুদ্ধে তাহারা প্রাণ দিয়াছে, কিন্তু প্রভুর পার্শ্ব ত্যাগ করে নাই। গোলীদিগের কেবল গোলার সহিত বিবাহ সম্ভব, স্বয়ং মহারাণার ঔরসজাত গোলীপুত্রও গোলা, কোন দরিদ্র রাজপুতও সেই মহারাণার পুত্রকে আপন কন্যাদান করিতে সম্মত হইত না*।

* পাঠকগণ পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন, রাজস্থানের রাজ্যতন্ত্র অনেক অংশে ইউরোপের ফিউডল রাজ্যতন্ত্রের সদৃশ; মহারাণার অধীনে ভিন্ন ভিন্ন কুলাধিপতি যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহাদের অধীনে নিম্নশ্রেণীর যোদ্ধা ছিলেন, প্রত্যেকের স্ব স্ব দুর্গ ও ভূমি-সম্পত্তি ও প্রজা ছিল, আবার সকলেই শ্রেণীক্রমে মহারাণার অধীন। রাজস্থানের দুই প্রকার দাস—"বসী" ও "গোলা;" ফিউডল সময়ের "Colomi" এবং "Slaves" দিগের সদৃশ, তাহাও পাঠকগণ দেখিয়াছেন।

অনেকক্ষণ চিন্তাকুল হইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন, অবশেষে প্রধানকে ডাকাইবার আদেশ দিলেন; উঠিয়া পুনরায় ছাদে পদচারণ করিতে লাগিলেন, গোলীগণ গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেল।

ক্ষণেক পর প্রধান অর্থাৎ মন্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দুর্জ্জয়সিংহ কহিলেন, "আমি যুদ্ধযাত্রাকালে যে আদেশ দিয়াছিলাম তাহা সম্পন্ন হইয়াছে?"

প্রধান। "সেইক্ষণেই আমি নানাদিকে চর পাঠাইয়াছি, তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের পুনরায় পাঠাইয়াছি, কিন্তু এপর্য্যন্ত তিলকসিংহের পুত্রের কোনও সন্ধান করিতে পারে নাই।"

দুর্জ্জয়। "বন্য ভীলদিগের মধ্যে, পর্ব্বত ও জঙ্গলের মধ্যে, বিশেষ অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন?"

প্রধান। "তাহাদিগের মধ্যেই বিশেষ অনুসন্ধান করিতেছে।"

দুর্জ্জয়। "যে অবধি সেই বালককে দেখিয়াছি, সে অবধি আমার জীবন তিক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় আমোদে রুচি নাই, পার্থিব কোনও সুখে ইচ্ছা নাই।"

প্রধান। "প্রভু, এরূপ বিরক্ত হইবেন না; যদিই সেই তেজসিংহ এখনও জীবিত থাকে, তাহা হইলে প্রভুর কি করিতে পারে?"

দুর্জ্জয়। "যদি? তেজসিংহের জীবিত থাকার বিষয় কোনও সন্দেহ আছে?"

প্রধান। "প্রভু বলিয়াছিলেন, রজনীতে কেবল একদিনমাত্র দেখিয়াছিলেন, তাহাতে ভ্রম কি সম্ভব নহে? সে জীবিত থাকিলে আমাদের চর তাহাকে পায় না কি জন্য? সেই বা এত দিন নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে কিজন্য? প্রভু, মিথ্যা চিন্তা করিবেন না, ঐ হ্রদগর্ভে তেজসিংহ বহুদিন প্রাণত্যাগ করিয়াছে।"

দুর্জ্জয়। "প্রধান! সেই একদিন নিশীথে দেখিলে সন্দেহ করিবার স্থল ছিল বটে, কিন্তু সেই বালককে আর একদিন দেখিয়াছি।

প্রধান। "কবে?"

দুর্জ্জয়। "ভীলগণ বা ভূমিয়া কবে বর্শা নিক্ষেপ করিতে জানে? হলদীঘাটার যুদ্ধের দিন এক দল ভীল ও ভূমিয়াবেশী সম্মুখরণ দিয়াছিল, বর্শা ও অসিহস্তে মানসিংহের সেনাকে আক্রমণ করিয়াছিল।"

প্রধান। "এ যথার্থই বিস্ময়ের কথা।"

দুর্জ্জয়। "বিস্ময় কিছুমাত্র নাই, তাহারা ভীল নহে, কয়েকজন রাঠোর ভীল ও ভূমিয়াবেশে আসিয়াছিল, তাহাদিগের সর্দ্দারকে আমি

চিনিয়াছিলাম, সে সেই যুবক। চিতোরধ্বংসের সময় জয়মল্লের পার্শ্বে তিলকসিংহকে আমি যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি, অসুরবলে চিতোরের দ্বার রক্ষা করিতে দেখিয়াছি, বালক পিতা অপেক্ষা যুদ্ধে ন্যূন নহে।”

মন্ত্রীর মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। দুর্জ্জয়সিংহ আরও বলিতে লাগিলেন—“সেই হলদীঘাটার যুদ্ধের দিন বালককে দেখিয়া আমার হস্তের বর্শা কম্পিত হইয়াছিল, দুর্জ্জয়সিংহের বর্শা মিথ্যা হয় না, এক আঘাতে জগৎ হইতে দুর্জ্জয়সিংহের চির-শত্রুকে দূর করিবার অভিলাষ হইয়াছিল, কিন্তু আহেরীয়ার দিন স্মরণ হইল, বর্শা আমার হস্তেই রহিল।”

প্রধান। “আহেরীয়ার দিন বালক আপনার জীবন রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া কি সে অবধ্য?”

দুর্জ্জয়। “তাহা বলি নাই; কিন্তু বিদেশীয় শত্রু উপস্থিত আছে বলিয়া তেজসিংহ আহেরীয়ার দিন আমার সহায়তা করিয়াছিল; বিদেশীয় শত্রু বর্ত্তমান থাকিতে দুর্জ্জয়সিংহ গৃহকলহে হস্ত কলুষিত করিবে না।”

প্রধান। “তবে অন্বেষণ কিজন্য?”

দুর্জ্জয়। “যেদিন দিল্লীর সহিত যুদ্ধ শেষ হইবে, সেইদিন দুর্জ্জয়সিংহ হৃদয়ের কণ্টকোদ্ধার করিবে। সেইজন্য পূর্ব্ব হইতে তাহাদিগের আবাস জানা আবশ্যক।”

প্রধান। “অন্বেষণে আমার ত্রুটী নাই, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন উদ্দেশ পাই নাই।”

দুর্জ্জয়। “অদ্যকার যুবক চরণকে বিশেষ করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহার গীত বুঝিয়াছিলেন?”

প্রধান। “যুবক চিতোরধ্বংসের গীত গাইয়াছিল, তাহা ভিন্ন আর কিছু জানি না।”

দুর্জ্জয়। “বৃথা মন্ত্রীকার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন! যুবক চিতোরের গীত গায় নাই, দুর্জ্জয়সিংহকর্ত্তৃক সূর্য্যমহল আক্রমণের গীত গাইয়াছিল!”

প্রধান বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পর দুর্জ্জয়সিংহ কহিলেন, “আমার স্থির বোধ হইতেছে, সেই চরণ তেজসিংহের বন্ধু ও সহচর; তাহাকে এইক্ষণেই পুনরায় ডাকাইয়া আন। অদ্য নিশীথেই কোন না কোন প্রকারে তাহার নিকট তেজসিংহের সংবাদ পাইব।”

মন্ত্রীবর আদেশপালনে তৎপর হইলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

গায়ক কে?

প্রায় দুই দণ্ড কাল পর প্রধান চরণকে লইয়া সেই ছাদে উপস্থিত হইলেন। চরণের শরীর দীর্ঘ ও সবল, মস্তকের কেশ ও শ্মশ্রু কৃষ্ণবর্ণ ও দীর্ঘ, নয়ন উজ্জ্বল, ললাটে রক্তচন্দনের দুইটী রেখা, বক্ষঃস্থলে শ্বেত-চন্দন। দুর্জ্জয়সিংহের আদেশে উপবেশন করিলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ কহিলেন, "চরণদেব, আপনার গীতের পরিচয় প্রাতে পাইয়াছি, আপনার গণনাবিদ্যার কথা শুনিয়াছি, সেইজন্য আপনাকে এক্ষণে আহ্বান করিয়াছি।"

চর। "আমি কার্য্যে চেষ্টার ক্রটী করি না।"

দুর্জ্জয়। "তিলকসিংহের নাম শুনিয়া থাকিবেন, যেদিন আমি বাহু-বলে এই দুর্গ জয় করি, সেইদিন তাহার পুত্র ঐ গবাক্ষ হইতে হ্রদে পতিত হইয়াছিল। এরূপ পতনের পর মনুষ্য বাঁচে না, সে কি বাঁচিয়া আছে?"

ক্ষণেক চিন্তার পর চরণ বলিলেন, "জীবিত আছে।"

দুর্জ্জয়সিংহ আনন্দিত হইলেন, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি অবস্থায় আছে?"

চরণ পুনরায় নয়ন মুদিত করিয়া চিন্তা করিলেন; কহিলেন, "বর্ব্বর বা হিংস্রক জন্তুর সহিত সহবাস করিতেছে।"

দুর্জ্জয়সিংহ অধিকতর আনন্দিত হইলেন, কহিলেন, "চরণদেব, আমি আপনার উপর যৎপরোনাস্তি তুষ্ট হইয়াছি; আর একটী জিজ্ঞাস্য আছে,— তেজসিংহ কি এই দুর্গ পুনরায় লইবার উদ্যম করিবে?"

চর। "তাহাতে গণনা আবশ্যক করে না, তিলকসিংহের পুত্র বংশানু-গত 'ওয়েরী' বোধ হয় বিস্মৃত হইবে না, পৈতৃক দুর্গ সহসা ছাড়িয়া দিবে না।"

দুর্জ্জয়সিংহ ঈষৎ রুষ্ট হইলেন, কহিলেন, "কাহার পৈতৃক দুর্গ? এ দুর্গ, এ প্রদেশ, চিরকাল চন্দাওয়ৎকুলের ছিল, রাঠোরকুল তস্করের ন্যায় আসিয়া দুর্গ লইয়াছিল, দুর্জ্জয়সিংহ সে তস্করদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে, পৈতৃক দুর্গ অধিকার করিয়াছে। চন্দাওয়ৎকুল শিশোদীয়বংশের মধ্যে প্রধান, রাঠোর শিশোদীয়বংশীয় নহে, মাড়ওয়ার হইতে ভিক্ষুকবেশে আসিয়াছে,

তস্করের ন্যায় দুর্গ ও ভূমি লইয়াছে! এ মেওয়ারের আদিমবাসী কাহারা? শিশোদীয়, না রাঠোর?"

ধীরে ধীরে চরণ উত্তর করিলেন, "আমাদের গণনায় দেখা যায়, এ প্রদেশে রাঠোর বা শিশোদীয় আসিবার পূর্ব্বে ভীলগণ বাস করিত। ভীলগণ আদি নিবাসী, ভীলগণ এই দুর্গ হস্তগত করিবে।"

দুর্জ্জয়সিংহ শিহরিয়া উঠিলেন, কেননা তিনি জানিতেন ভীলদিগের মধ্যে ভীলবেশে তেজসিংহ রহিয়াছেন। কিন্তু আত্মস্মরণ করিয়া ঘৃণা প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, "ভীলই আইসুক, আর শূকরই আইসুক, দুর্জ্জয়-সিংহ দুর্গরক্ষা করিতে জানেন।"

চরণ কহিলেন, "আমি এক্ষণে বিদায় হইতে পারি।"

দুর্জ্জয়সিংহ মনে ভাবিয়া দেখিলেন, তিনি চরণকে অন্যায়, কটু ও কর্কশ কথা বলিয়াছেন। বলিলেন—

"চরণদেব, আপনার উপর আমি অসন্তুষ্ট হই নাই, আপনি বিরক্ত হইবেন না। আপনার নিকট আমার আর একটি জিজ্ঞাসা আছে। কত-দিন পর তেজসিংহ দুর্গ আক্রমণ করিবেন?"

চর। "যতদিন বিদেশীয় যুদ্ধ আছে, ততদিন আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

দুর্জ্জয়সিংহ তুষ্ট হইলেন, চরণকে এক তোড়া মুদ্রা পারিতোষিক দিলেন, বলিলেন, "তেজসিংহ পুনরায় এই দুর্গ আক্রমণ করিবেন, সে আক্রমণের ফলাফল আপনি কহিতে পারেন?"

চর। "মনুষ্য-গণনায় তাহা নির্ণয় হয় না, পাপপুণ্যের দ্বারা সে বিষয় সিদ্ধান্ত হয়।"

দুর্জ্জয়সিংহ পুনরায় ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইলেন, বলিলেন, "দুর্জ্জয়সিংহ সে বিষয় খড়্গের দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন।"

চরণ চলিয়া যাইতেছিলেন, এরূপ সময় প্রধান তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "আপনি পারিতোষিক ভুলিয়া যাইতেছেন।" চরণ ফিরিয়া ঈষৎ চিন্তা করিয়া দুর্জ্জয়সিংহদত্ত মুদ্রা কুড়াইয়া লইলেন।

গায়ক চরণদেব প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; চারিদিকে চাহিলেন, পরে সেই মুদ্রা-তোড়া সজোরে দুর্গতলস্থ হ্রদে নিক্ষেপ করিলেন। এ গায়ক কে?

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

উদ্যানের পুষ্প।

পাঠক! চল, দুর্জ্জয়ের প্রাসাদ হইতে অনতিদূরে সেই দুর্গের মধ্যে অন্য একটী স্থানে আমরা গমন করি। চন্দ্র উদিত হইয়াছে, যাইতে কষ্ট হইবে না; যদি পরিশ্রান্ত হইয়া থাক, সুন্দর পুষ্পোদ্যানে ক্ষণেক বিশ্রাম করিব।

সূর্য্যমহল সমস্ত নিস্তব্ধ। দুর্গের উপর হইতে চারিদিকের চন্দ্রকরোজ্জ্বল পর্ব্বতমালা ও ক্ষেত্রবৃক্ষ দেখা যাইতেছে, যেন সেই শান্ত চন্দ্রকরে সমস্ত জগৎ শান্ত ও নিস্তব্ধ। দুর্গের ভিতরও সমস্ত নিস্তব্ধ, সমস্ত শশাঙ্ককিরণে সুপ্ত; কেবল ছাদের উপর প্রহরী একাকী পদচারণ করিতেছে ও সময়ে সময়ে আকাশের দিকে চাহিয়া যেন সময় নির্ণয় করিতেছে। দুর্গের ছায়া নীচস্থ হ্রদে বৃক্ষের উপর পতিত হইয়াছে; হ্রদের জলও নিস্তব্ধ ও শান্ত!

রজনী দ্বিপ্রহর হইয়াছে, কিন্তু এই নিঃশব্দ রজনীতে এক্ষণও দুর্গের পুষ্পোদ্যানে একজন রাজপুত বালিকা একাকী পদচারণ করিতেছেন! উদ্যানে আর জীবমাত্র নাই, শব্দমাত্র নাই, বালিকা একাকী সেই স্নিগ্ধ চন্দ্র-করে পদচারণ করিতেছেন, কথন স্থির উজ্জ্বলনয়নে সেই নীল নভোমণ্ডলের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন, কখন দুই একটী শিশিরসিক্ত পুষ্প তুলিতেছেন, কথন বা চিন্তাকুল হইয়া দুই একটী গীতের অংশমাত্র মৃদুস্বরে গাইতেছেন।

সেই দীর্ঘাকৃতি তন্বঙ্গীকে সেই চন্দ্রকরে একাকিনী দেখিলে যেন মানবী বলিয়া বোধ হয় না, চন্দ্রলোকবাসিনী উদ্যানবিচারিণী কোন উন্নতহৃদয়া পরীকন্যা বলিয়া ভ্রম হয়! বালিকার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষ হইবেক; মুখমণ্ডল অতিশয় সুন্দর; ললাট পরিষ্কার, কিন্তু চিন্তাশীল; নয়ন দুইটী উজ্জ্বল ও তেজঃপূর্ণ ও উন্নত হৃদয়ের পরিচয় দিতেছে; ওষ্ঠদ্বয় সূক্ষ্ম ও রক্তবর্ণ, কিন্তু স্থিরপ্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক। মুখমণ্ডল ও শরীর লাবণ্যময় ও পুষ্প অপেক্ষা কোমল; বালিকার নাম পুষ্পকুমারী। ললাট দেখিলে বোধ হয়, অল্প বয়সেই চিন্তা ও শোক সেই সুন্দর ললাটে আপন আবাসস্থল করিয়াছে; তথাপি সেই দীপ্তিপূর্ণ নয়নদ্বয়ের স্থিরদৃষ্টি দেখিলে বোধ হয়, পুষ্প যথার্থ গরীয়সী রাজপুতবালা, অল্প বয়সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও স্থিরমতি।

উদ্যানে চন্দ্রালোক বৃক্ষপত্রে পুষ্পের উপর রৌপ্যের ন্যায় পতিত হইয়াছে; নিশীথে পুষ্পগণ যেন নির্জ্জনে নিজ নিজ বক্ষের আবরণ ত্যাগ করিয়া শীতল বায়ুতে শরীর জুড়াইতেছে, নৈশ নিস্তব্ধতায় যেন বৃক্ষ ও শাখাগণ ভাবপূর্ণ হইয়া সেই নীল নভোমণ্ডল ও চন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে!

পুষ্প রজনীতে শিশিরাক্ত পুষ্প চয়ন করিতে বড় ভালবাসিতেন, সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বল উদ্যানে নীরবে পুষ্পচয়ন করিতে আসিয়াছিলেন।

সেই ললিত বাহুর উপর, সেই অনাবৃত স্কন্ধের উপর, সেই পরিষ্কার ললাটের উপর, শীতল চন্দ্রকর পতিত হইয়াছে; গুচ্ছ গুচ্ছ কেশের মধ্যে চন্দ্রকর যেন নীরবে প্রবেশ করিতেছে, সেই প্রশস্ত উজ্জ্বল নয়নদ্বয় যেন নীরবে চুম্বন করিতেছে!

এ কি প্রকৃত, না স্বপ্ন! ঐ চন্দ্রদেশ হইতে কি চন্দ্রসম্ভবা কোন অপ্সরা জগতের পুষ্পচয়ন করিতে আসিয়াছেন? কল্পনাশক্তি কি এই অপূর্ব্ব সুন্দর নিশীথে একটী অপরূপ মায়ামূর্ত্তি গঠন করিয়াছে? না জগতের কোন মানবীর ঐ ললিত বাহুযুগল, ঐ সুগোল ললাট ও গণ্ডস্থল, ঐ সূক্ষ্ম রক্তবর্ণ ওষ্ঠ, ঐ চন্দ্রকরোজ্জ্বল প্রশান্ত স্নেহগর্ভ নয়নদ্বয়! নিশীথের শীতল বায়ু ধীরে ধীরে গণ্ডস্থলের উপর দুই একটী কেশ লইয়া ক্রীড়া করিতেছে; নিশীথের চন্দ্রকর নীরবে সেই বিম্বোষ্ঠের পরিমল পান করিতেছে, সেই উন্নত বক্ষঃস্থলের উপর গলিয়া পড়িতেছে।

সহসা দূর হইতে সেই নিস্তব্ধ নিশীথে একটী বীণাধ্বনি শ্রুত হইল; আহা! যেন স্বর্গীয় সঙ্গীতে মুহূর্ত্তের জন্য জগৎ বিমোহিত করিল, আবার ধীরে ধীরে লয় প্রাপ্ত হইল! সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতবিনিন্দিতস্বরে যেন একটী নাম উচ্চারিত হইল,—সে নাম, "পুষ্প!"

নিস্তব্ধ রজনীতে এই মধুর কথা পুষ্পের কর্ণে আঘাত করিল, চকিতের ন্যায় পুষ্প ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—সেই স্নিগ্ধ প্রশান্ত নয়ন ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিলেন, গ্রীবা ঈষৎ বক্র, ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ ভিন্ন; যেন সেই শব্দটী পুনরায় প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন; ঈষদুন্নত মুখমণ্ডল ও ঈষৎ কম্পিত বক্ষঃস্থল সেই শুভ্র রৌপ্য চন্দ্রকরে স্নাত হইল।

পুনরায় সঙ্গীতশব্দ হইল, পুনরায় নাম উচ্চারিত হইল—"পুষ্প!"

এবার যেদিক্ হইতে সঙ্গীত আসিতেছিল, পুষ্প তাহা দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন, প্রাচীরের বাহিরে একটী নির্জ্জন বৃক্ষতলে বসিয়া একজন চরণ একটী বীণা বাজাইয়া গীত আরম্ভ করিতেছেন। পুষ্প চরণদিগের

গীত বড় ভালবাসিতেন, ধীরে চরণের নিকটে আসিয়া একটী বৃক্ষের অন্তরাল হইতে গীত শুনিতে লাগিলেন।

চরণ আর দুই একবার চেষ্টা করিয়া গীত আরম্ভ করিলেন।—"রাজপুত-কামিনীগণ, পুরাকালের একটী গীত শুন, সত্যপালনের একটী গীত শুন! সপ্তমবর্ষীয়া একটী বালিকা ও দশমবর্ষের একটী বালকে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, বালকবালিকা পরস্পরকে বরণ করিলেন, তাহাদিগের পরিণয়ের কথা স্থির হইল, বালিকা সত্য করিলেন, সেই বালক ভিন্ন আর কাহাকেও গ্রহণ করিবেন না। রাজপুতবালা সত্যভঙ্গ করে না।

"বিপদ্ মেঘরাশির ন্যায় গগন আচ্ছন্ন করিল। সে বালক কোথায় গেল, সেই বাত্যায় উড়িয়া গেল, বা জলে মগ্ন হইল,—কে বলিবে বালক কোথায় যাইল? জগৎ সে বালককে বিস্মৃত হইল, সকলে তাহাকে বিস্মৃত হইল, বালিকাও কি তাহাকে বিস্মৃত হইলেন? রাজপুতবালিকা সত্য-ভঙ্গ করে না।

"চন্দাত্তয়ৎকুলের পরাক্রান্ত বীর সেই বালিকার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইলেন; সে বীরের ঐশ্বর্য্য অতুল, পরাক্রম অসীম, যশে দেশ পরিপূরিত হইয়াছে! বালিকা কি সে ঐশ্বর্য্য দেখিয়া সত্যকথা ভুলিলেন? রাজপুত-বালিকা সত্যভঙ্গ করে না।

"চন্দাত্তয়ৎ লোভ প্রদর্শন করিলেন, বালিকা কহিলেন, 'আমি রাঠোরকে সত্যদান করিয়াছি।' চন্দাত্তয়ৎ ভয় প্রদর্শন করিলেন, বালিকা বলিলেন, 'আমি রাঠোরকে সত্যদান করিয়াছি।' চন্দাত্তয়ৎ বালিকাকে বন্দী করিয়া রাখিলেন, বলপূর্ব্বক পাণিগ্রহণ করিতে চাহিলেন, বালিকা বলিলেন; 'চন্দাত্তয়ৎ অপেক্ষা মৃত্যু বলবান্, বালিকা অগ্রে তাঁহার গৃহিণী হইবে।' রাজপুতবালিকা সত্যভঙ্গ করে না।

"রাঠোর কোথায়? পর্ব্বতগহ্বরে বাস করিতেছে, ভিক্ষার অন্ন ভোজন করিতেছে, মহারাণার যুদ্ধ বুঝিতেছে। রাজপুতনারী যদি সত্যবতী হয়েন, রাজপুতবীর অবশ্য জয়ী হইবেন। রাজপুতনারী যদি সত্যবতী হয়েন, রাঠোর সত্যভঙ্গ করিবেন না। রাজপুতবালা কখনও সত্যভঙ্গ করে না।"

পুষ্প এই গীত শ্রবণ করিয়া যেন স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; যতক্ষণ বায়ুতে সেই সঙ্গীতের মিষ্টত্ব লীন না হইল, ততক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, সে গীতে যেন বালিকার হৃদয়যন্ত্র বাজিয়া উঠিল, হৃদয়ের গূঢ় ভাবসমূহের উদ্রেক হইল। পরে ধীরে ধীরে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাহির হইলেন।

চরণদেব সেই লাবণ্যময়ীর দিকে একবার নেত্রপাত করিলেন, পুনরায় ভূমির দিকে নয়ন ফিরাইয়া কহিলেন, "এ নিস্তব্ধ রজনীতে কি আমার অকিঞ্চিৎকর গীতে কুমারী পুষ্পকে বিরক্ত করিলাম? কাননবাসী চরণের শ্রোতা কেহ নাই; কুমারীও যদি বিরক্ত হইয়া থাকেন, আদেশ করিলে চরণ পুনরায় কাননে ফিরিয়া যাইয়া নির্জ্জনে বসিয়া আপন গীত গাইবে।" আহা! সঙ্গীত হইতেও চরণের এই নম্র কথাগুলি মিষ্ট! বলিতে বলিতে ধীরে ধীরে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন; চন্দ্রালোকে তাঁহার অবয়ব দেখিয়া পুষ্প আরও বিস্মিত হইলেন। দুর্জ্জয়সিংহের সভায় পাঠক তাঁহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছেন। যৌবনের তেজঃপূর্ণ কান্তিতে সে অপূর্ব্ব উন্নত বপুঃ পূর্ণ রহিয়াছে, দীর্ঘ বাহুতে বীণা লম্বিত রহিয়াছে, উন্নত ললাটে ও উজ্জ্বল নয়নদ্বয়ে চন্দ্রকর পতিত হইয়াছে! তথাপি সে ললাট ও সেই নয়ন যেন পরিশ্রমে বা শোকে ঈষৎ ম্লান, ঈষৎ চিন্তাশীল। চরণ পুনরায় সেইরূপ ভূমির দিকে নয়ন ফিরাইয়া কহিলেন, "কুমারী আদেশ করিলে চরণ আপন নির্জ্জন কাননে প্রত্যাবর্ত্তন করে। কুমারীর শ্রবণের উপযুক্ত গীত সে কোথা পাইবে?" পুষ্প আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "চরণদেব এ গীত কোথায় শিখিলেন, বলিয়া কি পুষ্পকে চিরবাধিত করিবেন?"—পূর্ব্ববৎ ধীরে ধীরে চরণদেব কহিলেন, "গহ্বরে ও কাননে যাঁহার বাস, গহ্বরে ও কাননে তাঁহার নিকট শিখিয়াছি।" পুষ্পের হৃদয় আরও উদ্বেগপূর্ণ হইল, মনে মনে বলিলেন, "জগদীশ্বর! এতদিনের পর কি পুষ্পের সত্যপালন সার্থক হইল!"

পুনরায় অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গহ্বরে ও কাননে কাহার নিবাস?"

চরণ গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, "যিনি পৈতৃক দুর্গ হারাইয়াছেন, শিশুকাল অবধি বনে বনে বিচরণ করিতেছেন।"

পুষ্প আর উদ্বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না; এবার উচ্চতরস্বরে কহিলেন, "চরণদেব! একজন অভাগিনী রাজপুতবালার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন, সে রাঠোরবীর কি জীবিত আছেন?"

চরণ। "হল্‌দীঘাটার যুদ্ধে রাঠোরের খড়্গ দৃষ্ট হইয়াছিল; পুনরায় ম্লেচ্ছগণ আসিলে পুনরায় রাঠোরখড়্গ দৃষ্ট হইবে।"

সাশ্রুনয়নে পুষ্পকুমারী কহিলেন, "জগদীশ্বর তাঁহাকে কুশলে রাখুন!"

চরণদেব তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি! যদি চরণের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন, তবে সে জিজ্ঞাসা করে, সে রাঠোরকে কি কখনও আপনি

দেখিয়াছিলেন ? যাহাকে জগৎ বিস্মৃত হইয়াছে, যাহাকে তাহার বন্ধুবান্ধব বিস্মৃত হইয়াছে, যে ভীল বা ভূমিয়াদিগের ভিক্ষাহারী, নিবিড় কানন বা পর্ব্বতকন্দরবাসী, এ জগতে কি একজনও তাহার জন্য চিন্তা করে ?"

চরণের স্বর কম্পিত হইল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল ;—কষ্টে শেষে কহিলেন, "আমিও গহ্বরবাসী, সেই রাঠোরের সহিত সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে, কেবল এইজন্য জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার নিকট কি কিছু বলিবার আছে ?"

স্থিরস্বরে পুষ্প বলিলেন, "কেবল এইমাত্র বলিবার আছে, রাজপুতরমণী সত্যপালন করিতে জানে, রাজপুতবালা সত্যপালন করিবে।" পুষ্পের উজ্জ্বল নয়নের স্থিরদৃষ্টি চরণদেব বুঝিলেন।

চর। "তবে কি সে রাঠোর দেবীর পূর্ব্বপরিচিত ?"

এবার পুষ্প লজ্জিতা হইলেন, ধীরে ধীরে কহিলেন, "সে বীর এ অভাগিনীর অপরিচিত নহেন।"

অনেকক্ষণ উভয়ে নিস্তব্ধ রহিলেন ; অনেকক্ষণ পর চরণ পুনরায় কহিলেন, "দেবি ! যেদিন আমাকে তেজসিংহ এই গীত শিখাইয়াছিলেন, সেইদিন এই স্বর্ণ-অঙ্গুরীয়টী আমাকে দেখাইয়া আজ্ঞা করিয়াছিলেন— 'গীতোল্লিখিতা বীরনারীর সহিত যদি কখনও দেখা হয়, আমার সত্যের নিদর্শনস্বরূপ এই অঙ্গুরীয়টী তাঁহাকে দিও।' অদ্য দেবীকে দেখিতে পাইলাম ; যদি আদেশ করেন—যদি ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন—ঐ অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়টী পরাইয়া দি।"

লজ্জাবতী পুষ্প সেই দেববিনিন্দিতরূপ তরুণবয়স্ক চরণের দিকে চাহিলেন ; ঈষৎ কম্পিত হইয়া হস্তপ্রসারণ করিলেন। তাঁহার দেহলতা কাঁপিতেছিল,—কিজন্য ?

চরণদেব ধীরে ধীরে সেই অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিলেন, সেই পুষ্পবিনিন্দিত কোমল হস্ত অনেকক্ষণ আপন হস্তে ধারণ করিয়া রাখিলেন, পুষ্প নয়ন মুদিত করিয়াছিলেন, পুষ্পের বোধ হইল যেন চরণের দীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহার হস্তের উপর পড়িতেছে ; যেন হঠাৎ চরণের তপ্ত ওষ্ঠ সে হস্ত একবার স্পর্শ করিল !

প্রকৃতই কি চরণদেব এই ধৃষ্টতা প্রকাশ করিলেন ? না, এ কেবল পুষ্পকুমারীর কল্পনামাত্র ? জানিবার জন্য পুষ্প চাহিলেন ; পুনরায় সেই দেববিনিন্দিত বপুঃ ও উদার মুখমণ্ডল দেখিলেন, সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বল বিশাল নয়ন দেখিলেন, সেই আনত নম্র আনন দেখিলেন ; এ নম্র চরণের ধৃষ্টতা

সম্ভবে না, পুষ্পকুমারীর কল্পনামাত্র! ঈষৎ চেষ্টাদ্বারা হস্ত ছাড়াইয়া লইলেন। মুহূর্ত্তের জন্য পুষ্পের ললাট ও সমস্ত বদনমণ্ডল একবার রক্তোচ্ছ্বাসে রঞ্জিত হইল, কে বলিবে কিজন্য? কিন্তু চিত্তসংযম করিয়া পূর্ব্ববৎ অকম্পিতস্বরে কহিলেন—"চরণদেব! সে বীরপুরুষকে প্রতিদান করিতে পারি, এরূপ অলঙ্কার আমার নাই; কিন্তু যদি তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয়, অভাগিনী পুষ্পের নিদর্শনস্বরূপ এই পুষ্পটী তাঁহাকে দান করিবেন।" কেশ হইতে একটী পুষ্প লইয়া চরণের হস্তে দান করিলেন; চরণ তাহা হৃদয়ে ধারণ করিলেন।

পরে ধীরে ধীরে চরণকে অভিবাদন করিয়া পুষ্প গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। যতক্ষণ দেখা গেল, চরণদেব সেই লাবণ্যময় রূপ অনিমেষলোচনে দেখিতে লাগিলেন, পরে বৃক্ষাচ্ছাদিত প্রস্তরপরিপূর্ণ দুর্গম পথ দিয়া দুর্গ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। যেরূপে বৃক্ষের শাখা ও মূল ধরিয়া পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতে লম্ফ দিয়া দুর্গ অবতরণ করিতে লাগিলেন, দেখিলে নিশ্চয় উপলব্ধি হয়, চরণের চিরজীবন গীতরচনায় অতিবাহিত হয় নাই।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বন্য-পুষ্প।

রজনী এক প্রহর অবশিষ্ট আছে, এরূপ সময়ে তেজসিংহ সূর্য্যমহল হইতে অবতরণ করিয়া চরণের বেশ ত্যাগ করিয়া নিজ আবাসস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নিকটে আসিয়াছেন এরূপ সময়ে ভীল-ভাষায় একটী গীত তিনি শুনিতে পাইলেন। এই নিস্তব্ধ রজনীতে কে গীত গাইতেছে? উৎসুক হইয়া তিনি পথ ছাড়িয়া কিছু জঙ্গলের ভিতর যাইলেন, দেখিলেন, একটী তুঙ্গ প্রস্তররাশির উপর সেই চন্দ্রালোকে একজন বালিকা বন্য-ফুল চয়ন করিতেছে ও মধ্যে মধ্যে গীত গাইতেছে। বিস্মিত হইয়া চিনিলেন, সে ভীমচাঁদের কন্যা বালিকা।

ক্ষণেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া ডাকিলেন, "বালিকা!"

বালিকা তাঁহার দিকে দেখিয়া হাস্য করিয়া বলিল, "আমি তোমার জন্য বন্য-পুষ্প তুলিতেছি।"

তেজ। "এ কি বালিকা! এত রাত্রিতে একাকী এস্থানে ফুল তুলিতেছিস্ কেন? আমার সঙ্গে ঘরে আয়।"

বালি। "এই তুমি 'পুষ্প' ভালবাস, তোমার জন্য পুষ্প তুলিয়াছি।" বালিকা হাসিয়া উঠিল।

তেজসিংহ ভ্রূকুটী করিলেন; বালিকা কি তেজসিংহের সহিত অদ্য পুষ্পের সাক্ষাতের কথা জানে? কিছু বুঝিতে পারিলেন না।

বালিকা পুনরায় হাস্য করিয়া কহিল, "আমার এ মালা লইবে না?"

তেজ। "লইব বৈ কি, দে না।"

বালি। "আমি পরাইয়া দিব।"

তেজ। "দে, পরে বাড়ী আয়।"

বালি। "ও কি, তোমার বুকে কি?"

তেজ। "একটী ফুল।"

বালি। "ফেলিয়া দাও।"

তেজ। "কেন?"

বালি। "ও যে বাগানের ফুল।"

তেজ। "তাহা হইলেই বা, আমি ফেলিব না।"

বালি। "তবে আমি এ মালা পরাইব না।"

তেজ। "কেন?"

বালি। "মালা পরাইলে 'পুষ্প' রাগ করিবে।"

চকিতস্বরে তেজসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি?"

বালি। "বাগানের ফুল বড় লোক, বনের ফুল ছোট লোক, বন্যফুলের মালা গলায় দেখিলে তোমার ঐ বাগানের ফুলটী রাগ করিবে।"

তেজসিংহ কখনও বালিকার কথার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেন না; জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফুল কি আবার রাগ করে?"

বালি। "করে না? তবে তুমি ঐ ফুল ফেলিয়া দিতে ভয় করিতেছ কেন?" বালিকা হাসিয়া উঠিল।

তেজসিংহ বিরক্ত হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

বালিকা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রিতে একাকী গিয়াছিলে?"

তেজ। "কেন?"

বালি। "পথে যে ভয় আছে।"

তেজ। "কিসের ভয়?"

বালি। "চোরের।"

তেজ। "কৈ, আমি ত তাহা জানি না।"

বালি। "তোমার কিছু চুরি করে নাই?"

তেজ। "না।"

বালিকা তেজসিংহের আপাদমস্তক দেখিয়া বলিল—"তোমার হাতের অঙ্গুরীয়টী তবে কোথায় গেল?"

এবার তেজসিংহ যথার্থ বিস্মিত হইলেন।

এই ভীলবালিকা কি সমস্ত জানে, সমস্ত দেখিয়াছে? বালিকা কি সঙ্গে সঙ্গে লুকাইয়া গিয়াছিল, অঙ্গুরীয়-দান কি লুকাইয়া দেখিয়াছে? না, তাহা ত সম্ভব নহে; এইমাত্র ত সে একটী প্রস্তররাশিতে বসিয়া ফুল তুলিতেছিল। বালিকার কথা তেজসিংহ কিছু বুঝিতেন না। তেজসিংহকে চিন্তিত দেখিয়া ভীলবালা পুনরায় খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—

"কেমন, একটী জিনিস চুরি হইয়াছে কি না?"

তেজ। "না, চুরি হয় নাই, কোথায় রাখিয়া আসিয়া থাকিব।"

বালি। "আমি খুঁজিয়া দেখিব?"

তেজ। "দেখিস্।"

বালি। "যদি পাই তবে আমার?"

তেজ। "হাঁ।"

বালিকা করতালি দিয়া হাস্য করিয়া উঠিল, শেষে বলিল—

"আমার এ মালা লইবে না?"

তেজ। "না, লইব না, তুই বাড়ী আয়।"

বালি। "আমি যাইব না।"

তেজ। "কেন?"

বালি। "এ চাঁদ দেখিয়া গান করিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

বিরক্ত হইয়া তেজসিংহ চলিয়া গেলেন, পশ্চাতে সেই বালিকা-কণ্ঠ-নিঃসৃত গীতধ্বনি শুনিলেন; এবার সে ধ্বনি পরিষ্কার ও সপ্তস্বরমিলিত; বোধ হইল, যেন সেই অনন্ত পর্ব্বতরাশিকে আকুল করিয়া সে খেদনিঃসৃত গীত ধীরে ধীর নৈশ গগনে উত্থিত হইতে লাগিল। ব্যথিত বিদীর্ণ হৃদয় না হইলে কি এ গীত সম্ভবে? ভীলবালার হৃদয়ের সেই গীত কিরূপে আমরা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিব?

গীত।

বন্য-ফুলের পুষ্পমালা কে লভিতে চায়?
ভীলবালার পুষ্পমালা ভূমিতে লুটায়!
উদ্যানে সুগন্ধ ফুল, দেখে ধায় অলিকুল,
গন্ধশূন্য বন্য-ফুল ভূমিতে লুটায়!
গন্ধ-পুষ্প মনোলোভা, হৃদয়-নয়ন-শোভা,
কিবা গন্ধ, কিবা আভা হৃদে স্থান পায়!
নীরবেতে বার বার, বন্য-ফুল চাহে সার,
জীবন-বিহনে তার, জীবন শুখায়!

তেজসিংহ গহ্বরে প্রবেশ করিলেন; তখনও বহুদূর হইতে সেই গীত শুনিতে পাইলেন; তখনও একাকিনী ভীলকন্যা চন্দ্রালোকে বসিয়া সেই হৃদয়নিঃসৃত গীতে পর্ব্বতমালা ও উপত্যকা ভাসাইয়া দিতেছিল; নিস্তব্ধ রজনীকে জগতের অজ্ঞাত হৃদয়ের ভাবে আকুল করিতেছিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

অন্ধকারে আলোকচ্ছটা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রাবণ মাসের প্রারম্ভে হল্‌দীঘাটার যুদ্ধে চতুর্দ্দশ সহস্র রাজপুত স্বদেশের জন্য জীবনদান করিলেন। সে বৎসর বর্ষাকারণ মোগলেরা কিছু করিতে পারিলেন না; অগত্যা মেওয়ার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন; প্রতাপসিংহ কয়েক মাসের জন্য বিশ্রাম পাইলেন।

মাঘমাসে শত্রুগণ পুনরায় সসৈন্যে দেখে দিল। বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপ পুনরায় যুদ্ধদান করিলেন, কিন্তু বহুসংখ্য মোগলের সহিত যুদ্ধ বৃথা চেষ্টা, মনুষ্যের যাহা সাধ্য করিলেন, পুনরায় পরাস্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন।

মোগল সেনানী শাহবাজ খাঁ কমলমীর দুর্গ পরিবেষ্টন করিলেন। প্রতাপ উদয়সিংহের প্রাসাদ তুচ্ছ করিয়া এই স্থলেই রাজধানী করিয়াছিলেন। মেওয়ার হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে মাড়ওয়ারে যাইবার জন্য যে ভীষণ

পর্ব্বত-উপত্যকা ছিল, সেই উপত্যকার উপরই এ পর্ব্বতদুর্গ নির্ম্মিত। দুই পার্শ্বে উন্নত পর্ব্বতরাশি মেঘমালার সহিত বিজড়িত হইয়া থাকিত, মধ্য দিয়া নির্ঝর, পর্ব্বত-তরঙ্গ ও প্রস্তররাশির উপর দিয়া অতি সঙ্কীর্ণ পথ ছিল। এক্ষণে মাড়ওয়ারেও শত্রুদলস্থ সেইদিক্, হইতেই শত্রুগণ আক্রমণ করিয়াছিল, সুতরাং সে দ্বার রুদ্ধ করিবার জন্য প্রতাপসিংহ কমলমীরে রাজধানী করিয়াছিলেন। যতদিন সাধ্য ততদিন এই পর্ব্বতদুর্গ রক্ষা করিলেন; অবশেষে পানীয় জল মন্দ হইল, সেনার পীড়া হইতে লাগিল, প্রতাপসিংহ অগত্যা সে দুর্গ মাতুলহস্তে অর্পণ করিয়া শত্রুগণ না আসিতে আসিতে অন্য দুর্গ রক্ষা করিতে যাইলেন। প্রতাপসিংহের মাতুল বিজলীর প্রমরকুলাধিপতি যুদ্ধপ্রারম্ভে এই দুর্গে মহারাণার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিলেন, "স্বদেশরক্ষার্থে প্রমরকুল সানন্দে জীবনদান করিবে," প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; কমলমীর রক্ষার্থ জীবনদান করিলেন। যোদ্ধার ইহা অপেক্ষা অধিক সাধ্য নহে; কমলমীর শত্রুহস্তে পতিত হইল।

কমলমীর হইতে আসিয়া প্রতাপসিংহ মেওয়ারের দক্ষিণ-পশ্চিমে চপ্পন প্রদেশে চাওয়ন্দ দুর্গে প্রবেশ করিলেন। এ প্রদেশ অতিশয় পর্ব্বতময়, অতিশয় দুরাক্রম্য; এস্থানে কেবল পার্ব্বতীয় ভীলগণ বাস করিত; এ বিপদের সময় ভীল রাজপুতদিগের পরম হিতকারী, প্রতাপ চাওয়ন্দ দুর্গে ভীল ও রাজপুত সৈন্য লইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে শত্রুগণও নিরস্ত রহিলেন না, কমলমীর হস্তগত করিবার পর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানসিংহ ধর্ম্মেতী ও গগুন্দ দুর্গ বেষ্টন করিলেন, মহাবৎ খাঁ উদয়পুর হস্তগত করিলেন, ফরিদ খাঁ চপ্পন প্রদেশ আক্রমণ করিয়া প্রতাপের চাওয়ন্দ দুর্গের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপ চারিদিকে বেষ্টিত হইয়া, অসংখ্য সৈন্যদ্বারা আক্রান্ত হইয়াও প্রতাপসিংহ সাহস ও অধ্যবসায় হারান নাই; যতদিন মেওয়ার দেশে একটী পর্ব্বতদুর্গ বা উপত্যকা স্বাধীন থাকিবে, ততদিন সেই নির্ভীক যোদ্ধা পর্ব্বতকন্দরে, উপত্যকায়, ভীলদিগের মধ্যে বাস করিয়া শিশোদীয়ার নাম রাখিবেন, স্বদেশের নাম রাখিবেন। ভারতবর্ষের সমগ্র বলবীর্য্য আষাঢ় মাসের বৃষ্টির ন্যায় মেওয়ারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; প্রতাপ সেই ভীষণ বাত্যার মধ্যে স্থির ও অকম্পিত। পর্ব্বতে পর্ব্বতে রাজপুতসেনা লুক্কায়িত থাকিত, উপত্যকা ও কন্দরে প্রতাপসিংহের অনুচরগণ প্রতাপসিংহের আদেশ লইয়া যাইত, নিশীথে পর্ব্বত-চূড়ায় দীপালোক দেখিলে প্রতাপের

সেনানিগণ তাহার অর্থ বুঝিত; নির্জ্জন বনে শব্দ শুনিলে তাহার অর্থ বুঝিত; এইরূপ ইঙ্গিতে, মধ্যে মধ্যে, সময় পাইলেই, প্রতাপ নিজ সৈন্য জড় করিতেন ও শত্রুদিগকে অজ্ঞাতে সহসা আক্রমণ করিতেন। প্রতাপ দূরে পলাইতেছে বা লুকাইয়া আছে ভাবিয়া শত্রুগণ যখন নিশ্চিন্ত থাকিত, সহসা প্রতাপ সসৈন্যে দেখা দিতেন, শত্রুসেনা বিনাশ করিতেন। চিতোর গিয়াছে, উদয়পুর গিয়াছে, কমলমীর গিয়াছে, পর্ব্বতদুর্গ একে একে শত্রু-হস্তগত হইতেছে, উপত্যকায় শত্রুসেনা রাশীকৃত হইতেছে, মানসিংহ, সাহবাজ খাঁ, ফরিদ খাঁ, মহাবৎ খাঁ, চারিদিক্ হইতে অসংখ্য সেনা লইয়া আসিতেছে, কিন্তু মেওয়ারের যোদ্ধা স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও অবিচলিত; প্রতাপ-সিংহ শিশোদীয়ার নাম রাখিবেন, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন।

ফরিদ খাঁ সসৈন্যে চপ্পন অধিকার করিয়া চাওয়ন্দ দুর্গ হস্তগত করিতে আসিতেছিলেন। উন্নত পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশ জয় করিয়া মুসলমান মহা উল্লাসে প্রতাপকে বন্দী করিতে আসিতেছিলেন; সহসা প্রতাপের আদেশ গোপনে সেই পর্ব্বতের চারিদিকে নীত হইল; ইঙ্গিতে প্রতাপের সেনানিগণ প্রতাপের উদ্দেশ্য বুঝিল; সহসা ফরিদ খাঁ চারিদিকে অবিশ্রান্ত রাজপুতসৈন্য দেখিলেন; সেই গভীর পর্ব্বতগুহা হইতে ফরিদ খাঁ বা তাঁহার একজন সৈন্যও আর স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না!

চারিদিকে মেঘমালার ন্যায় বিপদ্ যত রাশীকৃত হইতে লাগিল, ভবিষ্যৎ গগন যত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল, অর্থ, সৈন্য-সংখ্যা, দুর্গ-সংখ্যা, যত হ্রাস পাইতে লাগিল, নির্ভীক প্রতাপের সাহস ও অধ্যবসায় ততই দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; সেই পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশ তিনি জগতের বিরুদ্ধে একাকী খড়্গহস্তে রক্ষা করিবেন, সেই পর্ব্বতের প্রত্যেক উপত্যকায় বীরত্বের নাম অঙ্কিত করিবেন।

ভবিষ্যৎ-গগন আরও মেঘাচ্ছন্ন হইতে লাগিল, আরও অন্ধকারময় হইতে লাগিল, সেই অন্ধকারের মধ্যে প্রতাপের সাহস ও দৃঢ় অধ্যবসায় বিদ্যুতালোকের ন্যায় উজ্জ্বলতর চমকিত হইতে লাগিল। দিল্লীর দ্বার পর্য্যন্ত সে আলোকচ্ছটা দৃষ্ট হইল, জগতের প্রান্ত পর্য্যন্ত সে আলোকচ্ছটা চমকিত হইল!

পুনরায় বর্ষা আসিল, মানসিংহ ও মোগলগণ ব্যর্থযত্ন হইয়া পুনরায় সে বৎসর মেওয়ার ত্যাগ করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

অস্থায়ি জগতে স্থায়িত্ব।

আবার বসন্তকাল আসিল। বসন্তকালের সঙ্গে সঙ্গে পঙ্গপালের ন্যায় শত্রুসৈন্য আসিল। ক্ষতি নাই, প্রতাপসিংহ শিশোদীয়ার নাম রাখিবেন, প্রতাপসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা রাখিবেন!

পুনরায় পর্ব্বত ও উপত্যকা শত্রুগণ আচ্ছাদিত করিল, পুনরায় পর্ব্বত-দুর্গ একে একে হস্তগত করিতে লাগিল, পুনরায় পর্ব্বতকন্দর ও নির্জ্জন গুহা হইতে অল্পসংখ্যক কিন্তু নির্ভীক রাজপুতদিগকে তাড়িত করিতে লাগিল; ক্ষতি নাই, প্রতাপসিংহ শিশোদীয়ার নাম রাখিবেন; স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন!

যুদ্ধতরঙ্গ প্রবাহিত হইতে লাগিল; শত্রুসৈন্য আরও রাশীকৃত হইতে লাগিল; ক্ষতি নাই, প্রতাপসিংহ শিশোদীয়ার নাম রাখিবেন, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন!

সে বৎসর অতীত হইল, নূতন বৎসর আসিল, নূতন বৎসর অতিবাহিত হইল, পুনরায় আর এক বৎসর আসিল; অনন্ত যুদ্ধের অন্ত হইল না, মেওয়ার বিজয় হইল না।

দিল্লী হইতে নূতন সৈন্য প্রেরিত হইল, বৎসরে বৎসরে অধিকতর সৈন্য মেওয়ার আক্রমণ করিল, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সেনানী সুশিক্ষিত সৈন্যতরঙ্গের ন্যায় মেওয়ারের উপর প্রধাবিত হইল; নির্ভীক প্রতাপ রণে ভঙ্গ দিলেন না;—মেওয়ার বিজয় হইল না।

প্রতাপসিংহ অনেক সময়ে পর্ব্বতকন্দরে ও নির্জ্জন গহ্বরে বাস করি-তেন; মেওয়ারের মহারাজ্ঞী ও রাজপুত্র গহ্বর হইতে গহ্বরান্তরে বাস করিতেন; শত্রুর আগমনে অনাহারে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে পলায়ন করিতেন; কখন বন্যভীলের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, কখন বন্যপশুর গহ্বরে লুকাইতেন! রাজপরিবার তাপসের ক্লেশ তুচ্ছ করিতেন; শীতে, গ্রীষ্মে, ঘোর বর্ষায় পর্ব্বত ভিন্ন অন্য আশ্রয় পাইতেন না; কখন কখন ক্ষেত্রের "মল" দূর্ব্বা ভিন্ন অন্য খাদ্য পাইতেন না। এ কষ্ট সহ্য করিয়া প্রতাপ রণে ভঙ্গ দিলেন না, মেওয়ার বিজয় হইল না।

প্রতাপসিংহের এ বীরত্বকথা দিল্লীতে শ্রুত হইল, সমগ্র ভারতবর্ষে শ্রুত হইল; কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলে জয় জয় রব করিতে লাগিলেন;

যাঁহারা প্রতাপসিংহের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাঁহারাও শক্রর বীরত্ব দেখিয়া সাধুবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই।

মহানুভব আকবর এই ক্ষত্রিয়ের বীরত্বকথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন, সম্রাটের পারিষদ্‌বর্গ চমৎকৃত হইলেন; দিল্লীর মণি-মাণিক্য-বিভূষিত উন্নত সিংহাসনে দরিদ্র গহ্বরবাসী প্রতাপসিংহের সাধুবাদ হইতে লাগিল, সমগ্র ভারতবর্ষে জয় জয় শব্দ হইল।

পাঠক! এ উপন্যাসকথা নহে; প্রতাপসিংহের বিস্ময়কর বীরত্বকথার নিকট উপন্যাসকথা কি ছার! কোন্ উপন্যাসে ইহা অপেক্ষা দুর্দ্দমনীয় সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার—ইহা অপেক্ষা প্রকৃত দেশানুরাগ ও বীরত্বের পরিচয় পাইয়াছ? ভারতবর্ষেব প্রকৃত গৌরবের কথা স্মরণ হইলে উপন্যাসকথা কি অসার বোধ হয়? আর্জ্জুনির কথা কি অলীক বোধ হয়? প্রতাপ-সিংহের বীরত্ব আলোচনা কব; তিনি সপ্তরথীর সহিত যুদ্ধ করেন নাই, সপ্তকোটি লোকের অধীশ্বর আক্‌বরসাহের সহিত একাকী যুঝিয়াছিলেন! তিনি এক দিবস যুদ্ধ করেন নাই, পঞ্চবিংশ বৎসর অবিশ্রান্ত কন্দরবাসী ক্ষত্রিয় একাকী দেশরক্ষা ও স্বাধীনতারক্ষা করিয়াছিলেন! পঞ্চবিংশ বৎসর যুদ্ধের পর জীবন দান করিলেন; স্বাধীনতা দান করেন নাই।

প্রতাপসিংহের বীরত্বকথা উপন্যাস অপেক্ষা বিস্ময়কব, কিন্তু উপন্যাস নহে। বিশ্বাস না হয়, নিম্নলিখিত কবিতাটী পাঠ কর; উটা আমাদিগের অসার লেখনী-নিঃসৃত নহে, প্রতাপসিংহেব পরম শক্র আক্‌ববসাহের রাজসভার প্রধান সভাসদ্ খান্‌খানান্ সেই দরিদ্র হিন্দুকে উপলক্ষ করিয়া উটি লিখিয়াছেন।

"জগতে সমস্তই ক্ষণস্থায়ী,
"ভূমি ও সম্পত্তি নষ্ট হইবে,
"কেবল মহৎ নামের গৌবব নষ্ট হয় না।
"প্রতাপ ভূমি ও সম্পত্তি বিসর্জ্জন দিয়াছেন,
"প্রতাপ মস্তক নত করেন নাই,
"ভারতবর্ষের রাজাদিগের মধ্যে তিনিই একাকী স্বজাতির মান রাখিয়াছেন।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

অপরিচিতা।

দিনে দিনে, মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে এইরূপ ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল, মেওয়ারের আকাশ মেঘচ্ছায়ায় আরও আবৃত হইতে লাগিল, শত্রুগণ পঙ্গপালের ন্যায় নগর, গ্রাম, পর্ব্বত, উপত্যকা আচ্ছাদিত করিল, দুর্গসমুদয় একে একে শত্রুহস্তগত হইল, কিন্তু কন্দরবাসী প্রতাপসিংহ রণে ভঙ্গ দিলেন না, মেওয়ার বিজয় হইল না।

একদা সমস্ত দিন এইরূপ তুমুল সংগ্রাম হইল, অসংখ্য মোগলসৈন্য প্রতাপসিংহকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছে; প্রতাপসিংহ কখন আনায়-বেষ্টিত সিংহের ন্যায় যুদ্ধদান করিতেছেন, কখন বা পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে সরিয়া যাইতেছেন, পুনরায় নির্ম্মেঘ আকাশ হইতে বজ্রের ন্যায় সহসা অন্যদিক্ হইতে শত্রুকে আক্রমণ করিতেছেন। সমস্ত দিবস এইরূপ যুদ্ধ হইল, রজনীর আগমনে যেন যোদ্ধাগণ অধিকতর উন্মত্ত হইয়া সেই ঘোর সংগ্রামে মিলিত হইল, যুদ্ধের পৈশাচিক রব রজনীর নিস্তব্ধতায় পর্ব্বত ও উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

রজনী দ্বিপ্রহরের পর বনের অন্ধকারের ভিতর দিয়া কতকগুলি ভীল অতি সতর্কতার সহিত একটী কাষ্ঠাধার একটী গহ্বরমুখের দিকে আনিতে লাগিল। রজনীর অন্ধকারে মনুষ্য মনুষ্যকে দেখিতে পায় না; সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে ভীলগণ ঝোপের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে সেই আধার আনিতেছিল। আকাশে তারা নাই, জগতে আলোক নাই, ভীল ভিন্ন আর কেহ সে অন্ধকার রজনীতে সে জঙ্গলাচ্ছাদিত পর্ব্বতপথ দিয়া আসিতে পারিত না। ভীলদিগের পদশব্দ শ্রুত হইতেছে না, নিশ্বাসশব্দ শ্রুত হইতেছে না, নিঃশব্দে সেই আধার একটী নিবিড় ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিল, সেই ঝোপে একটী গহ্বরের মুখ আবৃত ছিল। আধার গহ্বরে প্রবেশ করিল; ভীলগণ তথায় আধার রাখিয়া অদৃশ্য হইল। নিস্তব্ধ গহ্বরে শব্দমাত্র নাই; কেবল সুদূর হইতে ভয়ানক যুদ্ধশব্দ এক একবার প্রবেশ করিতে লাগিল; বোধ হইল, যেন অদ্যই জগৎ মোগলশূন্য বা রাজপুতশূন্য হইবে!

সেই অন্ধকারময় নিশীথে সেই ভীলবাহিত আধারে পাঠকের পূর্ব্ব-পরিচিতা পুষ্পকুমারী এই গহ্বরে আনিতা হইয়াছিলেন। এ ভীষণ যুদ্ধে সূর্য্যমহলে রমণীদিগের স্থান নাই, সুতরাং দুর্জ্জয়সিংহের পরিবার স্থান হইতে স্থানান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথাপি পুষ্প কি জানিতেন যে, অদ্য কাহার যত্নে তিনি এই নির্জ্জন নিরাপদ গহ্বরে আশ্রয় পাইলেন? পুষ্প কি জানিতেন যে, আর একজন রাজপুত বীররমণীও এই ভীষণ যুদ্ধ সময়ে এই নির্জ্জন ভীল-গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন?

গহ্বরের ভিতরে একটী দীপ জ্বলিতেছিল; সেই দীপালোকে পুষ্প দেখিলেন, একজন দীর্ঘকায় উজ্জ্বলনয়না গরীয়সী রাজপুতরমণী উপবিষ্টা রহিয়াছেন। রমণীর শরীর উন্নত, পরিষ্কার ললাটে একটী হীরকখণ্ড জ্বলিতেছে; নয়ন হইতে নির্ম্মল উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে, কণ্ঠে একটী মুক্তাহার লম্বিত রহিয়াছে। উন্নত অবয়ব ও জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডল দেখিলে রমণীকে উন্নতহৃদয়া ও উন্নতকুলসম্ভবা বলিয়া বোধ হয়; তথাপি পরিশ্রমে বা ক্লেশে বা চিন্তায় সে বিশাল নয়ন আজি কালিমাবেষ্টিত, সে সুন্দর ললাট আজি ঈষৎ রেখায় অঙ্কিত। গরীয়সী বামার বয়ঃক্রম চত্বারিংশৎ বৎসর হইবে, তিনি পাঠকের অপরিচিতা, কিন্তু মেওয়ারে তিনি অপরিচিতা ছিলেন না।

সেই অপূর্ব্ব নির্জ্জন পর্ব্বত-গহ্বরে সেই গরীয়সী অধিষ্ঠাত্রী দেবতুল্যা রমণীকে দেখিয়া পুষ্প চকিতের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেক নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন; পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—

"দেবি! আমি কোথায় আসিয়াছি জানি না, আপনি কে জানি না; এইমাত্র জানি যে, আমি অভাগিনী! আপনি দেবী কি মানবী জানি না; আমার হৃদয় যেন সত্যই আপনাকে ঈশানীস্বরূপ জ্ঞান করিতেছে। কি লীলার জন্য আপনি এ গহ্বরে বাস করেন জানি না, কিন্তু দেবী হউন আর মানবী হউন, অনুমতি করুন, আপনার দর্শন আর হারাইব না, আপনার দাসীর মধ্যে আমাকে গণ্য করিবেন। পুষ্প এ জীবনে অনেক সহ্য করিয়াছে; অনুমতি দিন, এক্ষণে এই নির্জ্জন গহ্বরে বাস করিয়া দেবীর সেবায় শান্তিলাভ করিবে।"

পুষ্পকুমারীর করুণস্বর ও সজল নয়ন দেখিয়া অপরিচিতা সানুকম্পাস্বরে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "দেবি! অদ্য তোমারও যে অবস্থা, আমারও সেই অবস্থা; আমি এ গহ্বরবাসিনী নহি, তোমারই ন্যায় বিপদ্ হইতে পলায়ন করিয়া এই গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। পুষ্প! পুষ্প

অপেক্ষা তোমার নম্র কথাগুলি মিষ্ট! এই বিপদের দিনে আমাদের সাক্ষাৎ হইল; যদি ইচ্ছা কর, তুমি আমারই নিকট থাকিও, আমার পুত্রকন্যা যদি নিরাপদে থাকে, তুমিও নিরাপদে থাকিবে, ইহার অধিক আশ্বাস দিতে পারি না।"

এই সস্নেহ বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া পুষ্প নিজের পরিচয় দান করিলেন। অল্প বয়সে তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল, বালিকা একটী রাঠোর বালককে বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহ চিরপ্রচলিত 'ওয়েরী' বশতঃ রাঠোরদুর্গ কাড়িয়া লইয়াছেন। রাঠোরযুবা বোধ হয় জীবিত আছেন, কিন্তু কোথায় আছেন পুষ্প জানেন না; পুষ্পের এ জগতে মহতের শরণ লওয়া ভিন্ন স্থান নাই, সে এখনও কুমারী।

এই দুঃখকাহিনী শুনিয়া অপরিচিতা অধিকতর অনুকম্পার সহিত পুষ্পকে আশ্বাসদান করিলেন ও কহিলেন, "আমার স্বামী মেওয়ারে অপরিচিত নহেন; এই ভীষণ যুদ্ধের অন্তে বোধ হয় তিনি তোমাকে সহায়তা করিবেন।"

পুষ্প। "দেবি! যদি ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, দেবী কোন্ উন্নতবংশসম্ভবা, দেবী কাহার গৃহিণী?"

অপরিচিতা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "পুষ্প! অদ্য আমাকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না; অদ্য আমার পরিচয় অব্যক্ত থাকিবে। কেবল এইমাত্র জানিও পিতার বহুদিন মৃত্যু হইয়াছে; হৃদয়েশ্বর একজন শিশোদীয় যোদ্ধা, সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়াছেন, সমস্ত রজনী যুদ্ধ করিবেন; ঈশানী তাঁহার সহায়তা করুন।"

অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর পুষ্প পুনরায় অপরিচিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আপনার কথায় বোধ হয় আপনি কোন উন্নত বংশের গৃহিণী; বোধ হয় অন্য কোন বংশের সহিত আপনাদিগেব 'ওয়েরী' আছে; এ যুদ্ধের সময় আপনাদিগের বিপদ দেখিয়া তাহারা আপনাদিগের সম্পত্তি ও দুর্গ লইয়াছে। মেওয়ারের সকল বংশেরই এইরূপ বংশাগত 'ওয়েরী' আছে; রাঠোরবংশেও চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহের বংশে এইরূপ 'ওয়েরী' আছে।"

কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া অপরিচিতা কহিলেন, "আমাদেরও বংশানুগত 'ওয়েরী' আছে, শত্রুকুল দুর্গ লইয়াছে, সম্পত্তি এখনও লইতে পারে নাই, কিন্তু যুদ্ধ চলিতেছে।"

পুষ্প। "বিদেশীয় শত্রু বর্ত্তমানে কিরূপে গৃহকলহ চলিতেছে?"

অপ। হাসিয়া কহিলেন, "বিদেশীয় শত্রু বর্ত্তমানে মেওয়ারে সমস্ত গৃহকলহ ক্ষান্ত থাকে, আমাদিগের 'ওয়েরী' ক্ষান্ত হয় না।"

পুষ্প। "এ 'ওয়েরী' কত পুরুষ অবধি চলিতেছে?"

অপ। "যতদূর মেওয়ারের চরণগণ মেওয়ারের ইতিহাস কহিতে পারে, ততদুর পর্য্যন্ত আমাদিগের এই 'ওয়েরীর' নিদর্শন দেখা যায়।"

পুষ্প। "কিন্তু শত্রুকুল বোধ হয় ইহার পুর্ব্বে কখনও আপনাদিগের পৈতৃক দুর্গ অপহরণ করিতে পারে নাই।"

অপ। "তাহাও হইয়াছে। তিন শত বৎসর পুর্ব্বে শত্রুকুল আমাদিগের দুর্গ লইয়াছিল, কিন্তু কতদিন রাখিতে পারে? পুনরায় সে দুর্গ শিশোদীয়-অধিকৃত হয়। পুনরায় এক্ষণে লইয়াছে, সেই জন্য আমরাও পর্ব্বতবাসিনী, কিন্তু কতদিন রাখিবে?"

পুষ্প। "আপনারা কখন শত্রুকুলের দুর্গ লইয়াছিলেন?"

অপ। "পারি নাই, কিন্তু উদ্যমের ক্রুটী নাই। স্বামীর পিতামহের সময় আমাদের বংশ প্রায় শত্রুকে পরাজয় করিয়া শত্রু-দুর্গ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে পরাস্ত হইলেন; সেই যুদ্ধের পর পিতামহের মৃত্যু হয়।"

পুষ্প। "সে যুদ্ধ কোথায় হয়?"

অপ। "বায়নায় যুদ্ধ হয়।"

এ গরীয়সী অপরিচিতা কে? বায়না কোথায়? পুষ্প এই চিন্তা করিতেছিলেন, এরূপ সময়ে সহসা সেই গহ্বরে দীর্ঘকায়া একজন রমণী প্রবেশ করিলেন; তিনি নাহারা মগ্‌রোর চরণীদেবী!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভবিষ্যৎ-বাণী।

চরণীদেবী অগ্রসর হইয়া আপন ধীর ও গম্ভীরস্বরে অপরিচিতাকে বলিলেন, "দেবি! গণনায় অদ্য জানিলাম, এই অন্ধকারময় শৈলগহ্বর অদ্য পবিত্র ও আলোকপূর্ণ; চরণী দৃষ্টিহীনা, কিন্তু এ পর্ব্বত-প্রদেশের পথ তাহার অবিদিত নহে। দিব্য চক্ষে সেই আলোক দর্শন করিতে আসিলাম,

অনুগ্রহ করিয়া দেখান। অবগুণ্ঠন ত্যাগ করুন; মহারাজ্ঞি! চরণীর নিকট অবগুণ্ঠন অনাবশ্যক।"

আর সঙ্গোপনচেষ্টা অনাবশ্যক জানিয়া মহারাণা প্রতাপসিংহের মহিষী অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিলেন; পুষ্প চকিত ও বিস্ময়পূর্ণ হইয়া ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে সজলনয়নে মহারাজ্ঞীর পদযুগল ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ্ঞী তাঁহাকে মিষ্ট কথা বলিয়া হাত ধরিয়া উঠাইলেন।

পরে চরণীর দিকে চাহিয়া কহিলেন,—

"দেবি! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান আপনার নিকট অবিদিত নাই; আমার হৃদয়ের চিন্তা দূর করুন।"

"অদ্য মহাযুদ্ধে স্বামী লিপ্ত হইয়াছেন; স্বামীর মঙ্গলবার্ত্তা কহিয়া এ হৃদয় শান্ত করুন।"

চরণীদেবী ক্ষণেক ঊর্দ্ধে চাহিয়া রহিলেন; ক্ষণেক পরে বলিলেন, "রাজ্ঞী, নিরুদ্বেগ হউন; মহারাণার এ যুদ্ধে আপদ্ নাই।"

মহারাজ্ঞীর হৃদয় শান্ত হইল; পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি! এ বিপদ্ কত দিন থাকিবে?—আমাদিগের সমস্ত দুর্গ শত্রুহস্তগত,—এ বিপদ্‌কালে আমাদিগের কোথায় বসতি?"

চরণী। "ভীলগণ শিশোদীয়ের চির-বিশ্বাসী; মহারাণা উদয়সিংহকে ভীলসর্দ্দার ভীমচাঁদের পিতাই আশ্রয়দান করিয়াছিল, মহারাণা প্রতাপ-সিংহের পরিবারকে তাহারাই আশ্রয়দান করিবে। জাউরার খনির ভিতর সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করে না, আহবের শব্দ প্রবেশ করে না; মহা-রাণার পরিবার তথায় যাইয়া নিরাপদে থাকিবেন, ভীলগণ তথায় আপনা-দিগকে রক্ষা করিবে।"

অন্যান্য কথার পর মহারাজ্ঞী পুষ্পের দিকে চাহিয়া হাসিয়া পুনরায় চরণীদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"দেবি, দিল্লীশ্বরের সহিত আমাদিগের বংশানুগত যে 'ওয়েরী' চলিতেছে, তাহা কি আপনি নিষেধ করেন?"

চরণী গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "পুরুষে পুরুষে এ পবিত্র 'ওয়েরী' চলিতে থাকুক, এ 'ওয়েরী' যবে শেষ হইবে, মেওয়ারের জীবন তবে শেষ হইবে।"

রাজ্ঞী। "দেবি, আর একটী কথা বলিয়া এ ব্যথিত হৃদয় শান্ত করুন; মেওয়ারের এ কাল সময় আর কতদিন থাকিবে?"

চরণীদেবী উত্তর করিলেন, "মেওয়ারের আকাশ পরিষ্কার হইতেছে, বীরত্ব ও অধ্যবসায়ের জয় অনিবার্য্য।"

রাজ্ঞী। "কিরূপে সে বিজয় সাধন হইবে তাহা কি জানিতে পারি ?"

চরণীদেবী অনেকক্ষণ উর্দ্ধনেত্রে চিন্তা করিলেন, শেষে বলিলেন, "রাজার বল অস্ত্রে ও মন্ত্রণায় ; অস্ত্রে যাহা সাধ্য, মহারাণা তাহা করিয়াছেন ; এক্ষণে মন্ত্রী ভামাশাহ সহায়তা করুন। ভামাশাহের স্বামীধর্ম্মে মেওয়ারের বিজয়।"

রাজ্ঞী। "ভামাশাহের সহায়তায় কি হৃদয়েশ্বর চিতোর উদ্ধার করিবেন ?"

চরণী। "মহারাজ্ঞীর পুত্র চিতোর উদ্ধার করিবেন ; মহারাণা প্রতাপসিংহ সে দিন দেখিবেন না।"

রাজ্ঞী। "তাহাই হউক ! হৃদয়েশ্বর মেওয়ার রক্ষা করুন, পুত্র অমরসিংহ পুনরায় চিতোর উদ্ধার করুন। দেবি ! আপনার বাক্য আমার চিন্তিত হৃদয়ে শান্তি দান করিল, যদি অনুমতি করেন, আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি।"

চরণী। "মহারাজ্ঞী যাহা আদেশ করিবেন, চরণীদেবী তাহা সানন্দে পালন করিবেন।"

রাজ্ঞী। "সে প্রশ্ন এই,—মেওয়ারের দূর ভবিষ্যতে কি আছে ? তুর্কীর বিজয়, না শিশোদীয়ের বিজয় ?"

এবার চরণীদেবী অনেকক্ষণ উর্দ্ধনেত্রে চিন্তা করিলেন, তাঁহার পরিষ্কার ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইল, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, দৃষ্টিহীন স্থির নয়ন অনেকক্ষণ উর্দ্ধদিকে চাহিয়া রহিল। পরে গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "মহাব্যক্তি ! আমার বয়স অধিক হইয়াছে, নয়ন ক্ষীণ ; ভবিষ্যৎ আকাশ যতদূর দেখিতে পাই, মেওয়ার তমসাচ্ছন্ন, রাশীকৃত মেঘের পর রাশীকৃত মেঘ ; অন্ধকারের পর নিবিড় অন্ধকার। রাজপুত বহুদিন তুর্কীর সহিত যুঝিতেছে ; তৎপরে রাজপুত দক্ষিণবাসী হিন্দুর সহিত যুঝিতেছে ; তাহার পর এ কি ! মহাসমুদ্র হইতে শ্বেত তরঙ্গের উপর শ্বেত তরঙ্গ আসিয়া মেওয়ার ও সমগ্র ভারতবর্ষ প্লাবিত করিতেছে। এ কি প্রলয় উপস্থিত ! বৃদ্ধার নয়ন ক্ষীণ, আর দেখিতে পায় না।"

চরণী নিস্তব্ধ হইল, গভীর অন্ধকারে তাঁহার গম্ভীর বাণী বার বার সেই পর্ব্বতগহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যমহল ধ্বংস।

কিজন্য ও কি অবস্থায় রাজ-পরিবার ভীল-গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা বর্ণনা করা আবশ্যক।

মোগলদিগের সহিত যুদ্ধহেতু মহারাণা প্রতাপসিংহ সর্ব্বদাই সপরিবারে কন্দরে ও পর্ব্বতগুহায় বাস করিতেন। মেওয়ারের মহারাজ্ঞী স্বামীর ন্যায় দেশপ্রিয়া ছিলেন; ক্লেশ ও যাতনা তুচ্ছ করিয়া কঠোর প্রস্তরের উপর রজনীতে শয়ন করিতেন, স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া শিশুদিগকে খাওয়াইতেন, বিপদের সময়ে পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে, কন্দর হইতে অন্য কন্দরে পলাইতেন, তথাপি সন্ধি প্রার্থনার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিতেন না। বন্য হিংস্রক জন্তুর আবাসস্থানে মহারাজ্ঞী আশ্রয় গ্রহণ করিতেন; শীতকালে রোরুদ্যমান শিশুদিগকে ক্রোড়ে করিয়া সান্ত্বনা করিতেন, বর্ষাকালে কখন কখন পর্ব্বতকন্দর ভাসিয়া যাইলে সিক্তবস্ত্রে সমস্ত রজনী শিশুক্রোড়ে দণ্ডায়মান থাকিতেন, তথাপি মোগলের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিতেন না। ক্ষেত্রের "মল" দূর্ব্বার রুটী প্রস্তুত করিয়া শিশুদিগকে খাওয়াইতেন, কখন বা প্রস্তুত রুটী একবার, দুইবার, পাঁচবার ত্যাগ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত শিশুদিগকে লইয়া শত্রুভয়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে, তথা হইতে পুনরায় আর এক স্থানে পলায়ন করিতেন, তথাপি মোগলের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিলেন না।

এইরূপ অসহ্য কষ্ট সহ্য করিয়াও মহারাণা মোগলদিগের সহিত বৎসর বৎসর যুদ্ধদান করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রায় সমস্ত দুর্গ, সমস্ত পর্ব্বত, সমস্ত উপত্যকা শত্রুহস্তে পতিত হইল, প্রতাপসিংহ বিশাল মেওয়ার রাজ্যে মস্তক রাখিবার স্থানও পাইলেন না! অবশেষে তিনি চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়-সিংহের সূর্য্যমহলে আপন পরিবার রাখিলেন, স্বয়ং শত্রুদিগকে আপন অল্প সৈন্য লইয়া নানাদিক্ হইতে বার বার গোপনে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ সসম্মানে রাজপরিবারকে আপন প্রাসাদ ছাড়িয়া দিলেন; অসংখ্য মোগল শত্রু আসিয়া সূর্য্যমহল বেষ্টন করিল; মেওয়ারের প্রধান

যোদ্ধাগণ কেহ প্রতাপসিংহের সঙ্গে রহিলেন, কেহ বা সূর্য্যমহল রক্ষা করিতে লাগিলেন।

তেজসিংহ সূর্য্যমহলেই রহিলেন; বিপদের সময় রাজপুত রাজপুতের ভ্রাতা! দুর্জ্জয়সিংহ নিঃসঙ্কোচে তেজসিংহ ও তাঁহার রাঠোরগণকে সূর্য্য-মহলে প্রবেশ করিতে দিলেন, কেননা তেজসিংহ রাজপুত! বিশ্বাস-ঘাতকতা জানেন না; রাজকার্য্যসাধনার্থ দুর্গে প্রবেশ পাইয়া আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন না। তেজসিংহ নিঃসঙ্কোচে শত্রুদুর্গে শত্রুসৈন্যের মধ্যে আপন অল্প সৈন্য লইয়া বাস করিতে লাগিলেন, কেননা দুর্জ্জয়সিংহ রাজপুত; বিদেশীয় যুদ্ধের সময় তেজসিংহের উপর কদাচ হস্তক্ষেপ করিবেন না।

তেজসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহ উভয়েই অসাধারণ সাহসী, কিন্তু এক্ষণে পরস্পরের বর্ত্তমানে অধিকতর বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যেস্থানে অতিশয় ঘোরতর বিপদ্ হইত, যে স্থানে শত্রুগণ অসংখ্য বলে আক্রমণ করিত, তেজসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহ উভয়েই প্রথমে সেই স্থানে যাইবার উদ্যম করিতেন, কেননা রাঠোর চন্দাওয়ৎ অপেক্ষা হীন নহে; চন্দাওয়ৎ রাঠোর অপেক্ষা হীন নহে। একদিন নিশার যুদ্ধে শত্রুগণ ভীষণ বলে দুর্গের একটী দ্বার ভগ্ন করিয়া ফেলিল ও সেই পথ দিয়া অসংখ্য মোগল দুর্গে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল। দুর্গবাসীগণ এই বিপদ্ দেখিয়া যেন চকিতের ন্যায় রহিল; সহসা তেজসিংহ বজ্রনাদে কতিপয়মাত্র রাঠোর সঙ্গে লইয়া শত্রুমধ্যে পড়িলেন; যেন অসুরবলে তাহাদিগের গতিরোধ করিলেন, অমানুষিক বেগে শত্রুসেনা ছিন্নভিন্ন করিয়া দুর্গদ্বার অতিক্রম করিলেন; পরে পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ হইলে লম্ফ দিয়া প্রাচীর অতিক্রম করিয়া শোণিতাপ্লুতদেহে দুর্গে প্রবেশ করিলেন। এই অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া সমস্ত দুর্গবাসীগণ জয় জয় নাদে দুর্গ পরিপূর্ণ করিল। দুর্জ্জয়সিংহ সে বীরত্ব দেখিলেন, সে জয় জয় নাদ শুনিলেন; রজনী প্রভাত হইলে দুর্গদ্বার উদ্ঘাটন করিবার আদেশ দিলেন; দ্বিশতমাত্র চন্দাওয়ৎ লইয়া দুর্দ্দমনীয় তেজে সহসা পঞ্চশত মোগলকে আক্রমণ করি-লেন; সহসা আক্রান্ত মোগলগণ সে সরোষ আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হইলে অসমসাহসী চন্দাওয়ৎ তাহাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বহস্তে মোগল-সেনানীর শিরশ্ছেদন করিয়া পুনরায় দুর্গে প্রবেশ করিলেন; অন্যান্য মোগলদল আসিবার পূর্ব্বে দুর্গের দ্বার রুদ্ধ হইল, চন্দাওয়তের বীরত্বযশে দুর্গ পরিপূরিত হইল!

এইরূপ পরস্পরে পরস্পরের সাহসে ও বীরত্বে যেন ক্রুদ্ধ হইয়াই অসাধারণ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; রজনীতে শয্যা তুচ্ছ করিয়া চন্দ্রালোকে বা মশালের আলোকে উভয়ে প্রাচীরের উপর পদচারণ করিতেন, শত্রুসেনা লক্ষ্য করিতেন, শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেন; আপন আপন সৈন্যগণকে সাহস দান করিতেন। শত্রুগণকে অসতর্ক দেখিলেই উভয়ে মিলিত হইয়া নৈশ আক্রমণে শত্রুসেনা ছারখার করিতেন, ভ্রাতার ন্যায় একের পার্শ্বে অন্যে যুদ্ধ করিতেন, উভয়েই ভীষণনাদে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেন, কেহই ন্যূন নহেন, কেহই অন্য অপেক্ষা অগ্রসর হইতে পারিতেন না। শত্রুসেনা ছারখার করিয়া চন্দাওয়ৎ ও রাঠোর একত্র দুর্গে প্রবেশ করিতেন; পরিশ্রান্ত তেজসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহ প্রাচীরেব উপর একই স্থানে উপবেশন করিয়া সামান্য রুটী ও অপরিষ্কার জলে ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতেন; পরে যখন পূর্ব্বদিক্ রক্তিমাচ্ছটায় রঞ্জিত হইত, সেই প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীরের উপর ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় দুইজন পরম শত্রু নিঃসঙ্কোচে নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যাইতেন।

রাজপুত-ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ কর; কপটাচারিতার পরিচয় নাই, সত্যভঙ্গের পরিচয় নাই, পরম শত্রুর সহিতও অন্যায় সমরের বা বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় নাই! সম্রাটের বাক্য লঙ্ঘন হইয়াছে, সন্ধিপত্র লঙ্ঘন হইয়াছে, রাজপুতের সত্য লঙ্ঘন হয় নাই!

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল; অবশেষে সূর্য্যমহলের খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের অভাব হইতে লাগিল; তখন রাজপরিবারকে আর এ দুর্গে রাখা বিধেয় বোধ হইল না। অতিশয় যত্নে, অতিশয় সঙ্গোপনে রাজপরিবারকে ভীমগড় দুর্গে প্রেরণ করা হইল; দুর্জ্জয়সিংহ ও অন্যান্য যোদ্ধাগণ নিজ নিজ পরিবারকে অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করিলেন; পরে যোদ্ধাগণ অর্দ্ধেক ভোজনে প্রাণধারণ করিয়া তখনও দুর্গরক্ষা করিতে লাগিলেন।

মনুষ্যের যাহা সাধ্য, রাজপুতগণ তাহা করিলেন, আরও এক মাস দুর্গ রক্ষা করিলেন, কিন্তু অনাহারে প্রাণধারণ করা মনুষ্যের সাধ্য নহে; সূর্য্যমহলের দ্বার অবশেষে উদ্ঘাটিত হইল, মোগলগণ ভীষণনাদে দুর্গে প্রবেশ করিল; দুর্গের মধ্যে মোগল ও রাজপুতে মহাকোলাহলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

সে যুদ্ধ বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম;—বর্ণনা করিবার আবশ্যকও নাই। রাজপুতগণ মৃত্যু নিশ্চয় জানিলে মানরক্ষার জন্য কিরূপ যুদ্ধ করে,

ইতিহাসের প্রত্যেক পত্রে তাহা বর্ণিত আছে। মনুষ্যের যাহা সাধ্য, রাজপুতগণ তাহা সাধিল; কিন্তু দশের সহিত একের যুদ্ধ সম্ভবে না: রাজপুত হীনসংখ্য হইয়া ক্রমে হটিতে লাগিল।

যুদ্ধতরঙ্গ প্রাঙ্গণ হইতে তোরণে, তোরণ হইতে গৃহমধ্যে গড়াইতে লাগিল, তীর ও বন্দুকের ধূমে ও মনুষ্যের কোলাহলে সূর্য্যমহল-প্রাসাদ পরিপূর্ণ হইল, অল্পসংখ্যক্ রাজপুত ছিন্নভিন্ন ও শত্রুবেষ্টিত হইয়া তখনও অসুরবীর্য্যে প্রাসাদ রক্ষা করিতেছে!

প্রাসাদের শেষ কুটীরে দুর্জ্জয়সিংহের সহিত তেজসিংহের সহসা দেখা হইল; উভয়ই খড়্গহস্ত, উভয়ই রক্তাপ্লুত! তেজসিংহ ঈষৎ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "দুর্জ্জয়সিংহ! চন্দাত্তয়ৎ রাঠোরের বীরত্ব দেখিয়াছেন, রাঠোর চন্দাত্তয়তের বীরত্ব দেখিয়াছেন; আর যুদ্ধ নিষ্ফল, এ যুদ্ধে জীবনদান করাও নিষ্ফল। কিন্তু অদ্য আমরা রক্ষা পাইলে মহারাণার অন্য কার্য্য সাধন করিতে পারিব।"

দুর্জ্জয়। "মহারাণার কার্য্যসাধন রাজপুতের প্রথম কর্ত্তব্য, কিন্তু অদ্য পরিত্রাণ পাওয়ার কি পথ আছে?"

তেজসিংহ ধীরে ধীরে একটী গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "শুনিয়াছি, ঐ গবাক্ষ দিয়া একজন রাঠোর বালক লম্ফ দিয়া হ্রদে পড়িয়াছিল, পরে সন্তরণ দিয়া জীবনধারণ করিয়াছিল। রাঠোর বালক যাহা করিয়াছিল, চন্দাত্তয়ৎ বীর বোধ হয় তাহা করিতে পারেন।"

লজ্জায়, রোষে, পূর্ব্বকথা স্মরণে দুর্জ্জয়ের মুখ রক্তবর্ণ হইল, হস্তের অসি কাঁপিতে লাগিল;—রোষে পদাঘাত করিয়া সে গবাক্ষ বিদীর্ণ করিয়া লম্ফ দিয়া হ্রদে পড়িলেন।

তেজসিংহও সে গবাক্ষ দিয়া হ্রদে পড়িলেন, উভয়ে সন্তরণ দিয়া হ্রদ পার হইলেন।

সূর্য্যমহল শত্রুহস্তগত হইল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভীমগড় ধ্বংস।

উপরি উক্ত ঘটনার পর প্রায় একমাস কাল কোন যুদ্ধ হইল না। ভীম-গড়নিবাসী রাজপুত্‌গণ মনে করিলেন, যুদ্ধ বোধ হয় এ বৎসরের জন্য ক্ষান্ত হইল; কিন্তু সে আশায় তাঁহারা অচিরে নৈরাশ হইলেন।

মহারাণা প্রায়ই দুর্গে থাকিতেন না। অল্পসংখ্যক্ সৈন্য লইয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে ও উপত্যকায় উপত্যকায় বাস করিতেন; স্থানে স্থানে সেনাগণকে সন্নিবেশিত করিতেন; সুযোগ পাইলেই অন্ধকার নিশীথে সমস্ত সৈন্য লইয়া নিশ্চিন্ত মোগলদিগকে সহসা আক্রমণ করিতেন, পুনরায় বহুসংখ্যক্ মোগল সৈন্য জড় হইবার পূর্ব্বে যেন ভূগর্ভে বা পর্ব্বতগহ্বরে লীন হইয়া যাইতেন। দিবসে, যামিনীতে, শীতে, বর্ষায়, গ্রীষ্মে, অবিশ্রান্ত প্রতাপসিংহ এইরূপে মেওয়ার রক্ষা করিতে লাগিলেন; অনন্ত যুদ্ধ চলিতে লাগিল, মেওয়ার বিজয় হইল না।

এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে মুসলমানগণ সহসা একদিন রজনীতে দ্বিসহস্র সৈন্যসমেত ভীমগড় দুর্গ আক্রমণ করিল। ভীমগড়ে রাজপরিবার আছেন এ সংবাদ কোনরূপে তাহারা জানিয়াছিল; রাজ-পরিবারকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করিলে অবশেষে প্রতাপ তাহাদিগের উদ্ধারের জন্য অবশ্যই অধীনতা স্বীকার করিবেন, এই আশায় অদ্য সহসা মহাকোলাহলে ভীমগড় দুর্গ আক্রমণ করিল।

রাজপুতগণ নিশাযোগে এই সহসা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। প্রতাপসিংহ দুর্গে ছিলেন না, দেবীসিংহও কয়েক শত রাঠোর লইয়া মহারাণার সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ফিরিতেছিলেন। কেবল বালক চন্দনসিংহ পাঁচ শত মাত্র রাঠোর লইয়া দুর্গে ছিলেন, আর তেজসিংহও দুর্গে ছিলেন; তিনি রাজপরিবার রক্ষার ভার লইয়াছিলেন, কদাপি দুর্গত্যাগ করিতেন না।

মুসলমানদিগের সহসা এই ভীষণ আক্রমণ দেখিয়া তেজসিংহের মুখ গম্ভীর হইল। তিনি ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, দুর্গপ্রাচীর হইতে চারিদিকে পিপীলিকাসারের ন্যায় মুসলমানদিগকে দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পর বালক চন্দনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন-

"চন্দন! অদ্য দুর্গরক্ষা সংশয়ের বিষয়; রাজপরিবারকে সংশয়ের স্থানে রাখা বিধেয় নহে। ভীমগড় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইবার জঙ্গলের ভিতর দিয়া একটী গোপনীয় পথ আছে, তাহা কেবল আমি ও আমার বিশ্বস্ত ভীলগণ জানে; কিন্তু সে পথ অতিশয় বক্র; নিরাপদ স্থানে পৌঁছিতে সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইবে। বালক! পঞ্চ শত রাঠোর লইয়া সমস্ত রজনী দুর্গরক্ষা করা অদ্য তোমার কার্য্য!"

উল্লাসে চন্দনসিংহ উত্তর করিলেন, "প্রভু পূর্ব্বেই দুর্গরক্ষাভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন, দাস তাহা করিবে। আমাদিগের ধন, সম্পত্তি, জীবন মহারাণার, মহারাণার জন্য এ দাস অদ্য যুঝিবে। প্রভু নিশ্চিন্ত হইয়া রাজপরিবার রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করুন; ভীমগড়-সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত এ দাস রক্ষা করিবে।"

বালকের এ গর্ব্বিত বচন শুনিয়া তেজসিংহ আনন্দিত হইলেন; কহিলেন, "চন্দনসিংহ! তুমি যখন এ কার্য্যের ভার লইয়াছ, আমার আর চিন্তা নাই"—পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অস্পষ্টস্বরে কহিলেন, "কিন্তু যখন দেবীসিংহ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবেন, তেজসিংহ তাহাকে কি বুঝাইবে?"

আর বিলম্ব না করিয়া তেজসিংহ রাজপরিবার রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, স্বয়ং ভীলবেশে সমস্ত পথ যাইলেন, কি উপায়ে ও কোন্ স্থানে তাঁহাদিগকে লইয়া যাইলেন, পাঠক তাহা পূর্ব্বেই অবগত আছেন।

এদিকে মুহূর্ত্তমধ্যে দুর্গ-প্রাচীরের উপর মশালের আলোক দৃষ্ট হইল; মুহূর্ত্তমধ্যে তিন শত রাঠোর দুর্গদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্থানে স্থানে শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যেস্থানে পর্ব্বত অতিশয় উচ্চ, আরোহণ অতিশয় কষ্টসাধ্য, রাজপুতগণ সেই স্থানে শত্রুর অপেক্ষা করিতে লাগিল। রাজপুতদিগের সংখ্যা অতিশয় অল্প, কিন্তু সাহস অসাধারণ,—সেই পর্ব্বতরাশি অপেক্ষা তাহাদিগের হৃদয় স্থির ও অকম্পিত। বালক চন্দনসিংহ অদ্য দৈবজ্ঞানে জ্ঞানী, দৈববলে বলিষ্ঠ; নিঃশঙ্কহৃদয়ে শত্রুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশিষ্ট দ্বিশত যোদ্ধা দুর্গের ভিতর রহিল।

দেখিতে দেখিতে তরঙ্গতেজে মুসলমানগণ আসিয়া পড়িল, একেবারে ভীষণ যুদ্ধনাদ আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিল!

সে ঘোর রজনীর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বর্ণনা করা যায় না। অদ্য দুর্গ হস্তগত হইবে, অদ্য মহারাণার পরিবার বন্দী হইবেন, এই আশায় ঘোর উল্লাসে মুসলমানগণ রাজপুতশ্রেণিকে আক্রমণ করিতে লাগিল; সে অল্পসংখ্যক

বীরমণ্ডলী হেলায় সে আক্রমণ প্রতিহত করিতে লাগিল। মুসলমানের অসংখ্য সেনা, কিন্তু সে পর্ব্বত আরোহণ করিবার একমাত্র পথ, সুতরাং যবনেরা সেই অল্পসংখ্যক্ রাজপুতসেনাকে চারিদিকে বেষ্টন করিতে পারিল না। সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় বার বার মহাগর্জ্জনে মুসলমানগণ সেই রাজপুতরেখার উপর পড়িতে লাগিল, কিন্তু জলধি-সীমাস্থ পর্ব্বতপ্রাচীরের ন্যায় রাজপুতরেখা বার বার সে তরঙ্গ প্রতিহত করিতে লাগিল। রোষে সমস্ত যবন অসিহস্তে পথ পরিষ্কার করিবার জন্য একেবারে গর্জ্জন করিয়া ছুটিল, কিন্তু রাজপুতদিগের অসি ও বর্শাও সুপ্ত ছিল না, পথ পরিষ্কার হইল না।

এক প্রহর কাল সেই স্থানে ভীষণ যুদ্ধ হইল; এক প্রহরের মধ্যে সেই অল্পসংখ্যক্ রাজপুতসেনা কম্পিত হইল না।

মহারাণার সম্মান, আমাদিগের জীবন, আমাদিগের মাতা, বনিতা, ভগিনী, কুটুম্বিনীর জাতি ধর্ম্ম সমস্তই আমাদিগের অসির উপর নির্ভর করে,—প্রতি রাঠোর নিঃশব্দে এই চিন্তা করিল,—নিঃশব্দে অসংখ্য শত্রুকে যুদ্ধদান করিল, পশ্চাতে চাহিল না। এ চিন্তায় যতদিন স্বাধীন যোদ্ধার ধমনীতে রক্ত বহিতে থাকে, ততদিন সে যোদ্ধার জগতে পরাজয় নাই। যবনের সেনা অধিক, কিন্তু রাজপুতগণ যবনের অধীনতা স্বীকার করিবে? এই প্রশ্নে প্রতি রাঠোরের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, কেবল নিঃশব্দ বর্শা ও অসিচালনে সে প্রশ্নের উত্তর করিল।

সমস্ত রজনী যুদ্ধ হইল, কিন্তু রাজপুতরেখা ভগ্ন হইল না। ক্রমে যুদ্ধস্থানে শব রাশীকৃত হইতে লাগিল, শবের উপর দণ্ডায়মান হইয়া উল্লাসিত মুসলমান যোদ্ধা পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতে লাগিল; শবপ্রাচীরের পশ্চাৎ হইতে অল্পসংখ্যক্ কিন্তু নির্ভীক ও অকম্পিত রাজপুত যোদ্ধা তখনও অব্যর্থ অসিচালনা করিতেছে।

পূর্ব্বদিকে রক্তিমাচ্ছটা দেখা দিল; অসংখ্য মুসলমানগণ ভয়ঙ্কর যুদ্ধনাদ করিয়া কতিপয় অবশিষ্ট রাজপুতকে আক্রমণ করিল, সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় যেন উপরে আসিয়া পড়িল। বিংশ কি দ্বাবিংশ রাজপুত যোদ্ধা তখনও পর্ব্বতপথ রোধ করিতেছে, তখনও সেই সঙ্কীর্ণ পথে দ্বিসহস্র মুসলমানের গতিরোধ করিতেছে;—ধন্য বীরত্ব!

পূর্ব্বদিকে সূর্য্যদেব দেখা দিলেন: তখন রক্তাপ্লুতকলেবর বালক চন্দনসিংহ সে পর্ব্বতপথ ছাড়িয়া ধীরে ধীরে দুর্গে প্রবেশ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে অনুমান বিংশমাত্র রাঠোর দুর্গে প্রবেশ করিল। তাঁহাদিগের আরক্ত

নয়ন, রক্তপূর্ণ পরিচ্ছদ, দীর্ঘ কলেবর ও ভীষণ মুখমণ্ডল দেখিলে বোধ হয় যেন ব্রহ্মবলে দেবযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অসুর বীরগণ ধীরে ধীরে আপন আলয়ে প্রত্যাগমন করিতেছেন।

মহাকোলাহলে মুসলমানগণ তখন দুর্গ আরোহণ করিয়া প্রবেশের চেষ্টা পাইল, কিন্তু ঝনৃঝন্‌শব্দে দুর্গকবাট রুদ্ধ হইল, কবাটের পশ্চাতে অবশিষ্ট নির্ভীক রাঠোর বীরগণ তখনও অধীনতা স্বীকার করিবে না, শেষ পর্য্যন্ত যুঝিবে, মুসলমান আক্রমণকারীদিগকে রাজপুতবীর্য্য দেখাইবে!

তখন মুসলমানগণ কিঞ্চিৎ হতাশ্বাস হইল। সমস্ত রজনী যুদ্ধ করিয়া শ্রান্ত হইয়াছে, এক্ষণে দেখিল দুর্গদ্বার রুদ্ধ, বোধ হয় পুনরায় সমস্ত দিবস যুদ্ধ না করিলে দুর্গ-বিজয় হইবে না। সেনাপতি সেনাদিগেব অবসন্ন ও শ্রান্ত শরীর লক্ষ্য করিলেন; আদেশ দিলেন, "অদ্যই ভীমগড় লইব, অদ্যই প্রতাপসিংহের পরিবার বন্দী হইবে, সৈন্যগণ ক্ষণেক বিশ্রাম কর।" সেনাগণ সসজ্জ হইয়াই দুর্গদ্বারের বাহিরে ক্ষণেক বিশ্রাম বা আহারাদি করিতে লাগিল।

মুসলমানদিগের উদ্যম ভঙ্গ দেখিয়া চন্দনসিংহ প্রাচীরের উপর উঠিলেন; দেখিলেন, প্রায় এক সহস্রের অধিক মুসলমান দ্বারের বাহিরে বিশ্রাম করিতেছে; বুঝিলেন, যুদ্ধ শেষ হয় নাই, ক্ষণেক নিবৃত্ত হইয়াছে মাত্র। দুর্গের ভিতরে চাহিলেন; দেখিলেন, কেবল দ্বিশত জন রাঠোর; যুবকের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, ললাট চিন্তাচ্ছন্ন হইল; ক্ষণমাত্র চিন্তার পরই যেন প্রতিজ্ঞা স্থির হইল, তখন ঈষৎ হাসিয়া প্রাচীর হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

যোদ্ধাগণকে চারিদিকে ডাকিয়া কহিলেন, "বন্ধুগণ; মনুষ্যের যাহা সাধ্য, রাজপুতের যাহা সাধ্য, তাহা করিয়াছি। আমার পণ রক্ষা করিয়াছি, সূর্য্যদেব আকাশে উদিত হইয়াছেন। এক্ষণে দুর্গবাহিরে সহস্র যবন, ভিতরে কেবল আমরা জীবিত আছি; আর যুদ্ধ সম্ভবে না। এক্ষণে তোমাদিগের কি পরামর্শ?"

একজন রাঠোর উত্তর করিলেন, "রাঠোর সম্মুখরণে প্রাণত্যাগ ভিন্ন অন্য পরামর্শ জানে না?"

চন্দনসিংহ। "তাহার পর?—তাহার পর আমাদিগের মাতা, ভগিনী, বনিতা যবনের গোলা হইবে; রাজপুত-রমণী দিল্লীতে বিলাসের দ্রব্য হইবে?"

রোষে সকলের মুখ রক্তবর্ণ হইল, কোষ হইতে অসি অর্দ্ধেক বহির্গত হইল।

চন্দনসিংহ—"আমার মত,————"শক নির্ব্বাহ করিব।"

রাজপুতমণ্ডল সকলে স্তব্ধ ও বাক্যশূন্য;—ক্ষণেক পর সকলেই গর্জ্জন করিয়া কহিল "শক নির্ব্বাহ করিব।" সে ভীমগর্জ্জন মুসলমানেরা শুনিতে পাইল; বুঝিল, এখনও যুদ্ধ শেষ হয় নাই।

চন্দনসিংহ তখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় তাঁহার মাতা অন্যান্য রাঠোর-রমণী-বেষ্টিতা হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন; পুত্র মাতার চরণে প্রণত হইলেন। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, যুদ্ধের সংবাদ কি?"

পুত্র। "সংবাদ ভাল; কোনও রাজপুত যোদ্ধা যুদ্ধস্থান ত্যাগ করে নাই, শত্রুকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করায় নাই। সূর্য্য উদয় হইয়াছেন, দুর্গ এখনও আমাদিগের হস্তে।"

মাতা সন্তুষ্ট হইয়া হাস্য করিলেন; পরে পুত্র ধীরে ধীরে কহিলেন,—

"মাতঃ! যদি অনুমতি করেন তবে আরও নিবেদন করি, রজনীর যুদ্ধে তিন শত যোদ্ধা রাঠোরের ন্যায় জীবনদান করিয়াছে, এক্ষণে দুর্গের ভিতর দ্বিশতের অধিক রাঠোর নাই, শত্রুগণ প্রায় এক সহস্র; ক্ষণপরেই যুদ্ধারম্ভ করিবে।" অবশিষ্ট কথা চন্দনসিংহ উচ্চারণ করিতে পারিলেন না;—বীর বালক অলক্ষিতভাবে একবিন্দু অশ্রু মোচন করিলেন।

তীব্রস্বরে দেবীসিংহের গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "দ্বিশত রাজপুত কি সহস্র তুর্কীর সহিত যুঝিতে ভয় করে?"

ধীরে ধীরে স্থিরস্বরে চন্দনসিংহ কহিলেন, "রাজপুত মনুষ্য সহিত যুদ্ধ করিতে ভয় করে না,—যুদ্ধ দান করিবে,—কিন্তু রাজপুতরমণীর সম্মান প্রথম রক্ষণীয়;—শক নির্ব্বাহ আবশ্যক!"

হাসিয়া চন্দনসিংহের মাতা উত্তর দিলেন,—"বৎস! এই কথা কহিতে ভয় করিতেছিলে? রাজপুত বীর মরিতে জানে, রাজরমণী কি মরিতে জানে না? যাও বৎস! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও; অচিরে শক নির্ব্বাহ হইবে।"

পরে অন্যান্য রমণীকে আহ্বান করিয়া চন্দনের মাতা সহাস্য বদনে কহিলেন, "সখিগণ! অদ্য আমরা সতী হইব, স্বামীর সোহাগিনী হইব, ইহা অপেক্ষা রাজপুত কামিনীর অদৃষ্টে কি সুখ আছে? ম্লেচ্ছ তুর্কীগণ দেখুক, রাজপুত যোদ্ধা যেরূপ বীর, রাজপুতরমণী সেইরূপ সতী।"

আনন্দে সমস্ত নারীমণ্ডলী উঠিল, করতালি দিয়া বালিকাগণ আগে আগে চলিল।

নবোদিত সূর্য্যালোকে সহস্র নারী স্নানাদি সমাপন করিলেন, দেব-দেবীর আরাধনা সমাপন করিলেন, পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া রাজদ্বারে একত্রিত হইলেন। বালা, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা সকলে একত্রিত হইলেন, সকলে একত্রিত হইয়া আনন্দে দেবনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর?—তাহার পর রাজপুতের পুরাতন ধর্ম্ম অনুসারে অলঙ্কারবিভূষিতা সহস্র রমণী উল্লাসরব করিতে করিতে চিতারোহণ করিলেন। যখন পরাজয়, অবমাননা ও ধর্ম্মনাশ অনিবার্য্য হয়, রাজপুত রমণীগণ এইরূপে সতীত্ব লাভ করেন।

সেই অগ্নিশিখার চতুর্দ্দিকে দ্বিশত রাঠোর বীর দণ্ডায়মান ছিলেন, নিঃশব্দে তাঁহারা হৃদয়ের হৃদয়কে দগ্ধ হইতে দেখিলেন। মাতা, বনিতা, ভগিনী ও আত্মীয়াকে, জগতের মধ্যে সমস্ত প্রিয় দ্রব্যকে চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে দেখিলেন। তাঁহাদিগের জীবনে আর মায়া রহিল না, জগতে আর আশা রহিল না; জগৎ ত্যাগ করিতে তাঁহারা প্রস্তুত হইলেন। প্রাতঃকালে পবিত্র জলে স্নান করিলেন, দেবদেবীর আরাধনা শেষ করিলেন। পরে নিঃশব্দে শরীরে বর্ম্ম ধারণ করিলেন, তদুপরি রক্তবস্ত্র পরিধান করিলেন। শিরে উজ্জ্বল মুকুটের উপর তুলসীপত্র স্থাপন করিলেন,—গলদেশে শালগ্রাম ধারণ করিলেন; এ জীবনে শেষবার নিঃশব্দে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। উঃ! সে সময় যোদ্ধার মনোগত ভাব কে বর্ণনা করিতে পারে! চিতা তখনও জ্বলিতেছে,—চিতায় হৃদয় সুদ্ধ দগ্ধ হইয়াছে; জীবনে আশা নাই; রুচি নাই,—সে জীবন ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বন্ধু বন্ধুকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, পিতা পুত্রকে, নিঃশব্দে আলিঙ্গন করিলেন।

দুই তিন দণ্ড বেলা হইয়াছে, এরূপ সময় ঝনঝনা শব্দে দুর্গদ্বার খুলিল,—বিস্মিত যবনেরা দেখিল, সেই দ্বার দিয়া একেবারে সমুদ্রতরঙ্গবেগে অল্পসংখ্যক্ রাজপুত বীর আসিয়া সহস্র মুসলমানকে আক্রমণ করিল।

সে রাজপুতসংখ্যা শীঘ্র নিঃশেষিত হইল, দুর্গ যবনের হস্তগত হইল, কিন্তু সেই যুদ্ধে যে মুসলমানগণ পরিত্রাণ পাইল,—তাহারা সেই দ্বিশত যোদ্ধার যুদ্ধকথা জীবনে বিস্মৃত হইল না।

পঞ্চাশৎ বর্ষ পরও দিল্লীর কোন কোন বৃদ্ধ মোগল পুত্র বা পৌত্রকে ভীমগড় দুর্গবিজয়ের কথা গল্প করিত; রাঠোরদিগের শক নির্ব্বাহের কথা গল্প করিত।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

বীরত্বে কাতরতা।

এইরূপে সমরতরঙ্গ চারিদিকে বহিতেছে, প্রতাপসিংহ সেই ভীল-নিবাসিত চপ্পন প্রদেশে চাত্তন্দ দুর্গ রক্ষা করিতেছেন, বা গহ্বর হইতে গহ্বরান্তরে নিবাস করিতেছেন। মহারাজ্ঞী সসন্তানে জাউরার খনি হইতে পুনরায় স্বামীর নিকট আসিয়াছেন।

সন্ধ্যার সময় একটী পর্ব্বতের উপর রাজসভা হইয়াছে; হরিদ্বর্ণ দুর্ব্বাদল রাজগদী, নৈশ গগন চন্দ্রাতপ, চারিদিকে অসংখ্য অনন্ত পর্ব্বতচূড়া ও পর্ব্বতমালা গৃহানুকরণ দ্রব্য!

প্রতাপসিংহের চারিদিকে কুলেশ্বরগণ বসিয়াছেন, কিন্তু যুদ্ধপূর্ব্বে যে সমস্ত প্রাচীন যোদ্ধা কমলমীরে প্রতাপকে বেষ্টন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কয়জন আছেন? দৈলওয়ারার ঝালাকুলেশ্বর হত হইয়াছেন, বিজলীর প্রমরকুলপতি হত হইয়াছেন, অন্যান্য প্রাচীন কুলপতি হত হইয়াছেন। প্রতাপ আপনার চারিদিকে নিরীক্ষণ করিলেন, তাহার পুরাতন সঙ্গী অনেকে আর নাই, নব নব বালকগণ এক্ষণে কুলপতি হইয়াছেন, পিতার মৃত্যুর পর পুত্রগণ যুদ্ধ করিতেছেন, তাঁহারাও মহারাণার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। প্রতাপ আপনার পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলেন, পুত্র অমরসিংহ পিতা-পার্শ্বে বসিয়া আছেন, বাল্যাবস্থা হইতেই পর্ব্বতে ও উপত্যকায় বাস করিয়া যুদ্ধব্যবসায় শিখিতেছেন। অমরসিংহ আছেন কিন্তু প্রতাপের কত পুত্র এই কাল সমরে হত হইয়াছেন! কত আত্মীয় বন্ধু মহারাণার চতুর্দ্দিকে দিন দিন হত হইতেছেন। এ কাল সমরে কি শিশোদীয়র বংশ নির্ম্মূল হইবে?

নির্ম্মূল হউক! কিন্তু তুর্কীদিগের অধীনতা স্বীকার যেন না করে! প্রতাপসিংহের এই আদেশ যোদ্ধাগণ শুনিলেন, সকলে উৎসাহে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন।

ভৃত্যগণ খাদ্য আনিল; প্রতিদিন খাদ্য পাওয়া যাইত না,—কতদিন শত্রুতাড়িত হইয়া প্রতাপসিংহ কেবল জঙ্গলের ফলমুল খাইয়া জীবনধারণ করিতেন, কতদিন বা অনাহারে থাকিতেন। রাজপুত এ ক্লেশ গ্রাহ্য করিতেন না।

বৃক্ষপত্র-বিনির্ম্মিত পাত্রে সকলে বন্য ফলমূল লইয়া আহার করিতে বসিলেন; মেওয়ারের গৌরবের দিনে রাজসভার যে সমস্ত রীতি প্রচলিত ছিল, তাহার কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই।

সভার মধ্যে সাহসী ও সম্মানিত যোদ্ধা মহারাণার পাত্র হইতে ফল বা আহারীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহাকে "তুনা" কহিত। প্রতাপসিংহ অদ্য কাহাকে "তুনা" দিবেন, স্থির করিতে অক্ষম হইলেন। অনেকক্ষণ পর বলিলেন,—

"চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহ ও রাঠোর তেজসিংহ! তোমরা উভয়েই আমার জন্য জীবন পণ করিয়াছ, রাজপরিবারকে বিপদের সময় স্থান দিয়াছ, যুদ্ধসময়ে পরস্পরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছ। আমি শতবার সানন্দে তোমাদের যুদ্ধ দর্শন করিয়াছি,—তোমরা উভয়েই তুল্য বীর, উভয়েই অতুল্য! তোমাদের মধ্যে কাহাকে "তুনা" দিব, আমি জানি না।"

এই কথায় সভাস্থ সকলেই সম্মানিত দুই জন বীরের প্রতি লক্ষ্য করিলেন, সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

সেই নিস্তব্ধ সভার মধ্যে তেজসিংহ দণ্ডায়মান হইয়া ধীরস্বরে কহিলেন, "মহারাণা যদি অনুমতি দান করেন, তবে এ দাস একটী কথা নিবেদন করে। দুর্জ্জয়সিংহ সূর্য্যমহলদুর্গে প্রাসাদে রাজপরিবারকে স্থান দিয়াছিলেন; তিনিই "তুনার" যোগ্য। আমি গহ্বরে মাত্র রাজপরিবারকে স্থান দিয়াছিলাম, কেননা আমার পৈতৃক দুর্গ শত্রুহস্তে ছিল; সুতরাং আমি দুর্জ্জয়সিংহের সমকক্ষ নহি।"

মহারাণা সস্নেহে বলিলেন, "তেজসিংহ! রাজপরিবারের পক্ষে এক্ষণে প্রাসাদ ও গহ্বর সমান; তথাপি তোমার কথায় আমি অদ্য দুর্জ্জয়সিংহকে "তুনা" দান করিব; ভরসা করি, অচিরে তুমি পৈতৃক দুর্গ অধিকার করিবে।"

"এ দাস যত্নের ত্রুটী করিবে না" বলিয়া তেজসিংহ দুর্জ্জয়ের দিকে চাহিয়া হাসিলেন। দুর্জ্জয়ের নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল।

ভোজন শেষ হইল, সভা ভঙ্গ হইল, মহারাণা মহিষী ও পুত্রদিগের নিকট যাইলেন।

অন্ধকার নিশীথে একটী পর্ব্বতগহ্বরের নিকট অগ্নি জ্বলিতেছে; রাজশিশুগণ সেই অগ্নির চতুর্দ্দিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, অথবা বিশ্রান্ত হইয়া সেই প্রস্তরের উপর সুখে নিদ্রা যাইতেছে; রাজমহিষী ও তাঁহার পুত্রবধূ

ক্ষেত্রের "মল" তৃণের আটা প্রস্তুত করিয়া তাহার রুটী প্রস্তুত করিতেছিলেন,—পুত্রকন্যাগণ উঠিলে ক্ষুধায় কাঁদিবে, সেইজন্য রুটী করিতেছিলেন। প্রতাপসিংহ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষণেক নীরবে এই দৃশ্যটী দেখিলেন; এ কি মেওয়ারের মহারাণার পরিবার, না পর্ব্বতবাসী একটী ভীল-পরিবার?

মহিষী দূর হইতে স্বামীকে দেখিতে পাইলেন। পুত্রবধূর নিকট রুটী রাখিয়া স্বামীকে আহ্বান করিতে আসিলেন; দেখিলেন, মহারাণা অদ্য চিন্তাকুল।

পতিব্রতা বহুসহিষ্ণু মহিষী সস্নেহে মহারাণাকে কহিলেন, "এ কি! অদ্য মহারাণা কাতর কেন? তুর্কীরা কি বলিবে, এতদিনে মহারাণা প্রতাপসিংহ বিপদে ও যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইয়াছেন?"

প্রতাপসিংহ সস্নেহে হৃদয়ের মহিষীকে চুম্বন করিয়া কহিলেন, "জগদীশ্বর জানেন, বিপদে ও আহবে রাজপুত কাতর নহে; রাজপুত অনেক সহ্য করিতে পারে, কিন্তু এ দৃশ্য রাজপুতেরও অসহ্য! এই গহ্বর কি চিরকাল রাজমহিষীর প্রাসাদ হইবে; ঐ প্রস্তর কি রাজপুত্রের শয্যা!"

রাজমহিষী কহিলেন, "রাজন্! বিপদ চিরস্থায়ী নহে, কিন্তু বীরত্ব-গৌরব চিরস্থায়ী।"

প্রতাপ বলিলেন, "মহিষী! যদি তোমার মুখমণ্ডলে একদিন বিরক্তির চিহ্ন দেখিতাম, তবে আমার এ কষ্ট হইত না। কিন্তু দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে তুমি তাপসীর ন্যায় এই কষ্ট সহ্য করিতেছ; গ্রীষ্মে, বর্ষায়, শীতে এই পর্ব্বতে বাস করিতেছ, স্বহস্তে জল আনিয়া রন্ধন করিতেছ, সকল ক্লেশ তুচ্ছ করিতেছ; এইরূপে জীবনযাপন করিবার জন্য কি প্রতাপ-সিংহকে বিবাহ করিয়াছিলে! প্রতাপসিংহ হৃদয়ের পত্নীকে থাকিবার একটী আবাসস্থান দিতে পারিলেন না!"

রাজ্ঞী কহিলেন, "স্বামীর পার্শ্ব হইতে রমণীর শ্লাঘ্যস্থান কি আছে? নলরাজা যবে বনগমন করিলেন, দময়ন্তী কি প্রাসাদে ছিলেন? আপনি স্বয়ং যখন এই পর্ব্বতকন্দরে বাস করেন, দাসী কি অট্টালিকা ইচ্ছা করে?"

প্রতাপ উত্তর করিলেন না; নিঃশব্দে সেই বহুসহিষ্ণু মহিষীর মুখচন্দ্র চুম্বন করিলেন; মহিষী পুনরায় রন্ধনার্থ গেলেন।

প্রতাপ সেই স্থানে নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেই পর্ব্বত ও কন্দরবাসী রাজপরিবারের দিকে দেখিতে লাগিলেন, এ কাল সময় কি কখনও ক্ষান্ত হইবে?

দুর্গ সকল একে একে শত্রুহস্তগত হইয়াছে, প্রাচীন যোদ্ধাগণ একে একে হত হইয়াছেন, সেনাসংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইয়াছে! প্রতাপসিংহের আর অর্থ নাই, সম্বল নাই, রাজ্য নাই, রাজধানী নাই, সেই প্রস্তর ভিন্ন মস্তক রাখিবার স্থান নাই! হৃদয়ের কলত্রপুত্রদিগকে রাখিবার স্থান নাই, কখন কখন রাজমহিষী কোন পর্ব্বতগহ্বরে খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, সহসা শত্রু-আগমনে সেই প্রস্তুত খাদ্য ত্যাগ করিয়া দূরে পলাইয়াছেন! পুনরায় তথায় খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, পুনরায় তাহা ত্যাগ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত রোরুদ্যমান সন্তান লইয়া পলাইয়াছেন! পাঁচবার এইরূপ খাদ্য ত্যাগ করিয়া পলাইয়াছেন, অবশেষে সেই মেওয়ারে থাকিবার স্থান পান নাই; ভীলদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভূগর্ভে ও খনিতে লুকাইয়াছিলেন, তথায় ভীলগণ তাঁহাকে রক্ষা করিত, ভীলগণ তাঁহাকে আহার যোগাইত!

কখন বা রজনীতে স্বামীপার্শ্বে রাজমহিষী কোন পর্ব্বতে শয়ন করিয়া আছেন, সহসা রাত্রিযোগে মুষলধারা বৃষ্টি আসিল, সেই অনাবৃত স্থল ভাসাইয়া লইয়া গেল, সমস্ত রাত্রি সিক্তদেহে রাজমহিষী বালিকাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া দণ্ডায়মান থাকিতেন।

নীরবে প্রতাপসিংহ পর্ব্বতপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন, নীরবে এই সমস্ত চিন্তা একে একে তাঁহার বীরহৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল। এরূপ ক্লেশ নাই, এরূপ বিপদ নাই, যাহা সেই বীরপ্রবর তুচ্ছ করিতেন না, কিন্তু যাহাদিগকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন, তাহাদিগের এ বিপদ, দিনে দিনে মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে এ কষ্ট দেখা সহৃদয় বীরপুরুষের অসহ্য! তিনি চিন্তার শেষ পাইলেন না, শ্রান্ত হইয়া সেই অন্ধকারময় নৈশ আকাশের দিকে চাহিলেন! অদ্য বীরহৃদয় কাতর!

সহসা হৃদয়বিদারক বালিকা-রোদনে প্রতাপসিংহ চমকিত হইলেন, আপন পুত্রকন্যার দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, রুটী প্রস্তুত হইয়াছে, তাঁহার বালিকার রুটী একটী বন্যবিড়ালে লইয়া গিয়াছে; বালিকা অসহ্য ক্ষুধার যাতনায় চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে!

রোষে, বিষাদে অদ্য প্রতাপসিংহের নয়ন জলপূর্ণ হইল, বিপদে বা যুদ্ধে, শত্রু বা মিত্র কেহ কখনও প্রতাপসিংহের নয়নে জল দেখে নাই। আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন;—

"যদি রাজ্যলাভের এই দুঃসহ যন্ত্রণাই ফল হয়, প্রতাপসিংহ সে রাজ্য চাহে না, রাজনামে জলাঞ্জলি দিবে!" পরদিন মহারাণা আকবর সাহের নিকট পত্রদ্বারা সন্ধিপ্রার্থনা করিলেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

অপবিত্রে পবিত্রতা।

দিন গেল, মাস অতিত হইল, যুদ্ধ ক্ষান্ত হইল না, সে পত্রের কোনও উত্তর আসিল না।

অদ্য সন্ধ্যার সময় প্রতাপসিংহ পুনরায় যোদ্ধাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন; রাঠোর ও চোহানকুল, প্রমর ও ঝালাকুল, চন্দাত্তয়ৎ, সঙ্গাত্তয়ৎ, জগাত্তয়ৎ প্রভৃতি শিশদীয় কুলের ভিন্ন ভিন্ন শাখা, সকল কুল ও শাখাকুলের অধিপতিগণ উপস্থিত হইয়াছেন। বাল্যাবধি যুদ্ধক্ষেত্রে বীরগণ শিক্ষা পাইয়াছেন; শত যুদ্ধে আপন আপন বীরত্ব আপন আপন কুলের গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু অদ্য সভাস্থলে সকলে নীরব!

ভবিষ্যতে কি কর্ত্তব্য প্রতাপসিংহ এই কথা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এই রাজপুতমণ্ডলীর মধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এরূপ কেহ নাই।

যতদিন যুদ্ধ সাধ্য ততদিন যুদ্ধ হইয়াছে; শত্রুবিরুদ্ধে মেওয়ার দেশের একটী উপত্যকা বা পর্ব্বতদুর্গ আর রক্ষা করা মনুষ্যের দুঃসাধ্য! শত্রুগণ নূতন সৈন্য লইয়া মেওয়ারের প্রধান প্রধান প্রায় প্রত্যেক উপত্যকা আচ্ছাদন করিয়াছে, প্রত্যেক দুর্গ হস্তগত করিয়াছে, চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছে, অপ্রতিহতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। যুদ্ধ? প্রতাপসিংহ আর কি লইয়া যুদ্ধ করিবেন? পুরাতন সেনা প্রায় সমস্ত হত হইয়াছে, মেওয়ারে আর সন্য নাই, সৈন্যদিগকে খাইতে দিবার অর্থ নাই, রক্ষা করেন এরূপ দুর্গ নাই, থাকিবার স্থান নাই! চারিদিকে অসংখ্য মোগল সৈন্য রাশীকৃত হইতেছে, চারিদিক্ হইতে তাহারা অগ্রসর হইতেছে, প্রতাপসিংহ কি লইয়া তাহাদিগের গতি প্রতিরোধ করিবেন? চাত্তয়ন্দ দুর্গে থাকিয়া অচিরে শত্রুহস্তে বন্দী হইবেন, বীরগণ কি এই পরামর্শ দান করেন? না, তবে কি পরামর্শ দেন? অম্বর ও মাড়ওয়ারের রাজাদিগের ন্যায় তুর্কের অধীনতা স্বীকার করিবার পরামর্শ দেন? যে স্বাধীনতার জন্য এতদিন পর্ব্বতে ও উপত্যকায় যুদ্ধ করিয়াছেন, রাজপুত-শোণিতে মেওয়ার দেশ প্লাবিত করিয়াছেন, গৃহ ও প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া কন্দরে ও গহ্বরে বাস করিয়াছেন, দিবসে নিশীতে অনন্ত ক্লেশ অনন্ত বিপদ সহ্য করিয়াছেন, সে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিবেন? রাজস্থানের সকল রাজাদিগের উপর ম্লেচ্ছ

পদ স্থাপন করিয়াছেন, এক্ষণে কি মহারাণার বংশ সেই পদে উন্নত মস্তক অবনত করিবেন? বাপ্পারাওয়ের বংশ, নির্ম্মল শিশোদীয় বংশ কি তুর্কীয় দাস হইবে? বীরগণ গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "তদপেক্ষা বংশ নির্ম্মূল হওয়া ভাল।"

আর এক উপায় আছে। রাজস্থানের পুরাতন রীতি অনুসারে সমস্ত যোদ্ধা সম্মুখযুদ্ধে প্রাণদান করুন, রাজপুত রমণীগণ চিতারোহণ করুন। সে যোদ্ধৃমণ্ডলীর মধ্যে একজনও সে প্রস্তাবে ভীত ছিলেন না, কিন্তু পুরাতন শিশোদীয় বংশ কি জগতে একবারে বিলুপ্ত হইবে? পূর্ব্বপুরুষগণ কি স্বর্গ হইতে এই দৃশ্য দেখিবেন যে, যে বংশের উন্নতির জন্য তাঁহারা এত যত্ন করিয়াছিলেন, জগতে সে বংশের নাম নাই!

রাজপুত বীরগণ নিস্তব্ধ! ইহার মধ্যে কোন্‌টী কর্ত্তব্য? ইহা ভিন্ন আর কি উপায় আছে?

'অদ্য দাসত্ব স্বীকার করিলে কল্য পুনরায় স্বাধীন হওয়া সম্ভব। আকবর মহাবলপরাক্রান্ত ও অতিশয় বুদ্ধিমান্; কিন্তু আকবরের মরণের পর দিল্লীশ্বর সেরূপ ক্ষমতাপন্ন না হইতে পারেন, তখন মেওয়ার পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, কিন্তু এক্ষণে শিশোদীয় বংশ একবারে বিনষ্ট হইলে জগতে তাহার নাম থাকিবে না। এইরূপ তর্ক কাহারও কাহারও হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল; কিন্তু প্রতাপসিংহ জলন্ত নয়নে চাহিয়া কহিলেন, "একবার দাসত্ব স্বীকার করিলে পুনরায় স্বাধীনতা লাভ সম্ভব বটে, কিন্তু বাপ্পারাওয়ের বংশের এ কলঙ্ক কখনও দূর হইবে না; প্রতাপসিংহ জীবিত থাকিতে এ কলঙ্ক হইবে না।"

এইরূপ পরামর্শ হইতেছে, এরূপ সময় একজন পত্রবাহক একখানি পত্র লইয়া আসিল। প্রতাপ দেখিলেন, বিকনীর রাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পৃথ্বীরাজ এই পত্র লিখিয়াছেন। এ পত্র নহে, কয়েকটী কবিতা; পৃথ্বীরাজের ন্যায় সুকবি সে সময়ে রাজস্থানে আর কেহ ছিলেন না।

বিকনীর দিল্লীর অনুগত, পৃথ্বীরাজ দিল্লীতে থাকিতেন, তথাপি প্রতাপের বীরত্ব শুনিয়া আনন্দিত হইতেন, মেওয়ারের স্বাধীনতা স্মরণ করিয়া আপন অপমান বিস্মৃত হইতেন, মনে মনে প্রতাপসিংহকে পূজা করিতেন। সে সময়ে কি হিন্দু কি মুসলমান কে না মনে মনে মেওয়াররাজকে পূজা করিতেন?

আকবর যখন প্রতাপসিংহের সন্ধিপ্রার্থনাপত্র পাইলেন, তখন উল্লাসে পূর্ণ হইলেন। প্রতাপের ন্যায় মহৎ শত্রু ভারতবর্ষে আর ছিল না, সেই

প্রতাপ সন্ধিপ্রার্থনা করিয়াছেন, সম্ভবতঃ অধীনতা স্বীকার করিবেন, এই চিন্তায় আনন্দিত হইলেন, দিল্লীতে আনন্দসূচক বাদ্য ও ধুমধাম হইতে আদেশ দিলেন। পৃথ্বীরাজ রোষে অভিমানে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, দিল্লীশ্বরকে কহিলেন, "এ পত্র জালমাত্র, প্রাতাপের কোন শত্রু প্রতাপের গৌরবনাশের জন্য এই পত্র সৃষ্টি করিয়াছে।" আরও বলিলেন, "দিল্লীশ্বর! আমি প্রতাপ-সিংহকে জানি; আপনার রাজমুকুটের জন্য প্রতাপসিংহ অধীনতা স্বীকার করিবেন না।" পরে পৃথ্বীরাজ প্রতাপকে কবিতাগর্ভ একটী পত্র লিখেন; অদ্য রজনীতে রাজসভায় প্রতাপসিংহ সেই পত্র পাইলেন,—প্রতাপসিংহ পাঠ করিতে লাগিলেন।—

"হিন্দুর আশাভরসা হিন্দুর উপরই নির্ভর করে।
"তথাপি রাণা তাহাদিগকে ত্যাগ করিতেছেন॥
"প্রতাপ না থাকিলে সমস্ত সমভূমি হইত।
"কারণ আমাদের যোদ্ধাগণ সাহস হারাইয়াছেন,
রমণীগণ ধর্ম্ম হারাইয়াছেন॥
"আকবর আমাদিগের জাতি স্বরূপ বাজারের
ব্যাপারী।
"উদয়ের পুত্র ভিন্ন সমস্ত ক্রয় করিয়াছে,—তিনি অমূল্য॥
"নরোজার জন্য কোন্ প্রকৃত রাজপুত সম্ভ্রম বিক্রয়
করিবে।
"তথাপি কত জনে বিক্রয় করিয়াছে॥
"সকলে ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম বিক্রয় করিয়াছেন।
"চিতোরও কি এই বাজারে আসিবেন?
"প্রাতাপ সমস্ত ধন ব্যয় করিয়াছেন।
"কিন্তু রত্নটী রক্ষা করিয়াছেন॥
"নৈরাশে অনেকে এই স্থানে আসিয়া আপনাদিগেব
অবমাননা দেখিতেছেন।
"হামিরবংশজ কেবল এই অপযশ হইতে রক্ষা
পাইয়াছেন॥
"জগতে জিজ্ঞাসা করে, প্রতাপ গোপনে কোথা হইতে
সহায়তা পায়।
"তাঁহার বীরত্ব এবং তাঁহার খড়্গ হইতে! তদ্দারা
ক্ষাত্র ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন॥

"ব্যাপারী চিরজীবী নহে, একদিন ঠকিবেন।
"তখন আমাদিগের শূন্য ক্ষেত্র বপন করিতে প্রতাপের
নিকট রাজপুতবীজ লইতে আসিব॥
"তিনিই রাজপুতবীজ রাখিবেন, সকলে এরূপ আশা
করে।
"যেন তাঁহার পবিত্রতা পুনরায় উজ্জ্বল হয়॥"

প্রতাপসিংহ এক বার, দুই বার, তিন বার এই পত্র পাঠ করিলেন; গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "বীরগণ! চারিদিকে অপবিত্রতার মধ্যে প্রতাপ-সিংহ রাজপুতকুল পবিত্র রাখিবে! মেওয়ারে যদি স্থান না হয়, আমরা মরুভূমি উত্তীর্ণ হইব, অন্যদেশে যাইব, কিন্তু শিশোদীয় বংশ কলুষিত হইবে না!" প্রতাপের জলন্তনয়ন অশ্রুপূর্ণ, যোদ্ধাগণ ভীষণনাদে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, "বাপ্পারাওয়ের কুল কলুষিত হইবে না।"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

দেওয়ীরের যুদ্ধ।

প্রাতাপসিংহ দেশ ত্যাগ করিতেছেন; মেওয়ারে শিশোদীয় কুলের স্থান নাই; শিশোদীয় কুল সিন্ধুনদীতীরে যাইয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করিবে, তথাপি তুর্কীর অধীনতা স্বীকার করিবে না।

প্রতাপসিংহ ও মেওযাবের প্রধান প্রধান বীরকুল সসৈন্যে ও সপরিবারে মেওয়ার ত্যাগ করিয়াছেন; আরাবলী পর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছেন, মরু-ভূমির প্রান্তে পঁহুছিয়া বিশ্রাম করিতেছেন! সম্মুখে, পশ্চিমদিকে মরুভূমি সন্ধ্যার আলোকে ধূ ধূ করিতেছে; পশ্চাতে আরাবলী পর্ব্বত ও মেওয়ার-দেশ। সেই পর্ব্বতরাশি এখনও দেখা যাইতেছে, যোদ্ধাগণ সেইদিকে নিরীক্ষণ করিয়া সকলে চিন্তাকুল! সূর্য্যদেব অস্ত গিয়াছেন, পুনরায় যখন উদয় হইবেন, স্বদেশ নয়ন হইতে বহির্ভূত হইবে, ঐ অনন্ত পর্ব্বতমালা আর দেখা যাইবে না। যে প্রদেশে শিশোদীয় বংশ বহু শতাব্দী বাস করিয়াছে, যে দেশে সমরসিংহ, সংগ্রামসিংহ প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় ভূপতিগণ রাজ্য করিয়াছেন, যে দেশে সকলে বাল্যকালে ক্রীড়া করিয়াছেন, যৌবনে যুদ্ধ

করিয়াছেন, সে দেশ চিরদিনের জন্য নয়ন-বহির্ভূত হইবে! যোদ্ধাগণের হৃদয়ে এই সমস্ত চিন্তা উদ্রেক হইতেছে, যোদ্ধাগণ নীরবে সেই পর্ব্বতমালার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। মেওয়ারের প্রতি পর্ব্বতদুর্গ ও উপত্যকা একে একে মনে উদয় হইতেছে, যে যে উপত্যকায় পূর্ব্বপুরুষগণ যুদ্ধ করিয়াছেন, যে যে পর্ব্বতে প্রতাপ অনন্ত যুদ্ধে শোণিতপাত করিয়াছেন; সে সমস্ত মানসচক্ষে চিত্রের ন্যায় উদয় হইতেছে, মেওয়ারের অনন্ত বীরত্বকথা হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে। যোদ্ধাগণ নীরব ও শোকাকুল! নীরবে অনন্ত যশোপূর্ণ আরাবলী পর্ব্বতের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন!

"যথার্থই শিশোদীয় বংশ নির্ব্বাসিত হইবে! সুন্দর মেওয়ারে কি শিশোদীয় বংশের আর স্থান নাই?" প্রতাপসিংহ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বীর-হৃদয় রোষে বিষাদে স্ফীত হইল। সে বীরের সেই প্রশ্ন শুনিয়া যোদ্ধাগণের হৃদয়ও রোষে স্ফীত হইল, তাঁহারা বলিলেন, "রাজন্! আপনার আজ্ঞায় এখনও স্বদেশের জন্য জীবন দিতে দাসগণ প্রস্তুত আছে, কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধ আর হয় না, কেননা অর্থ নাই, সম্বল নাই, সঙ্গতি নাই, যুদ্ধের কোন উপায় নাই।" পুনরায় সকলে নির্ব্বাক্!

সভায় সকলে নিস্তব্ধ! তন্মধ্যে একটী স্বর শুনা গেল, "এখনও মেওয়ারে শিশোদীয়ের স্থান আছে, এখনও যুদ্ধের উপায় আছে।"

বিস্মিত হইয়া সকলে সেইদিকে চাহিলেন, দেখিলেন বৃদ্ধ রাজমন্ত্রী ভামাশাহ। বংশানুক্রমে ইহাঁরা মেওয়ারের মন্ত্রীত্ব কার্য্য করিয়াছেন।

ভামাশাহ প্রতাপসিংহের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়াছিলেন, প্রতাপের স্ফীত হৃদয় দেখিয়াছিলেন, প্রতাপের হৃদয়ের অব্যক্ত, অব্যক্তব্য ভাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সে ভাব বুঝিয়া বৃদ্ধ দণ্ডায়মান হইয়া উত্তর করিলেন, "এখনও মেওয়ারে শিশোদীয়ের স্থান আছে, এখনও যুদ্ধের উপায় আছে।" সায়ংকালের বায়ুতে বৃদ্ধের শুক্ল কেশ উড়িতেছে, সায়ংকালের অন্ধকারেও বৃদ্ধের উদ্দীপ্ত নয়নের দীপ্তি স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে; বৃদ্ধ নিশ্চেষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সভাস্থ সকলে চমকিত, সকলে নিস্তব্ধ!

প্রতাপ চমকিত হইলেন, উৎসাহ ও নবজাত আশার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রীবর! আপনার কথা ব্যর্থ হয় না, কিন্তু আর যুদ্ধের কি উপায় আছে, প্রতাপসিংহ দেখিতেছেন না, আপনি নির্দ্দেশ করুন।"

বৃদ্ধ করযোড়ে রাজসম্মুখে পুনরায় সেই স্থির গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "দাস বহুদিন মন্ত্রীত্ব করিয়াছে, দাসের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ বহুপুরুষ

পর্য্যন্ত মেওয়ারের মন্ত্রীত্ব করিয়াছেন, সে কার্য্যে বংশানুক্রমে যে ধন সঞ্চিত হইয়াছে তাহা এখনও অস্পৃষ্ট। সে ধনের দ্বারা পঞ্চবিংশ সহস্র সেনার দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ভরণপোষণ হইতে পারে; অনুমতি করিলে দাস সে ধন প্রভু-পদে উপস্থিত করে।"

পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্যের এই স্বামীধর্ম্ম ও প্রভুভক্তি দেখিয়া প্রতাপ-সিংহের নয়ন জলপূর্ণ হইল, সে জল ধীরে ধীরে মোচন করিয়া কহিলেন, "মন্ত্রীবর! আপনার এই ভক্তিতে আমি পরিতুষ্ট হইলাম, কিন্তু রাজ্ঞা প্রদত্ত ধন কিরূপে পুনরায় লইবেন; প্রতাপসিংহ অদ্য দরিদ্র, কিন্তু তাঁহার অধীনদিগের ধন রণ করিতে অক্ষম!"

সভাস্থ সকলে পুনরায় নির্ব্বাক্! ভামাশাহ পুনরায় গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "মহারাণা! এ দাস প্রভুকে ধন দিতেছে না, মেওয়ারের রক্ষার্থ মেওয়ারকে দিতেছে; মেওয়ারের অনুপযুক্ত সুত মাতার জন্য আর কি উপকার করিতে পারে? মহারাণা, শিশোদীয়ের ধন, মান, প্রাণ সমস্তই মেওয়ারের, তাহা কি মহারাণার অবিদিত? মেওয়ারের জন্য ব্যয় হইবে, তাহাতে আক্ষেপ কি?"

প্রতাপসিংহ অনেকক্ষণ হেটমস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ পর জলসিক্তনয়নে মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন,—

"মন্ত্রীবর! আপনার দত্ত অর্থ গ্রহণ করিব, সেই অর্থবলে আর একবার উদ্যম করিব, মেওয়ার উদ্ধার হয় কি না, দেখিব! আপনার এ কার্য্যের পুরস্কার দেওয়া আমার দুঃসাধ্য; জগদীশ্বর আপনাকে পুরস্কার দিন্।"—

প্রতাপ সসৈন্যে ফিরিলেন, পুনরায় আরাবলী অতিক্রম করিয়া মেওয়ারে আসিলেন। সেই বিপুল অর্থবলে আর একবার উদ্যম করিলেন, মেওয়ার উদ্ধার হয় কি না, আর একবার দেখিলেন।

সে উদ্যমের ফল ইতিহাসে লেখা আছে; দেওয়ীরের যুদ্ধক্ষেত্রে অদ্যাপি অঙ্কিত রহিয়াছে! শাহবাজ খাঁ সসৈন্যে দেওয়ীরে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন; প্রতাপ দেশত্যাগ করিয়া পলাইতেছেন এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন, সহসা ঝটিকার ন্যায় চারিদিকে প্রতাপের সৈন্য আসিয়া পড়িল, দেওয়ীরের প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে শাহবাজ সসৈন্যে হত হইলেন।

সে প্রবল ঝটিকা বহিতে লাগিল, আমাইত পর্ব্বতদুর্গ হস্তগত হইল, তথাকার মুসলমান দুর্গরক্ষক হত হইল।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। কমলমীর হস্তগত হইল, তথাকার দুর্গরক্ষক আবতুল্লা সসৈন্যে হত হইল। উদয়পুর হস্তগত হইল, এক বৎসরের মধ্যে একে একে দ্বাত্রিংশৎ পর্ব্বতদুর্গ প্রতাপসিংহের হস্তগত হইল।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। মেওয়ারের আকাশ পরিষ্কার হইল; চিতোর, আজমীর ও মণ্ডলগড় ভিন্ন সমস্ত মেওয়ার পুনরায় প্রতাপের হস্তগত হইল; ভগ্নদূত দিল্লীতে যাইয়া আকবরশাহকে জানাইল যে, ক্রমাগত দশ বৎসর বিপুল অর্থব্যয়ে মহাবলপরাক্রান্ত আকবরশাহ মেওয়ারে যে জয়লাভ করিয়াছিলেন, দেওয়ীরের যুদ্ধে প্রতাপসিংহেব এক বৎসরের উদ্যমে সে সমস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। প্রতাপসিংহ মেওয়ার অতিক্রম করিয়া তাঁহার প্রধান শত্রু মানসিংহের অম্বর প্রদেশ আক্রমণ করিলেন, দেশ বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিলেন, মল্লপুর নামক প্রধান নগর ও বাণিজ্যস্থান লুণ্ঠন করিলেন।

ক্রমে সূর্য্যমহলদুর্গ পুনবায় রাজপুতদিগের হস্তগত হইল; সে দুর্গ আক্রমণকালে, তেজসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহ ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের পার্শ্বে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। চন্দাওয়ৎ ও রাঠোরগণ পরস্পরের সম্মুখে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া ভয়ঙ্কর নাদে যুদ্ধ করিতে লাগিল; সে দুর্দ্দমনীয় বেগের সম্মুখে মুসলমানগণ দাঁড়াইতে পারিল না।

ক্রমে যুদ্ধের গতিতে তেজসিংহ একদিকে ও দুর্জ্জয়সিংহ অন্যদিকে যাইয়া পড়িলেন; কিন্তু উভয়েই দুর্গে প্রথমে প্রবেশ করিবার মানসে অসাধারণ বীরত্বের সহিত শত্রুসেনা ভেদ করিয়া যাইতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে তেজসিংহই প্রথমে প্রবেশ করিলেন; ক্ষণেক পরই চন্দাওয়ৎগণ মহাকোলাহলে শত্রুসেনা মন্থন করিয়া দুর্গদ্বার অতিক্রম করিলেন।

তখন তেজসিংহ পুবাতন শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "দুর্গস্বামিন্! আপনার অনুমতি বিনা আপনার দুর্গে পূর্ব্বেই প্রবেশ করিয়াছি, সে দোষ ক্ষমা করিবেন; কেবল মহারাণার কার্য্য সাধনার্থ এইরূপ আচরণ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার দুর্গ আপনি অধিকার করুন, অনুমতি দিলে আমি নিষ্ক্রান্ত হই।"

এ কথায় জর্জ্জরিতকলেবর হইয়া দুর্জ্জয়সিংহ কহিলেন, "রাঠোর, ঘটনাক্রমে তুমিই প্রথমে দুর্গপ্রবেশ করিয়াছ বটে; তাহাই হউক, আপন রাঠোর লইয়া দুর্গ রক্ষা কর; আমি তোমার নিকট ভিক্ষা চাহি না। আমি সসৈন্যে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছি, দুর্গের দ্বার রুদ্ধ কর, পরে যদি

চন্দাওয়ৎ-অসিতে বল থাকে সে আক্রমণ করিয়া দুর্গ কড়িয়া লইবে।” দুর্জ্জয়ের নয়ন অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছিল!

ধীরে তেজসিংহ উত্তর করিলেন, “আমি রাজকার্য্য সাধনার্থ আপনার দুর্গে আসিয়াছি, এই সুযোগে দুর্গ অধিকার করিলে বিশ্বাসঘাতকতা হইবে; রাঠোর বিশ্বাসঘাতকতা জানে না। চন্দাওয়ৎ! এখনও বিদেশীয় যুদ্ধ শেষ হয় নাই, এখন আমাদিগের মধ্যে যুদ্ধ নিষিদ্ধ। যখন বিদেশীয় যুদ্ধ শেষ হইবে তখন রাঠোর পুনরায় সূর্য্যমহলে আসিতে বিলম্ব করিবে না।”

ধীরে ধীরে আপন রাঠোর লইয়া তেজসিংহ দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন;—দুর্জ্জয়সিংহ আরক্ত নয়নে সেই রাঠোর বীরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ইহার কয়েকদিন পর ভীমগড় দুর্গের উদ্ধার হইল, কিন্তু প্রাচীন যোদ্ধা দেবীসিংহ সেই বিস্তীর্ণ দুর্গ ও প্রাসাদে কেবল প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইলেন; এ জগতে তাঁহার যাহা কিছু প্রিয়দ্রব্য ছিল, তাহা যুদ্ধক্ষেত্রে বা চিতায় বিলুপ্ত হইয়াছে।

সেই যুদ্ধক্ষেত্রে একাকী ক্ষণেক দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন; নবজাত সূর্য্যরশ্মি দেবীসিংহের মুখমণ্ডলে ক্রীড়া করিতেছে, নবজাত প্রাতের বায়ু সেই শুক্লকেশ লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। দেবীসিংহ নিস্পন্দ ও নিস্তব্ধ! এ শোকপূর্ণ অসার জগতে পুত্রশোক অপেক্ষা আর দারুণ ব্যথা কি আছে? দেবীসিংহ যোদ্ধা, কিন্তু দেবীসিংহ মনুষ্য!

ধীরে ধীরে তেজসিংহ নিকটে আসিয়া কহিলেন, “পিতার চিরসুহৃদ্! আপনাকে আমি কি সান্ত্বনা দিব? কেবল এই জিজ্ঞাসা করি, মহারাণার জন্য সম্মুখযুদ্ধে রাজপুত বালক প্রাণ দিয়াছেন, সে জন্য কি রাজপুতপিতা কাতর?”

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দেবীসিংহ উত্তর করিলেন, “রাজপুতের ধন, মান, পরিবার সমস্তই মহারাণার, মহারাণার কার্য্যে শিশু চন্দনসিংহ জীবন দিয়াছেন, সে জন্য খেদ নাই। কেবল এ কাল সমর বৃদ্ধকে রাখিয়া শিশুকে লইল কি জন্য, এই চিন্তা করিতেছি!—শিশু চন্দন! পিতাকে কেন সঙ্গে লইলে না?”

সেই প্রাচীন মুখমণ্ডলে মুহূর্ত্তের জন্য কাতরতা-চিহ্ন দৃষ্ট হইল; ধীরে ধীরে দেবীসিংহ একবিন্দু জল মোচন করিলেন।

তেজসিংহ দেখিলেন, দেবীসিংহ সামান্য ব্যথায় ব্যথিত হয় নাই; তিনি সে ব্যথারও ঔষধি জানিতেন। দেবীসিংহের প্রাচীন হস্ত আপন

মস্তকে স্থাপন করিয়া কহিলেন, "পিতঃ! আপনি একটী পুত্র হারাইয়াছেন, আর একজন এখনও জীবিত আছেন; তেজসিংহ পিতার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছেন, পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

দেবী। "জগদীশ্বর তোমাকে কুশলে রাখুন, আপনাকে পিতৃগদীতে পুনরায় স্থাপন করুন।"

তেজ। "দেবীসিংহ সহায়তা না করিলে পিতৃদুর্গ কিরূপে পাইব? রাঠোর বীর! আপনি পিতাকে গদীতে আরোহণ করিতে দেখিয়াছেন, পুত্রকে কি সহায়তা করিবেন না?"

ধীরে ধীরে দেবীসিংহ নয়নের জল মোচন করিলেন; কাতরতা বিস্মৃত হইলেন; সবল হস্তে বর্শাধারণ করিলেন; কহিলেন—

"হাঁ দেবীসিংহের জীবনের আরও একটী উদ্দেশ্য আছে, তেজসিংহ অগ্রসর হও, দেবীসিংহ আপন প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয় নাই।"

ক্রমে বিদেশীয় যুদ্ধ ক্ষান্ত হইল; তখন তেজসিংহ সূর্য্যমহল-উদ্ধারচেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রসন্ন আকাশে মেঘরাশি।

একদিন সন্ধ্যার সময় ভীলকুটীরে ভীমচাঁদকে দেখিতে যাইলেন, তথায় ভীলবালা বালিকাকে দেখিতে পাইলেন, বালিকা এখন দেখিতে সেইরূপ, বালিকা! হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে গীত গাইতে গাইতে বালিকা নিকটে আসিল।

বালিকা গাইল।—

"প্রভাতে বাগানে গিয়া দেখে এলেম সই।
কিবা অপরূপ কথা শুনে এলেম সই!

তেজসিংহ। "আজ কি দেখেছিলি? কি শুনেছিলি?"

বালিকা। "এই শুন না।"

"ফুটেছে মালতী ফুল, গন্ধেতে করি আকুল!
ধেয়ে এল অলিকুল, দেখে এলেম সই।

তেজসিংহ। "এই দেখেছিলে, আর কিছু না?"

বালিকা। "এই শুন না।"

"অলি এসে গান গায়, ফুল শুনে মুগ্ধ হয়,
'তুমি নাথ' ফুল কয়, শুনে এলেম সই।

তেজসিংহ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "তুই অতিশয় দুষ্টা। তোর গান বুঝিয়াছি, এ ফুলের নাম কি বল দেখি?"

বালিকা। "ফুলের আবার কি নাম আছে? ফুলের নাম পুষ্প।" তেজসিংহ হাসিলেন, বালিকা গাইতে লাগিল—

"অলিরাজ ধেয়ে যায়, বায়ু ফুলের মধু খায়,
ফুলে কবে সত্য কয়, দেখিতে পাই কই?
প্রভাতে বাগানে গিয়ে দেখে এলেম সই!
কিবা অপরূপ কথা শুনে এলেম সই!"

তেজসিংহের মুখ গম্ভীর হইল। রোষে বালিকার হাত ধরিয়া কহিলেন, বালিকা তুই যদি পুরুষ হইতিস, তোর চপলতার শাস্তি দিতাম।"

ভীত বালিকা কহিল, "আমি কি করিয়াছি? আমাকে ছেড়ে দাও, আর আমি গীত গাইব না। গীত গাইলে তুমি রাগ করিবে তাহা কি আমি জনিতাম?"

তেজ। "পাপীয়সী! তুই কিজন্য এ গীত গাইলি বল্, পুষ্পের যদি মিথ্যা নিন্দা করিস্, অদ্য আমার হস্তে নিস্তার নাই।"

বালিকা। "আমি পুষ্পের কি জানি, পুষ্প কে? আমি দরিদ্র ভীলকন্যা, আমি ফুল তুলি, ফুলের গান করি, আমি পরের কথা কি জানিব? আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

বালিকা কি সত্যই বালিকা? যথার্থই কি কেবল ফুলের গীত গাইতেছিল? তেজসিংহ কখনও বালিকাকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেন না। ধীরে ধীরে ললাটের স্বেদ মোচন করিয়া ভাবিলেন, "আমি অনর্থক রাগ করিয়াছি।"

ধীরে ধীরে বালিকার হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "আর কোনও গীত জান?"

বালিকা এবার হাসিয়া করতালি দিয়া গাইল,—

"আর শুনেছ আর শুনেছ নূতন কথা কই।
"পুষ্পের হইবে বিয়ে কিন্‌তে যাই গো খই।"

তেজসিংহ। "কাহার সহিত বিবাহ হইবে?"

বালিকা। "ফুলের আবার কার সঙ্গে বিবাহ হয়? অলির সঙ্গে, আর কার সঙ্গে?"

তেজ। "ভীলবালা, তোর হাড়ে হাড়ে বুদ্ধি! পুষ্পকুমারীর সহিত কাহার বিবাহ হইবে, তাহা কিছু শুনিয়াছিস্?"

বালি। "তাহা কি জানি; তুমি কি শুনিয়াছ?"

তেজ। "পুষ্পকুমারীর সহিত দুর্জ্জয়সিংহের একবার সম্বন্ধ হইয়াছিল; কিন্তু কন্যা তাহাতে সম্মত হয়েন নাই; সে বিবাহ অপেক্ষা মৃত্যু পণ করিয়াছিলেন।"

বালি। "তাহা শুনি নাই।"

তেজ। "কি শুনিস্ নাই?"

বালি। "সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহা শুনি নাই।"

তেজ। "তবে কি শুনিয়াছিস্?"

বালি। "শুনিয়াছি, দুর্জ্জয়সিংহের সহিত কোন একটী মেয়ের বিবাহ স্থির হইয়াছিল, এমন সময়ে তুর্কীরা সূর্য্যমহল অধিকার করিল, আর"———

তেজ। "আর কি?"

বালি। "কিছু নয়।"

তেজ। "আর কি বল্, না হইলে প্রহার করিব।"

বালি। "আর সেই কন্যা নাকি বরকে অঙ্গুরীয় দানও করিয়াছিল?

তেজসিংহের নয়ন অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু সে রাগ সম্বরণ করিয়া কহিলেন,—"তুই বন্য, অসভ্য ভীল; তোর উপর রাগ করিয়া কি করিব? সম্মুখ হইতে দূর হ!" সজোরে বালিকাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন।

বালিকা উঠিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল, যাইবার সময় গাইতে লাগিল,—

"আর শুনেছ আর শুনেছ নূতন কথা কই।
পুষ্পের হইবে বিয়ে আন্‌তে যাই গো খই।

ধেয়ে এল বায়ুরাজ, গায়ে পরিমল সাজ,
অলির মাথায় পড়ে বাজ, শুন্‌লে কিনা সই।
আর শুনেছ আর শুনেছ নূতন কথা কই।
পুষ্পের হইবে বিয়ে আন্‌তে যাই গো খই !"

তেজসিংহ উঠিলেন। দুষ্টা বালিকার অলীক কথায় তেজসিংহের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল; তাহার কারণ, তিনি নানাস্থানে জনপ্রবাদ শুনিয়াছিলেন, পুষ্পকুমারী দুর্জ্জয়সিংহকে বিবাহ করিতে স্বীকৃতা হইয়াছেন; সে প্রবাদ বালিকার সৃষ্ট, তাহা তিনি জানিতেন না। এ কথা এতদিন বিশ্বাস করেন নাই, পুষ্পকুমারীর সত্য সন্দেহ করেন নাই, যুদ্ধের সময় পুষ্পকে কোনও কথা জিজ্ঞাসার অবসর পান নাই। কিন্তু অদ্য ভীলকন্যার কথায় সন্দেহ জাগরিত হইল; সে সন্দেহ ক্রমে হৃদয়কে অভিভূত করিতে লাগিল।

অন্ধকারে সেই পর্ব্বতপথের উপর দিয়া একাকী যাইতে লাগিলেন। ভীলবালার গীত এখনও তাঁহার কর্ণে যেন শব্দিত হইতেছিল, তাঁহার মন অসুস্থ ও বিচলিত। বালিকা মিথ্যাকথা বলিবে কিজন্য ?

পুষ্প কি যথার্থই দুর্জ্জয়সিংহের অনুরতা হইয়াছেন, তেজসিংহকে ভুলিয়াছেন ? তেজসিংহের হৃৎকম্প হইল।

আবার তিনি পুষ্পের পুষ্পবিনিন্দিত মুখখানি চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই ম্লান নয়ন, ঈষদ্ভিন্ন ওষ্ঠদ্বয়, স্থিরপ্রতিজ্ঞার কথাগুলি স্মরণ করিতে লাগিলেন; পুষ্প কখন, কখন, কখনও তাঁহাতে সত্য লঙ্ঘন করিবেন না; তেজসিংহ কেন আশঙ্কা করিতেছেন ?

আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা বিষয় মনে জাগরিত হইতে লাগিল, আবার হৃদয় বিচলিত হইতে লাগিল; তেজসিংহ শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না।

পর্ব্বততলের কুজ্‌ঝটিকা যেমন ধীরে ধীরে উত্থিত হইতে থাকে, ক্রমে বৃহৎ রূপ ধারণ করে, উন্নত স্থির পর্ব্বতকে আবৃত করে, গগনের সূর্য্যকে আবৃত করে, প্রকৃতির প্রসন্ন মুখচ্ছবি আবরণ করে, অবশেষে দীর্ঘবিলম্বী মেঘরূপ ধারণ করিয়া জগৎ কলুষময় ও গভীর অন্ধকারময় করে; সেইরূপ সন্দেহ-মেঘ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া অদ্য তেজসিংহের প্রসন্ন উদার হৃদয়কে আবৃত করিতে লাগিল। হৃদয়ের সে অন্ধকার কি দুর্ভেদ্য; সুন্দর পরিষ্কার ধীশক্তির আলোক তাহাতে বিলীন হইয়া গেল।

ঊনত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

সত্যপালন।

দ্বিপ্রহর রজনীতে চন্দ্রকরোজ্জ্বল পুষ্পোদ্যানে পাঠক মহাশয় পুষ্পকুমারীকে একবার দেখিয়াছেন; কিন্তু সেদিন চরণদেব তথায় উপস্থিত ছিলেন, সুতরাং পুষ্পকুমারী পরিচয় দান করেন নাই। যদি পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকেন, চলুন, অদ্য নিরালয়ে যাইয়া সে লাবণ্যময়ীর সহিত আলাপ করিব। অদ্য তিনি মহারাজ্ঞীর দাসীস্বরূপ রাজপরিবারের সহিত বাস করিতেছেন।

পুষ্পকুমারী রাজপুত বালিকা। পুষ্পের পিতার সহিত তিলকসিংহের অতিশয় প্রণয় ছিল, সেই কারণ তিলকসিংহ নিজ পুত্রের সহিত পুষ্পের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। দশমবর্ষীয় বালক ও সপ্তমবর্ষীয়া বালিকায় একদিন সাক্ষাৎ হইল; সেই দিন পরস্পর পরস্পরকে মনে মনে বরণ করিলেন। বিবাহের বাক্যদান হইল, সম্বন্ধ স্থির হইল, সমস্ত আয়োজন স্থির হইল, শুভকার্য্যের দিনস্থির হইল; এরূপ সময়ে দিল্লীশ্বর আকবর আসিয়া চিতোরনগরী আক্রমণ করিলেন; সে নগর রক্ষার্থ পুষ্পের পিতা ও সূর্য্যমহলেশ্বর উভয়েই হত হইলেন। কিছুদিন পরে তেজসিংহ পৈতৃক দুর্গ হইতে দূরীকৃত হইয়া ভীলদিগের সহায়তা গ্রহণ করিলেন।

সপ্তমবর্ষের বালিকা ও দশমবর্ষের বালক প্রণয়ের কি জানিবেন? কিন্তু রাজপুতগণ বাল্যকাল হইতে সত্যপালন করিতে শিখিতেন; রাজপুত-বালিকা সত্য বিস্মৃত হইলেন না। একদিনদৃষ্ট সে বালকের প্রতিমূর্ত্তি বালিকা কয়েক দিনের মধ্যে বিস্মৃত হইলেন; কিন্তু সপ্তমবর্ষে যে সত্য করিয়াছিলেন, জীবনে তাহা বিস্মৃত হইলেন না।

তিলকসিংহের কুলের অধিকতর অবমাননা করিবার জন্য দুর্জ্জয়সিংহ তেজসিংহের বাগ্দত্তা বধূকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিবার মানস করিলেন। পিতার মৃত্যুর পর পুষ্পকুমারীর রক্ষক কেহ ছিল না, অথবা যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা দুর্জ্জয়সিংহের পক্ষাবলম্বী ও অর্থভুক্। তাঁহারাও দুর্জ্জয়সিংহকে বিবাহ করিবার জন্য বালিকাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন; বালিকা উত্তর পাঠাইলেন, "আমার স্বামী হত হইয়াছেন, আমি বিধবা, পুরুষের

অস্পর্শনীয়া।" সেই দিন হইতে সমস্ত অলঙ্কার ত্যাগ করিলেন। তখন পুষ্পের বয়ঃক্রম দ্বাদশবর্ষমাত্র।

তরুণবয়সে শারীরিক কিছু কিছু পরিশ্রম ও চেষ্টায় আমাদিগের শরীর সবল হয়, দৃঢ়বদ্ধ হয়। তরুণ বয়সে কিছু কিছু ক্লেশে ও চিন্তায় ও শোকে আমাদিগের মন গঠিত হয়, মানসিক প্রবৃত্তি দৃঢ়তর হয়, প্রতিজ্ঞা স্থিরীকৃত হয়, মানসিক পেশীগুলি যেন স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ও বদ্ধ হয়। চিন্তা ও ক্লেশ অপেক্ষা মনের উৎকৃষ্ট শিক্ষক আর নাই; মানসিক দুর্ব্বলতার চিকিৎসক আর নাই। চিন্তা লৌহকর্ম্মকারের ন্যায় বার বার নির্দ্দয় ও সবল আঘাত করিয়া মনকে ও হৃদয়কে গঠিত করে, সে আঘাতে আমরা কাতর হই, চিৎকার শব্দ করি; কিন্তু কর্ম্মকার নির্দ্দয়, আপন কার্য্য বিস্মৃত হয় না। পরিশেষে আমাদের মন গঠিত হয়, হৃদয় গঠিত হয়, প্রবৃত্তিগুলি স্থিরীকৃত হয়, প্রতিজ্ঞা লৌহবৎ দৃঢ় হয়। যিনি বাল্যকাল হইতে অন্যের চেষ্টায় পালিত, অন্যের হস্তদ্বারা নীত, যাঁহাকে কখনও চিন্তা করিতে হয় নাই, ক্লেশ অনুভব করিতে হয় নাই, তাঁহার মন এখনও গঠিত হয় নাই, প্রতিজ্ঞা স্থিরীকৃত হয় নাই, তাঁহার সুখ ও স্বচ্ছন্দতা আমি হিংসা করি না।

বাল্যকালে ক্লেশে পড়িয়া কোমল রাজপুতবালিকার মন গঠিত হইল, লৌহবৎ দৃঢ়ীকৃত হইল। আত্মীয়ের ভৎর্সনা ও ভয় প্রদর্শনে, পরিচারিকা-দিগের অনুরোধে, দুর্জ্জয়সিংহের দূতীদিগের প্রলোভনে, বালিকার হৃদয় বিচলিত হইল না; বাল্যকালের সত্যপালনের প্রতিজ্ঞা আরও দৃঢ়বদ্ধ হইতে লাগিল। লোকে যত দুর্জ্জয়সিংহকে বিবাহ করিবার অনুনয় করিতে লাগিল, বালিকা ততই অধিকতর ভক্তিভাবে সেই অজ্ঞাত, অপরিচিত বীরপুরুষের নামমাত্র পূজা করিতে লাগিলেন। আত্মীয়ের ভ্রুকুটি, সকলের ভৎর্সনা, নীরবে সহ্য করিতে শিখিলেন; নিরানন্দ ও বন্ধুহীন গৃহে বাস করার ক্লেশ সহ্য করিতে শিখিলেন; আপন চিন্তা, আপন প্রতিজ্ঞা, আপন হৃদয়ে গোপন করিতে শিখিলেন; বহু পরিজন মধ্যে বালিকা একাকিনী বিচরণ করিতেন, একাকিনী চিন্তা করিতেন, একাকিনী পুষ্পচয়ন করিতেন ও হৃদয়ের ভাব ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে ধারণ করিতেন। অভ্যাসে আমা-দিগের কোন্ ক্লেশ না সহ্য হয়? পুষ্পকুমারী পরের স্নেহ আর চাহিতেন না, পরের মিষ্টকথা চাহিতেন না, পরের ভ্রুকুটি বা মর্ম্মভেদী রহস্যে তাঁহার লৌহবৎ হৃদয়ে আর ক্লেশকর হইত না; বিধবা-বেশধারিণী নবীনা রাজপুত-বালা এইরূপে বাল্যকালের সত্যপালন করিতেন। অন্ধকার যত গাঢ় হয়, দীপালোক তত প্রস্ফুটিত ও প্রজ্জ্বলিত হয়: সকলের ভৎর্সনা ও রোষের

মধ্যে পিতৃমাতৃহীনা, বন্ধুহীনা রাজপুতবালিকার স্থির, অবিচলিত প্রতিজ্ঞা ক্রতই দৃঢ়তর হইতে লাগিল।

দুর্জ্জয়সিংহ অনেক প্রলোভন দেখাইয়া পুনরায় পুষ্পকুমারীর হস্ত প্রার্থনা করিলেন। দূতী যেন শতমুখে দুর্জ্জয়সিংহের যশ ও পরাক্রম ও সাহস ও বিপুল অর্থের কথা বর্ণনা করিল। পুষ্পকুমারী সমস্ত শুনিলেন; শান্ত স্থিরস্বরে উত্তর করিলেন, "আমি বিধবা; পুরুষের অস্পর্শনীয়া।"

পুষ্পের আত্মীয়গণ এ কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধ করিলেন, এবার পুষ্পকে অনুরোধ করিলেন, ভয় প্রদর্শন করিলেন; বালিকা অবিবাহিতা, অধিক দিন থাকিলে নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক হইবে বুঝাইলেন। পুষ্পকুমারী সমস্ত শুনিলেন; শান্ত স্থিরস্বরে উত্তর করিলেন, "আমি বিধবা, পুরুষের অস্পর্শনীয়া।"

অবশেষে পুষ্পের আত্মীয়দিগের সহিত যড়্যন্ত্র করিয়া দুর্জ্জয়সিংহ বল-প্রকাশের অভিলাষ করিয়া স্বয়ং পুষ্পের আবাসস্থানে আসিয়া পুষ্পকে [illegible] করিয়া সূর্য্যমহলে লইয়া যাইলেন; তথায় পুষ্পের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলপূর্ব্বক বালিকাকে হরণ করিবার উদ্যোগ করিলেন। পুষ্পকুমারী দুর্জ্জয়সিংহের দিকে স্থিরনয়নে চহিলেন; অবগুণ্ঠন দিলেন না, মুখ আবৃত করিলেন না। স্থিরনয়নে সেই দুর্দ্দমনীয় যোদ্ধার দিকে চহিলেন; অকম্পিতস্বরে কহিলেন, "চন্দাওয়ৎরাজ! শুনিয়াছি আপনি অতিশয় বিক্রমশালী, সকলই করিতে পারেন; কিন্তু পুষ্প আপনাকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে এই ছুরিকা আপন হৃদয়ে স্থাপন করিবে তাহাও কি নিবারণ করিতে পারিবেন? শুনিয়াছি তিলকসিংহের বিধবাকে হত্যা করিয়াছেন, কেন আর একজন বিধবা-হত্যার পাতকে পাতকী হইবেন?" দুর্জ্জয়সিংহ অতিশয় সাহসী; কিন্তু শান্ত বালিকার সেই স্থিরদৃষ্টি দেখিলেন, সেই অকম্পিত স্বর শুনিলেন, হস্তে শাণিত ছুরিকা দেখিলেন, নিঃশব্দে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইলেন। সূর্য্যমহলের পৃথক্ একটী উদ্যান-বেষ্টিত অট্টালিকায় পুষ্পকুমারী বন্দীস্বরূপ হইয়া রহিলেন।

বিধবা-বেশধারিণী নবীনা রাজপুতবালা এইরূপে বাল্যকালের সত্যপালন করিলেন।

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

মেঘগর্জ্জন।

কয়েক বৎসর অবধি পুষ্প এইরূপে একাকিনী চিন্তা করিতেন, একাকিনী বিচরণ করিতেন, একাকিনী পুষ্পচয়ন করিতেন, ইতিমধ্যে সহসা একদিন নিশীথে স্বপ্নের ন্যায় একজন চরণদেব সাক্ষাৎ দিলেন, বলিলেন যে, "সে অজ্ঞাত, অপরিচিত বাল্যদৃষ্ট রাঠোর বীর নামমাত্র নহেন, তিনি জীবিত আছেন, তিনি দেশের যুদ্ধ যুঝিতেছেন, তিনি বাল্য-সত্যপালন করিতেছেন।" বালিকার হৃদয় সেদিন নিশীথে সহসা আনন্দে উথলিল, বালিকার প্রতিজ্ঞা সার্থক হইল!

স্বপ্নের ন্যায় সে চরণদেব ও চরণের গীত লয় হইয়া গেল, কিন্তু সে বার্ত্তা পুষ্পের হৃদয় হইতে লয় হইল না; বিধবার হৃদয়ে নব উল্লাস জাগরিত হইল,—শুষ্ক লালসার উদ্রেক হইল। প্রাতঃকালের প্রথম আলোকচ্ছটায় যেরূপ সেই উদ্যানের পুষ্পগুলি বিকশিত হইত, সেইরূপ বিধবার হৃদয়ে চরণবার্ত্তায় নিহিত আশা, নিহিত ভাব, নিহিত লালসা, সহসা প্রস্ফুটিত হইল।

যে অজ্ঞাত বাল্যস্বামীর নাম জপিয়া এতদিন সত্যপালন করিয়াছেন তিনি জীবিত আছেন! তিনি নিদর্শন প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি বাল্যসত্য ভুলেন নাই। পুষ্পকুমারী সেই বাল্যকালের কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেন, সেই বাল্যসুহৃদের মুখমণ্ডল স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেন; এখন যিনি পিতার ন্যায় বলিষ্ঠ হইয়া দেশের যুদ্ধ যুঝিতেছেন, তাঁহার অদৃষ্ট, দীর্ঘ অবয়ব ও মুখকান্তি কল্পনা করিতে চেষ্টা করিতেন। বাল্যকালের দৃষ্ট মুখমণ্ডল স্মরণ আসিত না, অথবা কথঞ্চিৎ অতি অল্প স্মরণ আসিত। একখানি উদার দেবকান্তি মুখমণ্ডল, প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘ বাহু, উন্নত বীরোচিত শরীর, স্মরণে আসিত। কল্পনা হইতে যেন চন্দ্রালোকে সেই বীর দণ্ডায়মান হইয়া পুষ্পের হস্তধারণ করিয়াছেন, যেন বীরের উষ্ণ নিশ্বাস, বীরের তপ্ত ওষ্ঠ, সেই হস্ত স্পর্শ করিল। এ কি! এঁযে চরণদেবের মূর্ত্তি; হৃদয়েশ্বরের চিন্তা করিতে এ মূর্ত্তি হৃদয়ে জাগরিত হইল কেন?

পুষ্প বিশ্বাসঘাতিনী নহেন; মনের নিহিত কন্দরেও সেই অজ্ঞাত স্বামী ভিন্ন আর কাহারও চিন্তা ছিল না। তথাপি কল্পনা অতিশয় মায়াবিনী।

যে স্থানের কথা বার বার শুনি, সে স্থান না দেখিলেও কল্পনাবলে মানসচক্ষে যেন সৃষ্ট হয়, প্রকৃত হউক বা অপ্রকৃত হউক, কিন্তু একটী স্থানের চিত্র মনে সৃষ্ট হয়। যে পুরুষের কথা সর্ব্বদা শুনি, তাঁহাকে না দেখিলেও তাঁহার কল্পিত একখানি আকৃতি মনের সম্মুখে থাকে; অপরিচিতের মানসিক যে সমস্ত গুণ আমরা জানি, তদনুযায়ী একখানি মুখচ্ছবি গঠন করিয়া লই। পুষ্প যখন অজ্ঞাত বাল্যসুহৃদের কথা মনে করিতেন, সেইদিনের স্বপ্নবৎ দৃষ্ট দেবতুল্য মুখকান্তি হৃদয়ে জাগরিত হইত। তেজসিংহের অসাধারণ বীরত্বের কথা যখন শুনিতেন, সেই উন্নত দীর্ঘ অবয়ব, বিশাল বক্ষঃস্থল ও দীর্ঘ বাহু স্মরণ হইত। তেজসিংহের কথা যখন স্মরণ বা কল্পনা করিবার চেষ্টা করিতেন, সেই সঙ্গীত-বিনিন্দিত রজনীশ্রুত মিষ্ট ভাষা কর্ণকুহরে শব্দিত হইতে থাকিত। পুষ্প অবিশ্বাসিনী নহেন; সত্যপালনের জন্য জগৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু মায়াবিনী কল্পনাশক্তি অজ্ঞাত হৃদয়েশ্বরের আকৃতির সহিত সেদিনকার স্বপ্নবৎ দৃষ্ট চরণদেবের সহিত সততই বিজড়িত করিত! কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও কি সেই মূর্ত্তির দিকে প্রধাবিত হইত? পুষ্পকুমারী জানেন না, আমরাও জানি না।

দুই তিন বৎসর অতীত হইল, পুষ্পকুমারীর চিন্তা ক্রমে গাঢ়তর হইতে লাগিল, কিন্তু সে চিন্তা নিহিত, জগতের অজ্ঞাত ও অলক্ষিত।

চাতক যেরূপ মেঘের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া বিশ্রান্ত হয় না, পুষ্পকুমারী সেইরূপ পর্ব্বতপথ চাহিয়া রহিলেন; পুনরায় স্বপ্নবদ্দৃষ্ট সেই নবীন চরণকে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রালোকে পদচারণ করিতেন, নিস্তব্ধ রজনীতে জাগরিতা থাকিতেন, দিবা গেল, মাস গেল, দুই তিন বৎসর অতিবাহিত হইল, রৌপ্যবিনিন্দিত চন্দ্রালোকে সে নবীন মূর্ত্তি আর দৃষ্ট হইল না; রজনীর নিস্তব্ধতায় সে স্বর্গীয় সঙ্গীত আর শ্রুত হইল না।

দুই তিন বৎসর অতীত হইল; সহসা স্বপ্নের ন্যায় যে সঙ্গীত শ্রুত হইয়াছিল, যে নবীন মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়াছিল, সে কি একেবারে শূন্যগর্ভে লীন হইয়া গেল?

আকাশে যেরূপ কৃষ্ণ মেঘের সহিত বিদ্যুল্লতা ক্রীড়া করে, পুষ্পের হৃদয়ে আশা ও চিন্তা সেইরূপ খেলা করিত; কিন্তু জগতে সে আশা বা চিন্তার কোন পরিচয় পায় নাই, বিধবা বালার নির্ম্মল ম্লান মুখমণ্ডলে কোনও ভাব লক্ষিত হইত না।

সহসা মুসলমানেরা সূর্য্যমহল আক্রমণ করিল; নিশীথে অলক্ষিত হস্তদ্বারা পুষ্পকুমারী ভীমগড়ে নীত হইলেন। পুনরায় ভীমগড় আক্রান্ত হইল,

পুনরায় অপরিচিত দীর্ঘকায় ভীল পুষ্পকুমারীকে রক্ষা করিল। অপরিচিত?———প্রেমিকের নয়ন ভ্রান্ত হয় না; পুষ্প সেই চরণদেবকে ভীল-বেশে দেখিয়া চিনিলেন,—দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন; সুপ্ত আশা হৃদয়ে পুনরায় জাগরিত হইল।

তাহার পর রাজপরিবারের সঙ্গে সঙ্গে পুষ্প ফিরিতে লাগিলেন,—কখন কন্দরে, কখন গহ্বরে, কখন উপত্যকায়, বাস করিতে লাগিলেন। এখন যুদ্ধ ক্ষান্ত হইয়াছে, কিন্তু মহারাণা প্রতাপসিংহ প্রাসাদ তুচ্ছ করিয়া পর্ণ-কুটীরে বাস করিতেন; চিতোর শত্রুহস্তে রহিয়াছে বলিয়া এখনও তাপসের ক্লেশ সহ্য করিয়া দুর্গ বা প্রাসাদ তুচ্ছ করিয়া কুটীরে বাস করিতেন। রাজরাজ্ঞী ও রাজবধূ সেই কুটীরে থাকিতেন; রাজশিশুগণ সেই কুটীরের চারিদিকে ক্রীড়া করিত! যতদিন চিতোর উদ্ধার না হয়, ততদিন প্রতাপসিংহ অন্য আবাসে বাস করিবেন না। প্রতাপ জীবিত থাকিতে চিতোর উদ্ধার হইল না;—ইতিহাসে লিখিত আছে, প্রতাপ সেই পর্ণকুটীরে প্রাণত্যাগ করেন!

পর্ণকুটীরের পার্শ্ব দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী বহিয়া যাইত, পুষ্পকুমারী তথায় সর্ব্বদা জল আনিতে যাইতেন। অদ্য রজনীতে সেই স্থানে জল আনিতে যাইলেন ও কলস রাখিয়া নীলমেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন। অনেকক্ষণ একাকী সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়ের চিন্তা আমরা কিরূপে অনুভব করিব?

মেঘ গর্জ্জন করিল; সহসা পুষ্পকুমারীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, কেন?—কে বলিবে, কিজন্য?

একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

বজ্রাঘাত।

সহসা সুদূর হইতে পুষ্প একটী সঙ্গীতধ্বনি শুনিলেন;—সে সঙ্গীত পুষ্পের হৃদয় আলোড়িত করিল, পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত করিল!

আশায় পুষ্পকুমারীর হৃদয় বিকশিত হইল; আনন্দময় স্বপ্নে পুনরায় সে হৃদয় ভাসিল, সে হৃদয় হাসিল; শুষ্কপ্রায় লতিকা যেন আর একবার মুখ তুলিয়া আকাশের দিকে চাহিল!

লতিকা কি জানিত, সে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ; বজ্রপাত সন্নিকট!

গীতের তীব্রতা শুনিয়া পুষ্প চমকিত হইলেন ; চরণদেব গাইতেছেন—

"বর্ষাকালে আকাশে সুন্দর ইন্দ্রধনু দৃষ্ট হয়, তাহার কি কমনীয় কান্তি, কি অনির্ব্বচনীয় রূপ! সে ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রধনুর স্থায়িত্বে বিশ্বাস করিও, কিন্তু তদপেক্ষা উজ্জ্বলনয়না নারীর সত্যে বিশ্বাস করিও না!

"বক্রগতি কালসর্প কি সুন্দর উজ্জ্বল চূড়া ধারণ করে! সে খল সর্পের সরলতায় বিশ্বাস করিও, কিন্তু তদপেক্ষা সুবেশধারিণী নারীর সত্যে বিশ্বাস করিও না!

"জগতের অস্থায়ী দ্রব্যের স্থায়িত্বে প্রত্যয় কর; চপলা বিদ্যুল্লতার কিরণে প্রত্যয় কর; জলে অঙ্কিত রেখার স্থায়িত্বে বিশ্বাস কর, উল্কার স্থিরত্বে প্রত্যয় কর, কিন্তু নারীর সত্যে প্রত্যয় করিও না!

"জগতের মধ্যে চপল, চঞ্চল, মায়াবী, অপ্রকৃত, সমস্ত দ্রব্য একীকৃত কর, তাহার উপর নাম লিখ, 'নারীর সত্যপালন'।"

চরণের উগ্রস্বর গগনে উত্থিত হইল, ছিন্ন-তার বীণা নীরব হইল!

ধীরে ধীরে চরণদেব নিকটে আসিয়া পুষ্পকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ গীত দেবীর মনোনীত হইয়াছে?"

পুষ্প চকিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন; অনেকক্ষণ পর বলিলেন,—"চরণদেব! এ গীতের অর্থ বুঝিলাম না, পূর্ব্বদিনে আপনি এরূপ গীত গান নাই।"

সে কোমলস্বরে প্রস্তর দ্রবীভূত হইত, চরণের হৃদয় দ্রবীভূত হইল না। তিনি কহিলেন,—'গীত আমার নহে, আমি যেরূপ শিক্ষিত হই, সেইরূপ গাই।"

পুষ্প সভয়ে কহিলেন, "যিনি আপনাকে গীত শিখাইয়াছেন, তিনি কুশলে আছেন?"

চরণ। "কুশলে নাই, তিনি কুস্বপ্নে অতিশয় প্রপীড়িত হইয়াছেন; আপনাকে যে নিদর্শনটী দিয়াছিলেন, তাহা একবার দেখিতে চাহিয়াছেন।"

পুষ্প এবার যথার্থ ভীতা হইলেন; সে অঙ্গুরীয়টী হৃদয়ে রাখিতেন, সর্ব্বদা দেখিতেন, সর্ব্বদা পরিতেন, পুনরায় হৃদয়ে রাখিতেন; কিন্তু কয়েক দিন হইতে সেই অঙ্গুরীয়টী তিনি খুঁজিয়া পান নাই।

চরণ কম্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে অঙ্গুরীয়টী কোথায়?"

পুষ্প স্তব্ধ ও নিরুত্তর!

অধিকতর কম্পিতস্বরে চরণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে অঙ্গুরীয়টী কোথায় ?" তাঁহার নয়ন অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছিল।

অস্ফুটস্বরে পুষ্প কহিলেন,—"চরণদেব! অনবধানতা মার্জ্জনা করুন; বীরপুরুষকে জানাইবেন——————"

চরণ। "সে অঙ্গুরীয়টী কোথায় ?" গর্জ্জন করিয়া তৃতীয়বার এই প্রশ্নটী করিলেন।

পুষ্প। "আমি অভাগিনী, সে অঙ্গুরীয়টী হারাইয়াছি।"

চরণ। "অভাগিনি! তাহার সঙ্গে সঙ্গে তেজসিংহের প্রণয় এ জীবনের মত হারাইয়াছ।"

বিদ্যুৎ-গতিতে ছদ্মবেশী তেজসিংহ নয়নের অদৃশ্য হইলেন!

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

পুত্রশোক বিমোচন।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময়, তেজসিংহ আপন আবাসস্থানে ফিরিয়া আসিলেন; মনে মনে কহিলেন, "চপলা নারীর জন্য বহুদিন ব্যর্থ কাটাইয়াছি; অদ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব।"

দ্বিপ্রহর রজনীতে চারিদিকে সৈন্য রাশীকৃত হইতেছিল, তেজসিংহ তাহার মধ্যে যাইয়া গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "বন্ধুগণ, বৈরনির্যাতনের সময় উপস্থিত, অগ্রসর হও।"

যাহারা তেজসিংহের সে গর্জ্জন শুনিলেন, সে নিশীথে তাঁহার ললাটে ভ্রূকুটি দেখিলেন, তাহাদিগের তিলকসিংহের কথা স্মরণ হইল; নিঃশব্দে সকলে সূর্য্যমহল-দুর্গের দিকে চলিল।

পর্ব্বত ও উপত্যকার মধ্য দিয়া দ্বিপ্রহর রজনীতে নিঃশব্দে সৈন্যগণ চলিতে লাগিল। কখন জঙ্গলের ভিতর দিয়া, কখন হ্রদের পার্শ্ব দিয়া, কখন অন্ধকারময় উপত্যকায় নীচে দিয়া, কখন পর্ব্বতের উপর দিয়া তেজসিংহের সৈন্য চলিল। যতক্ষণ সৈন্য চলিতেছিল, তেজসিংহের মুখে কেহ একটী বাক্য শ্রবণ করে নাই; সকলে বুঝিল, অদ্য দুর্জ্জয়সিংহের রক্ষা নাই; রোষানল তিলকসিংহের পুত্রের হৃদয়ে জাগরিত হইয়াছে, অদ্য সূর্য্যমহলের রক্ষা নাই।

অনেক পর্ব্বত, উপত্যকা উত্তীর্ণ হইয়া সেনা অবশেষে সূর্য্যমহলের সম্মুখে আসিল। উন্নত শেখর যেন কিরীটের ন্যায় দুর্গকে ধারণ করিয়াছে; সেই পর্ব্বত ও দুর্গ নৈশ আকাশপটে ভীষণ চিত্রের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। চারিদিকে কেবল পর্ব্বতমালা ও অনন্ত পাদপশ্রেণী দেখা যাইতেছে; নৈশ অন্ধকারে সূর্য্যমহলদুর্গ নিস্তব্ধ, জগৎ নিস্তব্ধ; নৈশ বায়ুও যেন স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। ক্ষণেক তেজসিংহ দণ্ডায়মান হইয়া দূর হইতে সেই পৈতৃক দুর্গ দেখিলেন, মনে মনে বলিলেন, "পিতা, অনুমতি দিন, অষ্টাদশ বর্ষ নির্ব্বাসনের পর আপনার পুত্র দুর্গে প্রবেশ করুক।" আর একজনকার নাম ইহার সঙ্গে সঙ্গে তেজসিংহের মনে উদয় হইল; রোষে দন্ত কড়মড় করিলেন, সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইতে কহিলেন।

নিঃশব্দে সৈন্যগণ সূর্য্যমহল-তলে উপস্থিত হইল। এ নিস্তব্ধ নিশীথে অসতর্ক শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য কেহ কেহ পরামর্শ দিলেন; তেজসিংহ ভ্রুকুটি করিয়া কহিলেন, "পিতার দুর্গে পুত্র তস্করবৎ প্রবেশ করে না। তেজসিংহ রাজপুত; রাজপুত সুপ্ত শত্রুর সহিত যুদ্ধ করে না।"

পরে উচ্চৈঃস্বরে ভেরী বাজাইলেন; ভেরীর শব্দ সে পর্ব্বত ও উপত্যকায় শতবার ধ্বনিত হইয়া জগৎকে চমকিত করিল, পরে দূত উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "অদ্য তিলকসিংহের পুত্র পিতার দুর্গে প্রবেশ করিবেন; যে পার পথ রোধ কর।" যাহারা সে ভেরীশব্দ, সে দূতকথা শুনিল, তাহারা বুঝিল, অদ্য তেজসিংহের গতি রোধ করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত! দুর্গ-প্রহরীগণ নীচের শব্দ শুনিতে পাইল, লক্ষ্য করিয়া দেখিল, পিপীলিকা-সারের ন্যায় সৈন্যশ্রেণী দুর্গে আরোহণ করিতেছে।

তৎক্ষণাৎ তাহারা দুর্জ্জয়সিংহকে সংবাদ দিল। দুর্জ্জয়সিংহ জাগরিত হইয়া দুর্গপ্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান হইলেন; মুহূর্ত্তের মধ্যে বুঝিলেন, রাঠোর অল্প দিন পূর্ব্বে যে সত্য করিয়াছিলেন, অদ্য তাহাই পালন করিতে আসিয়াছেন। রোষে মনে মনে বলিলেন, "দুর্জ্জয়সিংহ যেরূপে দুর্গ লইয়াছে সেইরূপে দুর্গ রক্ষা করিবে, অদ্য তিলকসিংহের পুত্রকে মারিবে, অথবা নিজে মরিবে; এ জগতে উভয়ের স্থান নাই।" তৎক্ষণাৎ যোদ্ধাগণকে প্রাচীর হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রাচীরের বাহিরেই শত্রুর পথ রোধ করিতে আদেশ করিলেন। সেস্থানে পর্ব্বতপথ অতিশয় দুরূহ, কঠোর, এবং সঙ্কীর্ণ, অল্পসংখ্যক যোদ্ধায় শত্রুকে রোধ করিতে পারে।

দুর্জ্জয়সিংহের আদেশে দ্বিশত যোদ্ধা প্রাচীর হইতে অবতীর্ণ হইল; প্রাচীরের উপরে চারিদিকে মশাল জ্বলিল; দুর্গশিরের এই আলোক

বহুদূর পর্য্যন্ত চারিদিকের দেশ প্রদীপ্ত করিল, নৈশ গগন উদ্দীপ্ত করিল।

তেজসিংহ দেখিলেন, বিনা যুদ্ধে আর আরোহণ সম্ভব নহে; বজ্রনাদে যুদ্ধের আদেশ দিলেন; স্বয়ং সমস্ত সৈন্যের অগ্রগামী হইয়া বর্শা ও অসিহস্তে শত্রুকে আক্রমণ করিলেন।

সেস্থানে উপরের অল্প সৈন্য নীচস্থ বহু সৈন্যের গতিরোধ করিতে পারিত; কিন্তু তেজসিংহের গতিরোধ হইল না। তাঁহার রাঠোর সেনাগণ যেরূপ দুর্দ্দমনীয় ও অপ্রতিহত তেজে দুর্জ্জয়সিংহের সেনাকে আক্রমণ করিল, দেখিয়া উপরস্থ দুর্গবাসীগণ বিস্মিত হইল, বুঝিল, এ তিলকসিংহের পুত্র, পিতার বলে বলিষ্ঠ! মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রচণ্ডনাদ গগনে উত্থিত হইল, উভয় পক্ষ ভীষণ রণে লিপ্ত হইল, অল্পক্ষণমধ্যে দ্বিশত চন্দাওয়ৎ সৈন্য বায়ু-তাড়িত পত্রের ন্যায় ছারখার ও ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল,—অনেকে হত হইল, অনেকে পর্ব্বত হইতে উপলখণ্ডের ন্যায় নীচে নিক্ষিপ্ত হইল; অবশিষ্ট দুর্গপ্রাচীরাভিমুখে পলায়ন করিল। শবরাশির উপর উপর দিয়া তেজ-সিংহের দুর্দ্দমনীয় রাঠোর সেনা হুঙ্কারশব্দে অগ্রসর হইতে লাগিল।

দুর্জ্জয়সিংহ উপর হইতে এই ব্যাপার দেখিলেন; নীরবে সসৈন্যে দুর্গ-প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান রহিলেন; তাঁহার দন্তপাতি ওষ্ঠের উপর স্থাপিত, নয়ন হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল; কহিলেন, "তিলকসিংহের পুত্র পিতার ন্যায় যুদ্ধ শিখিয়াছে, কিন্তু দুর্জ্জয়সিংহও দুর্ব্বল হস্তে অসিধারণ করে না।"

তেজসিংহের সৈন্য প্রাচীরের নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই তাহাদের উপর প্রাচীর হইতে রাশি রাশি বর্শা ও তীর নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; তাহারাও সুপ্ত রহিল না; মুহূর্ত্তের মধ্যে তেজসিংহের সেনা প্রাচীরের নিকট আসিল।

তখন প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হইল, রাঠোরগণ লম্ফ দিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা পাইল, চন্দাওয়ৎগণ হস্তে বর্শাচালনে তাহাদিগের প্রতিরোধ করিতে লাগিল। তেজসিংহের কতক সৈন্য প্রাচীরের উপর উঠিল, দুর্জ্জয়-সিংহের কতক সৈন্য উৎসাহে প্রাচীর হইতে লম্ফ দিয়া নীচে আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, অচিরে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ডনাদে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই নৈশ অন্ধকারে বা মশালের আলোকে শত্রু মিত্র রাশি রাশি হত হইতে লাগিল, রুধিরের স্রোত বহিতে লাগিল, শবের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সেনাগণ যুদ্ধ করিতে লাগিল, প্রচণ্ড যুদ্ধনাদে আহতদিগের আর্ত্তনাদ শ্রুত

হইল না। যেন শত বৎসরের বৈরভাব সেই রাঠোর ও চন্দাওয়ৎদিগের হৃদয়ে জাগরিত হইল; যেন সেই বৈরভাবে ও জিঘাংসায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া অসুরবীর্য্যে চন্দাওয়ৎ ও রাঠোর রণস্থল ও সমস্ত পর্ব্বতদুর্গ কম্পিত করিল। সালুম্ব্রা ও দুর্জ্জয়সিংহের নাম বার বার ভীষণ হুঙ্কারে উচ্চারিত হইতে লাগিল; সে হুঙ্কারকে ডুবাইয়া রাঠোরগণ জয়মল্ল ও তিলকসিংহের নাম করিয়া পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতে লাগিল। নিশাকালে সে যুদ্ধরবে চারিদিকের পর্ব্বত ও উপত্যকাবাসী চমকিত হইল; বুঝিল, তিলকসিংহের পুত্র অদ্য পৈতৃক দুর্গে প্রবেশ করিতেছেন।

প্রাচীরপার্শ্বে এইরূপে সমরতরঙ্গ উথলিতে লাগিল, যুদ্ধের ভীষণ নাদ গগনে উত্থিত হইতে লাগিল। সকলের অগ্রে তেজসিংহ ও কতিপয় যোদ্ধা প্রাচীরের দ্বার ভগ্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। দ্বার বৃহৎ বৃক্ষের কাষ্ঠে নির্ম্মিত; কিন্তু অদ্য রক্ষা নাই, তেজসিংহের ঘন ঘন কুঠার ও বর্শাঘাতে সে দ্বার কম্পিত হইতেছিল। অচিরে প্রচণ্ডশব্দে সে দ্বার ভগ্ন হইল, মহা-কোলাহলে রাঠোর সৈন্যগণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

সেই মুহূর্ত্তে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। দুর্জ্জয়সিংহ জানিলেন, এই দ্বার রক্ষা না হইলে দুর্গরক্ষা হইবে না, সুতরাং স্বয়ং সে ভগ্ন-দ্বারের নিকট আসিয়া শত্রুর পথ রোধ করিবার চেষ্টা করিলেন, প্রভুর চতুর্দ্দিকে দুর্গের সমস্ত সাহসী ও বলবান্ চন্দাওয়ৎ যোদ্ধা জড় হইল। তেজ-সিংহও ভগ্নদ্বারের উপর দণ্ডায়মান হইয়া পথ পরিষ্কারের চেষ্টা পাইলেন, তাহার সহ-যোদ্ধা রাঠোরগণও সে চেষ্টায় ক্ষান্ত ছিল না।

মুহূর্ত্তের মধ্যে বোধ হইল যেন দুইদিক্ হইতে সমুদ্রের দুইটী উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া পরস্পরকে সজোরে আঘাত করিল, সে আঘাতের শব্দ গগন পর্য্যন্ত উত্থিত হইল! ক্ষণেক উভয় পক্ষ উভয় পক্ষের বেগে যেন স্তব্ধ হইয়া রহিল; কেহ অগ্রসর হইতে পারে না; কেহ পশ্চাতে যাইবে না। অসংখ্য শব সেই দ্বারের নিকট রাশীকৃত হইতে লাগিল; শবের উপর দণ্ডায়মান হইয়া রাঠোর ও চন্দাওয়ৎগণ যুদ্ধ করিতে লাগিল, উভয় পক্ষ অসুর বীর্য্যে যুঝিতে লাগিল; কোন পক্ষ অগ্রসর হইতে পারিল না।

দুর্জ্জয়সিংহ সেইদিন যথার্থ যোদ্ধা-নাম রাখিলেন; তাঁহার শরীর রক্তাপ্লুত, নয়নদ্বয় জ্বলন্ত, ভীষণ প্রতিজ্ঞায় সে দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন, রাক্ষসবলে শত্রুদিগকে প্রতিহত করিতেছিলেন, বজ্রগর্জ্জনে আপন সেনা-দিগকে প্রোৎসাহিত করিতেছিলেন। প্রায় অর্দ্ধদণ্ড কাল সেই দ্বারদেশে অসুরবীর্য্য ও অপূর্ব্ব পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু তেজসিংহ অদ্য

যেন দৈববলে বলিষ্ঠ, তাঁহার গতি অদ্য রোধ করা মনুষ্যের অসাধ্য! অমানুষিক বলে সেই শক্ররাশি প্রতিহত করিয়া প্রচণ্ডনাদে সেই দ্বার প্রবেশ করিলেন, তাঁহার ঢালের সম্মুখে যেন কোন যন্ত্রবলে মনুষ্যবল হটিয়া গেল; বীরের নয়নদ্বয় জ্বলিতেছে, উষ্ণীষ ও শরীর রুধিরাক্ত; দক্ষিণহস্তে শালবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘ বর্শা কাঁপাইয়া তিলকসিংহের পুত্র পৈতৃক দুর্গে প্রবেশ করিলেন।

মহাকোলাহলে মেদিনী ও আকাশ কম্পিত করিয়া রাঠোর সৈন্য অষ্টাদশ বর্ষ পরে সূর্য্যমহল প্রবেশ করিল।

যখন দুর্গদ্বার ভগ্ন হইল, যখন রাঠোরগণ মহাকোলাহলে দুর্গপ্রবেশ করিল, তখন দুর্জ্জয়সিংহ এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিলেন। ধীরে ধীরে ললাটের স্বেদ ও রক্ত অপনয়ন করিলেন, রাঠোর ও চন্দাওয়ৎদিগের অসম যুদ্ধ মুহূর্ত্তের জন্য নিরীক্ষণ করিলেন।

ক্ষণেক দৃষ্টি করিয়া বজ্রনাদে তেজসিংহকে কহিলেন,—"রাঠোরবীর! তোর যুদ্ধে আমি তুষ্ট হইয়াছি। তোর পিতাকে আমি যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি, তুই পিতার ন্যায় ঐ বাহুতে অসাধারণ শক্তি ধারণ করিস্। কিন্তু এবার সাবধান! চন্দাওয়ৎগণ! আমাদিগের দুর্গ গিয়াছে, কিন্তু মান যায় নাই;—রাজপুতমান রক্ষা কর, চন্দাওয়ৎ-মান রক্ষা কর।"

"একেবারে সকল চন্দাওয়ৎ ভীষণ গর্জ্জনে মেদিনী ও আকাশ কম্পিত করিল;—সকলে বুঝিল, এখনও রাঠোরদিগের বিজয় সংশয়,—চন্দাওয়ৎগণ প্রাণ দিবে, কিন্তু অদ্য যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিবে না!

নৈরাশ-বলে বলিষ্ঠ হইয়া যেন ভগ্নজাঙ্গাল জলতরঙ্গের ন্যায় এবার চন্দাওয়ৎগণ রাঠোরের উপর পড়িল। এবার রাঠোরগণ অগ্রসর হইতে পারিল না; সমুদ্রতরঙ্গসম চন্দাওয়ৎ-তরঙ্গের সম্মুখে ক্রমে হটিতে লাগিল।

অসুরবীর্য্য তেজসিংহ রোষে গর্জ্জন করিয়া আপন দীর্ঘ বর্শা চালনা করিতে লাগিলেন; সে গর্জ্জনে বার বার পর্ব্বতদুর্গ কাঁপাইতে লাগিল, কিন্তু মরণে কৃতসংকল্প চন্দাওয়ৎ বীরদিগকে কাঁপাইতে পারিল না, সে চন্দাওয়ৎ-বেগের প্রতিরোধ করিতে পারিল না! এবার ক্রমে রাঠোরগণ হটিতে লাগিল।

বজ্রগর্জ্জনে তেজসিংহ রাঠোরদিগকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন; রাঠোরগণ প্রভুর গর্জ্জনে উৎসাহিত হইয়া রাক্ষসের ন্যায় যুঝিতে লাগিল; বার বার চন্দাওয়ৎ-মণ্ডলীকে ভীষণবেগে আক্রমণ করিল; বার বার চন্দাওয়ৎ-বেগ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল। সে বৃথা চেষ্টা; সেই

অল্পসংখ্যক্ কৃতসঙ্কল্প চন্দাওয়ৎ-মণ্ডলী যেন সহসা দৈববলে বলিষ্ঠ হইয়াছে ; সে গতিরোধ করা মনুষ্যের অসাধ্য ! সে গতিরোধ হইল না, রাঠোর সৈন্য হটিতে লাগিল।

"তিলকসিংহের প্রাসাদে তিলকসিংহের পুত্র প্রবেশ করিবেন ; আমার জীবনের সঙ্কল্প আজি সাধিব।" এই বলিয়া অবশেষে প্রাচীন রাঠোর দেবীসিংহ খড়্গহস্তে লম্ফ দিয়া চন্দাওয়ৎ-মণ্ডলীর মধ্যে পড়িলেন; তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য এবার সমস্ত রাঠোর অগ্রসর হইল ; অল্পসংখ্যক্ চন্দাওয়ৎ এবার ছারখার হইয়া প্রায় সকলে নিহত হইল। রণ সাঙ্গ হইল। শোণিতাক্তকলেবর প্রাচীন দেবীসিংহ তখন তেজসিংহের হস্ত-ধারণ করিয়া কহিলেন, "তেজসিংহ! আমার সঙ্কল্প সাধন হইল, আমাকে বিদায় দাও। তোমার পিতার ন্যায় যশস্বী হও ; বৃদ্ধের অন্য আশীর্ব্বাদ নাই।" দেবীসিংহের জীবনশূন্য কলেবর ভূমিতে পতিত হইল ; দুর্জ্জয়সিংহের অব্যর্থ বর্শায় তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ হইয়াছিল।

যুদ্ধ শেষ হইল। চন্দাওয়ৎগণ প্রায় সকলে হত হইয়াছে, কেবল দুর্জ্জয়সিংহ ও তাঁহার কতিপয় যোদ্ধা জীবিত আছেন। দুর্জ্জয়সিংহের বর্শা রক্তাপ্লুত, খড়্গ ভগ্ন ; নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতেছে। চন্দাওয়ৎ বীর তখনও যুঝিতে প্রস্তুত, যুদ্ধ-পিপাসা তখনও নিবারিত হয় নাই, জীবন থাকিতে হইবে না।

পরাজিত দুর্জ্জয়সিংহকে কেহ প্রাণে বধ না করে, তেজসিংহের পূর্ব্বেই আদেশ ছিল। এক্ষণে রাঠোরগণকে জিঘাংসায় ক্ষিপ্তপ্রায় দেখিয়া পুনরায় উচ্চনাদে কহিলেন, "দুর্জ্জয়সিংহের শরীরে যিনি অস্ত্রবর্ষণ করিবেন, তেজসিংহ তাঁহার শত্রু।"

রাঠোরগণ ক্ষান্ত হইল ; নিস্তব্ধতার মধ্যে কেবল একটী স্বর শুনা গেল ;—

"প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য ; কিন্তু জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় পুত্রশোক এখনও জ্বলিতেছে ;—ঐ আমার পুত্রহন্তা !"

নিমেষমধ্যে জিঘাংসাতাড়িত বৃদ্ধ গোকুলদাস লম্ফ দিয়া দুর্জ্জয়সিংহের হৃদয়ের উপর ছুরিকা বসাইল ; আহত দুর্জ্জয়সিংহও ভগ্ন খড়্গদ্বারা গোকুলদাসের মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিল ; দুইটী মৃতদেহ জড়িত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল।

এতদিনে গোকুলদাসের পুত্রশোক বিমোচন হইল !

ত্রয়স্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

অঙ্গুরীয় ও রত্ন।

পাঠক! চল, এ যুদ্ধের ভীষণ গণ্ডগোল হইতে আমরা মহারাণার কুটীরে যাই; তথায় অভাগিনী পুষ্পের সহিত দেখা হইবে।

সন্ধ্যাকালে সেই নদীতীরে পুষ্পকুমারী একাকী জল আনিতে আসিয়াছেন। সে সর্ব্বসহ নারীর ললাট এখনও পূর্ব্ববৎ পরিষ্কার; নয়নদ্বয় পূর্ব্ববৎ স্থির! এ বিষম যাতনায় কেহ পুষ্পকে একবিন্দু অশ্রুনিপাত করিতে দেখেন নাই, কাহারও নিকট স্নেহ যাচ্ঞা করিতে দেখেন নাই। একাকিনী বালা বাল্য বৈধব্য সহ্য করিয়াছিলেন, একাকিনী যৌবনে একদিন সুখস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন;—এখন সে স্বপ্ন লীন হইয়াছে, জীবনের আশা লুপ্ত হইয়াছে, জগতের সমস্ত সুখ নির্ব্বাণ হইয়াছে, এখনও বালা হৃদয়ের নৈরাশ একাকিনী বহন করিতেছেন, কাহারও স্নেহ চাহেন না, কাহারও সহানুভূতি প্রতীক্ষা করেন না।

বালিকার মুখমণ্ডল সেইরূপ পরিষ্কার,—পরিষ্কার, কিন্তু ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ। নয়ন সেইরূপ স্থির; কিন্তু অনৈসর্গিক জ্যোতিঃপূর্ণ ও ঈষৎ কালিমা-বেষ্টিত। স্নেহের চক্ষুদ্বারা সে মুখখানি কেহ দেখিলে বুঝিতে পারিত, কোন গভীর অব্যক্ত চিন্তা রমণীর পরিষ্কার মুখমণ্ডলের উপর আপন ছায়া ন্যস্ত করিয়াছে; কিন্তু বাল্যকাল অবধি স্নেহের চক্ষুতে সে মুখখানি কেহ দেখে নাই!

পুষ্প সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে নদীকূলে আসিতেছেন; তাঁহার বদন পাণ্ডুবর্ণ, কিন্তু পরিষ্কার; নয়নদ্বয় স্থিরজ্যোতি, সে নীরব সর্ব্বসহ রাজপুত-বালার হৃদয়ে কি চিন্তার উদ্রেক হইতেছিল, আমরা অনুভব করিতে সাহস করি না।

ক্ষণেক এক দিকে গমন করিয়া ফিরিলেন; দেখিলেন, পশ্চাতে ভীল-কন্যা বালিকা! কহিলেন, "ভীলবালা! কি জন্য এ স্থানে আসিয়াছ? তোমার পিতা মহারাজ্ঞীর বিপদের সময় যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা মহারাণা কখনও ভুলিবেন না।" বালিকা বলিল,—"এই নদীকূলে একটী চাঁপা ফুল লইতে আসিয়াছি,—দিবি?"

স্থির নৈসর্গিক স্বরে পুষ্প উত্তর করিলেন,—" হাঁ, লইয়া যাও।"

বালিকা। " দেবি! তোর মুখ শাদা কেন?"

পুষ্প ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, কৈ, না।"

বালিকা। " আমি জানি।"

পুষ্প। " কি জানিস্?"

বালিকা। " তোর মুখ শাদা কেন, জানি।"

পুষ্প। " কেন?"

বালিকা। " কোনও দ্রব্য হারাইয়াছ।"

পুষ্প। " কি দ্রব্য?"

বালিকা। " এই সোণার কোন গহনা, হার কি বালা, কি আংটী।"

পুষ্প শিহরিয়া উঠিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন,—

" হাঁ বালিকা, একটী আংটী হারাইয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটী রত্নও হারাইয়াছি।"

বালিকা। " তাহার জন্য দুঃখ কেন? একটী আংটী গিয়াছে, অন্য একটী হইবে।"

পুষ্প। " অঙ্গুরীয় গেলে অঙ্গুরীয় হয়, কিন্তু যে রত্নটী হারাইয়াছি, এ জীবনে আর পাইব না।" ধীরে ধীরে পুষ্প একটী দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বালিকা। " কি রত্ন পুষ্প? মুক্তাহার? বুকে পরিবার জিনিস?"

পুষ্প। " হাঁ, হৃদয়ে ধারণ করিবার জিনিস; কিন্তু মুক্তা অপেক্ষা উজ্জ্বল, মুক্তা অপেক্ষা দুর্ম্মূল্য!"

বালিকা। "তবে কি হবে?"

পুষ্প। "এ জীবনে পুষ্পকুমারী অনেক সহ্য করিতে শিখিয়াছে; এ ক্ষতিও সহ্য করিবে।" পুষ্পের স্বর স্থির ও নিষ্কম্প, পুষ্পের মুখমণ্ডল শান্ত ও সহিষ্ণু!

বালিকা ঊর্দ্ধদিকে চাহিল, যেন একটী চাঁপাফুলের দিকে দেখিতে লাগিল; মনে মনে ধীরে ধীরে কহিল, "পুষ্প পথ ছাড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু বালিকার পথ কি পরিষ্কার হইয়াছে! ভীলকন্যার এ জগতে স্থান নাই, কেন সে অন্য একজনকে অভাগিনী করে?"

অনেকক্ষণ সেই ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া বালিকা কহিল,—"দেবী! ঐ চাঁপাফুলটী আমাকে দিবি; তাহা হইলে আমি তোর রত্নটী খুঁজিয়া দেখিব। আমি বনজঙ্গলে বেড়াই, পাইলেও পাইতে পারি।"

ভীলকন্যার সরলতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া পুষ্প কোন উত্তর করিলেন না; ধীরে ধীরে সেই চাঁপাফুলটী পাড়িয়া ভীলের হস্তে দিলেন।

বাল্যচপলতা ত্যাগ করিয়া গম্ভীরস্বরে ভীলকন্যা বলিল,—"কল্য পুষ্পকুমারী আপন রত্ন ফিরিয়া পাইবেন।"

বালিকার গম্ভীর স্বর শুনিয়া পুষ্প চকিত হইলেন, সেইদিকে ফিরিয়া চাহিলেন; ভীলবালা কোথায়?

ঊষার রক্তিমাচ্ছটা পূর্ব্বদিক্ রঞ্জিত করিয়াছে, এরূপ সময় পুষ্পকুমারী রত্নটী ফিরিয়া পাইলেন; সূর্য্যমহলের অধিপতি তেজসিংহ পুষ্পকুমারীর নিকট সজলনয়নে মার্জ্জনা প্রার্থনা করিলেন, কহিলেন,—"পুষ্প! পুষ্প! তোমাকে অন্যায় সন্দেহ করিয়াছিলাম, অন্যায় যাতনা দিয়াছি, তাহা কি ক্ষমা করিবে? তোমার বাল্যসুহৃদ্ তেজসিংহকে কি ক্ষমা করিবে?" সবিস্ময়ে পুষ্পকুমারী দেখিলেন, সূর্য্যমহল-দুর্গেশ্বর সেই দেবকান্তি দীর্ঘকায় চরণদেব!

তেজসিংহের সহিত মহাসমারোহে পুষ্পকুমারীর বিবাহ হইল; স্বয়ং মহারাণা সে বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইলেন; স্বয়ং মহারাজ্ঞী পুষ্পকুমারীকে সাদরে চুম্বন করিয়া তাঁহার গলদেশে সুবর্ণের হার দোলাইয়া দিলেন।

উঃ! সে সুখের রজনী কে বর্ণনা করিতে পারে? উঃ! সে তৃষিত হৃদয়ের প্রথম সুখের উচ্ছ্বাস কে বর্ণিতে পারে? সেই পুষ্পবিনিন্দিত দেহ নিজ কম্পিত হৃদয়ে ধারণ করিয়া সেই সূক্ষ্ম ওষ্ঠ বার বার চুম্বন করিয়া তেজসিংহ কহিলেন, "পুষ্প, পুষ্প, একদিন তোমাকে অন্যায় সন্দেহ করিয়া ক্লেশ দিয়াছিলাম; তেজসিংহের সে দোষ তুমি ক্ষমা করিয়াছ?" পুষ্পকুমারী সজলনয়নে কহিলেন, "দেব! তোমার দোষ যেদিন গ্রহণ করিব, সেদিন যেন পুষ্প না জীবিত থাকে। সে যাতনা আমার নিজের দোষের উপযুক্ত; তোমার দত্ত প্রিয় অঙ্গুরীয় আমি কিরূপে হারাইলাম?"

তেজসিংহ সেই পুষ্পবিনিন্দিত ওষ্ঠে চুম্বন করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "পুষ্প, ক্ষোভ করিও না, তোমার দোষ নাই, সে অঙ্গুরীয় তুমি হারাও নাই।"

ঔৎসুক্যের সহিত পুষ্প বলিলেন, "আমি হারাই নাই, তবে কে হারাইল? আহা! এবার যদি পাই, চিরকাল এই হৃদয়ে ধারণ করি; আমার জীবনে আর ক্ষোভ থাকে না।"

তেজ। "ঈশানী তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন," বলিয়া ধীরে আপন হৃদয় হইতে সেই অঙ্গুরীয়টী বাহির করিয়া পুষ্পকে দিলেন। পুষ্প চকিত

হইলেন, বাষ্পোৎফুল্ললোচনে বার বার সেই অঙ্গুরীয়টী চুম্বন করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন। পরে বাষ্পোৎফুল্ললোচনে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বামীর দিকে চাহিলেন, কথা কহিতে পারিলেন না।

তেজসিংহ পুনরায় সেই মুখমণ্ডলে প্রগাঢ় চুম্বন করিলেন, আপনার বস্ত্রে পুষ্পের অশ্রু মোচন করিয়া দিলেন। তখন পুষ্প জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাথ! এ অমূল্য রত্নটী আর আমি হারাইব না; এটী তুমি কোথায় পাইলে?"

তেজসিংহ ধীরে ধীরে একখানি পত্র বাহির করিয়া পুষ্পের হস্তে দিলেন; পুষ্পমালা পড়িয়া দেখিলেন, সে ভীলকন্যা বালিবার প্রেরিত। পাঠ করিতে লাগিলেন,—

"তেজসিংহ! তোমার অঙ্গুরীয় একদিন হারাইয়াছিল, মনে পড়ে? সেদিন তুমি বালিকাকে বলিয়াছিলে, সে যদি খুঁজিয়া পায়, অঙ্গুরীয় তাহার। বালিকা অঙ্গুরীয় পুষ্পের বক্ষঃস্থলে একদিন রাত্রিতে খুঁজিয়া পাইল; অঙ্গুরীয়টী বড় উজ্জ্বল, বালিকা রাখিল। বালিকা মনে করিল, পুষ্পের হাতে পাঁচটী অঙ্গুলী, বালিকার হাতে পাঁচটী অঙ্গুলী; পুষ্প যদি অঙ্গুরীয় পরিতে পারে, বালিকা তাহার অধিকারিণী নহে কেন? যে ভীল ও রাজপুতকে গড়িয়াছে, সে ত একপ্রকারই গড়িয়াছে, তবে পুষ্প যাহার অধিকারিণী, ভীলবালা তাহার অধিকারিণী নহে কেন?

"কিন্তু আমি বালিকা, আমার বুঝিতে ভুল হইয়াছে—যে রাজপুত ও ভীলকে গড়িয়াছে, সে কোন বিভিন্নতা করে নাই, কিন্তু তেজসিংহ বাগানের ফুল ভালবাসেন, বন্যফুল ভালবাসেন না। সেদিন রাত্রিতে বাগানের ফুলগুলি লইয়া বুঝি তুমি পুষ্পকে অঙ্গুরীয় দিয়াছিলে? আমার ফুল বন্য, এইজন্য বুঝি আমাকে কিছু দেও নাই? আমি বালিকা, সকল কথা বুঝিতে পারি না।

"আজ সন্ধ্যার সময় পুষ্পকে দেখিতে গিয়াছিলাম; মনে করিলাম, তার কাছে দুটী বাগানের ফুল চাহিয়া লইব। সে বলিল, তুমি তাহাকে অঙ্গুরীয়টী দিয়াছিলে, তাহার সঙ্গে একটী রত্ন দিয়াছিলে। আমি অঙ্গুরীয়টী পাইয়াছি, কৈ, রত্নটী ত আমি পাই নাই।

"পুষ্প বলিল, অঙ্গুরীয় অপেক্ষা রত্নটী উজ্জ্বল; তবে আমার এ অঙ্গুরীয় রাখিয়া কি হইবে? এই পত্র যাহাদ্বারা পাঠাইতেছি, তাহার দ্বারা অঙ্গুরীয়-টীও পাঠাইতেছি, পুষ্পের দ্রব্য পুষ্পকে দিও।

"পুষ্পকে রত্নটীও ফিরাইয়া দিব বলিয়াছিলাম, কিন্তু সেটী অনেক

খুঁজিয়াও পাই নাই, আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। যদি তুমি পুষ্পের নিকট সেটী কাড়িয়া লইয়া থাক, পুষ্পকে ফিরাইয়া দিও।"

একবার, দুইবার, তিনবার, পুষ্প এই পত্রটী পাঠ করিলেন; শেষে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "নির্ব্বোধ বালিকা অঙ্গুরীয়টী সুন্দর দেখিয়াছিল, সেই জন্য চুরি করিয়াছিল।" তেজসিংহও তাহাই বুঝিলেন।

তেজসিংহ বালিকাকে কখনও বুঝিতে পারিলেন না।

বালিকা পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিল। গৃহের কার্য্য করিতে ভাল শিখিল না; সর্ব্বদা পর্ব্বত ও উপত্যকায় বেড়াইত, আর একাকী বসিয়া গান করিত। বালিকার স্বভাব দেখিয়া কেহ তাহাকে বিবাহ করিল না।

সেই চপ্পনপ্রদেশে অনেক দিন অবধি সেই ভীলগ্রামের নির্জ্জন কন্দরে ও উন্নত শিখরে রজনী দ্বিপ্রহরের সময় একটী রমণী-কণ্ঠনিঃসৃত গীত শ্রুত হইত। অতি প্রত্যূষে, নির্জ্জন প্রান্তরে, পথিকগণ কখন কখন একটী রমণীর পাণ্ডু মুখ ও উজ্জ্বল নয়ন দেখিতে পাইত। লোকে বলিত, কোন বিশ্রামশূন্য, উদ্বিগ্না বনদেবী হইবে।

চতুস্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

জাহাঙ্গীর।

১৫৯৭ খৃঃ অব্দে প্রতাপের মৃত্যু হয়। তাহার পর আকবর শাহ প্রায় আট বৎসর সিংহাসনে ছিলেন; তিনি জীবিত থাকিতে মেওয়ার বিজয়ের কোনও উদ্যম হয় নাই।

জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মেওয়ার বিজয়ের উদ্যম করিতে লাগিলেন। প্রতাপের সপ্তদশ সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অমরসিংহ; প্রতাপের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রতাপ মৃত্যুকালে অমরসিংহকে চিরকাল দিল্লীর সহিত যুদ্ধ করিবার আদেশ দিয়া যান; অমরসিংহও মুমূর্ষু পিতার নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। পুত্রের যতদূর সাধ্য, পিতার এই আদেশ পালন করিবার চেষ্টা করিলেন; জাহাঙ্গীরের অনন্ত সৈন্যের সহিত অমরসিংহ সপ্তদশ যুদ্ধ যুঝিলেন, এবং মোগল-সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া দেশ রক্ষা করিলেন। জাহাঙ্গীর প্রতাপের ভ্রাতা সাগরজীকে রাজা-পদে

চিতোরে প্রেরণ করিলেন; ভ্রাতুষ্পুত্র অমরসিংহ দেশের জন্য যুদ্ধ করিতেছেন; তিনি স্বয়ং মোগলের অধীন হইয়া চিতোর-দুর্গ রক্ষা করিতেছেন, এ চিন্তা সাগরজী সহ্য করিতে পারিলেন না; ভ্রাতুষ্পুত্রকে চিতোর-দুর্গ দিয়া স্বয়ং জাহাঙ্গীরের নিকট যাইয়া রোষে, অভিমানে, আত্মহত্যা করিলেন।

এতদিনে চিতোর উদ্ধার হইল বটে, কিন্তু মোগলদিগের সহিত আর যুদ্ধ করা অসম্ভব। প্রতি যুদ্ধে অমরসিংহের সৈন্য ও অর্থ নাশ হইতে লাগিল; বিজয়লাভ করিয়াও যে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, তাহা পূরণ করা দুঃসাধ্য। মনুষ্যের যতদূর সাধ্য, ততদূর চেষ্টা করিলেন; অবশেষে ১৬১৪ খৃঃ অব্দে মোগলের অধীনতা স্বীকার করিলেন। স্বয়ং জাহাঙ্গীরের পুত্র সুলতান কুর্ম্মের নিকট অধীনতা স্বীকার করিলেন; পরে নিজ পুত্র করুণকে সুলতানের সহিত আজমীরে জাহাঙ্গীরের শিবিরে প্রেরণ করিলেন।

সুলতান কুর্ম্ম (যিনি পরে শাহজিহান নামে ভারতবর্ষের সিংহাসনে আরোহণ করেন) যুবরাজ করুণকে লইয়া আজমীরে যাইলেন। এতদিন পর মেওয়ার বিজয় হওয়াতে জাহাঙ্গীর অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন ও যুবরাজ করুণকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। যুবরাজকে আপন আসনের দক্ষিণদিকে আসন দিলেন, অনেক খিল্লত ও বহুমূল্য উপহার দান করিলেন ও সঙ্গে করিয়া রাজ্ঞী নুর্জিহানের নিকট লইয়া গেলেন। নুর্জিহানের নাম জগদ্বিখ্যাত; তিনি যেরূপ সুন্দরী ছিলেন, সেইরূপ বুদ্ধিমতী ছিলেন; স্বামীকে তাঁহার অনির্ব্বচনীয় রূপলাবণ্য ও চতুরতায় বিমোহিত করিয়া রাখিতেন; অসাধারণ বুদ্ধিবলে সমগ্র ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

নুর্জিহান যুবরাজ করুণকে আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন; খিল্লত, হস্তী, ঘোটক, অসি, প্রভৃতি নানা দ্রব্য দান করিয়া যুবরাজের মনস্তুষ্টি করিলেন। সম্রাট্ ও রাজ্ঞী উভয়ে যতদূর সাধ্য যুবরাজের সম্মান করিলেন, কিন্তু প্রতাপসিংহের পৌত্রের ললাট পরিষ্কার হইল না! তাঁহার দরিদ্র পিতামহ প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপসিংহ স্বদেশের রাজা ছিলেন; এক্ষণে তাঁহারা দরিদ্র নহেন; প্রতিদিন অমূল্য উপহার প্রাপ্ত হইতেছেন; সম্রাট্ ও রাজ্ঞীর নিকট সম্মান পাইলেন; কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা স্বদেশের জায়গীরদার! আজমীরের মহা ধুমধামের মধ্যে, ভারতেশ্বর ও ভারতেশ্বরীর সমাদর ও সম্মানের মধ্যে, করুণের ললাট কুঞ্চিত, করুণের ললাট মেঘাচ্ছন্ন!

এইরূপ বহু সম্মান ও উপহার দিয়া সম্রাট্ করুণ ও তাহার দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র জগৎসিংহকে বিদায় দিলেন। সম্রাট্ স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, তিনি

করুণকে এই সাক্ষাতে সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশ লক্ষ টাকার উপহার ও এক শত দশটী অশ্ব ও পাঁচটী হস্তী দিয়াছেন। ইহা ভিন্ন সুলতান কুর্ম্ম অন্য উপহার দিয়াছিলেন।

করুণ ও জগৎসিংহ বিদায় পাইয়া স্বদেশাভিমুখে যাইলেন; দিনের ধুমধাম শেষ হইল; রজনীতে জাহাঙ্গীর নুর্জিহানের নিকট যাইয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, "করুণ কখনও সম্রাটের সভা দেখে নাই, সেইজন্য লজ্জাশীল ও সর্ব্বদা নতশির।"

লাবণ্যময়ী নুর্জিহান তাঁহার একটী সুধার হাসি হাসিয়া পতির দিকে সেই আয়তনয়নে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন,—

"সম্রাট্! তাহা নহে,—আমাদের সৈন্যবলে মেওয়ার অধীন হইয়াছে, কিন্তু চিরস্বাধীন শিশোদীয়দিগের অধীনতা এখনও অভ্যাস হয় নাই।"

সে চঞ্চল নয়নের দিকে চাহিয়া সম্রাট্ অচিরে মেওয়ার ও শিশোদীয়, করুণ ও অমরসিংহ, সমস্ত বিস্মৃত হইলেন।

পঞ্চত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

জীবন-সন্ধ্যা।

অমরসিংহ প্রতাপসিংহের পুত্র, অধীনতা সহ্য করিতে পারিলেন না। সুলতান কুর্ম্ম যখন দিল্লীশ্বরের ফর্ম্মাণ দিতে আসিলেন, অমরসিংহ তাহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সুলতান কুর্ম্ম মানসিংহের ভাগিনেয়, রাজপুত মাতার পুত্র, তিনি রাজপুতের উচিত সম্মান জানিতেন। তাঁহারই অনুরোধে তাঁহার পিতা করুণকে এত সমাদর করিয়াছিলেন; এক্ষণে কুর্ম্ম অমরসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন,—

"আমি কেবল মহারাণার বন্ধুত্ব চাহি; আর কিছু চাহি না। মহারাণা আপন রাজধানী হইতে বাহিরে আসিয়া কেবল দিল্লীশ্বরের ফর্ম্মাণ গ্রহণ করুন; আমি মেওয়ার প্রদেশ হইতে মুসলমান সৈন্য সমস্ত বাহিরে লইয়া যাইব।" বিজীত রাজাকে কেহ এরূপ সম্মান করেন না; তথাপি মহারাণা বিজীত; এক্ষণে দিল্লীশ্বরের ফর্ম্মাণবলে দেশ শাসন করিতে হইবে, এ কথা অমরসিংহ মনে স্থান দিতে পারিলেন না। তিনি পিতার কথা স্মরণ করিলেন; ফর্ম্মাণ গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

আপনার যোদ্ধাদিগকে রাজসভায় আহ্বান করিলেন। চোহান ও রাঠোর, ঝালা ও প্রমর ও শিশোদীয়, সকলে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন; তেজসিংহ উপস্থিত হইলেন; তাঁহার বয়ঃক্রম এক্ষণে পঞ্চাশৎ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু শরীর সেইরূপ দীর্ঘ, ঋজু ও বলিষ্ঠ; তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার একমাত্র বালক গজপতিসিংহ পিতার বীর্য্য অনুকরণ করিতে শিখিতেছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে পিতামহের নাম রাখিতে শিখিতেছিলেন।

দূত আসিয়া নিবেদন করিল, রাজধানীর দ্বারদেশে সুলতান কুর্ম্ম উপস্থিত আছেন, মহারাণা যাইলে ফর্ম্মাণ দান করিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। সভাস্থ সকলে নিস্তব্ধ, নির্ব্বাক্! অনেকক্ষণ পর সমস্ত যোদ্ধার সম্মুখে অমরসিংহ পুত্র করুণের ললাটে রাজটীকা দিলেন ও কহিলেন, "প্রতাপসিংহের পুত্র পিতার নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃত হইবেন না; অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজ্য করিবেন না। যুবরাজ অদ্য হইতে রাজা হইলেন; মেওয়ার-মান অবমাননা এক্ষণে তাঁহারই হস্তে; আমি বৃদ্ধ বাণপ্রস্ত অবলম্বন করিলাম।"

সেই দিন (খৃঃ ১৬১৬) অমরসিংহ রাজধানী উদয়পুর ত্যাগ করিয়া নচৌকি নামক স্থানে যাইয়া আবাস করিলেন; তাহার পর পাঁচ বৎসর জীবিত ছিলেন; কিন্তু আর রাজধানীতে প্রবেশ করেন নাই, রাজদণ্ড হস্তে গ্রহণ করেন নাই।

১৫৬৮ খৃঃ অব্দে আকবর শাহ মেওয়ার প্রথম আক্রমণ করিয়া চিতোর হস্তগত করেন। তাহার প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর পর জাহাঙ্গীরের শাসনকালে মেওয়ারের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল; সমস্ত রাজস্থানে জাতীয় জীবন অবসান হইল।

সমাপ্ত।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Street, Calcutta.

মাধবীকঙ্কণ।

দেশহিতৈষী পণ্ডিতবর

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

প্রিয়সুহৃৎ সুরেন্দ্র!

নয় বৎসর গত হইল তুমি ও সুহৃদ্‌বর বিহারীলাল ও আমি, এই তিনজনে একদিন প্রাতঃকালে মাতৃভূমির নিকট বিদায় লইয়া একত্রে একই উদ্দেশ্যে বহুদিনের জন্য বহু-সমুদ্র-পার বিদেশযাত্রা করিয়াছিলাম। আমাদের জীবনের মধ্যে সেই স্মরণীয় দিনটী স্মরণ করিয়া অদ্য এ পুস্তকখানি তোমাকে অর্পণ করিলাম। অদ্য আমরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি; তুমি যে ব্রত ধারণ করিয়াছ, তাহা অপেক্ষা মহত্তর ব্রত জগতে আর নাই। সেই মহৎকার্য্যে সফল হও, এই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার সহিত এই সামান্য পুস্তকখানি তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম। এ কঙ্কণ মাধবীলতায় বিনির্ম্মিত, আমি দরিদ্র, প্রকৃত কবিত্বের সুবর্ণরৌপ্যাদি কোথা পাইব?

দক্ষিণ শাহবাজপুর,
১০ই নবেম্বর, ১৮৭৭।

তোমার স্নেহাভিলাষী
শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

মাধবীকঙ্কণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বালকবালিকা।

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বীরনগর গ্রামে গ্রীষ্মঋতুর এক দিন সায়ংকালে গঙ্গা-সৈকতে দুইটী বালক ও একটী বালিকা ক্রীড়া করিতেছিল। সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইয়া গ্রাম, প্রান্তর ও প্রশস্ত গঙ্গানদী আচ্ছাদন করিতেছে। জলের উপব কয়েক থানি পোত ভাসিতেছে, দিনের পরিশ্রমের পর নাবিকেরা রন্ধনাদিতে ব্যস্ত রহিয়াছে; পোত হইতে দীপালোক নদীর চঞ্চল বক্ষে বড় সুন্দর নৃত্য করিতেছে। বীরনগরের নদীকূলস্থ আম্র-কানন অন্ধকারে আবৃত হইয়া ক্রমে নিস্তব্ধভাব ধারণ করিতেছে। কেবল বৃক্ষের মধ্য হইতে স্থানে স্থানে এক একটী দীপশিখা দেখা যাইতেছে, আর সময়ে সময়ে পর্ণকুটীরাবলী হইতে রন্ধনাদি সংসার-কার্য্যসম্বন্ধীয় কৃষকপত্নীদিগের কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে। কৃষকগণ লাঙ্গল লইয়া ও গরুর পাল হম্বারব করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে; ঘাট হইতে স্ত্রীলোকেরা একে একে সকলেই কলস লইয়া চলিয়া গিয়াছে; নিস্তব্ধ অন্ধকারে বিশাল শান্ত-প্রবাহিণী ভাগীরথী অসীম অনন্ত প্রেমে সমুদ্রের দিকে বহিয়া যাইতেছে। অপর পার্শ্বে প্রশস্ত বালুকাতট ও অসীম কান্তার অন্ধকারে ঈষৎ দৃষ্ট হইতেছে। গ্রীষ্মপীড়িত ক্লান্ত জগৎ সুস্নিগ্ধ সায়ংকালে নিস্তব্ধ ও শান্ত।

তিনটী বালকবালিকায় ক্রীড়া করিতেছে। বালিকার বয়ঃক্রম আট বৎসর হইবে, ললাট, বদনমণ্ডল ও গণ্ডস্থল বড় উজ্জ্বল, তাহার উপর নিবিড় কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ পড়িয়া বড় সুন্দর দেখাইতেছে। হেমলতার নয়নের তারাদুটী অতিশয় কৃষ্ণ, অতিশয় উজ্জ্বল, সুন্দরী চঞ্চলা বালিকা পরী-কন্যার মত সেই নৈশ গঙ্গাতীরে খেলা করিতেছে।

কনিষ্ঠ বালকটীর বয়ঃক্রম দশ বৎসর হইবে, দেখিলেই যেন হেমলতার ভ্রাতা বলিয়া বোধ হয়। মুখমণ্ডল সেইরূপ উজ্জ্বল ও সুন্দর, প্রকৃতি

সেইরূপ চঞ্চল। কেবল উজ্জ্বল নয়ন দুটীতে পুরুষোচিত তেজোরাশি লক্ষিত হইত ও উন্নত প্রশস্ত ললাটে শিরা এই বয়সেই কখন কখন ক্রোধে স্ফীত হইত। নরেন্দ্রকে দেখিলে তেজস্বী ক্রোধপরবশ বালক বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীশচন্দ্র দ্বাদশবর্ষীয় বালক, কিন্তু মনুষ্যের গম্ভীর ভাব ও অবিচলিত স্থির বুদ্ধির চিহ্ন বালকের মুখমণ্ডলে বিরাজ করিত। শ্রীশচন্দ্র বুদ্ধিমান্, শান্ত, গম্ভীরপ্রকৃতি বালক।

দুইটী বালকে বালুকার গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছিল, কাহার ভাল হয় হেমলতা দেখিবে। নরেন্দ্র গৃহ-নির্ম্মাণে অধিকতর চতুর কিন্তু চঞ্চল; হেম যখন নিকটে দাঁড়ায় নরেনের ঘর ভাল হয়, আবার হেম শ্রীশের ঘর দেখিতে গেলেই নরেন ব্যস্ত হয়, হাত কাঁপিয়া যায়, বালুকাগৃহ পড়িয়া যায়। মহা বিপদ্, দুই তিনবার উৎকৃষ্ট ঘর পড়িয়া গেল!

হেম এবার আর শ্রীশের নিকট যাবে না, সত্য যাবে না, যথার্থ যাবে না, নরেন আর একবার ঘর কর। নরেন মহা আহ্লাদে চক্ষের জল মুছিয়া ঘর আরম্ভ করিল, হেম সম্মুখে বসিয়া দেখিতে লাগিল। কি দেখিতে লাগিল? ঘর—না নরেনের সুন্দর মুখখানি?

ঘর প্রায় সমাধা হইল। হেম ভাবিল নরেনের ত জয় হইবে, কিন্তু শ্রীশ একাকী আছে, একবার উহার নিকট না যাইলে কি মনে করিবে। কেশগুচ্ছগুলি নাচাইতে নাচাইতে উজ্জ্বল জল-হিল্লোলের ন্যায় একবার শ্রীশের নিকট গেল। শ্রীশ ক্ষিপ্রহস্ত নহে, বালুকাগৃহ নির্ম্মাণে চতুর নহে, কিন্তু ধৈর্য্য ও বুদ্ধিবলে একপ্রকার গৃহ করিয়াছে, বড় ভাল হয় নাই।

নরেন একবার গৃহ করে, একবার হেমের দিকে চাহে। রাগ হইল, হাত কাঁপিয়া গেল, উত্তম গৃহ পড়িয়া যাইল। উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া বালুকা লইয়া হেম ও শ্রীশের গায়ে ছড়াইয়া দিল। শ্রীশের জিৎ, ঘর হইয়াছে, নরেনের ঘর হইল না।

নরেন্দ্রনাথ সাবধান! এ জগতে গুণ থাকিলে জয় হয় না, ভালবাসা থাকিলে জয় হয় না, বিষয়বুদ্ধির আবশ্যক আছে। আজ বালুকা-গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিলে না, দেখ যেন সংসারগৃহ ঐরূপে ছারখার হয় না; দেখ, যেন জীবনের খেলায় শ্রীশচন্দ্র তোমাকে হারাইয়া বিষয় ও হেমলতাকে জিতিয়া লয় না!

নরেন্দ্রনাথের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া ঘাট হইতে একটী সপ্তদশবর্ষীয়া বিধবা স্ত্রীলোক উঠিয়া আসিল। তিনি শ্রীশের জ্যেষ্ঠভগ্নী, নাম শৈবলিনী।

শৈবলিনী আসিয়া আপন ভ্রাতাকে তিরস্কার করিল। শ্রীশ ধীরে ধীরে বলিল—"না দিদি, আমি কিছুই করি নাই, নরেন ঘর করিতে পারে না সেই জন্য কাঁদিয়াছে—হেমকে জিজ্ঞাসা কর।" "তা না পারুক, আমি নরেনের ঘর করিয়া দিব," এইরূপ সান্ত্বনা করিয়া শৈবলিনী চলিলা গেলেন। শ্রীশ দিদির সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল।

হেম ও নরেনের কলহ শীঘ্র নিবারণ হইল। হেম নরেনের ক্রন্দন দেখিয়া সজলনয়নে বলিল—"ভাই তুমি কাঁদ কেন? আমি একটীবার শ্রীশের ঘর দেখিতে গিয়াছিলাম, তোমারই ঘর ভাল হইয়াছিল, তুমি ভাঙ্গিলে কেন? তোমার কাছে অনেকক্ষণ ছিলাম, শ্রীশের কাছে একবার গিয়াছিলাম বই ত নয়। তুমি ভাই রাগ করিও না, তুমি ভাই কাঁদ কেন।" নরেন কি আর রাগ করিতে পারে, নরেন কি কখনও হেমের উপর রাগ করিয়া থাকিতে পারে? আহা! বাল্যকালের প্রণয় কি পবিত্র, কি নির্ম্মল। ভ্রাতা কনিষ্ঠকে অর্দ্ধেক না দিয়া কোন দ্রব্য আহার করে না; আমরা বালক নহি, আমরা বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান, ভ্রাতাকে বঞ্চিত করিয়া সমস্ত বিষয় ভোগ করিতে চেষ্টা করি। শিশু-ভগিনীকে কাঁদিতে দেখিয়া বালক ক্রন্দন করে; আমরা বিদ্বান্ হইয়াছি, ভগিনী কষ্টে কালযাপন করিতেছে, হয়ত অন্নের কষ্ট সহ্য করিতেছে, আমরা অট্টালিকায় সুখে কালযাপন করিতেছি। আমরা বুদ্ধিমান্!

তাহার পর বালকবালিকায় কি কথা? আকাশে কেমন তারা ফুটিয়াছে? ও গুলা কি ফুল, না মাণিক? নরেন যদি একটী কুড়াইয়া পায়, তাহা হইলে কি করে? তাহা হইলে গাঁথাইয়া হেমের গলায় পরায়! ঐ দেখ, চাঁদ উঠিবার আগে কেমন রাঙ্গা হইয়াছে, ও আলো কোথা হইতে আসিতেছে? বোধ হয় নদী পার হইয়া খানিক যাইলে ঐ আলো ধরা যায়। না, তাহা হইলে ওপারের লোকে ধরিত। বোধ হয় নৌকা করিয়া অনেক দূর যাইতে যাইতে চাঁদ যে দেশে উঠে তথায় যাওয়া যায়; সে দেশে কি রকম লোক দেখিতে ইচ্ছা করে। নরেন বড় হইলে একবার যাবে, হেম তুমি সঙ্গে যেও।

বালকবালিকা কথা কহিতে থাকুক; আমরা এই অবসরে তাহাদের পরিচয় দিব। এই সংসারে বয়োবৃদ্ধ বালকবালিকারা গঙ্গার বালুকার ন্যায় ছার বিষয় লইয়া কিরূপ কলহ করে, চন্দ্রালোকের ন্যায় বৃথা আশার অনুগমন করিয়া কোথায় যাইয়া পড়ে তাহারই পরিচয় দিব। পরিচয়ে আবশ্যক কি? পাঠক, চারিদিকে চাহিয়া দেখ, জগতের বৃহৎ নাট্যশালায়

কেমন লোক-সমারোহ, সকলেই কেমন নিজ নিজ উদ্দেশ্যে ধাবমান হইতেছে! কে বলিবে, কি জন্য?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বুদ্ধিমান্ জমীদার।

নরেন্দ্রনাথের পিতা বীরেন্দ্রনাথ দত্ত ধনাঢ্য ও প্রতাপশালী জমীদার ছিলেন, ও ঐ গ্রামে প্রকাণ্ড অট্টালিকা সংস্থাপন করিয়া আপন নামানুসারে গ্রামের "বীরনগর" নাম দিলেন। তাঁহার যথার্থ সহৃদয়তার জন্য সকলে তাঁহাকে মান্য করিত, তাঁহার প্রবল প্রতাপের জন্য সকলে তাঁহাকে ভয় করিত, পাঠান জায়গীরদারগণ ও স্বয়ং সুবাদার তাঁহাকে মান্য করিত।

বাল্যকালে বীরেন্দ্র নবকুমার মিত্র নামক একটী দরিদ্রপুত্রের সহিত একত্র পাঠশালায় পাঠ করিতেন। নবকুমার অতিশয় সুশীল ও নম্র, ও সর্ব্বদাই তেজস্বী বীরেন্দ্রের বশম্বদ হইয়া থাকিত, সুতরাং তাহার প্রতি বীরেন্দ্রের স্নেহ জন্মাইয়াছিল। যৌবনকালে যখন বীরেন্দ্র জমীদারী স্থাপন করিলেন, নবকুমারকে ডাকাইয়া আপনার অমাত্য ও দেওয়ানপদে নিযুক্ত করিলেন। নবকুমার অতিশয় বুদ্ধিমান ও সুচতুর, সুশৃঙ্খলারূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। নবকুমার স্বার্থপর হইলেও অতিশয় মন্দলোক ছিলেন না, কৌশলক্রমে বীরেন্দ্রের দুই পাঁচখানি গ্রাম আপনার নামে করিলেন, কিন্তু ভয়ে হউক, কৃতজ্ঞতাবশতঃ হউক, বীরেন্দ্রের কার্য্যের অধিক হানি করেন নাই।

বীরেন্দ্রের মৃত্যুর সময় নরেন্দ্র অতি শিশু, জমীদারী ও পুত্রের ভার প্রিয় সুহৃদের হস্তে ন্যস্ত করিয়া বীরেন্দ্র মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

ভালবাসা যতদূর নাবে ততদূর উঠে না। অপত্যস্নেহের ন্যায় পিতৃস্নেহ বা মাতৃস্নেহ বলবান হয় না, দয়া অপেক্ষা কৃতজ্ঞতা দুর্ব্বল ও ক্ষণভঙ্গুর। নবকুমারের কৃতজ্ঞতা শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল।

নবকুমার অতিশয় গর্হিত লোক ছিলেন না, কিন্তু নবকুমার দরিদ্র, ঘটনাবলি বশতঃ সমস্ত জমীদারী প্রাপ্তির আশা তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হইল। সে লোভ, সে আশা দরিদ্রের পক্ষে দুর্দ্দমনীয়। বীরেন্দ্রের পুত্র অতি শিশু, বীরেন্দ্রের স্ত্রীর পূর্ব্বেই কাল হইয়াছিল, শিশুর বিষয় রক্ষা

করে এরূপ জ্ঞাতি কুটুম্ব কেহ ছিল না, দুই এক জন যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা নবকুমারের সহিত যোগ দিলেন। বীরেন্দ্রের বড় সংসারে অন্য কুটুম্বিনী বা আশ্রিতা যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা কিছুই জানিলেন না, অথবা অবলা, জানিয়া কি করিবেন?

তথাপি নবকুমার সমস্ত জমিদারী একাকী লইবেন প্রথমে এরূপ উদ্দেশ্য ছিল না। বীরেন্দ্রের জীবদ্দশায়ই দুই পাঁচ খানি গ্রাম আপন নামে করিয়াছিলেন, এখন আরও দুই পাঁচ খানি গ্রাম আপন নামে করিতে লাগিলেন। ক্রমে লোভ বাড়িতে লাগিল। ভাবিলেন আমার একমাত্র কন্যা হেমের সহিত নরেন্দ্রের বিবাহ দিব, অবশেষে বীরেন্দ্রের জমিদারী তাঁহার পুত্রেরই হইবে, এখন নাবালকের নামে জমিদারী থাকিলে গোলমাল হইতে পারে, সম্প্রতি আপন নামে থাকাতে বোধ হয়, কোন আপত্তি হইতে পারে না। এই প্রকাব চিন্তা করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

তৎকালে সুবাদারের সভাতে সকল প্রধান প্রধান জমিদার ও জায়গীর-দারের এক একজন উকীল থাকিত। তাহারা নিজ নিজ মনিবের পক্ষ হইতে মধ্যে মধ্যে নজর দিয়া সুবাদারেব মন তুষ্ট রাখিত, ও মনিবের পক্ষ হইতে আবেদন আদি সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। সদরে এইরূপে একটী একটী উকীল না থাকিলে জমিদারীর বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল, এমন কি জমিদারী হস্তান্তর হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল।

বীরনগর জমীদারীর উকীল এক্ষণে নবকুমারের বেতনভোগী, বঙ্গ-দেশের কানঙ্গু মহাশয়ের নিকট আবেদন করিলেন যে বীরেন্দ্রের মৃত্যু হইতে সে জমিদারীর খাজনা সুশৃঙ্খলারূপে আসিতেছে না, তবে নবকুমার নামে একজন কার্য্যদক্ষ লোক সেই জমীদারির ভার লইয়া আপন ঘর হইতে নিয়মিত খাজনা দিতেছে। নবকুমার বীরেন্দ্রের বিশেষ আত্মীয় লোক ও বীরেন্দ্রের সমস্ত পরিবারকে প্রতিপালন করিতেছে। এই আবেদনসহ পঞ্চ সহস্র মুদ্রা কানঙ্গু মহাশয়ের নিকট উপঢৌকন গেল। আবেদনের বিরুদ্ধে কেহ বলিবার ছিল না, তৎক্ষণাৎ বীরেন্দ্রের নাম খারিজ হইয়া নবকুমারের নাম লিখিত হইল। অদ্য নবকুমার মিত্র বীরনগরের জমীদার!

জমীদারের হৃদয়ে নূতন নূতন ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। যে নরেন্দ্রের পিতাকে পূর্ব্বে পূজা করিতেন, যে নরেন্দ্রকে এতদিন অতি যত্নে পালন করিয়াছিলেন, অদ্য সেই নরেন্দ্র তাঁহার চক্ষুর শূল হইল।

নবকুমারের সাক্ষাতে না হউক অসাক্ষাতে সকলেই বলিত, "নরেন্দ্রের বাপের জমীদারী," "নবকুমারের জমীদারী" কেহ বলিত না। গ্রামের প্রজারাও নরেন্দ্রকে দেখিয়া জমীদার-পুত্র বলিত, প্রকৃত জমীদার নব-কুমার কি এ সমস্ত সহ্য করিতে পারেন? তিনি চিন্তা করিতেন, "আমি কি অপবাদ বহন করিবার জন্যই এই জমীদারি করিলাম? পুনরায় নরেন্দ্রের সহিত বিবাহ হইলে কে না বলিবে পিতার জমীদারী পুত্রে পাইল, আমার নাম কোথায় থাকে? এতটা করিয়া কি পরিণামে এই ঘটিবে? আমি কি জমীদার হইয়াও বালকের দেওয়ান বলিয়া পরিগণিত হইব? কার্য্যেও কি তাহাও করিব, সযত্নে জমীদারী রক্ষা করিয়া পরে নরেন্দ্রকে ফিরাইয়া দিব?" বিচক্ষণ প্রগাঢ়মতি নবকুমার স্থির করিলেন যে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করা আবশ্যক, তিনি পোষ্যপুত্র লইবেন অথবা কোন দরিদ্রের সহিত আপন কন্যা হেমলতার বিবাহ দিবেন, তাহা হইলে সকলেই জানিবে হেমলতার বাপের জমীদারী জামাতা পাইয়াছে, বীরেন্দ্র ও নরেন্দ্র প্রজাবর্গের স্মৃতিপথ হইতে বহির্ভূত হইবে।

পণ্ডিতবর নবকুমার বিষয়পাণ্ডিত্যে এইরূপ সুন্দর সিদ্ধান্ত করিয়া কার্য্যসাধনে যত্নবান্ হইলেন। নিকটস্থ একটী গ্রামে গোকুলচন্দ্র দাস নামক এক জন ভদ্রলোক এক পুত্র ও এক বিধবা কন্যা ও অল্প সম্পত্তি রাখিয়া কালগ্রাসে পতিত হয়েন। পুত্রটীর নাম শ্রীশচন্দ্র দাস, কন্যার নাম শৈবলিনী। নবকুমার শ্রীশচন্দ্রকে বীরনগরে আনাইয়া লালনপালন করিতে লাগিলেন। শৈবলিনী শ্বশুরালয়ে থাকিত কখন কখন ভ্রাতাকে দেখিবার জন্য বীরনগরে আসিয়া দুই এক দিন বাস করিত। ভ্রাতা ভিন্ন বিধবার আর কেহই এ জগতে ছিল না।

বুদ্ধিমান নবকুমার দয়াশূন্য ছিলেন না, বীরেন্দ্রের জ্ঞাতি কুটুম্বকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দেন নাই, পরিচারিকারূপে তাহারা সকলেই আহারাদি ও কার্য্য করিত, ও দিবানিশি প্রকাশ্যে নবকুমারের গৃহিণীর সাধুবাদ ও খোসামোদ করিত, গোপনে বিধাতাকে নিন্দা করিত। বঙ্গদেশের অভাগিনীদের আর কি সাধ্য? নবকুমার নরেন্দ্রকে এখনও লালনপালন করিতেন, আপন অমাত্যবর্গের নিকট সর্ব্বদাই ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিতেন, "কি করি! বীরেন্দ্র জমিদারী বুঝিতেন না।—সমস্ত বিষয়টী খোয়াইয়া ছিলেন, পরের হাতে গেলে বীরেন্দ্রের পরিবার ও পুত্রের কষ্ট হয় সেই জন্য আমিই ক্রয় করিলাম, নচেৎ জমীদারিতে বিশেষ লাভ নাই। এখনও অনাথ নরেনকে আমিই লালন পালন করিতেছি, বীরেন্দ্রের

অনেকগুলি পরিবার, আমিই খাইতে পরিতে দিতেছি, কি করি, মানুষে কষ্ট পায় এতো আর চক্ষে দেখা যায় না। আর ভাবিয়া দেখ, ভগবান টাকা দিয়াছে কি জন্য? পাঁচ জনকে দিতেই সুখ, রাখিতে সুখ নাই, পরকে দিব, তাহাতে যদি আমার কিছু নাও থাকে সেও ভাল।" অমাত্যরা বলিত—"অবশ্য অবশ্য, আপনি মহাশয় লোক, আপনার দয়ার শরীর, সেই জন্যই এমন আচরণ করিতেছেন, অন্যে কি এমন করে? এইত এত জমীদার আছে, আপনি যতটা বীরেন্দ্রের পরিবারের জন্য করেন এত আর কে কাহার জন্য করে? আহা, আপনি না থাকিলে নরেন্দ্রকেই বা কে খাইতে দিত, অন্য অন্য লোককেই বা কে ভরণপোষণ করিত? তাহারা যে দুই বেলা দুই পেট খাইতে পায় সে কেবল আপনার অনুগ্রহে। আপনার মত পুণ্যবান লোক কি আর আছে?" হর্ষ-গদ্‌-গদ্‌-স্বরে ঈষৎ-হাস্য-বিস্ফারিত-লোচনে নবকুমার উত্তর করিতেন—"না বাপু, আমি পুণ্যও জানি না কিছুই জানি না, তবে লোকের দুঃখ দেখিয়া আমি থাকিতে পারি না, চিরকালই আমার এই রকম, আজ বীরেন্দ্রের পরিবার বলিয়া কিছু নূতন নহে, ইহাতে দোষ হয় আমি দোষী, পুণ্য হয় তাহাই"—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি নবকুমার অতিশয় গর্হিত লোক ছিলেন না। চাহিয়া দেখ, সকলেই নবকুমারকে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান লোক বলিয়া সমাদর করিতেছে; শুন, সকলেই তাহাকে দয়াশীল ব্রাহ্মণভক্তলোক বলিয়া সুখ্যাতি করিতেছে। অদ্যাপি নবকুমারের ন্যায় লোক লইয়া আমাদের সমাজ গর্ব্বিত রহিয়াছে, তাঁহাদের সর্ব্বস্থানে সমাদর, সর্ব্বস্থানে প্রশংসা, সর্ব্বস্থানে তাঁহাদের প্রভুত্ব! পাঠক, তোমার আমার কি অধিকার আছে যে তাঁহাকে অতিশয় গর্হিত লোক বলিব? তুমি আমি কে? তোমার জন্য কে খবর লইবে? মানী জ্ঞানী বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন নবকুমার মরিলে সমাজ শিরোমণি হারাইবে, সমাজে হুলস্থুল পড়িয়া যাইবে। যিনি সর্ব্বস্থানে আদৃত, সকলের মান্য, তোমার আমার কি অধিকার আছে তাঁহার নিন্দা করি?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনাথা বিধবা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি শৈবলিনী সন্ধ্যার সময় ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ধর্ম্মপরায়ণা শান্তচিত্তা বিধবা সন্ধ্যার পূজা সমাপ্ত করিয়া

বালকবালিকাগুলিকে লইয়া গল্প বলিতে বসিলেন। শৈবলিনী মাসে কি দুই মাসে একবার বীরনগরে আসিতেন। শৈবলিনী বড় গল্প করিতে পারিতেন। শৈবলিনীর সন্তানাদি নাই, সকল শিশুকেই আপনার বলিয়া মনে করিতেন; এই সমস্ত কারণে শৈবলিনী বালকবালিকাদিগের বড় প্রিয়পাত্র। শৈব আসিয়াছেন, গল্প করিতে বসিয়াছেন শুনিয়া সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকার সমস্ত বালকবালিকা একত্র হইল, কেহই শৈবলিনীর অনাদরের পাত্র ছিল না। কাহাকেও ক্রোড়ে, কাহাকেও পার্শ্বে, কাহাকেও সম্মুখে বসাইয়া শৈব মহাভারতের অমৃতমাখা গল্প করিতে লাগিলেন। আমরা এই অবসরে শৈবলিনীর বিষয় দুই একটী কথা বলিব।

শৈবলিনীর পিতা সামান্য সঙ্গতিপন্ন ও অতিশয় ভদ্রলোক ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র ও শৈবলিনী পিতার গুণগ্রাম ও মাতার ধীরস্বভাব ও নম্রতা পাইয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সে শৈবলিনী বিধবা হইয়াছিলেন, স্বামীর কথা মনে ছিল না, সংসারের সুখ দুঃখ প্রায় জানিতেন না, এ জন্মে চির-কুমারী বা চিরবিধবা হইয়া কেবল মাতার সেবা ও ছোট ভাইটীর যত্ন ভিন্ন আর কোন ধর্ম্ম জানিতেন না।

শৈবলিনীর পিতার মৃত্যুর পর তাহাদের অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে লাগিল, এমন কি অন্নের কষ্ট কাহাকে বলে অভাগা শৈবলিনী ও তাহার মাতা জানিতে পরিলেন। কিন্তু সেই শান্ত নম্র বিধবা একবারও ধৈর্য্যহীন হন নাই, অতি প্রত্যুষে উঠিয়া স্নান ও পূজাদি সমাপন করিয়া কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা বৃদ্ধমাতা ও শিশু ভ্রাতাকে ভরণপোষণ করিতেন। প্রত্যুষে প্রফুল্ল পুষ্পের ন্যায় প্রফুল্ল শৈবলিনী নিজ কার্য্য আরম্ভ করিতেন; শান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যাকালে শান্তচিত্তা বিধবা কার্য্য সমাপন করিয়া মাতার সেবায় ও শিশু ভ্রাতার লালনপালনে রত হইতেন। সেই কৃষ্ণকেশ-মণ্ডিত শ্যামবর্ণ নম্র বাক্যশূন্য মুখখানি ও আয়ত শান্তরশ্মি নয়ন দুইটী দেখিলে যথার্থই হৃদয় ভ্রাতৃস্নেহে আপ্লুত হয়, যথার্থই বোধ হয় যেন সায়ংকালের শান্তি ও নিস্তব্ধতায় শৈবলে আবৃত মুদিতপ্রায় শৈবলিনী মুখখানি নত করিয়া রহিয়াছে।

এ জগতে শৈবলিনী কিছুরই আকাঙ্ক্ষিণী নহে। বিধবা শৈবলিনী সহচর চাহে না, যে আম্রবৃক্ষ ও বংশবৃক্ষ শৈবলিনীর নম্র কুটীর চারিদিকে সস্নেহে মণ্ডিত করিয়া মধ্যাহ্নে ছায়া বর্ষণ ও সায়ংকালে মৃদুস্বরে গান করিত, তাহারাই শৈবলিনীর সহচর, তাহারাও যেমন প্রকৃতির সন্তান শৈবলিনীও সেইরূপ প্রকৃতির সন্তান; জগদীশ্বর তাহাদেরও ভরণপোষণ

করিতেন, অনাথা শৈবলিনীকেও ভরণপোষণ করিতেন। শৈবলিনী শৈশবে বিধবা কিন্তু প্রেমের আকাঙ্ক্ষিণী নহে, কেননা সমগ্র জগৎ শৈবের প্রেমের জিনিষ। বৃক্ষে বসিয়া যে কপোতকপোতিনী গান করিত, তাহারাও শৈবের প্রেমের পাত্র, তাহাদের সঙ্গে শৈব একত্রে গান গাইত, তাহাদের প্রত্যহ তণ্ডুল দিয়া পালন করিত। যখন বৃদ্ধ মাতাকে সেবাদ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারিত, তখনই শৈবলিনীর হৃদয় প্রেমরসে আপ্লুত হইত, মাতাকে সুখী দেখিলে শৈবের নয়ন যথার্থই আনন্দাশ্রুতে আপ্লুত হইত। যখন শিশু শ্রীশচন্দ্রকে ক্রোড়ে লইয়া চুম্বন করিত, সেই চুম্বনে যখন শিশু আহ্লাদিত হইয়া "দিদি" বলিয়া শৈবকে চুম্বন করিত, তখন যথার্থই শৈবের হৃদয় নাচিয়া উঠিত, অশ্রুতে বসন ভিজিয়া যাইত। আর যখন সায়ংকালে শান্ত নিস্তব্ধ নদীর প্রশস্ত বক্ষে চন্দ্রতারাবিভূষিত স্বর্গের প্রতিবিম্ব দেখিয়া সেই ভগবানের কথা মনে পড়িত, যিনি তারা, চন্দ্র, স্বর্গ, নদী করিয়াছেন, যিনি পক্ষিকে শাবক দিয়াছেন ও শৈবকে শ্রীশ দিয়াছেন, তখনই যথার্থ শৈবলিনীর হৃদয় অনন্ত প্রেমে সিক্ত হইত। শৈবলিনীর স্বামী বা পুত্র নাই, শৈবলিনীর প্রেমের একমাত্র ভাগী কেহ ছিল না, সুতরাং বর্ষাকালের নদী স্রোতের ন্যায় শৈবের স্নেহবারি চারিদিকে বহিয়া যাইত। গ্রামের সমস্ত বালক-বালিকাকে শৈব বড় ভালবাসিত, শৈব অনাথা দরিদ্রদিগের সমদুঃখিনী। পশুপক্ষীও শৈবের প্রেমের ভাগী, জগতে শৈবলিনীর ন্যায় প্রেমিক আর কে আছে? জগৎ যেরূপ বিস্তারিত, সমুদ্র যেরূপ গভীর, আকাশ যেরূপ অনন্ত, শৈবলিনীর প্রেম সেইরূপ বিস্তারিত, গভীর, অনন্ত।

এইরূপে কিছুকাল বিগত হইলে শৈবলিনীর মাতার কাল হইল। ধীরস্বভাব, রূপবান, ভদ্রবংশজাত শ্রীশচন্দ্রকেও নবকুমার আপন কন্যার সহিত বিবাহ দিবার ইচ্ছায় বীরনগরে লইয়া গেলেন; যাহাদের জন্য শৈবলিনী শ্বশুরগৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহারা না থাকায় শৈবলিনী পুনরায় শ্বশুরালয়ে গেলেন ও তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনার পরদিন প্রাতে শৈবলিনী সজলনয়নে শ্রীশচন্দ্রের নিকট বিদায় লইয়া শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বালিকা কাহার?

পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনাবলির পর পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত হইল। পাঁচ বৎসরে কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, পাঠক মহাশয় তাহা অনুভব করিতে পারেন।

শ্রীশচন্দ্র এক্ষণে সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমের যুবক, ধীর, শান্ত, বিচক্ষণ, ধর্ম্মপরায়ণ। তাঁহাব প্রশস্ত উদার সুন্দর মুখমণ্ডল ও উন্নত অবয়ব দেখিলেই তাঁহার গম্ভীর প্রকৃতি, ও স্থির বুদ্ধি জানিতে পারা যায়।

নরেন্দ্র পঞ্চদশ বর্ষের উগ্র যুবা, শ্রীশ অপেক্ষাও উজ্জ্বল, গৌরবর্ণ, উন্নতকায় ও তেজস্বী, কিন্তু অতিশয় উগ্র, ক্রোধপরবশ ও অসহিষ্ণু। নবকুমারের ঘৃণা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, শ্রীশচন্দ্রের যথার্থ গুণের কথাও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, সর্ব্বদাই তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিত। এখন পর্য্যন্ত যে তিনি এ সমস্ত সহ্য করিয়াছিলেন সে কেবল হেমলতার জন্য। মরুভূমিতে একমাত্র প্রস্রবণের ন্যায় হেমলতার অমৃতমাখা কথা ও অমৃতমাখা মুখখানি নরেন্দ্রের উত্তপ্ত হৃদয় শান্ত ও শীতল করিত। হেমলতার জন্য নবকুমাবের তিরস্কারও সহ্য করিতেন, আপন বিজাতীয় ক্রোধও সম্বরণ করিতেন।

হেমলতা ত্রয়োদশ বর্ষের বালিকা। আকাশে প্রথম উষাচিহ্নের ন্যায় প্রথম যৌবনচিহ্ন হেমলতাব শরীরে প্রকাশ পাইতেছে। নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাশি লম্বমান হইয়া বক্ষঃস্থল ও গণ্ডস্থল আবরণ কবিতেছে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ যৌবনারম্ভে অধিকতর উজ্জ্বল আভায় প্রকাশ পাইতেছে। উজ্জ্বল, কৃষ্ণ, আয়ত নয়ন দুইটী বাল্যকালসুলভ চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ধীর ও শান্ত ভাব ধারণ করিতেছে, সমস্ত অবয়ব ও ব্যবসায় ক্রমে গম্ভীর ভাব ধারণ করিতেছে।

সেই সুগঠিত, কুসুম-বিনিন্দিত শরীরে কি নব নব ভাব প্রবেশ করিয়াছে তাহা বর্ণনায় আমরা অক্ষম, তবে হেমলতার আচরণে যাহা লক্ষিত হয় তাহাই বলিতে পারি। হেম এখনও নবেন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্ত্তা করিতে বড় ভালবাসে, তথাপি নরেন্দ্র নিকটে আসিলে এক একবার হেমের হৃদয় সহসা বিচলিত হয়, লজ্জাবিহ্বলা বালিকা মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কথা কহে, ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের মুখের দিকে নয়ন উঠাইয়া আবার মস্তক

অবনত করে। আহা! সেই আয়ত প্রশান্ত নয়ন দুইটী নরেন্দ্রের মুখের উপর চাহিতেই বড় ভালবাসে, সেই বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় নরেন্দ্রের কথা ভাবিতে বড় ভালবাসিত। হেম বালিকা, হেম কিছু জানে না, কিন্তু যখন সায়ংকালে নরেন্দ্র নৌকা আরোহণ করিয়া গঙ্গার প্রশস্ত বক্ষে ইতস্ততঃ বিচরণ করেন, বালিকা কেন গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া স্থিরনয়নে সেই দেবমূর্ত্তি আলোচনা করে? যখন নৌকা অনেক দূর ভাসিয়া যায়, সন্ধ্যার অপরিস্ফুট আলোকে যতদূর দেখা যায়, বালিকা সজলনয়নে কেন সেই গঙ্গার অনন্ত স্রোত নিরীক্ষণ করে? যখনই নরেন্দ্র "হেম" বলিয়া কথা কহিতে আইসে, তখনই কি জন্য সেই আনন্দদায়ী শব্দে হেমের হৃদয় ঈষৎ স্ফীত হইয়া উঠে? যখন দুই একদিনের জন্যও নরেন্দ্র ভিন্ন গ্রামে গমন করেন, কেন প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে হেম অন্যমনা হইয়া থাকে?

তথাপি হেমের মনের কথা কেহ জানে না। কপোতিনী যেরূপ আপন শাবকটীকে অতি যত্নে কুলায় লুকাইয়া রাখে, বালিকা এই নূতন ভাবনাটীকে অতি সঙ্গোপনে হৃদয়ের হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিত। অগ্নি যেরূপ বস্ত্রাবৃত হইলে সেই সমস্ত বস্ত্রকে অগ্নিময় করে, নরেন্দ্রের চিন্তা হেমের হৃদয়ে লুক্কায়িত হইয়া হৃদয়কে নরেন্দ্রময় করিল! তথাপি বালিকা এই ভাব প্রকাশ হইতে দেয় নাই; যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই সঙ্গোপনের যত্ন অধিক হইতে লাগিল।

বৃদ্ধ নবকুমার হেমকে এখনও বালিকা মনে করিতেন, সেই বালিকার উদার সরল মুখখানি দেখিলে কেনই বা না মনে করিবে? বিবাহ দিলে একমাত্র কন্যা পরের হইবে, এই ভয়ে যতদিন পারিলেন বিবাহ না দিয়া রাখিলেন। বুদ্ধিমান শ্রীশচন্দ্রও হেমের হৃদয়ের পরিচয় পাইলেন না, কিরূপেই বা পাইবেন? হেম তাঁহার সহিত অকপটে সরল হৃদয়ে সর্ব্বদাই নিঃসঙ্কোচে কথা কহিত। নরেন্দ্রের সহিত সঙ্কুচিতভাবে কখন কখন কথা কহিত। শ্রীশচন্দ্রের নিকট হেম প্রত্যহ কিছু কিছু পড়িতে শিখিত, পাঠ বলিয়া লইত, পড়া হইলে পড়া দিত, যত্নের সহিত শ্রীশচন্দ্রের উপদেশবাক্য গ্রহণ করিত। নরেন্দ্র পড়াইতে আসিলে বালিকা মন স্থির করিতে পারিত না, নরেন্দ্র পড়া লইতে আসিলে বালিকা কিছুই বলিতে পারিত না, সমস্ত ভুলিয়া যাইত। সংসারকার্য্যের তাবৎ ঘটনাই হেম শ্রীশচন্দ্রের নিকট বলিত, শ্রীশের উপদেশ ভিন্ন কোন কার্য্য করিত না। নরেন্দ্র উপদেশদাতা নহেন, নরেন্দ্র আসিলে অন্য কথা হইত

অথবা অনেক সময়ে কথা হইত না। শ্রীশ কেন না মনে করিবেন যে বালিকার হৃদয়ে যেটুকু প্রণয় বা স্নেহ আছে তাহা শ্রীশকেই অবলম্বন করিয়াছে ; বালিকা কাহার প্রণয়িণী ? শ্রীশচন্দ্রের না নরেন্দ্রের ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

এইরূপে কিছু কাল অতিবাহিত হইল। একদিন সায়ংকালে শ্রীশ ও নরেন্দ্র একখান নৌকায় আরোহণ করিয়া গঙ্গায় বিচরণ করিতেছিলেন। নরেন্দ্র আপন বলপ্রকাশ অভিলাষে দাঁড়ীকে উঠাইয়া দিয়া দুই হস্তে দুইটী দাঁড় ধারণ করিয়া নৌকা চালাইতেছিলেন, শ্রীশ স্থিরভাবে বসিয়া প্রকৃতির সায়ংকালীন শোভা দর্শন করিতেছিলেন। শ্রীশ ও নরেন্দ্রের মধ্যে কখনই যথার্থ প্রণয় ছিল না, অদ্য অল্প কথা লইয়া তর্ক হইতে লাগিল। নরেন্দ্রের হস্ত হইতে সহসা একটী দাঁড় স্খলিত হওয়াতে নরেন্দ্র পড়িয়া গেলেন, শ্রীশ উচ্চ হাস্য হাসিয়া বলিলেন, "যাহার কায তাহাকে দাও, বীরত্বে আবশ্যক নাই।" সেই সময়ে নৌকা গঙ্গার মধ্যস্থলে, তীরস্থ অট্টালিকা হইতে হেমলতা দেখিতেছিল। হেমলতার সম্মুখে অপদস্থ হইয়া নরেন্দ্র মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহার উপর শ্রীশের রহস্য কথা সহ্য হইল না, তিনি অতিশয় কঠোর উক্তিতে প্রত্যুত্তর করিলেন। তর্ক বাড়িতে লাগিল, অল্প বিষয় লইয়া কখন কখন বিষম বিবাদ হয়, অদ্য তাহাই ঘটিল। শ্রীশ প্রকৃতিসুলভ ধৈর্য্যসহকারে ধীরে ধীরে তর্ক করিতেছিলেন, নরেন্দ্র স্বভাবতঃ অধীর ; শ্রীশের ধৈর্য্য দেখিয়া আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি অতি শীঘ্র অগ্নিবৎ ক্রোধ-প্রজ্জলিত হইয়া উঠিলেন ও অতিশয় অন্যায় কটু ভাষায় শ্রীশকে তিরস্কার করিলেন। শ্রীশ এবার কষ্টে ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন, "তোমার মত নীচাশয় অভদ্র লোকের সহিত কলহ করিলেও অপমান আছে ;" এইমাত্র বলিয়া নিস্তব্ধ হইয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিলেন। নরেন্দ্রের ললাটে শিরা স্ফীত হইল, নয়ন প্রজ্জলিত হইল, নিস্তব্ধ হইয়া শ্রীশের দিকে পরুষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। চিন্তা করিতে করিতে সহসা শ্রীশকে প্রহার করিতে উঠিলেন। নৌকায় জল ছিল, পদস্খলন হইয়া নরেন্দ্র সজোরে নৌকায় পতিত হইলেন ও তথা হইতে প্রায় সংজ্ঞাশূন্যভাবে

গড়াইয়া জলে পতিত হইলেন। নৌকার কাঠে তাঁহার মস্তক আহত হওয়ায় তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিলেন।

উদারচিত্ত শ্রীশচন্দ্র তখন ক্রোধ বিস্মরণ হইয়া দাঁড়ীদিগের পূর্ব্বেই স্বয়ং জলে পড়িলেন ও অনেক যত্নে মুমূর্ষু নরেন্দ্রকে পুনরায় নৌকায় উঠাইলেন। যত্নে তাঁহার চৈতন্য সাধন করিয়া ভ্রাতৃ-সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কেন ভাই আমাদের মধ্যে বিরোধ হয়, তোমার সহিত কলহ করি আমার ত এমন ইচ্ছা নহে, তবে তুমি কেন আমার সহিত কলহ করিতে ভালবাস ?" এই স্নেহসূচক বাক্যেও গর্ব্বিত নরেন্দ্রের মনস্তুষ্টি হইল না। যে শ্রীশচন্দ্রকে সকলেই সুখ্যাতি করে, যে শ্রীশচন্দ্রকে তিনি বোধ হয় সেই জন্যই দেখিতে পারেন না, সেই শ্রীশচন্দ্র যে তাঁহার অদ্য জীবন রক্ষা করিয়াছে এই চিন্তায় তাঁহার অতিশয় আত্মঘৃণা হইল। তিনি কোন কথা কহিলেন না।

অতি সামান্য বিষয় হইতে কখন কখন বিষম ঘটনা হইয়া থাকে। শ্রীশের সঙ্গে সামান্য কলহ নরেন্দ্রের বিষম দুঃখের কারণ হইয়া উঠিল। সেই দিন সায়ংকালে নবকুমার নরেন্দ্রকে ডাকাইয়া যথোচিত তিরস্কার করিলেন ও বলিলেন—

"শ্রীশচন্দ্রের সহিত কলহ করিতে তোমার লজ্জা হয় না, জাননা তুমি কে আর শ্রীশ কে ? তুমি কি শ্রীশের সমান ?"

নরেন্দ্র হেমলতাকে স্মরণ করিয়া অনেক সহ্য করিয়াছিলেন, অদ্য আর সহ্য করিতে পারিলেন না ; ক্রোধকম্পিতস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন—

"আমি শ্রীশের সমান নহি। আমি জমীদার বীরেন্দ্রের পুত্র, শ্রীশ পথের কাঙ্গালী, পরের অন্নে পালিত। তাহার সমান আমি কিরূপে ?"

নবকুমার এরূপ উত্তর কখন শুনেন নাই, বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—

"কাহার সহিত কথা কহিতেছ জান ?" নরেন্দ্র বলিলেন, "জানি, যে দরিদ্র সন্তান আমার পিতাকর্তৃক পালিত হইয়া কালসর্পের ন্যায় তাঁহাকে দংশন করিয়াছে, এক্ষণে তাঁহার বিষয়টী লইবার চেষ্টা করিতেছে, সেই বিষম প্রবঞ্চকের সহিত কথা কহিতেছি।" নরেন্দ্রের চক্ষু হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল।

নবকুমার এক মুহূর্ত্তের জন্য নিরুত্তর হইলেন। কি বিষয় তাঁহার স্মরণ হইতেছিল, কি ভাব উদয় হইতেছিল, বলিতে পারি না ; কিন্তু বুদ্ধিমান্ নবকুমার শীঘ্র সে ভাব সঙ্গোপন করিয়া কর্কশস্বরে বলিলেন—

"কৃতঘ্ন বালক! তোর পিতা নিজ দোষে জমিদারী হারাইয়াছে, অনাথকে এত দিন পালন করিলাম তাহার এই ফল! অদ্যই আমার বাড়ী হইতে দূর হ।"

"চলিলাম! কিন্তু যদি ইহজন্মে কি পরজন্মে বিচার থাকে, নবকুমার! তুমি তাহার ফলভোগ করিবে।" নরেন্দ্র সরোষে গৃহের বাহিরে আসিলেন।

সায়ংকালে গঙ্গাতীরে হেমলতা একাকী বিচরণ করিতেছিল। যে যে ঘটনা হইয়াছিল, হেমলতা সমস্ত শুনিয়াছিল। হেমলতাকে দেখিয়া নরেন্দ্র একবার দাঁড়াইলেন। সহসা তাঁহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, রক্তবর্ণ চক্ষুতে এক বিন্দু জল আসিল। ধীরে ধীরে হেমলতার হাত দুইখানি ধরিয়া কম্পিত গদ্‌গদ্ স্বরে বলিলেন, "হেমলতা, আমি জন্মের মত চলিলাম, বিদায় দাও।" সহসা বজ্রাহত তরুর ন্যায় হেমলতা ভূতলে পড়িয়া গেল।

নবকুমার এই ব্যাপার দেখিয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া কয়েকজন ভৃত্য সঙ্গে লইয়া আসিয়া নরেন্দ্রকে দূর করিয়া দিবার আদেশ দিলেন। ক্রোধে নরেন্দ্রের ললাটে শিরা স্ফীত হইতে লাগিল, নবকুমারের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি মুহূর্ত্ত পরেই পিতার গৃহ জন্মের মত ত্যাগ করিব; কিন্তু এই মুহূর্ত্ত আমাকে বিরক্ত করিও না, আমার নিকট আসিও না। আমার জ্ঞান নাই, উন্মত্তের নিকট আসিও না।" নরেন্দ্রের স্বর স্থির ও গম্ভীর, নবকুমার সেই ভীষণ আকৃতি দেখিয়া অগত্যা একটু সরিয়া গেলেন।

নরেন্দ্র ধীরে ধীরে হেমলতাকে তুলিয়া বলিলেন, "হেমলতা, কাঁদিও না, সমস্ত জীবন কাঁদিবার সময় আছে, একবার আমার কথা শুন—

"আমি আজি জন্মের মত চলিলাম। কোথায় যাইতেছি, কি করিব, তাহা আমি জানি না, কিন্তু সে চিন্তা করি না; জগতে লক্ষ লক্ষ প্রাণী রহিয়াছে, আমারও থাকিবার স্থান হইবে।

"কিন্তু এই জনাকীর্ণ জগতে আমি অদ্য হইতে একাকী। নানা দেশে নানা স্থানে অনেক লোক দেখিব, সকলেই সমাজমধ্যে, বন্ধুবর্গ মধ্যে, গৃহ মধ্যে বাস করিতেছে, তাহার মধ্যে আমি বন্ধুশূন্য, গৃহশূন্য, একাকী। জীবনে নরেন্দ্রকে আপনার ভাবিবে এরূপ লোক নাই, নরেন্দ্রের মৃত্যুকালে শোক করিবে এরূপ লোক নাই।"

হেমলতার চক্ষুজলে বস্ত্র ও শরীর সিক্ত হইয়াছিল, এক্ষণে আর না থাকিতে পারিয়া চীৎকার শব্দে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। নরেন্দ্রের চক্ষু উজ্জ্বল, কিন্তু জলশূন্য; আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—

"হেম, ক্ষণেক স্থির হও, কাঁদিও না, আমি এক্ষণে কাঁদিতে পারি না। আমার মনে যে ভাব হইতেছে তাহা ক্রন্দনে ব্যক্ত হয় না। হেম, তুমি আমাকে ভালবাস, জগতের মধ্যে তুমি এক একবার নরেন্দ্রের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখিতে, নরেন্দ্রের বিষয় সস্নেহচিত্তে ভাবিতে; কিন্তু নরেন্দ্র তোমাকে কিরূপ গাঢ় প্রণয়ের সহিত ভালবাসিত, অন্ধকার, সুখশূন্য, জীবন-আকাশের মধ্যে একটী প্রণয়-তারার প্রতি কিরূপ সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিত, তাহা হেমলতা জান না; রমণীর হৃদয় সে ভাব ধারণ করিতে পারে না। কিন্তু এ স্বপ্ন অদ্য সাঙ্গ হইল, জীবনের একমাত্র আলোক অদ্য নির্ব্বাণ হইল, অদ্য হইতে অন্ধকারে দেশে দেশে অরণ্যে অরণ্যে যাবজ্জীবন পরিভ্রমণ করিব।"

নরেন্দ্র ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—

"আমার এই দশা হইবে তাহা আমি অনেক দিন অবধি জানিতাম, আমাকে গৃহত্যাগ করিতে হইবে জানিতাম। শ্রীশচন্দ্রের সহিত তোমার পিতা তোমার বিবাহ দিবেন তাহা জানিতাম, সে জন্য প্রস্তুত হইতে চেষ্টা করিয়াছি।" নিস্তব্ধ হইয়া ক্ষণেক ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন; একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, যেন সর্ব্বসহ হৃদয়ও অদ্য বিদীর্ণ হইতেছে। ক্ষণেক পর অতি ধীরে অকম্পিত স্বরে বলিলেন—

"হেমলতা, আমার আর একটী কথা আছে। বাল্যকালে আমরা দুইজনে এই মাধবীলতাটী পুতিয়াছিলাম, আমাদের ভালবাসার ন্যায় লতাটী বাড়িয়াছে, আজ আর ইহার থাকিবার আবশ্যক কি?" নরেন্দ্র ধীরে ধীরে সেই লতাটী উৎপাটন করিলেন, ও তদ্দ্বারা একটী কঙ্কণ প্রস্তুত করিলেন, ও ধীরে ধীরে হেমলতাকে তাহা পরাইয়া দিয়া বলিলেন—

"ফুল যত শীঘ্র শুকায়, লতা তত শীঘ্র শুকায় না; হেম, বোধ হয় তুমিও আমাকে কিছুদিন স্মরণ রাখিবে। যদি রাখ, যত দিন নরেন্দ্রের জন্য তোমার স্নেহ থাকিবে, তত দিন এই মাধবী-কঙ্কণটী রাখিও, যখন অভাগাকে ভুলিয়া যাইবে, জাহ্নবীজলে শুষ্কলতা ফেলিয়া দিও।"

শোকবিহ্বলা দগ্ধহৃদয়া হেমলতা বিস্মিত হইয়া নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখিল, নরেন্দ্র স্থির, নরেন্দ্রের স্বর গম্ভীর ও অকম্পিত, নরেন্দ্রের চক্ষুতে জল নাই; কিন্তু অগ্নি জ্বলিতেছে। একি! নরেন্দ্র কি উন্মত্ত হইয়াছে?

ধীরে ধীরে হেমের হাত ছাড়িয়া নরেন্দ্র চলিয়া যাইলেন, হেম আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল।

নরেন্দ্র গৃহত্যাগী। নরেন্দ্র কোন্ দিকে যাইবেন? সম্মুখে সায়ংকালীন গঙ্গা প্রশস্ত বক্ষঃ বিস্তার করিয়া নরেন্দ্রকে আহ্বান করিতেছেন। গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া নরেন্দ্র হেমের ক্রন্দন শুনিতে পাইলেন, কিন্তু ফিরিলেন না, কেবল একবার আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "উঃ! আর সহ্য হয় না!" গঙ্গার বিশাল বক্ষে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সংসারে একাকিনী।

সায়ংকালীন অন্ধকারাচ্ছন্ন গঙ্গাতীরে বসিয়া একটী ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা অসংখ্য উর্ম্মিরাশির দিকে কি জন্য চাহিয়া রহিয়াছে? যতদূর অন্ধকারে দেখা যায়, বীচিমালা উঠিতেছে, নাবিতেছে, পড়িতেছে; তাহার পর একটী ঈষৎ ধূসর রেখা, তাহার পর আর অন্ধকারে দেখা যায় না। দেখিতে, দেখিতে, দেখিতে, হেমের চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল, তথাপি হেম কিছু দেখিতে পাইল না। সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিল, ক্রমে আকাশে তারা ফুটিতে লাগিল, তথাপি হেমের অনুসন্ধান শেষ হইল না; আকাশের তারার মধ্যে হেমলতা নয়নতারাটী দেখিতে পাইল না; গঙ্গার বিপুল বারিতে হেমের হৃদয়টী ভাসিয়া গিয়াছে, তাহা আর পাইল না।

রজনীতে জমিদারের বাড়ীর সকলে নিদ্রিত হইলেন; জগৎ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। হেমলতার পক্ষে সে রজনী কি ভীষণ! বালিকা ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিয়া গবাক্ষের নিকট আসিল; ধীরে ধীরে গবাক্ষ উদ্ঘাটন করিয়া বাহিরে দেখিল। দেখিল তারা-পরিপূর্ণ অন্ধকার আকাশের নীচে বিশাল গঙ্গা অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। উঃ! সেই নৈশগঙ্গার দিকে দেখিতে দেখিতে কি হৃদয়বিদারক ভাব হেমলতার হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল। বাল্যকালের ক্রীড়া, কিশোর বয়সের প্রথম ভালবাসা, কত কথা, কত বিষয়, একে একে জাগরিত হইয়া বালিকাহৃদয় দলিত করিতে লাগিল। এক একটী কথা মনে হয় আর হৃদয়ে দুঃখ উথলিয়া উঠে, অবিরল অশ্রুধারায় চক্ষু ও বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যায়। আবার বালিকা শান্ত হইয়া গঙ্গার দিকে দেখে, আবার একটী

কথা স্মরণ হয়, আবার শোকবিহ্বলা হইয়া অজস্র রোদন করে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বালিকা অবসন্ন হইল, হায় সে ক্রন্দনের শেষ নাই, সে ক্রন্দন অবারিত, অশান্তিপ্রদ। রজনী একপ্রহর, দ্বিপ্রহর হইল, তথাপি বালিকা গবাক্ষের নিকট দণ্ডায়মানা, অথবা ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া নীরবে রোদন করিতেছে।

শোকের প্রথম বেগের উপশম হইল; কিন্তু শোকচিন্তাপরম্পরা নিবারণ হইবার নহে। গণ্ডস্থলে হাত দিয়া একাকিনী গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া হেমলতা ভাবিতে লাগিল। এক একবার হেমলতার নয়নে এক বিন্দু জল আসিতে লাগিল, ধীরে ধীরে সেটী গড়াইয়া পড়িল, আবার একটী বিন্দু জড় হইতে লাগিল। সে বিন্দুপরম্পরা শুকায় না, সে চিন্তা-পরম্পরা শেষ হয় না।

রজনী শেষ হইল, পূর্ব্বাকাশে রক্তিমাচ্ছটা দেখা যাইতে লাগিল, মলিনা বালিকা তখনও গণ্ডে হস্ত দিয়া গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া আছে। তখনও চিন্তাসূত্র শেষ হয় নাই, জীবনে কি শেষ হইবে?

দিবা হইল, প্রথম সূর্য্যালোকে হেমলতা চকিত হইয়া উঠিল। চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট, বদনমণ্ডল মলিন, শরীর অবসন্ন। ধীরে ধীরে বালিকা গবাক্ষপার্শ্ব হইতে উঠিল, শূন্যহৃদয়ে শূন্যগৃহে গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

সেই কি এক দিন? দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে, বালিকা সেই গবাক্ষপার্শ্বে বসিত। যে গঙ্গায় নরেন্দ্র ভাসিয়া গিয়াছে সেই গঙ্গার দিকে দেখিত। প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে, গম্ভীর রজনীতে শূন্যহৃদয়া বালিকা সেই গঙ্গার দিকে চাহিয়া থাকিত। কত ভাবিত, কত কথা মনে আসিত কে বলিবে? এক দিন নরেন্দ্রনাথ হেমের কাণে কাণে কি বলিয়াছিল, এক দিন ওপার হইতে হেমের জন্য কি আনিয়াছিল, এক দিন গাছ হইতে আম্র পাড়িয়া হেম ও নরেন লুকাইয়া খাইয়াছিল, এক দিন পিতাকে না বলিয়া হেম সন্ধ্যার সময় নরেনের সহিত নৌকায় চড়িয়াছিল, এক দিন হেম নরেনকে ফুলের মালা পরাইয়া দিয়াছিল, এক দিন নরেন হেমের কেশে ফুল দিয়া সাজাইয়া দিয়াছিল; সহস্র সহস্র কথা একে একে নদীজলের হিল্লোলের ন্যায় হেমের হৃদয়ে উঠিত। দ্বিপ্রহর হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত, কখন কখন সন্ধ্যা হইতে গভীর রজনী পর্য্যন্ত হেমলতা ভাবিত, এক একবার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইত, পাছে কেহ দেখিতে পায় এই ভয়ে বালিকা জল মুছিয়া ফেলিত। নবকুমারের বিপুল সংসারের সে দুঃখের ভাগিনী কে হইবে? হেম কাহাকেও মনের কথা মুখ ফুটিয়া

বলিত না। বালিকা সকলের নিকটেই সঙ্গোপন করিত, বাড়ীর লোকদিগের নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া ভাবিত; কখন কখন শোক-পারাবার উথলিলে গোপন করিতে পারিত না; নয়ন হইতে অবিরল বারিধারা বহিত।

ক্রমে বসন্তকালের পর গ্রীষ্মকাল আসিল; প্রকৃতি বঙ্গদেশকে সুস্বাদু ফল, সুদৃশ্য ফুল, সুকণ্ঠপক্ষী দ্বারা পরিপূর্ণ করিল। নবপল্লবিত বৃক্ষগণ সুমন্দ বায়ুতে মধুর গান করিতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সুন্দর পক্ষিগণ আনন্দে গান করিয়া নিজ নিজ কুলায় নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। মধ্যাহ্নে ছায়াপ্রদায়ী বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া পত্রের মর্ম্মর শব্দ শুনিয়া পক্ষিশাবক ও পক্ষিদম্পতীর দিকে চাহিয়া বালিকা হস্তে গণ্ড দিয়া চিন্তা করিত; যতক্ষণ না সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া সেই বৃক্ষাবলী আবৃত করিত, হেমলতার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইত না। তাহার পর বর্ষা আসিয়া সমস্ত দেশ প্লাবিত করিল, কৃষকগণ আনন্দে ধান্য কাটিতে লাগিল, গ্রামে, গৃহে, গোলায় ধান পরিপূর্ণ হইল। জগৎ আনন্দিত হইল, কিন্তু হেমের নিরানন্দ হৃদয় শান্ত হইল না। সুন্দর আশ্বিন মাসে জল সরিয়া গেল, গ্রীষ্ম কমিয়া গেল, আকাশ পরিষ্কার হইল, কিন্তু হেমলতার হৃদয়াকাশ তমসাচ্ছন্ন, হেমলতা একাকিনী ম্লান বদনে সেই অম্লান শরচ্চন্দ্র নিরীক্ষণ করিত। একাকিনী নিরীক্ষণ করিত, একাকিনী ভ্রমণ করিত, একাকিনী চিন্তা করিত। আবার শীতকাল আসিল, আনন্দে কৃষকগণ আবার ধান কাটিল, আনন্দে সংসারী, গৃহস্থ, ধনী, কাঙ্গালী সকলেই পৌষপার্ব্বণ করিল, হেমলতার পার্ব্বণের দিন কি ইহ জন্মে আর আসিবে? আবার বসন্তকালে বৃক্ষলতা নবপল্লবে সুন্দর কান্তি ধারণ করিল; সহকার বৃক্ষ মুকুলিত ও মুঞ্জরিত হইল, হেমলতার শুষ্কহৃদয় কি ইহ জন্মে মুঞ্জরিত হইবে?

নবকুমারের বিপুল সংসার। কাহারও কিছু ক্ষোভ নাই, অভাব নাই, দুঃখ নাই। সেই সংসারে স্নেহপালিতা একমাত্র দুহিতা বিষণ্ণা কেন? বিপুল সংসারেও হেমলতা একাকিনী!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জগতে একাকী।

নরেন্দ্র অতিশয় সন্তরণপটু, বাল্যকাল অবধি তিনি সন্তরণ অতিশয় ভাল বাসিতেন। অনায়াসে সন্ধ্যার সময় গঙ্গা পার হইয়া অপর পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে অনেক দূর পর্য্যন্ত কেবল বালুকা, তাহার পর কেবল অনন্ত প্রান্তর দেখা যাইতেছে। নরেন্দ্র সেই অন্ধকার নিশীথে সেই সিক্তশরীর ও সিক্তবস্ত্রে সেই বালুকাক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্র গঙ্গার অপরপার্শ্বের দিকে দৃষ্টি করিলেন। অন্ধকারেও শ্বেত বীরনগরের প্রাসাদ ঈষৎ দৃষ্ট হইতেছে, নরেন্দ্র সেই দিকে দেখিলেন, আবার চক্ষু ফিরাইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন, আবার স্থির হইয়া সেই দিকে চাহিলেন। তাঁহার হৃদয়ে কি ভাব হইতেছিল জানি না। নিস্তব্ধ অন্ধকারে গঙ্গার কল কল শব্দ শুনা যাইতেছে, সময়ে সময়ে পেচকের ভীষণ রব শুনা যাইতেছে, আর এক একবার দূরে শৃগালের কোলাহল শ্রুত হইতেছে। নরেন্দ্র গঙ্গা দেখিতেছিলেন না, নরেন্দ্র পেচক বা শৃগালের ধ্বনি শুনিতেছিলেন না, তিনি নিঃশব্দে অন্ধকারে বিচরণ করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পর আবার বীরনগরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ঘোর অন্ধকারে আর সে গৃহ দেখা যায় না; নরেন্দ্র একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ফিরিলেন। সম্মুখে যে পথ পাইলেন সেই দিকে চলিলেন।

কোথায় যাইতেছেন, নরেন্দ্র জানেন না; উপরে অসীম গগন, নীচে অসীম প্রান্তর, নরেন্দ্রের চিন্তাও অসীম ও অনন্ত, নরেন্দ্র যে দিকে পাইলেন চলিলেন। পথপার্শ্বে বটবৃক্ষ হইতে নিশাচর পক্ষী নরেন্দ্রকে দেখিয়া কুলায় ছাড়িয়া পলায়ন করিল, নিশাবিহারী শৃগালপাল নরেন্দ্রকে দেখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; নরেন্দ্র তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। নরেন্দ্র চলিলেন।

অনেক দূর যাইয়া একটী গ্রামে আসিলেন। গ্রাম নিস্তব্ধ, সকলেই সুপ্ত। কৃষ্ণবর্ণ বৃক্ষশ্রেণীর নীচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছে, ও বৃক্ষপত্র মধ্যে কোন কোন স্থানে খদ্যোৎমালা ঝিকৃমিক্ করিতেছে। নরেন্দ্রকে দেখিয়া গ্রাম্য কুকুর শব্দ করিতে লাগিল, দুই এক জন গৃহস্থ

ঘরের দ্বার খুলিয়া চাহিয়া দেখিল, নরেন্দ্র কোন দিকে চাহিলেন না, পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। গ্রামের পথ ঠিক জানেন না, স্থানে স্থানে বৃক্ষের নীচে ও ঝোপের ভিতর দিয়া যাইতে নরেন্দ্রের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইল। নরেন্দ্র গ্রাহ্য করিলেন না; কতক্ষণে গ্রাম পার হইয়া আবার এক প্রান্তরে পড়িলেন।

আবার প্রান্তর পার হইলেন, অন্য গ্রামে পড়িলেন, আবার নিঃশব্দে গ্রাম পার হইয়া গেলেন। সেই ভীষণ রজনী-যোগে কত গ্রাম অতিক্রম করিলেন, কতদূর যাইলেন জানি না, নরেন্দ্রও বলিতে পারেন না।

সমস্ত রজনী ভ্রমণ করিয়া নরেন্দ্র প্রান্তরে দূরে একটী আলোক দেখিতে পাইলেন, সেই আলোক অনুধাবন করিয়া চলিলেন। প্রায় এক ক্রোশ যাইয়া আলোকের নিকট পৌঁছিলেন; দেখিলেন, কতকগুলি হতভাগা একটী শবদাহ করিতে আসিয়াছে। নরেন্দ্র তখন একবার দাঁড়াইলেন, শব দেখিয়া একবার দাঁড়াইলেন। কাষ্ঠের অগ্নি একবার জ্বলিয়া উঠিতেছিল, আবার একবার নিস্তেজ হইয়া যাইতেছিল, ঐরূপ আলোকে নরেন্দ্রের আকৃতি ও বিকট মুখমণ্ডল এক একবার দেখা যাইতে লাগিল। যাহারা শবদাহ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা নরেন্দ্রকে দেখিতে পাইল। শ্রান্ত পথিক বলিয়া নিকটে আসিতে বলিল। নরেন্দ্র নিকটে গেলেন না, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল নরেন্দ্র পরিচয় দিলেন না; শবদাহীগণ ক্ষণেক নরেন্দ্রের অচল দীর্ঘ অবয়ব ও বিকৃত মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টি করিয়া শব ছাড়িয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

শ্মশান ত্যাগ করিয়া নরেন্দ্র চলিলেন। ক্ষণেক যাইয়া একটী ক্ষুদ্র নদী দেখিতে পাইলেন, আবার ঝাঁপ দিয়া নদীতে পড়িলেন আবার সন্তরণ করিয়া সেই নদী পার হইয়া গেলেন, সিক্তবস্ত্রে আবার গমন করিতে লাগিলেন।

কতক্ষণ পর প্রত্যূষের শীতল বায়ু নরেন্দ্রের শরীরে লাগিল পূৰ্ব্বদিক্ রক্তিমা আভা ধারণ করিল, তথাপি নরেন্দ্রের ভ্রমণ শেষ হইল না।

প্রত্যূষে একটী গ্রামের স্ত্রীলোকগণ কলস লইয়া ঘাটে যাইতেছিল, এক দীর্ঘাকার, গৌরবর্ণ বিকৃত মূৰ্ত্তি মনুষ্যাকৃতি পথে শয়ান দেখিয়া সভয়ে পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল।

প্রাতঃকাল হইল। গ্রামের লোকে সমবেত হইয়া অপরিচিত ঘোর-নিদ্রাভিভূত পুরুষকে জাগাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে ধীরে

ধীরে উত্তর দিল "আমার নাম নাই, আমার নিবাস নাই, আমি জগতে একাকী।" নরেন্দ্র ঘোর উন্মত্ত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রাজমহল।

নরেন্দ্র সেই দিনই সঙ্কটজনক পীড়াক্রান্ত হইলেন, গ্রামের একজন ভদ্রলোক তাঁহার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন, কিন্তু অনেক দিন তাঁহার জীবনের আশা ছিল না। অনেক দিন পর নরেন্দ্র ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন; যখন চলিবার শক্তি হইল, তখন সেই ভদ্রলোককে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়া, নরেন্দ্র সে গ্রাম ত্যাগ করিলেন।

প্রথম শোক ও নৈরাশের বেগ তখন ক্ষান্ত হইয়াছে; নরেন্দ্র তখন হেমলতাকে ফিরিয়া পাইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন যে সুবাদারের নিকট আপন বিষয় পাইবার আবেদন করিব; পৈতৃক জমিদারি আমার হইলে, স্বার্থপর নবকুমার অবশ্যই আমাকেই কন্যাদান করিবেন।

এই উদ্দেশে নরেন্দ্র সুবাদার সুজার রাজধানীতে পৌঁছিলেন। সম্রাট শাজিহানের পুত্র শাসুজা বঙ্গদেশের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রাজধানী ঢাকা হইতে রাজমহলে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, ও বিংশতি বৎসর সুশাসন দ্বারা বঙ্গদেশে সম্যক্ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে দেশে প্রায় যুদ্ধ বা কোন রূপ উপদ্রব হয় নাই, ও প্রজাবর্গ নিরুদ্বেগে কালযাপন করিয়াছিল। ইতিহাসে তাঁহার অনেক সুখ্যাতি দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি যুদ্ধে যেরূপ বিক্রমশালী ও সাহসী ছিলেন, অন্য সময়ে সেইরূপ ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু ছিলেন। তাঁহার দয়া ও ন্যায়পরতা দেখিয়া সমগ্র বঙ্গদেশে, কি জমিদার, কি জায়গীরদার, সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিত; ও কথিত আছে তাঁহার নিধন সময়ে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহার জন্য খেদ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার উদারস্বভাব দুই একটী দোষে কলঙ্কিত ছিল; যুদ্ধের সময় তিনি যেরূপ সাহসী অন্য সময় তিনি সেইরূপ বিলাসী। আপনি নিরতিশয় সুগঠন পুরুষ ছিলেন, ও সর্ব্বদাই সুগঠন রমণীমণ্ডলীতে পরিবৃত্ত থাকিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার প্রধান রাজ্ঞী প্যারী বানু বঙ্গদেশে

রূপে গুণে ও চতুরতায় অদ্বিতীয়া বলিয়া খ্যাতা ছিলেন, ও বাকপটুতা ও সুমধুর কৌতুকে সর্ব্বদাই সুবাদারের হৃদয় প্রেমরসে সিক্ত করিয়া রাখিতেন। কিন্তু প্যারী বানুও একাকী সুজার প্রণয়-ভাগিনী ছিলেন না, শত শত বেগম উদ্যানে পুষ্পের ন্যায় সুজার রাজমন্দির আলো করিয়া থাকিত। তাহাদের রূপে বিমোহিত হইয়া সুজা রাজকার্য্য বিস্মৃত হইতেন, কখন কখন ২।৩ দিন ক্রমান্বয়ে মদ্যপান ও আমোদে অতিবাহিত হইত।

এইরূপ সুবাদারের নিকট নরেন্দ্রনাথ আবেদন করিতে যাইলেন, এরূপ সুবাদারের নিকট উচিত বিচার সম্ভব নহে। গঙ্গাতীরে সুন্দর রাজমহল নগরী এখন ও দেখিতে মনোহর, কিন্তু যখন বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল, তখন রাজমহলের অনির্ব্বচনীয় শোভা ছিল। সুবাদারের উচ্চ প্রাসাদ ও রাজবাটী, ওমরাহ ও জায়গীরদারদিগের হর্ম্ম্যাবলি ও বঙ্গদেশের সমস্ত ধনাঢ্য লোকের সমাগমে রাজমহল যথার্থই রাজপুরী বলিয়া বোধ হইত। স্বয়ং গঙ্গা সহস্র ধনাঢ্য বণিকের সহস্র পোত বক্ষে ধারণ করিয়া নগরের শোভা ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিত। প্রশস্ত রাজপথে যুদ্ধ-বিলাসী, গর্ব্বিত ওমরাহ ও মুসলমান জমিদারগণ সর্ব্বদাই অশ্বে বা হস্তীতে বা শিবিকায় গমনাগমন করিত; হিন্দু বণিক ব্যবসায়ী লোক শান্তভাবে নগরের এক পার্শ্বে বাস করিত ও নিজ ব্যবসায়ে রত থাকিত।

এ সমস্ত দেখিবার জন্য নরেন্দ্রনাথ রাজমহল যান নাই, এ সমস্ত দেখিয়া তিনি শান্ত হইলেন না। কিরূপে সুবাদারের নিকট নিজ আবেদন জানাইবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেক ধনাঢ্য হিন্দু বণিক নরেন্দ্রের পিতাকে চিনিত, কিন্তু নরেন্দ্র এক্ষণে দরিদ্র, দরিদ্রের জন্য কে চেষ্টা করে? নরেন্দ্র যাহার নিকট যাইলেন সেই বলিল, "হাঁ বাপু, তোমার পিতা মহাশয় লোক ছিলেন, তাঁহার পুত্রকে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম, কয়েক দিন এই স্থানে অবস্থিতি কর, পরে দেখা যাবে," ইত্যাদি। নরেন্দ্র বিফলপ্রযত্ন হইয়া রহিলেন।

অনেক দিন পর ঘটনাক্রমে এর্ফান খাঁ নামক এক মোগল জায়গীর-দারের সহিত নরেন্দ্রের পরিচয় হইল। এর্ফান খাঁ বীরেন্দ্রের পরম বন্ধু ছিলেন ও যথার্থ মহাশয় লোক ছিলেন; তিনি সাদরে নরেন্দ্রকে আহ্বান করিয়া সত্বর তাঁহার জন্য সুবাদারের নিকট যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তথাপি দরিদ্রের আবেদন বিচারাসন পর্য্যন্ত যায় না, অনেক যত্নে, অনেক দিন পর, এর্ফান অনেক অর্থে সুবাদার ও তাঁহার মন্ত্রীবর্গের

মন সিক্ত করিয়া এক দিন নরেন্দ্রের আবেদন সুজার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

সুন্দর রৌপ্য ও স্বর্ণখচিত সিংহাসনে সুবাদার বসিয়াছেন, রাজবেশে সে সুন্দর অবয়বে বড় সুন্দর শোভা পাইয়াছে। চারিদিকে অমাত্য ও বড় বড় আফগান ও মোগল যোদ্ধাগণ শির নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ও সেই বিস্তীর্ণ বিচারপ্রাসাদ পরিপূর্ণ করিয়াছে। মর্ম্মর-প্রস্তরবিনির্ম্মিত সারি সারি স্তম্ভের উপর চারু খচিত ছাদ শোভা পাইতেছে ও সিংহাসনের দুই দিকে পরিচারক চামর দুলাইতেছে। প্রাসাদের বাহিরে যতদূর দেখা যায়, লোকে সমাকীর্ণ; সুবাদার সর্ব্বদা দেখা দেন না, অতএব অদ্য সকলেই দেখিতে আসিয়াছে।

সুবাদারের সম্মুখে বৃদ্ধ এর্ফান খাঁ উঠিয়া আবেদন করিলেন—

"জেহাঁপনা! এ দাস প্রায় বিংশতি বৎসর হজুরের কর্ম্ম করিয়াছে, সুবাদারের কার্য্যে আমার কেশ শুক্ল হইয়াছে, ললাট খড়্গে ক্ষত হইয়াছে। গোলামের কিঞ্চিৎ আবেদন আছে।"

সুবাদার বলিলেন, "এর্ফান, তুমি আমাদের প্রধান অনুচর ও অতিশয় প্রিয়পাত্র, তোমার এমন কি যাচ্ঞা আছে যাহা আমাদের অদেয়?"

এর্ফান ভূমি পর্য্যন্ত শির নোমাইয়া পুনরায় বলিলেন, "জেহাঁপনা! বঙ্গদেশবাসীগণ অতি ভীরু ও দুর্ব্বল; তাহাদের মধ্যে সময় সময় যে আমাদিগের যুদ্ধে সাহায্য করে, সে সুবাদারের প্রীতিভাজন সন্দেহ নাই। জমিদার বীরেন্দ্রসিংহ একজন সেইরূপ লোক ছিলেন।"

সুবাদার বলিলেন, "হাঁ, আমি সেই হিন্দুর নাম শুনিয়াছি, পাঠানদিগের সহিত আমাদের যুদ্ধে সে সাহায্য করিয়াছিল।"

এর্ফান পুনরায় তসলীম করিয়া বলিল,—"জেহাঁপনা! যাহা কহিলেন যথার্থ। এই দাস যখন উড়িষ্যার যুদ্ধে গিয়াছিল, স্বচক্ষে বীরেন্দ্রের যুদ্ধকৌশল ও রাজভক্তি দেখিয়াছিল। এই রাজসভায় অনেক পরাক্রান্ত পাঠান ও মোগল যোদ্ধা আছেন, কিন্তু বীরেন্দ্র অপেক্ষা অধিক সাহসী পুরুষ এ গোলাম এ পর্য্যন্ত দেখে নাই।"

সভাস্থদিগের কোষে অসি ঝন্‌ঝনার শব্দ হইল, মুসলমানদিগের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; কিন্তু শাসুজা সহাস্য বদনে বলিলেন—

"এর্ফান, তুমি কাফেরের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছ, কিন্তু অযথার্থ নহে, সে হিন্দু যথার্থ সাহসী ছিল শুনিয়াছি। এক্ষণে তাহার জন্য কি বলিবার

আছে বল, তোমার উপরোধে আমি তাহাকে যে কোন পুরস্কার দিতে প্রস্তুত আছি।”

এর্ফান গম্ভীরস্বরে বলিলেন, “যিনি সুবাদারের উপর সুবাদার, পাদশাহের উপর পাদশাহ, তিনিই কেবল এক্ষণে বীরেন্দ্রকে পুরস্কার বা শাস্তি দিতে পারেন। আমি তাঁহার অনাথা বালকের জন্য আবেদন করিতেছি। বালক এক্ষণে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে, কানঙ্গু মহাশয়ের যোগে এক শঠ তাঁহার পৈতৃক জমিদারী কাড়িয়া লইয়াছে।”

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সুবাদার কানঙ্গুকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে সময়ে সমস্ত খাজনা ও জমিদারী বিষয় কানঙ্গু মহাশয়ের হস্তে থাকিত, এমন কি বঙ্গদেশের সুবাদার যে সমস্ত কাগজাৎ দিল্লীতে পাঠাইতেন, তাহাও কানঙ্গুর সহি না হইলে গ্রাহ্য হইত না। কানঙ্গু মহাশয় নবকুমারের অর্থভোগী; বিনীতভাবে বলিলেন, “সুবাদার মহাশয়ের আদেশ আমাদের শিরোধার্য্য; বীরেন্দ্রের মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর খাজনা আদায় না হওয়ায় জেহাঁপনা সেই জমিদারী নবকুমারকে দিতে আদেশ দিয়াছিলেন।”

শাসুজাকে কোন বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন ছিল না, কানঙ্গু মহাশয় যাহা বুঝাইলেন, সুবাদার তাহাই বুঝিলেন; এর্ফানের আবেদন ফাঁসিয়া গেল। এর্ফান রোষে নতশির হইয়া রহিলেন তাঁহার দক্ষিণ হস্তে নরেন্দ্র দণ্ডায়মান হইয়া কানঙ্গু মহাশয়ের দিকে তীব্র দৃষ্টি করিতেছিলেন।

সুবাদার শেষে বলিলেন, “এর্ফান খাঁ! সূর্য্য যে রশ্মি জগতে দান করেন তাহা ফিরিয়া লন না, জমিদারী স্বয়ং দান করিয়া ফিরাইয়া লওয়া রাজধর্ম্ম নহে। কিন্তু বীরেন্দ্রের বালক তেজস্বী দেখিতেছি, বীরেন্দ্রের মত যুদ্ধব্যবসায় শিক্ষা করুক, অবশ্যই উৎকৃষ্ট পুরস্কার ও অন্য জমিদারী এনাম পাইবে।”

সভাস্থ সকলে “কেরামৎ,” “কেরামৎ,” বলিয়া সুবাদারের কথার প্রশংসা করিল; এর্ফানও অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়া সেই দিন হইতেই নরেন্দ্রকে নিকটে রাখিয়া যুদ্ধব্যবসায় শিখাইতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

কাশীর যুদ্ধ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার তিন বৎসর পর ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে আশ্বিন মাসের প্রারম্ভে এক দিন ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী ও আগ্রানগরে বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। আগ্রার রাজদ্বার লোকে সমাকীর্ণ; সমস্ত নগরবাসী ভীত ও শশব্যস্ত; বাজার, দোকান সমস্ত বন্ধ, ওমরাহ, মনসবদার, রাজপুত, মোগল, পাঠান, সকলেই অস্থিরচিত্ত ও চিন্তাবিহ্বল। কার্য্যকর্ম্ম বন্ধ হইল, সকলেই ভীত ও উৎসুক। সম্রাট্ শাজিহান কয়েক দিন অবধি পীড়ায় শয্যাগত ছিলেন; আজি মিথ্যা সংবাদ রটনা হইল যে, তিনি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

মিথ্যা সংবাদে শীঘ্রই সমুদায় ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন হইল। বঙ্গদেশ হইতে সুজা, দক্ষিণ হইতে আরংজীব, গুজরাট হইতে মোরদ রণ-সজ্জায় বহিষ্কৃত হইলেন। পিতৃবিয়োগে সকলেই সিংহাসনারোহণে লোলুপ হইলেন। পরে যখন প্রকৃত সংবাদ জানা গেল যে, শাজিহান জীবিত আছেন, তখনও রাজপুত্রগণ রণোদ্যম হইতে নিরস্ত হইলেন না। তাহার প্রধান এক কারণ এই যে, ইতিপূর্ব্বে কয়েক মাস হইতে সম্রাট পীড়াবশতঃ রাজকার্য্য করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দারা পিতার শুশ্রূষা করা দূরে থাক, এই অবসরে পিতাকে বন্দীস্বরূপ রাখিয়া সমস্ত রাজকার্য্য আপনিই করিতে লাগিলেন; কোন বিষয়ে পিতার মত লইতেন না; জন্মের মত পিতাকে রুদ্ধ রাখিয়া আপনি রাজকার্য্য করিবেন এইরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ শঙ্কা করিয়াছিল যে, বিষ প্রয়োগ-দ্বারা যুবরাজ আপন সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক করিবেন। দারার ভ্রাতাগণ পিতার শাসনে সম্মত ছিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠভ্রাতার শাসনে সম্মত ছিলেন না; এই জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে যুদ্ধানল প্রজ্জলিত হইল।

১৬৫৭ খৃঃ অব্দের শেষে বারাণসীর ভীষণ যুদ্ধ হইল। যুদ্ধক্ষেত্র শীত-কালের সায়ংকালের ঈষৎ আলোকে ভীষণ রূপ ধারণ করিয়াছে। অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র ও মনুষ্যের শবরাশিতে ক্ষেত্র আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কোথাও মৃতদেহ সমুদায় পড়িয়া যেন আকাশের নক্ষত্রের দিকে তীব্র দৃষ্টি করিতেছে; কোথাও মুমূর্ষু অবস্থায় অঙ্গহীন শিপাহী ক্ষীণস্বরে "জল জল" উচ্চারণ করিতেছে; কোথাও দুই এক জন সেনা নিজ

ভ্রাতা বা বন্ধুর জন্য অনুসন্ধান করিতেছে,—হায়! তাহাদের এ জগতে আর ফিরিয়া পাইবে না। দুই এক জন তস্কর বহুমূল্য বস্ত্র বা স্বর্ণালঙ্কার বা অস্ত্রাদির অন্বেষণে ফিরিতেছে; ক্ষণে ক্ষণে পেচার ভীষণ রব শুনা যাইতেছে, সন্ধ্যায় শৃগালগণ মহাকোলাহলে রব করিতেছে ও যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে আসিতেছে; দুই এক স্থানে অগ্নিশিখা দেখা যাইতেছে ও ক্ষণে ক্ষণে ভীষণ আলোকচ্ছটায় ক্ষেত্র ও শবরাশি উজ্জ্বল করিতেছে; দূরে গঙ্গার পবিত্র জল কলকল শব্দে প্রবাহিত হইতেছে;—নদীর বিশাল বক্ষঃস্থল শান্ত, বিস্তীর্ণ ও উজ্জ্বল; ক্ষুদ্র মানবের সুখ বা দুঃখ, জয় বা পরাজয়ে বিচলিত হয় না।

ক্রমে রজনী গভীর হইল; চন্দ্র উদিত হইল; তাঁহার নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক কিরণে মানবের কি লজ্জা ও কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিতে লাগিল; প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতাগণ পরস্পরের শোণিতপানে লোলুপ হইয়া কত নরহত্যা করিয়াছে;—শৃগাল, ব্যাঘ্র, ভল্লুকও স্বজাতির উপর হিংসা করে না। সেই চন্দ্রালোকে দুই জন রাজপুত কোন বন্ধুর অনুসন্ধানে ক্ষেত্রে আসিয়াছিল। এক স্থানে কতকগুলি শব রাশীকৃত হইয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে যেন বেদনাসূচক স্বর বহির্গত হইল। রাজপুতসেনাগণ সেই শবরাশি উঠাইয়া দেখিল তাহার নীচে একজন যুবক মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। হৃদয়ে আঘাত পাইয়াছে ও সেই ক্ষতস্থান হইতে অনবরত শোণিত নির্গত হওয়ায় অচেতন হইয়াছে, কিন্তু মৃত্যুর আশু সম্ভাবনা নাই।

যুবকের আকৃতি দেখিয়া রাজপুত দুইজন বিস্মিত হইল। বয়ঃক্রম অতিশয় অল্প, বোধ হয় অষ্টাদশ বৎসরের অধিক নহে, মুখমণ্ডল অতিশয় সুন্দর ও উজ্জ্বল, সেরূপ অপরূপ সৌন্দর্য্য ও উজ্জ্বলতা স্ত্রীলোকের সম্ভবে; প্রায় পুরুষের সম্ভবে না। পরিশ্রম বা জীবনের চিন্তা বা বয়সের একটী রেখাও এ পর্য্যন্ত ললাটে অঙ্কিত হয় নাই; ললাট পরিষ্কার ও উন্নত। সমস্ত বদনমণ্ডল দেখিলে যোদ্ধা বলিয়া বোধ হয় না, বালক বলিয়া বোধ হয়; অথচ মুখের ভাব তেজ, গরিমা ও ঈষৎ ক্রোধ-ব্যঞ্জক।

রাজপুত সেনা দুই জনেরই যুদ্ধব্যবসায়ে হৃদয়ের স্বাভাবিক দয়া অনেক হ্রাস হইয়াছে, বালককে দেখিয়া তাহারা হাস্য করিয়া এইরূপে কথোপকথন করিতে লাগিল।

প্রথম সেনা। "এ বালক! এই বয়সেই যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে?"

দ্বি, সেনা। "দেখিতেছি শাসুজার পক্ষের সেনা। বালক হইলেও সাহসী,—দেখ আমাদের রেখা পর্য্যন্ত আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছে এ কোন্ দেশের লোক?"

প্র। "জানি না।"

দ্বি। "আমার বোধ হয় বঙ্গদেশের লোক, মোগল বা পাঠান হইলে এরূপ আকৃতি হইত না। আমার পিতামহ মানসিংহের সহিত বঙ্গদেশে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন, তিনি বলেন 'সেখানকার লোক সুখপ্রিয় ও বিলাসী, বিপদ দেখিলে না কি স্ত্রীলোক অগ্রসর হয়, স্বামী অঞ্চল ধরিয়া পশ্চাতে দাঁড়ায়।' সত্য মিথ্যা জানি না এইরূপ শুনিয়াছি।"

প্র। "হা হা হা! শাসুজা এই বাঙ্গালী শিশু লইয়া মহারাজ জয়সিংহ ও সলাইমানের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন? পুনরায় যখন আসিবেন আমরা যুদ্ধে না আসিয়া আমাদের বালকদিগকে পাঠাইয়া দিব।—চল এখানে আর কেন, আমাদের বন্ধুর অন্বেষণ করি।"

দ্বি। "এ লোক জীবিত আছে একটু সাহায্য করিলে বোধ হয় বাঁচিবে; ইহাকে ত্যাগ করিয়া যাইব?"

প্র। "শত্রুকে বাঁচাইতে গেলে আমাদের সময় থাকে না,—আমি এক দণ্ডে ইহার দফা শেষ করিতেছি।" এই বলিয়া অসি নিষ্কোষিত করিল। দ্বিতীয় সেনা তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিল—

"না, না, মুমূর্ষু লোকের প্রাণনাশ করিতে আমাদের প্রভু মহারাজ যশোবন্ত সিংহ নিষেধ করিয়াছিলেন, তুমি যাও আমি ইহাকে বাঁচাইব।"

প্রথম সেনা হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইল; দ্বিতীয় সেনা জলসেচনদ্বারা মুমূর্ষু যুবাকে জীবিত করিল। যুবা নেত্র উন্মীলিত করিয়া দেখিল চারিদিকে শব পড়িয়া রহিয়াছে—আকাশে চন্দ্র উদয় হইয়াছে; যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, জগৎ নিস্তব্ধ। জিজ্ঞাসা করিল—

"বন্ধু, তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, তোমার নাম কি,—কোন্ পক্ষের জয় হইয়াছে, শাসুজা কোথায় গিয়াছেন?"

সেনা বলিল, "আমার নাম গজপতি সিংহ; তোমার সুজা অতিশয় কামিনীপ্রিয়, এতক্ষণ কামিনীদের বিচ্ছেদে পীড়িত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বঙ্গদেশাভিমুখে পলায়ন করিয়াছেন; হা—হা!" পুনরায় গম্ভীরস্বরে বলিল, "যুবরাজ দারার পুত্র সুলতান সুলাইমান শেখের জয় হইয়াছে, তাঁহার সহচর মহারাজা জয়সিংহের জয় হইয়াছে। আমি রাজা যশোবন্ত সিংহের

অনুচর, তিনি কারণবশতঃ আমাকে রাজা জয়সিংহের নিকট পাঠাইয়া- ছিলেন সেই জন্য এক্ষণে তাঁহারই শিবিরে আছি। তোমার নাম কি, তুমি কোন্ দেশের লোক ?”

যুবক অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া ভূমির দিকে অবলোকন করিতে লাগিল। ক্ষণেক পর বলিল—“তুমি আমার শত্রু, কিন্তু আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, আমার পিতার স্বরূপ, আমাকে আর একটু সাহায্য কর। একটু জল দাও, একটু জল দাও, আর দুই এক দিন থাকিবার স্থান দাও। আমার দেশ অনেক দূর, বঙ্গদেশে, এখানে আমার একজনও বন্ধু নাই ; আমার নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। জল দাও, জল দাও।”

নরেন্দ্রের বালকাকৃতি দেখিয়া গজপতি সিংহের দয়ার আবির্ভাব হইয়াছিল ; তাহা না হইলে শত্রুর জন্য কে কারে যত্ন করে। বালকের কাতরোক্তি শুনিয়া আরও দয়া হইল। শুশ্রূষা করিয়া শিবিরে লইয়া যাইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

রাজা জয়সিংহের শিবির।

একটী প্রকাণ্ড শিবিরের অভ্যন্তরে দুই জন মহাবীর বসিয়া কথোপ- কথন করিতেছিলেন, একজন রাজপুত রাজা জয়সিংহ, অপর জন তাঁহার পরম সুহৃৎ দেবের খাঁ, জাতিতে পাঠান।

রাজার বয়ঃক্রম অনেক হইয়াছে, কিন্তু এখনও মুখমণ্ডল যৌবনের তেজে পরিপূর্ণ, শরীর যৌবনের বলে বলিষ্ঠ। সে সময়ে মোগল সম্রাট- দিগের প্রধান সেনাপতি অধিকাংশই রাজপুত ছিলেন। রাজপুতদিগের বাহুবীর্য্যেই মোগলগণ সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত সমুদায় ভারতবর্ষ শাসন করিতেন। যেখানে ঘোর বিপদ বা ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত সেই স্থানেই রাজপুত সেনাপতি প্রেরিত হইতেন, ও প্রায়ই বিজয় লাভ করিয়া আসিতেন। আখ্যায়িকা বিবৃতকালে রাজপুতানার রাজাদিগের মধ্যে দুই জন বিশেষ ক্ষমতাশালী ও প্রবলপরাক্রান্ত ছিলেন, রাজা জয়সিংহ ও রাজা যশোবন্তসিংহ। সম্রাট্ শাজিহান উভয়কেই বিশ্বাস করিতেন ও বিপত্তির সময় ইহাঁদেরই রণে প্রেরণ করিতেন। সে সময়ে কি পাঠান, কি মোগল, কোন সেনাপতিরই জয়সিংহের ন্যায় প্রতাপ বা ক্ষমতা বা

রণকৌশল ছিল না। তাৎকালিক একজন বিচক্ষণ লেখক মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন যে, জয়সিংহের মত কার্য্যদক্ষ লোক সে সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে বোধ হয় আর কেহই ছিলেন না। শাজিহান ও যুবরাজ দারা যখন সুলাইমান শেখকে সুলতান সুজার বিরুদ্ধে পাঠান, সঙ্গে জয়সিংহকে তাঁহার রাজপুত সৈন্য সহিত পাঠাইয়াছিলেন। বারাণসীর যুদ্ধে সুজা পরাস্ত হইয়া বঙ্গদেশাভিমুখে পলায়ন করিয়াছিলেন। আধুনিক জয়পুর নগরী এই জয়সিংহের প্রতিষ্ঠিত, ও সেই নগরীতে ও দিল্লী, বারাণসী ও অন্যান্য স্থানে জ্যোতিষ্ শাস্ত্রের আলোচনার জন্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মান-মন্দির অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়।

শিবিরে উজ্জ্বল দীপাবলি জ্বলিতেছিল, বাহিরে সৈন্য, তাহার চারিদিকে অন্য শিবির। কিন্তু রাজার শিবিবের মধ্যে আর কেহ ছিলেন না কেবল রাজা ও তাঁহার সুহৃৎ দেবের খাঁ গুপ্ত কথা কহিতেছিলেন।

দেবের খাঁ বলিলেন, "যথার্থই জয়সিংহ নাম পাইয়াছিলেন, আপনি যেস্থানে, জয় সেস্থানে।"

রাজা বলিলেন, "কেন অন্যের যুদ্ধের কথা বলিতেছেন। অন্য যুদ্ধ কোথায়? বঙ্গদেশের সেনার সহিত যুদ্ধ কি যুদ্ধ? বঙ্গদেশের সেনাগণ যেরূপ আরামপ্রিয় সেরূপ যুদ্ধপ্রিয় নহে; সুলতানসুজাও বঙ্গদেশে থাকিয়া রমণীপ্রিয় বিলাসী হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধ!",

দে। "কেন যুদ্ধের সময় সুলতানসুজা অতিশয় সাহস ও বিক্রম প্রকাশ করেন তাহা সকলেই স্বীকার করেন।"

রাজা। "তাহা স্বীকার করি। যুদ্ধের সময় তিনি প্রকৃত সাহসের পরিচয় দেন কার্য্যের সময় বিলাস বিস্মৃত হয়েন। কিন্তু কেবল সাহসে কি হয়, রণকৌশল জানেন না।"

দে। "আপনি আরংজীবকে কিরূপ মনে করেন?"

রাজা। "উঃ তাঁহার নাম করিবেন না, সেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন লোক আমি দেখি নাই, যেরূপ বীরত্ব সেইরূপ কৌশল। শুনিয়াছি তাঁহার গতি রোধ করিবার জন্য রাজা যশোবন্তসিংহ নর্ম্মদাতীরে যাইতেছেন। যশোবন্তসিংহ রাণার জামাতা ও সেইরূপ যোদ্ধা ও বিক্রমশালী, কিন্তু আরংজীবের সহিত যুদ্ধে কি হয় জানি না। যশোবন্তের সাহস আছে কৌশল নাই। আমার বোধ হয় এই ভ্রাতৃবিরোধে অবশেষে আরংজীবের জয় হইবে।"

দে। "আপনি দারাকে পরিত্যাগ করিবেন?"

রাজা। "ইচ্ছামতে কখনই নহে, কিন্তু যুদ্ধে যদি অবশেষে আরংজীবের জয় হয় তাহা হইলে তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া মানিতে হইবে। আমরা দিল্লীর সম্রাটের অধীন; যিনি যখন সম্রাট্ হইবেন তখন তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করা রাজবিদ্রোহিতা।"

দে। "ভাল, অদ্য আপনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সুজাকে বন্দী করিতে পারিতেন। সুজা যখন পলায়ন করিলেন আপনি অনায়াসে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ধরিতে পারিতেন; তাহা হইলে যুবরাজ দারাও অতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন; আপনি সেরূপ না করিলেন কেন?"

রাজা। "আপনি এতদূর দেখিয়াছেন, আমি ইচ্ছা করিয়া সুলতান-সুজাকে পলাইতে দিয়াছি তাহা জানিয়াছেন; তাহার কারণ আছে। ভ্রাতায় ভ্রাতার যেরূপ বিজাতীয় ক্রোধ, যদি সুজাকে দারার সম্মুখে লইয়া যাইতাম, বোধ হয় যুবরাজ তাঁহার প্রাণদণ্ড করিতেন, অথবা যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ রাখিতেন। তাহা কি বিধেয়? বিশেষ আমি এই যুদ্ধে আসিবার সময় সম্রাট্ শাজিহান যাহাতে যুদ্ধ না হয় এরূপ চেষ্টা করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। সুজার হানি করা তাঁহার ইচ্ছা নহে। সম্রাট্ আমাকে বলিয়াছিলেন, 'আমার সন্তান সুজাকে বলিও এখন যুদ্ধ করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে, কোন ফললাভও হইবে না। আমি কালপ্রাপ্ত হইলে তিনি যুদ্ধ করিতে পারেন; কি ততদিন যদি অপেক্ষা না করেন আরংজীব ও মোরাদের উদ্যম সফল হয় কি না দেখিয়া পরে যুদ্ধ করিতে পারেন।' সম্রাটের এই কথা অনুসারে আমি সন্ধি স্থাপনের কথা বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম। সুজাও একপ্রকার সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু সলাইমান যুবা পুরুষ, আপন বিক্রম দেখাইবার জন্য অধৈর্য্য হইয়া সহসা গঙ্গা পার হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এরূপ সময় এক জন সেনা আসিয়া বলিল—

"মহারাজ, এক জন সেনা গজপতি সিংহ একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহে।" রাজা বলিলেন, "আসিতে দাও," ক্ষণেক পর গজপতি সিংহ আসিয়া বলিল—

"মহারাজ, বঙ্গদেশের এক জন হিন্দু বন্দী হইয়াছে; সে আহত।"

রাজা বলিলেন, "আমরা আহত লোকের সহিত যুদ্ধ করি না, তাহাকে ছাড়িয়া দাও, স্বদেশে ফিরিয়া যাউক।"

গজপতি সিংহ—" মহারাজ, তাহার দেশ অনেক দূর, সে চলিতে অক্ষম, এদেশে তাহার বন্ধু বান্ধব কেহ নাই, নূতন আসিয়াছিল।"

রাজা কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন, " তবে আমার শিবিরে থাকিতে দাও, আরাম হইলে ছাড়িয়া দিও।"

নরেন্দ্রনাথকে অচেতন অবস্থায় একটী শিবিরে লইয়া যাওয়া হইল।

পরে জয়সিংহ গজপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গজপতি, অদ্য তুমি যুদ্ধে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছ, সে জন্য তোমাকে ও তোমার প্রভু যশোবন্তসিংহকে আমি ধন্যবাদ দিতেছি। এক্ষণে কি গুপ্ত কথা বলিবার জন্য যশোবন্ত তোমাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন নিবেদন কর।"

উভয়ে গুপ্ত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

জেলেখা অভাগিনী।

তাহার পর কয়েক দিন নরেন্দ্রনাথ ভীষণ জ্বরে অচেতন অবস্থায় থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে সংজ্ঞা হইত, বোধ হইত যেন তরীতে অতি দ্রুতবেগে গঙ্গার উপর দিয়া যাইতেছেন, পুনরায় কি দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন? বোধ হইত যেন এক অল্পবয়স্কা রমণী তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছে, আবার কি প্রাণের হেমলতাকে ফিরিয়া পাইলেন? রোগীর চক্ষে জল আসিল, শিরা স্ফীত হইল, ক্ষত হইতে রক্তধারা বহিতে থাকিল।

কয়েক দিন এইরূপে অতিবাহিত হইল। রোগের ক্রমশঃ উপশম হইল। যখন সম্পূর্ণ চৈতন্য হইল, দেখিলেন এক অপূর্ব্ব কুটীরে একটী দীপ জ্বলিতেছে, তিনি একটী শয্যায় শুইয়া রহিয়াছেন। সে কুটীর কি তাঁহার পৈতৃক কুটীর?—না, এরূপ সুরম্য কুটীর তিনি কখনও দেখেন নাই। সমস্ত ঘর সুন্দর শ্বেত প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত ও স্বর্ণ ও রৌপ্যদ্বারা খচিত। সুবর্ণের শামাদানে দীপ জ্বলিতেছে ও সমস্ত গৃহ সুগন্ধে আমোদিত করিতেছে। তাঁহার পালঙ্ক দ্বিরদরদ-খচিত, সুবর্ণ ও মণিদ্বারা বিভূষিত ও রক্তবর্ণ সাটীন দ্বারা মণ্ডিত। সম্মুখে, একটী রৌপ্য আধারের উপর এক রৌপ্য পাত্রে জল রহিয়াছে, নীচে শয্যা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটী বিচিত্র গালিচাব উপর এক যবনকন্যা ও এক খোজা বসিয়া

অতি মৃদুস্বরে কথোপকথন করিতেছে। যবন কন্যা যুবতী ও তন্বঙ্গী ও সুন্দরী, মুখে ও অবয়বে সৌন্দর্য্য ঝল্‌মল্‌ করিতেছে, নয়ন হইতে সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ হইতেছে, কেশপাশ হইতে সৌন্দর্য্য ঝরিয়া পড়িতেছে। হেম-লতার অবয়ব নরেন্দ্রের হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল; কিন্তু একপ উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য নরেন্দ্র কোথাও দেখেন নাই, এরূপ তেজস্কর গৌরব-বিস্ফারিত অবয়ব কখন দেখেন নাই। যবনকন্যার দৃষ্টিতে ও অঙ্গভঙ্গিতেই যেন তেজ ও দর্পের পরিচয় দিতেছে। যবনকন্যা এক একবার পাড়িত হিন্দুর দিকে চাহিতেছে, এক একবার বিষণ্ণভাবে ভূমির দিকে চাহিতেছে, আবার মৃদুস্বরে খোজার সহিত কথা কহিতেছে। খোজা কৃষ্ণবর্ণ ও বলবান্‌। তাহাদের কি কথা হইতেছিল নরেন্দ্রনাথ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কেবল দুই একটা কথা শুনিতে পাইলেন।

যবনকন্যা বলিতেছিল—"মসরুর, কেন এ হিন্দুর ও আমার সর্ব্বনাশ করিবে? নির্দ্দোষী নিরাশ্রয় ব্যক্তির জীবননাশে কি তোমার আমোদ?"

মসরুর। "তবে তুমি কাফেরকে এস্থলে আনিলে কেন?"

জেলেখা। "সে যেন আমার দোষ; ইহাঁর কি দোষ? ইনিত নির্দ্দোষী।"

ম। "'ইনি' কি? নাম ধরিতে পার না—তোমার কেহ হন না কি? সেই জন্য এত মায়া?"

জেলেখা যোদ্ধাকন্যা; সহসা তাহার বদনে পৈতৃক ক্রোধ ও তেজের আবির্ভাব হইল; রক্তোচ্ছ্বাসে মুখমণ্ডল সহসা আরক্ত হইয়া যাইল। সক্রোধে বলিল—

"মসরুর যদি তুমি স্ত্রীলোক হইতে তাহা হইলে মায়ার কাতরতা বুঝিতে, যদি পুরুষ হইতে তথাপি হৃদয়ে কিছু দয়া থাকিত। তোমার পুরুষত্বের সহিত দয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছে, এক্ষণে এই প্রস্তর-শাণের অপেক্ষা তোমার হৃদয় কঠিন ও দুর্ভেদ্য।" মসরুর হাসিয়া বলিল, "ঐ দেখ কাফের উঠিয়াছে, আমি চলিলাম," বলিয়া বাহিরে চলিয়া যাইল।

জেলেখা সহসা রোষ ত্যাগ করিয়া উঠিল, শয্যার দিকে আসিবার জন্যই উঠিল, কিন্তু ক্ষণেক স্থির হইয়া ভূমির দিকে স্থিরনয়নে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, নরেন্দ্রের বোধ হইল যেন শরীর ঈষৎ কাঁপিতেছে ও ললাটে ঈষৎ ঘর্ম্ম দেখা যাইতেছে। উদ্বেগ সম্বরণ করিয়া জেলেখা ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের নিকট আসিয়া ক্ষত স্থান পরীক্ষা করিল। ক্ষত প্রায় আরাম হইয়াছে, জ্বরও গিয়াছে, কেবল শরীর দুর্ব্বল। নরেন্দ্রনাথ

বিস্মিত হইয়া একদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, জেলেখার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, শরীরের সমস্ত রক্ত বেগে ললাট, চক্ষু ও গণ্ডস্থল আপ্লুত করিল, আবার সহসা তিরোহিত হইল।

পূর্ব্বেই এই গৃহ ও শয্যা দেখিয়া নরেন্দ্র অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন, কোথায় আসিয়াছেন, কে তাঁহাকে আনিল, কে সেবা করিতেছে। জেলেখাও মস্‌রুরের কথা শুনিয়া ভীত হইয়াছিলেন; এখন জেলেখার আচরণ দেখিয়া আরও বিস্মিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আমি কোথা আছি,—এই কি বঙ্গদেশ,—আপনি কে,—আপনার নাম কি?"

নিঃস্তব্ধ নিশাযোগে সহসা বজ্রধ্বনি হইলে লোকে যেরূপ চমকিত হয়, জেলেখা সহসা নরেন্দ্রের এই প্রথম কথা শুনিয়া সেইরূপ চমকিত হইল।—কেন? কে বলিবে? কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে রক্তবর্ণ সূক্ষ্ম ওষ্ঠদ্বয়ে অঙ্গুলি স্থাপন করিল। নরেন্দ্রনাথ আবার বলিলেন—

"আমি অসহায় নিরাশ্রয়! আমি কোথায় আছি, অনুগ্রহ করিয়া বলুন।"

জেলেখা আবার ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলি স্থাপন করিল। ক্ষণেক পর নরেন্দ্রনাথ অতিশয় ভীত ও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সুন্দরি! আমার বোধ হইতেছে আমি কোন বিপদে পড়িয়াছি, আমার হৃদ্‌কম্প হইতেছে—আমি অভাগা, জন্মাবধি অভাগা, আমাকে একটী কথা বলিয়া রক্ষা করুন, আমি কি নিরাপদে আছি?"

জেলেখা আবার অঙ্গুলি ওষ্ঠে স্থাপিত করিয়া সহসা মুখ ফিরাইল। নরেন্দ্রনাথের বোধ হইল যেন তিনি জেলেখার উজ্জ্বল চক্ষুতে জল দেখিতে পাইলেন। আর কোন প্রশ্ন করা বিফল বিবেচনায় নীরব হইয়া পড়িলেন, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"হায় আমার মত কে অভাগা!"

অস্পষ্ট প্রতিধ্বনির মত একটী শব্দ শুনিতে পাইলেন, "জেলেখা অভাগিনী!" একথা কি জেলেখা উচ্চারণ করিল? তাহা ত বোধ হয় না, জেলেখা ধীর পদসঞ্চরণে সেই ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। তবে কি নরেন্দ্রনাথের আপনার শেষোচ্চারিত কথার প্রতিধ্বনি হইল? "জেলেখা অভাগিনী!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল ?

কয়েক দিবসের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ বিশেষ আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু শারীরিক আরোগ্য হইলে কি হইবে, অন্তঃকরণ চিন্তায় ক্লিষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার সেই ঘরে কেবল মসরুর বা জেলেখা ভিন্ন কেহ আইসে না, কেহই কথা কহে না; মসরুরকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়া চলিয়া যায়, জেলেখা ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলি স্থাপন করে, অথচ স্পষ্ট বোধ হয়, জেলেখা তাঁহার দুঃখে দুঃখী, তাঁহার বিপদে বিপদাপন্ন। নরেন্দ্রনাথ ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি কি বঙ্গদেশে আসিয়াছেন? সুলতান সুজা নরেন্দ্রনাথকে ভাল বাসিতেন, সুলতানই কি স্বয়ং আজ্ঞা দিয়া নরেন্দ্রের পীড়ার সময় সেবাশুশ্রূষা করাইতেছেন, সম্ভব বটে; রাজ-অট্টালিকা না হইলে এরূপ বহুমূল্য দ্রব্য কোথায় সম্ভবে? কিন্তু সুজা কাশীর যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন; নরেন্দ্রনাথ মৃতপ্রায় হইয়া শত্রুহস্তে পড়িয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অল্প অল্প স্মরণ ছিল। শত্রুরা কি অবশেষে তাঁহাকে বলি দিবার জন্য এইরূপ শুশ্রূষা করিতেছিলেন? তাহার কারণ কি; আর অসহায় নিরাশ্রয় একজন হিন্দুকে বলি দিয়া কোন্ পক্ষের কি লাভ হইবে? নরেন্দ্র কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

রজনী দ্বিপ্রহর, নরেন্দ্রনাথ একখানি দ্বিরদ-রদ-বিনির্ম্মিত আসনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন; সম্মুখে একটী দীপ জ্বলিতেছে, নরেন্দ্র হস্তে গণ্ডস্থাপন করিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছেন।

যখন চিন্তারজ্জু ছিন্ন হইল, একবার বদনমণ্ডল উঠাইয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন। কি দেখিলেন?—"অভাগিনী জেলেখা" নিঃশব্দে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। জেলেখার মুখমণ্ডল ও ওষ্ঠদ্বয় পাণ্ডুবর্ণ, কেশপাশ আলুলায়িত, বদন বিষণ্ণ, নয়নদ্বয় জলে ছল্‌ছল্ করিতেছে। নরেন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"রমণি! আপনি কে জানি না, আপনার মুখ দেখিয়া আমার দুঃখ হইতেছে, আপনার কি অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলুন।"

জেলেখা উত্তর করিল না, ধীরে ধীরে এক বিন্দু চক্ষুর জল মোচন করিল।

নরেন্দ্র আবার বলিলেন—"আপনার হৃদয়ে বোধ হয় কোন বিষম দুঃখ জাগরিত আছে, যদি তাহা দূর করা আমার সাধ্যে থাকে, নিবেদন করুন, আমি যত্নের ত্রুটি করিব না।"

জেলেখা তথাপি নীরব, কিন্তু নরেন্দ্রের স্নেহসূচক কথা শুনিয়া তাহার নয়নদ্বয় হইতে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল। সে চক্ষু-জল মোচন করিয়া জেলেখা আপন হস্ত হইতে একটী অঙ্গুরীয় মোচন করিয়া নরেন্দ্রের নিকট স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন; নিশাযোগে এই সহসা সাক্ষাতের অর্থ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; তাঁহার বোধ হইল যেন কোন ঘোর সঙ্কট সন্নিকট। তিনি হস্তে গণ্ড স্থাপন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; অন্যমনস্ক হইয়া সেই অঙ্গুরীয়টী হস্তে ধারণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সহসা গৃহের দীপ নির্ব্বাণ হইল, ঘোর অন্ধকারে অস্পষ্ট পদশব্দ শ্রুত হইতে লাগিল, অচিরাৎ যে আসনে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন তাহা উত্থিত হইতে লাগিল, হাত দিয়া দেখিলেন তাহার চারি কোণে রজ্জু, সেই রজ্জু দ্বারা আসন উপরে উত্থিত হইতেছে!

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! সহসা উপরের ছাদে এক প্রকাণ্ড ছিদ্র দৃষ্ট হইল, সেই ছিদ্র হইতে রেখাকারে উজ্জ্বল আলোক আসিতে লাগিল। অচিরাৎ নরেন্দ্রের আসন উপরের ঘরে নীত হইল, ছিদ্র আবৃত হইল।

তখন নরেন্দ্র বিস্ময়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু সহসা অন্ধকার হইতে উজ্জ্বল আলোকে আনীত হওয়ায় কিছুই দেখিতে পাইলেন না, বরং সে আলোক সহ্য করিতে না পারিয়া হস্ত দ্বারা নয়ন আবৃত করিলেন; অমনি শত নারী-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত হাস্যধ্বনিতে সে উন্নত প্রাসাদ ধ্বনিত হইতে লাগিল।

নরেন্দ্র জীবনে কখনও এরূপ বিস্মিত হয়েন নাই। কোথায় আসিলেন, এ কি প্রকৃত ঘটনা না স্বপ্ন, এ কি পার্থিব না ঐন্দ্রজালিক ঘটনা? নরেন্দ্র পুনরায় চক্ষু উন্মীলন করিলেন, পুনরায় উজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় তাঁহার নয়ন ঝলসিত হইল, পুনরায় হস্ত দ্বারা নয়ন আবৃত করিলেন, পুনরায় শত নারী-কণ্ঠ-ধ্বনিতে প্রাসাদ শব্দিত হইতে লাগিল। নরেন্দ্রের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না।

ক্ষণেক পর যখন চাহিতে সক্ষম হইলেন, তখন যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার বিস্ময় দশগুণ বর্দ্ধিত হইল। দেখিলেন মর্ম্মর-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত একটী উচ্চ প্রাসাদের মধ্যে তিনি আনীত হইয়াছেন। সারি

সারি প্রস্তরস্তম্ভ উচ্চ ছাদ ধারণ করিতেছে, সে ছাদে ও সে স্তম্ভে যেরূপ সুবর্ণ, রৌপ্য ও বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তরের কারুকার্য্য দেখিলেন, সেরূপ তিনি জগতে কুত্রাপি দেখেন নাই। স্তম্ভ হইতে স্তম্ভান্তরে সুগন্ধ পুষ্পমালা লম্বিত রহিয়াছে, নীচে স্তবকে স্তবকে পুষ্প রাশি করা রহিয়াছে, শত নারীকণ্ঠ হইতে পুষ্পমাল্য দোদুল্যমান হইয়া সুগন্ধে ঘর আমোদিত করিতেছে। ছাদ হইতে, স্তম্ভ হইতে, পুষ্প ও পত্ররাশির মধ্য হইতে সহস্র গন্ধদীপ নয়ন একেবারে ঝলসিত করিতেছে ও সেই সুন্দর উন্নত প্রাসাদ আলোকময় ও গন্ধপরিপূর্ণ করিতেছে। রেখাকারে শত রমণী দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই রেখার মধ্যস্থানে দীপালোকপ্রতিঘাতী, রত্নরাজিবিনির্ম্মিত উচ্চ সিংহাসনে আর একজন রমণী উপবেশন করিয়া আছে;—রমণী, না অপ্সরা? এ স্বপ্ন, না ইন্দ্রজাল? নরেন্দ্র আলফলায়লায় পড়িয়াছিলেন, যে এবনহাসেন নামক একজন দরিদ্র ব্যক্তি এক দিন নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া সহসা দেখিলেন, যেন তিনি বগদাদের কালিফ হইয়াছেন! নরেন্দ্রের স্বপ্ন তদপেক্ষাও বিস্ময়কর, তিনি যেন সহসা স্বর্গোদ্যানে আপনাকে অপ্সরাবেষ্টিত দেখিলেন!

নরেন্দ্র সেই অপ্সরা বা নারী-রেখার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহারা নিঃশব্দে রেখাকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সকলেই বক্ষের উপর দুই হস্ত স্থাপন করিয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিয়াছে; দেখিলে যেন জীবনশূন্য পুত্তলির ন্যায় বোধ হয়। তাহাদের কেশপাশ হইতে মণিমুক্তা দীপালোক প্রতিহত করিতেছে; উজ্জ্বল বহুমূল্য বসন সেই আলোকে অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইতেছে; তাহারা সকলেই যেন রাজ্ঞীর আদেশ-সাপেক্ষ হইয়া নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

সেই রাজ্ঞীর দিকে যখন চাহিলেন, নরেন্দ্র তখন শতগুণ বিস্মিত হইলেন। যৌবন অতীত হইয়াছে, কিন্তু যৌবনের উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য ও উন্মত্ততা এখনও বিলীন হয় নাই; বোধ হয় যেন প্রথম যৌবনের বেগ ও লালিত্য ও লালসা বয়সে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজ্ঞীর শরীর উন্নত, ললাট প্রশস্ত, ওষ্ঠ ও সমস্ত বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ, কৃষ্ণ কেশপাশ হইতে একটী মাত্র বহুমূল্য হীরকখণ্ড আলোকে ধক্‌ধক্ করিতেছে; নয়নদ্বয় তদপেক্ষা অধিক জ্যোতির সহিত উজ্জ্বল! মলমলের অবগুণ্ঠনে সে উজ্জ্বলতা গোপন করিতে অক্ষম। দেখিলেই বোধ হয়, নারী হউন বা অপ্সরা হউন, ইনি কোন অসাধারণ মহিলা, জগৎ বা স্বর্গপুরী শাসন করিবার জন্যই অবতীর্ণা হইয়াছেন।

কিন্তু নরেন্দ্রের এ সমস্ত দেখিবার অবসর ছিল না। সহসা যেন স্বর্গীয় বাদ্যযন্ত্র হইতে কোন স্বর্গীয় তান উত্থিত হইতে লাগিল, তাহার সহিত সেই শত অপ্সরার কণ্ঠধ্বনি মিশ্রিত হইতে লাগিল। সেরূপ অপরূপ গীত নরেন্দ্র কখনও শুনেন নাই; তাঁহার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইল, তিনি প্রায় জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সেই গীত ক্রমে উচ্চতর হইয়া সেই উন্নত প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া উন্নত নৈশ গগনে বিস্তার পাইতে লাগিল; বোধ হইল যেন যথার্থই অদৃষ্ট নৈশ গগনবিহারী জীবগণ সেই গীতের সহিত যোগ দিয়া শতগুণ বর্দ্ধিত করিতে লাগিল! ক্রমে আবার মন্দীভূত হইয়া সে গীত ধীরে ধীরে লীন হইয়া গেল; আবার প্রাসাদ নিস্তব্ধ শব্দশূন্য! এইরূপ একবার, দুইবার, তিনবার গীতধ্বনি শ্রুত হইল, তিনবার সেই গীতধ্বনি ক্রমে লীন হইয়া গেল।

তখন রাজ্ঞী সজোরে পদাঘাত করায় সেই প্রাসাদের এক দিকের একটী রক্তবর্ণ যবনিকা পতিত হইল, নরেন্দ্র সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন; তাহার অপর পার্শ্বে চারি জন কৃষ্ণবর্ণ কুঠারহস্ত খোজা রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে! রাজ্ঞী পুনরায় পদাঘাত করায় তাহাদের মধ্যে প্রধান একজন রাজ্ঞীর সিংহাসনপার্শ্বে যাইয়া দণ্ডায়মান হইল; নরেন্দ্র দেখিলেন, সে—মস্‌রুর! নবেন্দ্রের ধমনীতে শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইল।

মস্‌রুর রাজ্ঞীর সহিত অনেকক্ষণ অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতে লাগিল, কি বলিতেছিল নরেন্দ্র তাহা শুনিতে পাইলেন না; কিন্তু কথা কহিতে কহিতে মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্রের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া নয়ন আরক্ত করিয়া যেন কি উত্তেজনা করিতে লাগিল। মস্‌রুর কি বলিতেছিল নরেন্দ্র তাহা জানিলেন না, কিন্তু তাহার আকৃতি ও ইঙ্গিত দেখিয়া নরেন্দ্রের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। রাজ্ঞীও সেই উত্তেজনাবাক্য শ্রবণ করিয়া নয়ন আরক্ত করিয়া পুনরায় সজোরে ভূমিতলে পদাঘাত করিলেন।

তৎক্ষণাৎ প্রাসাদের অন্য পার্শ্বে একটী হরিদ্বর্ণ যবনিকা পতিত হইল; তাহার পার্শ্বে চারিজন পরিচারিকা হরিদ্বর্ণ পরিচ্ছদে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দ্বিতীয় বার পদাঘাত করায় তাহার মধ্যে প্রধান একজন রাজ্ঞীর নিকট আসিল; নরেন্দ্র সবিস্ময়ে দেখিলেন সে পরিচারিকা—জেলেখা!

জেলেখা কি বলিল তাহা নরেন্দ্র শুনিতে পাইলেন না, কিন্তু তাহার আকার ও অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া বোধ হইল সে রাজ্ঞীর অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছে, যেন কোন বন্দীর জীবনরক্ষার প্রার্থনা করিতেছে। সকলেই দেখিতে পাইল, সেই জেলেখার কথা শুনিয়া রাজ্ঞীর ক্রোধ ক্রমে লীন হইল; তাঁহার নয়ন ও ওষ্ঠে স্নেহ ও দয়ার চিহ্ন প্রকাশ হইল।

জেলেখাও বারবার নরেন্দ্রের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিতে লাগিল ও রাজ্ঞী বারবার সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন; সে রূপরাশি দেখিলে কি নারী, কি অপ্সরা, সকলেরই চমকিত হওয়া সম্ভব। নরেন্দ্র স্বভাবতঃ গৌরবর্ণ, কিন্তু সম্প্রতি পাড়াবশতঃ তাঁহার মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়া যেন অধিকতর সুন্দর বোধ হইতেছিল। নয়ন সেইরূপ জ্যোতিঃপরিপূর্ণ, ললাট সেইরূপ উন্নত, বদনমণ্ডল সেইরূপ উগ্র ও তেজঃব্যঞ্জক। মৃত্যু আসন্ন জানিয়া নরেন্দ্র সাহসে নির্ভর করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন; রক্তবর্ণ ওষ্ঠের উপর দন্তস্থাপন করিয়া ভূমির দিকে একদৃষ্টিতে নিঃশব্দে চিন্তা করিতেছিলেন; কেবল এক একবার একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন। এরূপ সাহসী অল্পবয়স্ক সুন্দর যুবার উন্নত ললাট ও প্রশস্ত মুখমণ্ডলের দিকে চাহিলে কোন্ নারীর হৃদয় সহসা চমকিত না হয়?

রাজ্ঞী অবশেষে হাস্য করিয়া জেলেখাকে কি আদেশ করিলেন; সে নরেন্দ্রের নিকট আসিয়া বলিল. "আমাদের জীবন মৃত্যু এক্ষণে তোমার আপনহস্তে, এক্ষণে সিংহাসনের নিকট যাইয়া নম্রভাবে আপন জীবনরক্ষা প্রার্থনা কর; রক্ষা পাইলেও পাইতে পার।" এই বলিয়া নরেন্দ্রের হস্তধারণ করিয়া সিংহাসনের নিকট তাঁহাকে লইয়া গেল। নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন, তিনি কি দোষ করিয়াছেন, কি বিপদে পড়িয়াছেন, কোথায় আছেন, স্বর্গে না পৃথিবীতে, তাহা জানেন না;—তিনি কি প্রার্থনা করিবেন?

সহসা রাজ্ঞীর বদনমণ্ডল ক্রোধে একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল, নয়নদ্বয় আরক্ত হইল; তিনি দণ্ডায়মান হইয়া ক্রোধভরে জেলেখাকে পদাঘাত করিলেন ও পুনরায় ইঙ্গিত করায় মস্‌রুর ও অন্য তিন জন কুঠারহস্ত খোজা আসিয়া নরেন্দ্রকে বেষ্টন করিল। রাজ্ঞী ক্ষণেক সরোষে নরেন্দ্রের বামহস্তের দিকে তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিলেন, পরে সেই প্রাসাদ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া গেলেন। নরেন্দ্র আপন বামহস্তের দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—জেলেখাদত্ত অঙ্গুরীয়।

একেবারে দীপাবলি নির্ব্বাণ হইল, সেই চারি জন খোজা ভিন্ন সকলেই ঘর হইতে বহিষ্ক্রান্ত হইল, নিঃশব্দে অন্ধকারে সেই খোজাগণ রজ্জুদ্বারা নরেন্দ্রকে বন্ধন করিতে লাগিল।

অন্ধকারে কে নরেন্দ্রের মুখের নিকট একটী পাত্র ধারণ করিল, নরেন্দ্র বিস্ময় ও উদ্বেগে তৃষার্ত্ত হইয়াছিলেন,—সেই পাত্র হইতে পানীয় পান করিলেন; অচিরাৎ অচেতন হইয়া পড়িলেন। তাহার পর কি হইল তিনি জানিলেন না; কেবল বোধ হইল যেন সেই অন্ধকারে কে আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে সেই অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিল আর কে যেন অন্ধকারে করুণস্বরে রোদন করিতেছিল; তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, সে অভাগিনী জেলেখা!

নরেন্দ্রনাথ যখন জাগ্রত হইলেন তখন দেখিলেন সূর্য্য উদয় হইয়াছে, সূর্য্যের রশ্মিতে তিনি একটী প্রশস্ত বাজারের মধ্যে একটী পর্ণকুটীরের ধারে শুইয়া রহিয়াছেন, সূর্য্যের নবজাত রশ্মি তাঁহার মুখে পতিত হইয়াছে ও পথ, ঘাট, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা, দোকান, বাজার, বস্তী আলোকময় করিয়াছে। এ কি সহর?—এ কি বঙ্গদেশের রাজধানী রাজমহল? হইতে পারে, তাহা না হইলে এত লোকারণ্য কেন? তিনি আসিলেন কি প্রকারে? সুলতানসুজা কি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বারাণসী হইতে এই স্থানে আনিয়াছেন? গত নিশায় কি তিনি এই ভূমি-শয্যায় শুইয়া পীড়াবশতঃ প্রাসাদ ও পরীর স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন? না, এ সমস্ত ইন্দ্রজাল?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গজপতি সিংহ।

নরেন্দ্রের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। সে স্থানটী তিনি পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। সেই স্থান একটী প্রকাণ্ড সরাইয়ের মত বোধ হইল। মধ্যস্থানে একটী প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, তাহার চারিপার্শ্বে দ্বিতল হর্ম্ম্য-শ্রেণী, প্রত্যেক কুঠরীতে দুই একটী করিয়া লোক আছে, সে সমস্ত লোক অধিকাংশই সম্ভ্রান্ত পারস্য, উসবেক, পাঠান বা হিন্দু বাণিজ্য-ব্যবসায়ী লোক, প্রথমে নগরে আসিয়া এই সরাইয়ে বাসা করিয়া আছে। সকল লোক সরাইয়ে আসিলে নিশায় দ্বার রুদ্ধ হইয়াছিল

এক্ষণে প্রাতঃকালে পুনরায় সরাইয়ের বহির্দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, লোকে সমাগমন করিতে লাগিল।

এক বৃদ্ধ পারস্যদেশীয় সেখ একটী প্রকোষ্ঠে বসিয়া তামাক খাইতেছিল। নরেন্দ্র যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“সেখজী এটী কোন্ স্থান? আমি এখানে নূতন আসিয়াছি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।” সেখজী বলিলেন—“বৎস, আমিও বাণিজ্যকর্ম্মে এই সহরে কল্য আসিয়াছি, সহরের বিশেষ কিছু জানি না।” নরেন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—“সেখজী আপনি আমার অপেক্ষা অধিক জানেন, এই স্থানের নাম কি বলুন।” সেখজী উত্তর করিলেন—“আমি যথার্থই বলিতেছি এ সহরের কিছুই জানি না, তবে শুনিলাম এই স্থানটী বেগম সাহেবের সরাই, সম্রাটের জ্যেষ্ঠকন্যা পাদশা বেগম সহরের নূতন আগন্তুকের থাকিবার সুবিধার জন্য এই উৎকৃষ্ট সরাই নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। আমি সুমরকন্দ ও বোখারা দেখিয়াছি, শীরাজ ও ইস্পাহান দেখিয়াছি, কিন্তু এমন সুন্দর সহর দেখি নাই।” নরেন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—“এ সহরের নাম কি? পাদশা বেগমই বা কে?” বৃদ্ধ বণিক অনেকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে যুবকের দিকে চাহিয়া একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন—“এ কাফের জ্ঞানশূন্য পাগল দেখিতেছি; পাগলটাকে তাড়াইয়া দাও, পাগলামি চড়িলেই এইক্ষণেই কি করিয়া বসিবে।” নরেন্দ্র গতিক মন্দ দেখিয়া সেস্থান হইতে সরিয়া গেলেন।

দেখিলেন একজন পাঠান-স্ত্রী কতকগুলি ফলমূল লইয়া বিক্রয়ার্থ ধনী বণিকদিগের নিকট যাইতেছে। নরেন্দ্র তাহার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“বিবি, এ সহরের নাম কি, এ স্থানকেই বা লোকে কি বলে?” বৃদ্ধা বিস্মিত হইয়া ক্ষণেক নরেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া পরে উত্তর করিল—“কাফের, আমার সে বয়স নাই, উপহাস করিতে হয় অন্য স্থানে যাও, এ খুবসুরৎ মুখ দেখিলে অনেক কঞ্চনীও ভুলিয়া যাইবে।” নরেন্দ্রনাথ অপ্রতিভ হইলেন।

দেখিলেন একজন রাজপুত সৈনিক পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, একজন ভৃত্য তাহার অশ্বের সেবা করিতেছে, সৈনিক সসজ্জ হইয়া ভৃত্যকে শীঘ্র কার্য্য সমাধা করিতে বলিতেছেন। নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—“আমি নূতন এই স্থানে আসিয়াছি, এস্থানটীর নাম কি জানি না, আপনি বোধ হয় অনেক দিন আছেন, আমাকে একটু সহায়তা করুন।” সৈনিক উত্তর করিল—“আমার এমন অর্থ নাই যে তোমাকে সহায়তা

করি, তুমি যুবা পুরুষ, তোমার ভিক্ষা করিতে লজ্জা বোধ হয় না, আমি তোমায় বয়সে সৈনিকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, ইচ্ছা হয় তুমিও আইস, মহারাজ যশোবন্তের অধীনে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। যুদ্ধের ন্যায় আর ব্যবসায় নাই, মহারাজের প্রসাদে আমাদের বিপুল মান্য ও সম্মান, আমরা যেখানে থাকি সেই আমাদের ঘর। কল্য দেশে ছিলাম, অদ্য রাজধানীতে আছি, আবার কল্য নর্ম্মদাতীরে যাইয়া মহারাজের প্রসাদে আরংজীব ও মোরদের মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া আনিব। সাহস হয় আইস, এই ব্যবসায় প্রবৃত্ত হও, সাহস না থাকে, চলিয়া যাও, রাজপুত ভীরুর সহিত কথা কহে না।” নরেন্দ্র সরোষে উত্তর করিলেন—“কেবল তুমিই যুদ্ধব্যবসায়ী এরূপ বোধ করিও না, আমিও যুদ্ধ করিয়াছি, কর্ত্তব্য কর্ম্মে আমি পরাঙ্মুখ কি সম্মুখ আমার স্বদেশের সুবাদার তাহা জানেন। রাজপুত, আমি অর্থ ভিক্ষা করি নাই।”

রাজপুত অনেকক্ষণ নরেন্দ্রের দিকে দেখিয়া উত্তর করিলেন—

“বালক, তোমার মুখ আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি;—তুমি বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছ না?—হাঁ, স্মরণ হইয়াছে,—তুমি আমাকে ইহার মধ্যে বিস্মৃত হইয়াছ?”

নরেন্দ্র ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। নরেন্দ্র তখন রাজপুতকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন—

“না, বিস্মৃত হই নাই। গজপতি, তুমি কাশীর যুদ্ধের পর আমার জীবনরক্ষা করিয়াছ, জীবন থাকিতে আমি তোমাকে বিস্মৃত হইতে পারি না; আমার সরোষ বাক্য মার্জ্জনা কর।”

দুই জনে অনেকক্ষণ আলাপ পরিচয় হইতে লাগিল। গজপতি বলিলেন যে,—“আমি মহারাজ জয়সিংহের নিকট হইতে কতিপয় পত্রাদি লইয়া আমার প্রভু মহারাজ যশোবন্তসিংহের নিকট যাইতেছি। তিনি আপাততঃ উজ্জয়িনীতে আরংজীবের সহিত যুদ্ধার্থে গিয়াছেন, যুদ্ধ না হইতে হইতেই আমি তথায় পঁহুছিতে পারিলেই মঙ্গল। তুমি ইচ্ছা কর, তবে আমার সঙ্গে আইস, আমি মহারাজকে বলিয়া তোমাকে অশ্বারোহীর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিব।” নরেন্দ্র সে দেশে বন্ধুহীন ও অর্থহীন, ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ক্ষণেক কথোপকথনের পর বলিলেন,—“একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, উপহাস করিতেছি না,—আমি পীড়িত অবস্থায় এই স্থানে আসিয়াছি, আমাকে কে আনিয়াছে জানি না,—এসহরও কখন দেখি নাই,—ইহার নাম কি?”

গজ। "এসহরের নাম জিজ্ঞাসা করিতেছ?" লোকে তোমাকে বাতুল মনে করিবে; এরূপ সরাই, ঐরূপ রাজবাটী তুল্য অট্টালিকাশ্রেণী আর কোথায় সম্ভবে? এ দিল্লীনগর।" "দিল্লীনগর?" এই কি দিল্লী? নরেন্দ্রনাথ না বঙ্গদেশে ছিলেন, এস্থানে তাহাকে কে আনিল, তিনি কবে আসিলেন, যথার্থই কি অপ্সরাগণ তাঁহাকে বঙ্গদেশ বা প্রয়াগ হইতে কল্য রজনীতে দিল্লী আনিয়াছে? নরেন্দ্র ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে দুইজনে দিল্লীনগরে ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেন।

মহাভারতে বিবৃত ইন্দ্রপ্রস্থ নগর যে স্থানে ছিল, ভারতবর্ষের শেষ হিন্দু সম্রাট্ ও মহম্মদ ঘোরীর প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথুরায়ের রাজধানী দিল্লীনগর যে স্থানে ছিল, এই আখ্যায়িকা বিবৃত সময়ের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট্ শাজিহান সেইস্থানে নূতন রাজধানী স্থাপন ও সুন্দর প্রাসাদ, দুর্গ ও অট্টালিকাশ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়া নগরের শাজিহানাবাদ নাম দেন। কিন্তু নগরের সে নাম কেহ জানে না; অদ্যাপি শাজিহানের নগর নূতন দিল্লী নামে বিখ্যাত। পৃথুরায়ের সময়ের হিন্দু নাম অদ্যাপি পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

দিল্লী—এক দিকে যমুনানদী ও অন্য তিন দিকে অর্দ্ধগোলাকৃতিরূপে ইষ্টক ও মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রাচীর দিয়া বেষ্টিত; সে প্রাচীর প্রশস্ত, ও দীর্ঘে ৪।৫ ক্রোশ, ও তাহার উপর দিয়া যাতায়াতের একটী পথ ছিল। যমুনাও এই প্রাচীরের মধ্যে দিল্লীনগর সন্নিবেশিত, কিন্তু প্রাচীরের বাহিরেও তিন চারিটী বৃহৎ বৃহৎ পল্লী ছিল ও ধনাঢ্য ওমরাহ ও হিন্দুরাজগণের অট্টালিকা ও বাগান অনেক দুব অবধি দেখা যাইত। দিল্লীর ভিতরে যমুনার অনতিদূরে পরিখা ও প্রাচীর-পরিবেষ্টিত দুর্গ আছে, দুর্গ ও নদীর মধ্যে কেবল একটী বিস্তীর্ণ বালুকাক্ষেত্র ছিল; এই বালুকাক্ষেত্রে রাজা ও ওমরাহগণ সময়ে সময়ে যুদ্ধাভিনয় করিতেন, দুর্গের ভিতর হইতে বেগমগণ তাহা দৃষ্টি করিতেন। আধুনিক দিল্লী সকলেই দেখিয়াছেন, পাঠক, চল, নরেন্দ্র ও গজপতির সঙ্গে আমরাও সপ্তদশ শতাব্দীর দিল্লী দর্শন করিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করি।

গজপতি ও নরেন্দ্র দিল্লীর একটী প্রধান পথ দিয়া দুর্গাভিমুখে যাইতে লাগিল। সমস্ত দিল্লীই প্রায় সৈনিকের বাস, সে নগরে পঞ্চত্রিংশৎ সহস্রের অনধিক সৈন্য প্রায় কখনই নিবাস করিত না। সৈনিকগণের স্ত্রী, পরিবার ও বহুসংখ্যক ভৃত্য দিল্লীনগরে বাস করিত। তাহারা প্রায়ই মৃত্তিকা ও পর্ণকুটীরে বাস করিত, সুতরাং দিল্লী এইরূপ পর্ণকুটীরেই

পরিপূর্ণ। যে দিকে দেখা যায়, এইরূপ কুটীরশ্রেণীই অধিকাংশ দেখা যাইত। খাদ্যদ্রব্য বস্ত্রাদি বিক্রয়ার্থ যে দোকান ছিল তাহাও অধিকাংশ পর্ণকুটীর; সর্ব্বদাই অগ্নি লাগিত ও বৎসরে প্রায় বহু সহস্র পর্ণকুটীর একেবার দগ্ধ হইয়া যাইত। নরেন্দ্র দুই ধারে এইরূপ কুটীর দেখিতে দেখিতে চলিলেন। দোকানী পশারী নানারূপ দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে, পথ লোকারণ্য; অধিকাংশই অতি সামান্য লোক, অতি সামান্য বেশে নিজ নিজ কর্ম্মে যাইতেছে। দিল্লীতে এক্ষণে যেরূপ মধ্যশ্রেণী ব্যবসায়ী ও ও অন্যান্য লোক ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিয়া নগর পরিপূর্ণ ও সুশোভিত করিয়াছে, পূর্ব্বে তাহা ছিল না। কেবল মহল্লোক বা ইতর লোক, প্রাসাদ বা পর্ণকুটীর ছিল। ইংরাজশাসনের পূর্ব্বে মধ্যশ্রেণী ছিল না।

যাইতে যাইতে নরেন্দ্র একটী বড় রাজপথে গিয়া পড়িলেন। সে পথে অনেকগুলি প্রশস্ত ও বড় বড় অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। মন্সবদার, কাজী, বণিক, ওমরাহ, রাজা প্রভৃতি মহল্লোকের হর্ম্ম্যশ্রেণীতে পথ সুন্দর দেখাইতেছে। নরেন্দ্র এরূপ সুন্দর অট্টালিকাশ্রেণী কোথাও দেখেন নাই, একটী বিস্তীর্ণ প্রাসাদের নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া গজপতির সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্র। "ঐ হস্তী আরোহণ করিয়া অত সমারোহে কে যাইতেছে জান?"

গজপতি। "উনি দিল্লীর মধ্যে একজন বড় বিদ্বান্ বলিয়া খ্যাত, নাম দানেশমন্দ। বাদশা বড় ভাল বাসেন।" হস্তী ও আরোহী ও অনুচরবর্গ চলিয়া গেল।

ন। "আর ও কে যাইতেছে? আকৃতি পাঠানের ন্যায়, আরোহী যেমন তেজস্বী, অশ্বও যেন সেইরূপ তেজস্বী।"

গ। "জানি না দিল্লীর কোন প্রধান পাঠান ওমরাহ হইবেন।" অশ্বারোহী চলিয়া যাইল।

ক্ষণেক যাইতে যাইতে উভয়ে প্রসিদ্ধ জমা মস্‌জীদ দেখিতে পাইলেন, ভারতবর্ষে সেরূপ মস্‌জীদ আর একটীও ছিল না। নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সম্মুখে ঐ বৃহৎ অট্টালিকা কি?—যেন মস্‌জীদের মত বোধ হইতেছে, ওরূপ অপূর্ব্ব হর্ম্ম্য আমি জন্মেও দেখি নাই।"

গ। "ও মস্‌জীদ্‌ই বটে, শুনিয়াছি উহা নির্ম্মাণ করিতে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছে। পর্ব্বতের উপরিভাগ সমতল করিয়া তাহার উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। দেখ কেমন উহার আরক্ত বর্ণে নয়ন ঝলসাইয়া

যাইতেছে, তাহার উপর কেমন শ্বেতপ্রস্তরের তিনটী গম্বুজ উঠিয়াছে, এরূপ অট্টালিকা তোমাদের বঙ্গদেশে আছে? বাদশাহ যখন দিল্লীতে থাকেন স্বয়ং ঐ মস্‌জীদে প্রতি শুক্রবার যান,—সে যে সমারোহ যদি এক দিন দেখিতে কখনও ভুলিতে না। দুর্গ হইতে মস্‌জীদ পর্য্যন্ত চারি পাঁচ শত শিপাহী সার দিয়া দাঁড়ায়, তাহাদের বন্দুকের উপর হইতে সুন্দর রক্তবর্ণ পতাকা উড়িতে থাকে। পাঁচ ছয় জন অশ্বারোহী পথ পরিষ্কার করিতে করিতে আগে যায়, পরে বাদশাহ হস্তীর উপর জাজ্বল্যমান এক সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যান, তাহার পর কত ওমরাহ মনসবদার অপরূপ সজ্জা করিয়া যায় তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু আর এস্থানে দাঁড়াইয়া কি হইবে, চল আমরা রাজবাটী দেখিগে। সেরূপ সুন্দর অট্টালিকা তোমাদেব বঙ্গদেশে কি হিন্দুস্থানে নাই।” নরেন্দ্র সম্মত হইলেন, উভয়ে দুর্গাভিমুখে চলিলেন।

দূর হইতেই রক্তবর্ণ উন্নত দুর্গপ্রাচীরের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ চমৎকৃত হইলেন। যত নিকটে আসিতে লাগিলেন ততই নয়ন আরও আকৃষ্ট হইতে লাগিল। সে সময়ে ভারতবর্ষে যে দেশের যে লোক আসিয়াছেন দিল্লীর রাজবাটীর শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত মতি মস্‌জীদ, প্রাসাদ ও হর্ম্ম্যাবলীকে জগতের মধ্যে প্রায় অতুল্য বলিয়া সকলেই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। দুর্গপ্রবেশের স্থানে একটী বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ তাহার মধ্যে একজন হিন্দুরাজার শিবিরশ্রেণী রহিয়াছে, রাজা দুর্গের দ্বার রক্ষা করিতেছেন। চারিদিকে নানা দেশের নানা লোক আসিয়া উত্তমোত্তম দ্রব্যাদি ক্রয়বিক্রয়াদি করিতেছে। অশ্বারোহী ও ওমরাহগণ সর্ব্বদাই এদিক্ ওদিক্ যাতায়াত করিতেছেন, দুর্গের ভিতর হইতে শিপাহীগণ বাহিরে আসিতেছে আবার ভিতর যাইতেছে। সেরূপ জনাকীর্ণ ও সুন্দর স্থান প্রায় সহরের মধ্যে ছিল না। কত দেশের কত সহস্র লোক তথায় একত্রিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান লোক তথায় সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেছে, ক্রয়বিক্রয়ার্থ সহস্র সহস্র ইতর লোক যেন নদীর স্রোতের ন্যায় এদিক্ ওদিক্ ধাবিত হইতেছে।

দ্বারদেশে দুইটী প্রস্তরনির্ম্মিত হস্তীর আকৃতি, তাহার উপর দুইটী মনুষ্যের প্রতিমূর্ত্তি। নরেন্দ্র উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“এ কাহার প্রতিমূর্ত্তি?” গজপতি বলিলেন—“আপনি হিন্দু, আপনি জানেন না? ইঁহারা দুই জন রাজপুত বীরপুরুষ। চিতোরের জয়মল্ল ও পত্ত সম্রাট্ আকবরের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়া সেই দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন;

পরে যখন আর পারিলেন না, অধীনতা স্বীকার করিতে অস্বীকার করিয়া যুদ্ধে হত হয়েন। পত্তের মাতাও বীররমণী ছিলেন, তিনিও বীরত্ব প্রকাশ করিয়া হত হয়েন। তাঁহাদিগের কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য সম্রাট্ আকবর এই প্রতিমূর্ত্তি এই স্থানে স্থাপন করিয়াছেন।" পরে সগর্ব্বে গজপতি বলিলেন, "কিন্তু রাজপুত রাজাদিগের কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য প্রতিমূর্ত্তির আবশ্যক নাই, যত দিন বীরত্বের গৌরব থাকিবে, রাজপুত নাম কেহ বিস্মরণ হইবে না। রাজপুতানার প্রত্যেক পর্ব্বত-শেখরে রাজপুতের বীরনাম খোদিত আছে, ভারতবর্ষের প্রত্যেক বেগ-বতী নদীতরঙ্গে রাজপুতের বীরনাম শব্দিত হইতেছে।" নরেন্দ্র ও গজপতি দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

প্রশস্ত পথ অতিবাহন করিয়া দুই জনে যাইতে লাগিলেন। পথের দুই ধারে অট্টালিকা তাহার উপর রাজ কর্ম্মচারিগণ রাজকার্য্য করিতেছেন। দুর্গের দ্বারের বাহিরে যেরূপ হিন্দুরাজগণ দ্বার রক্ষা করিতেন, ভিতরে এই পথের উপর মনসবদার ও ওমরাহগণ নিশাকালে দ্বার রক্ষা করিতেন। নরেন্দ্র সেই পথের নিকট দিয়া একটী পরিষ্কার জলের প্রণালী দেখিতে পাইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন——

"এ জল কোথায় গিয়াছে?"

গ। "এই প্রণালী দিয়া যমুনার পরিষ্কার জল দুর্গের অভ্যন্তরে বেগমদিগের মহলে গিয়াছে। শুনিয়াছি প্রতি বেগমের গৃহের পার্শ্ব দিয়া এই জল গিয়াছে।"

ন। "ঐদিক্ হইতে কি গোলমালের শব্দ আসিতেছে, ওস্থানে কি হয়?"

গ। "ও স্থানে বড় বড় কারখানা আছে, রাজপরিবারের যে সমুদায় বিচিত্র বিচিত্র দ্রব্য আবশ্যক হয়, ঐ স্থানে প্রস্তুত হয়। এক স্থানে রেশমকার্য্যের কারখানা, অন্যস্থানে স্বর্ণকারদিগের, অপর স্থানে চিত্রকরদিগের, ছুতার, দরজী, চর্ম্মব্যবসায়ী, বস্ত্রব্যবসায়ী সকল প্রকার লোকের কারখানা আছে। দেশে যত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কারিকর আছে, তাহারা প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত কার্য্য করে, মাসে মাসে বেতন পায়; ইচ্ছা হয়, চল কারখানায় যাই, কত অপরূপ দ্রব্য দেখিতে পাইবে।"

ন। "না আগে ঐদিকে যাই চল, ঐ অপূর্ব্ব উৎকৃষ্ট অট্টালিকা কি, চারিদিকে এরূপ সেনা, অশ্বারোহী, ওমরাহদিগের সমারোহ কেন?" দুই জনে সেইদিকে চলিলেন।

নরেন্দ্র উচ্চ ও সুরম্য প্রবেশদ্বারের উপর নাগরাখানা দেখিলেন। তাহার উপর বিংশতি বা ত্রিংশৎ জন বাদ্যকর দিবারাত্র সর্ব্বদাই রহিয়াছে ও প্রহরে প্রহরে বাদ্য করিতেছে। সে বাদ্য এত উচ্চ যে, নিশাকালে সমস্ত দিল্লীর লোক সেই গম্ভীর সুন্দর বাদ্য শ্রবণ করিতে পারিত। দ্বার দিয়া প্রবেশ করতঃ প্রাঙ্গণে আসিয়া নরেন্দ্র যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার নয়ন একেবারে ঝল্‌সাইয়া গেল। সম্মুখে জগদ্বিখ্যাত মর্ম্মর প্রস্তর-বিনির্ম্মিত প্রাসাদ "দেওয়ান খাস," সে প্রাসাদের ছাদ ও স্তম্ভ সুবর্ণ-দ্বারা মণ্ডিত ও রৌদ্রাতপে ঝল্‌মল্ করিতেছে। সেই প্রাসাদের ভিতরে সুবর্ণ ও হীরকখচিত দিবালোকপ্রতিঘাতী রত্নরাজী-বিনির্ম্মিত রাজ-সিংহাসনের উপর সম্রাট্ শাজিহান উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন; তাঁহার গম্ভীর ও প্রশান্ত মুখমণ্ডলে এখনও পীড়ার চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। তিনি এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেন নাই। পার্শ্বে দক্ষিণদিকে জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা বসিয়া রহিয়াছেন। ললাট ও বদনমণ্ডল সুন্দর ও প্রশস্ত, কিন্তু মুখে দুর্দ্দমনীয় দর্প, অভিমান ও তেজ বিরাজ করিতেছে। পিতার সম্মুখেও সে তেজ সম্পূর্ণ লীন হয় নাই। বামদিকে পৌত্র সুলতান সলাইমান দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; বয়স পঞ্চবিংশতি বর্ষ হইবে, অবয়ব ও আকৃতি সুন্দর ও উন্নত। পশ্চাতে খোজাগণ ময়ুরপুচ্ছবিনির্ম্মিত চামর হেলাইতেছে। তাহার চারিদিকে রৌপ্যনির্ম্মিত রেল আছে, তাহার বাহিরে রাজা, ওমরাহ, মন্সবদার, দূত, সেনাপতি, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান লোক অপরূপ বেশভূষায় ভূষিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভূমির দিকে চাহিয়া দণ্ডায়মান্ হইয়া রহিয়াছে। সম্মুখস্থ সমভূমি লোকারণ্য। কি ধনী কি নির্দ্ধন, কি উচ্চ কি অধম সে স্থানে যাইয়া রাজাকে দর্শন করিবার সকলেরই অধিকার ছিল। সেই অপূর্ব্ব প্রাসাদে যথার্থই লিখিত রহিয়াছে, "যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে, তবে এই স্বর্গ, এই স্বর্গ, এই স্বর্গ।"—

সম্রাটের সম্মুখ দিয়া প্রথমে সুন্দর সুন্দর আরবদেশীয় অশ্ব চলিয়া গেল। পরে বৃহৎকায় হস্তীশ্রেণী পরিদর্শিত হইল, হস্তীগণ কর উত্তোলন করিয়া ও ভীষণ নাদ করিয়া বাদশাহকে "তস্‌লীম" করিয়া চলিয়া গেল। পরে হরিণ, বৃষ, মহিষ, গণ্ডার, ব্যাঘ্র প্রভৃতি সফল জন্তু ও তৎপরে নানারূপ পক্ষী একে একে পরিদর্শিত হইল, পরে কয়েক শত অশ্বারোহী লৌহবর্ম্মে মণ্ডিত হইয়া সদর্পে চলিয়া গেল। এই সমস্ত ও অন্যান্য অনেক প্রকার দৃশ্য দর্শন করিয়া নরেন্দ্র চমৎকৃত হইলেন।

এই সমুদায় হইয়া গেলে পর বাদশাহ দরখাস্ত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কি নীচ কি উচ্চ সকলেই, আসিয়া আসিয়া আপন আপন দুঃখ রাজাধিরাজ ভারতবর্ষের সম্রাটের নিকট জানাইতে লাগিল। সম্রাট দুই একটী আদেশ দিয়া সকলের দুঃখ মোচন করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ যে বিষয়ে যে কথা বলিলেন, তৎক্ষণাৎ সকল প্রধান প্রধান ওমরাহ "কেরামৎ" "কেরামৎ" বলিয়া ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

নরেন্দ্র এই সমস্ত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। দুই ঘণ্টার মধ্যে রাজকার্য্য সমাধা হইয়া গেল; সম্রাট্পুত্র ও কয়েকজন প্রধান প্রধান ওমরাহের সহিত "গোসলখানায়" গেলেন। "গোসলখানা" কেবল হস্তমুখ প্রক্ষালনের জন্য নির্ম্মিত হয় নাই; তথায় প্রধান প্রধান অমাত্যদিগের সহিত রাজকার্য্যের গূঢ় মন্ত্রণাদি হইত। এদিকে রাজকার্য্য সমাধা হইল বলিয়া লোকরাশি আপন আপন গৃহে চলিল, নরেন্দ্রও নগরাভিমুখে যাইতে যাইতে গজপতিসিংহকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

ন। "সম্রাট্ কি সমস্ত মোকদ্দমার কার্য্য আপনি সমাধা করেন?"

গ। "না, অল্প অল্প বিষয় এইরূপে প্রত্যহ স্বয়ং দেখেন, বড় বড় মোকদ্দমায় দুইজন কাজীর সহিত বসিয়া সপ্তাহে একদিন বিচারকার্য্য করেন।"

ন। "পশ্চাতে ঐ উচ্চ প্রাচীর কিসের?"

গ। "ঐ প্রাচীরের পশ্চাতে রাজবাটীর বেগমদিগের ভিন্ন ভিন্ন মহল আছে। শুনিয়াছি সে মহল অতিশয় চমৎকার। প্রত্যেক বেগমের ভিন্ন ভিন্ন মহল আছে, তাহার চারিদিকে বাগান, ফোয়ারা, সুন্দর কুঞ্জবন, গ্রীষ্মকালে থাকিবার জন্য মৃত্তিকার অভ্যন্তরে ঘর, নিশায় শয়নের জন্য প্রস্তরনির্ম্মিত উচ্চ উচ্চ ছাদ ও সুবর্ণ ও রৌপ্যমণ্ডিত হর্ম্ম্যাদি আছে। কিন্তু সম্রাট্ ভিন্ন পুরুষের নয়ন সে সৌন্দর্য্য কখনও দেখে নাই, পুরুষের পদচিহ্নে সে রম্যস্থান অঙ্কিত হয় নাই।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

দেওয়ানা ভাতার বালক।

এইরূপে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে দুইজনে দুর্গের দ্বারের বহির্ভাগে পূর্ব্বোল্লিখিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িলেন, সে স্থান তখনও জনাকীর্ণ।

বড় বড় লোক কেহ শিবিকায়, কেহ হস্তীর উপর, কেহ অশ্বারোহী হইয়া এদিকে ওদিকে যাতায়াত করিতেছে, শত শত ব্যবসায়ী লোক নানা অপরূপ ও বহুমূল্য দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে, তাহা ক্রয় করিতে বা দেখিতে সহস্র সহস্র লোক ব্যস্ত। কেহ বা গান করিয়া বা নৃত্য করিয়া অর্থলাভ করিতেছে, কেহ ভেল্কী দেখাইতেছে, কেহ সাপ দেখাইতেছে, কেহ হাত গণিয়া বলিতেছে। গণক বলিয়া পরিচয় দিয়া অনেকেই তথায় আসিয়াছে। তাহারা সকলে রৌদ্রে আপন আপন জীর্ণ বস্ত্র পাতিয়া বসিয়া রহিয়াছে। এক দিকে একখানা যন্ত্র, আর এক দিকে একখানি করিয়া পুস্তক। অনেক লোক তাহাদের নিকট আসিয়া হাত দেখাইতেছে, কুলকামিনীরাও শুভ্র বসনে মণ্ডিত হইয়া ব্যগ্র হইয়া আসিয়াছে। প্রতিজন এক পয়সা করিয়া দিতেছে।

তাহাদের মধ্যে নরেন্দ্র এক অপরূপ গণক দেখিতে পাইলেন। তাহার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসরের অধিক হইবে না, মুখমণ্ডল অতিশয় কোমল, ও অতিশয় গৌরবর্ণ সূর্য্যাতপে আরক্ত হইয়া গিয়াছে। চক্ষু ও গণ্ডস্থল ও স্কন্ধের উপর জটা পড়িয়াছে। জটা দ্বারা ঈষৎ আবৃত হইলেও চক্ষু হইতে তেজ যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে বাহির হইতেছে; অবয়ব ক্ষুদ্র ও কোমল অথচ তেজঃ-পরিপূর্ণ। মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর কৃষ্ণ বসনে আবৃত, কোমরে বহুমূল্য পেটী রৌদ্রে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। বালক তাতারদেশীয় মুসলমান, কাহারও নিকট পয়সা না লইয়া হাত দেখিতেছে।

তাতার বালকের আকৃতি দেখিয়াই অনেকে তাহার নিকট যাইতেছে। গজপতি ও নরেন্দ্র উভয়েই তাহার নিকট গেল। গজপতি প্রথমে হাত দেখাইল ও জিজ্ঞাসা করিল, "অদ্য সন্ধ্যার সময়ই আমরা দিল্লীনগর পরিত্যাগ করিয়া যাইব, কোথায় যাইব বল দেখি?"

তাতার গজপতির মুখ ও বসন বিশেষ করিয়া দেখিয়া বলিল "মহারাজ যশোবন্তসিংহ নর্ম্মদাতীরে গিয়াছেন, তুমি সেইস্থানে যাইবে।"

গজপতি উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "মহারাজ যশোবন্ত আরংজীবের সহিত যুদ্ধে গমন করিয়াছেন, তাহা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানে; আর আমি রাজপুত অশ্বারোহী, আমার বসন দেখিয়া সকলেই বলিতে পারে, ইহার অধিক বলিবার তোমার বিদ্যা নাই?"

তাতার প্রজ্জ্বলিত নয়নে গজপতির উপর স্থির দৃষ্টি করিয়া ক্ষণেক পর মস্তক নাড়িয়া জটাভার পশ্চাৎ দিকে ফেলিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল—

"রাজপুত! আরও বলিতে পারি, আরংজীবের হস্তে সমস্ত রাজপুতের নিধন হইবে। মহারাজকে বলিও যেন দ্রুতগতি একটী অশ্ব বাছিয়া লয়েন, নতুবা পলাইবার সময় পাইবেন না। সপ্ত সহস্র রাজপুতের মধ্যে সপ্ত শতেরও রক্ষা নাই। রাজপুত! সে যুদ্ধে তোমার নিশ্চয় নিধন।"

গজপতি সাহসী যোদ্ধা, কিন্তু তাতার বালকের আকার বা গম্ভীর স্বর বা প্রজ্জলিত চক্ষু দেখিয়া ও এই কথা শুনিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, শরীরের শোণিত চন্‌চন্‌ করিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সে ভাব অন্তর্হিত হইল, অতিশয় গম্ভীরস্বরে বলিলেন—

"ক্ষতি নাই, যদি জগদীশ্বর ললাটে তাহাই লিখিয়া থাকেন, মহারাজের রক্ষার্থ হৃদয়ের শোণিতদান অপেক্ষা রাজপুত অধিকতর গৌরবের কার্য্য জানে না।"

সকলে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে নরেন্দ্র আপন হাত দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি আমার নাম কি?"

বালক বলিল "নরেন্দ্রনাথ।" সকলে বিস্মিত হইল। নরেন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি যদি যথার্থ হাত দেখিতে জান, বল দেখি কল্য নিশাকালে আমি কাহাকে দেখিয়াছিলাম?"

তাতার অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি এক অপূর্ব্ব গৃহে এক অপূর্ব্ব পালঙ্গে ছিলেন, একটী নারীকে দেখিয়াছিলেন, সে কে, স্থির করিতে পারিতেছি না। আমি বালক, গণনাবিদ্যা সম্পূর্ণ শিখিতে পারি নাই—বোধ হয় সে নারী কোন অভাগিনী হইবে।"

সকলে হাসিয়া উঠিল "না, না, সে নারী বড় সৌভাগ্যবতী, না হইলে সেই অপূর্ব্ব পালঙ্গে এ অপূর্ব্ব সুপুরুষ পাইল কিরূপে?" এইরূপ বলিতে বলিতে সকলে হাসিয়া গোল করিয়া উঠিল।

নরেন্দ্রনাথ হাসিলেন না, গোল করিলেন না, তাতারের কথা শুনিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ক্ষণেক পর তাতার নরেন্দ্রকে একদিকে ডাকিয়া ধীরে ধীরে গুপ্তভাবে বলিল—

"মহাশয়, আমি আপনাকে ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছি, এই কোমরে যে পেটী দেখিতেছেন ইহাতে আমার ধনের পরিচয় দিতেছে। তথাপি আমি ফকীর দেওয়ানা, পীরের কাছে পণ করিয়াছি যাবজ্জীবন দেওয়ানা ফকীর থাকিব। আপাততঃ দিল্লীতে আমার মহা বিপদ, আমার

জীবনের সংশয়, আপনি যুদ্ধে যাইতেছেন, আপনার কাছে যাজ্ঞা, এই ফকীরকে সঙ্গে রাখিবেন, দেওয়ানাকে নিকটে স্থান দিবেন। দেওয়ানা আপনার অপকার করিবে না, উপকার করিবার চেষ্টা পাইবে।"

শেষ কথাগুলি অতিশয় করুণস্বরে উচ্চারিত হইল। নরেন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন দেওয়ানার চক্ষে একবিন্দু জল। ইতিপূর্ব্বে তাতারের তেজঃ-পরিপূর্ণ বাক্যে রাজপুতও কম্পিত হইয়াছিল, সহসা সে ভাব পরিবর্ত্তিত হইল, তাহার করুণস্বরে নরেন্দ্রের হৃদয় বিগলিত হইল। তাতার বোধ হয় যথার্থই জ্ঞানশূন্য দেওয়ানা। নচেৎ এরূপ ভাব পরিবর্ত্তন কেন? নরেন্দ্র পারশীপুস্তকে অনেক রাজপুত্রের কথা পড়িয়াছিলেন, যে তাহারা অল্পবয়সেই রাজ্য ও সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া ফকীরি গ্রহণ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেন। এই তাতার বালকও কি সেইরূপ? অল্পবয়সে অতিশয় কষ্ট সহ্য করিয়া কিছু পরিমাণে জ্ঞানশূন্য হইয়াছে? হইতে পারে। ভাবিয়া চিন্তিয়া নরেন্দ্রনাথ তাহাকে নিকটে রাখিতে সম্মত হইলেন।

সেইদিন সন্ধ্যার সময়েই গজপতি, নরেন্দ্র ও তাতার বালক দিল্লী ত্যাগ করিয়া নর্ম্মদাভিমুখে চলিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

রাজা যশোবন্ত সিংহের শিবির।

১৬৫৮ খৃঃ অব্দে বসন্তকালে প্রাচীন উজ্জয়িনী নগর ও তরঙ্গবাহিনী সিপ্রানদীর অপরূপ দৃশ্য দর্শন করিল। চন্দ্র উদিত হইয়াছে, তাহার উজ্জ্বল কিরণে সিপ্রানদীর উভয় কূলে যতদূর দেখা যায়, শুভ্র শিবিরশ্রেণী দেখা যাইতেছে। একদিকে রাজা যশোবন্ত ও তাহার সহযোদ্ধা কাসেম খাঁর অসংখ্য সেনা চন্দ্রকরোজ্জ্বল শিবিরশ্রেণীর মধ্যে বিশ্রাম করিতেছে, অপর তীরে এক পর্ব্বতোপরি আরংজীব ও মোরদের মোগল সৈন্য রহিয়াছে; মধ্যে কলকলনাদিনী সিপ্রানদী প্রস্তরশয্যার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, যেন দুই পার্শ্বস্থ ভীমদর্শন পর্ব্বতের ক্রোধদৃষ্টিতে ভীত না হইয়া উপহাস করিয়া যাইতেছে। দূরে ভারতবর্ষের কোটীবন্ধনস্বরূপ বিন্ধ্যপর্ব্বত চন্দ্রালোকে দেখা যাইতেছে। কল্য ভীষণ যুদ্ধ হইবে কিন্তু অদ্য সমস্ত জগৎ সুপ্ত। কেবল সময়ে সময়ে প্রহরীর স্বর নিস্তব্ধ রজনীতে সুদূর পর্য্যন্ত শ্রুত হইতেছে; কেবল সিপ্রানদীর তরঙ্গমালা কলকল

করিতেছে; কেবল দূর হইতে নৈশ শৃগালের শব্দ নদীকূলে ও পর্ব্বত-শ্রেণীতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

একটী শিবিরে নরেন্দ্র শয়ন করিয়া আছেন, নিদ্রিত আছেন, তথাপি যুদ্ধের নানারূপ চিন্তা স্বপ্নরূপে তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন কথা হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে। সিপ্রানদীর কল্‌কল্‌ নাদ যেন ভাগীরথীর শব্দ বোধ হইল; সেই ভাগীরথীতীরে সেই কুঞ্জবন-বেষ্টিত উচ্চ অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। তীরে বালুকারাশি; বালুকা-রাশিতে দুইজন শিশু ক্রীড়া করিতেছে, আর একজন দাড়াইয়া রহিয়াছে। সে প্রেমপুত্তলী কে? সে কোথায়? ভাগীরথীতীরস্থ কুঞ্জবনে সেই তিনটী শিশু রজনীতে ক্রীড়া করিত সত্য; কিন্তু কালের নিষ্ঠুর গতিতে সে চিত্রটী বিলুপ্ত হইয়াছে।

স্বপ্ন পরিবর্ত্তিত হইল; ভাগীরথীর কল্লোল নহে, এ রমণীর গীতধ্বনি, রমণী না অপ্সরা? উচ্চ প্রাসাদ, তাহার ছাদ ও স্তম্ভ সুবর্ণ ও রোপ্য-মণ্ডিত, তাহার মধ্যে এক অপ্সরা গান করিতেছে। কেবল একজন অপ্সরা গান করিতেছে, সে বড় দুঃখের গীত, অভাগীর গীত, "অভাগিনী জেলেখা" কাঁদিয়া কাঁদিয়া গীত গাইতেছে। নরেন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন—ঐ যে জেলেখা দাঁড়াইয়া আছে; ঐ যে তাহার রত্নরাজি-বিভূষিত কেশ-পাশে উজ্জ্বল বদনমণ্ডল কিঞ্চিৎ আবৃত রহিয়াছে, ঐ যে তাহার প্রজ্জ্বলিত নয়নদ্বয় হইতে দুই এক বিন্দু জল পড়িতেছে; একি স্বপ্ন? স্বপ্নে কি এরূপ স্পষ্ট দেখা যায়? নরেন্দ্র আবার চক্ষু মুছিলেন, এবার শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া দেখিলেন।

কৈ জেলেখা ত নাই! কিন্তু সে সুন্দর সুমধুর হৃদয়বিদারক গীতধ্বনি এখনও কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। যে ব্যর্থ প্রেম করিয়া প্রেমের প্রতিদান পায় নাই, না পাইয়া পাগল হইয়াছে ও জগতে উদাসীন হইয়া দেশে দেশে বেড়াইতেছে, তাহারই এই গান সম্ভবে। গান শুনিতে শুনিতে নরেন্দ্রের চক্ষুতে জল আসিল, শয্যা হইতে উঠিয়া বাহিরে যাইলেন। কৈ অপ্সরা কৈ, জেলেখা কৈ? জগৎ নিস্তব্ধ, দ্বিপ্রহর নিশার বায়ু রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাইতেছে, চন্দ্রকিরণে নদী, পর্ব্বত, শিবির ও মাঠ দৃষ্ট হইতেছে;—আর সেই অভাগা দেওয়ানা তাতার বালক শিবিরদ্বারে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছে; স্বপ্তস্বরমিলিত সে গান বায়ুতে বাহিত হইয়া নৈশ গগনে উত্থিত হইতেছে ও চারিদিকে আকাশে বিস্তৃত হইতেছে।

নরেন্দ্র সাশ্রুনয়নে বালকের হস্তধারণ করিয়া তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি যথার্থই প্রেমের জন্য দেওয়ানা হইয়াছ? তোমার হৃদয়ে কি কোন গভীর দুঃখ আছে? তাহা না হইলে এই ঘোর রজনীতে একাকী জাগরণ করিয়া এই দুঃখ গান করিতেছ?"

বালক একদৃষ্টিতে নরেন্দ্রের দিকে চাহিতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, ললাট হইতে ঘর্ম্ম বহির্গত হইতে লাগিল। ক্ষণেক পর হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে করুণস্বরে বলিল—

"মার্জ্জনা করুন, আমি দেওয়ানা, আমার জ্ঞান নাই, যখন যাহা মনে আইসে তাহাই গান করি।" নরেন্দ্র অনেক প্রবোধবাক্য প্রয়োগ করিয়া বার বার তাহার দুঃখের কারণ ও এই অল্প বয়সে ফকিরী গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক তাহার উত্তর দিল না, কেবল বলিল "আমি দেওয়ানা।"

নিশা অবসানে নরেন্দ্র রণসজ্জা করিয়া আপন বন্ধু গজপতি সিংহের শিবিরে গেলেন, দেখিলেন তিনিও যোদ্ধার কার্য্য করিতেছেন, আপন তরবারি, চর্ম্ম, বর্ষা প্রভৃতি স্বয়ং শানাইতেছেন; অস্ত্রগুলি রৌপ্যের মত উজ্জ্বল হইয়াছে, তথাপি আরও উজ্জ্বল করিতেছেন। দেখিয়া নরেন্দ্র কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন; পরে শয্যার দিকে চাহিয়া দেখিলেন গজপতি সমস্ত রাত্রি শয়ন করেন নাই, সমস্ত রাত্রিই এই কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার বদনমণ্ডল অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষুদ্বয় ঈষৎ কালিমাবেষ্টিত। কেন? নরেন্দ্র গত কয়েক দিন অবধি গজপতির যে ভাব গতিক দেখিয়াছিলেন, তাহাতে কারণ কিছু কিছু বুঝিতে পারিলেন। দেওয়ানা বালক হাত দেখা অবধি গজপতি স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন উজ্জয়িনীর যুদ্ধে তাঁহার নিধন হইবে। বোধ হয় গত নিশায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, শয়নের অবসর পান নাই।

পাঠক, গজপতিকে ভীরু মনে করিতেছ? রাজপুত সকলেই সাহসী, তথাপি তাহাদের মধ্যেও গজপতি অপেক্ষা সাহসী কেহ ছিল না। তথাপি কল্য নিশ্চয় মৃত্যু জানিলে সাহসীর ললাটও চিন্তারেখায় অঙ্কিত হয়। যোদ্ধা যৌবনমদে মত্ত থাকিয়া, জীবনের সুখে মগ্ন থাকিয়া, যুদ্ধের উৎসাহে প্রফুল্ল থাকিয়া, জয়ের আশায় আশ্বস্ত হইয়া, মৃত্যুর চিন্তা দূর করে; যুদ্ধ তাহাদের পক্ষে আমোদমাত্র, অনেক লোক মরিতেছে, তাহারাও এক দিন মরিবে, তাহাতে ক্ষতি কি। কিন্তু "কল্য মরিবে"

বজ্রধ্বনিতে যদি এই শব্দ সহসা হৃদয়ে আহত হয়, তাহা হইলে সে উৎসাহ সে প্রফুল্লতা একবারে হ্রাস পায়। গজপতি সে সময়ের সকল লোকের ন্যায় গণনবিদ্যায় দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন, অদ্য যুদ্ধে তিনি মরিবেন তাহা তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল, গত রজনীতে অনিদ্র হইয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। অস্ত্র পরিষ্কার করা কেবল কাল কাটাইবার একটী উপায়মাত্র।

নরেন্দ্র আসিবামাত্র গজপতি উঠিয়া তাঁহার হস্তধারণ কবিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি অস্ত্রগুলি পবিষ্কার হইয়াছে কি না।" শুষ্কবদনে সে হাসি বিকট বোধ হইল।

নরেন্দ্র উত্তর করিলেন, "যথার্থই কি আপনি অদ্য যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন? দেওয়ানা ফকীরের কথা স্মরণ করুন।"

গজপতি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "সম্মুখে রণ রাখিয়া রাজপুত কখনও পশ্চাতে চাহে না।" রাজপুতেব নয়ন হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল।

নরেন্দ্রনাথ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; ক্ষণেক পর গজপতি আবার বলিতে লাগিলেন—

"নরেন্দ্র, আমার যুদ্ধ করিবাব অন্য একটী কারণ আছে,—আমার ললাটের লিখন অদ্য মানবলীলা সম্বরণ করিব।"—নরেন্দ্র আবার নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; তখন ধীরে ধীরে বাজপুত বলিতে লাগিলেন—

"নরেন্দ্র, আমি যে দিন তোমাব কোমল আকৃতি দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া কাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার জীবনরক্ষা করি,—জানি না কেন,—সেই দিন হইতে আমি তোমাকে কনিষ্ঠের মত ভাল বাসি, তোমার প্রতি আমার মায়া যেন দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়াছে। নরেন্দ্র, তোমার ভ্রাতাকে বিদায় দাও।" নবেন্দ্রের চক্ষুতে জল আসিল।

গজপতি আরও বলিলেন "নরেন্দ্র, এক যুদ্ধে আমি মহারাজ যশোবন্ত-সিংহের উপকার করিয়াছিলাম; রাজা সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে এই মুক্তা-হার প্রদান করেন। সেই অবধি সকল যুদ্ধেই আমি এই হার ললাটে পরিধান করিয়াছি। অদ্যকার যুদ্ধে তুমি নিস্তার পাইবে, এই হার রাজাকে দিও এবং বলিও দেশে আমার দুইটী শিশু-সন্তান আছে, হত-ভাগাদের মাতা নাই। মহারাজকে বলিও যেন অনুগ্রহ করিয়া তাহা-দিগের উপর কৃপাদৃষ্টি করেন, বালক রঘুনাথও কালে রাজার আজ্ঞায় পিতার ন্যায় সংগ্রামে জীবন দিতে সক্ষম হয় ইহা অপেক্ষা অধিক মঙ্গল ইচ্ছা তাহার পিতা জানে না।"

নরেন্দ্র নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, নয়ন দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। গজপতির নয়নদ্বয় শুষ্ক ও অতিশয় উজ্জ্বল!

সহসা ভেরী-শব্দ শুনা যাইল, মোগলেরা সিপ্রানদী পার হইবার উদ্যোগ করিতেছে। গজপতি রণসজ্জা পরিধান করিয়া বাহিরে আসিয়া লম্ফ দিয়া অশ্ব আরোহণ করিয়া তীরবেগে নদীমুখে চলিলেন।

নরেন্দ্রও নির্গত হইয়া যুদ্ধাভিমুখে চলিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মোগলশিবির।

যুদ্ধের পূর্ব্বনিশায় রাজপুত-শিবির পাঠক দর্শন করিয়াছ; একবার সেই নিশায় মোগল-শিবির দর্শন কর।

আরংজীব পূর্ব্বেই সেইস্থানে পৌছিয়াছিলেন, মোরাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। দুই তিন দিন পর মোরাদ সসৈন্যে আরংজীবের সহিত যোগ দিলেন, এই দুই তিন দিনের মধ্যে যদি যশোবন্তসিংহ আরংজীবকে আক্রমণ করিতেন, আরংজীব অবশ্যই পরাস্ত হইতেন। কোন কোন ইতিহাসবেত্তা বলেন যে, আরংজীবের অল্পমাত্র সৈন্য আছে এ কথা যশোবন্ত জানিতেন না, সেইজন্যই আক্রমণ করেন নাই; আবার কেহ কেহ বলেন, মহানুভব রাজপুত সেনাপতি সে কথা জানিয়া ও অল্পসংখ্যক্ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করা রীতিবিরুদ্ধ, এই জন্যই অপেক্ষা করিয়াছিলেন। যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলে যশোবন্তের ন্যায় ধর্ম্মাত্মা অতি বিরল।

আজি আরংজীব ও মোরাদ দুই ভ্রাতার সাক্ষাৎ হইয়াছে, কালি যুদ্ধ হইবে। জয়জয়নাদে শিবির পরিপূর্ণ হইল। পট্টবস্ত্রমণ্ডিত উৎকৃষ্ট দীপালোকশোভিত প্রশস্ত শিবিরে দুই ভ্রাতা ভোজন করিতে বসিয়াছেন; চারিদিকে জগদ্‌বিমোহিনী নর্ত্তকী ও গায়কীগণ নৃত্যগানাদি করিয়া রাজপুত্রদ্বয়ের মনোরঞ্জন করিতেছে। মোরাদের প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষঃস্থল, বীর-আকৃতি, অকপট হৃদয়; আরংজীবের ললাট কুঞ্চিত, তীব্রদৃষ্টি, মনের গভীর কুটিলতা দুর্ভেদ্য, মন সর্ব্বদাই সহস্র চিন্তায় অভিভূত; তথাপি কি সুন্দর সরল হাসিই হাসিতেছেন, কি সম্মানের সহিত মোরাদের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন, যেন ভ্রাতাকে দেখিয়া তিনি আর আনন্দ

রাখিতে পারিতেছেন না, যেন ভ্রাতার কার্য্যসাধন অপেক্ষা তাঁহার জগতে অন্য আমোদ বা অন্য উদ্দেশ্য নাই।

ভোজন সাঙ্গ হইল, ভৃত্যেরা ফল ও মদিরা লইয়া আসিল; গায়কীগণ পুনরায় সপ্তস্বরে গান আরম্ভ করিল, শিবির আমোদিত হইল, কেশের হীরকের সহিত কটাক্ষদৃষ্টির জ্যোতিঃ মিশাইয়া যাইতে লাগিল; সুললিত গানের সহিত সুমিষ্ট হাস্যধ্বনি মিশাইয়া যাইতে লাগিল, মোরাদ একবারে বিমোহিত হইলেন।

আরংজীব সুবর্ণপাত্রে মদিরা ঢালিয়া মোরাদের হস্তে দিয়া বলিলেন—

"আজি সেবায় আপনাকে তুষ্ট করিতে পারিয়াছি, আজ আমার জীবন সার্থক।"

মোরা। "আরংজীব, আপনার ন্যায় অমায়িক ভ্রাতা আমি পাইব না। একটু মদিরা আপনার জন্য লউন্।"

আরং। "ক্ষমা করুন, আপনি জানেন আমার জীবনে সুখের বাঞ্ছা নাই; হৃদয়ে বড় মানস আছে, আপনার মত বীরপুরুষকে পিতৃসিংহাসনে একবার দেখিব, ইহা ভিন্ন আর ইচ্ছা নাই; পৈগম্বর যদি এই এরাদা সফল করেন তাহা হইলে সন্তুষ্টমনে ফকিরী গ্রহণ করিয়া মক্কায় যাইব।" এই বলিয়া আর এক পাত্র মদিরা দিলেন।

মোরা। "আরংজীব, আপনি যথার্থই ধার্ম্মিক, তাহা না হইলে আমার জন্য আপনি এরূপ যত্ন করিবেন কেন?"

আরং। "কাহার জন্য করিব? তৈমুরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবার উপযুক্ত আর কে আছে? সুজা বিলাসপ্রিয়, ভীরু, সুজা আকবরের সিংহাসন কলঙ্কিত করিবে? আত্মাভিমানী মূর্খ কাফের দারা আকবরের সিংহাসন কলুষিত করিবে? তাহা অপেক্ষা পুনরায় হিন্দুস্থান কাফেরদের হস্তে যাউক, তৈমুরের নাম বিলুপ্ত হউক! ইহাদের জন্য আমি যুদ্ধ করিব না; যাঁহার সাহস অপরিসীম, যাঁহার যশোরাশিতে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ হইয়াছে, যিনি মোগল সিংহাসনের স্তম্ভস্বরূপ, মোগলকুলে কুলতিলকস্বরূপ, তাঁহার জন্য যুদ্ধ করিব;—আমি আপনার সম্মুখে আপনার সুখ্যাতি করিতে চাহি না, কিন্তু যখন আমি আপনাকে দেখি, আমার যথার্থই বোধ হয় যেন আপনার উদার ললাটে "সম্রাট্" শব্দ খোদিত রহিয়াছে, আপনার বিশাল বক্ষঃ ও দীর্ঘ বাহুতে "যোদ্ধা" শব্দ অঙ্কিত রহিয়াছে; আমার জীবন ধন্য, যে এইরূপ বীরপুরুষের কার্য্য-

সাধনে আমি লিপ্ত হইয়াছি।" সুবর্ণপাত্র আর একবার মদে পরিপূর্ণ করিলেন।

মোরা। "আরংজীব, আমি যথার্থই আপনার বাক্যে পরিতুষ্ট হইলাম, কাল যুদ্ধ হইবে, সৈন্য সকল প্রস্তুত আছে?"

আরং। "আমি তিন চারি দিন হইতেই প্রস্তুত আছি, কিন্তু যুদ্ধব্যবসায়ে আমি এখনও অপরিপক্ক, একাকী সাহস হয় না; আপনি নিকটে থাকিলে আমার যেন বোধ হয় আমি পর্ব্বত-পার্শ্বে নিরাপদে আছি, আমার সাহস দ্বিগুণ হয়।"

মোরাদ এরূপ আত্মাভিমানী ছিলেন, যে প্রবঞ্চনা এবং চাটুকার বাক্যও সত্য বলিয়া জ্ঞান হইত, বিশেষ এক্ষণে অধিক মদিরাসেবনে কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। আরংজীবের প্রশংসাবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—

"ভ্রাতা, আপনিও কালে রণপণ্ডিত হইবেন, এক্ষণে কিছুদিন আমার উপর নির্ভর করুন। আর আমি,—আমি জগতে কাহারও উপর নির্ভর করি না, কেবল আমার সাহস ও এই অসির উপর ভরসা করি।"—বলিয়া অসি নিষ্কোষিত করিলেন; দীপালোকে ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। পুনরায় অসি কোষে রাখিতে গেলেন, কিন্তু অতিশয় মদিরাসেবনে দৃষ্টি স্থির ছিল না, অসি মৃত্তিকায় পড়িয়া যাইল। চতুঃপার্শ্বে সুন্দরীগণ ঈষৎ হাসিল, কিন্তু আরংজীব তীব্র দৃষ্টিপাত করায় তাহারা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। আরংজীব আর এক পাত্র মদিরা দিলেন, মোরাদ তাহাও শেষ করিলেন।

আরংজীব বলিলেন "ভ্রাতা, তবে বিদায় হই, কাল রণক্ষেত্রে আবার আপনার দর্শন পাইব।"

মোরা। "যাও, আরংজীব যাও, আমি আপনার উপর বড়ই পরিতুষ্ট হইলাম, আইস আলিঙ্গন করি।" এই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে যাইয়া ভ্রমবশতঃ একজন রমণীর গলায় হস্ত দিয়া আলিঙ্গন করিলেন; রমণীমণ্ডলী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, আরংজীব সরিয়া যাইলেন। মোরাদ সেই রমণীকে ক্রোড়ে লইয়া ঢলিয়া পড়িলেন।

আরংজীব পার্শ্বস্থ শিবিরে যাইলেন, ভ্রাতাকে যে সহাস্য মুখ দেখাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা পরিবর্ত্তিত হইল, মুখ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল, ললাটে দুই তিনটী ভীষণ রেখা অঙ্কিত হইল; অন্ধকারে নিঃশব্দে পদসঞ্চারণ করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে এক একবার হঠাৎ দণ্ডায়মান

হয়েন, স্থিরদৃষ্টিতে এক একবার দেখেন যেন অন্ধকারের মধ্যে কি দেখিতে পাইলেন, আবার পদসঞ্চারণ করিতে থাকেন; একবার মুখে ঈষৎ হাস্য লক্ষিত হয়, আবার বদনমণ্ডল কঠোরভাব ধারণ করে, ললাট কুঞ্চিত হয়।

একবার স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া একদিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া অর্দ্ধ-স্ফুটবচনে বলিতে লাগিলেন—

"উজ্জ্বল মণিময় মুকুট, ময়ূর সিংহাসন, প্রশস্ত ভারতপ্রদেশ, পিতার দুর্ব্বল হস্ত হইতে স্খলিত হইতেছে, কে লইবে?—দারা সাবধান! তোমার সাহস আছে, বল আছে, কিন্তু আমিও দুর্ব্বলহস্তে অসি ধারণ করি নাই; পথ ছাড়িয়া দাও, নচেৎ অসিহস্তে পথ পরিষ্কার করিব। তুমি আত্মাভিমানী, দর্পী, কিন্তু তোমা অপেক্ষা ভীষণ দর্প ও দৃঢ়তর ব্রত সহাস্য বদনের ভিতর লুক্কায়িত থাকে। মোরাদ! তুমি সাহসী বীর! সিংহাসনে বসিবে? তবে শূকর যেরূপ কর্দ্দমে পড়ে সেইরূপ ধরাতলে লুটাইয়া পড়িলে কেন? অচেতন? কল্য যুদ্ধ হইবে, অদ্য বিলাসবিহ্বল? সাহস? বন্য শূকরেরও ভীষণ সাহস আছে! যতদিন আবশ্যক তোমার দ্বারা আমার কার্য্যসিদ্ধি করিব, তাহার পর এইরূপ পদাঘাত করিয়া তোমাকে দূরে ফেলিয়া দিব। কল্য যুদ্ধ হইবে, ললাটের লিখন কি আছে! পিতার হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ভ্রাতার শোণিতে দেশ প্লাবিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; ভীষণ উদ্যমে প্রবৃত্ত হইয়াছি; অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি, আর ফিরিবার উপায় নাই। হৃদয়! সাহসে নির্ভর কর, আরও অগ্রসর হইব; অসিহস্তে কণ্টকময় পথ পরিষ্কার করিব; আবশ্যক হয় উজ্জয়িনী হইতে আগ্রাপর্য্যন্ত পথ নররক্তে রঞ্জিত করিব, কিন্তু এ ভীষণ প্রতিজ্ঞা বিচলিত হইবে না। পিতামহ তৈমুর! তোমার মুকুটে এই ললাট শোভিত করিব, নচেৎ সিপ্রাবারি কল্যই হৃদয়শোণিতে রঞ্জিত করিব।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

উজ্জয়িনীর যুদ্ধ।

১৬৫৮ খৃঃ অব্দে বৈশাখ মাসে ভীষণ যুদ্ধ হইল। মোরাদ ও আরংজীবের সৈন্যেরা সিপ্রা পার হইবার উদ্যম করিতে লাগিল, কিন্তু সে বড়

সহজ ব্যাপার নহে। আরংজীব সৈন্যের পার হইবার জন্য অতিশয় নিপুণ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উন্নত স্থানে তাঁহার কামান সাজাইয়া শত্রুর সম্মুখে আগমন রোধ করিয়া নিজ সৈন্যকে নদী পার হইতে বলিলেন। শত্রুরাও কামান সাজাইয়াছিল ও তদ্দ্বারা আরংজীবের সৈন্যের নদী পার হওয়া নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; অনেকক্ষণ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল ও যশোবন্তসিংহ অপূর্ব্ব বীর্য্যবল প্রকাশ করিয়া মোগল-দিগের গতিরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার সহযোদ্ধা কাসেম খাঁ সেরূপ যত্ন করেন নাই, তাৎকালিক লেখকেরা সন্দেহ করেন, যে তিনি আরংজীবের অর্থে বশীভূত হইয়া আপন গোলা বারুদ লুকাইয়া রাখিয়া-ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সৈন্যের কামান অচিরাৎ নিস্তব্ধ হইল। এ অবস্থায় শত্রুর কামানের সম্মুখে যুদ্ধ করা যশোবন্তের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল, কিন্তু তিনি ভগ্নপ্রযত্ন না হইয়া অমানুষিক বীরত্ব প্রকাশ করিয়া শত্রুর গতিরোধ করিতে লাগিলেন। সেস্থান পর্ব্বতময় সুতরাং আক্রমণ-কারীগণ সহজে নদী পার হইতে পারিল না; কিন্তু সাহসী মোরাদ কতিপয় সৈন্য লইয়া সকল ব্যাঘাত অতিক্রম করিয়া খড়্গহস্তে জয় জয়-নাদে নদী পার হইলেন, তাহা দেখিয়া সমস্ত সৈন্য নদী পার হইল। ভীরু কাসেম খাঁ তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে পলায়ন করিলেন, সুতরাং যশোবন্ত-সিংহের বিপদের সীমা রহিল না। কিন্তু সেই অসমসাহসী রাজপুত চতুর্দ্দিকে শত্রুকর্তৃক বেষ্টিত হইয়া ও জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া তখনও তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেনাসংখ্যা ক্ষীণ হইয়া যাইল, তাঁহার প্রিয় ভৃত্যেরা তাঁহার চতুর্দ্দিকে হত হইতে লাগিল, মোগলেরা জয় জয়নাদে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিতে লাগিল, তথাপি বীর রাজপুতেরা রণে ভঙ্গ দিল না। ধন্য বীরত্ব! অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর আর যুদ্ধ করা বৃথা বিবেচনা করিয়া অবশেষে যশোবন্তসিংহ কেবলমাত্র পঞ্চশত সেনা লইয়া যুদ্ধস্থল ত্যাগ করিলেন, সপ্ত সহস্রেরও অধিকসংখ্যক্ রাজপুত সেই দিন সেই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনদান করে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

চিতোর।

যশোবন্তসিংহের অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক সেনা রাজপুতানা অভিমুখে আসিতে লাগিল। নরেন্দ্র তাঁহার পরম বন্ধু, গজপতির মরণে অতিশয় দুঃখিত ও ক্লিষ্ট হইলেন, কিন্তু প্রত্যহ নূতন নূতন দেশ দেখিতে দেখিতে সে দুঃখ কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিস্মৃত হইলেন। কয়েক দিন আসিতে আসিতে সৈন্যেরা অবশেষে রাজপুতানার অভ্যন্তরে আসিয়া পড়িল। যশোবন্তসিংহ মাড়ওয়ার দেশের রাজা, সে দেশে আসিতে হইলে মেওয়ার দেশের অভ্যন্তর দিয়া আসিতে হয়।

মেওয়ার দেশের পর্ব্বতরাশি ও অসংখ্য দুর্গ দেখিয়া নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। দুর্গগুলি প্রায়ই পর্ব্বতচূড়ায় প্রস্তররাশির দ্বারা বিনির্ম্মিত, সে দুর্গ সহসা হস্তগত করা শত্রুর দুঃসাধ্য। পর্ব্বত যেন গগন স্পর্শ করিবার জন্য উত্থিত হইয়াছে ও উন্নতশিরে মুকুটস্বরূপ দুর্গ ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। সে সমস্ত দুর্গে উঠিবার পথ নাই, কেবল একদিকে সোপানের ন্যায় আছে, তাহার উপর দিয়া লোকে গমনাগমন করে; যুদ্ধকালে দুর্গের ভিতর খাদ্যসামগ্রী সঞ্চিত হয়, সেই একটীমাত্র দ্বার রুদ্ধ হয়; পরে শত্রুগণ যাহাই করুক না, দুর্গবাসীগণ নিশ্চিন্তে থাকিতে পারে। শত্রুরা দুর্গে উঠিবার উপক্রম করিলে উপর হইতে প্রস্তররাশি নিক্ষিপ্ত হয়, একেবারে বহুসংখ্যক শত্রু বিনষ্ট হয়।

এইরূপ দুর্গ ও পর্ব্বত দেখিতে দেখিতে সৈন্যেরা অবশেষে সন্ধ্যার সময় চিতোরের দুর্গের নিকট আসিয়া পড়িল। সৈন্যেরা আহারাদি সমাপ্ত করিয়া আপন আপন শিবিরে বিশ্রাম করিতে গেল, কিন্তু নরেন্দ্র কতিপয় রাজপুতের সহিত সেই ভগ্নদুর্গ দেখিতে যাইলেন। চারিদিকে যত দেখিতে লাগিলেন, ততই চিতোরের প্রাচীন গৌরবের কথা স্মরণ হইতে লাগিল, ততই বিস্মিত হইলেন। অবশেষে শ্রান্ত হইয়া এক শিলাতলে উপবেশন করিলেন।

সহসা তাঁহাদের সম্মুখে একজন বৃদ্ধ মনুষ্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজপুতদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন, তিনি চিতোরের পুরাতন "চরণ"। "চরণ" অর্থ কবি। তাঁহারা রাজপুতানার পূর্ব্ব রাজাদিগের গৌরবগীত গাইয়া রাজপুরুষ ও নগরবাসীদিগের মনোরঞ্জন

করেন। রাজপুতানায় এক্ষণ পর্য্যন্ত সন্ধ্যার সময় লোকে সমবেত হইয়া চরণের গীত শুনিতে ভালবাসে ও পূর্ব্বগৌরব-গান শুনিতে শুনিতে তাহাদের হৃদয় স্ফীত হয় ও নয়ন বীরাশ্রুতে আপ্লুত হয়।

সে স্থানটী অতিশয় ভীষণ, পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে আরাবলী পর্ব্বত-শ্রেণী নীলবর্ণ মস্তক আকাশে উন্নত করিয়া রহিয়াছে। নিকটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্যান্য পর্ব্বত, বৃক্ষ ও জঙ্গলে আবৃত, তাহা হইতে শত শত ঝরণা অবতরণ করিতেছে। আকাশের ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ মেঘে পর্ব্বতের নীলিমাকে গাঢ়তর করিতেছে ও রজনীর অন্ধকার গভীরতর করিতেছে, সেই অন্ধকারে পর্ব্বতনদের ভীষণ অবতরণ-শব্দ ও মেঘের ভীষণতর গম্ভীর শব্দ ভিন্ন আর কিছু শ্রুত হইতেছে না; ও সম্মুখস্থ চিতোরের পর্ব্বতদুর্গ ও পশ্চাতে নীল পর্ব্বতশ্রেণী ভিন্ন আর কিছু লক্ষিত হইতেছে না। রাজপুত-গণ চরণকে শিলার উপর বসাইলেন ও আপনারা চারিদিকে বসিয়া প্রতাপসিংহের গান শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, চরণ সেই গান আরম্ভ করিল। নদী ও অম্বর অপেক্ষা ভীষণতর গর্জ্জনে মেওয়ারের বৃদ্ধ কবি চিতোরের গৌরব বর্ণন করিতে লাগিল। চরণ সূর্য্যবংশের যশোরাশির ব্যাখ্যা করিতে লাগিল, কেন না মেওয়ারাধিপতি সূর্য্যবংশাবতংস। ক্রমে আরও তীব্রস্বরে গাইলেন, "রাজপুতগণ! একটী গীত শুন, এটী আমার গীত নহে, ঐ অম্বরগর্জ্জন-প্রতিঘাতী পর্ব্বত-শৃঙ্গের গীত, ঐ বজ্রনাদী জলপ্রপাতের গীত, তোমরা শ্রবণ কর। যে পর্ব্বত-কন্দরে এক-জন রাজপুত সেনার অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে, সেই গহ্বর হইতে এই গীত বহির্গত হইতেছে, যে পর্ব্বততরঙ্গবাহিনীর জল একবিন্দু রাজপুতের শোণিতেও আরক্ত হইয়াছে, সেই তটিনীর কূলে এই গীত ধ্বনিত হই-তেছে। প্রতাপসিংহ! জগতে তোমার ন্যায় বীর আছে? তুমি মনুষ্য না দেবতা? ঐ দেখ আকবরের ভীষণপ্রতাপে সমগ্র ভারতবর্ষ কম্পিত হইতেছে, কিন্তু প্রতাপের হৃদয় কম্পিত হইল না। চিতোর নগর আর তাঁহার নাই, তাঁহার পিতার রাজত্বকালে নিষ্ঠুর আকবর কাড়িয়া লইয়াছে, দুর্গরক্ষার্থ জয়মল্ল ও পত্ত অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া জীবন দিয়াছিল, পত্তের মাতা ও বনিতা স্বহস্তে যুদ্ধ করিয়া জীবনদান করিয়া-ছিল, তথাপি রাজপুতের বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া চিতোর-রত্ন আকবর কাড়িয়া লইলেন, ৭৪॥ মণ মণিমাণিক্য কাড়িয়া লইলেন, সেই অবধি ৭৪॥ অঙ্ক নিষেধের শপথ হইয়াছে। প্রতাপ যখন রাজা হইলেন তখন চিতোর নাই, সৈন্য নাই, অর্থ নাই, কিন্তু তাঁহার বীরান্তঃকরণ ছিল, বীরের

দুঃসাধ্য কি আছে? প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজপুত রাজগণ দিল্লীর দাসত্ব স্বীকার করিলেন, প্রতাপ করিলেন না। অম্বরের * ভগবানদাস, মাড়-ওয়ারের মল্লদেব নিজ নিজ দুহিতাকে দিল্লীর সম্রাটহস্তে অর্পণ করিলেন, মহানুভব প্রতাপ ম্লেচ্ছের কুটুম্ব হইতে অস্বীকার করিলেন। কেন স্বীকার করিবেন? মেওয়ারাধিপতিরা সূর্য্যবংশাবতংস, সে উন্নত বংশ কেন কলুষিত করিবেন?

"সাগরতরঙ্গের ন্যায় দিল্লীর সেনা মেওয়ার প্লাবিত করিল; তাহার সঙ্গে—হা জগদীশ! এ লজ্জার অঙ্ক কেন রাজস্থানের ললাটে অঙ্কিত করিলে? তাহার সঙ্গে রাজপুত রাজগণ যোগ দিলেন। মাড়ওয়ার, অম্বর, বিকানীর, বুন্দী প্রভৃতি নানাদেশের রাজারা আপনাদিগের দাসত্বের কলঙ্ক অপনীত কবিবার জন্য, প্রতাপকেও দিল্লীর দাস করিবার জন্য, আকবরের সহিত যোগ দিলেন। অম্বরের মানসিংহ প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন; মহানুভব প্রতাপ ম্লেচ্ছের কুটুম্বের সহিত ভোজনে অস্বীকার হইলেন। সরোষে মানসিংহ দিল্লী যাইয়া অসংখ্য সেনাতরঙ্গে মেওয়ার দেশ প্লাবিত করিলেন। মানসিংহ! বড় কীর্ত্তির কার্য্য করিলে, ম্লেচ্ছের দাস হইয়া স্বদেশের ধ্বংশচেষ্টায় আসিলে? মানসিংহ! তুমি কাবুল হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষে বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া শক্রদমন করিয়াছিলে; কাহার জন্য? হায়! ম্লেচ্ছের অধীন হইয়া রাজপুত নাম ডুবাইলে? ম্লেচ্ছের পদরজঃ রাজ-পুতের ললাটে কি সুন্দব শোভন হইয়াছে!

"অন্ধকারে ঐ ভীষণ জলপ্রপাতের ভীষণ তেজ দেখিতে পাইতেছ? সরোষ গর্জ্জন দূর হইতে শুনিতে পাইতেছ? না, তোমরা পাইবে না, কিন্তু আমি অন্ধকারে থাকি, আমি দেখিতেছি। উহার মধ্যস্থলে উন্নত শিলাখণ্ড সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ভীষণ জলপ্রপাতেও কম্পিত হই-তেছে না। জলপ্রপাত অপেক্ষা ভীষণতর তেজে সাগরগর্জ্জনে মোগল-সৈন্য আসিয়া মেওয়ার দেশ প্লাবিত করিল; শিলাখণ্ডের ন্যায় সগর্ব্বে প্রতাপ দণ্ডায়মান রহিলেন। যে দিন হলদীঘাটের মহাযুদ্ধ হইল, সেনাদিগের ভীষণ রব পর্ব্বতকন্দর হইতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, আকাশে উত্থিত হইয়া মেঘ হইতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, তিনবার প্রভু শক্রদিগের মধ্যে যাইয়া পড়িলেন, তিনবার তাঁহার প্রিয় অনুচরগণ

* আধুনিক জয়পুর।

তাঁহাকে অনেক কষ্টে বাহির করিয়া আনিল। ভগবন্! এ কি পুনরায় আর্জ্জুনী জগতে ফিরিয়া আসিল? হায়! সাহসে কি হইবে? মোগলের যে অসংখ্য সেনা! দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুতের মধ্যে কেবল অষ্ট সহস্র লইয়া প্রতাপ পলায়ন করিলেন, অবশিষ্ট হলদীঘাটের ভীষণ উপত্যকায় চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিলেন*।

"এই কি একবার? বৎসর বৎসর এইরূপ সংগ্রাম হইল, বৎসর বৎসর প্রভুর সেনা, ধন, রাজ্য হ্রাস পাইতে লাগিল, বৎসর বৎসর তাঁহার জীবনাকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার বীরত্ব হ্রাস হইল না, তিনি দিল্লীর দাস হইলেন না।

"রাজপুত! তোমাদের চক্ষুতে যদি জল থাকে, বিসর্জ্জন কর, হৃদয়ে যদি শোণিত থাকে, বিসর্জ্জন কর! ঐ দেখ প্রতাপের রাজরাণী পর্ব্বত-কন্দরে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মুষলধারায় বৃষ্টি হইতেছে, রাজরাণী পর্ব্বতকন্দরে শয়ন করিয়া আছেন, প্রতাপ খড়্গাহস্তে জাগরিত হইয়া আছেন। ঐ দেখ বৃক্ষ হইতে রজ্জু লম্বিত হইয়াছে, কাষ্ঠাসনে কি দুলিতেছে? জগদীশ! এই কি বীরত্বের পুরস্কার? রাজার শিশু পুত্রেরা ঝুলিতেছে, নীচে রাখিলে হিংস্রক জন্তু লইয়া যাইবে। আর ঐ দেখ রাজমহিষী ও তাঁহার পুত্রবধূ শুষ্কপত্র জ্বালাইয়া খাদ্য প্রস্তুত করিতেছেন। রুটী প্রস্তুত হইল, সকল খাইও না, অর্দ্ধেকটী খাও, অর্দ্ধেক রাখিয়া দাও, আবার ক্ষুধা পাইলে কোথায় পাইবে? উঃ! ও কি হৃদয়-বিদারক ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইল! একটী বালিকার হস্ত হইতে বন্যবিড়াল রুটী কাড়িয়া লইয়া যাইল, বালিকা ক্ষুধায় চীৎকার করিয়া উঠিল†। ভগবন্, তোমার কি পাষাণ হৃদয়! এ বিষম দুঃখে দুঃখিত হইলে না, এ বিষম ক্রন্দনে তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল না!" উন্মত্ত চরণের হস্ত হইতে বীণা পড়িয়া যাইল, বায়ুতে তাহার শুক্ল কেশ উড়িতে লাগিল, নয়ন হইতে অগ্নিশিখা বহির্গত হইতে লাগিল।

বহুক্ষণ পরে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিয়া কবি বলিতে লাগিল—"রাজপুতগণ, প্রতাপের জয়গীত গাও, পঞ্চবিংশ বৎসর মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, পর্ব্বতশিখরে বাস করিয়াছেন, পর্ব্বত-উপত্যকায় যুদ্ধ করিয়াছেন, পর্ব্বতকন্দরে স্ত্রীপরিবারকে পালন

---

* ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ।

† প্রকৃত ঘটনা।

করিয়াছেন, তথাপি ইহজন্মে আকবরের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। গাও, রাজপুতগণ এই গীত গাও ; পর্ব্বতে পর্ব্বতে এই গীত প্রতিধ্বনিত হইতে থাকুক ; সমগ্র রাজস্থানে এই গীত শব্দিত হইতে থাকুক ; হিমালয় হইতে প্রতিহত হইয়া সাগরবারি পর্য্যন্ত সঞ্চরণ করুক ; হিমালয় অতিক্রম করিয়া সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হউক ; আর যদি স্বর্গে সাহস ও স্বদেশানুরাগের গৌরব থাকে, সে গীত আকাশপথে উত্থিত হইয়া স্বর্গের দ্বারে সজোরে আঘাত করিয়া মানবের যশঃ-কীর্ত্তি বিস্তার করুক!"

চরণের ভীষণ গর্জ্জন শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া রহিল ; আবার সকলে চাহিয়া দেখিল চরণ নাই, তাহার চিহ্নমাত্রও নাই, কেবল আকাশে অম্বর ভীষণ গর্জ্জন করিয়া যেন তাহার ভয়াবহ গীত বার বার ধ্বনিত করিতে লাগিল!

রাজপুতেরা স্বদেশের পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করিতে করিতে উৎসাহে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, কোন কোন বীরপুরুষের চক্ষু বীরাশ্রুতে ছল্ ছল্ করিতে লাগিল, সকলেই উঠিয়া আপন আপন শিবিরে প্রস্থান করিল। নরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন না, তিনি হুঙ্কারশব্দ করিলেন না ; হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া সেই ভীষণ মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে ভীষণ চিতোরদুর্গের তলে বসিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। মেঘ ক্রমে গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে, অচিরাৎ বৃষ্টি হইবে, নরেন্দ্র ঘরে যাও।—নরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন না। আকাশের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত উজ্জ্বল বিদ্যুল্লতা জগৎ ও গগনমার্গ চমকিয়া চলিয়া যাইল ; রহিয়া রহিয়া মেঘ ভীষণ গর্জ্জনে পৃথিবী কম্পিত করিতে লাগিল ; রহিয়া রহিয়া নৈশ বায়ু ভীষণ উচ্ছ্বাসে চলিয়া যাইতে লাগিল ;—নরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন না।

নরেন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন—"স্বদেশেও মহাবলপরাক্রান্ত রাজারা আছেন, তাঁহারা কি করিতেছেন, সুন্দর বঙ্গদেশের এ দুর্দ্দশা কেন? আজি ছয় শত বৎসর অবধি পরাক্রান্ত মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাজপুতেরা স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে, বঙ্গদেশে মুসলমান পদার্পণ না করিতে করিতে হিন্দুরাজ্যের নাম লুপ্ত হইল। যুদ্ধই রাজপুতদিগের ব্যবসা ; বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোকেরাও সময়ে সময়ে যুদ্ধ করে, তাহারা ধন দিয়াছে, ঐশ্বর্য্য দিয়াছে, প্রাণ দিয়াছে, তথাপি স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেয় নাই ; তাহাদের গ্রাম দগ্ধ হইয়াছে, নগর লুণ্ঠিত হইয়াছে, দুর্গ শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছে, তথাপি তাহারা গৌরব বিসর্জ্জন দেয় নাই ; সে গৌরবগীত আজিও আরাবলীর কন্দরে, উপত্যকায় গীত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে!

আর বঙ্গদেশ! বেগপ্রবাহিনী গঙ্গানদী গৌরবগীত গায় না, ব্রহ্মপুত্র স্বাধীনতার গীত গায় না; রাজা প্রজা সকলেই অধীনতা নিদ্রায় সুপ্ত, বড় সুখে নিদ্রা যাইতেছে! জগতে তাহাদিগের নাম নাই, অথবা তাহাদিগের নাম কেবল ঘৃণার পদার্থ। হা বিধাত!” বলিয়া নরেন্দ্র ললাটে সজোরে করাঘাত করিলেন, ললাট হইতে রুধির-ধারা বহিতে লাগিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

যোধপুর।

পরদিন প্রাতে নরেন্দ্র অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, উক্ত চরণ বাল্যকালে মেওয়ারাধিপতি প্রতাপসিংহের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। প্রতাপ স্বপুত্র অমরুকে যেরূপ ভাল বাসিতেন, চরণকেও সেইরূপ ভাল বাসিতেন, অনেক সময়ে অমরুকে বলিতেন, “অমরু, তোর অপেক্ষা চরণ যোদ্ধা হইবে।” বাল্যকালাবধি চরণের ভীষণ তেজ ও অভিমান লক্ষিত হইত, প্রতাপের সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতগুহা ও উপত্যকায় বাস করিত ও সেই অল্পকালেই রাজার কীর্ত্তিগান রচনা করিয়া কবিত্বের পরিচয় দিয়াছিল।

আকবরসাহের সেনার সহিত অসংখ্য সংগ্রামের পর প্রতাপের যখন কাল হইল, তখন চরণের বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিংশৎ বৎসর, সে আজ ৬০ বৎসরের কথা, সুতরাং চরণের বয়ঃক্রম এক্ষণে প্রায় ৯০ বৎসর, তথাপি অমানুষিক বলে পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে লম্ফ দিয়া রজনীতে বিচরণ করে; সকলেই বলে চরণ দৈববলে বলিষ্ঠ।

প্রতাপের মৃত্যুর সময় তিনি মৃত্যু-শয্যার নিকট অমরুকে আনিয়া শপথ করাইয়াছিলেন যে, তিনিও পিতার ন্যায় চিরকাল মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন, অধীনতা স্বীকার করিবেন না। পিত্রাজ্ঞা পালনের জন্য অমরু অনেক বৎসর পর্য্যন্ত আকবর ও তাঁহার পুত্র জেহাঙ্গীরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ও পিতার ন্যায় বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধে চরণ সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন ও সর্ব্বসময়ে পিতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া উত্তেজনা করিতেন। কিন্তু সে উত্তেজনা বিফল; আর না পারিয়া অমরু জেহাঙ্গীরের অধীনতা স্বীকার করিলেন, কিন্তু

সে নামমাত্র অধীনতা। অমরু স্বদেশের রাজা রহিলেন, দিল্লীতে যে কর পাঠাইতেন তাহা দ্বিগুণ করিয়া মহানুভব জেহাঙ্গীর তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতেন; অমরুকে দিল্লী যাইতে হইত না, তাঁহার পুত্র কর্ণ ও পৌত্র জগৎসিংহকে জেহাঙ্গীর ও তাঁহার মহিষী নুরজেহান সর্ব্বদাই সমাদরের সহিত আহ্বান করিতেন ও অনেক মণিমুক্তা দিয়া পরিতুষ্ট করিতেন। ইহাকে প্রকৃত অধীনতা বলে না, তথাপি চরণ রোষে অভিমানে অমরুকে রাজা জ্ঞান না করিয়া অনেক কটূক্তি করিয়া প্রস্থান করিলেন।

আকবরকর্ত্তৃক চিতোর ধ্বংস হওনের পরই উদয়পুর নামে এক সুন্দর রাজধানী নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু চরণ তথায় যাইতে অস্বীকার করিলেন, তিনি সরোষে ভগ্ন চিতোরদুর্গে বাস করিতে লাগিলেন, একদিন দুইদিন অন্তর দুর্গ হইতে অবতরণ করিতেন, নীচে পল্লীগ্রামবাসীরা যাহা দিত তাহাই খাইতেন, আবার দুর্গে আরোহণ করিয়া ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। এইরূপ থাকিতে থাকিতে চরণ উন্মত্ত হইয়া গিয়াছেন, পর্ব্বতশৃঙ্গ তাঁহার বাসস্থান হইয়াছে, মেঘগর্জ্জন ও ঝটিকায় বন কম্পিত হইলে তাহার বড় উল্লাস হয়, তিনি স্বপ্ন দেখেন যেন আবার প্রতাপ আকবরসাহের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন।

রাজপুত সেনাগণ কয়েকদিন ভ্রমণ করিতে করিতে আরাবলী পার হইয়া যাইল। জগতের মধ্যে পর্ব্বতের যেরূপ উন্নত শোভা ও মাহাত্ম্য, সেরূপ শোভা বোধ হয় অন্য কোন বস্তুরই নাই। যাঁহারা পর্ব্বতের উপর ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারাই একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। সেনাগণ কখন উপত্যকার নীচে দিয়া যাইতেছে, দুই দিকে ভীষণ পর্ব্বত-রাশি মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে, শেখরগুলি যেন আকাশ হইতে নীচে অবলোকন করিতেছে, সেই সমস্ত শেখর হইতে অসংখ্য জলপ্রপাত দূর হইতে রৌপ্যপুচ্ছের ন্যায় দেখা যাইতেছে, কখন রবিকরে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, কখন বা অন্ধকারে দৃষ্ট হইতেছেনা। ঝরণার জল নিম্নে পড়িয়া কোন স্থানে বেগবতী নদীরূপে প্রবাহিত হইতেছে, আবার কোথাও বা চারিদিকে পর্ব্বত থাকায় সুন্দর স্বচ্ছ পর্ব্বতহ্রদ সৃষ্ট হইয়াছে, সে হ্রদ কি সুশোভন, কি মনোহর! জল পরিষ্কার, নিষ্কম্প, তাহার উপর চারি-দিকের পর্ব্বতশেখরের ছায়া যেন নিদ্রিত রহিয়াছে। শব্দমাত্র নাই, কেবল রহিয়া রহিয়া বায়ু পর্ব্বতবৃক্ষের ভিতর দিয়া মর্‌মর্ শব্দে সঞ্চরণ করিতেছে; কেবল গিরিপ্রবাহিনী ঝরণাগুলি শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে লম্ফ দিতে দিতে অবতরণ করিতেছে, ও অবারিত সুশৃঙ্খলিতস্বরে হ্রদের বক্ষে জলরাশি ঢালিয়া দিতেছে; স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও শৈলদ্বারা শতধা বিভিন্ন

জলরাশি ঝক্‌মক্‌ করিতেছে, যেন প্রজা মণিমাণিক্য মুক্তাফল ঢালিয়া দিয়া রাজার পূজা করিতেছে, অথবা পতিব্রতা কামিনী মুক্তাফল অপেক্ষা অমূল্য অজস্র প্রেমরাশি ঢালিয়া দিয়া পতির চরণসেবা করিতেছে।

কখন বা সেনাগণ নিশাকালে পর্ব্বতশৃঙ্গ উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে লাগিল। সে যে অপরূপ শোভা, কাহার সাধ্য বর্ণনা করে। শেখর চন্দ্রকরে সমুজ্জ্বল, কিন্তু দ্বিপ্রহর রজনীতে নিস্তব্ধ, গম্ভীর, শান্ত, যেন যোগী-পুরুষ পার্থিব সকল প্রবৃত্তি দমন করিয়া পরিষ্কার আকাশে ললাট উন্নত করিয়া ধ্যানে বসিয়াছেন। সেই গম্ভীর রজনীতে পর্ব্বতের সেই গম্ভীর শোভা দেখিলে যথার্থই মানবের অকিঞ্চিৎকারিত্ব দেদীপ্যমান হয়, মানবীয় দর্প, অভিমান, আশা, রোষ মুহূর্ত্তের জন্যও তিরোহিত হয়। যজ্ঞোপবীতস্বরূপ যোগীপুরুষের স্কন্ধ হইতে ঝরণা লম্বিত রহিয়াছে, চন্দ্রকরে কি অপরূপ সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে।

পর্ব্বতের সহস্র উপত্যকা ও কন্দরে অসভ্য আদিমবাসীরা বাস করিতেছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও যেরূপ, রাজপুতানায়ও সেইরূপ আর্য্যবংশীয়েরা অসিহস্তে আসিয়া কৃষিকার্য্যোপযোগী সমস্ত দেশ কাড়িয়া লইয়াছে, আদিমবাসীরা, পর্ব্বতগুহায় বাস করিতেছে। তাহারা রাজপুতানার রাজাদিগের অধীনতা স্বীকার করে না; তথাপি মোগলদিগের সহিত যুদ্ধের সময় অনেক সময় ধনুর্ব্বাণহস্তে পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া রাজপুতদিগের অনেক সহায়তা করিয়াছে।

পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া যশোবন্ত অচিরাৎ আপন মাড়ওয়ার দেশে আসিয়া পড়িলেন। মেওয়ার ও মাড়ওয়ার দুই দেশ দেখিলেই বোধ হয় যেন প্রকৃতি স্বহস্তেই দুই দেশের বিভিন্নতা সাধন করিয়াছেন। মেওয়ারে যেরূপ পর্ব্বতরাশি ও বিশাল বৃক্ষাদি ও লতাপত্রের গৌরব, মাড়ওয়ারে তাহার বিপরীত; পর্ব্বত নাই, অশ্বত্থ, বট, প্রভৃতি বৃহৎ বৃক্ষ নাই, উর্ব্বরা ক্ষেত্র নাই, বেগবান তরঙ্গ নাই, পর্ব্বত-বেষ্টিত হ্রদ নাই, কেবল মরুভূমিতে বালুকারাশি ধূধূ করিতেছে, ও স্থানে স্থানে অতি ক্ষুদ্রকায় কণ্টকময় বাবুল ও অন্যান্য বৃক্ষ দেখা যাইতেছে। এই মরুভূমির উপর দিয়া সেনাগণ যাইবার সময় মেওয়ারদেশীয় একজন চরণ মাড়ওয়ারী এক সেনাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল,—

আক রা ঝোপ, ফোক রা বার,
বজরা রা রোটী, মোঠ রা দার,
দেখো হো রাজা তেরি মাড়ওয়ার।

সেনা হাস্য করিয়া সগর্ব্বে উত্তর করিল, "আমাদের জন্মভূমি উর্ব্বরা নহে, কিন্তু বীর-প্রসবিনী।" প্রকৃত মাড়ওয়ারের রাজপুতেরা কঠোর জাতি, রাজপুতানায় তাহাদের অপেক্ষা সাহসী জাতি আর ছিল না।

সৈন্যগণ এইরূপে কয়েকদিন ভ্রমণ করিতে করিতে রাজধানী যোধপুরের সম্মুখে পৌঁছিল ও শিবির সন্নিবেশিত করিল।

তখন নরেন্দ্র স্বীয় বন্ধু গজপতির কথা স্মরণ করিয়া একবার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন। রাজা যশোবন্তসিংহ শিবিরে একাকী বিষণ্ণবদনে বসিয়া আছেন; নরেন্দ্র তাঁহার নিকট যাইয়া পৌঁছিলেন। "মহারাজের জয় হউক!" রাজা ফিরিয়া দেখিলেন একজন অল্পবয়স্ক সেনা। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার কি আবশ্যক?"

নরে। "মহারাজ! সিপ্রাতীরে আপনার একজন অনুচর হত হইয়াছেন, পূর্ব্বে একবার তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এক মুক্তামালা মহারাজ তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি আপনার দানের অপমান করেন নাই, সম্মুখযুদ্ধে হত হইয়াছেন, এ মুক্তামালা আপনার হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে বলিয়াছেন।"

রাজা সেই মুক্তামালা ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "হা! গজপতি, মাড়ওয়ারের কুলতিলক, তোমা অপেক্ষা সাহসী আমার শিবিরে কেহ ছিল না। একবার যুদ্ধে আমার জীবন-রক্ষা করিয়াছিলে, সেই জন্য তোমাকে মুক্তামালা দিয়াছিলাম, এবার আপনার জীবন আমার জন্য বিসর্জ্জন দিয়া সেই মালা ফিরাইয়া দিলে!—বৎস, নদীর জল একবার যাইলে আর ফিরিয়া আইসে না, রাজা একবার দান করিলে আর ফিরাইয়া লন না, তোমার বন্ধুর মুক্তামালা তুমি ললাটে ধারণ করিও, ও যুদ্ধের সময় তাহার বীরত্ব যেন তোমার স্মরণ থাকে।"

নরেন্দ্র রাজাকে শত ধন্যবাদ দিয়া সেই মালা শিরে ধারণ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আমার আর একটী আবেদন আছে। গজপতির দুইটী শিশুসন্তান আছে, তাহাদের মাতা নাই। গজপতি মহারাজকে বলিয়াছেন, যেন অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন, যেন কালে শিশু রঘুনাথও রাজাজ্ঞায় পিতার ন্যায় সংগ্রামে জীবন দিতে সক্ষম হয়। ইহা অপেক্ষা অধিক মঙ্গলকামনা তাহার পিতাও জানে না।"

এই করুণবাক্য শুনিয়া রাজার নয়নে জল আসিল; তিনি বলিলেন, "বৎস, ক্ষান্ত হও, আমি সেই শিশুদের পিতাস্বরূপ হইব, যোধপুরের

রাজ্ঞী স্বয়ং তাহাদের মাতা হইবেন। এখনও তাঁহাকে আমাদের আগমন-সংবাদ দেওয়া হয় নাই; আমাদের দূত যাইতেছে, যাও, তুমি স্বয়ং দূতের সঙ্গে যাইয়া রাজ্ঞীর নিকট গজপতির আবেদন জানাও এবং তাহার শিশু-দের জন্য দুটী কথা বলিও

রাজার আজ্ঞানুসারে নরেন্দ্র কয়েকজন রাজপুত দূতের সহিত যোধ-পুরের দুর্গ আরোহণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে কেবল বালুকারাশি-পরিবেষ্টিত, দীর্ঘে দ্বাদশ ক্রোশ, প্রস্থে এক ক্রোশ, ও অনতি-উচ্চ একটী পর্ব্বতশ্রেণী আছে; সেই পর্ব্বতের একটী শেখরের উপব যোধপুর নগর নির্ম্মিত। শেখরস্থ উচ্চ রাজবাটী ও ভীষণ দুর্গ নিম্নে চতুর্দ্দিকস্থ মরুভূমির উপর যেন কোপদৃষ্টি করিতেছে। নরেন্দ্র সেই পর্ব্বতে দুইটী হ্রদ দেখিলেন; পূর্ব্বদিকে "বাণীতলাও" ও দক্ষিণ দিকে "গোলাপ সাগর।" নরেন্দ্র আরও দেখিলেন, শেষোক্ত হ্রদ হইতে নগরবাসিনী শত শত কামিনী জল লইতে আসিয়াছে, হ্রদের পার্শ্বস্থ সুন্দর উদ্যানে শত শত দাড়িম্ববৃক্ষ ফল ধারণ করিয়াছে ও নাগরিকগণ স্বচ্ছন্দচিত্তে সেই উদ্যানে বিচরণ করিতেছে। ঊর্দ্ধে প্রকাণ্ড দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ;—স্বভাবতই দুর্গম পর্ব্বত শত স্তম্ভ ও প্রাচীবদ্বারা বক্ষিত হইয়া শত্রুর পক্ষে অধিকতর দুর্গম হইয়াছে। রাজ্ঞীর আদেশে দূতগণ ও নবেন্দ্র প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

শ্বেত প্রস্তরনির্ম্মিত সুপ্রশস্ত হর্ম্ম্যে মহারাজ্ঞী রাজসিংহাসনে বসিয়া আছেন, চারিদিকে সহচরী বেষ্টন কবিযা বহিয়াছে ও চামর ঢুলাইতেছে; তাঁহার তেজোব্যঞ্জক বদনমণ্ডল অবগুণ্ঠনে কিঞ্চিৎ আবৃত হইয়াছে, তথাপি সে রূপরাশি ও নয়নেব অগ্নিবৎ উজ্জ্বলতা সম্যক্ লুক্কায়িত হয় নাই। গরীয়সী বামা যথার্থই রাজমহিষীর ন্যায় সিংহাসনে বসিয়া আছেন, নিবিড়কৃষ্ণকেশে উজ্জ্বল রত্নরাজি ধক্‌ধক্ করিতেছে।

দূত প্রণত হইয়া ধীরে ধীরে সভয়ে সকল সংবাদ জানাইলেন। মহা-রাজ্ঞী ক্ষণেক নিস্তব্ধ ও নিষ্পন্দ হইয়া রহিলেন, বজ্রপাত ও ঝটিকার পূর্ব্বে আকাশমণ্ডল সেইরূপ নিষ্পন্দ থাকে। সহসা অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিয়া আরক্তনয়নে দূতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—

"কাপুরুষ! ভগ্নদূত! সেই সিপ্রানদীতে আপনার অকিঞ্চিৎকর শোণিত বিসর্জ্জন করিতে পার নাই? আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, আর তোমার প্রভু সেই কাপুরুষকে বলিও তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া কলঙ্করাশিতে কলঙ্কিত হইয়াছেন, তিনি আমার এ পবিত্র দুর্গে প্রবেশ পাইবেন না।" পরে সিংহীর ন্যায় ভীষণস্বরে বলিতে লাগিলেন,—

"তিনি ক্ষত্রিয় নহেন, তিনি আমার স্বামী নহেন, এ নয়ন যশোবন্তসিংহকে আর দেখিবে না। আমি, মেওয়ারের রাণার দুহিতা, প্রতাপসিংহের-কুলে যে বিবাহ করিবে সে ভীরু কাপুরুষ কেন হইবে? যুদ্ধে জয় করিতে পারিলেন না, কেন সম্মুখ রণে হত হইলেন না?—

"কাপুরুষ! এক্ষণও দণ্ডায়মান আছ,—আমার যোদ্ধাগণ কোথায়? দূতগণকে পর্ব্বতের উপর হইতে নীচে নিক্ষেপ কর, দুর্গের দ্বার রুদ্ধ কর।"—রাজ্ঞীর সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছিল, ক্রোধে কণ্ঠরুদ্ধ হইল, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

তখন নরেন্দ্র অগ্রসর হইয়া ধীরে ধীরে অতিশয় গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন—

"মহারাজ্ঞি! আমাদের সম্বন্ধে যে আদেশ করিলেন তাহা শিরোধার্য্য, কিন্তু মহারাজ যশোবন্তসিংহকে কাপুরুষ বলিবেন না, এই নয়নে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি, যতদিন জীবিত থাকিব এরূপ ভীষণ যুদ্ধ কখনও দেখিব না, এরূপ অদ্বিতীয় বীর কখনও দেখিব না।"

রাজ্ঞী ক্ষণেক স্থিরনয়নে নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন; ধীরে ধীরে বলিলেন, "যথার্থই কি আমার যশোবন্ত সম্মুখযুদ্ধ করিয়াছিলেন, তুমি বিদেশীয়, তোমার জীবনের কোন ভয় নাই, যথার্থ কথা বিস্তার করিয়া বল।"

নরেন্দ্র যুদ্ধের বিষয় সবিশেষ বর্ণনা করিলেন। রাজপুতের যেরূপ সাহস দেখিয়াছিলেন, মহারাজের যেরূপ সাহস দেখিয়াছিলেন তাহা বলিলেন। শেষে বলিলেন—"যখন মেঘরাশির ন্যায় চারিদিকে মোগলসেনা আসিয়া বেষ্টন করিল, যখন ধূম ও ধূলায় ক্ষেত্র অন্ধকার হইয়া যাইল, যখন ভীরু কাসেম খাঁ পলায়ন করিল, তখনও মহারাজ অমানুষিক সাহস অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজপুতেরা সহস্র সহস্র হত হইয়া পর্ব্বত, উপত্যকা ও সিপ্রানদী আরক্ত করিয়াছে; রাজার চতুর্দ্দিকে অল্পসংখ্যক্‌মাত্র রাজপুত আছে; আরংজীব ও মোরাদ সহস্র মোগলসৈন্য সমেত রাজার উপর আক্রমণ করিলেন; তখনও মহারাজ অমানুষিক সাহস অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজার পদতলে শত শত রাজপুত হত হইতে লাগিল; রাজপুতসংখ্যা ক্ষীণ হইতে লাগিল; মোগলের জয় জয়নাদে মেদিনী ও আকাশ কম্পিত হইতে লাগিল, কিন্তু মহারাজের হৃদয় কম্পিত হইল না। অষ্ট সহস্র রাজপুতের মধ্যে অষ্টশতও জীবিত ছিল না, তথাপি মহারাজ ক্ষেত্র পরিত্যাগ

করিলেন না; ঘোর কল্লোলিনী সিপ্রানদী ও ভীষণাকার বিন্ধ্যপর্ব্বত রাজা যশোবন্তের ভীষণ বীরত্বের সাক্ষী আছে।”

শুনিতে শুনিতে রাজ্ঞীর নয়নদ্বয় জলে ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল। বলিলেন—“তবে যশোবন্ত সম্মুখযুদ্ধে রাজপুতের নাম রাখিয়াছেন—বিদেশীয় দূত! এ কথায় আমার হৃদয় শীতল হইল। বল তাহার পর কি হইল।”

নরে। “মনুষ্যের যাহা সাধ্য, দেবতার যাহা সাধ্য, যশোবন্ত তাহা করিয়াছেন। যখন কেবলমাত্র পঞ্চশত সৈন্য জীবিত আছে দেখিলেন, অগত্যা পলায়ন করিলেন।”

“পলায়ন করিলেন। হা বিধাতঃ! রাজপুত পলায়ন করিলেন! রাণার জামাতা পলায়ন করিলেন!”—বক্ষঃস্থলে সজোরে করাঘাত করিয়া রাজ্ঞী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

তৎক্ষণাৎ দাসীগণ রাজ্ঞীর মুখে জলসিঞ্চন করিতে লাগিল, রাজ্ঞীও অল্পক্ষণ মধ্যেই চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া এবার করুণস্বরে বলিলেন, “সহচরি! চিতা প্রস্তুত কর, আমার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইয়াছেন, তিনি স্বর্গধামে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, আমি তথায় যাই;—যশোবন্তের নামে যে আসিয়াছে সে প্রবঞ্চক; আর তুই দূত, তোর সঙ্গিগণ সহিত এইক্ষণেই মাড়ওয়ার দেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হ, নচেৎ প্রাণে হত হইবি।”

নরেন্দ্র ও দূতগণ দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, রাজ্ঞীর আজ্ঞায় দুর্গের দ্বার রুদ্ধ হইল। বাহিরে যাইবার সময় যোধপুরের রাজমন্ত্রী দূতের হস্তে একখানি পত্র দিয়া বলিলেন—

মহারাজের সহিত তোমাদের দেখা করিবার আর আবশ্যকতা নাই, এই পত্র লইয়া শীঘ্র মেওয়ার দেশের রাজধানী উয়য়পুরে যাও, তথায় রাণা রাজসিংহকে এই পত্র দিও, তিনি তোমাদিগকে আশ্রয় দিবেন, আমাদের মহারাজ্ঞীর আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়, মাড়ওয়ারে আর থাকিতে পাইবে না। মহারাজ্ঞীর মাতা তথায় আছেন; এই পত্র প্রাপ্তিমাত্র তিনি যোধপুরে আসিবেন, তিনি ভিন্ন তাঁহার কন্যাকে কেহ শান্ত করিতে পারিবেন না।”

নরেন্দ্র দূতের সহিত অচিরাৎ মেওয়ার দেশের রাজধানী উদয়পুরে যাইলেন। তথাকার রাজাকে পত্র দিলেন ও তাঁহার অনুগ্রহভাজন হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

ইতিহাসে লিখিত আছে, যে যোধপুরের রাজ্ঞী ৮।৯ দিবস অবধি উন্মত্তপ্রায় হইয়া রহিলেন; পরে উদয়পুর হইতে তাঁহার মাতা আসিয়া তাঁহাকে অবশেষে সান্ত্বনা করিলেন। তখন তিনি যশোবন্তসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যশোবন্তসিংহ আরংজীবের সহিত অচিরাৎ যুদ্ধ করিতে যাইবেন স্থির হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

উদয়পুর।

মাড়ওয়ার দেশের প্রধান নগরী যোধপুর; মেওয়ার দেশে পূর্ব্বে চিতোর প্রধান নগরী ছিল, এক্ষণে উদয়পুর। মাড়ওয়ারের বালুকারাশি ও মরুভূমি হইতে পর্ব্বতপ্রধান মেওয়ার দেশে পুনরায় আসিতে নরেন্দ্রনাথ বড়ই আনন্দানুভব করিলেন; আবার আরাবলীর উচ্চ শেখর উল্লঙ্ঘন করিলেন; আবার পার্ব্বতীয় নদী ও প্রস্রবণের বেগ ও মহিমা সন্দর্শন করিলেন; আবার শান্ত নিস্তব্ধ পর্ব্বত-হ্রদের শোভা দেখিয়া নরেন্দ্রের হৃদয়ে অতুল আনন্দ উদয় হইল। কিছুদিন এইরূপে ভ্রমণ করিয়া নরেন্দ্রনাথ ও যোধপুরের দূতগণ উদয়পুরে উপস্থিত হইলেন।

নরেন্দ্রনাথের বোধ হইল সেরূপ সুন্দর স্থানে সেরূপ সুন্দর নগরী পূর্ব্বে তিনি কখন দেখেন নাই। নীচে সুন্দর শান্ত প্রশস্ত হ্রদ, নির্ম্মল আকাশ ও চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতশ্রেণীর ছায়া সযত্নে বক্ষে ধারণ করিতেছে; চতুর্দ্দিকে সুন্দর পর্ব্বতশেখরের পর পর্ব্বতশেখর, যতদূর দেখা যায়, চারিদিকে প্রকৃতি এই মনোহর উচ্চ প্রচীর দিয়া জগতে সুখের আবাসস্থানকে যেন রক্ষা করিতেছে; হ্রদের নিকটবর্ত্তী একটী পর্ব্বতশ্রেণীর উপর সুন্দর রাজপ্রাসাদ ও শ্বেতবর্ণ সৌধমালা যেন সহাস্য বদনে নির্ম্মল দর্পণে আপনার সুন্দর প্রতিরূপ অবলোকন করিতেছে। নরেন্দ্রনাথের নয়নে ইহা অপেক্ষাও একটী বস্তু সুন্দর বোধ হইল, তাঁহার বোধ হইল যেন গৌরব, যশ, বীরত্ব সেই অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণীতে চিরকাল অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, ও দেবতাস্বরূপ বীর্য্যবন্ত রাজপুতদিগকে চিরকাল রক্ষিত ও প্রোৎসাহিত করিতেছে।

সূর্য্যদ্বার দিয়া যোধপুরের দূত নগরে প্রবেশ করিলেন। যোধপুরে ও উদয়পুরে তখন বন্ধুত্ব ছিল, সুতরাং যোধপুরের দূতগণকে আহ্বান করিবার

জন্য নাগরিকগণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। প্রশস্ত পথ দিয়া নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গিগণ রাজপ্রাসাদাভিমুখে যাইতে লাগিলেন; চরণগণ "টপ্পা" অর্থাৎ মঙ্গলসূচক গীত গাইতে লাগিলেন; দুই পার্শ্বের স্ত্রীলোকগণ কলসকক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া "সুহেলিয়া" অর্থাৎ আনন্দগীত গাইয়া যোধপুরের দূতদিগকে আহ্বান, করিলেন। দূতগণ সকলকেই দুই এক মুদ্রা পুরস্কার দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন।

অনন্তর রাজপ্রাসাদে পৌঁছিয়া রাণার অনুমতিক্রমে প্রাসাদের উপর উঠিলেন। শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত সোপান দ্বারা আরোহণ করিয়া সূর্য্যমহলে প্রবেশ করিলেন। সেই মহলেই রাণা বিদেশীয় রাজা ও রাজদূতদিগকে আহ্বান করিতেন, বংশের আদিপুরুষ সূর্য্যের একটী প্রতিমূর্ত্তি সেই গৃহের এক দেওয়ালে খোদিত ছিল, সেই জন্য উক্ত মহলের নাম সূর্য্যমহল।

রক্তবর্ণ মকমলমণ্ডিত সূর্য্যরশ্মি-প্রতিঘাতী বহুমূল্য রত্নবিনির্ম্মিত রাজাসনে বাপ্পা রাওয়ের বংশাবতংস মহারাণা রাজসিংহ উপবেশন করিয়া আছেন। চারিদিকে সুবর্ণখচিত রৌপ্য স্তম্ভের উপর একটী চন্দ্রাতপ মণিমুক্তায় ঝলমল করিতেছে। কিঞ্চিদ্দূরে পারিষদ্গণ উপবেশন করিয়া আছেন; ও চরণগণ স্তুতিবাক্যে এই অমরাবতী তুল্য রাজসভার সাধুবাদ করিতেছেন। এরূপ সময়ে যোধপুরের দূত প্রবেশ করিলেন।

দূত বিনীতভাবে সমস্ত সমাচার অবগত করাইলেন। যশোবন্তসিংহের পরাজয় ও দেশে প্রত্যাগমন, মহারাজ্ঞীর ক্রোধ ও রাজার দুর্দ্দশা, এই সমস্ত অবগত করাইয়া যোধপুরের মন্ত্রীর পত্র রাণার হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাণা রাজসিংহ সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া যশোবন্তের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া দূতগণকে বিদায় করিলেন ও তাঁহাদের উদয়পুরে থাকিবার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্দ্ধারিত করিতে মন্ত্রীবরকে আদেশ করিলেন। অল্পদিন পরেই যোধপুর-রাজ্ঞীর মাতা উদয়পুর হইতে যোধপুরে গমন করিলেন।

নরেন্দ্রনাথ উদয়পুরে কয়েক মাস বাস করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। হেমের প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে অনপনেয় অঙ্কে অঙ্কিত হইয়াছিল, হেমের চিন্তা তিরোহিত হইবার নহে; তথাপি সেই বীরদেশে সেই সুন্দর উপত্যকায় বাসকালীন সে চিন্তাও কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাঘব হইল। উদয়পুর হইতে অল্প দূরে অনেক অনেক যুদ্ধস্থান, অনেক কীর্ত্তিস্তম্ভ, অনেক পূজাস্থান আছে; নরেন্দ্র একে একে সমুদায় সন্দর্শন করিতে

লাগিলেন। কখন একাকী, কখন দেওয়ানাকে সঙ্গে লইয়া নরেন্দ্র নানা পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিতেন, হ্রদের এক অংশ হইতে অন্য অংশ, এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বত, এক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অন্য যুদ্ধক্ষেত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন। এক একটী পর্ব্বত নরেন্দ্রনাথের পক্ষে রাজপুতের কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়া বোধ হইত; তিনি কখন কখন প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এক একটী নিস্তব্ধ উপত্যকায় বিচরণ করিতেন, বা একটী কীর্ত্তিস্তম্ভের নিকট উপবেশন করিয়া থাকিতেন। প্রাতঃকালে ক্রীড়াসক্ত রাজপুত বালকগণ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সেই অপরিচিত ভ্রমণকারীকে দেখাইত; সায়ংকালে রাজপুত মহিলাগণ কলসকক্ষে হ্রদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় সেই বিদেশীকে চরণ বিবেচনায় প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইত। দেওয়ানাও নিস্তব্ধে প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিত; নিকটস্থ বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ করিয়া আনিয়া দিত; ও সায়ংকালে নৌকা আনিয়া আপনি দাড় ধরিয়া প্রভুকে উদয়পুরে পুনরায় লইয়া যাইত। নিস্তব্ধ শান্ত হ্রদের উপর দিয়া ধীরে ধীরে নৌকা ভাসিয়া যাইত; সে শান্ত সায়ংকালীন আকাশ, নিস্তব্ধ পর্ব্বতরাশি, ও নির্ম্মল শব্দশূন্য হ্রদ দেখিয়া নরেন্দ্রনাথের হৃদয় শান্তিরসে পরিপূর্ণ হইত, ও গভীর অনন্ত চিন্তায় মগ্ন হইয়া প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য অনুকরণ করিত। কখনও বা দেওয়ানার হৃদয় কোন নূতন অনিশ্চিতভাবে উথলিলে সে সপ্তস্বরে গীত আরম্ভ করিত, সে বাল-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত সুবিমল স্বরে সেই নৈশহ্রদ, পর্ব্বতরাশি ও আকাশমণ্ডল ভাসিয়া যাইত। নরেন্দ্রনাথ নিস্তব্ধে সেই গান শুনিতেন, আর তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্ব কথা জাগরিত হইত। তাহার ভাষায় গীত, সে গান নরেন্দ্র বুঝিতে পারিতেন না, তথাপি দুই একটী কথা শুনিয়া বোধ হইত যেন সে প্রেমের গান। অভাগা উন্মত্ত বালক! তুই এই বয়সে কি প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিস? না হইলে সে দেওয়ানা কেন, তাহার চক্ষু এরূপ অস্বাভাবিক জ্যোতিতে জ্বলিতেছে কেন, সে দেশ, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া উন্মত্ত হইয়া দেশে দেশে বিচরণ করে কেন? নরেন্দ্রনাথের উপযুক্ত ভৃত্য!

রজনীযোগে চন্দ্রালোকে সেই হ্রদের নির্ম্মল জল বড় সুন্দর শোভা পাইত। জলহিল্লোলে চন্দ্রের আলোক বড় সুন্দর নৃত্য করিত; বায়ু রহিয়া রহিয়া সেই সুন্দর উর্ম্মিশ্রেণীকে চুম্বন করিয়া যাইত। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ এ সমস্ত দেখিতেন না। নৌকার উপরে শয়ান হইয়া চারিদিকের সেই অনন্ত পর্ব্বতরাশি দেখিতেন; অনন্ত আকাশে নির্ম্মল নীল আভা দেখিতেন;

দুই একখানি দুগ্ধফেননিভ শুভ্র মেঘ দেখিতেন। দেখিতেন আর কত চিন্তা করিতেন। কখন বা হেমলতার চিন্তা করিতেন, কখনও বা বঙ্গদেশের অনাথ অবস্থার বিষয় ভাবিতেন, কখন বা অনন্ত রাজপুত-গৌরব ও রাজপুত-পর্ব্বতের বিষয় চিন্তা করিতেন। তাঁহার পার্শ্বে তাতার বালক বসিয়া থাকিত, কখন আপন অঙ্কে নরেন্দ্রের মস্তক স্থাপিত করিয়া বসিত; সেও আকাশের দিকে, চন্দ্রের দিকে চাহিত আর গভীর চিন্তা করিত।—কি চিন্তা? দেওয়ানার কি চিন্তা কে বলিবে?

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। ক্রমে আশ্বিন মাসে অম্বিকা-পূজার সময় সমাগত হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

শারদীয়া পূজা।

শরৎকাল উপস্থিত, গ্রীষ্মের তেজ আর নাই; বর্ষার জল অপসৃত হইয়াছে এবং মেদিনী বর্ষা-স্নানের পর দ্বিগুণ শোভায় হরিৎ পরিচ্ছদে দৃষ্ট হইতেছে। বীরস্থান, রাজপুতানায় এই সময়ে যুদ্ধ আরম্ভের সময়, সুতরাং রাজস্থানে অম্বিকার পূজার সহিত খড়্গের পূজা হইয়া থাকে। আশ্বিন মাসে উপর্য্যুপরি দশ দিন নরেন্দ্রনাথ যেরূপ ঘটা ও সমারোহে যেরূপ উৎসাহ দেখিলেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। পূর্ব্বপুরুষগণ যে সমস্ত অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ জয় করিয়াছেন বা যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছেন, বীরগণ এখন মহা উৎসাহে সেই সমস্ত অস্ত্র আয়ুধশালা হইতে বাহির করিয়া মহাসমারোহে তাহার পূজায় রত হইলেন। দেবীর মন্দিরে প্রতিদিন মহিষ ও মেষ বলি হয়, রঙ্গস্থানে যোদ্ধাগণ প্রতিদিন একত্রিত হইয়া আপন আপন যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করেন ও মহা উৎসাহ ও বীরদর্পে কালহরণ করেন। দশম দিবসে মহাসমারোহে দুর্গার পূজা হইল; তাহার পরদিবসে মহারাণা সমস্ত যোদ্ধা বীরগণকে আহ্বান করিয়া রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন। সে দিনের সমারোহ দেখিয়া নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। সমস্ত উদয়পুর যেন নূতন শোভায় শোভিত হইয়াছে; বাজার, দোকান, পথ, ঘাট, আজি পুষ্পমাল্য ও বৃক্ষশাখায় পরিশোভিত হইয়াছে; বহুমূল্য সাটীন ও জরীর চন্দ্রাতপে পথ ও গৃহ আচ্ছাদিত হইয়াছে; দ্বারে দ্বারে সুন্দর ও সুশোভিত তোরণ দৃষ্ট হইতেছে; গৃহে গৃহে বিজয়পতাকা উড্ডীন হইতেছে; প্রাতঃকালের সূর্য্যরশ্মি এই সমস্ত সুন্দর দ্রব্যের উপর খেলিতেছে; সহস্র জয়ঢাকের শব্দে রাজপুত বীর

ও সৈন্যগণ সজ্জিত হইয়া রঙ্গস্থলে গমন করিতেছে; উদয়পুরের অধীনস্থ নানা স্থান হইতে অনেক বীর অদ্য, নিজ নিজ সৈন্য সামন্ত লইয়া সমবেত হইয়াছে; নানা লোকের নানারূপ অশ্ব, নানারূপ পরিচ্ছদ, নানারূপ পতাকা ও বাদ্যযন্ত্র ও নানারূপ অস্ত্রশস্ত্র আজি উদয়পুরে সম্মিলিত হইয়াছে। পঞ্চদশ সহস্র বীরপুরুষ আজি মহারাণাকে বেষ্টন করিয়াছে ও মহারাণার আদেশে স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। কে না জানে উদয়পুরের সৈন্যের পদভরে দিল্লীর সিংহাসন সমগ্র ভারতবর্ষ, শত বার কম্পিত হইয়াছে!

বেলা এক প্রহর হইতে হইতে সকলেই রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন, ও তথায় সকলেই নিজ নিজ বীরত্ব, নিজ নিজ যুদ্ধকৌশল, অশ্বচালনে বা অস্ত্রচালনে কৌশল দেখাইতে লাগিলেন। পঞ্চদশ সহস্র বীরগণের পদভরে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল, তাহাদের জয় জয় ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সে রঙ্গস্থানের শোভা কে বর্ণনা করিতে পারে? তাহার মধ্যে চরণগণ আসিয়া রাজসম্মুখে নিজ নিজ কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিল। কিরূপে সমরসিংহ ত্রয়োদশ সহস্র রাজপুতের সহিত স্বদেশরক্ষার্থ কাগার নদীকূলে জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিরূপে কুম্ভ বাহুবলে দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন, কিরূপে সংগ্রামসিংহ দিল্লীশ্বর বাবরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিরূপে প্রতাপসিংহ ক্রমান্বয়ে বিংশতি বৎসর পর্ব্বতকন্দরে বাস করিয়াও মহাবল পরাক্রান্ত আকবরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এই সমস্ত অনন্ত গীত আজি উদয়পুরের রঙ্গস্থলে গীত হইতে লাগিল। চরণের গীত সমাপ্ত হইল; রাণা লম্ফ দিয়া অশ্বে আরোহণ করিয়া অসি নিষ্কোষিত করিলেন, একেবারে পঞ্চদশ সহস্র অসি নিষ্কোষিত হইল, পঞ্চদশ সহস্র বীর পুরুষের জয় জয় নাদে আকাশ বিদীর্ণ হইল। তাহার পর রাজপুতগণ আবার যুদ্ধলীলায় লিপ্ত হইলেন। নরেন্দ্রনাথও তাহাদিগের সহিত মিলিলেন।

নরেন্দ্রনাথ অশ্বে আরোহণ করিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত কেবল একমাত্র ভৃত্য আসিয়াছিল; সে অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নরেন্দ্রের বর্শা লইয়া আসিতেছিল। নরেন্দ্র সেদিনকার যুদ্ধলীলায় আপন রণকৌশল প্রকাশ করিলেন, কোন কোন রাজপুতকে পরাস্ত করিলেন, কাহারও বা নিকট পরাস্ত হইলেন, অবশেষে অশ্বকে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দিবার জন্য দ্বিপ্রহরের সময় অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া একটী বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিলেন; ভৃত্য অশ্বকে বৃক্ষের এক পার্শ্বে বাঁধিল।

পরে ভৃত্য নিকটস্থ একটী ঝরণা হইতে নরেন্দ্রের জন্য জল আনিতে গেল। অচিরাৎ ফিরিয়া আসিয়া প্রভুর নিকট আবেদন করিল, যে ঐ ঝরণার নিকট এক জন অশ্বারোহী আমাকে জল লইতে নিবারণ করিল; কারণ জিজ্ঞাসায় বলিল, "বীরপুরুষ ভিন্ন এ অমৃতবারি পান করিবার অধিকার কাহারও নাই, বঙ্গবাসী প্রথমে বীরপুরুষ বলিয়া পরিচয় দিন, পরে জলপান করিতে পারিবেন।"

শুনিবামাত্র নরেন্দ্র ক্রোধে আরক্তবদন হইয়া লম্ফ দিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন ও সেই জলপ্রপাতের নিকট যাইলেন। দেখিলেন একটী প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ অশ্বে একজন প্রকাণ্ড কৃষ্ণপরিচ্ছদ যোদ্ধা বসিয়া রহিয়াছেন। যোদ্ধার মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ পরিচ্ছদে আবৃত, মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ উষ্ণীষ। যোদ্ধার বয়স অনেক হইয়াছে, কিন্তু এখনও নয়ন জ্যোতিঃ-পূর্ণ ও শরীর দেখিলে অসীম বলবান বলিয়া বোধ হয়।

নরেন্দ্র কর্কশভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমার বীরত্বের প্রমাণ চাহিয়াছিলেন?"

কৃষ্ণপরিচ্ছদ যোদ্ধা উত্তর না করিয়া দুইখানি যষ্টি দুই হাতে ধরিয়া বলিলেন, "একটী বাছিয়া লউন।" নরেন্দ্র একটী বাছিয়া লইলেন।

দুই জন অশ্বারোহী অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া একেবারে বেগে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, ক্ষণকাল তাহাদের কাহাকেও ভাল করিয়া দেখা গেল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে নরেন্দ্র পরাজিত হইলেন; সেই অপূর্ব্ব বলবান যোদ্ধার সজোর আঘাতে নরেন্দ্রের ঢাল চূর্ণ হইয়া গেল, নরেন্দ্রের যষ্টি হস্ত হইতে পড়িয়া গেল, নরেন্দ্র স্বয়ং ভূমিতে নিপতিত হইলেন। চারিদিকে যোদ্ধাগন উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

নরেন্দ্র স্বাভাবিক ক্রুদ্ধস্বভাব, এক্ষণে ক্রোধে একেবারে অন্ধ হইলেন। দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া আপন কোষ হইতে অসি বাহির করিয়া কৃষ্ণপরিচ্ছদ যোদ্ধার শরীরে আঘাত করিবার চেষ্টা করিলেন। রাজপুত অবহেলার ঢাল দ্বারা আপন শরীর বাঁচাইলেন, আবার যোদ্ধাগণ হাস্য করিয়া উঠিল।

তখন রাজপুত ঈষৎ হাসিয়া নরেন্দ্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমার হস্তে যষ্টিমাত্র, আপনার যুদ্ধখড়্গ ব্যবহার করা ন্যায়সঙ্গত হয় নাই; তবে স্ত্রীলোক ও বঙ্গদেশীয় যাহাই করে তাহাই মার্জ্জনীয়।"

এই ব্যঙ্গোক্তিতে মর্ম্মান্তিক ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া নরেন্দ্র কর্কশভাবে বলিলেন, "আমার উপহাস করিবার সময় নাই, আপনার যুদ্ধখড়্গ বাহির করুন।"

কৃষ্ণপরিচ্ছদ যোদ্ধা উত্তর করিলেন, "বালক! এই বয়সেই কেন প্রাণ হারাইবে? যষ্টি ধারণ কর তাহাই তোমাকে সাজে, যথার্থ যুদ্ধব্যবসায় তোমাকে সাজে না।"

নরেন্দ্র আর সহ্য করিতে না পারিয়া রাজপুতকে আক্রমণ করিলেন। তখন রাজপুত তিনহস্তপরিমিত আপন যুদ্ধখড়্গ বাহির করিলেন, সূর্য্যালোকে সে অসি ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। অধিকক্ষণ যুদ্ধ হইল না; কৃষ্ণপরিচ্ছদ যোদ্ধা অকাতরে এক আঘাতে নরেন্দ্রের অসি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন; দ্বিতীয় বার তাহার অসি উন্নত হইয়াছে, নরেন্দ্র জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এমন সময়ে এক দিকে একটী চীৎকার শব্দ হইল, রাজপুত সেই দিকে চাহিয়া দেখিয়া অসি আপন কোষে রাখিলেন; নরেন্দ্র সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার অনুচর দেওয়ানা চীৎকার করিয়াছিল। দেওয়ানার আগমনে তাঁহার জীবনরক্ষা হইল, নরেন্দ্র ইহা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু সেই তাতার বালকের চীৎকার শুনিয়া রাজপুত কেন তাঁহাকে বধ করিতে নিরস্ত হইলেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি রাজপুতের দিকে চাহিয়া দেখিলেন; দেখিলেন, তিনি নিস্তব্ধে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছেন; তাঁহার মুখমণ্ডল স্থির ও গম্ভীর, এইক্ষণেই যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহাকে দেখিলে তাহা কোন ক্রমেই বোধ হয় না।

নরেন্দ্র কর্কশস্বরে বলিলেন, "রাজপুত! আমি তোমার নিকট জীবনভিক্ষা চাহি না; তোমার যাহা ইচ্ছা, যাহা সাধ্য কর, আমি অনুগ্রহ চাহি না।"

কৃষ্ণপরিচ্ছদ যোদ্ধা গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন,—"আমি এক্ষণে ব্যঙ্গ করিতেছি না, আপনি যথার্থ বীর আপনার বীরত্ব দেখিয়া আমি তুষ্ট হইলাম। আমিও যুদ্ধব্যবসায় করিয়া থাকি, যোদ্ধার নিকট ভিক্ষা চাহিতে যোদ্ধার কোন অপমান নাই। তিন দিবসের মধ্যে আমাদের আবার সাক্ষাৎ হইবে, সে দিন আমি আপনার নিকট একটী ভিক্ষা করিব। আমার নাম শৈলেশ্বর।"

নরেন্দ্রকে উত্তর দিবার সময় না দিয়াই শৈলেশ্বর ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। নরেন্দ্র অতিশয় বিস্মিত হইলেন। দেওয়ানাকে নিকটে ডাকিয়া সে অদ্য রঙ্গস্থলে কখন আসিয়াছিল, কি জন্য আসিয়াছিল, কৃষ্ণপরিচ্ছদ যোদ্ধাকে পূর্ব্বে জানিত কি না, কেনই বা যোদ্ধা তাহার চীৎকার শুনিয়া যুদ্ধে নিরস্ত হইল, প্রভৃতি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু

দেওয়ানা জ্ঞানশূন্য; সে কোন কথার উত্তর দিতে পারে না। নরেন্দ্র দেখিলেন দেওয়ানাকে জিজ্ঞাসা করা ব্যর্থ। সন্ধ্যার প্রাকালে ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

দেবমন্দির।

রাজস্থানে নূতন নূতন দেশ নূতন নূতন আচার ব্যবহার দেখিয়া নরেন্দ্রনাথের হৃদয় কিছুদিন শান্ত হইয়াছিল, কিন্তু প্রস্তরে যে অঙ্ক খোদিত হয়, জলে বা অগ্নিতে তাহা একেবারে বিলুপ্ত হয় না। বঙ্গদেশ হইতে উদয়পুর শত শত ক্রোশ অন্তর, কত নদ, নদী, পর্ব্বত, মরুভূমি পার হইয়া নরেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। তথাপি প্রাতঃকালে যখন পূর্ব্বদিকে আকাশে রক্তিমাচ্ছটা অবলোকন করিতেন, তখন সেই পূর্ব্বদেশবাসিনী উজ্জলতর সৌন্দর্য্যচ্ছটা নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে জাগরিত হইত। গভীর রজনীতে যখন নরেন্দ্রনাথ একাকী ছাদের উপর অন্ধকারে বিচরণ করিতেন, বোধ হইত যেন সেই প্রণয়প্রতিমা তারার জ্যোতিতে নরেন্দ্রনাথের উপর প্রেমদৃষ্টি করিতেছে! কোথায় বীরনগরের বাটী, কোথায় কলনাদিনী ভাগীরথী, আর কোথায় নরেন্দ্রনাথ? কিন্তু স্বদেশ হইতে পলায়ন করিলে কি চিন্তা হইতে পলায়ন করা যায়? মৃত্যুর আগে আর একবার সেই হেমলতাকে দেখিবেন; প্রাতে, সায়ংকালে, দ্বিপ্রহরে, নিশীথে তিনি যে চিন্তা করেন, হেমলতাকে একবার সেই সমস্ত কথা বলিবেন, নরেন্দ্রনাথের কেবল এই ইচ্ছা। মৃত্যুর আগে কি আর একবার দেখা হইবে না? নরেন্দ্রনাথ দেওয়ানার নিকট শুনিলেন, যে ভগবান্ একলিঙ্গের মন্দিরের কোন কোন গোঁসাই ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন; নরেন্দ্রনাথ একদিন সেই মন্দিরে যাত্রা করিলেন।

রজনী এক প্রহরের পর মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলেন, ও মন্দিরের যে শোভা দেখিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইলেন। সে দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; রহিয়া রহিয়া শীতল বায়ু ঝটিকাবেগে প্রবাহিত হইতেছে। মন্দির একটী উপত্যকাস্থিত ছিল, তাহার চারিদিকে যতদূর দেখা যায়, কেবল উচ্চ প্রকাণ্ড অন্ধকারময় পর্ব্বতরাশি অন্ধকার আকাশের সহিত মিশ্রিত

হইয়াছে; চারিদিকে যেন প্রকৃতি অলঙ্ঘনীয় ভীষণ প্রাচীর দিয়া ভীষণ রুদ্রের উপযুক্ত গৃহনির্ম্মাণ করিয়াছেন; সেই প্রাচীরের উপর গভীর কৃষ্ণবর্ণ দূরবিলম্বী বজ্রনাদী ঘন ঘনরাশি ছাদস্বরূপ লম্বিত রহিয়াছে; রুদ্রের উপযুক্ত চন্দ্রাতপ! আকাশের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত এক এক-বার বিদ্যুল্লতা চমকিত হইতেছে। সেই ক্ষণস্থায়ী আলোকে চারিদিকের বস্তু এক একবার দেখা যাইতেছে। দূর পর্ব্বতের শেখর চারিদিকে গগন বিদীর্ণ করিয়া উর্দ্ধবাহুর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে দেখা যাইতেছে; কাল মেঘের উপর কাল মেঘ যেন রাশীকৃত হইয়াছে দেখাইতেছে; মন্দিরের নিকটে বিশাল অন্ধকারাচ্ছন্ন আম্রকানন দৃষ্ট হইতেছে, আর সেই প্রশান্ত প্রকাণ্ড শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত উন্নত দেবালয় দৃষ্ট হইতেছে। আবার গভীর অন্ধকার, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অন্ধকার; কেবল শ্বেত মন্দির ও চারিদিকে ভীষণ অচলপ্রাচীর অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে; কেবল প্রবল বাত্যা, প্রবল উচ্ছ্বাসরব শুনা যাইতেছে; কেবল নিকটস্থ বেগবাহিনী প্রস্রবণ শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে নিপতিত হইতেছে, তাহারই বজ্রনাদ শুনা যাইতেছে। মুহূর্ত্তমধ্যে বিদ্যুতের উপযোগী বজ্রনাদ শুনা গেল, কড় কড় শব্দে আকাশ, পর্ব্বত, উপত্যকা, প্রতিধ্বনিত করিল, এবং ভীত ও স্তম্ভিত জগতে রুদ্রতেজ প্রচারিত করিল।

নরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ মন্দিরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া এই ভীষণ শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রকৃতির এ মহিমা দেখিয়া তিনি মুহূর্ত্তের জন্য সমস্ত জগৎসংসার ও পার্থিব বিষয় বিস্মৃত হইলেন। আজি নরেন্দ্রনাথের হৃদয় শান্ত, সংসার-চিন্তাশূন্য! অচকিতনয়নে তিনি বিদ্যুতের বিকট শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন, অকম্পিতহৃদয়ে বজ্রের ভীষণ নাদ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে অন্ধকার, নরেন্দ্র একাকী সেই গভীর রজনীতে মন্দিরপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তমসাচ্ছন্ন অভ্রভেদী পর্ব্বতমালার দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন, যেন প্রকৃতির উদ্বেগ দেখিয়া আজি তাঁহার হৃদয়ের উদ্বেগ কিঞ্চিৎ শান্ত হইল।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় নরেন্দ্র সেই প্রকাণ্ড মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, তখনও প্রবল বাত্যা ও ঘন বিদ্যুৎ থামে নাই। সারি সারি শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত সুন্দর স্তম্ভের মধ্য দিয়া সেই বিস্তীর্ণ প্রস্তরালয়ে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখে মহাদেবের যণ্ড ও নন্দির পৈত্তল প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে, ভিতরে শুভ্র প্রকোষ্ঠ ও স্তম্ভসার উজ্জ্বল সুগন্ধ দীপাবলিতে ঝল্‌মল্ করিতেছে; মধ্যে ভোলানাথের প্রস্তরবিনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত

রহিয়াছে। মন্দিরের একজন দীর্ঘকায় তেজস্বী জটাধারী গোস্বামী এক প্রান্তে উপবেশন করিয়া মুদিতনয়নে তপ করিতেছেন, প্রশস্ত ললাটে অর্দ্ধশশাঙ্কের ন্যায় চন্দনরেখা, বিশাল স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত লম্বিত রহিয়াছে। অন্য দুই চারি জন গোস্বামী এদিক ওদিক বিচরণ করিতেছেন। আজি এই দুর্য্যোগে অধিক যাত্রী আইসে নাই। ঐ মন্দিরের প্রধান গোস্বামী চিরকাল অবিবাহিত থাকেন, তাঁহার মৃত্যুর পর শিষ্যের মধ্যে একজন ঐ পদে নিযুক্ত হন। মন্দিরের সাহায্যার্থে অনেকসংখ্যক গ্রাম নির্দ্দিষ্ট ছিল; তাহা ভিন্ন যাত্রিদিগের দানও অল্প ছিল না।

সহসা দ্বিপ্রহরের ঘণ্টারব সেই সুন্দর শিলা-মন্দিরে প্রতিধ্বনিত হইল; তৎক্ষণাৎ যোগ-রত গোস্বামী নয়ন উন্মীলিত করিয়া ইঙ্গিত করিলেন; বম্‌বম্ হর হর শব্দে মন্দির পরিপূরিত হইল, ও তৎপরে যন্ত্র-সম্মিলিত উচ্চ গীতধ্বনিতে ভোলানাথের স্তব আরম্ভ হইল। জগদ-বিমোহিনী অপ্সরতুল্যা প্রৌঢ়যৌবনসম্পন্না নর্ত্তকীগণ তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল; গায়কগণ সপ্তস্বরে মহাদেবের অনন্ত গীত গাইতে আরম্ভ করিল। সে অনন্ত গীতের সহিত বায়ু ভীষণ উচ্ছ্বাসশব্দে মিলিত হইতে লাগিল, আর মধ্যে মধ্যে বজ্রনাদ যেন সেই মহাগীত জগতে প্রচার করিতে লাগিল।

ক্ষণেক পর সে গীত সাঙ্গ হইল, সেই গোস্বামী আবার ইঙ্গিত করিলেন, নর্ত্তকীগণ দলে দলে সরিলা গেল, গায়কগণ নিস্তব্ধ হইল, মন্দিরের দীপাবলি সহসা নির্ব্বাপিত হইল; পূজা সাঙ্গ হইল। নরেন্দ্রনাথ সে অন্ধকারে ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন।

ক্ষণেক পর বোধ হইল, যেন অন্ধকারে সেই দীর্ঘকায় গোস্বামী তাঁহাকে ইঙ্গিত করিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ সেই দিকে যাইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয় কি এ মন্দিরের একজন গোস্বামী?" গোস্বামী কিছুমাত্র না বলিয়া ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আমার সহিত কথোপকথনে অভিলাষী?" গোস্বামী পুনরায় ওষ্ঠে অঙ্গুলী স্থাপন করিলেন। নরেন্দ্রনাথ সেই অন্ধকারে এইরূপ লোক দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন; আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আমাকে ইঙ্গিত করিলেন কেন?" গোস্বামী উত্তর না করিয়া অঙ্গুলী দ্বারা দূরে এক দিক নির্দ্দেশ করিলেন; নরেন্দ্র সেইদিকে চাহিলেন, নিবিড় দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না; আবার চাহিলেন, বোধ হইল যেন অন্ধকারে একটী

দীপশিখা দেখা যাইতেছে। গোস্বামী নরেন্দ্রনাথকে ইঙ্গিত করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন; নরেন্দ্রনাথ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

দুইজনে অনেক পথ সেই অন্ধকারে অতিবাহিত করিলেন। তখন আকাশ হইতে মুসলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে, সময়ে সময়ে মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, সে পথ জনশূন্য ও নিস্তব্ধ; কিন্তু গোস্বামী কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া সেই আলোকাভিমুখে চলিলেন; নরেন্দ্রনাথও চলিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইল। এ অন্ধকারে এ মৌনাবলম্বী যোগীপুরুষ কে? ইহার উদ্দেশ্য কি? শৈবগণ কখন কখন নরহত্যার দ্বারা পূজাসাধন করে, এ দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ বিকট যোগীর কি তাহাই উদ্দেশ্য? একবার নরেন্দ্রনাথ দাঁড়াইলেন, আবার খড়্গে হাত দিয়া ভাবিলেন, "আমি কি কাপুরুষ? এই প্রশান্তমূর্ত্তি যোগীর সহিত যাইতে ভয় করিতেছি?" আবার গোস্বামীর সঙ্গে সঙ্গে সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পর শৈব গোস্বামী এক পর্ব্বতগহ্বরে প্রবেশ করিলেন, নরেন্দ্রও প্রবেশ করিলেন; তাহার ভিতর যাহা দেখিলেন তাহাতে নরেন্দ্রনাথ আরও বিস্মিত হইলেন।

সম্মুখে করালবদনা কালীর ভীষণ প্রতিমূর্ত্তি, তাহার নিকটে কয়েকখানি সমাধিকাষ্ঠ জ্বলিতেছে, তাহার আলোক সেই গহ্বরের শিলায় চারিদিকে প্রতিহত হইতেছে। গহ্বরের ভিতর উপর হইতে বিন্দু বিন্দু জল পড়িতেছে; অগ্নির পার্শ্বে কয়েকখানি পুস্তক, একখানি শোণিতাক্ত খড়্গ, ও স্থানে স্থানে শোণিতে ব্যপ্লিত হইয়াছে। দূর-জলস্রোতের ন্যায় একটী শব্দ সেই গহ্বরে শ্রুত হইতেছিল।

গোস্বামীর আকৃতি অপূর্ব্ব। শ্বেতশ্মশ্রু বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত লম্বিত রহিয়াছে, শ্বেত কেশের জটাভার পৃষ্ঠে দুলিতেছে, অথচ শরীর অতিশয় দীর্ঘ, অতিশয় বলিষ্ঠ, অতিশয় তেজোময় বলিয়া অনুভব হয়, ও নয়নদ্বয় সেই অগ্নির আলোকে ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। উন্নত ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দনরেখা শোভা পাইতেছে। নরেন্দ্রনাথের বোধ হইল, যেন এরূপ অপূর্ব্ব আকৃতি তিনি কখনও দেখেন নাই।

গোস্বামী পদাঘাতে জ্বলন্তকাষ্ঠ নির্ব্বাণ করিলেন; পরে তাহার অপর পার্শ্বে যাইয়া সেই রক্তাক্ত খড়্গ হস্তে তুলিয়া লইলেন; বিকীর্ণ অগ্নিকণাতে তাঁহার মুখমণ্ডল ও দীর্ঘ অবয়ব আরও বিকট বোধ হইল; নরেন্দ্রনাথের

হৃদয় স্তম্ভিত হইল; তিনি অগত্যা একপদ পশ্চাতে যাইয়া শিলারাশিতে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইলেন; অগত্যা তিনি কোষ হইতে অসি বাহির করিলেন, সাহসে ভর করিয়া তখন তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তাঁহার হৃৎ-কম্প একেবারে অবসান হইল না।

অতি গম্ভীরস্বরে গোস্বামী ডাকিলেন, "নরেন্দ্রনাথ!"

নরেন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হইয়া দেখিলেন, শৈব সেই উদয়পুরের কৃষ্ণপরিচ্ছদ যোদ্ধা—শৈলেশ্বর!

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

পর্ব্বতগহ্বর।

তখন নরেন্দ্রনাথের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। "এ অপরিচিত যোগী আমার নাম কিরূপে জানিল; কিজন্য এই ভীষণ স্থানে আমাকে এই ভীষণ স্বরে আহ্বান করিল?" নরেন্দ্রের হৃদয় উদ্বেগে অস্থির হইল, কিন্তু চিন্তার সময় ছিল না। শৈলেশ্বর আবার বলিলেন—

"নরেন্দ্রনাথ! ভগবান্ একলিঙ্গের মন্দিরে গোস্বামীগণ যোগবলে মানব-হৃদয় জানিতে পারেন; নরেন্দ্রনাথ! তুমি পাপ-হৃদয়ে এ পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছ?"

নরেন্দ্রনাথ অধোবদনে রহিলেন। পুনরায় শৈলেশ্বর অতি কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"নিরুত্তর হইলে কি জন্য? নিজ পাপমুখে পাপকথা বিস্তার করিয়া বল; পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিলম্ব নাই।"

এই ভয়াবহ আদেশ শুনিয়া নরেন্দ্র মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইলেন; কিন্তু তিনি ভীরু ছিলেন না, কর্কশভাবে উত্তর করিলেন—

"আপনি কে জানি না, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নহি।"

শৈল। "আমি ভগবান্ একলিঙ্গের মন্দিরের গোস্বামী, সে মন্দির-কলুষিতকারিকে প্রশ্ন করিবার আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।"

নরেন্দ্র। "আমি মহেশ্বর মন্দিরের গোস্বামীকে এইমাত্র উত্তর করিব, যে গোস্বামিগণ যদিও রমণী-প্রেমে বঞ্চিত, তথাপি রমণী-প্রেম-আকাঙ্ক্ষা পাপ নহে; স্বয়ং শূলপাণি অপর্ণার প্রেম আকাঙ্ক্ষা করেন।"

গোস্বামী বজ্রনাদে উত্তর করিলেন, "নরেন্দ্র! এ প্রবঞ্চনার স্থান নহে; তুমি কেবল রমণীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী নহ, পাপিষ্ঠ! তুমি পরস্ত্রীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী;

জগতে এরূপ যন্ত্রণা কি আছে, নরকে এরূপ অগ্নি কি আছে, যাহাতে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়?" সে ভীষণ শব্দ পর্ব্বতগহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইল। নরেন্দ্র আবার অধোবদনে রহিলেন; শৈলেশ্বর বলিতে লাগিলেন—

"নরেন্দ্রনাথ! আপনাকে ভুলাইও না, জগৎকে ভুলাইও না; যে ঘোর পাপে লিপ্ত হইয়াছ, তাহা বিশেষ করিয়া আলোচনা কর, সেই সুন্দর জাহ্নবীকূলে সেই সুন্দর অট্টালিকা স্মরণ কর। পবিত্রাত্মা শ্রীশচন্দ্র, পবিত্রা হেমলতা, পবিত্র সংসার! পাপিষ্ঠ! তোমার মনোরথ কি? সেই সংসার ছারখার হয়, সেই শ্রীশচন্দ্রের সর্ব্বনাশ হয়। আহা! সেই শ্বেত-পদ্ম-সন্নিভা পবিত্রা হেমলতা বাল্যকালে যে তোমার সহিত খেলা করিয়াছিল, এখনও সহোদরা অপেক্ষা তোমাকে যে স্নেহ করে, তোমার জন্য যে চিন্তা করে, সেই স্নেহময়ী পতিব্রতা নারী কুলটা হইয়া তোমাকে সেবা করে! সতীর ললাটে কুলকলঙ্কিনী দুশ্চারিণী শব্দ অনপনেয় অঙ্কে অঙ্কিত হয়; তাঁহার দুগ্ধফেননিভ শ্বেত যশে অঙ্গারবর্ণ দেদীপ্যমান্ হয়; ঘোর পাপিষ্ঠ! তোমার জন্য সে সোণার সংসার, সে পবিত্রা পতিব্রতা নারী, সকলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়! হা নরেন্দ্রনাথ! আপনাকে ভুলাইও না; সত্য তুমি এতদূর ভাব নাই, কিন্তু তোমার মনোরথ পূর্ণ হইলে ইহা ভিন্ন আর কি ফল হয়? এই কাল মনোরথে তুমি এই পবিত্র মন্দিরে আসিয়াছ।"

কথা সাঙ্গ হইল; কিন্তু সে বজ্রধ্বনি তখনও কর্ণমূলে কম্পিত হইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ অধোবদনে রহিলেন, তাঁহার শরীর কম্পিত হইতেছিল, চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার কর্কশভাব লীন হইল, নয়ন হইতে দুই একটী অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইল। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—

"স্বামিন্! আমি একবার আত্মরক্ষার জন্য এই গহ্বরে প্রবেশ করিয়াই অসি বহিষ্কৃত করিয়াছিলাম; এই সে অসি গ্রহণ করুন; আমার হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়া এই অগ্নিতে নিক্ষেপ করুন; আমার মত ঘোর পাপিষ্ঠের নরকেও প্রায়শ্চিত্ত নাই।"

শৈলেশ্বর তখন ধীরে ধীরে বলিলেন, "বৎস! এ সংসারে এরূপ ব্যাধি নাই, যাহার ঔষধ নাই; এরূপ পাপ নাই, যাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই; আমি তোমার সংশোধনকামনা করি, সংহারকামনা করি না।"

নরে। "স্বামিন্! আমি এ দয়ার উপযুক্ত নহি; যে পাপিষ্ঠ হেমলতার ন্যায় পবিত্রপুত্তলীকে কলুষিত করিবার মানসে দেবালয়ে আইসে, তাহার ইহজীবনে প্রায়শ্চিত্ত নাই।"

শৈল। "নরেন্দ্র, তুমি যতদূর এক্ষণে বিবেচনা করিতেছ ততদূর পাপী নহ। আমার নিকট কিছুই অবিদিত নাই। তুমি হেমলতাকে পাইবার মানস কর নাই; একবার দেখিবে, জীবনে আর একবার দেখিবে, এইরূপ মানস প্রকাশ করিয়াছিলে; সেই মানসেই দেবালয়ে আসিয়াছিলে।"

গোস্বামী যোগবলে এতদূর জানিয়াছেন দেখিয়া নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন; তাঁহার হৃদয়ও কিছু শান্ত হইল। বলিলেন—

"প্রভো! আপনি যাহা আদেশ করিলেন যথার্থ, হেমলতার হানি করা দূরে থাক, তাঁহার শরীরের একটী কণ্টক বিমোচন করিবার জন্য আমি জীবন দিতে পারি, ভগবান্ অন্তর্যামী, তিনি তাহা জানেন।"

শৈল। "তবে তাহার হৃদয়ে যে কণ্টকটী তুমিই স্থাপন করিয়াছ সেটী তুলিতে যত্নবান্ কেন না হও?"

নরে। "কিরূপে? আদেশ করুন।"

শৈল। "বাল্যকালাবধি তুমি তাঁহার হৃদয়ে প্রেমস্বরূপ কণ্টক রোপণ করিয়াছ, সেটী তুমি উৎপাটন কর; না হইলে তাহা উৎপাটিত হইবে না। হেমলতা জীবন্মৃতা থাকিবে। হেমলতা এক্ষণে সচ্চরিত্র ধর্ম্মপরায়ণ স্বামী পাইয়াছেন, সংসারকার্য্যে বিব্রত হইয়াছেন, কেবল তুমি কোথায় আছ, কি করিতেছ, এই চিন্তা এক একবার তাঁহার মনে হয়, কেবল সেই সেই সময়ে স্বামীর প্রতি হৃদয়ে বিশ্বাসঘাতিনী হয়েন। সেই চিন্তা তুমি দূর কর।

নরে। "কিরূপে দূর করিব? আমি তাঁহার নিকটে থাকিলে কি সে চিন্তা দূর হইবে?"

শৈল। "হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে তোমার হৃদয়ে এখনও যেরূপ উদ্বেগ, তাহা দেখিয়া হেমলতার পূর্ব্বের উদ্বেগ আবার সজীব হইতে পারে।"

নরে। "স্বামিন্! তবে কি করা উচিত? আমি দূরে থাকিলে হেম আমার চিন্তা করিবে, নিকটে থাকিলে আবার পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইবে। তবে কি উপায় নাই?"

শৈল। "উপায় আছে। নিকটে থাকিবে; কিন্তু হেমলতার সহিত একেবারে চিরজন্মের বিচ্ছেদ ঘটান আবশ্যক। নরেন্দ্র যদি যথার্থ হেমকে ভাল বাস, যদি যথার্থ তাহার কণ্টকোদ্ধারের জন্য প্রাণ দিতে সম্মত থাক, তবে আমার পরামর্শ গ্রহণ কর। বিধর্ম্মী হও; মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন কর; মুসলমানকন্যা বিবাহ কর, তোমার পূর্ব্ব স্বামী সুজার অধীনে পুনরায়

কার্য্য কর। হেম যখন শুনিবে, যে নরেন্দ্র আমার বাল্যকালের ভালবাসা ভুলিয়া অন্য স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়াছেন, মুসলমান হইয়া মুসলমান সুবাদারের প্রিয়পাত্র হইয়াছেন; তখন অবশ্যই তাঁহার হৃদয় ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইবে। মানব-হৃদয় লতার মত শুষ্ককাষ্ঠে জড়াইয়া থাকে না। যে আমাকে একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে, যাহার অন্য আশা, অন্য প্রেম, অন্য উদ্দেশ্য, অন্য চিন্তা, তাহার প্রতি অনুরক্তি কখনই চিরকাল থাকে না। নরেন্দ্র! তোমার বিষম পাপের এই বিষম প্রায়শ্চিত্ত।"

নরেন্দ্রের মস্তকে যেন সহসা বজ্রপাত হইল। তিনি অনেকক্ষণ বাক্‌শূন্য হইয়া রহিলেন, অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভগবন্‌! রক্ষা করুন এ বিষম প্রায়-শ্চিত্তে আমি অশক্ত; আমি জলমগ্ন হইব, আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব; আমি অন্য কন্যা পরিগ্রহ করিতে পারিব না।"

শৈল। "স্বার্থপর! তুমি অগ্নিপ্রবেশ করিলে তোমারই যন্ত্রণা শেষ হইবে, হেমের কি হইবে? যখন হেম শুনিবে তুমি তাহার জন্য অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছ, তখন তাহার পূর্ব্ব ভালবাসা, পূর্ব্বশোক শতগুণ বৃদ্ধি পাইবে; অভাগিনী চিরকালের জন্য শতগুণ হতভাগিনী হইবে। নরেন্দ্রনাথ, এই জন্য কি বলিয়াছিলে হেমের উপকার করিতে তুমি ক্লেশ স্বীকার করিতে পার?"

নরে। "ভগবান জানেন আমি তাহার জন্য অনেক ক্লেশ স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু আপনি যে ব্যবস্থা করিলেন সে অসহ্য। স্বামিন্‌! এ ঔষধ অতিশয় তিক্ত, অন্য ঔষধের ব্যবস্থা করুন।"

শৈল। "উৎকট রোগে উৎকট ঔষধ আবশ্যক।"

নরে। "স্বামিন্‌! আপনি পরম ধার্ম্মিক শৈব হইয়া আমাকে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার আদেশ করিতেছেন?"

শৈল। "পাপের জন্য মনুষ্য গোজন্ম পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়, কেবল জাতিনাশে ভীত হইতেছ?"

দুই জনে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; নরেন্দ্রনাথ হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দিকে চাহিয়া একমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; শৈলেশ্বর সেই পর্ব্বতগহ্বরে ধীরে ধীরে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পর শৈলেশ্বর গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"নরেন্দ্রনাথ, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর?"

নরে। "না বিশ্বাস করিলে নিজ খড়্গ স্বামীর হস্তে দিতাম না।"

শৈল। "তবে একটী কথা শুন। প্রেম নারীর একমাত্র অবলম্বন, প্রেম নারীর জীবন; পুরুষের তাহা নহে। পুরুষের অনেক আশা আছে, অনেক অভিলাষ, অনেক মহৎ উদ্দেশ্য আছে; তুমি যুবক, সাহসী অভিমানী; এ প্রশস্ত জগতে কি আপন অসি সহায় করিয়া আপনার যশের পথ পরিষ্কার করিতে পারে না? স্ত্রীলোকের মত কি কেবল ক্রন্দনে জীবন অতিবাহিত করিবে? শুনিয়াছি তোমার বঙ্গদেশ বীরশূন্য, যশঃশূন্য। যাও, নরেন্দ্রনাথ! সেই দূর বঙ্গদেশে যশঃস্তম্ভ স্থাপন কর, যাও স্বদেশের গৌরব সাধন কর, সিংহবীর্য্য প্রকাশ করিয়া আপন কীর্ত্তি স্থাপন কর। এ মহৎ উদ্দেশ্যে তোমার জীবন সমর্পণ কর। আকাশে এরূপ দেবতা নাই, যিনি এ মহৎ উদ্দেশ্যে তোমাকে সহায়তা না করিবেন। স্বয়ং বজ্রপাণি পুরন্দর, স্বয়ং শূলপাণি মহাদেব, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন। জগৎ বিহারী বায়ু দেশে দেশে তোমার যশোগান বিস্তার করিবে।"

শৈলেশ্বর নিস্তব্ধ হইলেন; নরেন্দ্রের নয়নদ্বয় ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল, তিনি একদৃষ্টিতে সেই অপূর্ব্ব শৈবের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পূর্ব্বে একদিন এই শৈবকে যেরূপ যুদ্ধনিপুণ দেখিয়াছিলেন, অদ্য মানব-হৃদয় জ্ঞানে তাঁহাকে সেইরূপ নিপুণ দেখিলেন। শৈব আবার বলিতে লাগিলেন—

"ঐ শুন ভীষণ বজ্রনাদ, ঐ ভীষণ বায়ুর শব্দ; এইরূপ রজনীতে তুমি বিদেশে ভগবান্ একলিঙ্গের মন্দিরে পূজা দিতে আসিয়াছ! কি জন্য? দেশের হিতসাধনের জন্য আসিয়াছ? কোন্ বীরব্রতে ব্রতী হইয়া আসিয়াছ? কোন্ দেবোচিত মহদুদ্দেশ্য সাধনার্থ আসিয়াছ? ধিক্ নরেন্দ্র! তোমার ন্যায় বীরপুরুষ একটী বালিকার মুখ দেখিবার জন্য জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ভুলিয়া থাকে? প্রেমচিন্তা দূর কর; অথবা যদি সে চিন্তা দূর করিতে না পার, এরূপ প্রণয়নিগড়ে বদ্ধ হও, যদ্দারা মহদুদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। পুরুষসিংহ! সিংহী গ্রহণ কর।"

নরে। "ভগবন্, আদেশ করুন।"

শৈল। "এ জগৎ অনুসন্ধান কর; প্রাণ অপেক্ষা তোমাকে ভাল বাসিবে, পীড়ার সময় সাবিত্রীর ন্যায় তোমার সেবা করিবে, যুদ্ধের সময় নৃমুণ্ডমালিনীর ন্যায় তোমার পার্শ্বে অসিহস্তে দাঁড়াইবে, কুশলের সময় পরিমল প্রণয়দানে তোমার হৃদয় তৃপ্ত করিবে, বিপদের সময় যশোগীতে তোমার শরীর কণ্টকিত করিবে; এরূপ রমণী যদি পাও, তাহাকে গ্রহণ কর।"

নরে। "এরূপ নারী কি জগতে আছে?"

শৈল। "স্বয়ং দেখিতে পাইবে। নরেন্দ্র! আমার যোগবল মিথ্যা নহে, এরূপ নারী না থাকিলে আমি বৃথা তোমাকে এই গহ্বরে আহ্বান করি নাই; আর একটী কথা শুন; যে নারীর কথা আমি বলিতেছি, সে হেমলতা অপেক্ষা তোমাকে ভালবাসে; আমি বৃদ্ধ হইয়াছি কিন্তু মানবী-হৃদয়ে এরূপ গভীর প্রেম থাকে, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। এ নারীকে পূর্ব্বে তুমি দেখিয়াছ।"

নরে। "স্মরণ নাই।"

শৈল। "অদ্য স্বপ্নে দেখিবে। আমি চলিলাম, এই কলসে যে মদিরা আছে, তাহা পান করিয়া আজ এই গহ্বরে শয়ন কর। এই নির্ব্বাণপ্রায় অগ্নির দিকে দেখ, যখন শেষ অগ্নিকণা সমস্ত ভস্ম হইয়া যাইবে, তখন সেই স্বপ্ন দেখিবে। যে নারীকে দেখিবে, সেই এই জগতের মধ্যে তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী, তোমার ন্যায় অভিমানিনী, বীরপুরুষ! তোমার উপযুক্ত বীরনারী।"

নরে। "মহাশয়, আপনার কথায় বিস্মিত হইলাম।"

শৈল। "আর একটী কথা আছে; এটী ভয়ানক কথা মন দিয়া শুন। এই স্বপ্ন দেখিয়া কাল প্রাতে তুমি এই গহ্বর হইতে বাহিরে যাইও। তিন দিন তোমাকে সময় দিলাম, স্বপ্নদৃষ্টা নারীকে বিবাহ করিবে কি না, তিন দিনের মধ্যে স্থির করিবে। যদি সম্মত হও, তবে তিন দিন পরে শ্বেত-চন্দনরেখা ললাটে ধারণ করিয়া অমাবস্যার সায়ংকালে আমার সহিত এই গহ্বরে সাক্ষাৎ করিও, কিরূপে সে কন্যা পাইবে তাহার উপায় বলিয়া দিব। যদি এ বিবাহে না সম্মত হও, তবে রক্তচন্দনের রেখা ললাটে ধারণ করিয়া আমার সহিত ঐ অমাবস্যার সায়ংকালে এই স্থানে সাক্ষাৎ করিও; তোমার সমুচিত শাস্তি দিয়া নররক্তবিলাসিনী কালীকে পরিতুষ্টা করিব। ইহাতে প্রতিশ্রুত হও, নচেৎ কালী তোমাকে স্বপ্ন দিবেন না।" শৈলের স্বর স্থির ও গম্ভীর!

নরেন্দ্র চমকিত হইলেন; তথাপি ভয়ের চিহ্ন প্রদর্শন করিতে লজ্জিত হইলেন, স্থিরস্বরে কহিলেন, "প্রতিশ্রুত হইলাম; তিন দিন পর অমাবস্যার সন্ধ্যায় আপনার সহিত এই গহ্বরে সাক্ষাৎ করিব। ইহাতে যে প্রকার অঙ্গীকার করিতে বলেন করিতে প্রস্তুত আছি।" শৈলেশ্বর বলিলেন, "তুমি বীরপুরুষ; তোমার কথাই অঙ্গীকার; রজনী তিন প্রহর হইয়াছে; আমি বিদায় হইলাম।"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বীণাহস্তে।

নরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ সেই অন্ধকার গহ্বরে বিচরণ করিতে লাগিলেন, একাকী বিদেশে ভীষণ স্থানে ভীষণ শৈবের হস্তে পতিত হইয়াছেন; বাল্যকালের ভালবাসা, যৌবনের প্রেম সহসা উৎপাটিত করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। না করিলে করালবদনা কালীর সম্মুখে জীবন সমর্পণ করিবেন। একাকী অনেকক্ষণ সেই গহ্বরে পদচারণ করিতে লাগিলেন। কি ভীষণ চিন্তায় তাঁহার হৃদয় উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল, তাহা আমরা অনুভব করিতে সাহস করি না।

অনেকক্ষণ পর অগ্নি নির্ব্বাণপ্রায় দেখিয়া তিনি শৈবের আদেশ স্মরণ করিলেন, কলসে যে মদিরা ছিল, সমস্ত পান করিলেন; মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, অগ্নির একপার্শ্বে নরেন্দ্রনাথ শয়ন করিলেন।

অগ্নি দেখিতে লাগিলেন, এক একবার কাষ্ঠের এক অংশ প্রদীপ্ত হয়, আবার নির্ব্বাণ হয়, এক একটী স্ফুলিঙ্গ দেখা যায় আবার অঙ্গার হইয়া যায়। দেখিতে দেখিতে জ্বলন্ত অঙ্গারগুলি প্রায় সমস্ত নির্ব্বাণ হইল, হীনতেজ আলোকে সেই শিলাগৃহের শিলাভিত্তি আরও অপরূপ দেখাইতে লাগিল; নরেন্দ্রনাথ উন্মত্তপ্রায়, তিনি সেই ভিত্তির উপর আলোক ও ছায়ার নৃত্যতে যেন অমানুষিক জীবের নৃত্য দেখিতে লাগিলেন; কালীর নয়নদ্বয় যেন ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল, কালীর হস্তের খড়্গ যেন নরেন্দ্রের দিকে প্রসারিত হইতে লাগিল। নরেন্দ্র উঠিবার চেষ্টা করিলেন, উঠিবার শক্তি নাই। কি ভয়ানক! নরেন্দ্র জাগ্রত না সুপ্ত?

অচিরাৎ শেষ অগ্নিকণা নির্ব্বাণ হইল। নরেন্দ্র তাহা দেখিতেছিলেন না, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। এতক্ষণ দূরস্থ জলের শব্দ যাহা শুনা যাইতেছিল, নরেন্দ্রের বোধ হইল যেন, সে সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া স্বর্গীয় সঙ্গীতধ্বনি হইল। গভীর অন্ধকারে যেন ক্রমে আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ হইতে লাগিল; যে স্থানে গহ্বরের ভিত্তি ছিল তথায় যেন একটী প্রস্তর সহসা পড়িয়া যাইল, তাহার ভিতর হইতে অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনি, অপূর্ব্ব সৌর আলোকের ন্যায় আলোক বাহির হইতে লাগিল। ক্রমে যেন সূর্য্যের উপর হইতে মেঘ সরিয়া গেল, সে আলোকস্থান সম্পূর্ণ মুক্ত হইল। উঃ! একি স্বপ্ন না যথার্থ? স্বর্গীয় আলোকে জ্বলন্ত রূপরাশিবিভূষিতা

এক জন ষোড়শী বীণাহস্তে উপবেশন করিয়া অপূর্ব্ব বাদ্য করিতেছে। নরেন্দ্র বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া সেই অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

উঃ! কি অপরূপ সৌন্দর্য্য, কি উজ্জ্বল নয়ন, কি কৃষ্ণ কেশপাশ, কি ক্ষীণ অঙ্গ, এ কি মানবী? নরেন্দ্রনাথ ভাল করিয়া দেখ, এ বদনমণ্ডল, এ চারুনয়ন ও ওষ্ঠ কি তুমি কখনও দেখ নাই?

সুদূরশ্রুত সঙ্গীতের ন্যায় স্মৃতিশক্তি নরেন্দ্রের মনে ক্রমে ক্রমে জাগ্রত হইল।

কাশীর যুদ্ধ, দিল্লী, দিল্লীতে অপ্সরাবিষয়ক স্বপ্ন, একজন মুসলমান নারী; উঃ! এ যে সেই "অভাগিনী জেলেখা!" তবে দিল্লীর সে অপ্সরার স্বপ্ন নহে, তবে সে যথার্থ নারীমণ্ডলী দেখিয়াছিলেন, তাহারই মধ্যে উৎকৃষ্ট কুসুমটী আজি রাজস্থানের পর্ব্বতগহ্বরে ফুটিয়াছে, না কি সেও স্বপ্ন, এও স্বপ্ন? স্বপ্নে যে অপ্সরা একবার দিল্লীতে দেখা দিয়াছিল, আজিও সেই রাজস্থানে দেখা দিল। অপ্সরা কি মনুষ্যের প্রেমাকাঙ্ক্ষী? শৈলেশ্বর না মানবীর প্রেমের কথা বলিয়াছিলেন?

নরেন্দ্রের চিন্তা করিবার সময় ছিল না, সহসা সপ্তস্বরসমন্বিত অপ্সরা-কণ্ঠনিঃসৃত অপূর্ব্ব গীত সেই পর্ব্বতকন্দর আমোদিত করিল; নরেন্দ্রের হৃদয় আলোড়িত করিল। জেলেখা সেই বীণার সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব্ব মিষ্ট গান সংযোজনা করিয়াছেন; আহা! কি মধুর, কি হৃদয়গ্রাহী, কি ভাব-পরিপূর্ণ। নরেন্দ্র একদৃষ্টিতে সেই জেলেখার দিকে চাহিয়া রহিলেন; গাইতে গাইতে জেলেখার কণ্ঠ এক একবার রুদ্ধ হইল, নয়ন দিয়া দুই এক বিন্দু জল গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িতে লাগিল।

পতির জন্য পতিব্রতা কি সাধিতে পারে, জেলেখা তাহাই গাইতে লাগিল। হৃদয়ে হৃদয় স্থাপন করিয়া, নয়নে নয়ন স্থাপন করিয়া, অজস্র প্রেমবারিদানে প্রেমতৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে। গৌরবকালে, সম্পদ্‌কালে, প্রেমালোক দ্বিগুণ জ্বালিয়া লক্ষ্মীরূপিণী পতির আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারে। ভীষণ রণের মাঝে বীর্য্যবতী প্রদীপ্ত আশারূপিণী হইয়া পতির হৃদয় বীররসে পরিপূর্ণ করিতে পারে। যবে দুঃখ-অন্ধকারে জীবনের আশাপ্রদীপ একে একে নির্ব্বাণ হইয়া যায়, দুঃখীর সমদুঃখিনী তখন একাকিনী স্বামীর সেবা ও ক্লেশবিমোচন করিতে পারে। অবশেষে জীব-আকাশ হইতে জীবতারা যবে খসিয়া যায়, পতিব্রতা নারী উল্লাসে প্রিয়ের পাশে সহমৃতা হইতে পারে।

এই মর্ম্মের সুন্দর গান সমাপ্ত হইল, কিন্তু নরেন্দ্রের কর্ণমূলে তখনও সে সঙ্গীত শেষ হইল না। এক একবার সুমধুর ধীরশব্দে, এক একবার বজ্রনাদে

তাঁহার কর্ণে সে গান এখনও শব্দিত হইতে লাগিল। জেলেখা মানবী কি পরী-কন্যা? যেই হউক, নরেন্দ্র তাঁহার মুখমণ্ডল বার বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; বোধ হইল, যেন পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছিলেন এখন সেরূপ নাই, তাহা অপেক্ষা অধিক সুন্দরী কিম্বা অল্প সুন্দরী হইয়াছেন, নরেন্দ্র তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। শোকের পাণ্ডুবর্ণ ললাটে ন্যস্ত হইয়াছে; বাহু ও অঙ্গুলী অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ, নয়নদ্বয়ে যেন দুঃখ নিবাস করিতেছে। নরেন্দ্র আর দেখিবার সময় পাইলেন না; আবার অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনি পর্ব্বতকন্দর কাঁপাইতে লাগিল; আবার দুঃখের গানে নরেন্দ্রের হৃদয় আলোড়িত ও দ্রবীভূত হইল।

পতির নিকট পতিব্রতা নারী কি ভিক্ষা চাহে, জেলেখা এবার তাহাই গাইতে লাগিল। প্রেমভিক্ষা ভিন্ন এ জগতে দাসীর আর কি ভিক্ষা আছে? প্রেমলতিকার বেশে তোমার পদযুগল ধরিয়াছে, স্নেহকণা দিয়া সজীব করিও, যেন ধরণীতে না লোটায়। জ্ঞাতি, বন্ধু, দেশ দূরে রাখিয়া তোমার নিকট আসিয়াছে, জীবনের এই আশা, যে তোমার সুখে সুখিনী হইবে, তোমার দুঃখে দুঃখিনী হইবে। আহা! তোমার পদচ্ছায়া যেন পায়। যতদিন প্রাণ থাকে ইহা ভিন্ন ভিক্ষা নাই, আয়ুঃ শেষ হইলে পতির চরণ ধরিয়া পতির মুখের দিকে চাহিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, ইহা ভিন্ন সতীর আর কি ভিক্ষা আছে?

গান সমাপ্ত হইল; আহা! নয়নজলে সে পাণ্ডুবদনখানি ও উরঃস্থল ধৌত হইয়া গেল। ধীরে ধীরে মেঘচ্ছায়ায় যেন সূর্য্যকান্তি আচ্ছন্ন হইল; আলোকদ্বার ক্রমে রুদ্ধ হইল; সে স্বর্গীয় মূর্ত্তি ঢাকিয়া গেল; গভীর অন্ধকারে বীণাধ্বনি আবার থামিয়া গেল; পূর্ব্বশ্রুত দূর-জলশব্দ ভিন্ন নরেন্দ্র আর কিছু শুনিতে পাইলেন না। নরেন্দ্র গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন; আর কি স্বপ্ন দেখিলেন প্রাতে তাহা মনে রহিল না। নিদ্রান্তে নরেন্দ্র গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার মত্ততা আর নাই, তিনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে গাত্রোত্থান করিলেন। গহ্বর হইতে খড়্গ লইয়া বাহিরে আসিলেন; দেখিলেন, নবজাত সূর্য্যরশ্মিতে বৃষ্টিস্নাত বৃক্ষলতা ও দূর্ব্বাদল ঝিকমিক্ করিতেছে, ডালে ডালে পক্ষিগণ গান করিতেছে, সুদূরে একলিঙ্গের প্রকাণ্ড শ্বেত-প্রস্তরবিনির্ম্মিত মন্দির সূর্য্যকিরণে বড় শোভা পাইয়াছে। মন্দির লোকসমাকীর্ণ, আর চতুর্দ্দিকে বহুদূরে পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত সূর্য্যরশ্মিতে সুন্দর দেখা যাইতেছে!

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

খড়্গহস্তে।

সেই তিন দিন নরেন্দ্রনাথ কি চিন্তাজালে বেষ্টিত ও ব্যথিত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। শত সহস্র চিন্তা নরেন্দ্রনাথকে শত বৃশ্চিক-দংশনাপেক্ষা অধিক ক্লেশ দিতে লাগিল। নরেন্দ্র সে যাতনায় অস্থির হইলেন।

সেই ভীষণ পর্ব্বত-গহ্বরে শৈলেশ্বর যে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা নরেন্দ্রের হৃদয় হইতে তিরোহিত হইল না। হেমলতা পরের স্ত্রী, পরের গৃহিণী, তাহার চিন্তা, তাহার প্রতি ভালবাসা কি উচিত কার্য্য? নরেন্দ্রনাথ, তুমি যোদ্ধা বলিয়া পরিচয় দাও, এই কি বীরের উপযুক্ত কার্য্য? শৈবের উন্নত আদেশ গ্রহণ কর, অসি-হস্তে প্রেমচিন্তা উৎপাটন কর, যশের পথ পরিষ্কার কর, দেশের গৌরব সাধন কর, ইহা অপেক্ষা বীরের উপযুক্ত কার্য্য আর কি আছে? নরেন্দ্রের বীরহৃদয় স্ফীত হইল, তিনি স্থির করিলেন শৈবের আদেশ শিরোধার্য্য।

আবার তিন বৎসর পর বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একাকী নক্ষত্রের আলোকে যে পাণ্ডুবর্ণ শুষ্ক মুখখানি দেখিয়াছিলেন, গঙ্গাতীরে যে ক্ষীণ শরীর আপন হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে সেই দুঃখিনী হেমলতার কথা মনে পড়িল। উঃ! এ ভাব কি মনুষ্য দমন করিতে পারে? নরেন্দ্রের সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সেই হেম বাল্যকালে নরেনের সহিত খেলা করিয়াছে, যে দিন নরেন গৃহত্যাগী হয় হেম সে দিন নদীতীরে একাকী অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ছিল, যেন আপন জীবনকে বিদায় দিতেছিল, তাহা নরেনের মনে পড়িল। বাল্যকালে হেম নরেন ভিন্ন আর কাহাকেও জানিত না; যৌবনের প্রারম্ভে দিনান্তে নরেনের মুখ দেখিলে যেন হেম উদ্বেগশূন্য ও শান্ত হইত। বাল্যকালে একদিন নরেন হেমকে একখানি সামান্য কাচের কণ্ঠমালা সযত্নে পরাইয়া দিয়াছিল, হেম সে অবধি স্বর্ণমালা রত্নমালা তুচ্ছ করিয়া সেই মালা হৃদয়ে ধারণ করিত। আর একদিন নরেন্দ্র হেমকে না বলিয়া নৌকারোহণে নিকটস্থ একটী গ্রামে গিয়াছিল। সায়ংকালে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন, বালিকা সেদিন পাঠ দিতে পারে নাই, ভাল আহার করিতে পারে নাই, নিজ কক্ষে বসিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া একাকী চিন্তা করি-

ভেঁছে। আর একদিন পিতাকে না বলিয়া হেম নরেনের সহিত "ও-পারে" গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিলে নবকুমার হেমকে যথোচিত তিরস্কার ও প্রহার করিয়াছিল; তথাপি হেম নরেনের দোষ দেয় নাই, নরেন তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল, সে কথা প্রকাশ করে নাই। এইরূপ পূর্ব্বকালের, বাল্যকালের সহস্র কথা অজস্র বারিতরঙ্গের ন্যায় নরেন্দ্রের হৃদয় ব্যথিত ও আলোড়িত করিতে লাগিল; নরেন্দ্র আর সহ্য করিতে পারিলেন না; একাকী মন্দির-পার্শ্বে উপবেশন করিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।

আবার চিন্তা আসিতে লাগিল। নরেন্দ্রের দেশ নাই, গৃহ নাই, বন্ধু নাই, পরিজন নাই, নরেন্দ্র একাকী দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতেছেন, কেবল হেমের চিন্তাস্বরূপ নক্ষত্রের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সংসার-সমুদ্রে বিচরণ করিতেছেন! নিদারুণ শৈব! অভাগার একমাত্র সুখচিন্তা, এক-মাত্র সুখস্বপ্ন দূর করিও না; এ নিদারুণ আদেশ করিও না। নরেন্দ্র অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়াছে; আরও যে ক্লেশ আদেশ কর সহ্য করিতে প্রস্তুত আছে; নরেন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবে, বীরমর্য্যাদা ত্যাগ করিবে, পীড়াকষ্ট অন্নকষ্ট ভোগ করিতে সম্মত আছে, জগতের নিন্দা-ভার বহন করিতে সম্মত আছে, অথবা জগৎ পরিত্যাগ করিয়া ভীষণ অরণ্যে সিংহ ব্যাঘ্র আদি ভীষণ জন্তুর সহিত ঘোর অন্ধকারে জীবন অতিবাহিত করিতে সম্মত আছে। শৈলেশ্বর! আদেশ কর, ইহাতে যদি ভীষণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, নরেন্দ্র তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিবে; ইহাতে যদি নরেন্দ্র মুহূর্ত্তের জন্য সঙ্কোচ করে, করালবদনার সম্মুখে তাঁহার মস্তক-চ্ছেদন করিও; কিন্তু বাল্যকাল অবধি যে চিন্তা অবলম্বন করিয়া নরেন্দ্র জীবনধারণ করিতেছে, যৌবনে যে আনন্দের ভাব আলোক-হিল্লোলের ন্যায় নরেন্দ্রের হৃদয়ে নৃত্য করিত; সুখের চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়াও যে আলোকস্তম্ভস্বরূপ মূর্ত্তির চিন্তায় নরেন্দ্র দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতেছে; নিদারুণ শৈব! সে চিন্তা দূর করিতে বলিও না। নরেন্দ্র আর সহ্য করিতে পারিলেন না; আবার নিঃশব্দে দর-বিগলিত ধারায় রোদন করিতে লাগিলেন। এখন হেম পরের গৃহিণী, তথাপি নরেনের ভালবাসা বিস্মরণ হয় নাই, নরেনের চিন্তায় সে সুন্দর মুখখানি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। নরেন্দ্র তাহার চিন্তা ত্যাগ করিবে? নরেন্দ্র মুসলমান হইয়া যবনীকে বিবাহ করিবে? হেম তাহা শুনিবে? সে ভাবনা অসহ্য। নরেন্দ্র স্ত্রীলোকের ন্যায় যাবজ্জীবন রোদন করিবে, নরেন্দ্র

বীর নহে, বীর হইতে চাহে না। দেশের উন্নতি! জাতির উন্নতি! মুসলমান হইয়া খ্যাতি লাভ করিলে, মুসলমান-রাজ্যের মুসলমান-সমাজের গৌরব বৃদ্ধি হইবে, দেশের, স্বজাতির কি হইল? প্রবঞ্চক শৈব! তোমার উপদেশ প্রবঞ্চনা মাত্র, নরেন্দ্র গ্রাহ্য করিবে না। হিন্দু পুরোহিত হইয়া তুমি যবনীর পাণিগ্রহণ করিতে উপদেশ দেও। বিধর্ম্মি! কপটাচারি! দূর হও।

আবার শৈলেশ্বরের গম্ভীর আদেশ মনে পড়িল।

"হা নরেন্দ্রনাথ! আপনাকে ভুলাইও না, জগৎকে ভুলাইও না, যে ঘোর পাপে লিপ্ত হইয়াছ তাহা বিশেষ করিয়া আলোচনা কর।" শৈব কি মিথ্যাবাদী? পরনারী-চিন্তা কি পাপ নহে? নরেন্দ্রনাথ, সাবধান! আপনি পাপে লিপ্ত হইতেছ, শৈব প্রকৃত বন্ধু, তোমার দোষ দেখাইয়া দিতেছেন, তাহার নিন্দা করিও না।—নরেন্দ্রনাথ ভাবিয়া ভাবিয়া সে দিন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

তিন দিন অতিবাহিত হইল, তৃতীয় দিবস রজনীতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের দুই দণ্ড পূর্ব্বে নরেন্দ্রনাথ সেই গহ্বরমুখে একাকী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। এক একবার এদিক্ ওদিক্ নিঃশব্দে পদসঞ্চারণ করিতেছেন, এক একবার অন্ধকার আকাশের দিকে স্থির দৃষ্টি করিতেছেন, আবার গহ্বরমুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইতেছেন। হস্তে নিষ্কোষিত অসি; আকৃতি স্থির ও গম্ভীর!

ক্ষণেক পর শৈলেশ্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও নরেন্দ্রনাথকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; নরেন্দ্রনাথ পুরোহিতকে প্রণাম করিতে বিস্মৃত হইলেন।

শৈলেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছ?" গম্ভীর ও ঈষৎ কর্কশ স্বরে নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "হইয়াছি।" উভয়ে গহ্বরে প্রবেশ করিলেন।

গহ্বরে পূর্ব্বদিনের ন্যায় অতি উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল, সেই আলোকচ্ছটায় শৈলেশ্বর যাহা দেখিলেন তাহাতে চমকিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথের ললাট, গণ্ডস্থল, স্কন্ধ, বাহু, বক্ষঃস্থল রক্তচন্দনে একেবারে প্লাবিত রহিয়াছে!

শৈলেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন—

"পাপিষ্ঠ! পরস্ত্রী-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে পারিলে না?"

নরেন্দ্র। "পরস্ত্রী-আকাঙ্ক্ষা রাখি না।"

শৈলে। "হেমলতাকে এ জীবনে আর দেখিতে চাহ না?"

নরে। "তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি।"

শৈলে। "তবে যবনীকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত আছ ?"

নরে। "এ জীবনে নহে।"

শৈলেশ্বর ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আবার বলিলেন—

"তবে প্রতিজ্ঞাপালনে প্রস্তুত হও। খড়্গ ত্যাগ কর; কালীর সম্মুখে জীবন দানে প্রস্তুত হও।"

নরে। "আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা পালন করিয়াছি। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব বলিয়াছিলাম।"

শৈলে। "মূঢ়! সিংহের গহ্বরে আসিয়াও জীবনের প্রত্যাশা আছে? এই দণ্ডে তোর প্রাণনাশ করিব; এস্থলে তোর কে সহায়?"

নরে। "এই অসি আমার সহায়।" আলোকচ্ছটায় অসি ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিল।

শৈলেশ্বর নিঃশব্দে গহ্বরের এক স্থান হইতে আপন অসি বাহির করিলেন। উদয়পুরে একবার যেরূপ হইয়াছিল অদ্য আবার দুইজনে অসিযুদ্ধ হইল। নরেন্দ্র সেদিন অপেক্ষা অধিক সাবধানে অধিক যত্নে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে যত্ন বৃথা! সিংহবীর্য্য শৈব অল্পক্ষণ মধ্যেই নরেন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার অসি কাড়িয়া লইলেন; ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন—

"কেবল পূজা ব্যবসায়ে এই কেশ শুক্ল হয় নাই। রাজস্থানভূমি বীরপ্রসবিনী, কিন্তু যুদ্ধকালে শৈব গোস্বামিগণ বীর্য্যপ্রকাশে রাজস্থানেও অগ্রগণ্য। বালক! বঙ্গদেশবাসি! তোর সহিত যুদ্ধ করিলাম এই কলঙ্ক আমার রহিল।"

নরেন্দ্র স্থিরস্বরে বলিলেন—"আমি ইহার জন্যও প্রস্তুত আছি; তোমার যাহা ইচ্ছা, যাহা সাধ্য কর।"

শৈলেশ্বর একটী রজ্জু বাহির করিলেন; নরেন্দ্রের দুই হস্ত সেই রজ্জুদ্বারা সজোরে বন্ধন করিলেন, এরূপ জোরে বাঁধিলেন যে হস্তের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল; নরেন্দ্র শব্দমাত্র উচ্চারণ করিলেন না। পরে পূর্ব্বের ন্যায় কলস লইয়া নরেন্দ্রের মুখের নিকট ধরিয়া মদ্যপান করিতে বলিলেন; নরেন্দ্র তাহাই করিলেন। গোস্বামী গহ্বর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মত্ততাহেতু নরেন্দ্র অচিরাৎ ভূমিতে নিপতিত হইলেন, চক্ষুতে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, গহ্বর-পার্শ্বে দুই জন যেন ধীরে ধীরে কথা কহিতেছে এইরূপ নরেন্দ্রের বোধ হইতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে নরেন্দ্র মদিরা প্রভাবে নিদ্রায় পতিত হইলেন, আর কি হইল স্মরণ রহিল না।

কিন্তু সে নিদ্রা গভীর নহে; নরেন্দ্র সমস্ত রজনী স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, কখন স্বপ্ন দেখেন, কখন অর্দ্ধেক জাগ্রত হইয়া থাকেন। কখন্ স্বপ্ন দেখেন, কখন্ জাগ্রত থাকেন, মত্ততাপ্রযুক্ত কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

অনেকক্ষণ পর বোধ হইল, যেন পূর্ব্বে এক দিনের ন্যায় আবার অন্ধকারে আলোকচ্ছটা প্রকাশ হইতে লাগিল, আবার যেন প্রস্তরভিত্তি সরিয়া গেল, মেঘ সরিয়া গেলে যেন সূর্য্যালোক প্রকাশ হইল। সেই আলোকে সেই উজ্জ্বল রমণী! কিন্তু জেলেখা অদ্য গান গাইতেছে না, অদ্য বীণাহস্তে আইসে নাই, অদ্য খড়্গাহস্তে!

উঃ! এ কি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি! নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে, সূক্ষ্ম রক্তবর্ণ ওষ্ঠের উপর দন্ত চাপিয়া রহিয়াছে, সমস্ত বদনমণ্ডল ক্রোধপ্রজ্বলিত ও রক্তবর্ণ; বামার করে সেই শৈবের দীর্ঘ খড়্গ, বামার বক্ষে একটী তীক্ষ্ণ ছুরিকা! নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন; তাঁহার ললাট হইতে স্বেদ বহির্গত হইতে লাগিল; তিনি উঠিবার উদ্যম করিলেন; কিন্তু স্বপ্নে বিপদাপন্ন ব্যক্তির ন্যায় পলাইতে অক্ষম, উঠিতে অক্ষম।

বামা মৃণাল-করে দীর্ঘখড়্গ ধারণ করিয়া গহ্বরে প্রবেশ করিলেন। একবার দণ্ডায়মান হইলেন, একবার নরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলেন; হস্ত হইতে সে খড়্গ পড়িয়া গেল, জেলেখা নম্রশিরে চিন্তা করিতে লাগিলেন। আবার সেই তীক্ষ্ণ ছুরিকা ধারণ করিলেন; এবার দৃঢ়হস্তে সে ছুরিকা নরেন্দ্রের বক্ষঃস্থলের উপর ধরিলেন। আবার কি চিন্তা আসিল; ছুরিকা হস্তভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইল, বামা ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

নরেন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি চীৎকার শব্দ করিয়া উঠিয়া বসিলেন; তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, দেখিলেন ঘর্ম্মে তাঁহার সমস্ত শরীর আপ্লুত হইয়াছে; উন্মত্ততা গিয়াছে; গহ্বর অন্ধকার ও নিস্তব্ধ। ধীরে ধীরে তিনি গহ্বরের বাহিরে আসিলেন। রজনী অবসানপ্রায়; পূর্ব্বদিকে রক্তিমা ছটায় আকাশ রঞ্জিত হইয়াছে; নির্ব্বাণপ্রায় প্রদীপের ন্যায় দুই একটী তারা এখনও দেখা যাইতেছে; প্রত্যূষের শীতল বায়ু সেই পর্ব্বতশ্রেণী ও শিব-মন্দিরের উপর বহিয়া যাইতেছে ও নবজাত পুষ্পপরিমল বহিয়া নিদ্রোত্থিত জগৎকে আমোদিত করিতেছে। দুই একটী নিকুঞ্জ বন হইতে দুই একটী পক্ষী সুন্দর গীত করিতেছে। নরেন্দ্র শিশিরসিক্ত দূর্ব্বাদলের উপর দিয়া মন্দিরাভিমুখে চলিলেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্যামনগরের যুদ্ধ।

উপরি উক্ত ঘটনার কিছু পর যোধপুবাধিপতি রাজা যশোবন্তসিংহ পুনরায় সৈন্য সামন্ত লইয়া আরংজীবের বিরুদ্ধাচরণ করণাভিলাষে আগ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নরেন্দ্রনাথও সেই সৈন্যের সহিত রাজস্থান ত্যাগ করিলেন। যে কয়েক মাস নরেন্দ্রনাথ উদয়পুরে ছিলেন তাহার মধ্যে আগ্রায় একটী রাজবিপ্লব ঘটিয়াছিল; আগ্রায় এক্ষণে সে সম্রাট্ নাই, সে রাজত্ব নাই। সে বিপ্লবের কথা সংক্ষেপে বলা আবশ্যক; ইতিহাসজ্ঞ পাঠক ইচ্ছা করিলে এ পরিচ্ছেদ ছাড়িয়া যাইতে পারেন।

এই ভীষণ ভ্রাতৃযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া অবধি প্রথমে বারাণসীতে সুলতান-সুজা ও তৎপরে উজ্জয়িনীতে যশোবন্তসিংহ পরাস্ত হইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। এই শেষ ঘটনার বিষয় শুনিয়া সম্রাট্ শাজিহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া এক লক্ষের অধিক সেনা লইয়া স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন ও চম্বল নদীতীরে শিবির অধিবেশন করিয়া মোরাদ ও আরংজীবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ তাঁহারা ঐ নদীর অপর পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মোরাদ যেরূপ সাহসী সেইরূপ যুদ্ধকৌশলে অবিজ্ঞ, নদী পার হইয়া সংগ্রাম করিবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কৌশলপটু আরংজীব তাহা না করিয়া দারাকে ভুলাইবার জন্য শিবির সেই স্থানে ত্যাগ করিয়া গোপনে সৈন্যশুদ্ধ নদীর অপর এক স্থানে পার হইলেন ও আগ্রা হইতে ৭।৮ ক্রোশ দূরে যমুনাতীরে শ্যামনগর নামক গ্রামে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। শত্রু চম্বল পার হইয়াছে ও আগ্রার নিকট যমুনাতীরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছে শুনিয়া দারা একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন, ও তৎক্ষণাৎ আপন সৈন্য লইয়া সেই গ্রামের নিকট যমুনাতীরে আপন শিবির সন্নিবেশিত করিলেন।

শ্যামনগরের যুদ্ধের ফল ভারতবর্ষের সিংহাসন। উভয় পক্ষই এই যুদ্ধে লিপ্ত হইতে সঙ্কুচিত হইলেন; চারি দিবসকাল উভয় সৈন্য উভয়ের সম্মুখীন হইয়া রহিল; পঞ্চম দিবসে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সে যুদ্ধের বর্ণনায় আমাদিগের আবশ্যক নাই। দারার বামপার্শ্বে রাজপুত রাজা রামসিংহ ও চত্বরশাল পুরুষোচিত বিক্রম প্রকাশ করিয়া নিহত হইলেন;

দারার দক্ষিণ দিকে কালীউল্লা নামক মুসলমান সেনাপতি বিদ্রোহী আরংজীবের অর্থভুক্, যুদ্ধে লিপ্ত হইল না। অবশেষে আরংজীবের জয় হইল।

যুদ্ধক্ষেত্রে কৌশলপটু আরংজীব কালীউল্লার সম্মান করিলেন ও মোরাদকে ভারতবর্ষের সম্রাট্ বলিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করিলেন।

দারার পুত্র সুলাইমান বারাণসীর যুদ্ধে সুজাকে পরাস্ত করিয়া আসিয়া পিতার পরাজয়ের কথা শুনিলেন; তৎক্ষণাৎ সপরিবারে কাশ্মীর দেশে পলায়ন করিলেন। অচিরাৎ আরংজীব ছলে, বলে, কৌশলে আগ্রা হস্তগত করিয়া পিতাকে বন্দী করিলেন। শাজিহানের দুই কন্যার মধ্যে রৌশন্ আরা সকল বিষয়ে আরংজীবকে সমাচার প্রদান করিয়া তাঁহার অনেক সহায়তা করিতেন। অন্য কন্যা জেহান আরা রূপে, গুণে, কৌশলে রৌশন্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা; তিনি সম্রাটের অধিকতর প্রিয়া ও দারার হিতসাধনে সযত্না ছিলেন; কিন্তু আরংজীবের বুদ্ধিকৌশলে সকলেই পরাস্ত হইলেন।

আগ্রা হস্তগত করিয়া আরংজীব দিল্লী যাত্রা করিলেন। পথে মথুরাতে মোরাদকে নিমন্ত্রণ করিলেন, মোরাদ মদিরাপানে ও সুন্দরী গায়কী ও নর্ত্তকীগণের সৌন্দর্য্যে মত্ত হইয়া পড়িলেন। মোরাদকে মধ্যে করিয়া সেই জগদ্বিমোহিনিগণ চারিদিকে বেষ্টন করিয়া বসিল; মোরাদ অচিরাৎ একেবারে প্রমত্ত হইয়া একজন সুন্দরীর আলিঙ্গনে অচেতন হইয়া পড়িলেন। আরংজীবের তাহাই উদ্দেশ্য, মোরাদ সেই রজনীতেই কারারুদ্ধ হইলেন।

তাহার পর? তাহার পর আরংজীব রাজছত্র আপন মস্তকের উপর ধারণ করিলেন। দারা সিন্ধুনদীর দিকে পলায়ন করিলেন। বঙ্গদেশ হইতে সুলতানসুজা পুনরায় সৈন্য লইয়া যুদ্ধবেশে বহির্গত হইলেন; রাজস্থানে যশোবন্তসিংহ পরাজয়ের অপমান এখনও বিস্মৃত হয়েন নাই। তিনিও সসৈন্যে বহির্গত হইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

আগ্রা।

কয়েকদিন ভ্রমণানন্তর যশোবন্তসিংহের সেনা আগ্রা নগরে উপনীত হইল। আরংজীবের পরাক্রম অসীম, তাঁহার সহিত সম্মুখযুদ্ধ করা

যশোবন্তের সাধ্য নহে ; তিনি সুযোগ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আরংজীবের মিত্রবেশে পরমশত্রু আগ্রা নগরে প্রবেশ করিলেন।

যমুনার অনন্ত সৌন্দর্য্য ও আগ্রা নগরের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া কে না বিমোহিত হইয়াছে ? সুদূরে শ্বেতপ্রস্তর বিনির্ম্মিত, অপূর্ব্ব চারু শিল্পখচিত, সূর্য্যরশ্মি-প্রতিঘাতী জগতে অতুল্য তাজমহল নীল গগনে প্রতিকৃতির ন্যায় বোধ হয়। তাহার চতুর্দ্দিকে সুন্দর পথ, সুন্দর কুঞ্জবন, সুন্দর ফোয়ারা ;—পার্শ্বে শ্যামা যমুনা। আগ্রার প্রকাণ্ড দুর্গ ; তন্মধ্যে মর্ম্মর প্রস্তর-বিনির্ম্মিত সুন্দর মতি মসজীদ্, দেওয়ান খাস, দেওয়ান আম, রংমহল, শীশমহল। আগ্রার সৌন্দর্য্য কত বর্ণনা করিব! পাঠিকাগণ! যদি এই অপূর্ব্ব নগরী না দেখিয়া থাক, অদ্যই যাইবার উদ্যোগ কর। তোমাদের "তিনি" ব্যয়ের ওজর করিবেন, তাহা শুনিও না, তোমরা অনুরোধ করিলে কি নিষ্ফল হয় ? যে অব্যর্থ মন্ত্র পাতিয়া স্বামীর সর্ব্বস্ব ক্ষয় করিয়া রাশি রাশি গহনা করিয়াছ একবার সেই মন্ত্র পাত, অবশ্য আগ্রা দর্শন হইবে !

প্রসিদ্ধ হিরণ্ময় সিংহাসনে অদ্য সম্রাট্ আরংজীব উপবেশন করিয়াছেন। প্রাসাদের শ্বেত স্তম্ভসারি রক্তবর্ণ সাটিনে মণ্ডিত রহিয়াছে। রক্তবর্ণ চন্দ্রাতপ হইতে পুষ্পমাল্যের সহিত মণিমাণিক্য ঝুলিতেছে ও বালসূর্য্য-করস্পর্শে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, চারিদিকে মহারাজা, রাজা, ওমরাহ, মনসবদার প্রভৃতি ভারতের অগ্রগণ্য বীর ও ধনী ও মান্য লোকে নিজ নিজ ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিয়া অদ্য রাজপ্রাসাদকে ইন্দ্রপুরী করিয়াছে !

সেই প্রাসাদের সম্মুখে একটী বিস্তৃত শিবির সন্নিবেশিত ছিল, শিবিরের চতুর্দ্দিকে রৌপ্য-বিনির্ম্মিত স্তম্ভ ঝক্‌মক্ করিতেছে। উপরের বস্ত্র উজ্জ্বল রক্তবর্ণ; ভিতরে মসলীপত্তনের ছিট্। সে ছিটে লতা পুষ্প এরূপ সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে, যে দর্শকগণ শিবিরের পার্শ্বে যথার্থ পুষ্প ফুটিয়াছে না ভাবিয়া থাকিতে পারেন না। ভূমিতে সেইরূপ অপরূপ গালিচা, তাহাতেও পুষ্পগুলি এরূপ সুন্দরভাবে বুনা হইয়াছে, যে শিষ্টরুচি ব্যক্তি পুষ্প দলিত হইবে ভয়ে সহসা পদক্ষেপ করিতে সঙ্কোচ করেন।

তাহার বাহিরে দুর্গের প্রাচীর পর্য্যন্ত জয়পতাকা, তোরণ, ও পুষ্পমাল্য দ্বারা দুর্গ সুশোভিত হইয়াছে ; সেনাগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিজয়বাদ্যে সকলের মন উত্তেজিত করিতেছে, নবজাত সূর্য্যরশ্মিতে তাহাদের বন্দুক ঝক্‌মক্ করিতেছে ; সুদূরে দুর্গপ্রাচীরের উপর ইংরাজ ও ফরাশিশ

ও ওলন্দাজ, সৈনিক ঘন ঘন কামান ছাড়িতেছে, বহুদূর হইতে রত্নগর্ভ ভারতবর্ষে রত্ন কুড়াইবার জন্য আসিয়াছে ও সম্রাটের বেতনভোগী হইয়া অদ্য কামানের শব্দে সম্রাটের বিজয় প্রচার করিতেছে। দুর্গের বাহিরে নগরের ভিতরে ও চারিদিকে পথে, ঘাটে, গৃহে, দ্বারে, যমুনাতীরে রাশি রাশি লোক নিজ নিজ সুপরিচ্ছদে দলবদ্ধ হইয়া প্রশস্ত আগ্রা নগর ও যমুনাতীর পরিপূর্ণ করিয়াছে।

পুরাতন রীত্যনুসারে আরংজীব সুবর্ণের সহিত ওজন হইলেন, তাহার পর প্রধান প্রধান ওমরাহগণ ঐরূপে ওজন হইলেন; প্রত্যেক ওমরাহ, রাজা ও মনসবদার সুবর্ণ, মুক্তা ও হীরক নজর দিয়া সম্রাটের মনস্তুষ্টি করিলেন।

তাহার পর জগদ্বিমোহিনী কঞ্চনীগণ প্রৌঢ় যৌবন-মদে উন্মত্ত হইয়া অপূর্ব্ব সঙ্গীত ও নৃত্যদ্বারা সভাসদ্‌গণের হৃদয় বিমোহিত করিল। কঞ্চনীগণ সাধারণ বারবণিতা নহে; তাহারা নর্ত্তকী, বড় বড় ওমরাহ-দিগের মধ্যে বিবাহাদি কার্য্য হইলে তাঁহারা সঙ্গীত ও নৃত্য করিতে যাইত। শাজিহান তাহাদের সর্ব্বদাই নিকটে রাখিতে ভাল বাসিতেন ও বেগমদিগের আলয়েও লইয়া যাইতেন; কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখ-পরাঙ্মুখ আরংজীব তাহাদের প্রায় নিকটে আসিতে দিতেন না, তবে আনন্দের দিনে কঞ্চনীগণ কেননা সমাদৃত হইবে।

তাহার পর দুর্গের পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ যমুনাতীরে মল্লযুদ্ধ অসিযুদ্ধ প্রভৃতি নানারূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল; প্রাসাদের উপর হইতে বেগমগণ দেখিতে পাইবেন এই জন্য এই স্থলে যুদ্ধ হইত। অবশেষে দুই মত্ত হস্তীর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মধ্যে আন্দাজ দুই হাত উচ্চ একটী মৃত্তিকার প্রাচীর, তাহার দুই দিক্ হইতে দুইটী মত্তহস্তী মাহুত দ্বারা পরিচালিত হইয়া ভীষণ রণে লিপ্ত হইল। অনেকক্ষণ যমুনার উত্তরপার্শ্ব হইতে লোক সবিস্ময়ে এই ভীষণ যুদ্ধ দেখিতে লাগিল, শুণ্ডের চপেটাঘাতে ও দন্তজনিত আঘাতে হস্তিদ্বয়ের মস্তক ও শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইল। প্রত্যেক হস্তীর দুইজন করিয়া মাহুত ছিল; একটী হস্তীর একজন মাহুত পড়িয়া গেল ও সহসা হস্তী দ্বারা পদদলিত হইয়া জীবনত্যাগ করিল, অপর পক্ষের একজন মাহুতের ঐরূপে জন্মের মত হাত ভাঙ্গিয়া গেল। হতভাগারা এই জীবনের আশায় নৈরাশ হইয়াই হস্তীদ্বয়কে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিল, বহু অর্থলোভে স্ত্রী পুত্র সকলের নিকট পূর্ব্বে বিদায় লইয়াই আসিয়াছিল। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর একটী হস্তী অন্যকে পরাস্ত করিয়া মৃত্তিকাপ্রাচীর

উল্লঙ্ঘন করিয়া অপরের পশ্চাৎ ধাবমান হইল; তাহাদের ছাড়াইবার জন্য অনেকে চরকী প্রভৃতি আগুনের বাজী করিল, কিন্তু সঞ্জাতক্রোধ হস্তী তাহাতে নিরস্ত না হইয়া অপব হস্তীর পশ্চাৎ ধাবমান হইল; অবশেষে পরাজিত হস্তী সন্তরণ করিয়া যমুনা পার হইয়া গেল, পথিমধ্যে দুই এক জন লোক যাহারা সম্মুখে পড়িল্ তাহারাও নিহত হইল।

এ সমস্ত বালকোচিত ও নৃশংস আমোদ দেখিয়া বিরক্ত হইয়া নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া যমুনাপুলীনে যাইলেন ও মুখ ও হস্ত প্রক্ষালন করিয়া একটী সুন্দর বৃক্ষমূলে শয়ন করিলেন। যেস্থানে নরেন্দ্রনাথ শয়ন করিলেন সেটী অতি মনোহর। বিশাল তমাল বৃক্ষ সূর্য্যের কিরণ নিবারণ করিতেছে ও বৃক্ষের উপর হইতে দুই একটী পক্ষী যেন দিনের তাপে ক্লিষ্ট হইয়া অতি মৃদুস্বরে ডাকিতেছে। নিকটে বৃক্ষের একপার্শ্বে একটী পুরাতন কবর আছে, প্রস্তর স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইয়া গিযাছে ও অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ লতাদি সেই কবরের উপর জন্মিয়াছে। কবরের এক পার্শ্বে পারস্যভাষায় একটী বায়েৎ লেখা আছে তাহার অর্থ, "বন্ধু! আমার নাম জানিবার আবশ্যক কি? আমি জগতে অভাগা, অসুখী ছিলাম, তুমি যদি হতভাগা হও আমার জন্য একবিন্দু অশ্রু বর্ষণ করিও।" মন্দ মন্দ যমুনা-বায়ু সেই শীতল স্থানকে আরও সুশীতল করিতেছে; কল্লোলিনী যমুনা সুমধুর কল কল শব্দে বহিয়া যাইতেছে। নরেন্দ্রনাথ অচিরাৎ নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

কতক্ষণ নিদ্রিত রহিলেন, তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। নিদ্রায় একটী অপরূপ স্বপ্ন দেখিলেন। বোধ হইল যেন সেই অপূর্ব্ব গোরস্থান হইতে মৃত মনুষ্য পুনর্জ্জীবিত হইল,—সে একটী মুসলমান স্ত্রীলোক! মৃত্যুর ভীষণ শ্বেতবর্ণ স্ত্রীলোকের মুখে এখনও দেদীপ্যমান্। স্ত্রীলোকের চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট, শরীর ক্ষীণ, সমস্ত অবয়ব দুঃখব্যঞ্জক। গোরস্থানে যে বায়েৎটী লেখা ছিল স্ত্রীলোক যেন সেই বায়েৎটী গান করিল, সে দুঃখ-ব্যঞ্জক গীতধ্বনিতে নরেন্দ্রের মুদিত নেত্র হইতে একবিন্দু জল ভূতলে পতিত হইল। মুসলমানী যেন সহসা আর একটী গীত আরম্ভ করিল,—একি? নরেন্দ্রের বোধ হইল যেন সে স্বর অপরিচিত নহে; বোধ হইল যেন সে স্বর সেই অভাগিনী জেলেখাকণ্ঠ-নিঃসৃত, নরেন্দ্র ভাল করিয়া দেখ। একি? স্বয়ং জেলেখা গোরের উপর বসিয়া এই দুঃখগান গাইতেছে?

নরেন্দ্রের স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কোথাও কেহ নাই। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, সন্ধ্যাব ললাটে একটী উজ্জ্বল তারা বড় শোভা

পাইতেছে, সন্ধ্যার বায়ু রহিয়া রহিয়া মৃদু গান করিতেছে, যমুনার নীল জল অধিকতর নীলবর্ণ ধারণ করিয়া বহিয়া যাইতেছে।

নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। এই জেলেখার গান তিনি নিদ্রাযোগে ইতিপূর্ব্বে তিন চারিবার শ্রবণ করিয়াছেন। জেলেখার প্রতি কি নরেন্দ্রের হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছে? নরেন্দ্র হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, হৃদয় হেমলতাময়! জেলেখা কি মানবী নহে, জেলেখা কি পরী, তবে মানবের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী কেন? নরেন্দ্রনাথ ভাবিতে ভাবিতে সেই গোরস্থানের দিকে আসিলেন, সহসা তিনি একেবারে বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইলেন; গোরের পার্শ্ব হইতে স্বয়ং জেলেখা দণ্ডায়মান হইলেন; তাহার ক্ষীণ শরীর ও পাণ্ডুবর্ণ বদনমণ্ডল দেখিলে বোধ হয় যেন যথার্থই কবর-গহ্বরস্থ মৃতদেহ পুনর্জ্জীবিত হইল। বদন পাণ্ডুবর্ণ বটে, কিন্তু নয়ন হইতে পূর্ব্ববৎ তীক্ষ্ণ জ্যোতি বাহির হইতেছে, অবয়ব সেইরূপ তেজঃপরিপূর্ণ; তীক্ষ্ণ জ্যোতির্ম্ময়ী বামা সরোষে অধর দংশন করিয়া নরেন্দ্রের দিকে কটাক্ষপাত করিতেছে; বক্ষঃস্থলে একটী তীক্ষ্ণ ছুরিকার অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে! এই নারী কি দুঃখগান গাইয়াছিল? বোধ হয় না।

জেলেখা নরেন্দ্রকে আসিতে ইঙ্গিত করিয়া আপনি অগ্রে চলিল। অনেক দূর যাইয়া দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া রাজপ্রাসাদের একটী অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিল। নরেন্দ্র এতক্ষণ ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন এক্ষণে গৃহের ভিতর অন্ধকারে রমণীর বিকটমূর্ত্তি ও বক্ষে ছুরিকা দর্শন করিয়া বলিলেন, "তুমি কে জানি না, আমি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাই নাই।"

জেলেখা। "আমার প্রাসাদে যাইবার অধিকার না থাকিলে তোমাকে আসিতে বলিতাম না।"

নরে। "তথাপি তুমি কে জানি না তোমার সঙ্গে যাইব না।"

জেলেখা কর্কশ স্বরে বলিল, "মৃত্যুভয় করিতেছ? তোমাকে হনন করিবার ইচ্ছা থাকিলে আমি তাতারদেশীয়া, আমি এই ছুরিকা এতক্ষণ ব্যবহার করিতে পারিতাম না? এখনও এই বন্দুক ব্যবহার করিতে পারি না?" পরিচ্ছদের ভিতর হইতে ক্ষুদ্র বন্দুক বাহির করিয়া নরেন্দ্রের হৃদয়ের দিকে ধারণ করিয়া বলিল, "এ বন্দুক প্রস্তুত আছে আমার একটী অঙ্গুলী ব্যবহার করিলে তোমার জীবননাশ নিশ্চয়! কিন্তু এই লও, ছুরিকা ত্যাগ করিলাম, বন্দুক ত্যাগ করিলাম, রিক্তহস্তা স্ত্রীলোকের

সহিত যাইতে বোধ হয় বঙ্গদেশীয় বীরপুরুষেরও কোন আপত্তি নাই।” জেলেখার বিকট হাস্যধ্বনিতে গৃহ প্রতিধ্বনিত হইল, ক্রোধে নরেন্দ্রের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল। তিনি নিঃশব্দে জেলেখার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। ক্ষণেক যাইলে পর জেলেখা এক স্থানে কতকগুলি বস্ত্র দেখাইয়া কহিল, “এইগুলি পরিধান কর।” নরেন্দ্র তুলিয়া দেখিল সে তাতারদেশীয় রমণীর পরিচ্ছদ! বিস্মিত হইয়া আবার জেলেখার দিকে চাহিলেন, জেলেখা এবার গম্ভীরস্বরে বলিল, “বিলম্ব করিও না, আমরা যে দ্বার দিয়া আসিয়াছি এক্ষণে সে দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে, চারিদিকে খোজা-গণ নিষ্কোষিত অসিহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; এ বেগমদিগের প্রাসাদ, তুমি পুরুষ জানিলে এইক্ষণেই তোমার প্রাণনাশ করিবে।” নরেন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেখিলেন, জেলেখার কথা সত্য; অগত্যা তাতারদেশীয় নারীবেশ ধারণ করিলেন; জেলেখা তাঁহাকে পরচুলা পরাইয়া দিয়া মস্তকের উপর অবগুণ্ঠন ঝুলাইয়া দিল।

নরেন্দ্র জেলেখার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কতগুলি গৃহ ও পথ অতিবাহিত করিলেন তাহা গণনা করা যায় না। দ্বারে দ্বারে অসিহস্তে খোজাগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে ও শত শত পরিচারিকা এদিক্ ওদিক্ পরিভ্রমণ করিতেছে। জেলেখাকে দেখিয়া সকলেই দ্বার ছাড়িয়া দিল।

নরেন্দ্রনাথ বেগমদিগের মহলের অভ্যন্তরে যত যাইতে লাগিলেন ততই বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ঐশ্বর্য্য, শিল্পকার্য্য ও বিলাসপ্রিয়তার সহায়তায় মনুষ্যের যাহা সাধ্য তাহা নরেন্দ্র অদ্য দেখিলেন। শ্বেত-মর্ম্মর-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত কত ঘর, কত প্রাঙ্গণ, কত সুন্দর স্তম্ভসার, কত উন্নত ছাদ দেখিলেন তাহা গণনা করা যায় না। সেই প্রস্তরে কি অপূর্ব্ব শিল্পকার্য্য! দেয়ালে, স্তম্ভে, প্রকোষ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের প্রস্তর শ্বেতপ্রস্তরে সন্নিবেশিত হইয়া লতা, পত্র, বৃক্ষ, পুষ্পের রূপ ধারণ করিয়াছে যেন সুন্দর শ্বেত দেয়ালের পার্শ্বে যথার্থই পুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে। ছাদ হইতে যেন সেইরূপ পুষ্প লম্বিত রহিয়াছে অথবা সুন্দর সুবর্ণে মণ্ডিত ও চিত্রিত হইয়া অধিকতর শোভা ধারণ করিতেছে। শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত সুন্দর গবাক্ষ, সুন্দর ফোয়ারা, সুন্দর পুষ্পাধার; তাহার উপর কি মনোহর সুগন্ধ পুষ্প ফুটিয়া প্রাসাদকে আমোদিত করিতেছে। শ্বেত, পীত, নীল বর্ণের আলোক সেই রঞ্জিত ঘরের ভিতর ও বাহিরে দেখা যাইতেছে। জগতে অতুল্য রূপবতী বেগমগণ কেহ বা সেই ঘরে বা প্রকোষ্ঠে ভ্রমণ করিতেছেন, কেহ বা পুষ্প

চয়ন করিয়া কেশে ধারণ করিতেছেন, কেহ বা আনন্দে গান করিতেছেন। আজি আনন্দের দিন, রাজপ্রাসাদ আনন্দে ও নৃত্যগীতে পরিপূর্ণ।

এ সমস্ত ত্যাগ করিয়া নরেন্দ্র অন্য একস্থানে আসিলেন; দেখিলেন, সম্রাট্ আরংজীব বেগমদিগের সহিত পচিশী খেলিতেছেন। পচিশীর ঘর শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত ও প্রকাণ্ড; এক একটী রূপবতী কামিনী এক একটী ঘুঁটী! ঘুঁটী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের হওয়া আবশ্যক এই জন্য কামিনীগণ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছেন! নরেন্দ্রের হৃদয় চিন্তাকুল, কিন্তু সম্রাটদিগের বিলাসপটুতার এই পরাকাষ্ঠা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

পরে নরেন্দ্র একটী আমোদগৃহে যাইয়া পড়িলেন। ঘরের ছাদ সেইরূপ স্বর্ণ, রৌপ্য ও দ্বিরদরদে খচিত, দেয়ালে সেইরূপ প্রস্তরের পুষ্প, পত্র, লতা, বৃক্ষে খচিত; মর্ম্মরপ্রস্তর বিনির্ম্মিত স্তম্ভসারির উপর সেইরূপ সাটিন ও মক্‌মল বিজড়িত; ও নানা বর্ণের গন্ধদীপ সেইরূপ আলোক ও গন্ধদানে ঘর আমোদিত করিতেছে! ভিতরে তিন চারি জন বেগম বাদ্য ও গীত করিতেছে, সপ্তস্বরমিলিত সেই গীতধ্বনি উন্নত ছাদ উল্লঙ্ঘন করিয়া যমুনা-তীরে ও নৈশ গগনে প্রধাবিত হইতেছে।

সে গৃহ হইতে কিছু দূর যমুনানদীর দিকে একটী শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত বারান্দায় সুন্দর চন্দ্রালোক পতিত হইয়াছে। এ স্থানটী কি নিস্তব্ধ, কি রমণীয়! উপরে আকাশ নীলবর্ণ, দুই একটী তারা দেখা যাইতেছে; ও শারদীয় চন্দ্র সুধাবর্ষণ করিয়া গগনকে শোভিত ও জগৎকে তৃপ্ত করিতেছে। নীচে নীলবর্ণ যমুনানদী কল কল শব্দে প্রধাবিত হইতেছে। তাহার চন্দ্রকরোজ্জ্বল বক্ষের উপর দুই একখানি ক্ষুদ্র পোত ভাসমান রহিয়াছে। দক্ষিণে সুন্দর তাজমহল চন্দ্রকরে অধিকতর সুন্দর দেখা যাইতেছে; নদীর অপরপার্শ্বে পল্লীগ্রাম নিশিতে সুপ্ত; শব্দ প্রায় শুনা যায় না। বারান্দা জনশূন্য, কেবল একজন বেগম বীণাহস্তে গান করিতেছিলেন এক্ষণে পরিশ্রান্ত হইয়া বারান্দার শ্বেতপ্রস্তরে মস্তক রাখিয়া বোধ হয় সুখের বা দুঃখের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। যমুনার বায়ু বেগমের মণিমুক্তা-বিজড়িত চন্দ্রকরোজ্জ্বল কেশপাশ লইয়া ক্রীড়া করিতেছে অথবা সে বীণার উপর কখন কখন সুখের গান করিতেছে। বারান্দায় দণ্ডায়-মান হইয়া ও যমুনার সুন্দর গান ও শীতল বায়ু ভোগ করিয়া নরেন্দ্রের হৃদয়ে নব নব ভাব উদিত হইতে লাগিল। এইরূপ নিস্তব্ধ রজনীতে এইরূপ নদীতীরে নরেন্দ্র দূর বঙ্গদেশে হেমকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া-

ছিলেন। আহা! সে সুন্দর মুখখানি চন্দ্র হইতেও সুধাপূর্ণ ও জ্যোতির্ম্ময়। মুহূর্ত্তের জন্য নরেন্দ্রের হৃদয় স্নেহলতাপূর্ণ হইল; নরেন্দ্র আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অন্য দিকে যাইলেন।

সহসা আলোকচ্ছটায় নরেন্দ্রের নয়ন ঝলসিয়া গেল। যখন স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইলেন, যাহা দেখিলেন তাহাতে একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

দেখিলেন সম্মুখে একটী অতি বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ; প্রাঙ্গণে কত অনির্ব্বচনীয় সুন্দর পুষ্পচারা ও পুষ্পলতিকা তাহা বর্ণনা করা যায় না। চতুষ্পার্শ্বস্থ হর্ম্ম্যশ্রেণী হইতে পুষ্পমালা দুলিতেছে, বৃক্ষ লতায় পুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে, স্থানে স্থানে স্তূপাকারে পুষ্প রহিয়াছে, চারিদিকে সুগন্ধ পুষ্প বিকীর্ণ রহিয়াছে। সুদর্শন ফোয়ারা যেন দ্রব রৌপ্য-স্তম্ভ নৈশ আকাশে উত্তোলন করিয়া আবার মুক্তারূপে চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেছে! ঝোপে, বৃক্ষের অন্তরালে, সম্মুখে, পার্শ্বে, উর্দ্ধে, নীচে নানা বর্ণের সুগন্ধদীপাবলী জ্বলিতেছে, যেন আজি ইন্দ্রের অমরাপুরী ও নন্দনকে লজ্জিত করিয়া এই বেগমমহল অপূর্ব্বরূপ ধারণ কবিয়াছে। সেই প্রাঙ্গণে একটী বাজার বসিয়াছে, ক্রেতা বিক্রেতা দলে দলে বিচরণ করিতেছে,—অন্যান্য বাজার হইতে এই ভেদ যে সকলেই রমণী,—বিক্রেতা ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজা মহারাজা ও ওমরাহের মহিলাগণ; ক্রেতা সম্রাটের বেগমগণ! যে সমস্ত বহুমূল্য দ্রব্য ক্রীত ও বিক্রীত হইতেছে, যে সমস্ত অনির্ব্বচনীয় বহুমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কারে ক্রেতা ও বিক্রেতাদিগের শরীর আবৃত ও শোভিত ও যে সমস্ত অসূর্য্যম্পশ্যা কোমলাঙ্গী লাবণ্যময়ী যুবতীগণ সেই বস্ত্র ও সেই অলঙ্কার ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া নরেন্দ্র বিস্ময়ে মগ্ন হইলেন। তিনি অনেক রাজপ্রাসাদে অনেক অপরূপ শোভা দেখিয়াছিলেন কিন্তু এরূপ স্বর্গোদ্যানে এরূপ অপ্সরামণ্ডলী কখনও দেখেন নাই।

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, বৎসর বৎসর নরোজার দিন দিল্লীর সম্রাটগণ বেগমমহলে এইরূপ একটী করিয়া বাজার বসাইতেন, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান মহিলাগণ এই "বাজারে" দ্রব্য বিক্রয় করিতে আসিত. যে ওমরাহ বা রাজার সুন্দরী কন্যা বা রমণী থাকিত, বেগমদিগের সহিত পরিচিতা করিবার জন্য এই বাজারে তাঁহাদের পাঠাইতেন। পুরুষের মধ্যে কেবল স্বয়ং সম্রাট্ আসিতেন। পূর্ব্বপ্রথামতে এই আনন্দের দিন আরংজীব সেইরূপ বাজার বসাইয়াছেন ও স্বয়ং দুই এক বেগমের সহিত এক দোকান

হইতে অন্য দোকানে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। ভ্রাতৃযুদ্ধে আরংজীবের ভগ্নী রৌশন আরা আরংজীবের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন, আগ্রার গুপ্ত সমাচার তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন। এক্ষণে আরংজীবের জয় হইয়াছে, সে "বাজারের" মধ্যে রৌশন আরার ন্যায় কাহার গৌরব, কাহার প্রভুত্ব? অন্য ভগ্নী জেঁহান আরা দারার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, অদ্য এই মহোৎসবের মধ্যে জেহাঁন আরা নাই।

বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে নরেন্দ্রনাথ এই মহোৎসব দেখিতে লাগিলেন; যাহা দেখিলেন তাহাতে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দেখিলেন, সম্রাট একজন রূপবতী মোগলকন্যার নিকট কতকগুলি অলঙ্কার ও সাটীন ও স্বর্ণখচিত বস্ত্রের দর করিতে আরম্ভ করিতেছেন। দর করিতে উভয়পক্ষই সমান পটু; কখন কখন এক পয়সার বিভিন্নতার জন্য মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইতেছে। আরংজীব বলিলেন, "তোমার জিনিস ভাল নহে, ঠকাইতে আসিয়াছ?" চতুরা মোগল কন্যা বলিলেন, "তুমি এরূপ জিনিস কখনও দেখ নাই, ইহার দর কি জানিবে? তুমি ইহার উপযুক্ত নও, অন্য স্থানে যাও, তোমার উপযুক্ত অল্পমূল্য দ্রব্য পাইবে।" এইরূপ বহু বাগ্‌বিতণ্ডার পর মূল্য অবধারিত হইল। ক্রেতা তখন সেই মূল্য দিয়া যেন ভ্রমক্রমে দুই চারিটী রৌপ্যমুদ্রার স্থানে বিক্রেতাকে স্বর্ণমুদ্রা দিয়া যাইলেন। এইরূপে বিক্রয়কার্য্য শেষ হইল।

অনেকক্ষণ এই অপরূপ "বাজার" দেখিয়া নরেন্দ্র জেলেখার আদেশানুসারে "শিশমহলে" প্রবেশ করিলেন, তথায় আবার অন্যরূপ অপরূপ দৃশ্য দেখিলেন। সম্রাট্ ও বেগমদিগের স্নানার্থ এই মহল নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত সানের উপর দিয়া নির্ম্মল জল প্রবাহিত হইতেছে, সেই সানে অঙ্কিত প্রতিকৃতি দেখিয়া বোধ হয় যেন জলের নীচে অসংখ্য মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে। চতুর্দ্দিক্ হইতে ফোয়ারার নির্ম্মল জল বেগে উঠিতেছে, আবার মুক্তারাশির ন্যায় প্রস্তরের উপর পতিত হইতেছে। ছাদ হইতে অসংখ্য দীপাবলি লম্বিত রহিয়াছে ও সেই সমস্ত দীপের বিবিধবর্ণের আলোক ফোয়ারার জলের উপর বড় সুন্দর প্রতিহত হইতেছে। স্থানে স্থানে ফোয়ারার সহিত সানের নীচে হইতে নানাবর্ণের আলোক উত্থিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য দর্পণ রত্নরাজি-খচিত হইয়া দেয়ালে সন্নিবেশিত হইয়াছে, কেননা স্নানকারিণী চতুর্দ্দিকেই আপনার সুন্দর অবয়ব দেখিতে পাইবেন। বিলাসপটু সম্রাট্ ও বেগমগণ একত্রে স্নান ও জলকেলি করিতে পারিবেন, এই জন্য কত দেশ হইতে

কত ধন আনীত হইয়া এই অপূর্ব্ব বিলাসগৃহ বিনির্ম্মিত ও সুশোভিত হইয়াছে।

নানাদেশ হইতে অনেক রাজ্ঞী ও রমণী অদ্য প্রাসাদে সমবেত হইয়াছে ও তাহার মধ্যে অনেকেই শিশমহলের অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেছিল। জেলেখা নরেন্দ্রের হস্তধারণ করিয়া একটী দর্পণের নিকট আনিল ও তাহার ভিতর দেখিতে বলিল। নরেন্দ্র তাহাই করিলেন। দেখিবামাত্র নরেন্দ্র একেবারে মোহিত ও চকিত হইয়া রহিলেন, তাঁহার শরীরে স্পন্দ নাই, নয়নে নিমেষ নাই,—নরেন্দ্রনাথ প্রস্তরপ্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চেষ্ট। নরেন্দ্রনাথ কি সহসা রোগাক্রান্ত হইলেন? নরেন্দ্রনাথ কি স্বপ্ন দেখিতেছেন? নরেন্দ্র রোগাক্রান্ত হয়েন নাই, স্বপ্নবিমূঢ় হয়েন নাই;—অদ্য সহসা সেই বহুপূর্ব্ব-দৃষ্টা চিরপূজিতা স্নেহময়ীর সুন্দর ম্লান মুখমণ্ডল দর্পণে দেখিতে পাইলেন। নরেন্দ্র কি করিতেছিলেন বিস্মৃত হইলেন, নরেন্দ্র স্থানকাল বিস্মৃত হইলেন; নরেন্দ্রের নয়ন, নরেন্দ্রের সমস্ত সংজ্ঞা সেই দর্পণদৃষ্ট মূর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইল, নরেন্দ্রের জীবন স্বপ্নময় ও সেই মূর্ত্তিপরিপূর্ণ! কতক্ষণ ঐ অবস্থায় রহিলেন নরেন্দ্র জানেন না; ক্রমে হেমলতার প্রতিমূর্ত্তি দর্পণ হইতে সরিয়া গেল, তখন নরেন্দ্র চৈতন্য পাইয়া ফিরিয়া চাহিলেন, সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না; চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। হায়! হেমলতার প্রতি প্রণয়ও এইরূপ ছায়ামাত্র; নরেন্দ্রনাথ! কেন দেশে দেশে সেই ছায়া অনুধাবন করিতেছ?

সহসা একজন অবগুণ্ঠনবতী রাজপুত-বেশ-ধারিণীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি আর কয়েকজন রাজপুত-রমণীর সহিত শিসমহল হইতে বাহিরে যাইতেছিলেন;—উন্মত্ত নরেন্দ্র তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সে রমণী কি হেমলতা? নরেন্দ্র জানে না। কিন্তু নরেন্দ্রের হৃদয় যেদিকে আকৃষ্ট হইল, নরেন্দ্র সেই দিকেই যাইল। নরেন্দ্র ঘন ঘন সেই রমণীর দিকে দেখিতে লাগিলেন, ক্রমে নিকটে আসিলেন, তথাপি রমণীর অঙ্গুলী ও গঠন ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইলেন না; মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া প্রায় দেখা যায় না। নরেন্দ্র কোন কৌশলে বা ছলে সেই অঙ্গুলী স্পর্শ করিতে গেলেন, বোধ হইল যেন সে হস্ত আপন হস্তে ধারণ করিলে স্বর্গসুখ হইবে; কিন্তু যতবার উদ্যম করিলেন ততবার নিষ্ফল হইলেন হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল; হৃদয় সজোরে আঘাত করিতে লাগিল, ললাট হইতে স্বেদ বহির্গত হইতে লাগিল।

একবার ইচ্ছা হইল রমণীর নাম ধাম জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু নরেন্দ্রের কণ্ঠরোধ হইল। অচিরাৎ সেই রমণী ও তাঁহার রাজপুত-সঙ্গিনীগণ সেই "বাজার" পরিত্যাগ করিলেন। নরেন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অনেক ঘর, অনেক দ্বার, অনেক পুষ্পোদ্যান ও প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া বাহিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় অনেক শিবিকা ছিল, রাজপুত-কামিনীগণ নিজ নিজ শিবিকায় আরোহণ করিলেন। যে রমণীর দিকে নরেন্দ্র দেখিতেছিলেন তিনিও শিবিকায় আরোহণ করিবার উপক্রম করিলেন। বোধ হইল যেন তিনি যমুনানদী ও আগ্রার রাজপ্রাসাদ পূর্ব্বে দেখেন নাই, কেননা শিবিকায় আরোহণ করিবার পূর্ব্বে একবার প্রাসাদ ও নদীর দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া দেখিতে লাগিলেন। যমুনার প্রবল বায়ুতে তাঁহার অবগুণ্ঠন নড়িতে লাগিল; নরেন্দ্র তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইতে লাগিল, কিন্তু সে মুখ নরেন্দ্র দেখিতে পাইলেন না; অচিরাৎ শিবিকাযোগে সে রাজপুত-বেশধারিণী চলিয়া গেলেন।

এ কি হেমলতা? সেই গঠন, সেই চলন, সেই অঙ্গুলী নরেন্দ্র সতৃষ্ণ-নয়নে দেখিয়া চিনিলেন, সেই প্রিয় করদ্বয় নিজ করে ধারণ করিতে নিজ বক্ষে এক মুহূর্ত্তের জন্য স্থাপন করিতে নরেন্দ্র উন্মত্ত হইয়াছেন; তবে অবশ্য এ সেই হেমলতা। তবে আগ্রায় বেগম মহলে কেন? তবে রাজপুত-বেশ কি জন্য? নরেন্দ্রনাথ! প্রেমান্ধ হইয়া কাহাকে হেমলতা মনে করিতেছ? নরেন্দ্র! কেন দেশে দেশে সেই ছায়া অনুধাবন করিতেছ?

পাঠক! হেমলতাকে আমরা বীরনগরে রাখিয়া আসিয়া অনেক দিন অবধি নরেন্দ্রের সহিত ভ্রমণ করিতেছিলাম, চল একবার বীরনগরে যাইয়া হেমের সহিত পুনরায় দেখা করি।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতৃস্নেহ।

বীরনগরে জমীদারের প্রকাণ্ড অট্টালিকার পার্শ্বে সুন্দর ও প্রশস্ত উপবন ছিল; সেই উপবন দিয়া নদীতীরে আসা যাইত; সেই উপবনে বাল্যকালে নরেন্দ্রনাথ ও হেমলতা দৌড়াদৌড়ি করিত; সেই নদীকূলে বালক লিকার সঙ্গে খেলা করিত, হাসিত, কাঁদিত, আধার উচ্চহাস্যে উপবন আমোদিত করিত। আজি মনুষ্যত্বের গম্ভীর চিন্তায় ও বিষয়কার্য্যে সে

বাল্যকালের হাস্যধ্বনি বিলীন হইয়াছে। নরেন্দ্রনাথ অনাথ, অসহায়, দেশে দেশে বেড়াইতেছেন, শ্রীশচন্দ্র শ্বশুরের সম্প্রতি মৃত্যু হওয়ায় জমীদার হইয়াছেন, হেমলতা আজি বালিকা নহেন, নবজমীদারের গৃহিণী।

সায়ংকালে সেই উপবন দিয়া দুইটী রমণী ঘাটে যাইতেছিলেন। একজন হেমলতা, অপরটী শ্রীশচন্দ্রের বিধবা ভগ্নী শৈবলিনী।

হেমলতার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ হইবে, অবয়ব ক্ষীণ, কোমল ও উজ্জ্বল রূপরাশিতে পরিপূর্ণ। নয়ন দুটী জ্যোতির্ম্ময়, ভ্রূযুগল সুচিক্কণ, ওষ্ঠ সূক্ষ্ম, গণ্ডস্থল রক্তিমাচ্ছটায় আরক্ত, মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও লাবণ্যময়; তথাপি যৌবনপ্রারম্ভের প্রফুল্লতা সে অবয়বে লক্ষিত হয় না, যৌবনের উন্মত্ততা সে মুখমণ্ডলে দৃষ্ট হয় না। বোধ হয় যেন সে সুন্দর ললাটে, সেই স্থির চক্ষুদ্বয়ে, সেই সুচিক্কণ ওষ্ঠে অকালেই চিন্তার অঙ্ক অঙ্কিত হইয়াছে, নয়নের উজ্জ্বল জ্যোতিকে ঈষৎ স্তিমিত করিয়াছে, যৌবনোদয়ে মুখমণ্ডলের প্রফুল্ল ও আনন্দময়ী আলোকের উপর জীবনের সন্ধ্যার ছায়া বিক্ষিপ্ত করিয়াছে। হেমলতা দুঃখিনী নহে, কিন্তু চিন্তাশীলা; যৌবনের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু যৌবনের প্রফুল্লতা কৈ? প্রফুল্লতা থাকিলে কি হেম এরূপ নম্রভাবে ধীরে ধীরে যাইত? ঐ ক্ষুদ্র নতশির পুষ্পটীকে তুলিয়া কি উহার দিকে ঐরূপ স্থিরভাবে চাহিত? হেমলতার মনে দুঃখ নাই, কিন্তু হৃদয় ভারাক্রান্ত, শান্ত, সহিষ্ণু। যে কৃষ্ণবর্ণ সুচিক্কণ কেশপাশে তাঁহার বদনমণ্ডল ও নয়নদ্বয় ঈষৎ আবৃত হইয়াছে, ধীরে ধীরে সযত্নে সরাইয়া দেখ, নয়নদ্বয়ে জল নাই, তথাপি নয়নদ্বয় স্থির, শান্ত, যৌবনোচিত চপলতাশূন্য। নিকটে যাইয়া দেখ হেমলতা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে না, তথাপি যেন ভারাক্রান্ত হৃদয় হইতে ধীরে ধীরে নিশ্বাস বহির্গত হইতেছে। অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত কোরকে দুঃখকীট প্রবেশ করে নাই, তথাপি কোরক জীবনাভাবে যেন ঈষৎ শুষ্ক ও নতশির; হেমলতার জীবন যেন অরুণোদয়ের উজ্জ্বলতা মেঘচ্ছায়ায় বিমিশ্রিত।

শৈবলিনীর বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশ বর্ষ হইবে। শৈবলিনী বিধবা, অবয়বে যৌবনের রূপ নাই, তথাপি শরীর উন্নত, গম্ভীর ও এক অনির্ব্বচনীয় গৌরবে পরিপূর্ণ। মস্তক হইতে নিবিড় কৃষ্ণ কেশপাশ পৃষ্ঠদেশে লম্বিত রহিয়াছে, ললাট সুন্দর, চক্ষু বিশাল ও শান্তপ্রভ, মুখমণ্ডল গম্ভীর অথচ কোমল, অবয়ব উন্নত ও বিধবার শুভ্র বসনে আবৃত। শৈবলিনী হেমলতাকে কনিষ্ঠার ন্যায় ভাল বাসিত, সস্নেহ বচনে তাহার সহিত কথা

কহিতে কহিতে ঘাটে যাইতেছিল। শৈবলিনীর জীবন যেন মেঘশূন্য-বায়ুশূন্য সায়ংকাল, গম্ভীর, নিস্তব্ধ, শান্ত।

বাল্যকালে হেমলতা নরেন্দ্রনাথের মুখ দেখিলে ভাল থাকিত, যৌবন-প্রারম্ভে নরেন্দ্রনাথ হেমলতার হৃদয়ের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিল, হেমলতা বুঝিতে পারিত না কিন্তু তাহার জীবন নরেন্দ্রনাথপূর্ণ হইয়াছিল। যখন সেই নরেন্দ্রের সহিত চির-বিচ্ছেদ হইল, যখন হেমলতার পিতার কাল হইল, যখন হেম আর একজনের সহধর্ম্মিণী হইয়া নরেন্দ্রের প্রতিমাকে হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইল, তখন প্রেম কি পদার্থ হেম বুঝিতে পারিল, তখন মর্ম্মভেদী দুঃখ আসিয়া হেমের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল। বালিকা সরলা, নবোঢ়া বধূ, সে কথা কাহার কাছে বলিবে, সে দুঃখ কাহার কাছে জানাইবে, সে ভীষণ দুঃখ কে দেখিতে পাইত, সমস্ত রজনী জাগরিত থাকিয়া হেম নরেন্দ্রের জন্য রোদন করিত, আহা! সে কে দেখিত, কে শুনিত! এইরূপ ঘোর দুঃখে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল, জীবনালোক নির্ব্বাণপ্রায় হইল, এই সুন্দর জগতে হেমলতার থাকিবার স্থান রহিল না।

শৈবলিনী পঞ্চ বর্ষের সময়ই বিধবা হইয়াছিল, শ্বশুরালয়েই থাকিত, কখন কখন ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। শৈবলিনী তীক্ষ্ণবুদ্ধি-মতী, দুই তিন বার বীরগ্রামে আসিয়াই হেমলতার অন্তরের ভাব কিছু কিছু বুঝিতে পারিল, মনে মনে সঙ্কল্প করিল, "যদি বালিকাকে আমি যত্ন না করি বোধ হয় ভ্রাতার সংসার ছারখার হইয়া যাইবে," সেই অবধি বীরগ্রামে রহিল।

শৈবলিনীর সস্নেহ ব্যবহারে ও প্রবোধ বাক্যে হেমলতার দুঃখভার কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইল। শৈবলিনী মানবচরিত্র বিশেষরূপ জানিত, একবারও হেমকে তিরস্কার করিত না, কনিষ্ঠা ভগিনীকে যেন প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিত। তাহার সারগর্ভ স্নেহপরিপূর্ণ কথায় কোন্ দুঃখিনীর দুঃখ না বিমোহিত হয়? শৈবলিনী গল্প করিতে অতিশয় পটু; সর্ব্বদাই হেমলতাকে পুরাণের গল্প বলিতেন। সে পবিত্র মুখে সে পবিত্র গল্প শুনিতে শুনিতে হেমলতা রজনীতে নিদ্রা বিস্মরণ হইত। গভীর রজনী, গভীর বন, চারি দিকে বৃক্ষের অন্ধকার দেখা যাইতেছে, বায়ুর ভীষণ শব্দ ও হিংস্রক জন্তুর ভীষণতর নাদ শুনা যাইতেছে। রাজকন্যা দময়ন্তী অদ্য অভাগিনী বেশে স্বামীর প্রেমকে একমাত্র অবলম্বন করিয়া ধন মান রাজ্য তুচ্ছ-জ্ঞান করিয়া সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভিখারিণী বেশে বিচরণ করিতেছে।

স্বামী তৃষ্ণার্ত্ত হইলে গণ্ডূষ করিয়া জল দিতেছে, স্বামী বস্ত্রহীন হইলে আপন বস্ত্র দিতেছে; স্বামী পরিশ্রান্ত হইলে আপন অঙ্কে তাঁহার মস্তক স্থাপন করিয়া স্বয়ং অনিদ্র হইয়া উপবেশন করিয়া আছে। সেই স্বামী যখন মায়াজাল বিদীর্ণ করিয়া অভাগিনীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইল তখনও অভাগিনীর স্বামী-চিন্তা ভিন্ন এ জগতে আর চিন্তা নাই; স্বামীর পুনর্ম্মিলন ভিন্ন এ জগতে আর আশা নাই। অথবা সেই মহর্ষি বাল্মীকির কুটীরে চিরদুঃখিনী বৈদেহী হস্তে গণ্ডস্থাপন করিয়া এখনও হৃদয়ের একেশ্বরকে চিন্তা করিতেছে। সম্মুখে পুত্র দুইটী খেলা করিতেছে; তাহাদিগের মুখ অবলম্বন করিতেছে আবার শ্রীরামের চিন্তা করিতেছে। যিনি নিরাশয়া নিষ্কলঙ্কা অন্তঃসত্ত্বা রাজকন্যা রাজরাণীকে চিরনির্ব্বাসিত করিয়াছেন সেই নিষ্ঠুর পতিকেও অদ্যাবধি হৃদয়ে স্থান দিয়া অভাগিনী চিন্তা করিতেছে; সেই কমললোচন সীতার জীবনের জীবন, হৃদয়ের সর্ব্বস্ব ধন! পতিব্রতার কি মাহাত্ম্য! পতিব্রতা কি পবিত্র অমূল্য রত্ন!

রজনী তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত হেমলতা তাহার ধর্ম্মপরায়ণা ননদিনীর নিকট এই সকল পুণ্য কথা শুনিত, দুঃখকথা শুনিয়া হৃদয় আলোড়িত হইত, ননদিনীর হৃদয়ে বদন ঢাকিয়া দর-বিগলিত ধারায় রোদন করিত, আবার মুখ তুলিয়া সেই পবিত্র কথা শুনিত, আবার শোকাকুল হইয়া অবারিত অশ্রুজল ত্যাগ করিত। ভাবিত "সংসারে সকলেই দুঃখিনী, পুণ্যাত্মা সীতা দুঃখিনী, ধর্ম্মপরায়ণা সাবিত্রী দুঃখিনী, আমি কে অভাগিনী যে নিজ দুঃখে বিহ্বলা হইয়া রহিয়াছি। তাঁহারা সাধ্বী ছিলেন, পতিব্রতা ছিলেন, অভাগিনী হেমলতা আজিও নরেন্দ্রের চিন্তা করে,—দেবতুল্য স্বামীকে বিস্মরণ হইয়া আছে। আমি অবলা, আমার বল নাই, ভগবান সহায় হও, পাপচিন্তা হৃদয় হইতে উৎপাটিত কর, অবলার যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিবে।" এইরূপ ভাবনা আসিতে আসিতে আবার চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িত, আবার শৈবলিনী অভাগিনীকে আপন ক্রোড়ের দিকে লইত।

শৈবলিনীর অপরূপ স্নেহ ও প্রবোধ্যবাক্যে হেমলতা ক্রমশঃ শান্তি লাভ করিল, হৃদয়ের প্রথম প্রেমস্বরূপ ভীষণ শেল উৎপাটিত হইল, কিন্তু অনেক দিনে, অনেক চেষ্টায়, অনেক পরিশ্রমে, সে ফল লাভ হইল। সেই ভীষণ অস্বাভাবিক পরিশ্রম ও চেষ্টায় যৌবনের প্রফুল্লতা শুষ্ক হইয়া গেল, অবয়বে চিন্তার রেখা অঙ্কিত হইল, হেমলতা আজি আর দুঃখিনী নহে, কিন্তু স্বভাবতঃ বিষন্নবদনা, নম্র ও নতশির।

এক্ষণে হেমলতা ও শৈবলিনী সর্ব্বদাই নরেন্দ্রের কথা কহিত, বাল্যকাল অবধি শৈবলিনী নরেন্দ্রকে ভ্রাতা বলিত, এখন হেমও তাহাকে ভ্রাতার স্বরূপ জ্ঞান করিত। ভ্রাতার বিপদে বা অবর্ত্তমানে অবশ্যই ভগ্নীর চিন্তা হয়, হেমও নরেন্দ্রের জন্য ভাবিত, কিন্তু তাহার হৃদয় আর পূর্ব্ববৎ বিচলিত হইত না। কিম্বা যদি কখন কখন সায়ংকালে সেই উপবনে একাকী বিচরণ করিতে করিতে হেমের বাল্যকালের কথা মনে পড়িত, ভাগীরথীর কল কলনাদ শুনিয়া, মেঘশূন্য নীল গগনমণ্ডলে উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্র দর্শন করিয়া, শীতল হরিৎ কুঞ্জবনে উপবেশন করিয়া, বাল্যকালে এ সমস্ত দ্রব্যের সহিত আর যে একটী রমণীয় দ্রব্য দেখিত তাহাকে যদি কখন কখন মনে পড়িত; যদি সে কথা মনে পড়িয়া হেমের চক্ষে একবিন্দু জল লক্ষিত হইত,—পাঠক, সে ভ্রাতৃস্নেহের নিদর্শনস্বরূপ বলিয়া মার্জ্জনা করুন। ভ্রাতৃস্নেহ ভিন্ন অন্য কোন ভাবে সে অশ্রুবিন্দু দেখাগিয়াছে কি না জানি না, হেমলতাও জানে না; যদি অন্য কোন ভাবের একবিন্দুও থাকে, সেটুকু অভাগিনী হেমকে মার্জ্জনা করুন। সে ভাব তিরোহিত করিবার জন্য হেম অনেক চেষ্টা করিয়াছে, অনেক সহ্য করিয়াছে, অভাগিনী অনেক কাঁদিয়াছে; সেই চেষ্টায় সে ভাব তিরোহিত হইয়াছে, যদি হৃদয়ের কন্দরে অল্প পরিমাণে লুক্কায়িত থাকে, সেটুকু অভাগিনী হেমকে ক্ষমা করুন।

ঊনত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

পুরাণ কথা।

ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া হেমলতা ও শৈবলিনী গৃহের সমস্ত কার্য্যাদি সমাপন করিলেন; পরে দুইজনে একটী ঘরে বসিয়া হেম বলিল, "দিদি অনেক দিন অবধি গল্প শুনি নাই, আজ একটু অবসর আছে একটী গল্প বল না!"

শৈবলিনী সস্নেহ বচনে উত্তর দিলেন, "বল্‌বো বৈ কি বৌ, কোন্ গল্প বলিব বল।"

হেম বলিল, "রাজা হরিশ্চন্দ্রের গল্প অনেক দিন শুনি নি, সেই গল্প বল।" শৈবলিনী হরিশ্চন্দ্রের গল্প বলিতে লাগিল।

মহাভারতের যথার্থই অমৃতের কথা, সে গল্প কি মিষ্ট, কি সুললিত, কি হৃদয়গ্রাহী! রাজার রাজ্য গেল, ধন গেল, মান গেল, স্ত্রী-পুত্র লইয়া

বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। রাজমহিষী শৈব্যা এক্ষণে রাজার একমাত্র রত্ন,—কি অমূল্য রত্ন! সুখের সময়, সম্পদের সময়, রমণী অস্থিরা, চঞ্চলচিত্তা, মানিনী! কত আবদার করে, কতবার ক্রোধ করে! কিন্তু যখন জীবনাকাশ ক্রমশঃ মেঘাচ্ছন্ন হইতে থাকে, যখন পৃথিবীর সমস্ত সুখ নাট্যাভিনয়ের শেষে নাট্যমন্দিরে দীপশ্রেণীর ন্যায় ক্রমশঃ নিস্তেজ ও একে একে নির্ব্বাণ হইতে থাকে, যখন আশা মরীচিকারূপে আমাদের অনেক পথ লইয়া যাইয়া শেষে মরুভূমিতে রাখিয়া অদৃশ্য হয়, যখন বন্ধুগণ আমাদিগকে ত্যাগ করে, লক্ষ্মী বিমুখ হয়; তখনও কে অনন্যমনা ও অনন্যহৃদয়া হইয়া অভাগার শুশ্রূষা করে? মাতা ব্যতীত আর কে হতভাগার শয্যা রচনা করে? দুহিতা ব্যতীত আর কে রোগীর শুষ্ক ওষ্ঠে জল দান করে? ভার্য্যা ব্যতীত আর কে নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া, ক্লান্তি বিস্মৃত হইয়া, দিবানিশি হতভাগার সেবায় রত থাকে? পতিকে স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে? রমণীর প্রেম অগাধ, অপরিসীম; দারিদ্র্যে, দুঃখে, কষ্টেও শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রকে সেবা করিতে লাগিলেন। সে দুঃখের কথা শুনিয়া হেমলতার চক্ষুতে জল আসিল।

তাহার পর আবও দুঃখ, রাজা শৈব্যাকে ও পুত্রটীকে বিক্রয় করিলেন, আপনাকে চণ্ডালের নিকট বিক্রয় করিলেন; অভাগিনী শৈব্যা স্বামীবিরহে আপনি কায়িক পরিশ্রমে আপনার ও পুত্রটীর ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন; আহা! সে পুত্রটিও অকালে কাল প্রাপ্ত হইল।—— হেমলতা আর থাকিতে পারিল না, ননদিনীর হৃদয়ে মস্তক স্থাপন করিয়া দর-বিগলিত ধারায় রোদন করিতে লাগিল।

গল্প সাঙ্গ হইল, রাজা রাজ্ঞীকে ফিরিয়া পাইলেন, পুত্রকে ফিরিয়া পাইলেন, রাজ্য সম্পদ সমস্তই ফিরিয়া পাইলেন। হেমলতার হৃদয় শান্ত হইল; অনেকক্ষণ, প্রায় এক দণ্ডকাল, উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; অনেকক্ষণ পর হেমলতা ধীরে ধীরে উঠিয়া একটী বাতায়ন খুলিল—বাহিরে চন্দ্রকরে জগৎ উদ্দীপ্ত হইয়াছে, নৈশ বায়ুতে বৃক্ষগণ ধীরে ধীরে মস্তক নাড়িতেছে; দূর হইতে গঙ্গার জলের কুল্‌কুল্‌ শব্দ শুনা যাইতেছে।

শৈবলিনী ধীরে ধীরে হেমলতার নিকট আসিয়া ভগ্নীর ন্যায় সস্নেহে তাহার হস্ত ধারণ করিল। হেম কি ভাবিতেছিল?—ভাবিতেছিল ঐ বৃক্ষের পাতায় পাতায় কত জোনাক পোকা দেখা যাইতেছে, উহাদেরও জীবন আছে; সুখ, দুঃখ, ভরসা, ইচ্ছা আছে; যে ভগবান রাজা

হরিশ্চন্দ্রকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন, তিনিই এই নিশায় অনিদ্র হইয়া ঐ পোকাগুলিকে খাদ্য যোগাইতেছেন, উহাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন; এই বিপুল বিশ্বসংসারে সকল জীবজন্তুকে তিনিই রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাকে নিবিষ্টমনে পূজা করি, আমাদেরও তিনিই রক্ষা করিবেন।

হেমলতা বালিকা-সুলভ সরলতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, যিনি দয়ার সাগর, তিনি তোমাকে এরূপ অল্পবয়সে বিধবা করিলেন কেন?"

শৈব। "সকলের কপালে কি সকল সুখ থাকে? তিনি আমাকে বিধবা করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখিনী করেন নাই। দেবতুল্য ভ্রাতা দিয়াছেন, তোমার ন্যায় সুশীলা ভ্রাতৃজায়া দিয়াছেন, এই সোণার সংসারে স্থান দিয়াছেন; আমার আর কিছুই কামনা নাই, কেবল একবার তীর্থ ভ্রমণ করিয়া পূজা করিব এই ইচ্ছা।"

হেম। "আমাদের কাশী বৃন্দাবন যাওয়ার কথা স্থির হইয়াছিল না?"

শৈব। "হাঁ, শ্রীশ আমার উপরোধে সম্মত হইয়াছেন, বোধ হয় শীঘ্রই যাওয়া হইবে।"

হেম। "দিদি, তোমার সঙ্গে তীর্থে যাইব ভাবিলে আমার বড় আহ্লাদ হয়; কত দেশ দেখিব, কত তীর্থ দেখিব! আর শুনিয়াছি নরেন্দ্রনাথ পশ্চিমে আছেন, হয়ত তাঁহার সঙ্গেও দেখা হইবে।"

শৈব। "হইতে পারে" বলিয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধি শৈবলিনী কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইল। এমন সময় শ্রীশচন্দ্র সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। শৈবলিনী এক পার্শ্ব দিয়া বাহির হইয়া যাইল।

শৈবলিনীর কি চিন্তা?—বাহিরে দণ্ডায়মান হইয়া শৈবলিনী ভাবিতেছিল, "হেম! তুমি আমাকে বিধবা বলিয়া অভাগিনী বল; কিন্তু নারীতে যাহা কখনও সহ্য করিতে পারে না, বালিকা! তুমি তাহা সহ্য করিয়াছ। সে আঘাতে তোমার হৃদয় চূর্ণ হইয়াছে, তোমার জীবন শুষ্ক হইয়াছে; এ বয়সে তোমার দুর্ব্বল শরীর ও নীরস ওষ্ঠ দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এ বিষম চিন্তার কথা ভ্রাতা কিছুই জানেন না; তুমি বালিকা, তুমিও ভাবিয়াছ এ চিন্তা নির্ব্বাণ হইয়াছে; কিন্তু নরেন্দ্রের সহিত আবার সাক্ষাৎ হইলে কি হয় জানি না। ভগবান অনাথার নাথ, অসহায়ের সহায় হইবেন।"

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

তীর্থযাত্রা।

হেমলতা হরিশ্চন্দ্রের গল্প শুনিতে শুনিতে চিন্তায় অভিভূতা ছিলেন, এক্ষণে স্বামীর উদার মুখমণ্ডল সে চিন্তা দূর করিল। শ্রীশচন্দ্র সস্নেহে হেমের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আজ ভাল আছ?" হেম ধীরে ধীরে কেবলমাত্র বলিলেন, "হাঁ আছি।"

অন্য কথা কহিবার সময় ছিল না। শৈবলিনী ঘরের ভিতর আসিলেন ও ভ্রাতাকে আসন দিয়া ভোজনে বসাইয়া আপনি পার্শ্বে বসিয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন। হেমলতা শীঘ্র সে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইয়া দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বামীর ভোজন দেখিতে লাগিলেন।

ভ্রাতা ভগিনীতে অনেকক্ষণ কথোপকথন হইতে লাগিল, শ্রীশচন্দ্রের খাওয়া সাঙ্গ হইল; রাত্রি অধিক হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ শয়নের উদ্যোগ করিলেন, শৈবলিনী অন্য গৃহে গেলেন।

তখন হেমলতা ধীরে ধীরে যাইয়া স্বামীর পার্শ্বে আসিলেন, ও বিনীতভাবে তাম্বূল দিলেন। অদ্য শ্রীশের অন্তঃকরণ কিছু আহ্লাদিত ছিল, তিনি রহস্য করিয়া বলিলেন, "আমি তাম্বূল লইব না।" উদ্বিগ্নচিত্তে হেম জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?"

শ্রীশ। "তুমি কি দাসী যে এরূপ ভয়ে ভয়ে পান দিতেছ?"

হেমলতা ভূমির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তবে কি করিব?"

শ্রীশ সস্নেহে হেমের হাতখানি ধরিয়া বলিলেন, "চিরকালই কি এই শুষ্ক মুখখানি দেখিব? কবে তুমি শরীরে একটু সারিবে, কবে তোমার মুখখানি প্রফুল্ল দেখিব?"

হেম কি উত্তর দিবে জানে না। একবার স্বামীর দিকে নয়ন দুইটী তুলিয়া আবার বিনীতভাবে ভূমির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার শরীর ত এখন ভাল আছে?"

শ্রীশ বলিলেন, "হাঁ, ঈশ্বরেচ্ছায় শরীর অল্প সারিয়াছে, কিন্তু মনে উল্লাস কৈ?"

হেম বালোচিত সরলতায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "উল্লাস কি?"

শ্রীশ। "মনের স্ফূর্ত্তি কৈ? কবে তোমাকে সুখী দেখিব?"

হেম আবার স্বামীর দিকে বিনীত দৃষ্টি করিয়া আবার ভূমির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "কৈ আমার মনে কোন কষ্ট নাই।" হেমলতা সত্য কথাই কহিয়াছিলেন, মনের মধ্যে কোন কষ্টের কারণ অনুসন্ধান করিয়া পায় নাই। তবে উল্লাস? হেমের কপালে সেটী ঘটে নাই।

শ্রীশ দেখিলেন, হেমকে বুঝান সহজ নহে। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মুখখানি সহাস্য দেখিব কবে?"

হেম আর উত্তর করিতে পারিলেন না। ভূমির দিকেই চাহিয়া রহিলেন। হঠাৎ একটী কথা মনে পড়িল; এবার হেম অল্প হাসিয়া বলিলেন, "যবে তুমি আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিবে।"

শ্রীশ। "কি প্রতিজ্ঞা?"

হেম। "তীর্থযাত্রা।"

শ্রীশচন্দ্র এবার কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন। হেমলতা ও শৈবলিনীর উপরোধে অনেকবার তীর্থযাত্রা করিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন উদ্যোগ করেন নাই। অদ্য হেমলতার কথায় কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে বলিলেন—

"যদি যথার্থই তীর্থযাত্রা করিলে তোমার শরীর ও মন ভাল থাকে, তাহা হইলে আমি অবশ্যই যাইব। কল্য হইতেই আমি যাত্রার আয়োজন করিব।"

হেম অতিশয় পরিতৃপ্ত হইলেন, কিন্তু স্বাভাবিক লজ্জা বা বিনীতত্ব-বশতঃ কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। হেমের হৃদয়ে যে কৃতজ্ঞতা ও পরিতৃপ্তির ভাব উদয় হইয়াছিল তাহা শ্রীশচন্দ্র হেমের মুখ দেখিয়াই জানিতে পারিলেন। অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া হেমকে আরও নিকটে আনিয়া সস্নেহে চুম্বন করিয়া বলিলেন—"কল্যই আমি উদ্যোগ করিব; আজ অধিক রাত্রি হইয়াছে, যাও খাওয়া দাওয়া কর গিয়ে; আর অধিক বিলম্ব করিও না।"

হেম ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আহারাদি করিতে গেলেন। শৈবলিনী হেমের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। দুই জনে একত্রে আহারাদি সমাপন করিলেন, পরে হস্তপদাদি ধৌত করিয়া হেম স্বামীর কক্ষে যাইলেন।

যৌবনের, প্রারম্ভে, দ্বিপ্রহর রজনীতে হেমলতা একাকী স্বামীর মন্দিরে স্বামীর শয্যায় যাইতেছেন; কিন্তু যৌবনের উদ্বেগ কৈ? উল্লাস কৈ? যৌবনের প্রারম্ভে যে সমস্ত অনিশ্চিত স্বপ্নসম চিন্তা ও ভাবে হৃদয় নৃত্য করিতে থাকে তাহা কোথায়? ধীরে ধীরে হেমলতা স্বামীমন্দিরে

যাইয়া নিদ্রিত স্বামীর পার্শ্বে শয়ন করিলেন; সমস্ত দিনের কাযকর্ম্মের পর অচিরাৎ নিদ্রিত হইলেন।

উপরিউক্ত ঘটনার অল্পদিন পরই শ্রীশচন্দ্র সপরিবারে পশ্চিম যাত্রা করিলেন। গঙ্গাতীরস্থ সমস্ত তীর্থস্থান দেখিয়া অবশেষে মথুরা ও বৃন্দাবন যাইবার মানসে অগ্রায় পঁহুছিলেন। তথায় শ্রীশচন্দ্র প্রধান প্রধান হিন্দু রাজাদিগের সহিত আলাপ করিলেন। তাহাদিগের মধ্যে একজন রাজার উপরোধে শ্রীশ সেই রাজার পরিবারের সহিত আপন পরিবারকে নরোজার দিন প্রাসাদে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হেমলতা অগত্যা রাজপুত-মহিলার বেশ ধরিয়া রাজপুত-রমণীদিগের সহিত আগ্রার বেগমমহলে গিয়াছিলেন।

একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

জেলেখার পত্র।

নরেন্দ্র আগ্রাদুর্গের ভিতর হেমলতার মুখচ্ছবি দেখিয়া প্রায় হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অনেকক্ষণ পরে নিস্তব্ধ আকাশ ও শান্তপ্রবাহিণী নদীর দিকে চাহিতে চাহিতে সেই চন্দ্রালোকে ধীরে ধীরে আপন গৃহে যাইলেন।

গৃহে প্রবেশ করিলেন একটী প্রদীপ জ্বলিতেছিল, লোক কেহ নাই। নরেন্দ্র দ্বার রুদ্ধ করিয়া স্ত্রীলোকের বস্ত্র খুলিতে লাগিলেন! সহসা তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে একখানি পত্র ভূমিতে পড়িয়া যাইল। নরেন্দ্র তুলিয়া দেখিলেন উর্দু ভাষায় লিখিত। নরেন্দ্র প্রদীপের নিকট বসিয়া পত্র খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। অধিক না পড়িতে পড়িতেই বুঝিতে পারিলেন জেলেখার পত্র। তখন অধিকতর বিস্মিত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পত্রে এই লিখা ছিল;—

"নরেন্দ্র!

"আমি পাগলিনী, আমি অভাগিনী, সেই জন্য এই পত্র লিখিতেছি। অমি চক্ষুতে আর দেখিতে পাইতেছি না, আমার মস্তক ঘুরিতেছে তথাপি মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার মনের কথা তোমাকে বলিয়া যাই। তুমি যখন এই পত্র পড়িবে তখন অভাগিনী আর এ জগতে থাকিবে না।

"আমি শাজিহানের জ্যেষ্ঠকন্যা জেহান আরা বেগমের পরিচারিকা; যে দিন বারাণসীর যুদ্ধ হয়, কার্য্যবশতঃ আমি ও মসরুর নামে খোজা

রাজা জয়সিংহের শিবিরে ছিলাম। সেই দিন আহত ও অচেতন হইয়া তুমি সেই শিবিরে আনীত হও, সেই দিন তোমাকে দর্শন করিয়া কালসর্প হৃদয়ে ধারণ করিলাম, বিষম হলাহল পান করিলাম।

"দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, আমি সেই হলাহল পান করিতে লাগিলাম। অশ্রান্ত হইয়া সেই পীড়াশয্যার উপর নত হইয়া থাকিতাম, অনিদ্র হইয়া সেই নিদ্রিত কলেবর নিরীক্ষণ করিতাম। ঐ আয়ত নয়ন দুটী, ঐ প্রশস্ত ললাট, ঐ রক্তবর্ণ ওষ্ঠ দুটীর দিকে দেখিতাম আর পাগলিনীপ্রায় হইতাম। পীড়াবশতঃ কখন তুমি কাহাকে লক্ষ্য করিয়া তিরস্কার করিতে, আমি নিঃশব্দে মনের দুঃখে রোদন করিতাম। পীড়াবশতঃ কখন সস্নেহে আমার হস্ত ধরিতে, আমি পাগলিনী; আমার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইত! ঐ তেজোময় জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির ভিতর ঈশ্বর পাষাণহৃদয় সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা তখন জানিতাম না।

"ক্রমে বারাণসী হইতে নৌকাযোগে তুমি দিল্লীতে আনীত হইলে; আমি কোন ছলে তোমাকে রাজপ্রাসাদের ভিতর আনিয়া আপন ঘরে রাখিলাম; তথায় সেইরূপ তোমার দিকে চাহিয়া থাকিতাম; চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া, রজনী যাপন করিতাম; যখন আর পারিতাম না তখন খেদে, আনন্দে রোদন করিয়া তোমার পদে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতাম।

"দুষ্ট মসরুর তোমার কথা সাহেব বেগমকে জানাইল! প্রাসাদের ভিতর পুরুষ আনিয়াছি শুনিয়া তিনি আমার ও তোমার প্রাণ সংহারের আদেশ দিলেন। আবার মসরুর যাইয়া সাহেব বেগমকে কি বলিল; কি বলিল জানি না, কিন্তু পরে শুনিলাম তোমার অপূর্ব্ব বীরত্ব ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কথা বলিয়াছিল। যাহা হউক বেগম পূর্ব্বের আজ্ঞা রোধ করিলেন, আমাকে এই ঘরে বন্দী করিয়া রাখিলেন ও তোমার আরোগ্যের পর স্বয়ং আমাদের দোষের বিচার করিবেন এইরূপ আদেশ দিলেন।

"আমি বন্দী হইলাম, দিবারাত্রি ঘরে একাকী বসিয়া থাকিতাম;—না একাকী নহে, নরেন্দ্র! তুমি আমার হৃদয়ে বাস করিতে। আমি এক্ষণে আর কোন কথা গোপন করিব না, আমার মৃত্যু সন্নিকট, লজ্জা অনাবশ্যক।

"তোমাকে না দেখিয়া অসহ্য যাতনা হইত, অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া দ্বাররক্ষক ও মসরুরের অনেক খোসামদ করিয়া গোপনে তোমাকে দেখিতে যাইতাম। তখন তুমি আরোগ্যলাভ করিয়াছ, কখন কখন আমার দিকে চাহিয়া দেখিতে তাহা কি স্মরণ হয়? আমি অধিকক্ষণ থাকিতে পারিতাম না, কথা কহিতে পারিতাম না, নিষ্ঠুর

মসরুর আমাকে শীঘ্রই আপন ঘরে পাঠাইয়া দিত, তথায় যাইয়া আমি আবার সেই দেবকান্তির চিন্তা করিতাম।

"ক্রমে বিচারের দিন সমাগত হইল ; সে দিন তোমার স্মরণ আছে? সিংহাসনোপবিষ্টা জেহান আরার চারিদিকে পরীবেশে যে সহচরীগণ দাঁড়াইয়াছিল তাহা তোমার স্মরণ আছে? সাহেব বেগম সেই দিন প্রথমে তোমাকে দেখিলেন ; যে কঠোর আজ্ঞা দিলেন তোমার স্মরণ আছে? শাহজাদী! আমার পাপের কি এই উচিত দণ্ড? তুমিও স্ত্রীলোক, তোমার হৃদয় কি পাষাণ, কখনও বিচলিত হয় নাই? তবে আমি বাঁদী ; আমার স্বাধীনতা নাই, কিন্তু স্বাধীনতার সহিত কি হৃদয়ের ভাবগুলিও বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম? আমার পাপের দণ্ড দিলে, কিন্তু তুমি সিংহাসনোপবিষ্টা রাজদুহিতা আমা অপেক্ষাও যে ঘোর পাপীয়সী, তাহার কি দণ্ড নাই?

"কি কৌশলে সেই রাত্রি আমি দুর্গ হইতে তোমাকে লইয়া পলায়ন করিলাম তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। তাহার পরই সৈনিকবেশে তুমি দিল্লী ত্যাগ করিলে, এ অভাগিনীও দেওয়ানা নাম ধারণ করিয়া পুরুষবেশে তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইল। নরেন্দ্র! তোমার প্রণয়ভাজন হইব এরূপ আশা হৃদয়ে ধারণ করি নাই ; দিবারাত্রি তোমার নিকটে থাকিব, দিবা-রাত্রি তৃষার্ত্ত চাতকের ন্যায় তোমার অপূর্ব্ব মুখকান্তির দিকে চাহিয়া থাকিব, দিবসে তোমার অমৃত কথা শ্রবণ করিব, রজনীতে সন্ধ্যা হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, কখন কখন দ্বিপ্রহর হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত তোমার সুপ্ত-কান্তির উপর চাহিয়া চাহিয়া হৃদয়ের পিপাসা নিবারণ করিব, জগতে অতুল্য স্বর্গে অতুল্য সুখ লাভ করিব,—কেবল এই আশায় আমি তোমার সহিত দিল্লী হইতে শিপ্রাতীরে, শিপ্রাতীর হইতে রাজস্থানে ভ্রমণ করি-য়াছি! জগতে কোন্ স্থল আছে, নরকে কোন্ স্থল আছে, যথায় এই সুখের আশায় অভাগিনী যাইতে পরাঙ্মুখ!

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

পত্র সমাপ্ত।

"নরেন্দ্র! তুমি ভালবাসিয়াছ, যে হিন্দুরমণী তোমার প্রণয়ের পাত্রী তাহাকেও আমি দেখিয়াছি, কিন্তু তুমি কখনও দেওয়ানা হও নাই। আমার তাতার দেশে জন্ম, তথাকার সকলেই উগ্রস্বভাব, কিন্তু আমি

বাল্যকাল হইতেই অতিশয় উগ্রস্বভাব ছিলাম। আমি ক্রুদ্ধ হইলে সবল বালকগণও ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া বালিকার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইত, আমি যাহাকে ভালবাসিতাম তাহাকে দিবারাত্রি নিকট হইতে যাইতে দিতাম না। একটী যুদ্ধে আমার পিতা হত হয়েন, আমি রুদ্ধ হইয়া বাঁদী অবস্থায় দিল্লীর সম্রাটের নিকট বিক্রীত হইলাম। স্বাধীনতা গেল, কিন্তু উগ্রস্বভাব গেল না, বোধ হয় ভারতবর্ষের উষ্ণতর সূর্য্যতাপে আমার শোণিত ক্রমশঃ উষ্ণতর হইল। প্রাসাদে তাতার-রমণীদিগের কি কায বোধ হয় তুমি জান। আমরা বেগমদিগের মহল রক্ষা করি, খড়্গ ও ছুরিকা সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতে হয়; বেগমদিগের আদেশে কত দুর্ঘটনা সংঘটন হয় তাহা জগৎ সাধারণ কি জানিবে? আমি এ সমস্ত নৃশংস ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতাম না, কিন্তু যখন যথার্থ ক্রুদ্ধ হইতাম তখন সকলের অসাধ্য অসংসাহসী কার্য্যে লিপ্ত হইতেও সঙ্কোচ করিতাম না। আমার এই গুণের জন্যই বেগম সাহেব আমার এরূপ ক্রোধ সহ্য করিতেন।

"যখন দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া তোমার সহিত আসিলাম, আমার স্বভাব কিছুমাত্র অন্যথা হইল না, কেবল যেরূপ উগ্রস্বভাব দেওয়ানা জন্মিয়াছিলাম, সেই ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তোমার দিকে দেখিতে দেখিতে আমি কখন কখন যথার্থই সংজ্ঞা হারাইতাম, দেওয়ানা হইতাম। ইহাকে ভালবাসা বলে কি না জানি না, কিন্তু আমার মস্তক ঘূর্ণিত হইত, আমি হৃদয়ের পিপাসায় অস্থির হইতাম; আবার সেই হলাহল পান করিতাম, আবার তোমার দিকে চাহিয়া থাকিতাম, আবার উন্মত্তপ্রায় হইতাম। ইহার নাম সুখ কি ক্লেশ তাহা বলিতে পারি না, কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, এ অবস্থা আমি কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে চাহিতাম না, বেহস্তে প্রধানতম হুরীকেও আমি হিংসা করিতাম না। এইরূপ দেওয়ানা হইয়া আমি তোমার সহিত রাজস্থানে যাই। তথায় সহসা আমার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল।

"উদয়পুরের হ্রদে নৌকা করিয়া সন্ধ্যার সময় চন্দ্রালোকে বেড়াইতে যাইতে, স্মরণ হয়? তোমাকে সর্ব্বদাই চিন্তিত দেখিতাম, ভাবিতাম সেই বীরস্থান দেখিয়া তোমার হৃদয়ে বীরচিন্তা উদয় হইত। একদিন আমি নৌকায় বসিয়াছিলাম, তুমি আমার অঙ্কে মস্তক দিয়া শুইয়াছিলে ও অর্দ্ধ ঘণ্টা চন্দ্রের দিকে দেখিতেছিলে, স্মরণ হয়? আমিও সমস্ত সময় তোমার চন্দ্রকরোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম, তোমার কেশ বিন্যাস করিয়া

দিতেছিলাম, তোমার অঙ্গুলী লইয়া খেলা করিতেছিলাম! সহসা তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলে 'হেম! আর কি তোমাকে এ জীবনে দেখিব?' আমি বঙ্গভাষা ভাল জানি না, কিন্তু এ কথা বুঝিলাম; দন্ত কড়মড় করিয়া উঠিলাম, নয়ন হইতে অগ্নি বহির্গত হইতে লাগিল, তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া নৌকায় নিপতিত হইলাম, স্মরণ হয়? পূর্ব্বে জানিতাম তুমি পাষাণহৃদয়, সে দিন জানিলাম তোমার হৃদয় আছে কিন্তু সে আমার নহে,—অন্যের!

"সে রাত্রির যন্ত্রণা বর্ণনা করা যায় না। আমি তোমার প্রণয়ভাজন হইব এরূপ কখন আশা করি নাই, কিন্তু যাহাকে আমি পূজা করিতেছিলাম, যাহার জন্য আমি সমস্ত ত্যাগ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছিলাম, যাহার জন্য আমি দেওয়ানা হইয়াছিলাম, তিনি অন্যের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী এ চিন্তা অসহ্য। চিন্তায় আমি উন্মত্তপ্রায় হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিলাম; সেই রজনীতেই তোমার প্রাণসংহার করিব স্থিরসঙ্কল্প হইলাম। আমাকে দোষ দিও না, বঙ্গদেশের রীতিনীতি আমি জানি না, আমি ধর্ম্মের উপদেশ কখন শুনি নাই; আমি অশিক্ষিতা উগ্রমতি তাতারবালা; আমি দেওয়ানা; দেওয়ানার ন্যায় ভালবাসিতাম, দেওয়ানার ন্যায় এক্ষণে জিঘাংসায় পরিপূর্ণ হইলাম। আমার হৃদয় যাহা বলিল আমি তাহাই করিলাম, লতার ন্যায় তোমার পদতলে পড়িয়াছিলাম, কালসর্পের ন্যায় তোমায় দংশন করিতে প্রস্তুত হইলাম।

"আমার উন্মত্ততার আধিক্য দেখিয়া তুমি এক সপ্তাহ রুদ্ধ করিয়া রাখ, স্মরণ হয়? সেই উপায় দ্বারা তুমি আপন জীবন বাঁচাইলে, এক সপ্তাহের মধ্যে আমার ক্রোধ অনেক হ্রাস হইল, আমি অন্য কৌশল চিন্তা করিতে লাগিলাম।

"তোমার হিন্দুধর্ম্মে আস্থা দেখিয়া আমি একলিঙ্গ-মন্দিরের গোস্বামীদিগের নিকট আপন ইষ্টলাভের জন্য যাইলাম। প্রথম যাঁহার নিকট যাইলাম তিনি পরম তেজস্বী ও ধার্ম্মিক, আমার সমস্ত প্রস্তাব শুনিয়া আমাকে পদাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। এইরূপে তিন চারি জনের নিকট অবমানিত হইয়া অবশেষে সেই কৃষ্ণপরিচ্ছদ শৈবের নিকট যাইলাম। তিনি অনেক অর্থলোভে সম্মত হইলেন। তৎক্ষণাৎ তিন সহস্র মুদ্রার একটী হীরক-বলয় তাঁহার হস্তে পরাইয়া দিলাম, আর বিংশতি সহস্র মুদ্রার একটী মুক্তমালা তাঁহার সম্মুখে দোলাইয়া বলিলাম, 'যদি ছলে বলে কৌশলে নরেন্দ্রকে হেমলতার চিন্তা ত্যাগ করাইতে পার, মুসলমান ধর্ম্ম

অবলম্বন করাইতে পার, আমাকে গ্রহণ করাইতে পার, তবে এই মুক্তাহার তোমার গলায় স্বহস্তে পরাইয়া দিব।'

"এত অর্থ কোথায় পাইলাম জিজ্ঞাসা করিবে। জেহান আরার দাস-দাসীরও অর্থের অভাব ছিল না। দেশের বড় বড় লোক সম্রাটের নিকট কোন আবেদন করিতে আসিলে সাহেব বেগমকে উপঢৌকন না দিলে কোন কার্য্যই সম্পাদিত হইত না। কেহ একটী উচ্চ কর্ম্মের প্রার্থী, কেহ একটী বিষয়ের প্রার্থী, কেহ প্রজার উপর অত্যাচার করিয়াছেন তাহার ক্ষমা চাহেন, কেহ পরের তালুক কাড়িয়া লইয়াছেন তাহার একটী সনন্দপত্র চাহেন, কোন যোদ্ধা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছেন বা কাপুরুষতা দেখাইয়াছেন তাহার ক্ষমাপ্রার্থী, কাহারও উপর সম্রাটের অন্যায় ক্রোধ হইয়াছে, সে ক্রোধ হইতে নিস্তার পাওয়া আবশ্যক ;—সকলেই রাশি রাশি হীরা, মুক্তা ও অর্থ সাহেব বেগমের নিকট পাঠাইয়া দিয়া আপন আপন আবেদন জানাইতেন। সাহেব বেগমের দাসীরাও অর্থে বঞ্চিত হইত না।

"তাহার পর শৈলেশ্বর যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা তুমি জান। সে উপায় বিফল হইল, আমার আশা বিফল হইল, দুই দিন পর্ব্বতগহ্বরে নিজ নারীবেশে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, তুমি সুরায় উন্মত্ত ছিলে, দেখিয়াছিলে কি না জানি না। প্রথম দিন তোমার পদতলে রোদন করিয়াছিলাম, দ্বিতীয় দিবস তোমার প্রাণসংহারে উদ্যত হইয়াছিলাম। হস্ত হইতে দুইবার খড়্গ পড়িয়া গেল ; তাতারের হস্ত হইতে খড়্গ পড়িয়া যায় কখনও জানিতাম না, আমি এরূপ ক্ষীণ তাহা জানিতাম না।

"পরে তোমার সহিত পুনরায় আগ্রায় আসিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম বঙ্গদেশ হইতে একজন ধনাঢ্য জমীদার আসিয়াছে,—তোমার হেমকে দেখিলাম। পাপিষ্ঠ! পরস্ত্রী তোমার হেম? উঃ—আর যাতনা সহ্য করিতে পারি না। মথুরার প্রধান মন্দিরে তিন দিন পর যাইও, পরস্ত্রীকে আবার দেখিও ; তুমি আমাকে হতভাগিনী করিয়াছ, তোমাকেও হতভাগা করিব, সেই জন্য এই সমাচার দিলাম, সেই জন্য আগ্রার দুর্গে লইয়া যাইয়া হেমকে দেখাইয়াছিলাম।

"আমার মৃত্যু সন্নিকট, কিন্তু জিঘাংসা তাতারের ধর্ম্ম, আমি স্বধর্ম্ম ভুলি নাই, আমার শোণিত শীতল হয় নাই।

"উঃ! আমার মস্তক ঘুরিতেছে। যদি এ তৃষার্ত্তকে স্নেহ-বারি দান করিতে, তবে মুসলমানী অকৃতজ্ঞ হইত না ; যতদিন জীবন থাকিত,—

উঃ! আর দেখিতে পাই না। নরেন্দ্র! এ জীবনের জন্য বিদায় দাও, যদি মৃত্যুর পর আর একবার দেখা হয়, নিষ্ঠুর নরেন্দ্র! এই হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া অন্তরের ভাব তোমাকে দেখাইব। নরেন্দ্র! তখন তুমি আমাকে ভাল বাসিবে,—নতুবা এই ছুরিকাদ্বারা তোমার পাষাণ-হৃদয় চূর্ণ করিব।

উন্মাদিনী জেলেখা।"

পত্রপাঠ সমাপ্ত হইল। নরেন্দ্রের নয়ন হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রুবারি পড়িল। তিনি নিস্তব্ধে চিন্তা করিতে করিতে গৃহ হইতে বাহির হইলেন।

রজনী প্রায় শেষ হইয়াছে, সমস্ত নগর নিস্তব্ধ। নরেন্দ্র পদচারণ করিতে করিতে অনেক দূর যাইয়া পড়িলেন, দেখিলেন সম্মুখে যমুনা।

একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন এরূপ সময় দেখিলেন যমুনাতীরে একস্থানে কতকগুলি লোক সমবেত হইয়া একটী মৃতদেহ ভুমিতে সন্নিবেশিত করিতেছে। জিজ্ঞাসা করায় সেই লোকের মধ্যে একজন উত্তর দিলেন—

"মৃত ব্যক্তি পূর্ব্বে বেগমমহলে দাসী ছিল, একজন কাফের সৈনিকের সহিত ব্যভিচারিণী হইয়া বাহির হইয়া যায়। বোধ হয় সে সৈনিক উহাকে এক্ষণে হত্যা করিয়াছে। দাসীর বক্ষঃস্থলে এই তীক্ষ্ণ ছুরিকা বসান দেখিলাম। হতভাগিনীর নাম জেলেখা।"

নরেন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন। দেখিলেন সে জেলেখার নিজের ছুরিকা। নরেন্দ্র জানিলেন, অভাগিনী আত্মঘাতিনী হইয়াছে।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

মথুরা।

সায়ংকালে শান্তপ্রবাহিনী যমুনাকূলে মথুরা নগরী বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। সূর্য্য অনেকক্ষণ অস্ত গিয়াছে, গগনে নক্ষত্র এক একটী করিয়া প্রস্ফুটিত হইতেছে, যমুনার নীল বিশাল বক্ষের উপর দিয়া সন্ধ্যার বায়ু রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাইতেছে; সমস্ত জগৎ শীতল ও শান্ত। মথুরার প্রস্তর-বিনির্ম্মিত ঘাট-শ্রেণী জল পর্য্যন্ত নামিয়াছে, ও বৃক্ষ ও কুঞ্জ-বনের ভিতর দিয়া মথুরার দেব-মন্দির ও হর্ম্ম্যাবলি দেখা যাইতেছে।

ক্রমে রজনী অধিক হইল; হেমন্তকালের চন্দ্রালোকে নদী, গ্রাম, বৃক্ষ ও হর্ম্ম্যাবলি অতি সুন্দর কান্তি ধারণ করিল। নীল গগনে সুধাংশু

যেন ধীরে ধীরে ভাসিতেছে; নদীবক্ষে দুই একখানি ক্ষুদ্রতরী ভাসমান রহিয়াছে; নদীর দুই পার্শ্বে নিবিড় কৃষ্ণ বৃক্ষশ্রেণী নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; বোধ হইতেছে যেন চন্দ্রের সুধাবর্ষণে সমগ্র জগৎ তৃপ্ত হইয়া সুখে নিদ্রিত রহিয়াছে।

সহসা নগরের মধ্যে সায়ংকালীন পূজা আরম্ভ হইল; একেবারে শত দেবালয় হইতে শঙ্খ ঘণ্টার নিনাদ শ্রুত হইতে লাগিল, সায়ংকালীন বায়ুহিল্লোলে সুদূরশ্রুত সে নিনাদ কি সুমধুর, কি মিষ্ট! সেই ঘণ্টারব ধীরে ধীরে নদীর বক্ষে ও নগরের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল, ধীরে ধীরে সেই নীল অনন্ত নৈশ গগনে উত্থিত হইতে লাগিল; ধার্ম্মিকদিগের মন যেন মুহূর্ত্তের জন্যও পৃথিবীর চিন্তা বিস্মরণ হইয়া সেই পবিত্র ঘণ্টা-রবের সহিত গগনের দিকে প্রধাবিত হইতে লাগিল।

নদীকূলে একটী প্রস্তরবিনির্ম্মিত সোপানশ্রেণীর উপরই একটী প্রকাণ্ড দেবমন্দিরে আরতি হইতেছিল। বহুসংখ্যক্ ব্রাহ্মণ ও পূজক উচ্চৈঃস্বরে সায়ংকালীন গীত গাইতেছিল, তাহাদের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য যাত্রী সেই মন্দির বেষ্টন করিয়া সেই গান শুনিতেছিল। যাত্রিদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকই অধিক, বহুদূর হইতে, বহু দেশ হইতে এই পুণ্যস্থানে সমবেত হইয়া অদ্য মন্দির দর্শন করিয়া যেন জীবন চরিতার্থ করিলেন।

আরতি শেষ হইল, যাত্রিগণ নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেল, কেবল দুই-জন স্ত্রীলোক সেই মন্দিরপার্শ্বে একটী বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া কথোপ-কথন করিতেছিলেন।

হেমলতা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—

"দিদি, মুসলমান পাগলিনী বলিয়াছিল আজ এই মন্দিরে নরেনের সঙ্গে দেখা হইবে, কৈ তাহা হইল না?"

শৈবলিনী অতিশয় বুদ্ধিমতী, তিনি হেমের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, যদিও হেম হাসিতে হাসিতে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তথাপি হেমের হৃদয় অদ্য যথার্থ উদ্বেগপরিপূর্ণ। সেই আশায় হেমের হৃদয় আজি সজোরে আঘাত করিতেছে, হেমের শরীর এক একবার অল্প অল্প কম্পিত হইতেছে।

শৈবলিনী মনে মনে ভাবিলেন, "আজি না জানি কি কপালে আছে, হেম বালিকামাত্র, নরেন্দ্রকে দেখিলে আবার পূর্ব্বকথা মনে পড়িবে, সে অসহ্য যাতনা বালিকা সহ্য করিতে পারিবে না।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "সে পাগলিনীর কথা কি বিশ্বাস করে? নরেন্দ্র কোথায়, কোন্ দেশে আছে, তাহার সহিত মথুরায় দেখা হইবার আশা করিতেছ?"

হেম। "না, আশা করি না, পাগলিনী বলিয়াছিল সেই কথা বলিতে-ছিলাম। কিন্তু দিদি, জেলেখার অন্য কথাগুলি ত ঠিক হইয়াছিল।"

শৈব। "ঐ প্রকারে উহারা মিথ্যা আশা জন্মায়, দুটা সত্য বলে একটা মিথ্যা কথা বলে। কৈ আমাদের দাসী আসিল না? আমি যে ঠিক পথ চিনি না, না হইলে আমরা দুই জনেই বাড়ী যাইতাম।"

হেম। "তাড়াতাড়ি কি? এখনও রাত্রি অধিক হয় নাই, আর এ স্থানটী কি সুন্দর। দেখ দিদি, আমার বোধ হইতেছে যেন এই আমাদের বীরনগর, যেন এই গঙ্গা, আর বাল্যকালে চন্দ্রালোকে গঙ্গাতীরে খেলা করিতাম, তোমার সহিত খেলা করিতাম আর, আর,—আর, সকলের সহিত খেলা করিতাম, সেই কথা মনে পড়িতেছে।"

শৈবলিনীর মুখ আরও গম্ভীর হইল, তিনি দাসীর আসিতে বিলম্ব হইতেছে বলিয়া যৎপরোনাস্তি উৎসুক হইলেন। হেম তাহা লক্ষ্য না করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—

"দেখ দিদি, ঐ নৌকাখানি কেমন তীরের মত আসিতেছে, উঃ! মাজিরা কি জোরে দাঁড় বাহিতেছে, উঃ! যেন উড়িয়া আসিতেছে।"

শৈবলিনী সেই দিকে দেখিলেন; তাঁহার ভয় দ্বিগুণ হইল। তিনি যাহা ভয় করিয়াছিলেন তাহাই হইল,—নৌকা ঘাট হইতে আট হস্ত দূরে থাকিতে থাকিতে একজন সৈনিক লম্ফ দিয়া ঘাটে পড়িলেন,—তিনি নরেন্দ্রনাথ।

হেম বৃক্ষের ছায়ায় ছিলেন, নরেন্দ্র তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া মন্দিরের ভিতর যাইলেন। কিন্তু নরেন্দ্রকে হেম দেখিয়াছিলেন; সেই মুহূর্ত্তে যেন শরীরের সমস্ত রক্ত হেমের মুখমণ্ডলে দৃষ্ট হইল; চক্ষু, কর্ণ, ললাট, স্কন্ধ একেবারে রক্তবর্ণ হইয়া গেল; পরমুহূর্ত্তে সমস্ত মুখমণ্ডল পাণ্ডু-বর্ণ হইল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, ললাট হইতে স্বেদবিন্দু বহির্গত হইতে লাগিল।

শৈবলিনী সভয়ে হেমকে ধরিলেন; হেম কিঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিলে শৈবলিনী গম্ভীরস্বরে বলিলেন—

"হেম, আমি তোমাকে ভগ্নী অপেক্ষা ভালবাসি, আমি বলিতেছি, আজ নরেনের সহিত দেখা করিও না, বাড়ী চল। তুমি আমাকে ভগ্নী অপেক্ষা ভালবাস, আমার এই কথাটী শুন, বাড়ী চল। তুমি বালিকা, আপনার মন জান না,—নরেনের সহিত অদ্য তোমার কথোপকথন হইলে কি বিপদ ঘটিবে ভগবান জানেন।"

হেমলতা মুখ নত করিয়া এই কথা শুনিলেন, অনেকক্ষণ ভূমির দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, নয়ন হইতে দুই এক বিন্দু স্বচ্ছ অশ্রু স্বচ্ছ বালুকায় পড়িয়া অদৃশ্য হইল। আবার ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন, তখন উদ্বেগের লেশমাত্র চিহ্ন নাই,—হেমের মুখখানি শান্ত, নির্ম্মল, স্থির; নয়নে কেবল একবিন্দু জল।

শৈবলিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন-

“দিদি, তুমি আমার প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়, তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিও না। দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে, আমাকে কত ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছ, আমি তাহা ভুলি নাই, আমি তোমার অবিশ্বাসিনী নহি। আজি এইমাত্র দেবপূজা সাঙ্গ করিলাম, এই পুণ্যভূমিতে দাঁড়াইয়া এই পুণ্য দেবমন্দিরে আমি অবিশ্বাসিনী হইব না। আর যিনি আমার প্রধান দেবতা, যে দেবতুল্য স্বামী আমাকে ভাল বাসেন, আমার জীবনের যিনি সর্ব্বস্ব ধন, জীবন থাকিতে এ দাসী তাঁহার অবিশ্বাসিনী হইবে না। দিদি, আমাকে সন্দেহ করিও না, আমাকে মন্দ ভাবিও না, তুমি আমাকে মন্দ ভাবিলে এ সংসারে অভাগিনীকে কে ভাল বাসিবে?” হেমলতার নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িয়া সমস্ত মুখমণ্ডল সিক্ত হইতেছিল।

তখন শৈবলিনীর মন শান্ত হইল, শৈবলিনীরও চক্ষুতে জল আসিল। তিনি সস্নেহে হেমের চক্ষু মুছাইয়া বলিলেন—

“হেম আমাকে ক্ষমা কর। তুমি ধর্ম্মপরায়ণা, তুমি পতিব্রতা, আমি যে মুহূর্ত্তের জন্যও সন্দেহ করিয়াছিলাম সে জন্য ক্ষমা কর।”

হেম। “দিদি, তুমি ক্ষমা চাহিও না, তোমার দয়া, তোমার ভালবাসা, তোমার ঋণ আমি ইহজন্মে পরিশোধ করিতে পারিব না। জন্মে জন্মে যেন তোমার ভগ্নী হই, আর আমার কিছু প্রার্থনা নাই।”

আবার দুইজনে দুই জনকে ধরিয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন,—দুই জনেরই চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। সে স্নেহের জল, ভালবাসার জল; পরস্পরের ভালবাসায় পরস্পর কত সুখী, সেই কথা স্মরণ করিয়া দুই জনের চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। পরে শৈবলিনী বলিলেন—

“রাত্রি হইতেছে, যাও, নরেন্দ্রের সহিত দেখা করিয়া আইস।”

শৈবলিনী সেই বৃক্ষতলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, হেমলতা মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হেমলতার এক্ষণে উদ্বেগ নাই, তিনি ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের নিকটে আসিয়া বসিলেন ও নম্রভাবে মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এতদিনের পর হৃদয়ের হেমকে পাইয়া নরেন্দ্রের হৃদয় উদ্বেগপূর্ণ হইল, তিনি কথা কহিতে পারিলেন না, কেবলমাত্র হেমের হাত ধরিয়া পিপাসিতের ন্যায় সেই অমৃতমাখা মুখখানি দেখিতে লাগিলেন, শরীর কাঁপিতে লাগিল, নয়ন হইতে ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। হেম আর সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনিও মস্তক নত করিয়া রহিলেন, তাঁহার নয়ন ছল ছল করিতেছিল।

অনেকক্ষণ পর হেমলতা নরেন্দ্রের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া বলিলেন, নরেন্দ্র!”

নরেন্দ্র দেখিলেন, হেমের মুখে আর উদ্বেগের চিহ্ন নাই, লজ্জার চিহ্ন নাই, মুখমণ্ডল নির্ম্মল ও পরিষ্কার, ধীরে ধীরে হেমলতা বলিলেন, “নরেন্দ্র!”

চতুস্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

মাধবীকঙ্কণ।

দেবালয়ের সমস্ত দীপ তখন নির্ব্বাণ হইয়াছে ও সমস্ত লোক সুপ্ত অথবা চলিয়া গিয়াছে। স্তম্ভ ও প্রকোষ্ঠের উপর সুন্দর চন্দ্রালোক পতিত হইয়াছে ও সারি সারি স্তম্ভচ্ছায়া ভূমিতে পতিত হইয়াছে। পার্শ্বে বিশাল যমুনানদী চন্দ্রকরে নিস্তব্ধে বহিয়া যাইতেছে, ও রহিয়া রহিয়া শীতল যমুনার বায়ু মন্দিরের ভিতর দিয়া গাইয়া যাইতেছে। সেই সুস্নিগ্ধ রজনীতে পবিত্র মন্দিরের একটী স্তম্ভচ্ছায়াতে নিস্তব্ধে নরেন্দ্র ও হেম বসিয়া রহিয়াছেন।

হেম স্থিরভাবে বলিলেন—

“নরেন্দ্র! অনেক দিন পর আমাদের দেখা হইয়াছে, আবার বোধ হয় অনেক দিন দেখা হইবে না, আমাদের মনের যা কথা আইস তাহাই কহি।

“নরেন্দ্র! বাল্যকালে আমরা দুই জনে গঙ্গাতীরে খেলা করিতাম, কত স্বপ্ন দেখিতাম; এক্ষণে তুমি সৈনিকের ব্রতে ব্রতী হইয়াছ, আমি পরের স্ত্রী; নরেন্দ্র, বাল্যকালের স্বপ্ন একেবারে বিস্মরণ হও।”

হেমলতা ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, আবার বলিলেন—

“বিধাতা যদি অন্যরূপ ঘটাইতেন, তবে আমাদের জীবন অন্যরূপ হইত, বাল্যকালের স্বপ্ন সফল হইত। কিন্তু নরেন্দ্র, আমরা যেন ভ্রমেও

বিধাতার নিন্দা না করি। যিনি তোমাকে পরাক্রম দিয়াছেন, যশ দিয়াছেন, তাঁহার নাম লও, অবশ্য তোমাকে সুখী করিবেন। যিনি আমাকে এই সংসারে স্থান দিয়াছেন, দেবতুল্য স্বামী দিয়াছেন, শৈবের ন্যায় ননন্দিনী দিয়াছেন, ধন দিয়াছেন, ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন, তিনি দয়ার সাগর, তাঁহাকে আমি প্রণাম করি।"

হেমলতা গলায় বস্ত্র দিয়া করযোড়ে বিশ্বের আদিপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও পবিত্র প্রেমরস ও শান্তি-রসে পরিপূর্ণ।

নরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া হেমলতার মুখের দিকে চাহিলেন, নিজ নয়ন হইতে অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন—

"হেমলতা, আমি এতদিন তোমাকে জানিতাম না. তুমি মানবী না দেবী? এরূপ সহিষ্ণুতা, এরূপ যথার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান আমি এ জগতে দেখি নাই, কখন দেখিব না।"

দুই জনে ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। হেমলতা আবার বলিতে লাগিলেন—

"নরেন্দ্র, আমি শুনিয়াছি তুমি অনেক যুদ্ধ করিয়াছ, অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছ, সকল দেশেই সুখ্যাতি লাভ করিয়াছ। তুমি পুণ্যাত্মা, জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন। কিন্তু যদি যুদ্ধে শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম আকাঙ্ক্ষা কর, বা যদি বিপদ বা দরিদ্রতায় পতিত হও, আবার বীর-নগরে যাইও, তুমি যাইলে সকলেই আহ্লাদিত হইবেন। আমার স্বামীর হৃদয় আমি জানি, তিনি তোমাকে কনিষ্ঠের ন্যায় ভালবাসেন, সর্ব্বদাই সস্নেহে তোমার কথা কহেন, তুমি যাইলে বড় আহ্লাদিত হইবেন।"

নরেন্দ্র নিস্তব্ধ হইয়াছিলেন; হেমের কথাগুলি তাঁহার কর্ণে অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনির ন্যায় বোধ হইতেছিল। তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ, তাঁহার নয়ন দুটীও পরিপূর্ণ। হেম আবার বলিতে লাগিলেন—

"আর শৈবলিনীও তুমি যাইলে কত আহ্লাদিত হইবেন, আর হেমলতা যত দিন জীবিত থাকিবে, কনিষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় তোমার সেবা শুশ্রূষা করিবে। ভাই নরেন! আমি তোমাকে যখন দেখিব তখনই আহ্লাদিত হইব।"

এই স্নেহবাক্য শুনিয়া নরেন্দ্রের চক্ষুতে আবার জল আসিল; আবার দুইজনে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

শেষে হেম ঈষৎ গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"নরেন্দ্র, আর একটী কথা আছে, কিছু মনে করিও না; আমি অভাগিনী, আমার দোষ গ্রহণ

করিও না। নরেন্দ্র, আমাদের বিদায়কালে প্রণয়চিহ্নস্বরূপ আমাকে একটী দ্রব্য দিয়াছিলে, সেটি পরিধান করিতে আমি অধিকারিণী নহি. নরেন্দ্র! সেটী ফিরিয়া লও।”

হেমলতা আপন হস্তের বস্ত্র তুলিয়া লইলেন, নরেন্দ্র দেখিলেন তিনি যে মাধবীকঙ্কণ দিয়াছিলেন তাহা এখনও রহিয়াছে। লতা শুষ্ক হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে ও অনেক স্থলে একেবারে চূর্ণ হইয়া ধূলিবৎ হইয়াছে, হেমলতা সেই অসংখ্য খণ্ডকে একে একে সূতার দ্বারা গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, অদ্য তাহাই পরিধান করিয়া আসিয়াছিলেন।

উভয়ের পূর্ব্বকথা মনে আসিতে লাগিল, উভয়ের হৃদয় বিষাদচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হইল, উভয়েই অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; নরেন্দ্র হেমলতার সেই সুন্দর বাহু ও সেই মাধবীকঙ্কণ দেখিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার নয়ন জলে পরিপূর্ণ হইল, আর দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে দর-বিগলিত ধারায় অশ্রুবারি পড়িয়া হেমলতার হস্ত ও বাহু সিক্ত করিল। অবশেষে নরেন্দ্র একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—

“হেম, তবে কি জীবনের জন্য আমাকে বিস্মরণ করিবে?”

হেম বলিলেন, “জীবন থাকিতে তোমাকে বিস্মৃত হইব না; চিরকাল সহোদরার ন্যায় তোমার কথা ভাবিব। কিন্তু এই কঙ্কণ অন্যরূপ প্রণয়ের চিহ্নস্বরূপ আমাকে দিয়াছিলে;—নরেন্দ্র, আমি সে প্রণয়ের অধিকারিণী নহি। নরেন্দ্র, মনে ক্লেশবোধ করিও না; আমি এই কয় বৎসর ঐ কঙ্কণটী পূজা করিয়াছি, হৃদয়ে রাখিয়াছি, উহা ত্যাগ করিতে আমার যত কষ্ট হইতেছে, নরেন, তাহা তুমি জান না। কিন্তু উটি উন্মোচন কর, উহাতে আমার অধিকার নাই; নরেন্দ্র, আমি অবিশ্বাসিনী পত্নী নহি।”

নরেন্দ্র আর কোন কথা কহিলেন না। নিঃশব্দে হেমলতার হস্ত হইতে সেই কঙ্কণ খুলিয়া লইলেন; তখন হেমলতা বলিলেন—

“নরেন্দ্র! আমি চলিলাম, তুমি ধর্ম্মপরায়ণ, বাল্যকাল হইতেই তোমার ধর্ম্মে আস্থা আছে, সে ধর্ম্ম কখনও বিস্মরণ করিও না, জগদীশ্বর তোমাকে সুখী রাখিবেন। তিনি যাহাকে যাহা করিয়াছেন, যেন আমরা সেইরূপ থাকিতেই চেষ্টা করি। পুষ্পটী দুই এক দিন সুগন্ধ বিস্তার করিয়া শুষ্ক হইয়া যায়, পক্ষীটী আলোকে প্রফুল্ল হইয়া গান করে, তাহাদের সেই কার্য্য। নরেন্দ্র, তুমি বীরপুরুষ, শত্রুকে জয় কর, দেশের মঙ্গল কর, পদাশ্রিত দীনের প্রতি দয়া করিও। আর ভগবান আমাকে দেবতুল্য

স্বামী দিয়াছেন, তিনি সহায় হউন, সেই স্বামীর সেবায় যেন আমি কখন না ত্রুটি করি, সেই স্বামীতে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে, আমি যেন তাঁহারই চিরপতিব্রতা দাসী হইয়া থাকি। নরেন্দ্র!—ভাই নরেন! বাল্যকালে তুমি আমাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছিলে, এই পবিত্র দেবমন্দিরে আবার সেই শিক্ষা দাও; এস ভাই আমরা প্রতিশ্রুত হই, ধর্ম্মপথ কখনও ত্যাগ করিব না; আমি জন্মে মরণে স্বামীর চিরদাসী থাকিব।” কথা সাঙ্গ করিয়া হেমলতা দেবপ্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে প্রণত হইল, নরেন্দ্রও নিঃশব্দে প্রণত হইলেন।

উঠিয়া আবার সযত্নে নরেন্দ্রের হাত ধরিয়া হেমলতা বলিল—“ভাই নরেন! এক্ষণ রাত্রি অধিক হইয়াছে, বিদায় দাও,—আমি চিরকাল তোমাকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় ভাল বাসিব, তুমিও তোমার কনিষ্ঠ ভগ্নীকে মনে রাখিও।” একবিন্দু জল নয়ন হইতে মোচন করিয়া হেমলতা ধীরে ধীরে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। যতক্ষণ দেখা যাইল নরেন্দ্র হেমের প্রতি চাহিয়া রহিলেন,—তাহার পর? তাহার পর এ জগতের মধ্যে নিতান্ত দুর্ভাগ্য লোকও নরেন্দ্রের সে রজনীর শোক ও বিষাদ দেখিলে বিষণ্ণ হইত। সে শোকের শেষ নাই, সে বিষাদের শান্তি নাই। অভাগার হৃদয় আজি শূন্য হইল, অভাগার সে দুঃখরোদন অবারিত, অলক্ষিত, অশান্তিপ্রদ।

পঞ্চত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

প্রয়াগের যুদ্ধ।

আমাদের আখ্যায়িকা শেষ হইল, কেবল আখ্যায়িকার নায়ক নায়িকাদিগের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে বাকি আছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শাসুজা বঙ্গদেশ হইতে দ্বিতীয়বার যুদ্ধার্থে আগমন করিতেছিলেন। শীতকালে প্রয়াগের নিকট সুজা ও আরংজীবের মধ্যে মহাযুদ্ধ হয়। দুই দিনের যুদ্ধের পর সুজা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। যশোবন্তসিংহ এই যুদ্ধে আরংজীবের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন, কিন্তু সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি মহাযোদ্ধার অধিক ক্ষতি করিতে পারিলেন না ক্ষোভে রাজস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সুজা প্রয়াগ হইতে পাটনা, পাটনা হইতে মুঙ্গের, মুঙ্গের হইতে রাজমহল এবং তথা হইতে গঙ্গা পার হইয়া তণ্ডায় পলায়ন করিলেন। আরংজীবের পুত্র মহম্মদ এবং সেনাপতি আমির জুমলা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন

করিতেছিলেন। তথায় মহম্মদ সুজার কন্যাকে বিবাহ করিয়া সুজার পক্ষাবলম্বন করিলেন, কিন্তু উভয়েই আমির জুমলার নিকট পরাস্ত হইলেন; মহম্মদ পিতার কপটপত্রে বিশ্বাস করিয়া সস্ত্রীক সুজার পক্ষ ত্যাগ করিলেন,—অভাগা সুজা আরাকানে পলায়ন করিলেন; তথাকার রাজার সহিত বিরোধ হওয়ায় সুজা সসৈন্যে হত হইলেন, তাঁহার কন্যাকে রাজা বিবাহ করিলেন; কথিত আছে সুজার রূপবতী সহধর্ম্মিণী প্যারীবানু বিষাদে আত্মহত্যা করিলেন। যিনি বিংশতি বৎসর বঙ্গদেশে সুশাসন করিয়াছিলেন, যিনি যুদ্ধে সাহস, শাসনে দয়া ও হিন্দুদিগের প্রতি বদান্যতার জন্য খ্যাত হইয়াছিলেন, যাঁহার রাজমহলের প্রাসাদ মর্ত্ত্যে ইন্দ্রপুরী ছিল ও দিবারাত্র আনন্দ-লহরীতে ভাসিত,—তিনি মৃত্যুকালে মস্তক রাখিবার স্থান পাইলেন না, বিদেশে শত্রুহস্তে সবংশে বিনষ্ট হইলেন।

দারা শ্যামনগর অথবা ফতেআবাদের যুদ্ধে পরাজয়ের পর সিন্ধুদেশে পলায়ন করিয়াছিলেন; আরংজীবের সৈন্য তথা হইতে দারাকে দিল্লী লইয়া আইসে। নৃশংস সম্রাট্ জ্যেষ্ঠকে যথেষ্ট অপমান করিয়া পরে হত্যা করেন। কারারুদ্ধ মোরাদও অচিরাৎ রাজাজ্ঞায় হত হইলেন। ভ্রাতৃরক্তে স্নাত হইয়া আরংজীব ভারতবর্ষের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

যেদিন মথুরায় হেমের সহিত নরেন্দ্রের সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহার পর নরেন্দ্র নিরুদ্দেশ হইলেন। হেমলতা বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নরেন্দ্রের অনেক অনুসন্ধান করাইলেন, মহানুভব শ্রীশচন্দ্র দেশে দেশে সংবাদ পাঠাইলেন যে, নরেন্দ্র ফিরিয়া আসিলেই তাঁহাকে তাঁহার পৈতৃক জমিদারীর অর্দ্ধ অংশ ছাড়িয়া দিবেন,—কিন্তু সেই দিনের পর নরেন্দ্রকে আর কেহ কোথাও দেখিতে পাইল না।

হেমলতা বীরনগরে শ্রীশচন্দ্রের সহিত বাস করিতে লাগিলেন; মথুরা-মন্দিরে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন হেম তাহা বিস্মৃত হয়েন নাই। পতি-সেবায় ধর্ম্মপরায়ণা হেমের অন্য চিন্তা তিরোহিত হইল, পতিভক্তি ভিন্ন ধর্ম্ম তিনি আর জানিতেন না। ক্রমে শ্রীশচন্দ্রের ঔরসে তাঁহার হেমন্ত-কুমারী ও সরযুবালা নামক দুইটী কন্যা ও প্রতাপ নামে একটী পুত্র জন্মিল; বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে নরেন্দ্র ও হেমলতা যেরূপ সায়ংকালে গঙ্গাতীরে খেলা করিত, বাষ্পোৎফুল্ল-লোচনে হেমলতা দেখিলেন, তাঁহার পুত্রকন্যাগণ সেইস্থানে সেইরূপে খেলা করিতেছে, দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, আনন্দধ্বনিতে চারিদিকের কুঞ্জবন প্রতিধ্বনিত করিতেছে। সংসারের এই গতি, একদল যাইতেছে, অন্যদল আসিতেছে! আহা! শিশুদিগের ললাট

পরিষ্কার, নয়ন উজ্জ্বল, মুখমণ্ডল চিন্তাশূন্য, এখনও মানবজীবনের চিন্তায় সে স্বর্গীয় অবয়ব অঙ্কিত হয় নাই।

হেমলতার বিবাহের প্রায় দশ বৎসর পর হেমলতা পুত্রকন্যাগুলিকে লইয়া একটী সন্ন্যাসীর আশ্রম দেখিতে গেলেন। বীরনগর হইতে কয়েক ক্রোশ দূর একটী প্রসিদ্ধ শিমুল বৃক্ষ ছিল। শিমুল বৃক্ষের গুঁড়ী হইতে প্রায়ই তিন দিকে তিনটী দেয়ালের মত বাহির হয়, এই বৃক্ষের সেই "দেয়াল" গুলি এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, যেন একটী উন্নত ঘরের ন্যায় হইয়াছিল। সেই অপরূপ বৃক্ষতলে একটী অপরূপ সন্ন্যাসী কয়েক বৎসর অবধি বাস করিতেছিলেন। পল্লীগ্রামস্থ গৃহিণী ও বালিকাগণ সস্নেহে সেই সন্ন্যাসীকে প্রত্যহ খাদ্য আনিয়া দিত, তাহাতেই তিনি জীবন-ধারণ করিতেন। সমস্ত দিন তিনি প্রায় ধ্যানে রত থাকিতেন, সায়ংকালে সেই গ্রামের ভিতর গৃহে গৃহে যাইতেন, বিধবাকে সান্ত্বনা করা, পীড়িতকে শুশ্রূষা করা, দুর্ব্বলকে সাহায্য করা, মানবের কষ্ট নিবারণ করা তাঁহার কার্য্য। গভীর রজনী পর্য্যন্ত এই কার্য্য করিয়া আবার তিনি সেই তরুগৃহে ফিরিয়া আসিতেন, তথায় ঘাসের উপর তিনি সকল কালে, বৃষ্টিতে, শীতে, গ্রীষ্মে সমান নিদ্রা যাইতেন। সেই তরুগৃহ ও সেই সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য অনেক দেশ হইতে অনেক লোক আসিত।

হেমলতা বৃক্ষের কিঞ্চিৎ দূরে নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন, ধীরে ধীরে পদব্রজে তরুর নিকটে যাইয়া সন্ন্যাসীর দিকে দেখিতে লাগিলেন। কি দেখিলেন জানি না, কিন্তু সে দিক্ হইতে নয়ন ফিরাইতে পারিলেন না, নিস্পন্দে দেখিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পরে সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি হেমলতার দিকে চাহিলেন, সহসা দণ্ডায়মান হইলেন। তীব্রদৃষ্টিতে হেমলতার দিকে আবার চাহিলেন, পরে ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া বলিলেন,—"পতিব্রতা হও। জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন।" সন্ন্যাসী সহসা মুখ ফিরাইলেন, বোধ হইল যেন নয়ন হইতে একবিন্দু বারি মুছিয়া ফেলিলেন; ধীরে ধীরে সেই তরু হইতে একটী জঙ্গলের দিকে চলিলেন, সেই জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন।

তাহার পর আর সে তরুতলে কেহ সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইল না। সন্ন্যাসী সে গ্রাম হইতে কোথায় চলিয়া গেল কেহ আর জানিতে পারিল না।

সমাপ্ত।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Street, Calcutta.

জীবন-প্রভাত।

বিজ্ঞানোৎসাহী, সংযতমনা, উদারচরিত্র,

কনিষ্ঠ-সহোদর, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দত্ত।

প্রিয় ভ্রাতঃ!

ইউরোপ হইতে তুমি যে নানা ভাষা ও নানা বিদ্যা আহরণ করিয়া আনিয়াছ, তাহা যখন চিন্তা করি তখনই আনন্দিত হই! কিন্তু তুমি ইহা অপেক্ষাও অমূল্য রত্নের অধিকারী! সে রত্ন, নির্ম্মল উদার চরিত্র, মনঃ-সংযমে অসাধারণ ক্ষমতা, বিজ্ঞানচর্চ্চায় আনন্দনীয় উৎসাহ ও জীবনব্যাপী চেষ্টা।

এই অসাধারণ সদ্গুণ সমূহদ্বারা স্বদেশের মঙ্গল সাধন কর, ভ্রাতার এই মঙ্গলেচ্ছা! ভ্রাতার জীবনব্যাপী স্নেহের সামান্য নিদর্শনস্বরূপ এই পুস্তকখানি তোমাকে অর্পণ করিতেছি।

কাটওয়া,
১৪ই মার্চ ১৮৭৯।

তোমার চিরস্নেহাভিলাষী
শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

জীবন প্রভাত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জীবন-উষা।

"দেও করতালি, জয় জয় বলি,
পূরিয়া অঞ্জলি কুসুম সহ।
ঐ যে প্রাচীতে, হাসিতে হাসিতে
উদয় অরুণ উষার সহ॥"

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

খ্রীষ্টের একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই গজনীর অধিপতি মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, ও সেই সময় হইতে দুইশত বৎসরের মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশই মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। সেই বিপুল ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্য অধিকার করিয়া মুসলমানেরা এক শতাব্দী ক্ষান্ত থাকিলেন, বিন্ধ্যাচল ও নর্ম্মদাস্বরূপ বিশাল প্রাচীর ও পরিখা পার হইবার সহসা কোন উদ্যম করেন নাই। অবশেষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে দিল্লীর যুবরাজ আলাউদ্দীন খিলজী অষ্ট সহস্র অশ্বারোহী সেনা সহিত নর্ম্মদানদী পার হইলেন ও খন্দেশ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া সহসা হিন্দু-রাজধানী দেবগড়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেবগড়ের রাজা সন্ধির প্রস্তাব করিতেছিলেন, এমত সময়ে রাজপুত্র বহুসংখ্যক্ সৈন্য লইয়া আলাউদ্দীনকে আক্রমণ করিলেন। তুমুল সংগ্রামে হিন্দুসেনা পরাস্ত হইল ও হিন্দুরাজা বহু অর্থ ও ইলিশপুর প্রদেশ দান করিয়া সন্ধি ক্রয় করিলেন। পরে আলাউদ্দীন দিল্লীর সম্রাট্ হইলে তাঁহার সেনাপতি মালীক কাফুর তিনবার দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন ও নর্ম্মদাতীর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করেন। তথাপি আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর কেবল দেবগড় ভিন্ন আর সমুদায় প্রদেশ পুনরায় হিন্দুদিগের হস্তগত হইল।

চতুর্দ্দশ খ্রীঃ শতাব্দীতে যখন টোগ্লক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁহার পুত্র যুনাস পুনরায় দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিয়া সমুদায় তৈলঙ্গ প্রদেশ অধিকার করেন (১৩২৩ খ্রীঃ), পরে মহম্মদ টোগ্লক নাম ধারণ করিয়া স্বয়ং দিল্লীর সম্রাট্ হইয়া রাজধানী দিল্লী হইতে দেবগড়ে আনিবার প্রয়াস পান। দেবগড়ের নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া দৌলতাবাদ রাখিলেন ও সমস্ত দিল্লীবাসিদিগকে তথায় যাইবার আদেশ দিলেন। পীড়া ও নানাস্থানে বিদ্রোহ কারণ যখন এই প্রয়াস নিষ্ফল হইল তখনও সম্রাট্ দাক্ষিণাত্য বিজয়ের বাঞ্ছা পরিত্যাগ কবিলেন না। সুতরাং দক্ষিণের হিন্দু ও মুসলমান সকলে বিরক্ত হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। তৈলঙ্গ প্রদেশ জয়ের পর সেই স্থানেব কতকগুলি হিন্দুনিবাসী বিজয়নগরে নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া একটী বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন (খ্রীঃ ১৩৩৫); ও জফীরখাঁ নামক একজন মুসলমান তৈলঙ্গের রাজার সহায়তায় দিল্লীর সেনাপতি উম্মাদউলমুলককে তুমুল সংগ্রামে পরাভূত করিয়া দৌলতাবাদে একটী স্বতন্ত্র মুসলমান রাজ্য স্থাপন করিলেন (খ্রীঃ ১৩৪৭)। কালক্রমে বিজয়নগর ও দৌলতাবাদ দাক্ষিণাত্যের মধ্যে দুইটী প্রধান রাজ্য হইয়া উঠিল ও প্রায় তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীর সম্রাট্গণ দাক্ষিণাত্য হস্তগত করিবাব আব কোনও চেষ্টা করেন নাই।

কিন্তু এই বিপদ্ হইতে নিস্তার পাইলেও দক্ষিণে হিন্দু-সাম্রাজ্য বিপদ্-শূন্য ছিল না। হিন্দুগণ গৃহের মধ্যে দৌলতাবাদস্বরূপ মুসলমান রাজ্যকে স্থান দিয়াছিলেন। সে সময়ে হিন্দুদিগের জাতীয় জীবন ক্ষীণ ও অবনতিশীল, বিজয়ী মুসলমানদিগের জাতীয় জীবন উন্নতিশীল ও প্রবল, সুতরাং একে অন্যের ধ্বংস সাধন করিল। কথিত আছে দৌলতাবাদের প্রথম রাজা জফীর খাঁ পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণের ক্রীতদাস ছিলেন, ব্রাহ্মণবালকের বুদ্ধিবল দেখিয়া তাহাকে স্বাধীন করিয়া দেন। পরে যখন জফীর খাঁ রাজা হইলেন তখন তিনি সেই ব্রাহ্মণকে আপন কোষাধ্যক্ষ করেন ও সেই কারণে জফীরের বংশ বাহমিনী (ব্রাহ্মণীয়) বংশ বলিয়া খ্যাত। কালক্রমে দৌলতাবাদ রাজ্য বর্দ্ধিতায়তন হইয়া খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইল, ও একটীর স্থানে বিজয়পুব, গলখন্দ ও আহম্মদনগর নামক তিনটী মুসলমান-রাজ্য হইয়া উঠিল। ১৫২৬ খ্রীঃ অব্দে বাহ্মিনী বংশ ও দৌলতাবাদ রাজ্য লোপপ্রাপ্ত হইল, ও মুসলমান রাজগণ একত্র হইয়া ১৫৬৪ খ্রীঃ অব্দে টেলিকোটা বা রক্ষিত গণ্ডীর যুদ্ধে বিজয়নগরের সৈন্য পরাস্ত করিয়া সেই হিন্দু-রাজ্যের লোপ সাধন করিলেন। দাক্ষিণাত্যে হিন্দু-স্বাধীনতা এক

প্রকার বিলুপ্ত হইল ও বিজয়পুর, গলখন্দ ও আহম্মদনগর নামক তিনটী মুসলমান-রাজ্য প্রবলপরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। কর্ণাট ও দ্রাবিড়ের হিন্দু-রাজগণও ক্রমে বিজয়পুর ও গলখন্দের অধীনতা স্বীকার করিলেন।

১৫৯০ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট্ আকবর পুনরায় সমগ্র দাক্ষিণাত্য দিল্লীর অধীনে আনিবার চেষ্টা করেন, ও তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই সমস্ত খন্দেশ ও আহম্মদ-নগর রাজ্যের অধিকাংশ দিল্লী-সৈন্যের হস্তগত হয়। তাঁহার পৌত্র শাহজিহান ১৬৩৬ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে সমগ্র আহম্মদনগর রাজ্য অধিকৃত করেন, সুতরাং আখ্যায়িকা বিবৃতকালে দাক্ষিণাত্যে কেবল বিজয়পুর ও গলখন্দ এই দুইটী পরাক্রান্ত স্বাধীন মুসলমান রাজ্য ছিল।

এই সমস্ত রাজবিপ্লবের মধ্যে দেশীয় লোকদিগের অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয়-দিগের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা আমাদিগের জানা আবশ্যক। মুসলমান-রাজ্যের অধীনে, অর্থাৎ প্রথমে দৌলতাবাদের, পর আহম্মদনগর বিজয়পুর ও গলখন্দের অধীনে হিন্দুদিগের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। বস্তুতঃ মুসলমানদিগের দেশশাসন-কার্য্য অনেকটা মহারাষ্ট্রীয় বুদ্ধিবলেই পরিচালিত হইত। প্রত্যেক রাজ্য কতকগুলি সরকারে, ও প্রত্যেক সরকার কতক-গুলি পরগণায় বিভক্ত ছিল, ও সেই সমস্ত সরকার ও পরগণায় কখন কখন মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইতেন, কিন্তু অধিক সময়ে মহারাষ্ট্রীয় কার্য্যকারিগণই কর আদায় করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করিতেন। মহারাষ্ট্র-দেশ পর্ব্বত-সঙ্কুল, ও সেই সমস্ত পর্ব্বতচূড়ায় অসংখ্য দুর্গ নির্ম্মিত ছিল। মুসলমান সুলতানগণ সেই সকল পর্ব্বত-দুর্গও মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে ন্যস্ত রাখিতে সঙ্কুচিত হইতেন না; কিল্লাদারগণ কখন কখন রাজকোষ হইতে বেতন পাইতেন, কখন বা চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমির জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া তাহারই আয় হইতে দুর্গরক্ষার জন্য আবশ্যকীয় ব্যয় করিতেন। এই সমস্ত কিল্লাদার ও দেশমুখ ভিন্ন মুসলমান সুলতানদিগের অধীনে অনেক হিন্দু-মনসবদার ছিলেন, তাঁহারা শত কি দ্বিশত কি পঞ্চশত কি সহস্র কি তদ-ধিক অশ্বারোহীর সেনাপতি, সুলতানের আদেশমতে সেই সেই পরিমাণ সৈন্য লইয়া যুদ্ধসময়ে উপস্থিত হইতে বাধ্য ছিলেন, ও সৈন্যের বেতন ও আবশ্যকীয় ব্যয়ের জন্য এক একটী জায়গীর ভোগ করিতেন। মহা-রাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী সেনা শীঘ্রগতিতে ও ত্বরিতযুদ্ধে অদ্বিতীয়, ও নিজ নিজ সুলতানদিগকে যুদ্ধসময়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন; সময়ে সময়ে তাঁহারা আপনামধ্যেও ঘোরতর বিবাদে লিপ্ত হইতেন। বিজয়পুরের সুলতানের অধীনে চন্দ্ররাও মোরে দ্বাদশ সহস্র পদাতিকের সেনাপতি ছিলেন ও

সুলতানের আদেশে নীরা ও বার্ণানদীর মধ্যবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। সুলতান পরিতুষ্ট হইয়া সেই দেশ চন্দ্ররাওকে অল্পমাত্র কর ধার্য্য করিয়া জায়গীর স্বরূপ দান করেন ও চন্দ্ররাওয়ের সন্ততিগণ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত রাজা খেতাবে সেই প্রদেশ স্বচ্ছন্দে সুশাসন করেন। এইরূপ রাওনায়েক নিম্বালকর বংশ পুরুষানুক্রমে ফল্‌তন দেশের দেশমুখ হইয়া সেই দেশ শাসন করেন। এইরূপে ঘাটিগী বংশ মল্লওরী প্রদেশে, মনয় বংশ মুখর প্রদেশে, ঘরপুরীয় বংশ কাপসী ও মুধোল দেশে, ডুফ্লে বংশ ঝট্টপ্রদেশে ও শবন্ত বংশ ওয়ারিপ্রদেশে অবস্থিতি করিয়া পুরুষানুক্রমে বিজয়পুরের সুলতানের কার্য্য সাধন করিতে থাকেন, ও সময়ে সময়ে বা আপনাদিগের মধ্যেই তুমুল সংগ্রাম করিতেন। জ্ঞাতিবিরোধের ন্যায় আর বিরোধ নাই; পর্ব্বতসঙ্কুল কঙ্কণ ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বকালেই স্থানীয় বড় বড় বংশে আত্মবিরোধ দৃষ্ট হইত, ও পর্ব্বতকন্দরে ও উর্ব্বরা উপত্যকায় সর্ব্বদাই মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইত। বহু শোণিতপাত হইলেও সেগুলি কুলক্ষণ নহে, সেগুলি সুলক্ষণ; পরিচালনার দ্বারায় আমাদের শরীর যেরূপ সুবদ্ধ ও দৃঢ়ীকৃত হয়, সর্ব্বদা কার্য্য ও উপদ্রব ও বিপর্য্যয় দ্বারা জাতীয় বল ও জাতীয় জীবন সেইরূপ রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হয়। এইরূপে মহারাষ্ট্রীয় জীবন-উষার প্রথম রক্তিমাচ্ছটা শিবজীর আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বেই ভারত-আকাশ রঞ্জিত করিয়াছিল।

আহম্মদনগরের সুলতানের অধীনে যাদবরাও ও ভনস্লে নামক দুইটী পরাক্রান্ত বংশ ছিল। সিন্ধুক্ষিরের যাদবরাওয়ের ন্যায় পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রবংশ সমস্ত মহারাষ্ট্র প্রদেশে আর কোথাও ছিল না, এবং অনেকে বিবেচনা করেন দেবগড়ের প্রাচীন হিন্দুরাজবংশ হইতেই এই পরাক্রান্ত বংশ উদ্ভূত। ষোড়শ খ্রীঃ শতাব্দীতে লক্ষজী যাদবরাও আহম্মদনগরের সুলতানের অধীনস্থ একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন; তিনি দশ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি ছিলেন ও প্রশস্ত জায়গীর ভোগ করিতেন। ভনস্লেবংশ যাদবরাওয়ের ন্যায় উন্নত না হইলেও একটী প্রধান ও ক্ষমতাশালী বংশ ছিল তাহার সন্দেহ নাই। এইস্থানে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে যাদবরাওয়ের বংশ হইতে শিবজীর মাতা ও ভনস্লে বংশ হইতে তাঁহার পিতা সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন।

উপন্যাসের প্রারম্ভে দেশের ইতিহাস ও লোকের আপন অবস্থা সংক্ষেপে বিবৃত হইল, তাহাতে বোধ হয় পাঠক মহাশয় বিরক্ত হইবেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রঘুনাথজী হাবিলদার।

"কাঞ্চন জিনিয়া তার অঙ্গের বরণ।
শ্রবণ তাহার দিব্য পঙ্কজ নয়ন॥
শ্রবণে কুণ্ডলযুগ্ম দীপ্ত দিনকর।
অভেদ্য কবচে আবরিল কলেবর॥
দুইদিকে দুই তূণ বামে ধরে ধনু।
আজানুলম্বিত ভুজ আনন্দিত তনু॥"

কাশীরাম দাস।

কঙ্কণপ্রদেশে বর্ষাকালে প্রকৃতি অপরূপ ভীষণ রূপ ধারণ করে; ১৬৬৩ খ্রীঃ অব্দে বসন্তকালেই একদিন সায়ংকালে সেই ঘোর ঘটা ও ভীষণ সৌন্দর্য্য যেন দশগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সূর্য্য এখন অস্ত যায় নাই, অথচ সমস্ত আকাশ দীর্ঘবিলম্বী অতিকৃষ্ণ মেঘরাশিতে আচ্ছন্ন ও চারিদিকে পর্ব্বতশ্রেণী ও অনন্ত অরণ্য দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। পর্ব্বতে, উপত্যকায়, অরণ্যমধ্যে, প্রান্তরে, আকাশ বা মেদিনীতে শব্দমাত্র নাই, যেন জগৎ অচিরে প্রচণ্ড বাত্যা আসিবে জানিয়া ভয়ে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। নিকটস্থ পর্ব্বতের উপর দিয়া গমনাগমনের পথগুলি, ঈষৎ দেখা যাইতেছে, দূরস্থ বিশাল পাদপাবৃত পর্ব্বতগুলি কেবল গাঢ়তর কৃষ্ণবর্ণ স্বরূপ দেখা যাইতেছে, আর বহু নীচে উপত্যকা একেবারে অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। পর্ব্বত-প্রবাহিণী জলপ্রপাতগুলি কোথাও রৌপ্য-গুচ্ছের ন্যায় দেখা যাইতেছে, কোথায় অন্ধকারে লীন হইয়া কেবল শব্দ-মাত্রে আপন পরিচয় দিতেছে।

সেই পর্ব্বতপথের উপর দিয়া একমাত্র অশ্বারোহী বেগে অশ্বচালন করিয়া যাইতেছিলেন। অশ্বের সমস্ত শরীর ফেনপূর্ণ ও ঘর্ম্মাক্ত, ও অশ্বারোহীর বেশ ধূলা ও কর্দ্দমময়, দেখিলেই বোধ হয় তিনি অনেক দূর হইতে আসিতেছেন। তাঁহার হস্তে বর্শা, কোষে অসি; বামহস্তে বল্গা ও বাম বাহুতে ঢাল, শরীর উজ্জ্বল লৌহবর্ম্মাচ্ছাদিত। পরিচ্ছদ ও উষ্ণীষ মহারাষ্ট্রদেশীয়। অশ্বারোহীর বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ হইবে, সচরাচর মহারাষ্ট্রীয়দিগের অপেক্ষা তাঁহার অবয়ব উন্নত ও বর্ণ গৌর, কিন্তু পরিশ্রমে বা রৌদ্রোত্তাপে এই বয়সেই তাঁহার মুখমণ্ডলের উজ্জ্বল বর্ণ কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ

হইয়াছে ও শরীর সুবদ্ধ ও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। যুবকের ললাট উন্নত, চক্ষুদ্বয় জ্যোতিঃপরিপূর্ণ, মুখমণ্ডল ঔদার্য্যব্যঞ্জক ও অতিশয় তেজঃপূর্ণ। যুবক অশ্বকে অল্প বিশ্রাম দিবার জন্য লম্ফ দিয়া ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন, বল্‌গা বৃক্ষোপরি নিক্ষেপ করিলেন, বর্শা বৃক্ষশাখায় হেলাইয়া রাখিলেন, ও হস্তদ্বারা ললাটের ঘর্ম্ম মোচন করিয়া ও নিবিড় কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ উন্নত প্রশস্ত ললাট হইতে পশ্চাৎ দিকে সরাইয়া ক্ষণেক আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আকাশের আকৃতি অতি ভয়ানক, অচিরাৎ তুমুল বাত্যা আসিবে তাহার সংশয় নাই। মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে আরম্ভ হইয়াছে এবং অনন্ত পর্ব্বত ও পাদপশ্রেণী হইতে গভীর শব্দ উত্থিত হইতেছে ও দুই একটী স্তিমিত মেঘগর্জ্জন শুনা যাইতেছে। যুবকের শুষ্ক ওষ্ঠে দুই এক বিন্দু বৃষ্টিজলও পতিত হইল। এ যাইবার সময় নহে, আকাশ পরিষ্কার হওয়া পর্য্যন্ত কোথাও অপেক্ষা করা উচিত। যুবকের চিন্তা করিবার সময় ছিল না; তিনি যে কার্য্যে আসিয়াছিলেন তাহাতে বিলম্ব সহে না, তিনি যে প্রভুর কার্য্য করিতেছেন তিনি কোন আপত্তি শুনেন না, যুবকেরও বিলম্ব বা আপত্তি করার অভ্যাস নাই। পুনরায় বর্শা হস্তে লইয়া লম্ফ দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠিলেন। তাঁহার অসি অশ্বপৃষ্ঠে ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল; আর এক মুহূর্ত্ত আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন, পরে পুনরায় তীরবেগে অশ্বচালন করিয়া সেই নিঃশব্দ পর্ব্বত-প্রদেশের সুপ্ত প্রতিধ্বনি জাগরিত করিয়া চলিলেন।

অল্পক্ষণমধ্যেই ভয়ানক বাত্যা আরম্ভ হইল। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুল্লতা চমকিত হইল, ও মেঘের গর্জ্জনে সেই অনন্ত পর্ব্বত-প্রদেশ যেন শত বার শব্দিত হইল। অচিরাৎ কোটী-রাক্ষস-বল বিদ্রূপ করিয়া ভীষণ গর্জ্জনে পবন প্রবাহিত হইল, ও যেন সেই অনন্ত পর্ব্বতকেও সমূলে আলোড়িত করিতে লাগিল। এককালে শত পর্ব্বতের অসংখ্য পাদপশ্রেণী হইতে কর্ণভেদী শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল, জলপ্রপাত ও পর্ব্বত-তরঙ্গিণীর জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ-আলোকে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রকৃতির এই ঘোর বিপ্লব দৃষ্ট হইতে লাগিল; ও মধ্যে মধ্যে দূরপ্রতিঘাতী বজ্র শব্দে জগৎ কম্পিত ও স্তব্ধ হইতে লাগিল। ত্বরায় মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িয়া পর্ব্বত অরণ্য ও উপত্যকা প্লাবিত করিল ও জলপ্রপাত ও তরঙ্গিণী সমুদয়কে স্ফীতকায় ও উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল।

অশ্বারোহী কিছুতেই প্রতিরুদ্ধ না হইয়া বেগে চলিতে লাগিলেন, সময়ে সময়ে বোধ হইল যেন অশ্ব ও অশ্বারোহী বায়ুবেগে পর্ব্বত হইতে সজোরে নীচে নিক্ষিপ্ত হইবেন, সময়ে সময়ে অন্ধকারে লম্ফ দিয়া জল-স্রোত পার হইবার সময় উভয়েই সেই কঠিন প্রস্তরের উপর পতিত হইলেন, ও এক স্থানে বায়ুপীড়িত বৃক্ষশাখার সজোর আঘাতে অশ্বারোহীর উষ্ণীষ ছিন্ন ভিন্ন হইল ও তাঁহার ললাট হইতে দুই এক বিন্দু রুধির পড়িতে লাগিল। তথাপি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে অপেক্ষা করা দুঃসাধ্য, সুতরাং যুবক মুহূর্ত্ত মাত্রও চিন্তা না করিয়া যত দূর সাধ্য সতর্কভাবে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিন চারি দণ্ড মুষলধারায় বৃষ্টি হওয়াতে আকাশ পরিষ্কার হইতে লাগিল, ও অচিরাৎ বৃষ্টি থামিয়া গেল, ও অস্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্য্যের আলোকে সেই পর্ব্বতরাশি ও নবস্নাত বৃক্ষসমূহের চমৎকার শোভা দৃষ্ট হইল। যুবক দুর্গে উপস্থিত হইয়া একবার অশ্ব থামাইলেন ও সিক্ত কেশগুচ্ছ পুনরায় সুন্দর প্রশস্ত ললাট হইতে অপসৃত করিয়া নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সে শোভা অনির্ব্বচনীয়! পর্ব্বতশ্রেণীর পর পর্ব্বতশ্রেণী, যত দূর দেখা যায় দুই তিন সহস্র হস্ত উন্নত শিখরগুলি ক্রমান্বয়ে দেখা যাইতেছে, ও সেই পর্ব্বতশ্রেণীর পার্শ্বে, মস্তকে, চারিদিকে, নবস্নাত নিবিড় হরিদ্বর্ণ অনন্ত পাদপশ্রেণী সূর্য্যালোকে চিক্ চিক্ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে জলপ্রপাত শত গুণ স্ফীতকায় হইয়া বর্দ্ধিত গৌরবে শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে নৃত্য করিতেছে, ও সূর্য্যের সুবর্ণ রশ্মিতে বড় সুন্দর ক্রীড়া করিতেছে। প্রতি পর্ব্বত ও শিখরের উপর সূর্য্যরশ্মি নানারূপ বর্ণ ধারণ করিয়াছে, স্থানে স্থানে জল-প্রপাতের উপর রামধনু খেলা করিতেছে, আকাশে প্রকাণ্ড ধনু নানাবর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে ও বহুদূরে বায়ুদ্বারা মেঘ তাড়িত হইয়া বৃষ্টিরূপে গলিত হইতেছে তাহাও দেখা যাইতেছে।

যুবক ক্ষণমাত্র এই শোভায় মুগ্ধ রহিলেন; পরে সূর্য্যের দিকে অবলোকন করিয়া শীঘ্র দুর্গের উপর উঠিতে লাগিলেন। অচিরে আপন পরিচয় দিয়া দুর্গপ্রবেশ করিলেন; দ্বারের ভিতর যাইলেন ও পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন সূর্য্য অস্ত হইতেছে। অমনি ঝন্‌ঝনা শব্দে দুর্গদ্বার রুদ্ধ হইল।

দ্বাররক্ষকগণ দ্বার বদ্ধ করিয়া যুবকের দিকে চাহিয়া কহিলেন—

"অধিক সকালে পঁহুছেন নাই; আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে অদ্য রাত্রি প্রাচীরের বাহিরে অতিবাহিত করিতে হইত।"

যুবক সহাস্যে উত্তর করিলেন, "সেই এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় নাই; ভবানীর প্রসাদে প্রভুর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা রাখিব, অদ্যই কিল্লাদারের নিকট প্রভুর আদেশ জানাইতে পারিব।"

দ্বাররক্ষক। "কিল্লাদারও আপনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

"তবে চলিলাম" বলিয়া যবক রাজগহের দিকে প্রস্থান করিলেন।

অনুমতি পাইয়া যুবক কিল্লাদারের প্রাসাদে যাইলেন ও সম্যক্ অভিবাদন করিয়া নিজ কটিদেশ হইতে বন্ধন খুলিয়া কতকগুলি লিপি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। কিল্লাদার মাউলীজাতীয় একজন শিবজীর বিশ্বস্ত যোদ্ধা, তিনি লিপিগুলি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, দূতের দিকে না চাহিয়াই মনোনিবেশ পূর্ব্বক সেইগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন।

দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধারম্ভ। যুদ্ধের আধুনিক অবস্থা, কিরূপে কিল্লাদার শিবজীর বিশেষরূপে সহায়তা করিতে পারেন ও কোন্ বিষয়ে শিবজীর কি কি আদেশ, লিপি পাঠে সমস্ত অবগত হইলেন। অনেকক্ষণ সেই লিপি পাঠ করিয়া কিল্লাদার অবশেষে পত্রবাহকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবকের বালকোচিত সরল ও উদার মুখমণ্ডল ও আনয়নবিলম্বী গুচ্ছ গুচ্ছ নিবিড় কৃষ্ণ কেশ, অথচ সুদৃঢ় উন্নত অবয়ব ও প্রশস্ত ললাট দেখিয়া কিল্লাদার একবার চকিত হইলেন, লিপির দিকে দেখিলেন আবার বালক বা যুবার দিকে মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণ নয়নদ্বয় উঠাইলেন। অবশেষে বলিলেন, "হাবিলদার! তোমার নাম রঘুনাথজী? তুমি জাতিতে রাজপুত?"

রঘুনাথজী বিনীতভাবে শির নমাইয়া প্রশ্নের উত্তর করিলেন।

কিল্লাদার। "তুমি আকৃতি ও বয়সে বালক মাত্র।" (ঈষৎ ক্রোধে রঘুনাথজীর নয়ন উজ্জ্বল হইল; দেখিয়া কিল্লাদার ধীরে ধীরে বলিলেন) "কিন্তু বিবেচনা করি কার্য্যকালে পরাঙ্মুখ নহ।"

রঘুনাথজী ঈষৎ ক্রোধকম্পিতস্বরে অথচ নম্রভাবে বলিলেন, "যত্ন ও চেষ্টামাত্র মনুষ্যসাধ্য, বোধ হয় তাহাতে প্রভু আমার ত্রুটি দেখেন নাই; সিদ্ধি ভবানীর ইচ্ছাধীন।"

কিল্লাদার। "তুমি সিংহগড় হইতে তোরণ দুর্গে এত শীঘ্র আসিলে কিরূপে?"

স্থিরস্বরে যুবক উত্তর করিলেন, "প্রভুর নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম।"

কিল্লাদার এই উত্তরে পরিতুষ্ট হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "জিজ্ঞাসা অনাবশ্যক, তোমার আকৃতিতেই কার্য্যসাধনে তোমার যেরূপ যত্ন তাহার পরিচয় দিতেছে।" রঘুনাথজীর সমস্ত বস্ত্র ও শরীর এখনও সিক্ত ও ললাটের ঈষৎ ক্ষত দেখা যাইতেছিল।

পরে কিল্লাদার সিংহগড়ের ও পুনার, সমস্ত অবস্থা ও মহারাষ্ট্রীয় ও মোগল ও রাজপুতসেনার অবস্থা ও সংখ্যা তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রঘুনাথজী যতদূর পারিলেন উত্তর দিলেন।

কিল্লাদার বলিলেন, "তবে কল্য প্রাতে আমার নিকট আসিও, আমার পত্রাদি প্রস্তুত থাকিবে; আর শিবজীকে আমার নাম করিয়া জানাইও, যে তিনি যে তরুণ হাবিলদারকে এই বিষম কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন সে হাবিলদার-কার্য্যের অনুপযুক্ত নহে।" এই প্রশংসাবাক্যে রঘুনাথ মস্তক নত করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন।

রঘুনাথজী বিদায় পাইয়া চলিয়া গেলেন। রঘুনাথকে এরূপ পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য এই যে, কিল্লাদার শিবজীকে অতিশয় গূঢ় রাজকীয় সংবাদ ও কতকগুলি গূঢ় মন্ত্রণা পাঠাইবার মানস করিতেছিলেন। সেগুলি সমস্ত লিপিদ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, লিপি শত্রুহস্তে পড়িতে পারে। রঘুনাথজীকে সেগুলি বাচনিক বলা যাইতে পারে কি না, অর্থবলে বা কোন উপায়ে শত্রুর বশবর্ত্তী হইয়া গূঢ় মন্ত্রণা শত্রুর নিকট প্রকাশ করা রঘুনাথের পক্ষে সম্ভব কি না, কিল্লাদার তাহাই পরীক্ষা করিতেছিলেন, পরীক্ষা শেষ হইল। রঘুনাথ নয়নপথের বহির্ভূত হইলে পর কিল্লাদার ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "শিবজী এবিষয়ে অসাধারণ পণ্ডিত, উপযুক্ত কার্য্যে যথার্থই উপযুক্ত লোক পাঠাইয়াছেন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সরযুবালা।

"——————————সজনি! ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঙ্গে তড়িতলতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল॥
আধ আঁচল খসি, আধবদনে হাসি, আধই নয়ন তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি, আধ আচর ভরি, তব ধরি দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা কনয় কটোরা অতনু কাঁচল উপাম।
হরি হরি কহ মন, জনু বুঝি ঐছন ফাস পসারল কাম॥
দশন মুকুতাপাঁতি অধর মিলায়ত মৃদু মৃদু কহ তাহি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ, অতবে সে দুঃখ রহ, হেরি হেরি না পূরাল আশা॥"

বিদ্যাপতি।

রঘুনাথ কিল্লাদারের নিকট বিদায় পাইয়া ভবানীদেবীর মন্দিরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। এই দুর্গজয়ের অল্পদিন পরই শিবজী ভবানীর একটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ও অম্বরদেশীয় অতি উচ্চকুলোদ্ভব এক ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া দেবসেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে এই দেবীর পূজা না দিয়া কোনও কার্য্যে লিপ্ত হইতেন না, দেবীকে পূজা দেওয়া ও পুরোহিতের নিকট যুদ্ধের ফলাফল জানাই রঘুনাথকে পাঠাইবার অন্যতম উদ্দেশ্য।

রঘুনাথ যৌবনোচিত উল্লাসের সহিত আপন কৃষ্ণকেশগুলি নাচাইতে নাচাইতে একটী যুদ্ধগীত মৃদুস্বরে গাইতে গাইতে মন্দিরাভিমুখে আসিতেছিলেন; মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলে, মন্দিরপার্শ্বস্থ ছাদে সহসা তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি দণ্ডায়মান হইলেন, সহসা তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইল! দেখিলেন সেই ছাদে একজন অনুপম লাবণ্যময়ী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা একাকী আসীনা রহিয়াছেন, হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া অস্তাচলের রক্তিমা শোভা অনিমেষে দৃষ্টি করিতেছেন। কন্যার রেশমবিনিন্দিত সুমার্জ্জিত অতি কৃষ্ণকেশপাশ গণ্ডস্থলে, হস্তোপরি ও পৃষ্ঠদেশে লম্বিত রহিয়াছে ও উজ্জ্বল মুখমণ্ডল ও ভ্রমরবিনিন্দিত চক্ষুদ্বয় কিঞ্চিৎ আবৃত করিয়াছে। ভ্রূযুগল যেন তুলিদ্বারা লিখিত, কি সুন্দর বক্রভাবে ললাটের শোভা সাধন করিতেছে! ওষ্ঠদ্বয় সূক্ষ্ম ও রক্তবর্ণ, উন্মত্তপ্রায় হইয়া রঘুনাথ সেই ওষ্ঠদ্বয়ের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। হস্ত ও বাহু সুগোল ও অতিশয় গৌরবর্ণ, ও সুবর্ণের বলয় ও কঙ্কণদ্বারা সুশোভিত।

কন্যার ললাটে আকাশের রক্তিমাটচ্ছা পতিত হইয়া সেই তপ্তকাঞ্চন বর্ণকে সমধিক উজ্জ্বল করিতেছে। কণ্ঠ ও ঈষদুন্নত বক্ষঃস্থলের উপর একটী কণ্ঠমালা দোদুল্যমান রহিয়াছে। 'রঘুনাথ! রঘুনাথ! সাবধান! তুমি রাজকার্য্যে আসিয়াছ, তুমি দরিদ্র, একজন সৈন্যমাত্র, ওদিকে চাহিও না, ওপথে যাইও না! রঘুনাথ এ সকল বিবেচনা করিতেছিলেন না, তিনি মুগ্ধের ন্যায় অনিমেষলোচনে সেই সায়ংকালের আকাশপটে অঙ্কিত অনুপম ছবির দিকে চাহিয়াছিলেন; তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইতেছিল, পূর্ব্বে যে ভাব কখনও জানেন নাই, অদ্য সহসা সেই নব ভাবের উদ্রেকে হৃদয় মুহুর্ম্মুহুঃ সজোরে আহত হইতেছিল; সময়ে সময়ে একটী দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইতেছিল। যৌবনপ্রারম্ভে প্রথম প্রেমের দুর্দ্দমনীয় বেগে তাঁহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছিল, রঘুনাথ উন্মত্তপ্রায়!

যতক্ষণ দেখা গেল, রঘুনাথ প্রস্তরবৎ অচল হইয়া সেই সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বৈকালিক আকাশ-শোভা ক্রমে লীন হইয়া গেল, সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইয়া সেই প্রতিমূর্ত্তির উপর পড়িতে লাগিল, রঘুনাথ তখনও দণ্ডায়মান!

সন্ধ্যার সময় কন্যা গৃহে যাইবার জন্য উঠিলেন, দেখিলেন অনতিদূরে একজন দীর্ঘকায় অতি সুগঠন যুবক দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার দিকে অনিমেষলোচনে দেখিতেছেন। ঈষৎ লজ্জায় কন্যার মুখ রঞ্জিত হইল, তিনি মুখ অবনত করিলেন। আবার চাহিয়া দেখিলেন, যুবক সেইরূপ বক্ষের উপর বামহস্ত স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ যুবকের উন্নত ললাট ও জ্যোতিঃপূর্ণ নয়নদ্বয় আবৃত করিয়াছে, কোষে খড়্গ, দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ বর্শা, ও অনিমেষলোচনে তখনও তাঁহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। মুহূর্ত্তের জন্য রমণীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, তাঁহার মুখমণ্ডল লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; তৎক্ষণাৎ মস্তকে অবগুণ্ঠন দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তখন রঘুনাথ যেন চৈতন্যপ্রাপ্ত হইলেন, ললাট হইতে দুই এক বিন্দু স্বেদ মোচন করিলেন, মন্দিরের পুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ধীরে ধীরে চিন্তিতভাবে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, ও পুরোহিতের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে আমরা পুরোহিতের পরিচয় দিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরোহিত অম্বরদেশীয় উচ্চকুলোদ্ভব রাজপুত ব্রাহ্মণ, তাঁহার নাম জনার্দ্দন দেব। তিনি অম্বরের রাজা প্রসিদ্ধ জয়সিংহের এক-

জন সভাসদ্ ছিলেন, ও শিবজীর বহু অনুরোধে, জয়সিংহের অনুমত্যনুসারে শিবজীর সর্ব্বপ্রথম বিজিত তোরণদুর্গে আগমন করেন। তাঁহার পুত্রকন্যা কেহই ছিল না, কিন্তু স্বদেশত্যাগের অচিরকাল পূর্ব্বেই তিনি এক ক্ষত্রিয়কন্যার লালনপালনের ভার লইয়াছিলেন। কন্যার পিতা জনার্দ্দনের আশৈশব পরমবন্ধু ছিলেন; কন্যার মাতাও জনার্দ্দনের স্ত্রীকে ভগিনী সম্বোধন করিতেন। সহসা উভয় পিতামাতার কাল হওয়ায় নিঃসন্তান জনার্দ্দন ও তাঁহার গৃহিণী ঐ শিশু ক্ষত্রিয়বালার লালনপালনভার লইলেন; ও তোরণদুর্গে আসিয়া সেই শিশুকে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন।

পরে জনার্দ্দনের স্ত্রীর কাল হইলে কন্যা সরযু ভিন্ন বৃদ্ধের স্নেহের দ্রব্য আর কেহ রহিল না; সরযুবালাও জনার্দ্দনকে পিতা বলিয়া ডাকিতেন ও ভাল বাসিতেন। কালক্রমে সরযুবালা নিরুপমা লাবণ্যবতী হইয়া উঠিলেন, সুতরাং দুর্গের সকলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ জনার্দ্দনকে কণ্বমুনি ও তাঁহার পালিতা নিরুপমা লাবণ্যময়ী ক্ষত্রিয়বালাকে শকুন্তলা বলিয়া পরিহাস করিতেন। জনার্দ্দনও কন্যার সৌন্দর্য্য ও স্নেহে পরিতুষ্ট হইয়া রাজস্থান হইতে নির্ব্বাসনের দুঃখও বিস্মৃত হইলেন।

দেবালয়ে রঘুনাথ কতক্ষণ অপেক্ষা করিলে পর জনার্দ্দন দেব-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ হইয়াছে, অবয়ব দীর্ঘ ও এক্ষণও বলিষ্ঠ, চক্ষুর্দ্বয় শান্তিরসপূর্ণ ও শ্বেতশ্মশ্রু বিশাল বক্ষঃস্থল আবরণ করিয়াছে। জনার্দ্দনের বর্ণ গৌর, স্কন্ধ হইতে যজ্ঞোপবীত লম্বিত রহিয়াছে। পূজকের পবিত্র শান্তিপূর্ণ মন ও বালকের ন্যায় সরল হৃদয় জনার্দ্দনের মুখ দেখিলেই বোধগম্য হইত। জনার্দ্দন ধীরে ধীরে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া রঘুনাথ সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

সংক্ষেপে মিষ্টালাপ করিয়া উভয়ে আসন গ্রহণ করিলেন ও জনার্দ্দন শিবজীর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। রঘুনাথ যতদূর পারিলেন যুদ্ধের বিবরণ বলিলেন, ও শিবজীর প্রণাম জানাইয়া পূজকের হস্তে কয়েকটী সুবর্ণমুদ্রা দিয়া বলিলেন—

"প্রভুর প্রার্থনা যে তিনি এক্ষণে মোগলদিগের সহিত যে তুমুল রণে নিযুক্ত হইয়াছেন তাহাতে আপনি তাঁহার জয়ের জন্য ভবানীর নিকট পূজা করিবেন। দেবীপ্রসাদ ভিন্ন মনুষ্যচেষ্টা বৃথা।"

জনার্দ্দন তাঁহার নৈসর্গিক স্থির গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন—"সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য মাদৃশ লোকের চিরকালই যত্ন করা বিধেয়, সেই ধর্ম্মের

প্রহরীস্বরূপ শিবজীর বিজয়ের জন্য অবশ্যই পূজা দিব। মহাত্মাকে জানাইও সে বিষয়ে ত্রুটি করিব না।”

রঘুনাথ। “প্রভুর দেবীপদে আর একটী আবেদন আছে। তিনি ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার ফলাফল কথঞ্চিৎ পূর্ব্বে জানিবার আকাঙ্ক্ষা করেন। ভবাদৃশ দূরদর্শী দৈবজ্ঞ এবিষয়ে অবশ্যই তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারেন।”

জনার্দ্দন ক্ষণেক চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন, পরে পুনরায় আপন গম্ভীরস্বরে বলিলেন—

“রজনীযোগে দেবীপদে শিবজীর বাসনা জানাইব, কল্য প্রাতে উত্তর জানিতে পারিবে।”

রঘুনাথ ধন্যবাদ করিয়া বিদায় হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন এমন সময়ে জনার্দ্দন বলিলেন—

“তোমাকে পূর্ব্বে এই দুর্গে দেখি নাই, অদ্য কি প্রথমে এস্থলে আসিয়াছ?”

রঘু। “অদ্যই আসিয়াছি।”

জনা। “দুর্গে কাহারও সহিত পরিচয় আছে? থাকিবার স্থল আছে?”

রঘু। “পরিচয় নাই, কিন্তু কোন এক স্থানে রজনী অতিবাহিত করিব, কল্য প্রাতেই চলিয়া যাইব।”

জনা। “কিজন্য অনর্থক ক্লেশ সহ্য করিবে?”

রঘু। “প্রভুর অনুগ্রহে কোন ক্লেশ হইবে না, আমাদের সর্ব্বদাই এরূপে রাত্রি অতিবাহিত করিতে হয়।”

যুবকের এইরূপ কথা শুনিয়া ও সরল উদার আকৃতি দর্শনে জনার্দ্দনের অন্তঃকরণে বাৎসল্যের উদ্রেক হইল, বলিলেন—

“বৎস! যুদ্ধসময়ে ক্লেশ অনিবার্য্য, কিন্তু অদ্য ক্লেশ সহনের কোন আবশ্যকতা নাই। আমার এই দেবালয়ে অবস্থিতি কর, আমার পালিতা রাজপূতবালা তোমার খাদ্যের আয়োজন করিয়া দিবে। পরে রাত্রে বিশ্রাম করিয়া কল্য দেবীর আজ্ঞা শিবজীর নিকট লইয়া যাইবে।”

রঘুনাথজীর বক্ষঃস্থল সহসা স্ফীত হইল, তাঁহার হৃদয়ে যেন কে সজোরে আঘাত করিল। এটী যাতনা না আনন্দের উদ্বেগ? রাজপুতবালা কে? সে কি সেই সায়ংকালীন আকাশপটে অঙ্কিত মনোহর চিত্র? রজনীর আগমনে আকাশপট হইতে সে চিত্র লীন হইয়াছে, কিন্তু রঘুনাথের হৃদয়পট হইতে সে আনন্দময়ী মূর্ত্তি কখন—কখন—কখনই লীন হইবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কণ্ঠমালা।

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

ভারতচন্দ্র রায়।

রজনী প্রায় এক প্রহর হইলে সরযুবালা পিতার আদেশে অতিথির খাদ্যের আয়োজন করিয়া দিলেন, রঘুনাথ আসন গ্রহণ করিলেন, সরযু পশ্চাতে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহারাষ্ট্রদেশে অদ্যাবধি আহূত ব্যক্তিকে পরিবারের মধ্যে কোন এক জন রমণী আসিয়া ভোজন করাইবার রীতি আছে।

রঘুনাথ বসিলেন, কিন্তু ভোজন দূরে থাক, চিত্তসংযম করিতে পারিলেন না। শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত আধারে সরযু মিষ্ট সরবৎ আনিয়া দিলেন, রঘুনাথ পাত্রধারিণীর দিকে সোদ্বেগচিত্তে চাহিলেন, যেন তাঁহার জীবন, প্রাণ, দৃষ্টির সহিত হইয়া সেই কন্যার দিকে ধাবমান হইল! চারি চক্ষুর মিলন হইল, অমনি সরযুর মুখমণ্ডল লজ্জায় রক্তবর্ণ হইল, লজ্জাবতী চক্ষু মুদিত করিয়া মুখ অবনত করিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেলেন। রঘুনাথও যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া অধোবদন হইলেন।

পুনরায় সরযু আর একটী পাত্র আনিলেন, রঘুনাথ বর্ব্বর নহেন, এবার তিনি মুখ অবনত করিয়া রাখিলেন, কেবল সরযুর সুন্দর সুবর্ণ বলয়-বিজড়িত হস্ত ও কঙ্কণ-বিজড়িত সুগোল বাহুমাত্র দেখিতে পাইলেন; অগত্যা হৃদয় স্ফীত হইল, একটী দীর্ঘনিশ্বাস বহির্গত হইল। সরযু তাহা শুনিতে পাইলেন, তাঁহার হস্ত ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল, তিনি ধীরে ধীরে পার্শ্বে সরিয়া গেলেন।

ভোজন সাঙ্গ হইল। রঘুনাথের শয্যারচনা হইল, রঘুনাথ দীপ নির্ব্বাণ করিলেন, শয়ন করিলেন না, ঘরের দ্বার ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটন করিয়া নক্ষত্রালোকে ছাদে পদচারণ করিতে লাগিলেন।

সেই গম্ভীর অন্ধকারে নক্ষত্র-বিভূষিত নৈশ আকাশের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া অল্পবয়স্ক যোদ্ধা কি চিন্তা করিতেছেন? নিশার ছায়া ক্রমে গভীরতর হইতেছে, সেই সুস্নিগ্ধ ছায়ায় মনুষ্য, জীব, জন্তু, সমগ্র জগৎ সুপ্ত হইয়াছে, দুর্গে শব্দমাত্র নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে প্রহরিগণের শব্দ শুনা যাইতেছে ও প্রহরে প্রহরে ঘণ্টারব সেই নিস্তব্ধ দুর্গে ও চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতে

প্রতিহত হইতেছে। এ গভীর অন্ধকার রজনীতে রঘুনাথ অনিদ্র হইয়া কি চিন্তা করিতেছেন?

রঘুনাথের জীবনের এই প্রথম গভীর চিন্তা, এই হৃদয়ের প্রথম ভীষণ উদ্বেগ, এ চিন্তা এ উদ্বেগ রজনীর মধ্যে শেষ হইবার নহে, চিরজীবনে কি শেষ হইবে? এতদিন রঘুনাথ বালক ছিলেন, অদ্য যেন সহসা তাঁহার শান্ত, নীল, জীবনাকাশের উপরি দিয়া বিদ্যুৎরূপিণী একটী প্রতিমূর্ত্তি সরিয়া গেল, রঘুনাথের নয়ন, হৃদয় ঝল্‌সিয়া গেল, তাঁহার সুপ্ত চিন্তা, উদ্বেগ ও সহস্র বেগবতী মনোবৃত্তি সহসা জাগরিত হইল। শত সহস্রবার সেই আনন্দময়ী মূর্ত্তি মনে আসিতে লাগিল, সেই আলেখ্য-লিখিত ভ্রূযুগল, সেই ভ্রমর-কৃষ্ণ উজ্জ্বল চক্ষু, সেই পুষ্পনিন্দিত মধুময় ওষ্ঠ দুইটী, সেই নিবিড় কেশপাশ, সেই সুগোল বাহুযুগল মনে জাগরিত হইতে লাগিল, আর রঘুনাথ উন্মত্ত হইয়া সেই চিত্রের দিকে দেখিতে লাগিলেন। এই আনন্দময়ী কন্যা কি তিনি লাভ করিতে পারিবেন? এই আয়ত স্নেহপূর্ণ নয়ন, এই জবানিন্দিত ওষ্ঠ, এই চিত্তহারী অতুল লাবণ্য, রঘুনাথ! কি তোমার হইবে? তুমি একজন সামান্য হাবিলদার মাত্র, জনার্দ্দন অতি উচ্চকুলোদ্ভব রাজপুত, তাঁহার পালিত কন্যা রাজাদিগেরও প্রার্থনীয়া! কিজন্য এরূপ আশায় হৃদয় বৃথা ব্যথিত করিতেছ? রঘুনাথ! এ বৃথা তৃষ্ণায় কেন হৃদয় দগ্ধ করিতেছ?

দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা বাজিল, কিন্তু রঘুনাথের এ বিষম চিন্তা শেষ হইল না। হস্তে গণ্ডস্থাপন করিয়া একাকী নিঃশব্দে সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। এই শান্ত রজনীতে তাঁহার হৃদয়ে কি প্রলয়ের ঝটিকা বহিতেছে!

কিন্তু যৌবনকালে আশাই বলবতী হয়, শীঘ্র আমাদের নৈরাশ হয় না, অসাধ্যও আমরা সাধ্য বিবেচনা করি, অসম্ভবও সম্ভব বোধ হয়। রঘুনাথ আকাশের দিকে চাহিয়া, চাহিয়া চাহিয়া অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিতেছিলেন, অনেকক্ষণ পর সহসা দণ্ডায়মান হইলেন, আপন হৃদয়ের উপর উভয় বাহু স্থাপন করিয়া সগর্ব্বে ক্ষণেক দণ্ডায়মান রহিলেন, মনে মনে বলিলেন—

"ভগবন্, সহায় হও, অবশ্য কৃতকার্য্য হইব; যশ, মান, খ্যাতি, মনুষ্য-সাধ্য, কিজন্য আমার অসাধ্য হইবে? আমার শরীর কি অন্য অপেক্ষা ক্ষীণ? বাহু কি অন্য অপেক্ষা দুর্ব্বল? * * "দেখিব এই পণ রাখিতে পারি কি না।" * * "তাহার পর? যদি কৃতকার্য্য হই তাহা হইলে সরযু! আমি তোমার অযোগ্য হইব না; তখন সরযু! তোমাকে গল্পচ্ছলে

অদ্যকার এই সকল কথা বলিব, তখন তোমার সুন্দর হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া স্বর্গসুখ তুচ্ছ করিব, তখন স্বহস্তে ঐ সুন্দর কেশপাশে মুক্তামালা জড়াইয়া দিব, আর ঐ সুন্দর বিম্ববিনিন্দিত ওষ্ঠদ্বয়———” রঘুনাথ! রঘুনাথ! উন্মত্ত হইও না।

তখন রঘনাথ কথঞ্চিৎ শান্ত-হৃদয়ে শয়ন করিতে আসিলেন। গৃহের ভিতর না যাইয়া সেই ছাদের যেস্থানে পূর্ব্বদিন সরযু বসিয়াছিলেন সেই-স্থানে শয়ন করিতে আসিলেন। দেখিলেন—কি দেখিলেন? দেখিলেন একটী কণ্ঠমালা পড়িয়া রহিয়াছে; দুইটী করিয়া মুক্তা পরে একটী করিয়া পলা,—রঘুনাথ সে মালা চিনিলেন। সেই মালা পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে সরযু কণ্ঠে ও বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াছিলেন, বোধ হয় অসাবধানতা বশতঃ ঐস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। রঘুনাথ আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ভগবন্ একি আমার আশা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বলক্ষণ দান করিলেন?” শত সহস্রবার সেই মালা চুম্বন করিয়া পরে পরিধেয় কুর্ত্তীর নীচে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন। পরে অচিরাৎ সেইস্থানেই নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কিন্তু সে নিদ্রা স্বপ্নপূর্ণ, স্বপ্ন সরযুপূর্ণ।

পরদিন প্রাতে রঘুনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল। জনার্দ্দন দেবের নিকট ভবানীর আজ্ঞা জানিলেন; “ম্লেচ্ছদিগের সহিত যুদ্ধে জয়, স্বধর্ম্মীদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজয়।” পরে কিল্লাদারের নিকট কতকগুলি লিপি ও যুদ্ধ-বিষয়ক উপদেশ লইয়া রঘুনাথ যাত্রা করিলেন।

দুর্গ ত্যাগের পূর্ব্বে একবার সরযুর সহিত দেখা করিলেন; সরযু যখন মন্দিরে আসিয়াছেন, ধীরে ধীরে আপনিও তথায় যাইলেন; হৃদয়ের তুমুল উদ্বেগ কথঞ্চিৎ দমন করিয়া ঈষৎ কম্পিতস্বরে বলিলেন—

“ভদ্রে! কল্য নিশিযোগে ছাদে এই কণ্ঠমালাটী পাইয়াছি, সেইটী দিতে আসিয়াছি; অপরিচিতের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন।”

এই বিনীতবাক্য শুনিয়া সরযু ফিরিয়া চাহিলেন, দেখিলেন সেই কমনীয় উদার মুখমণ্ডল, সেই কেশাবৃত উন্নত ললাট ও উজ্জ্বল কৃষ্ণ নয়নদ্বয়, সেই তরুণ যোদ্ধার উন্নত অবয়ব! সহসা রমণীর শরীর কম্পিত হইল, গৌর মুখমণ্ডল পুনরায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল! সরযু উত্তর দিতে অশক্ত।

সরযুকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া রঘুনাথ ধীরে ধীরে বলিলেন, “যদি অনুমতি করেন তবে এই সুন্দর মালাটী উহার অভ্যন্তস্থানে স্থাপন করিয়া জীবন চরিতার্থ করি।”

সরযু সলজ্জনয়নে একবার রঘুনাথের দিকে চাহিলেন, উঃ! সে বিশাল আয়ত নয়নের ক্ষণদৃষ্টিতে রঘুনাথের হৃদয় সহস্রধা বিদ্ধ হইল। তৎক্ষণাৎ রঞ্জিতমুখী লজ্জায় আবার চক্ষু মুদিত করিলেন।

মৌনই সম্মতির লক্ষণ জানিয়া রঘুনাথ ধীরে ধীরে সেই কণ্ঠমালা পরাইয়া দিলেন, কন্যার পবিত্র শরীর স্পর্শ করিলেন না।

কন্যার শরীর একেবারে রোমাঞ্চিত হইল, ও বায়ুতাড়িত পত্রের ন্যায় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; ধন্যবাদ দিবেন কি তাঁহার কম্পিত ওষ্ঠ হইতে বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না।

রঘুনাথ সরযুর এই উদ্যম দেখিয়াই আপনাকে যথেষ্ট অনুগৃহীত বিবেচনা করিলেন। ক্ষণেক পর ঈষৎ খেদযুক্ত স্বরে বলিলেন—"তবে অতিথিকে বিদায় দিন।"

সরযু এবার লজ্জা ও উদ্বেগ সংযম করিয়া ধীরে ধীরে রঘুনাথের দিকে চাহিলেন; আবার ধীরে ধীরে ভূমির দিকে নয়ন ফিরাইয়া অতি মৃদু অস্পষ্ট স্বরে কহিলেন, "আপনার নিকট অনুগৃহীত রহিলাম, পুনরায় কি এ দুর্গে আগমন হইবে?"

উঃ! পিপাসার্ত্ত চাতকের পক্ষে প্রথম বৃষ্টিবিন্দুর ন্যায়, পথভ্রান্ত পথিকের পক্ষে ঊষার প্রথম রক্তিমাচ্ছটার ন্যায়, সরযুর প্রথমোচ্চারিত এই অমৃত কথাগুলি রঘুনাথের হৃদয় আনন্দলহরীতে প্লাবিত করিল! তিনি উত্তর করিলেন—

"রমণীরত্ন! আমি পরের দাস, যুদ্ধ আমার ব্যবসা, পুনরায় কবে আসিতে পারিব, কখনও আসিতে পারিব কি না জানি না; কিন্তু যতদিন জীবিত থাকিব, যতদিন এই হৃদয় শুষ্ক না হইবে, ততদিন আপনার সৌজন্য, আপনার যত্ন, আপনার দেবনিন্দিত মূর্ত্তি মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইব না। আপনার পিতা এই পথে আসিতেছেন, আমি বিদায় হইলাম, কখন কখন নিরাশ্রয় দরিদ্র সেনাকে স্মরণ করিবেন।"

সরযু উত্তর দিতে পারিলেন না, রঘুনাথ দেখিলেন সেই আয়ত নয়ন দুইটী ছল্ ছল্ করিতেছে; তাঁহার আপনার নয়নও শুষ্ক ছিল না।

অচিরে দেবালয় হইতে বাহির হইলেন ও অশ্বে আরূঢ় হইয়া দুর্গদ্বার অতিক্রম করিলেন।

রঘুনাথের অধীনের অশ্বারোহীগণ পূর্ব্বদিন রঘুনাথের অল্প পরে আসিয়াছিল, সুতরাং প্রাচীরের বাহিরে তাহারা রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিল। তাহারা পুনরায় আপনাদিগের অসমসাহসী ও দুর্দ্দমনীয় তেজস্বী হাবিল-

দারকে পাইয়া হুঙ্কার শব্দ করিয়া উঠিল, কিন্তু সেই সরল বালককে আর পাইল না। তোরণদুর্গাগমনের দিন হইতে রঘুনাথজীর বালোচিত চপলতা দূর হইল, মনুষ্যের চিন্তা ও প্রতিজ্ঞায় জীবন আচ্ছন্ন হইল।

সেই দিবসেই রঘুনাথজী হাবিলদার সিংহগড়ে উপস্থিত হইয়া শিবজীকে সমস্ত সংবাদ জানাইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শায়েস্তাখাঁ।

"কেন চিন্তাকুল আজি নবাবের মন?"

নবীনচন্দ্র সেন।

যদিও কয়েক বৎসর অবধি শিবজীর ক্ষমতা ও রাজ্য ও দুর্গসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল, তথাপি ১৬৬২ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহাকে বশীকরণ অভিপ্রায়ে বিশেষ কোন যত্ন করেন নাই। সেই বৎসর শায়েস্তাখাঁ আমীর উল উমরা খেতাপ প্রাপ্ত হইয়া দক্ষিণের শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত হয়েন, ও শিবজীকে একেবারে জয় করিবার আদেশ প্রাপ্ত হয়েন। শায়েস্তাখাঁ সেই বৎসরেই পুনা ও চাকনদুর্গ ও অন্য কয়েক স্থান অধিকার করেন, ও পরবৎসর অর্থাৎ এই আখ্যায়িকা বিবৃত সময়ে শিবজীকে একেবারে ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প করেন। দিল্লী সম্রাটের আদেশানুসারে মাড়ওয়ারের রাজা প্রসিদ্ধনামা যশোবন্তসিংহও এই বৎসরে (১৬৬৩ খ্রীঃ) বহুসৈন্য লইয়া শায়েস্তাখাঁর সহিত যোগ দিলেন, সুতরাং শিবজীর বিপদের সীমা ছিল না। মোগল ও রাজপুত সৈন্য পুনা নগরের নিকটে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিল ও শায়েস্তাখাঁ স্বয়ং দাদাজী কানাইদেবের গৃহে, অর্থাৎ যে গৃহে শিবজী বাল্যকালে মাতার সহিত বাস করিতেন, সেই গৃহেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। শায়েস্তাখাঁ শিবজীর চতুরতা বিশেষরূপে জানিতেন, সুতরাং তিনি আদেশ করিলেন যে অনুমতিপত্র বিনা কোন মহারাষ্ট্রীয় পুনানগরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। শিবজী নিকটবর্ত্তী সিংহগড় নামক এক দুর্গে সসৈন্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা সে সময়ে যুদ্ধব্যবসায়ে অধিক পরিপক্ক হয়

নাই, দিল্লীর পুরাতন সেনার সহিত সম্মুখযুদ্ধ করা কোনমতেই সম্ভব নহে; সুতরাং শিবজী চতুরতা ভিন্ন স্বাধীনতা রক্ষা ও হিন্দুরাজ্য বিস্তারের অন্য উপায় দেখিলেন না।

চৈত্র মাসের শেষযোগে একদিন সায়ংকালে মোগল সেনাপতি শায়েস্তাখাঁ আপন অমাত্য ও মন্ত্রীগণকে আহ্বান করিয়া সভায় বসিয়াছেন, ও কিরূপে শিবজীকে জয় করিবেন তাহাই পরামর্শ করিতেছেন। দাদাজী কানাইদেবের বাটীর মধ্যে সভাগৃহেই এই সভা হইয়াছিল। চারিদিকে উজ্জ্বল দীপাবলী জ্বলিতেছে, ও জানালার ভিতর দিয়া সায়ংকালের শীতল বায়ু উদ্যানের পুষ্পগন্ধ বহিয়া আনিয়া সকলকে পুলকিত করিতেছে। আকাশ অন্ধকার, কেবল দুই একটী নক্ষত্র দেখা যাইতেছে, আমির উল ওমরা স্বয়ং ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন—

"তাহাকে পাইলে জয় করিতে কতক্ষণ?" আন্‌ওরী নামে একজন চাটুকার বলিল. "আমিরের সেনার সম্মুখে মহারাষ্ট্রীয় সেনা যেন মহা বাত্যার সম্মুখে শুষ্ক পত্রের ন্যায় আকাশে উড়িয়া যাইবে, অথবা ভীত হইয়া পৃথিবীর ভিতর প্রবেশ করিবে।"

সেনাপতি তুষ্ট হইয়া হাস্য করিলেন।

চাঁদখাঁ নামক একজন প্রাচীন সেনা কয়েক বৎসর অবধি মহারাষ্ট্রীয়দিগের বল বিক্রম দেখিয়াছিলেন; তিনি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "আমি বোধ করি তাহাদের উক্ত দুইটী ক্ষমতাই আছে।"

শায়েস্তাখাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

চাঁদখাঁ নিবেদন করিলেন, "গত বৎসর কতিপয় পার্ব্বতীয় মহারাষ্ট্রীয় যখন চাকন দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, আমাদের সমস্ত সৈন্য দুই মাস অবধি চেষ্টা করিয়া কিরূপে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দুর্গ জয় করিয়াছে তাহা জঁহাপানার স্মরণ আছে; একটী দুর্গ হস্তগত করিতে সহস্র মোগলের প্রাণনাশ হইয়াছে। আবার এ বৎসর সর্ব্বস্থানে আমাদের সৈন্য থাকাতেও নিতাইজী আসমান দিয়া আহম্মদনগর ও অরাঙ্গাবাদ পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইয়া দেশ ছারখার করিয়া আসিয়াছে।"

সভাসদ্ সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, শায়েস্তাখাঁ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন, কিন্তু ক্রোধ সম্বরণ করিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন—

"চাঁদখাঁর বয়স অধিক হইয়াছে, তিনি এক্ষণে পর্ব্বত-ইন্দুরকে ভয় করেন। পূর্ব্বে তাঁহার এরূপ ভয় ছিল না।" চাঁদখাঁর মুখমণ্ডল আরক্ত হইল, কিন্তু তিনি নিরুত্তর রহিলেন।

আন্‌ওরী সময় বুঝিয়া বলিল, "জহাঁপানা ঠিক আজ্ঞা করিয়াছেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা ইন্দুরবিশেষ, তাহারা যে পর্ব্বত-ইন্দুরের ন্যায় গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া থাকিতে পারে তাহা আমি অস্বীকার করি না।"

শায়েস্তাখাঁ এইটী বড় সুন্দর রহস্য বিবেচনা করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, সুতরাং সভাসদ্ সকলেই হাস্য করিয়া উঠিল। চাটুকারেরই জয়।

চাঁদখাঁ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, অস্পষ্টস্বরে বলিলেন—"ইন্দুরে পুনার ভিতর গর্ত্ত করিয়া বাহির না হইলে রক্ষা!" শায়েস্তাখাঁ এবিষয়ে উদ্বেগশূন্য ছিলেন না। কিন্তু ভয়চিহ্ন সম্বরণ করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন—"এখানে দিল্লীর সহস্র সহস্র নখযুধ বিড়াল আছে, ইন্দুরে সহসা কিছু করিতে পারিবেন না।" সভাসদ্ সকলেই "কেরামৎ" "কেরামৎ" করিয়া সেনাপতির এই বাক্যের অনুমোদন করিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিষয়ে এইরূপ অনেক রহস্য হইলে পর কি প্রণালীতে যুদ্ধ হইবে তাহাই স্থির হইতে লাগিল। চাকন দুর্গ হস্তগত হওয়া অবধি শায়েস্তাখাঁ দুর্গ হস্তগত করা একেবারে দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "এই প্রদেশ দুর্গপরিপূর্ণ, যদি একে একে সমস্ত দুর্গ হস্তগত করিতে হয় তবে কত দিনে যে দিল্লীশ্বরের কার্য্যসিদ্ধি হইবে, কখনও সিদ্ধি হইবে কি না, তাহার স্থিরতা নাই।" চাঁদখাঁ কার্য্যজ্ঞ ছিলেন এইক্ষণেই অপ্রতিভ হইয়াছেন সে কথা বিস্মৃত হইয়া সৎপরামর্শ দিবার চেষ্টা করিলেন। "জহাঁপানা! দুর্গই মহারাষ্ট্রীয়দিগের বল, উহারা সম্মুখ রণ করিবে না, অথবা রণে পরাস্ত হইলেও উহাদিগের ক্ষতি নাই, কেননা দেশ পর্ব্বতময়, উহাদের সেনা এক স্থান হইতে পলায়ন করিয়া কোন্ দিক দিয়া অন্য স্থানে উপস্থিত হইবে, আমরা তাহার উদ্দেশ পাইব না। কিন্তু দুর্গগুলি একে একে হস্তগত করিতে পারিলে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অবশ্যই দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে।"

শায়েস্তাখাঁ চাকন দুর্গ অধিকার করিয়া অবধি আর দুর্গ জয় করিবার আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বলিলেন, "কেন? মহারাষ্ট্রীয়েরা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলে কি আমরা পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারিব না? আমাদের কি অশ্বারোহী নাই, পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সমস্ত মহারাষ্ট্র-সেনা ধ্বংস করিতে পারিবে না?"

চাঁদখাঁ পুনরায় নিবেদন করিলেন—"যুদ্ধ হইলে অবশ্যই মোগলের জয়, ধরিতে পারিলে আমরা মহারাষ্ট্রীয় সেনা বিনাশ করিব তাহার সংশয় নাই, কিন্তু এই পর্ব্বতপ্রদেশে মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহীকে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া

ধরিতে পারে এমন অশ্বারোহী হিন্দুস্থানে নাই। আমাদের অশ্বগুলি বৃহৎ, অশ্বারোহী বর্ম্মাবৃত ও বহু-অস্ত্র-সমন্বিত; সমভূমিতে, সম্মুখক্ষেত্রে তাহাদের তেজ, তাহাদের ভার দুর্দ্দমনীয়, তাহাদের গতি অপ্রতিহত; কিন্তু এই পর্ব্বতপ্রদেশে তাহাদিগের যাতায়াতের ব্যাঘাত জন্মে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহারাষ্ট্রীয় অশ্ব ও অশ্বারোহীগণ যেন ছাগের ন্যায় তুঙ্গশৃঙ্গে লম্ফ দিয়া উঠে, ও হরিণের ন্যায় উপত্যকা ও সুরাখের মধ্য দিয়া পলায়ন করে। জহাঁপানা! আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন। সিংহগড়ে শিবজী আছেন সহসা সেই স্থান অবরোধ করুন; এক মাস কি দুই মাস কালের মধ্যে দুর্গ জয় করিব, শিবজী বন্দী হইবে, দিল্লীশ্বরের জয় হইবে। নচেৎ এ স্থানে মহারাষ্ট্রীয়দিগের জন্য অপেক্ষা করিলে কি হইবে? তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনের চেষ্টা করিলেই বা কি হইবে? দেখুন, নিতাইজী অনায়াসে আমাদের নিকট দিয়া যাইয়া আহম্মদনগর ও আরঙ্গাবাদ ছারখার করিয়া আসিল, রুস্তম জমান তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কি করিল?”

শায়েস্তাখাঁ সক্রোধে বলিলেন—“রুস্তম জমান বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে, ইচ্ছা করিয়া নাতাজীকে পলাইতে দিয়াছে; আমি তাহার সমুচিত দণ্ড দিব। চাঁদখাঁ, তুমিও সম্মুখ যুদ্ধের বিরুদ্ধে পরামর্শ দিতেছ, দিল্লীশ্বরের সেনাগণের মধ্যে সাহসী কি কেহই নাই?”

প্রাচীন যোদ্ধা চাঁদখাঁর মুখমণ্ডল আবার রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া একবিন্দু অশ্রুজল মুছিয়া ফেলিলেন; পরে সেনাপতির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—“পরামর্শ দিতে পারি এরূপ সাধ্য নাই; সেনাপতি, যুদ্ধের প্রণালী স্থির করুন, যেরূপ হুকুম হইবে, তামীল করিতে এ দাস পরাঙ্মুখ হইবে না।”

চাঁদখাঁ উৎকৃষ্ট পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করেন, শায়েস্তাখাঁর এরূপ সাহস ছিল না।

এই সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সমাচার দিল যে সিংহগড়ের দূত মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী নামক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, নীচে অপেক্ষা করিতেছেন। শায়েস্তাখাঁ তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাকে সভাগৃহে আসিবার আজ্ঞা দিলেন। সভার সকলে এই দূতকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন।

ক্ষণেক পরই মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

ন্যায়শাস্ত্রীর বয়স এক্ষণও চত্বারিংশৎ বৎসর হয় নাই; অবয়ব মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায় ঈষৎ খর্ব্ব ও কৃষ্ণবর্ণ। ব্রাহ্মণের মুখমণ্ডল সুন্দর,

বক্ষঃস্থল বিশাল, বাহুযুগল দীর্ঘ, নয়ন গভীর বুদ্ধিব্যঞ্জক, ললাটে দীর্ঘ তিলক চন্দন, স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত লম্বিত রহিয়াছে। শরীর পুরু তুলার কুর্তিতে আবৃত, সুতরাং গঠন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মস্তকে প্রকাণ্ড উষ্ণীষ, এরূপ প্রকাণ্ড যে বদনমণ্ডল যেন তাহার ছায়াতে আবৃত রহিয়াছে। শায়েস্তাখাঁ সাদরে দূতকে আহ্বান করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন।

শায়েস্তাখাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সিংহগড়ের সংবাদ কি?"

মহাদেওজী একটী সংস্কৃত শ্লোক পড়িলেন—

"সন্তি নদ্যো দণ্ডকেষু তথা পঞ্চবটীবনে।
সরযূ-বিচ্ছেদশোকং রাঘবস্তু কথং সহেৎ॥"

পরে তাহার অর্থ করিলেন, "দণ্ডকারণ্যে ও পঞ্চবটীবনে শত শত নদী আছে, কিন্তু তাহা দেখিয়া কি রাঘব সরযূ নদীর বিচ্ছেদদুঃখ ভুলিতে পারেন? সিংহগড় প্রভৃতি শত শত দুর্গ এক্ষণও শিবজীর হস্তে আছে, কিন্তু পুনা আপনার হস্তগত, সে সন্তাপ কি তিনি ভুলিতে পারেন?"

শায়েস্তাখাঁ পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন—"হাঁ, তোমার প্রভুকে বলিও প্রধান দুর্গ আমি হস্তগত করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহার যুদ্ধ করা বিফল, দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিলে বরং এক্ষণও আশা আছে।"

ব্রাহ্মণ ঈষদ্ধাস্য করিয়া পুনরায় সংস্কৃত পাঠ করিলেন —

"ন শক্তোহি স্বাভিলাষং জ্ঞাপয়তুঞ্চাতকঃ।
জ্ঞাত্বাতু তৎ বারিধরস্তোষয়তি যাচকং॥"

"অর্থাৎ চাতক কথা কহিয়া আপন অভিলাষ মেঘকে জানাইতে পারে না, কিন্তু মেঘ আপনার দয়া বশতই সেই অভিলাষ বুঝিয়া পূর্ণ করে। মহজ্জনের যাচককে দিবার এই রীতি। প্রভু শিবজী এক্ষণে পুনা ও চাকন হারাইয়া সন্ধিপ্রার্থনা করিতেও লজ্জা বোধ করেন, কিন্তু ভবাদৃশ মহল্লোক তাঁহার মনের অভিলাষ জানিয়া অনুগ্রহ করিয়া যাহা দান করিবেন তাহাই শিরোধার্য্য।"

শায়েস্তাখাঁ আনন্দ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "পণ্ডিতজী, তোমার পাণ্ডিত্যে আমি যে কতদূর পরিতুষ্ট হইলাম বলিতে পারি না; তোমাদের সংস্কৃত ভাষা কি সুমধুর ও ভাবপরিপূর্ণ। যথার্থই কি শিবজী সন্ধির ইচ্ছা করিতেছেন?'

মহাদেওজী। "খাঁ সাহেব! সম্মুখযুদ্ধে দিল্লীশ্বরের সৈন্যের দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া আমরা কেবল 'সন্ধি সন্ধি' এই শব্দ করিতেছি।"

শায়েস্তাখাঁ এবার আহ্লাদ আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "চাঁদখাঁ! সম্মুখযুদ্ধ ভাল না দুর্গ অবরোধ ভাল, কিসের দ্বারা শত্রু অধিক ভীত হইয়াছে?" পরে আনন্দ কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়া শায়েস্তাখাঁ বলিলেন—

"ব্রাহ্মণ! আপনার শাস্ত্রালোচনায় সন্তুষ্ট হইলাম, এক্ষণে যদি সন্ধির কথাই বলিতে আসিয়া থাকেন তবে শিবজী আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার নিদর্শন কৈ?"

ব্রাহ্মণ তখন গম্ভীরভাবে বস্ত্রের ভিতর হইতে নিদর্শনপত্র বাহির করিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শায়েস্তাখাঁ সেইটী দেখিলেন। পরে বলিলেন—"হাঁ আমি নিদর্শন পত্র দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে কি কি প্রস্তাব করিবার আছে করুন।"

মহাদেওজী। "প্রভুর এইরূপ আজ্ঞা যে যখন প্রথমেই আপনাদিগের জয় হইয়াছে, তখন আর যুদ্ধ করা বৃথা।"

শায়েস্তাখাঁ। "ভাল।"

মহা। "সুতরাং সন্ধির জন্য তিনি উৎসুক হইয়াছেন।"

শায়ে। "ভাল।"

মহা। "এক্ষণে কি কি নিয়মে দিল্লীশ্বর সন্ধি করিতে সম্মত হইবেন তাহা জানিতে তিনি উৎসুক। জানিলে সেইগুলি পালন করিতে যত্নবান হইবেন।"

শায়ে। "প্রথম দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকারকরণ। তাহাতে আপনার প্রভু স্বীকৃত আছেন?"

মহা। "তাঁহার সম্মতি বা অসম্মতি জানাইবার আমার অধিকার নাই; মহাশয় যে যে কথাগুলি বলিবেন তাহাই আমি তাঁহার নিকট জানাইব, তিনি সেইগুলি বিবেচনা করিয়া সম্মতি অসম্মতি পরে প্রকাশ করিবেন।"

শায়ে। "ভাল, প্রথম কথা আমি বলিয়াছি, দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকারকরণ। দ্বিতীয়, দিল্লীশ্বরের সেনা যে যে দুর্গ হস্তগত করিয়াছে তাহা দিল্লীশ্বরেরই থাকিবে। তৃতীয়, সিংহগড় প্রভৃতি আরও কয়েকটী দুর্গ তোমরা ছাড়িয়া দিবে।"

মহা। "সে কোন্ কোন্‌টী?"

শায়ে। "তাহা দুই এক দিনের মধ্যে পত্রদ্বারা জানাইব। চতুর্থ, অবশিষ্ট যে যে দুর্গ ও দেশ শিবজী আপন অধীনে রাখিবেন তাহাও দিল্লীশ্বরের অধীনে জায়গীরস্বরূপ ভোগ করিবেন, তাহার জন্য কর দিতে হইবে। এইগুলি তোমার প্রভুকে জানাইও, ইহাতে তিনি সম্মত কি অসম্মত তাহা যেন আমি দুই এক দিনের মধ্যে জানিতে পারি।"

মহা। "যেরূপ আদেশ কবিলেন সেইরূপ করিব। এক্ষণে যখন সন্ধির প্রস্তাব হইতেছে তখন যতদিন সন্ধিস্থাপন না হয় ততদিন যুদ্ধ ক্ষান্ত থাকিতে পারে?"

শায়ে। "কদাচ নহে। ধূর্ত্ত কপটাচারী মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আমি কদাচ বিশ্বাস করি না; এমত ধূর্ত্ততা নাই যে তাহাদের অসাধ্য। যতদিন সন্ধি একেবারে স্থাপন না হয় ততদিন যুদ্ধ চলিবে, আমরা তোমাদের অনিষ্ট করিব, তোমরা পার, আমাদের অনিষ্ট করিও।"

"এবমস্তু" বলিয়া ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করিলেন; তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতেছিল।

তিনি ধীরে ধীরে প্রাসাদ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। প্রত্যেক দ্বার, প্রত্যেক ঘর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। একজন মোগল প্রহরী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দূত মহাশয়, কি দেখিতেছেন?" দূত উত্তর করিলেন, "এই গৃহে প্রভু শিবজী বাল্যকালে ক্রীড়া করিতেন তাহাই দেখিতেছি; এটীও তোমাদের হস্তগত হইয়াছে, বোধ হয় একে একে সমস্ত দুর্গগুলিই তোমরা লইবে; হা! ভগবন্!" প্রহরী হাস্য করিয়া বলিল, "সেজন্য আর বৃথা খেদ করিলে কি হইবে, আপন কার্য্যে যাও।" "সে কথা সত্য" বলিয়া ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

ব্রাহ্মণ শীঘ্রই বহুজনাকীর্ণ পুনানগরীর লোকের মধ্যে মিশিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শুভকার্য্যের দিনস্থির।

"অদূরে শিবিরে বসি নিশি দ্বিপ্রহরে
কুমন্ত্রণা করিতেছে রাজদ্রোহিগণ।"
নবীনচন্দ্র সেন।

ব্রাহ্মণ একে একে পুনার বহু পথ অতিবাহন করিলেন; যে যে স্থান দিয়া যাইতে লাগিলেন সেই সেই স্থান বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দুই একটী দোকানে দ্রব্য ক্রয়ের ছলে প্রবেশ করিয়া কথায় কথায় নানা বিষয় জানিলেন, পরে বাজার পার হইয়া গেলেন, প্রশস্ত রাজপথ হইতে একটী গলিতে প্রবেশ করিলেন, সেখানে রজনীতে দীপ সমস্ত নির্ব্বাণ হইয়াছে, নাগরিক সকলে দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিজ নিজ আলয়ে সুপ্ত।

ব্রাহ্মণ একাকী অনেক দূর যাইলেন, আকাশ অন্ধকারময়, কেবল দুই একটী তারা দেখা যাইতেছে, নাগরিক সকলে সুপ্ত, জগৎ নিস্তব্ধ। ব্রাহ্মণের মনে সন্দেহ হইল, তাঁহার বোধ হইল যেন তাঁহার পশ্চাতে পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। স্থির হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন,—কৈ সে পদশব্দ আর শুনা যায় না।

পুনরায় পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন, ক্ষণেক পর পুনরায় বোধ হইল যেন পশ্চাতে কে অনুসরণ করিতেছে। ব্রাহ্মণের হৃদয় ঈষৎ চঞ্চল হইল। এই গভীর নিশীথে কে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে? সে শত্রু না মিত্র? শত্রু হইলে কি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে? উদ্বেগ-পরিপূর্ণ হৃদয়ে ক্ষণেক চিন্তা করিলেন; পরে নিঃশব্দে তুলা-নির্ম্মিত কুর্ত্তির আস্তিনের ভিতর হইতে একটী তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিলেন, একটী পথের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইলেন; গভীর অন্ধকারের দিকে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন, কৈ কেহই নাই, সকলে সুপ্ত, নগর শব্দশূন্য ও নিস্তব্ধ!

সন্দিগ্ধমনা ব্রাহ্মণ পুনরায় আলোকপূর্ণ বাজারে ফিরিয়া গেলেন; তথায় অনেক দোকান, নানাজাতীয় অনেক লোক এখনও ক্রয় বিক্রয় করিতেছে, তাহার ভিতর মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। আবার তথা হইতে সহসা এক গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন, পরে দ্রুতবেগে

অন্যান্য গলির ভিতর দিয়া নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। নিঃশব্দে অনেকক্ষণ শ্বাস রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। শব্দমাত্র নাই, চারিদিকে পথ, ঘাট, কুটীর, অট্টালিকা সমস্ত নিস্তব্ধ, নৈশ গগন গভীর দুর্ভেদ্য অন্ধকারদ্বারা সমস্ত জগৎকে আবৃত করিয়াছে। অনেকক্ষণ পর একটী চীৎকারশব্দ শ্রুত হইল; ব্রাহ্মণের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, তিনি নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন।

ক্ষণেক পর আবার সেই শব্দ হইল, মহাদেওজীর ভয় দূর হইল, সে নাগরিক প্রহরী পাহারা দিতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে মহাদেও যে গলিতে লুক্কায়িত ছিলেন সেই গলিতেই প্রহরী আসিল। গলি অতি সঙ্কীর্ণ, মহাদেও পুনরায় সেই ছুরিকা হস্তে লইয়া দুর্ভেদ্য অন্ধকারে দণ্ডায়মান রহিলেন।

প্রহরী ধীরে সেইস্থানে আসিল, এদিক্ ওদিক্ চাহিতে চাহিতে সেই স্থানে আসিল; মহাদেও যেস্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন সেইদিকে চাহিল। উঃ! মহাদেবের হৃদয় দুরু দুরু করিতে লাগিল, তিনি শ্বাস রুদ্ধ করিয়া হস্তে সেই ছুরিকা দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

প্রহরী অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইল না; ধীরে সে পথ হইতে চলিয়া গেল। মহাদেও ধীরে ধীরে তথা হইতে বাহির হইয়া ললাটের স্বেদ মোচন করিলেন।

পরে নিকটবর্ত্তী একটী দ্বারে আঘাত করিলেন; শায়েস্তাখাঁর একজন মহারাষ্ট্রীয় সেনা বাহির হইয়া আসিল; দুইজনে অতি সঙ্গোপনে নগরের মধ্যে অতি গোপনীয় ও মনুষ্যের অগম্য স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় দুইজনে উপবেশন করিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "সমস্ত প্রস্তুত?"

সেনা। "প্রস্তুত।"

ব্রাহ্মণ। "অনুমতিপত্র পাইয়াছ?"

সেনা। "পাইয়াছি।"

আবার অস্পষ্ট পদশব্দ শ্রুত হইল। মহাদেওজী এবার ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া ছুরিকাহস্তে সম্মুখে যাইয়া দেখিলেন; অন্ধকারে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন কিছুমাত্র দেখিতে পাইলেন না। ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে সেনাকে বলিলেন, "রিক্তহস্তে আসিয়াছ?"

সেনা বক্ষঃস্থল হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া দেখাইল। ব্রাহ্মণ বলিল, "ভাল, সতর্ক থাকিও। বিবাহ কবে?"

সেনা। "কল্য।"

ব্রাহ্মণ। "অনুমতি পাইয়াছ ?"

সেনা। "হাঁ" একটী কাগজ দেখাইল।

ব্রাহ্মণ। "কতজন লোকের ?"

সেনা। "বাদ্যকর দশ জন ও অস্ত্রধারী ত্রিশ জন, ইহার অধিক অনুমতি পাইলাম না।"

ব্রাহ্মণ। "এই যথেষ্ট, কোন্ সময়ে ?"

সেনা। "রজনী এক প্রহর।"

ব্রাহ্মণ। "ভাল, এই দিক্ হইতে বরযাত্রা আরম্ভ হইবে।"

সেনা। "স্মরণ আছে।"

ব্রাহ্মণ। "বাদ্যকারেরা সজোরে বাদ্য করিবে।"

সেনা। "স্মরণ আছে।"

ব্রাহ্মণ। "জ্ঞাতি কুটুম্ব যত পারিবে জড় করিবে।"

সেনা। "স্মরণ আছে।"

ব্রাহ্মণ তখন অল্প হাস্য করিয়া বলিলেন, "আমরাও শুভকার্য্যে যোগ দিব, সে শুভকার্য্যের ঘটা সমস্ত ভারতবর্ষে রাষ্ট্র হইবে।"

সহসা একটী সজোরে নিক্ষিপ্ত তীর আসিয়া ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থলে লাগিল; সে তীরে প্রাণনাশ নিশ্চয় সম্ভব, কিন্তু ব্রাহ্মণের কুর্ত্তির নীচে লৌহ-বর্ম্মে লাগিয়া তীর খণ্ড খণ্ড হইল।

তৎপরেই একটী বর্শা। বর্শার ভীষণ আঘাতে ব্রাহ্মণ ভূমিতে পতিত হইলেন, কিন্তু সে দুর্ভেদ্য বর্ম্ম ভিন্ন হইল না, মহাদেও পুনরায় উঠিলেন। সম্মুখে দেখিলেন, নিষ্কোষিত অসিহস্তে একজন দীর্ঘ মোগল যোদ্ধা,—তিনি চাঁদখাঁ।

অদ্য সভাতে সেনাপতি শায়েস্তাখাঁ চাঁদখাঁকে ভীরু বলিয়াছেন। যুদ্ধব্যবসায়ে চাঁদখাঁর কেশ শুক্ল হইয়াছিল, সম্মুখ যুদ্ধ বিনা তিনি কখনও পলায়ন জানিতেন না, এ অপবাদ কখন কেহ তাঁহাকে দেয় নাই।

মনে মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়াছিলেন, অন্যকে তাহা কি জানাইবেন, মনে স্থির করিলেন কার্য্য দ্বারা এ অপবাদ দূর করিব, নচেৎ এই যুদ্ধেই এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণ দান করিব।

ব্রাহ্মণের আচরণ দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি শিবজীকে বিশেষ করিয়া জানিতেন, শিবজীর অসাধারণ ক্ষমতা, তাঁহার বহুসংখ্যক দুর্গ, তাঁহার অপূর্ব্ব ও দ্রুতগামী অশ্বারোহী সেনা, তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে আস্থা, হিন্দুরাজ্য স্থাপনে অভিলাষ, হিন্দু-স্বাধীনতাসাধনে প্রতিজ্ঞা, এ সমস্ত

চাঁদখাঁর নিকট অগোচর ছিল না। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধপ্রারম্ভেই যে শিবজী পরাজয় স্বীকার ও সন্ধি যাজ্ঞা করিবেন এরূপ সম্ভব নহে, তথাপি এ ব্রাহ্মণ শিবজীর নিদর্শন পত্র দেখাইয়াছে। এ ব্রাহ্মণ কে? ইহার গুপ্ত অভিসন্ধিই বা কি?

ব্রাহ্মণের কথাগুলিতেও চাঁদখাঁর সন্দেহ জন্মিয়াছিল, মহারাষ্ট্রের নিন্দা শুনিয়া যখন ব্রাহ্মণের নয়ন প্রজ্জ্বলিত হয় তাহাও তিনি দেখিয়াছিলেন। এ সমস্ত সন্দেহের কথা শায়েস্তাখাঁর নিকট বলেন নাই, সত্য বলিয়া কেন আবার তিরস্কার সহ্য করিবেন, কিন্তু মনে মনে স্থির করিলেন এই ভণ্ড দূতকে ধরিব। সেই অবধি দূতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন, পথে পথে, গলিতে গলিতে অদৃশ্যভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন। মুহূর্ত্তের জন্যও ব্রাহ্মণ চাঁদখাঁর নয়নবহির্ভূত হইতে পারেন নাই।

সেনার সহিত ব্রাহ্মণের যে কথা হয় তাহা শুনিলেন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি যোদ্ধা তখনই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, এই দূতকে বিনাশ করিয়া সেনাকে সেনাপতিসদনে লইয়া যাইয়া প্রতিপত্তি লাভের সঙ্কল্প করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "শায়েস্তাখাঁ! যুদ্ধব্যবসায়ে বৃথা এ কেশ শুক্ল করি নাই, আমি ভীরুও নহি, দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধাচারীও নহি; অদ্য যে ষড়যন্ত্রটী ধরিয়া প্রকাশ করিয়া দিব তাহার পর বোধ হয় এ প্রাচীন দাসের কথা অবহেলা করিবে না।" কিন্তু আশা মায়াবিনী।

মহাদেওজী ভূমি হইতে উঠিতে না উঠিতে চাঁদখাঁ তীর ও বর্শা ব্যর্থ দেখিয়া লম্ফ দিয়া তাঁহার উপর আসিয়া পড়িলেন ও খড়্গ দ্বারা সজোরে আঘাত করিলেন। আশ্চর্য্য বর্ম্মে লাগিয়া সে খড়্গ প্রতিহত হইল।

"কুক্ষণে আমার অনুসরণ করিয়াছিলে" বলিয়া মহাদেওজী আপন আস্তিন গুটাইয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকা আকাশের দিকে উত্তোলন করিলেন।

নিমেষমধ্যে বজ্রমুষ্টি চাঁদখার বক্ষঃস্থলে অবতীর্ণ হইল,—চাঁদখাঁর মৃতদেহ ধরাতলশায়ী হইল।

ব্রাহ্মণ সূক্ষ্ম অধরোষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল। ধীরে ধীরে সেই ছুরিকা পুনরায় লুকাইয়া বলিলেন—

"শায়েস্তাখাঁ! মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিন্দা করার এই প্রথম ফল, ভবানীর কল্যাণে দ্বিতীয় ফল কল্য ফলিবে।"

শায়েস্তাখাঁ! অন্যায় তিরস্কারে অদ্য যে অমূল্য বীররত্নটীকে হারাইলে, বিপদের সময় তাহাকে স্মরণ করিবে কিন্তু আর পাইবে না!

যোদ্ধার কর্ত্তব্যকার্য্যে যে সময়ে চাঁদখাঁ জীবনদান করিলেন, সেনাপতি শায়েস্তাখাঁ সে সময়ে বড় সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন, শিবজীকে বশীকরণ-বিষয়ে সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলেন!

মহারাষ্ট্রীয় সেনা এই সমস্ত ব্যাপারে বিস্মিত হইয়া বলিল, "প্রভু কি করিলেন? কল্য এবিষয়ে গোল হইবে, আমাদের সমুদয় সঙ্কল্প বৃথা হইবে।"

ব্রাহ্মণ। "কিছুমাত্র বৃথা হইবে না। আমি জানিয়াছি চাঁদখাঁ অদ্য সভায় অপমানিত হইয়াছেন, এখন কয়েকদিন সভায় না যাইলেও কেহ সন্দেহ করিবে না! এই মৃতদেহ ঐ গভীর কূপে নিক্ষেপ কর, আর স্মরণ রাখিও কল্য রজনী এক প্রহরকালে।"—

সেনা। "রজনী এক প্রহরকালে।"

ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে পুনানগর ত্যাগ করিলেন। তিন চারি স্থানে প্রহরীগণ তাঁহাকে ধরিল, তিনি শায়েস্তাখাঁর স্বাক্ষরিত অনুমতিপত্র দেখাইলেন, ও নিরাপদে পুনা হইতে বহির্গত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাজা যশোবন্তসিংহ।

"কোন্ ধর্ম্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ পর পর সদা।"

মধুসূদন দত্ত।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় রাজপুত রাজা যশোবন্তসিংহ একাকী শিবিরে বসিয়া রহিয়াছেন; হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া এই গভীর নিশীথেও কি চিন্তা করিতেছেন, সম্মুখে কেবল একটী মাত্র দীপ জ্বলিতেছে, শিবিরে অন্য লোকমাত্র নাই।

সংবাদ আসিল মহারাষ্ট্রীয় দূত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। যশোবন্ত তাঁহাকে আনয়ন করিতে কহিলেন, তাঁহারই জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী শিবিরে আসিলেন, যশোবন্ত তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন। উভয়ে উপবেশন করিলেন।

ক্ষণেক যশোবন্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, কি গভীর চিন্তা করিতেছিলেন। মহাদেও নিঃশব্দে রাজপুতের দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিতেছিলেন।

পরে যশোবন্ত বলিলেন, "আমি আপনার প্রভুর পত্র পাইয়াছি। তাহাতে যাহা লিখিত আছে অবগত হইয়াছি, তাহা ভিন্ন অন্য কোন প্রস্তাব আছে ?"

মহা। "প্রভু আমাকে কোন প্রস্তাব করিতে পাঠান নাই, খেদ করিতে পাঠাইয়াছেন।"

যশো। "কেবল পুনা ও চাকান দুর্গ আমাদের হস্তগত হইয়াছে মাত্র, এই জন্য খেদ ?"

মহা। "দুর্গনাশে তিনি ক্ষুব্ধ নহেন, তাঁহার অসংখ্য দুর্গ আছে।"

যশো। "মোগল-যুদ্ধস্বরূপ বিপদে পড়িয়া তিনি খেদ করিতেছেন ?"

মহা। "বিপদে পড়িলে খেদ করা তাঁর অভ্যাস নাই।"

যশো। "তবে কি জন্য খেদ করিতেছেন ?"

মহা। "যিনি হিন্দুরাজ-তিলক, যিনি ক্ষত্রিয়কুলাবতংস, যিনি সনাতন ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহাকে অদ্য ম্লেচ্ছের দাস দেখিয়া প্রভু ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।"

যশোবন্তের মুখমণ্ডল ঈষৎ আরক্ত হইল ; মহাদেও তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না, গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন ;—

"উদয়পুরের প্রতাপ রাণার বংশে যিনি বিবাহ করিয়াছেন, মাড়ওয়ারের রাজছত্র যাঁহার মস্তকের উপর ধৃত হইয়াছে, রাজস্থান যাঁহার সুখ্যাতিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সিপ্রাতীরে যাঁহার বাহুবিক্রম দেখিয়া আরংজীব ভীত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন, সমগ্র ভারতবর্ষ যাঁহাকে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ জ্ঞান করে, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে মন্দিরে মন্দিরে যাঁহার জয়ের জন্য হিন্দুমাত্রেই, ব্রাহ্মণমাত্রেই জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, অদ্য তাঁহাকে মুসলমানের পক্ষ হইয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া প্রভু ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। রাজন্! আমি সামান্য দূতমাত্র, আমি কি বলিতেছি জানি না, অপরাধ হইলে মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু এ যুদ্ধসজ্জা কেন ? এ সৈন্যসামন্ত কেন ? এ সমস্ত বিজয়পতাকা কিজন্য উড্ডীন হইতেছে ? স্বাধিকার বৃদ্ধি করিবার জন্য ? হিন্দু-স্বাধীনতা স্থাপন করিবার জন্য ? ক্ষত্রোচিত যশোলাভের জন্য ? আপনি ক্ষত্রকুলর্ষভ! আপনি বিবেচনা করুন ; আমি জানি না।"

যশোবন্ত অধোবদনে রহিলেন। মহাদেও আরও বলিতে লাগিলেন—

"আপনি রাজপুত। মহারাষ্ট্রীয়েরা রাজপুত-পুত্র; পিতাপুত্রে যুদ্ধ সম্ভবে না; স্বয়ং ভবানী এ যুদ্ধ নিষেধ করিয়াছেন। আপনি আজ্ঞা করুন আমরা পালন করিব। রাজপুতের গৌরবই অনাথ ভারতবর্ষের একমাত্র গৌরব। রাজপুতের যশোগীত আমাদের রমণীগণ এখনও গাইয়া থাকে, রাজপুত-দিগের উদাহরণ দেখিয়া আমাদের বালকগণ শিক্ষিত হয়, সে রাজপুতের সহিত যুদ্ধ। ক্ষত্রকুলতিলক! রাজপুত-শোণিতে আমাদিগের খড়্গ রঞ্জিত হইবার পূর্ব্বে যেন মহারাষ্ট্র নাম বিলুপ্ত হয়, রাজ্য বিলুপ্ত হয়, আমরা যেন বর্শা ও খড়্গ ত্যাগ করিয়া পুনরায় লাঙ্গল ধারণ করিতে শিখি!"

যশোবন্তসিংহ তখন নয়ন উঠাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "দূতপ্রধান! তোমার কথাগুলি বড় মিষ্ট, কিন্তু আমি দিল্লীশ্বরের অধীন, মহারাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ করিব বলিয়া আসিয়াছি, মহারাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ করিব——"

"এবং শত শত স্বধর্ম্মীকে নাশ করিবেন, হিন্দু হিন্দুর মস্তক ছেদন করিবে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণেব বক্ষে ছুরিকা বসাইবে, ক্ষত্রিয়ের শোণিতস্রোতে ক্ষত্রিয়-শোণিতস্রোত মিশাইবে, শেষে ম্লেচ্ছ সম্রাটের সম্পূর্ণ জয় হইবে।" ঈষৎ ব্যঙ্গভাবে দূত এই কথা বলিলেন।

যশোবন্তের মুখ আরক্ত হইল, কিন্তু উদ্বেগ সম্বরণ করিয়া কিঞ্চিৎ কর্কশ-ভাবে বলিলেন—

"কেবল দিল্লীশ্বরের জয়ের জন্য যুদ্ধ নহে;—আমি তোমার প্রভুর সহিত কিরূপে মিত্রতা করিব? শিবজী বিদ্রোহাচারী, চতুর শিবজী অদ্যের অঙ্গীকার অনায়াসে কল্য ভঙ্গ করে।"

এবার ব্রাহ্মণের নয়ন প্রজ্জ্বলিত হইল, তিনি ধীরে বলিলেন, "মহা-রাজ! সাবধান, অলীক নিন্দা আপনার সাজে না। শিবজী কবে হিন্দুর নিকট যে বাক্য দান করিয়াছেন তাহার অন্যথা করিয়াছেন? কবে ব্রাহ্মণের নিকট যে পণ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয়ের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন? দেশে শত শত গ্রাম শত শত দেবালয় আছে অনুসন্ধান করুন, শিবজী সত্য পালন করিতে, ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দিতে, হিন্দুর উপকার করিতে, গোবৎসাদি রক্ষা করিতে, হিন্দু-দেবের পূজা দিতে কবে পরাঙ্মুখ? তবে মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ! জেতা ও বিজিতদিগের মধ্যে কবে কোন্ দেশে সখ্যতা? বজ্রনখ যখন সর্পকে ধারণ করে, সর্প সে সময় মৃতবৎ হইয়া থাকে, মৃত বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবামাত্র জর্জ্জরিত-শরীর নাগরাজ সময় পাইয়া দংশন করে, এটী বিদ্রোহাচরণ নয়; এটী স্বভাবের রীতি। কুক্কুর যখন খরগশকে

ধরিবার চেষ্টা করে, খরগণ প্রাণরক্ষার জন্য কত যত্ন করে, একদিকে পলাইবার উদ্যোগ করিয়া সহসা অন্যদিকে যায়; এটী চাতুরী না স্বভাবের রীতি? দেখুন, যাবতীয় জীবজন্তুদিগকে জগদীশ্বর যে প্রাণরক্ষার যত্ন ও উপায় শিখাইয়াছেন, মনুষ্যকে কি সে উপায় শিখান নাই? আমাদের প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবনস্বরূপ স্বাধীনতা যে মুসলমানেরা শত শত বৎসর অবধি শোষণ করিতেছে, হৃদয়ের শোণিতস্বরূপ বল, মান, দেশ-গৌরব, জাত্যভিমান শোষণ করিতেছে, ধর্ম্ম বিনাশ করিতেছে, তাহা-দিগের সহিত আমাদিগের সখ্যতা ও সত্যসম্বন্ধ? তাহাদিগের নিকট হইতে যে উপায়ে সেই জীবনস্বরূপ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারি স্বধর্ম্ম ও জাতিগৌরব রক্ষা করিতে পারি, সে উপায় কি চতুরতা, সে উপায় কি নিন্দনীয়? জীবনরক্ষার্থ পলায়নপটু মৃগের শীঘ্রগতি কি বিদ্রোহ? শাবককে বাঁচাইবার জন্য পক্ষী যে অপহারককে অন্যদিকে লইয়া যাইতে যত্ন করে, সেটী কি নিন্দনীয়? ক্ষত্রিয়রাজ! দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, মুসল-মানদিগের নিকট মহারাষ্ট্রীয় চতুরতার নিন্দা শুনিতে পাই, কিন্তু হিন্দু-প্রবর! আপনি হিন্দুজীবন রক্ষার একমাত্র উপায়কে নিন্দা করিবেন না, শিবজীকে নিন্দা করিবেন না।” মহাদেবের জ্বলন্ত নয়নদ্বয় জলে আবৃত হইল।

ব্রাহ্মণের চক্ষে জল দেখিয়া যশোবন্ত হৃদয়ে বেদনা পাইলেন। বলি-লেন, “দূতপ্রবর! আমি আপনাকে কষ্ট দিতে চাহি নাই, যদি অন্যায় বলিয়া থাকি মার্জ্জনা করিবেন। আমি কেবল এইমাত্র বলিতেছিলাম যে, দেখুন্ রাজপুতগণও স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছেন, কিন্তু তাহারা সাহস ও সম্মুখরণ ভিন্ন অন্য উপায় জানে না। মহারাষ্ট্রীয়েরাও কি সেই উপায় অবলম্বন করিয়া সেইরূপ ফললাভ করিতে পারে না?”

মহা। “মহারাজ! রাজপুতদিগের পুরাতন স্বাধীনতা আছে, বিপুল অর্থ আছে, দুর্গম পর্ব্বত বা মরুবেষ্টিত দেশ আছে, সুন্দর রাজধানী আছে, সহস্র বৎসরের অপূর্ব্ব রণশিক্ষা আছে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের ইহার কোন্‌টী আছে? তাহারা দরিদ্র, তাহারা চিরপরাধীন, তাহাদের এই প্রথম রণ-শিক্ষা। আপনাদিগের দেশ আক্রমণ করিলে আপনারা পুরাতন রীত্যনুসারে যুদ্ধ দেন, পুরাতন দুর্দ্ধর্ষ তেজ ও বিক্রম প্রকাশ করেন, অসংখ্য রাজপুত সেনার সম্মুখে দিল্লীশ্বরের সেনা সরিয়া যায়। আমাদের দেশ আক্রমণ করিলে আমরা কি করিব? পূর্ব্বরীতি বা রণশিক্ষা নাই, অসংখ্য সৈন্য নাই, যাহারা আছে তাহারা প্রত্যুত রণ দেখে নাই। যখন দিল্লীশ্বর

কাবুল, পঞ্জাব, অযোধ্যা, বিহার, মালব, বীরপ্রসবিনী রাজস্থানভূমি হইতে সহস্র সহস্র পুরাতন রণদর্শী যোদ্ধা প্রেরণ করেন, যখন অপরূপ বৃহৎ ও অনিবার্য্য রণ-অশ্ব ও রণ-গজ প্রেরণ করেন, যখন তাঁহার কামান, বন্দুক, বারুদ, গোলা, রৌপ্যমুদ্রা, স্বর্ণমুদ্রা, সহস্র সহস্র শকটে আনিয়া রাশীকৃত করেন, তখন দরিদ্র মহারাষ্ট্রীয়েরা কি করিবে? তাহাদিগের সেরূপ অসংখ্য যুদ্ধদর্শী সেনা নাই, সেরূপ অশ্ব গজ নাই, সেরূপ বিপুল অর্থ নাই, চতুরতা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? ত্বরিতগতি ও পর্ব্বতযুদ্ধ ভিন্ন তাহাদের আর কি উপায় আছে? ক্ষত্রিয়রাজ! জীবনপ্রারম্ভে দরিদ্রজাতির এইরূপ আচরণ ভিন্ন উপায় নাই। জগদীশ্বর করুন মহারাষ্ট্রীয় জাতি দীর্ঘজীবী হউক, তাহাদিগের অর্থ ও যুদ্ধায়োজনের উপায় সংস্থান হইলে, দুই তিনশত বৎসরের রণশিক্ষা হইলে, তাহারাও রাজপুতের অসাধারণ গুণ অনুকরণ করিবে।”

এই সমস্ত কথা শুনিয়া যশোবন্ত চিন্তায় অভিভূত হইয়া রহিলেন, হস্তে ললাট স্থাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহাদেও দেখিলেন তাঁহার বাক্যগুলি নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই, আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—

“আপনি হিন্দুশ্রেষ্ঠ, হিন্দুগৌরবসাধনে সন্দেহ করিতেছেন কেন? হিন্দুধর্ম্মের জয় অবশ্যই আপনি ইচ্ছা করেন, শিবজীরও ইহা ভিন্ন অন্য ইচ্ছা নাই। মুসলমান শাসন ধ্বংসকরণ, হিন্দুজাতির গৌরবসাধন, স্থানে স্থানে দেবালয় স্থাপন, সনাতন ধর্ম্মের গৌরববৃদ্ধি, হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা, ব্রাহ্মণকে আশ্রয়দান, গোবৎসাদি রক্ষাকরণ, ইহা ভিন্ন শিবজীর অন্য উদ্দেশ্য নাই। এই বিষয়ে যদি তাঁহাকে সাহায্য করিতে বিমুখ হয়েন তবে স্বহস্তে এই কার্য্য সাধন করুন। আপনি এই দেশের রাজত্ব গ্রহণ করুন, মুসলমানদিগকে পরাস্ত করুন, মহারাষ্ট্রে হিন্দুস্বাধীনতা স্থাপন করুন। আদেশ করুন দুর্গের দ্বার এইক্ষণেই উদ্‌ঘাটিত হইবে, প্রজারা আপনাকে কর দিবে, আপনি শিবজী অপেক্ষা সহস্রগুণ বলবান, সহস্রগুণ দূরদর্শী, সহস্রগুণ উপযুক্ত, শিবজী সন্তুষ্টচিত্তে আপনার একজন সেনাপতি হইয়া মুসলমানদিগের ধ্বংস সাধন করিবেন। তাঁহার অন্য বাসনা নাই।”

এই প্রস্তাবে উচ্চাভিলাষী যশোবন্তের নয়ন যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, কিন্তু অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, “মাড়ওয়ার ও মহারাষ্ট্র অনেক দূর, এক রাজার অধীন থাকিতে পারে না।”

মহাদেও। "তবে আপনার উপযুক্ত পুত্র থাকিলে তাঁহাকেই এই রাজ্য দিন, নচেৎ কোন আত্মীয় যোদ্ধাকে দিন। শিবজী ক্ষত্রিয় রাজার অধীনে কার্য্য করিবে, কিন্তু কদাচ ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করিবে না।"

যশোবন্ত আবার চিন্তা করিয়া বলিলেন—"এই বিপদ্‌কালে আরংজীবের সহিত যুদ্ধ কবিয়া এ দেশ রাখিতে পারিবে এমত আত্মীয় নাই।"

মহাদেও। "কোন ক্ষত্রিয় সেনাপতিকে নিযুক্ত করুন, হিন্দুধর্ম্ম ও স্বাধীনতা রক্ষা হইলে শিবজীর মনস্কামনা পূর্ণ হইবে; শিবজী সানন্দচিত্তে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন।"

যশোবন্ত। "সেরূপ সেনাপতিও নাই।"

মহাদেও। "তবে যিনি এই মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারিবেন তাঁহাকে সাহায্য করুন। আপনার সাহায্যে, আপনার আশীর্ব্বাদে, শিবজী অবশ্যই স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের গৌরবসাধন করিতে পারিবেন। ক্ষত্রিয়রাজ! ক্ষত্রযোদ্ধাকে সহায়তা করুন, ভারতবর্ষে এরূপ হিন্দু নাই, আকাশে এরূপ দেবতা নাই যিনি আপনাকে এজন্য প্রশংসাবাদ না করিবেন।"

যশোবন্ত ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "দ্বিজবব, তোমার তর্ক অলঙ্ঘনীয়, কিন্তু দিল্লীশ্বর আমাকে স্নেহ করিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমি কিরূপে অন্যরূপ আচরণ করিব? সে কি ভদ্রোচিত?"

মহা। "দিল্লীশ্বর যে হিন্দুদিগেব কাফের বলিয়া জিজিয়া কর স্থাপন করিয়াছেন, সে কার্য্য কি ভদ্রোচিত? দেশে দেশে যে হিন্দুপূজক, হিন্দুমন্দির, হিন্দুদেবালয়ের অবমাননা করিতেছেন, সে কি ভদ্রোচিত? কাশীর পুরাতন মন্দির চূর্ণ করিয়া সেই প্রস্তর দ্বারা সেই পুণ্যধামে মস্‌জীদ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, সে কি ভদ্রোচিত?"

ক্রোধকম্পিতস্বরে যশোবন্ত বলিলেন—"দ্বিজবর! দ্বিজবর! আর বলিবেন না, যথেষ্ট বলিয়াছেন! অদ্যাবধি শিবজী আমার মিত্র. আমি শিবজীর মিত্র। রাজপুতের প্রতিজ্ঞা কখনও মিথ্যা হয় না, অদ্যাবধি শিবজীর পণ ও আমার পণ এক, শিবজীর চেষ্টা ও আমার চেষ্টা অভিন্ন। সেই হিন্দুবিরোধী দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে এতদিন যিনি যুদ্ধ করিয়াছেন সে মহাত্মা কোথায়? একবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ের সন্তাপ দূর করি।"

মহারাষ্ট্রীয় দূত ঈষৎ হাস্য করিয়া যশোবন্তের কর্ণের নিকট মুখ লইয়া যাইয়া একটী কথা কহিলেন। শুনিবামাত্র যশোবন্ত একেবারে চমকিত হইয়া উঠিলেন, চকিতের ন্যায় ক্ষণেক নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন, বিস্ময়োৎ-

ফুল্ললোচনে দূতের দিকে দেখিতে লাগিলেন, পরে সানন্দে ও সাদরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ে গোপনে অতি মৃদুস্বরে অনেকক্ষণ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কথোপকথনের পর মহাদেও বলিলেন, "মহারাজ, অনুগ্রহ করিয়া কল্য কোন ছলে পুনা হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে থাকিলে ভাল হয়।"

যশো। "কেন? কল্য পুন্না হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবে?"

দূত হাস্য করিয়া বলিল, "না, একটী বিবাহকার্য্য সম্পাদন হইবে, মহারাজ থাকিলে শুভকার্য্যে ব্যাঘাত হইতে পারে।"

যশোবন্ত বুঝিয়া বলিলেন, "ভাল দূরেই থাকিব।" দূত বিদায় যাচ্ঞা করিলেন। যশোবন্ত ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন—

"ন্যায়শাস্ত্রী মহাশয়ের বোধ হয় অনেক দিন পাঠ সমাপন হইয়া থাকিবে; এক্ষণে স্মরণ আছে কি না।"

মহা। "তথাপি যে বিদ্যা আছে তাহাতে দিল্লীর সেনাপতি শায়েস্তাখাঁ বিস্মিত হইয়াছেন।"

যশোবন্ত দ্বার পর্য্যন্ত সঙ্গে যাইলেন, পরে বিদায়ের সময় বলিলেন, "তবে যুদ্ধবিষয়ে যেরূপ কথোপকথন হইল সেইরূপ কার্য্য করিবেন।"

মহা। "সেইরূপ কার্য্য করিবার জন্য প্রভু শিবজীকে বলিব।"

যশো। "হাঁ বিস্মরণ হইয়াছিলাম, সেইরূপ কার্য্য করিতে তোমার প্রভুকে বলিও।" হাসিতে হাসিতে শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

যশোবন্তের একজন বিশ্বস্ত অমাত্য অল্পক্ষণ পরে শিবিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার শিবির হইতে এইমাত্র এক জন অশ্বারোহী সিংহগড়প্রমুখে যাইলেন, উনি কে?"

যশোবন্ত উত্তর করিলেন, "উনি হিন্দুজাতির আশাস্বরূপ, হিন্দুধর্ম্মের প্রহরী।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শিবজী।

"অসুর-উচ্ছিষ্ট গ্রাসি পুষ্ট কলেবর?
অসুর পদাঙ্করজঃ; শোভিত মস্তকে?
তার চেয়ে শতবার পশিব গগনে,
প্রকাশি অমরবীর্য্য সমরের স্রোতে,
ভাসিব অনন্তকাল দৈত্যের সংগ্রামে,
দেবরক্ত যতদিন না হবে নিঃশেষ।"

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্ব্বদিকে রক্তিমাচ্ছটা দেখা যাইতেছে, এমন সময় ব্রাহ্মণবেশধারী শিবজী সিংহগড় প্রবেশ করিলেন। উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, উষ্ণীষ ও তূলার কুর্ত্তি ফেলিয়া দিলেন, প্রাতঃকালের আলোকে মস্তকের লৌহ শিরস্ত্রাণ ও শরীরের বর্ম্ম ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। বক্ষঃস্থলে তীক্ষ্ণ ছুরিকা, কোষে "ভবানী" নামক প্রসিদ্ধ খড়্গ। হস্তদ্বয় দীর্ঘ, বক্ষঃস্থল বিশাল, শরীর ঈষৎ খর্ব্ব বটে, কিন্তু সুবদ্ধ; সুদৃঢ়বন্ধনী ও পেশীগুলি বর্ম্মের নীচে হইতেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। পেশওয়া মুরেশ্বর ত্রিমূল পিঙ্গলী সানন্দে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—

"ভবানীর জয় হউক!" আপনি এতক্ষণ পরে কুশলে ফিরিয়া আসিলেন।"

শিব। "আপনার আশীর্ব্বাদে কোন্ বিপদ্ হইতে উদ্ধার ~~না হই~~য়াছি?"

মুর। "সমস্ত স্থির হইয়াছে?"

শিব। "সমস্ত।"

মুর। "অদ্য রাত্রি বিবাহ?"

শিব। "অদ্যই।"

মুর। "শায়েস্তাখাঁ কিছু জানেন না? তীক্ষ্ণবুদ্ধি চাঁদখাঁ কিছু জানেন না?"

শিব। "শায়েস্তাখাঁ ভীত শিবজীর নিকট সন্ধিপ্রার্থনা প্রতীক্ষা করিতেছেন; যোদ্ধা চাঁদখাঁ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, আর যুদ্ধ করিবেন না।" শিবজী সবিশেষ বিবরণ বলিলেন।

মুর। "যশোবন্ত?"

শিব। "আপনি পত্রে যে সমস্ত যুক্তি দেখাইয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছিল; আমি যাইয়াই দেখিলাম তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিয়াছেন; সুতরাং অনায়াসেই আমার কার্য্য সিদ্ধ হইল।"

মুর। "ভবানীর জয় হউক! উঃ! আপনি এক রাত্রিতে একাকী যে কার্য্যসাধন করিলেন তাহা সহস্রের অসাধ্য। যে অসমসাহসী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ভাবিলে এক্ষণও হৃৎকম্প হয়। শিবজী! শিবজী! এরূপ কার্য্যে আর প্রবৃত্ত হইবেন না, আপনার অমঙ্গল হইলে মহারাষ্ট্রের কি থাকিবে?"

শিবজী গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মুরেশ্বর! বিপদ্ ভয় করিলে অদ্যাবধি জায়গীরদার মাত্র থাকিতাম, বিপদ্ ভয় করিলে এ মহৎ উদ্দেশ্য কিরূপে সাধন হইবে? চিরজীবন বিপদে আচ্ছন্ন থাকে ক্ষতি নাই, কিন্তু ভবানী করুন যেন মহারাষ্ট্রদেশ স্বাধীন হয়।"

মুর। "বীরশ্রেষ্ঠ! আপনার জয় অনিবার্য্য, স্বয়ং ভবানী সহায়তা করিবেন। কিন্তু দ্বিপ্রহর রজনীতে, শত্রুশিবিরে, একাকী ছদ্মবেশে? অঙ্গীকার করুন এরূপ আচরণ করিবেন না, আপনার কি বিশ্বস্ত অনুচর নাই?"

শিবজী দেখিলেন বিশ্বস্ত পেশওয়ার নয়নে একবিন্দু জল। হাস্য করিয়া বলিলেন—"অদ্য সত্যই একটী মহা বিপদে পতিত হইয়াছিলাম।"

মুর। "কি?"

শিব। "এমন মূর্খকেও আপনি সংস্কৃত শ্লোক শিখাইয়াছিলেন? যে আপন নাম স্বাক্ষর করিতে পারে না, সে সংস্কৃত স্মরণ রাখিবে?"

মুর। "কেন, কি হইয়াছিল?"

শিব। "আর কিছু নহে, শায়েস্তাখাঁর সভায় যাইয়া ন্যায়শাস্ত্রী মহাশয় প্রায় সমস্ত শ্লোকগুলি ভুলিয়া গিয়াছিলেন।"

মুর। "তাহার পর?"

শিব। "দুই একটী মনে ছিল। তদ্দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধ হইল।" সহাস্য-বদনে শিবজী শয়নাগারে গেলেন।

শিবজীর সহিত আমাদের এই প্রথম পরিচয়; এইস্থলে তাঁহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত আমরা কিছু বলিতে চাই; ইতিহাসজ্ঞ পাঠক ইচ্ছা করিলে এইটী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন।

শিবজী ১৬২৭ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং আখ্যায়িকা বিবৃত সময়ে তাঁহার বয়স ৪৬ বৎসর ছিল। তাঁহার পিতার নাম শাহজী ও পিতামহের নাম মল্লজী-ভনস্লে। আমরা প্রথম অধ্যায়ে ফুল্‌তন দেশের দেশমুখ প্রসিদ্ধ নিম্বলকর বংশের কথা বলিয়াছি; সেই বংশের যোগপাল রাও নায়েকের ভগ্নী দীপাবাইকে মল্লজী বিবাহ করিয়াছিলেন। অনেক দিন অবধি সন্তানাদি না হওয়ায় আহম্মদনগরনিবাসী শাহশরীফ নামক একজন মুসলমান পীরের নিকট মল্লজী অনেক অনুরোধ করেন, এবং পীরও মল্লজীর সন্তানার্থে প্রার্থনাদি করেন। তাহারই কিছু পরে দীপা-বাইয়ের গর্ভে একটী সন্তান হওয়াতে মল্লজী সেই পীরের নামানুসারে পুত্রের নাম শাহজী রাখিলেন।

আহম্মদনগরের প্রসিদ্ধনামা লক্ষজী যাদব রাওয়ের নাম প্রথম অধ্যায়েই উল্লেখ হইয়াছে। ১৫৯৯ খ্রীঃ অব্দে হুলির দিনে মল্লজী আপন সন্তান শাহজীকে লইয়া যাদব রাওয়ের বাড়ী গিয়াছিলেন। শাহজীর বয়স তখন পাঁচ বৎসর মাত্র, যাদব রাওয়ের কন্যা জীজীর বয়স তিন কি চারি বৎসর, সুতরাং বালক বালিকা বড় আনন্দে একত্রে ক্রীড়া করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে যাদবরাও সন্তুষ্ট হইয়া আপন কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, "কেমন, তুই এই বালকটীকে বিবাহ করিবি?" পরে অন্যান্য লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দুইজনে কি সুন্দর জোড় মিলিয়াছে!" এই সময়েই শাহজী ও জীজী পরস্পরের দিকে ফাগ নিক্ষেপ করায় সকলেই হাস্য করিয়া উঠিল; কিন্তু মল্লজী সহসা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ, সাক্ষী থাকিও, যাদব রাও আমার বৈবাহিক হইবেন, অদ্য প্রতিশ্রুত হইলেন।" সকলে এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন যাদব রাও উচ্চবংশজ, শাহজীর সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিতে কখনই বাসনা করেন নাই; কিন্তু মল্লজীর এই চতুরতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন।

পরদিন যাদব রাও মল্লজীকে নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু বৈবাহিক বলিয়া স্বীকার না করিলে মল্লজী যাইবেন না বলিয়া পাঠাইলেন। যাদবরাও সেরূপ স্বীকার করিলেন না, সুতরাং মল্লজী আসিলেন না। যাদব-রাওয়ের গৃহিণী যাদবরাও হইতেও বংশমর্য্যাদার অভিমানিনী, কথিত আছে যে যাদব রাও রহস্য করিয়াও আপন দুহিতার সহিত শাহজীর বিবাহ দিবেন বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার গৃহিণী তাঁহাকে বিলক্ষণ দুই এক কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন। মল্লজী সরোষে একটী গ্রামে চলিয়া গেলেন ও প্রকাশ করিলেন যে ভবানী সাক্ষাৎ অবতীর্ণা হইয়া তাঁহাকে

বিপুল অর্থ দিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে জনশ্রুতি আছে যে ভবানী এই সময়ে মল্লজীকে বলিয়াছিলেন, "মল্লজী! তোমার বংশে একজন রাজা হইবেন, তিনি শম্ভুর ন্যায় গুণান্বিত হইবেন, মহারাষ্ট্রদেশে ন্যায়বিচার পুনঃস্থাপন করিবেন, এবং ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ের শত্রুদিগকে দূরীভূত করিবেন। তাঁহার সময় হইতে কাল গণনা হইবে ও তাঁহার সন্তানসন্ততি সপ্তবিংশ পুরুষ পর্য্যন্ত সিংহাসনারূঢ় থাকিবেন।"

সে যাহা হউক, মল্লজী যে এই সময়ে বিপুল অর্থ পাইয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। সেই অর্থের দ্বারা আত্মোন্নতির চেষ্টা করিলেন ও এ বিষয়ে তাঁহার শ্যালক যোগপালও তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। অচিরে মল্লজী আহম্মদনগরের সুল্‌তানের অধীনে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি হইলেন 'রাজা ভন্‌শ্লে' খেতাব প্রাপ্ত হইলেন, সুবর্ণী ও চাকান দুর্গ ও তৎপার্শ্বস্থ দেশের ভার প্রাপ্ত হইলেন, ও জাগীরস্বরূপ পুনা ও সোপানগর পাইলেন। তখন আর যাদব রাওয়ের কোন আপত্তি রহিল না; ১৬০৪ খ্রীঃ অব্দে মহাসমারোহে শাহজীর সহিত জীজীর বিবাহ হইল ও আহম্মদনগরের সুলতান স্বয়ং সেই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। তখন শাহজীর বয়ঃক্রম ১০ বৎসর মাত্র। কালক্রমে মল্লজীর মৃত্যুর পর শাহজী পৈতৃক জায়গীর ও পদ প্রাপ্ত হইলেন।

এই সময়ে দিল্লীশ্বর আকবরশাহ আহম্মদনগর রাজ্য দিল্লীর অধীনে আনিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছিলেন। এই যুদ্ধ প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই, আকবরের পর জহাঁগীর ও তৎপর শাহজিহান আহম্মদনগর জয়ের জন্য প্রয়াস পান ও শেষোক্ত সম্রাটের সময় ১৬৩৭ খ্রীঃ অব্দে এই রাজ্য সম্পূর্ণরূপে দিল্লীর অধীনে আইসে ও যুদ্ধ শেষ হয়। এই যুদ্ধকালে শাহজী সুষুপ্ত ছিলেন না। ১৬২০ খ্রীঃ অব্দে (জহাঁগীরের শাসনকালে) তিনি আহম্মদনগরের প্রধান সেনাপতি মালীক অম্বরের অধীনে ছিলেন ও একটী মহাযুদ্ধে আপন সাহস ও বিক্রম প্রকাশ করিয়া সকলেরই সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। নয় বৎসর পর তিনি দিল্লীশ্বর শাহজহাঁর পক্ষাবলম্বন করিলে উক্ত সম্রাট্ তাঁহাকে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি করিলেন ও অনেক জায়গীর দান করেন। কিন্তু সম্রাট্‌দিগের অনুগ্রহ আজ আছে কাল থাকে না; তিন বৎসর পর শাহজীর কতকগুলি জায়গীর সম্রাট্ কাড়িয়া লইয়া ফতেহখাঁকে দান করেন, তাহাতে শাহজী বিরক্ত হইয়া সম্রাটের পক্ষ ত্যাগ করিয়া ১৬৩২ খ্রীঃ অব্দে বিজয়পুরের সুল্‌তানের পক্ষ অবলম্বন করিলেন ও আপন মৃত্যু পর্য্যন্ত

অর্থাৎ দ্বাত্রিংশৎ বৎসরের মধ্যে কখনও বিজয়পুরের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই।

পতনোন্মুখ আহম্মদনগর রাজ্য নিজ অসাধারণ বাহুবলে দিল্লীর অধীন রাখিবার জন্য শাহজী দিল্লীর সেনার সহিত অনেক যুদ্ধ করিলেন। সুলতান শত্রুহস্তে পতিত হইলে, শাহজী সেই বংশজ আর একজনকে সুল্‌তান বলিয়া সিংহাসনে আরোপিত করিলেন কতকগুলি বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সাহায্যে দেশ শাসনের সুন্দর রীতি স্থাপন করিলেন, বহুসংখ্যক্ দুর্গ হস্তগত করিলেন, ও সুল্‌তানের নামে সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

সম্রাট্ শাহজিহান এই সমস্ত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া শাহজী ও তাঁহার প্রভু বিজয়পুরের সুল্‌তানকে এককালে দমন করিবার জন্য অষ্টচত্বারিংশৎ অশ্বারোহী ও বহুসংখ্যক্ পদাতিক প্রেরণ করিলেন। দিল্লীশ্বরের সহিত যুদ্ধ করা বিজয়পুরের সুল্‌তান বা শাহজীর সাধ্য নহে; কয়েক বৎসর যুদ্ধের পর সন্ধিস্থাপন হইল; আহম্মদনগর রাজ্য বিলুপ্ত হইল (১৬৩৭) ও শাহজী বিজয়পুরের অধীনে জায়গীরদার ও সেনাপতি রহিলেন। সুল্‌তানের আদেশানুসারে কর্ণাট দেশের অনেক অংশ জয় করিলেন, সুতরাং বিজয়পুরের উত্তরে পুনার নিকট তাঁহার যেরূপ জায়গীর ছিল, দক্ষিণে কর্ণাট দেশেও সেইরূপ বহু জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন।

জীজীবাই দ্বারা শাহজীর শম্ভুজী ও শিবজী নামে দুই পুত্র হয়। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে জীজীর পিতা লক্ষজী যাদব রাও পুরাতন দেবগড়ের হিন্দুরাজার বংশ হইতে অবতীর্ণ এরূপ জনশ্রুতি আছে। এ কথা যদি যথার্থ হয় তবে শিবজী সেই পুরাতন রাজবংশোদ্ভূত সন্দেহ নাই। ১৬৩০ খ্রীঃ অব্দে শাহজী টুকাবাইনাম্নী আর একটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন; অভিমানিনী জীজীবাই তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামীর সংসর্গ ত্যাগ করিয়া পুত্র শিবজীকে লইয়া পুনার জায়গীরে আসিয়া অবস্থিতি করিতেন; শাহজী টুকাবাইকে লইয়া কর্ণাটেই থাকিতেন ও তাহার গর্ভে বেনকাজী নামে একটী পুত্র হইল।

শাহজীর দুইজন অতি বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও কর্ম্মচারী ছিলেন। দাদাজী কানাইদেব পুনায় জায়গীর রক্ষা করিতেন এবং জীজী ও শিশু শিবজীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন; ও নারায়ণপন্ত নামে অন্য কর্ম্মচারী কর্ণাটের জায়গীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

১৬২৭ খ্রীঃ অব্দে সুবর্ণীদুর্গে শিবজীর জন্ম হয়। এই দুর্গ পুনা হইতে অনুমান ২৫ ক্রোশ উত্তরে ও জুনীর নামে খ্যাত। শিবজীর তিন বৎসর

বয়সের সময় শাহজী টুকাবাইকে বিবাহ করিলেন, সুতরাং জীজীর সহিত বিচ্ছেদ জন্মিল। শাহজী কর্ণাটাভিমুখে যাইলেন, জীজী সপুত্রে পুনায় আসিয়া দাদাজী কানাইদেবের রক্ষণাবেক্ষণে বাস করিতে লাগিলেন।

শিবজীর বাসার্থে দাদাজী পুনানগরে একটী বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন, আমরা ইতিপূর্ব্বে সেই গৃহে শায়েস্তাখাঁকে দেখিয়াছি।

মাতাপুত্রে সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন, ও বাল্যকালাবধি শিবজী দাদাজীর নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। শিবজী কখনও নাম লিখিতেও শিখেন নাই; কিন্তু অল্পবয়সেই ধনুর্ব্বাণ ব্যবহার, বর্শা নিক্ষেপ, নানারূপ মহারাষ্ট্রীয় খড়্গ ও ছুরিকা চালন ও অশ্বারোহণে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়মাত্রেই অশ্বচালনায় তৎপর, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যেও শিবজী বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিলেন। এইরূপ ব্যায়াম ও যুদ্ধশিক্ষায় বালকের দেহ শীঘ্রই সুদৃঢ় ও বলবান হইয়া উঠিল।

কিন্তু কেবল অস্ত্রবিদ্যায়ই শিবজী কাল অতিবাহিত করিতেন না, যখন অবসর পাইতেন, দাদাজীর চরণোপান্তে বসিয়া মহাভারত ও রামায়ণের অনন্ত বীরত্বের গল্প শ্রবণ করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। শুনিতে শুনিতে বালকের হৃদয়ে সাহসের উদ্রেক হইল, হিন্দুধর্ম্মে আস্থা দৃঢ়ীভূত হইল, সেই পূর্ব্বকালীন বীরদিগের বীরত্ব অনুকরণ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইল; ধর্ম্মবিদ্বেষী মুসলমানদিগের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিল। অচিরাৎ শাস্ত্রানুযায়িক সমুদায় ক্রিয়াকর্ম্ম শিখিলেন, এবং কথা শুনিতে এরূপ আগ্রহ জন্মিল যে, অনেক বৎসর পর যখন দেশে খ্যাতি ও রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, তখন পর্য্যন্ত কোন স্থানে কথা হইবে শুনিলে বহু বিপদ ও কষ্ট সহ্য করিয়াও তথায় উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিতেন।

এইরূপে দাদাজীর যত্নে শিবজী অল্পকালমধ্যেই স্বধর্ম্মানুরক্ত ও অতিশয় মুসলমানবিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন, ও ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে স্বাধীন পলীগার হইবার জন্য নানারূপ সংকল্প করিতে লাগিলেন। আপনার ন্যায় উৎসাহী যুবকদিগকে ও দস্যুগণকেও চারিদিকে জড় করিতে লাগিলেন, ও পর্ব্বতপরিপূর্ণ কঙ্কণদেশে তাহাদিগের সহিত সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন। সেই পর্ব্বত কিরূপে উল্লঙ্ঘন করা যায়, কোথায় পথ আছে, কোন্ পথে কোন্ দুর্গে যাওয়া যায়, কোন্ কোন্ দুর্গ অতিশয় দুর্গম, কিরূপে দুর্গ আক্রমণ বা রক্ষা করা যায়, এ সকল চিন্তায় বালকের দিন অতিবাহিত হইত। কখন কখন কয়েকদিন ক্রমাগত এই পর্ব্বত ও উপত্যকার মধ্যে যাপন করিতেন, কোন দুর্গ, কোন পথ, কোন উপত্যকা শিবজীর অজ্ঞাত ছিল

না। শেষে কিরূপে দুই একটী দুর্গ হস্তগত করিবেন এই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বালকের এইরূপ কথা শুনিয়া ও আচরণ দেখিয়া বৃদ্ধ দাদাজী ভীত হইতে লাগিলেন। তিনি অনেক প্রবোধবাক্য দ্বারা বালককে সে পথ হইতে আনয়ন করিয়া জায়গীর যাহাতে সুচারুরূপে রক্ষা হয়, তাহাই শিখাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শিবজীর হৃদয়ে যে বীরত্বের অঙ্কুর স্থাপিত হইয়াছিল তাহা আর উৎপাটিত হইল না। শিবজী দাদাজীকে পিতৃতুল্য সম্মান করিতেন, কিন্তু যে উন্নত পথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিলেন না।

মাউলীজাতীয়দিগের কষ্টসহিষ্ণুতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য শিবজী তাহাদিগকে বড় ভাল বাসিতেন, ও তাঁহার যৌবনসুহৃদ্গণের মধ্যে যশজী-কঙ্ক, তনজীমালশ্রী ও বাজী-ফাসলকর নামক তিনজন মাউলীই প্রিয়তম ও অগ্রগণ্য ছিলেন। পরিশেষে ইহাঁদের সহায়তায় ১৬৪৬ খৃঃ অব্দে তোরণ-দুর্গের কিল্লাদারকে কোনরূপে বশবর্ত্তী করিয়া শিবজী সেই দুর্গ হস্তগত করিলেন। এই আখ্যায়িকার প্রারম্ভেই তোরণদুর্গের বর্ণনা করা হইয়াছে; এই প্রথম বিজয়ের সময় শিবজীর বয়ঃক্রম ঊনবিংশ বর্ষ মাত্র। ইহারই পর-বৎসর তোরণদুর্গের দেড় ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটী তুঙ্গগিরিশৃঙ্গের উপর শিবজী একটী নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন ও তাহার রাজগড় নাম দিলেন।

বিজয়পুরের সুলতান এই সমস্ত বিষয়ের সমাচার প্রাপ্ত হইয়া শিবজীর পিতা শাহজীকে তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন ও এই সমস্ত উপদ্রবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিজয়পুরের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী শাহজী এসমস্ত বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না, তিনি দাদাজীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দাদাজী কানাইদেব শিবজীকে পুনরায় ডাকাইলেন। এই রূপ আচরণে সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভব তাহা অনেক বুঝাইলেন, ও বিজয়-পুরের অধীনে কার্য্য করিয়া শিবজীর পিতা কিরূপ বিপুল অর্থ, জায়গীর, ক্ষমতা ও সম্মান পাইয়াছেন, তাহাও দেখাইলেন। শিবজী পিতৃসদৃশ দাদাজীকে আর কি বলিবেন, মিষ্ট বাক্যদ্বারা উত্তরদান করিলেন, কিন্তু আপন কার্য্যে নিরস্ত হইলেন না। ইহার কিছুদিন পরেই দাদাজীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর প্রাক্কালেই দাদাজী শিবজীকে আর একবার ডাকাইয়া নিকটে আনেন। বৃদ্ধ পুনরায় ভৎর্সনা করিবেন এই বিবেচনা করিয়া শিবজী তথায় যাইলেন, কিন্তু যাহা শুনিলেন তাহাতে বিস্মিত হইলেন। মৃত্যু-শয্যায় যেন দাদাজীর দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইল, তিনি শিবজীকে সস্নেহভাবে

বলিলেন, "বৎস, তুমি যে চেষ্টা করিতেছ তাহা হইতে মহত্তর চেষ্টা আর নাই। এই উন্নত পথ অনুসরণ কর, দেশের স্বাধীনতা সাধন কর, ব্রাহ্মণ, গোবৎসাদি ও কৃষকগণকে রক্ষা কর, দেবালয়কলুষিতকারী-দিগকে শাস্তিপ্রদান কর, ঈশানী যে উন্নত পথ তোমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই পথ অনুধাবন কর।" বৃদ্ধ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন, শিবজীর হৃদয় এই দিব্য উপদেশ পাইয়া উৎসাহ ও সাহসে দশগুণ স্ফীত হইয়া উঠিল। তখন শিবজীর বয়ঃক্রম বিংশ বৎসর।

সেই বৎসরেই চাকন ও কন্দানা দুর্গের কিল্লাদারগণকে অর্থে বশীভূত করিয়া শিবজী উভয় দুর্গ হস্তগত করেন, ও কান্দানার নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া সিংহগড় নাম রাখেন। আখ্যায়িকায় চাকন ও সিংহগড়ের কথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। শিবজীর বিমাতা টুকাবাইয়ের ভ্রাতা বাজী মহিতী সোপা দুর্গের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদিন দ্বিপ্রহর রজনীসময়ে আপন মাউলী সৈন্য লইয়া শিবজী এই দুর্গ সহসা আক্রমণ করিয়া হস্তগত করেন। মাতুলের প্রতি কোনও অত্যাচার না করিয়া তাহাকে কর্ণাটে পিতার নিকট পাঠাইয়া দেন। তৎপরেই পুরন্দর দুর্গের অধীশ্বরের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে ভ্রাতৃকলহ হয়, শিবজী কনিষ্ঠ দুই ভাইয়ের সহায়তা করিবার ছলনায় আপনি সেই দুর্গ হস্তগত করেন। এই অভদ্র আচরণে তিন ভ্রাতাই শিবজীর উপর বিরক্ত হইলেন, কিন্তু শিবজী যখন দেশের স্বাধীনতা-স্বরূপ আপন মহৎ উদ্দেশ্য তাঁহাদিগের নিকট ব্যক্ত করিলেন, যখন সেই উদ্দেশ্যসাধনজন্য ভ্রাতৃগণ হইতে সহায়তা যাজ্ঞা করিলেন, তখন তাঁহাদিগের ক্রোধ রহিল না। শিবজীর বাক্‌পটুতার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল; তাঁহার কথা শুনিয়া ও তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া তিন ভ্রাতাই শিবজীর অধীনে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

এইরূপে শিবজী একে একে অনেক দুর্গ হস্তগত করেন, তাহাদের নাম লিখিয়া এই আখ্যায়িকা পূর্ণ করিবার আবশ্যক নাই। ১৬৪৮ খৃঃ অব্দে শিবজীর কর্ম্মচারী আবাজী স্বর্ণদেব কল্যাণদুর্গ ও সমস্ত কল্যাণী প্রদেশ জয় করিলেন, তখন বিজয়পুরের সুলতান ক্রুদ্ধ হইয়া শিবজীর পিতা শাহজীকে কারারুদ্ধ করিলেন ও তাঁহাকে এক প্রস্তরময় ঘরে রাখিয়া আদেশ করিলেন যে, নিয়মিত সময়ের মধ্যে শিবজী অধীনতা স্বীকার না করিলে সেই গৃহের দ্বার প্রস্তরদ্বারা একেবারে রুদ্ধ হইবে। শিবজী দিল্লীশ্বরের নিকট আবেদন করিয়া পিতার প্রাণ বাঁচাইলেন, কিন্তু চারি বৎসরকাল শাহজী বিজয়পুরে বন্দীস্বরূপ রহিলেন।

জৌলীর রাজা চন্দ্ররাওকে শিবজী স্বপক্ষে আনিবার জন্য ও মুসলমানের অধীনতা-শৃঙ্খল চূর্ণ করিবার জন্য অনেক পরামর্শ দেন। চন্দ্ররাও যখন একেবারে অস্বীকার করিলেন, তখন শিবজী নিজ লোকদ্বারা সেই রাজা ও তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করাইয়া, সহসা রাত্রিযোগে আক্রমণ করিয়া সেই দুর্গ হস্তগত করেন। শিবজী আপন উদ্দেশ্যসাধনার্থ অনেক গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ গর্হিত কার্য্য আর একটী করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। সমস্ত জৌলীপ্রদেশ অধিকার করিলেন ও সেই বৎসরেই (১৬৫৬) প্রতাপগড় নামক একটী নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন, ও আপন প্রধান মন্ত্রী সম্রাজপন্তকে পেশওয়া খেতাব দিলেন। কিন্তু দুই বৎসর পরে সম্রাজ কঙ্কণদেশে ফতেখাঁর নিকট পরাস্ত হওয়ায় শিবজী তাঁহাকে অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়া পদচ্যুত করিলেন ও মুরেশ্বর ত্রিমুল পিঙ্গলীকে পেশওয়া করেন। মুরেশ্বরের সহিত পাঠক পূর্ব্বেই পরিচিত হইয়াছেন। সমগ্র কঙ্কণদেশ জয় করিবার জন্য বহুসংখ্যক্ সৈন্য জড় হইল।

এবার বিজয়পুরের সুলতান শিবজীকে একেবারে ধ্বংস করিবার মানস করিলেন। আবুল ফাজেল নামক একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ৫০০০ অশ্বারোহী ও ৭০০০ পদাতিক ও বহুসংখ্যক্ কামান লইয়া যাত্রা করিলেন। গর্ব্বিত-ভাবে প্রকাশ করিলেন যে, শীঘ্রই সেই অকিঞ্চিৎকর বিদ্রোহীকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া সুলতানের পায়তখ্‌তের নিকট উপস্থিত করিবেন। (১৬৫৯ খৃঃ অব্দ।)

এ সৈন্যের সহিত সম্মুখযুদ্ধ অসম্ভব; শিবজী সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। আবুল ফাজেল গোপীনাথনামক একজন ব্রাহ্মণকে শিবজী-সদনে প্রেরণ করিলেন। প্রতাপগড় দুর্গের নিকট সভামধ্যে সাক্ষাৎ হইল ও নানারূপ কথাবার্ত্তা হইল; রজনী যাপনার্থ গোপীনাথের জন্য একটী স্থান নির্দ্দেশ করা হইল।

রজনীযোগে শিবজী গোপীনাথের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। শিবজীর অসাধারণ বাক্‌পটুতা ছিল, তিনি গোপীনাথকে অনেক প্রকার বুঝাইয়া বলিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি আমার শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আমার কথাগুলি শ্রবণ করুন। আমি যাহাই করিয়াছি সমস্তই হিন্দুজাতির জন্য, হিন্দুধর্ম্মের জন্য করিয়াছি; স্বয়ং ভবানী আমাকে ব্রাহ্মণ ও গোবৎসাদিকে রক্ষা করিবার জন্য উত্তেজনা করিয়াছেন, হিন্দুদেব ও দেবালয়ের উচ্ছিষ্ট-কারিদিগের দণ্ড দিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, ও স্বধর্ম্মের শত্রুর বিরুদ্ধাচরণ করিতে

আদেশ করিয়াছেন। আপনি ব্রাহ্মণ, ভবানীর আদেশ সমর্থন করুন, ও আপন জাতীয় ও দেশীয় লোকের মধ্যে স্বচ্ছন্দে বাস করুন।" এইরূপ উত্তেজনাবাক্যের পর শিবজী প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, জয়লাভ হইলে তিনি গোপীনাথকে হেওরা গ্রাম অর্পণ করিবেন, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সেই গ্রাম তাঁহাদেরই থাকিবে। গোপীনাথ এই সমস্ত বাক্যে তুষ্ট হইয়া শিবজীর সহায়তা করিতে স্বীকার করিলেন; পরামর্শ স্থির হইল যে কার্য্যসিদ্ধির জন্য আবুল ফাজেলের সহিত শিবজীর কোন স্থানে সাক্ষাৎ করা আবশ্যক।

কয়েকদিন পর প্রতাপগড় দুর্গের নিকটই সাক্ষাৎ হইল। আবুল ফাজেলের পঞ্চদশ শত সেনা দুর্গ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে রহিল, তিনি স্বয়ং একমাত্র সহচরের সহিত শিবিকারোহণে নির্দ্দিষ্ট গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিবজী সেইদিন বহু যত্নে প্রাতে স্নান পূজাদি সমাপন করিলেন; স্নেহময়ী মাতার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিলেন; তুলার কুর্ত্তি ও উষ্ণীষের নীচে লৌহবর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ ধারণ করিলেন; দুর্গ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, বাল্যসহচর তন্নজীমালশ্রীকে সঙ্গে লইয়া আবুল ফাজেলের নিকট আসিলেন,—আলিঙ্গনচ্ছলে তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা মুসলমানকে ভূতলশায়ী করিলেন। শিবজীর উদ্দেশ্য সাধন হইল, কিন্তু এই গর্হিত কার্য্যে তাঁহার যশোরাশি চিরকাল কলুষিত থাকিবে। তৎক্ষণাৎ শিবজীর গুপ্তসেনা আবুল ফাজেলের সেনাকে পরাস্ত করিল, অন্নজীদত্ত নামক শিবজীর প্রসিদ্ধ কর্ম্মচারী পানাল্লা ও পবনগড় হস্তগত করিলেন, শিবজী বসন্তগড়, বন্ধন ও বিশালগড় হস্তগত করিলেন, ও বিজয়পুরের অন্য সেনাপতি রস্তম জমানকে সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিজয়পুরের দ্বার পর্য্যন্ত যাইয়া দেশ লুণ্ঠন করিয়া আনিলেন।

বিজয়পুরের সহিত যুদ্ধ আরও তিন বৎসর পর্য্যন্ত চলিতে লাগিল, কিন্তু কোন পক্ষই বিশেষ জয়লাভ করিতে পারিল না। অবশেষে ১৬৬২ খৃঃ অব্দে শাহজী মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিজয়পুর ও শিবজীর মধ্যে সন্ধি সংস্থাপন করিয়া দিলেন। শাহজী যখন শিবজীকে দেখিতে আসিলেন, শিবজী পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আপনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পিতাকে রাজার তুল্য অভিবাদন করিলেন, পিতার শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলিলেন, ও পিতা বসিতে আদেশ করিলেও তিনি পিতার সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলেন না। কয়েকদিন পুত্রের নিকট থাকিয়া শাহজী পরম তুষ্ট হইয়া বিজয়পুরে যাইলেন, ও সন্ধিসংস্থাপন করিয়া দিলেন।

শিবজী পিতাকর্ত্তৃক সংস্থাপিত এই সন্ধির বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। শাহজীর জীবদ্দশায় শিবজীর সহিত বিজয়পুরের আর যুদ্ধ হয় নাই, তাহার পরও যখন যুদ্ধ হয়, সে সময়ে শিবজী আক্রমণকারী ছিলেন না।

১৬৬২ খৃঃ অব্দে এই সন্ধি স্থাপন হয়, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই বৎসরই মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হয়। আমাদের আখ্যায়িকাও এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভের সময় সমস্ত কঙ্কণদেশ শিবজী অধিকৃত করিয়াছিলেন, ও তাঁহার সপ্ত সহস্র অশ্বারোহী ও পঞ্চাশৎ সহস্র পদাতিক সেনা ছিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

শুভকার্য্য সম্পাদন।

"যুগে যুগে কল্পে কল্পে নিত্য নিরন্তর,
জ্বলুক গগন ব্যাপি অনন্ত বহ্নিতে।
জ্বলুক সে দেবতেজ স্বর্গ সংবেষ্টিয়া,
অহোরাত্রি অবিশ্রান্ত প্রদীপ্ত শিখায়,
দহুক দানবকুল দেবের বিক্রমে
পুত্র পরম্পরা দগ্ধ চির শোকানলে।"

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূর্য্য অস্তাচল-চূড়া অবলম্বন করিয়াছেন, সিংহগড় দুর্গের ভিতর সৈন্য-গণ নিঃশব্দে সজ্জিত হইতেছে; এত নিঃশব্দে যে দুর্গের বাহিরের লোকও দুর্গের ভিতর কি হইতেছে তাহা জানিতে পারে নাই।

দুর্গের একটী উন্নত স্থানে কয়েকজন মহাযোদ্ধা দণ্ডায়মান রহিয়া-ছেন; সেই দুর্গচূড়া হইতে দৃশ্য অতি মনোহর! দুর্গতলে, পূর্ব্বদিকে সুন্দর নীরানদী প্রবাহিত হইয়াছে, সেই নদীর উপত্যকা বসন্তকালের নব পুষ্পপত্র ও দূর্ব্বাদলে সুশোভিত হইয়া মনোহর রূপধারণ করিয়াছে। উত্তরদিকে বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র, যতদূর পর্য্যন্ত সুন্দর হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে। বহুদূরে বিস্তীর্ণ পুনানগরী সুন্দর শোভা পাই-তেছে, যোদ্ধাগণ প্রায়ই সেইদিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, অদ্য রজনীতে সেই নগরীতে কি বিষম ঘটনা সংঘটিত হইবে তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। কেহ কেহ বা দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে দেখিতেছিলেন, উন্নত পর্ব্বতের পর

উন্নত পর্ব্বত, যতদূর দেখা যায়, অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণী নীল মেঘমালায় বি-জড়িত রহিয়াছে, অথবা অস্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্য্যকিরণে অপূর্ব্ব শোভা পাই-তেছে! কিন্তু বোধ করি যোদ্ধাগণ এই চমৎকার পর্ব্বতদৃশ্যের বিষয় ভাবিতেছিলেন না; অন্য চিন্তায় অভিভূত রহিয়াছেন।

যে যুদ্ধে বা যে অসমসাহসিক কার্য্যে একেবারে বহুকালের বাঞ্ছিত ফললাভ হইতে পারে, বা এককালে সর্ব্বনাশ হইতে পারে, তাহার প্রাক্কালে মুহূর্ত্তের জন্যও অতিশয় সাহসিক হৃদয়ও চিন্তাপূর্ণ ও স্তম্ভিত হয়। অদ্য শায়েস্তাখাঁ ও মোগল সৈন্য ছিন্নভিন্ন ও পরাভূত হইবে, অথবা অসমসাহসে মহারাষ্ট্র-সূর্য্য একেবারে চির-অন্ধকারে অস্ত যাইবে, এইরূপ চিন্তা অগত্যা যোদ্ধাদিগের হৃদয়ে উদ্রেক হইতে লাগিল। কেহ এ চিন্তা ব্যক্ত করিলেন না, ভবানীর আশীর্ব্বাদে অবশ্যই জয় হইবে, সকলেই এইরূপ বলিয়া-ছিলেন, তথাপি যখন নিঃশব্দে যোদ্ধা যোদ্ধার দিকে নিরীক্ষণ করিলেন, তখন কাহারও মনোগত ভাব লুক্কায়িত রহিল না। কেবল বিংশ বা পঞ্চবিংশ মাত্র সেনা লইয়া শিবজী শত্রুসেনার মধ্যে যাইয়া আক্রমণ করিবেন। এরূপ ভীষণ কার্য্যে শিবজীও কখন লিপ্ত হইয়াছেন কি না সন্দেহ। কেনই বা যোদ্ধাদিগের ললাট মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তামেঘাচ্ছন্ন না হইবে?

সেই বীরমণ্ডলীর মধ্যে বহুদর্শী পেশওয়া মুরেশ্বর ত্রিমূল ছিলেন। অল্পবয়সে তিনি শিবজীর পিতা শাহজীর অধীনে যুদ্ধব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, পরে শিবজীর অধীনে আসিয়া প্রতাপগড়ের চমৎকার দুর্গ তিনিই নির্ম্মাণ করেন। চারি বৎসরাবধি পেশওয়াপদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি সেই পদের যোগ্যতা বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আবুল ফাজেলকে শিবজী হত্যা করিলে পর মুরেশ্বরই তাঁহার সেনাকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিয়াছিলেন, পরে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হওনাবধি তিনিই পদা-তিক সৈন্যের সরনৌবৎ অর্থাৎ সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। যুদ্ধকালে সাহসী, বিপদ্ কালে স্থির ও অবিচলিত, পরামর্শে বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী, মুরেশ্বর অপেক্ষা কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী ও প্রকৃত বন্ধু শিবজীর আর ছিল না।

আবাজী স্বর্ণদেব নামে তথায় দ্বিতীয় একজন দূরদর্শী ও যুদ্ধপটু ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম নীলুপন্ত স্বর্ণদেব; কিন্তু আবাজী নামেই তিনি খ্যাত ছিলেন। তিনিই ১৬৪৮ খৃঃ অব্দে কল্যাণদুর্গ ও সমস্ত কল্যাণী প্রদেশ হস্তগত করেন, এবং সম্প্রতি রায়গড়ের প্রসিদ্ধ দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধনামা অন্নজীদত্তও অদ্য সিংহগড়ে উপস্থিত ছিলেন। চারি বৎসর পূর্ব্বে তিনিই পানাল্লা ও পবনগড় হস্তগত করেন, ও শিবজীর কর্ম্মচারীর মধ্যে একজন প্রধান ও অতিশয় কার্য্যদক্ষ ছিলেন।

অশ্বারোহীর সরনোবৎ অর্থাৎ সেনাপতি নিতাইজী পহলকর সিংহগড়ে ছিলেন না; তিনি কিরূপে মোগল সৈন্যের সম্মুখ দিয়া যাইয়া আরঙ্গাবাদ ও আহম্মদনগর ছারখার করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা আমরা শায়েস্তাখাঁর সভায় চাঁদখাঁর প্রমুখাৎ শুনিয়াছি। সিংহগড়ে সে সময়ে কেবল অল্পসংখ্যক্ অশ্বারোহী সেনা কর্ত্তাজী গুজ্জর নামক একজন নীচস্থ সেনানীর অধীনে অবস্থিতি করিতেছিল।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে শিবজীর তিনজন প্রধান মাউলী বাল্য সুহৃদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে বাজী ফাসলকরের তিন বৎসর পূর্ব্বেই মৃত্যু হইয়াছিল; তন্নজী মালশ্রী ও যশজী কঙ্ক অদ্য সিংহগড়ে উপস্থিত ছিলেন। বাল্যকালের সৌহার্দ্দ্য, যৌবনের বিষম সাহস ইহাঁরা এক্ষণও ভুলেন নাই, শিবজীকে প্রাণের ন্যায় ভাল বাসিতেন, শতবার রজনীযোগে মাউলী সৈন্য লইয়া শিবজীর সহিত শত পর্ব্বতদুর্গ নিঃশব্দে আরোহণ করিয়া সহসা অধিকার করিয়াছিলেন।

সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, সন্ধ্যার ছায়া যেন স্তরে স্তরে জগতে অবতীর্ণ হইতেছে, তখনও সেই যোদ্ধৃমণ্ডলী দুর্গশৃঙ্গে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান; এমত সময়ে শিবজী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক, কিন্তু ভয়ের লেশমাত্র দৃষ্ট হয় না। যোদ্ধার নয়ন উজ্জ্বল, বস্ত্রের নীচে তিনি বর্ম্ম ও অস্ত্রধারণ করিয়াছেন, অদ্য নিশির অসমসাহসিক কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। দৃষ্টি স্থির ও অবিচলিত।

ধীরে ধীরে বলিলেন, “সমস্ত প্রস্তুত, বন্ধুগণ বিদায় দিন।”

ক্ষণেক সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, শেষে মুরেশ্বরপন্ত বলিলেন, “তবে স্থির করিয়াছেন, অদ্য রজনীতে স্বর্ণদেব কি অন্নজী কি আমাকে সঙ্গে যাইতে দিবেন না? মহাত্মন্! বিপদ্‌কালে কবে আমরা আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছি?”

শিবজী। “পেশওয়াজী! ক্ষমা করুন, আর অনুরোধ করিবেন না; আপনাদের সাহস, আপনাদের বিক্রম, আপনাদের বিজ্ঞতা আমার নিকট অবিদিত নাই; কিন্তু অদ্য ক্ষমা করুন। ভবানীর আদেশে আমি অদ্য বিষম প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অদ্য আমিই এই কার্য্য সাধন করিব, নচেৎ অকিঞ্চিৎকর প্রাণ বিসর্জ্জন দিব। আশীর্ব্বাদ করুন জয়লাভ করিব;

নচেৎ যদি অমঙ্গল হয়, যদি অদ্যকার কার্য্যে নিধন প্রাপ্ত হই, তথাপি আপনারা তিনজন থাকিলে মহারাষ্ট্রের সকলেই রহিল। আপনারা আমার সহিত বিনষ্ট হইলে কাহার দূরদর্শী বুদ্ধিবলে দেশ থাকিবে? কাহার বাহুবলে স্বাধীনতা থাকিবে? হিন্দুগৌরব কে রক্ষা করিবে? যাত্রাকালে আর অনুরোধ করিবেন না।"

পেশওয়া বুঝিলেন আর অনুরোধ করা বৃথা, সুতরাং আর কিছু বলিলেন না। শিবজী পেশওয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"মুরেশ্বর, আপনি পিতার নিকট কার্য্য করিয়াছেন, আপনি আমার পিতৃতুল্য; আশীর্ব্বাদ করুন যেন আজ জয়লাভ করিতে পারি, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ অবশ্যই ফলিবে। আবাজী! অন্নজী! আশীর্ব্বাদ করুন, আমি কার্য্যে প্রস্থান করি।" সকলেই বাষ্পোৎফুল্ললোচনে বিদায় দিলেন।

পরে তন্নজী ও যশজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাল্যসুহৃদ্! বিদায় দাও।

দুইজনই থেমে নির্ব্বাক্! ক্ষণেক পর তন্নজী বলিলেন—"প্রভু! কি অপরাধে আমাদের সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিতেছেন? কোন্ নৈশ ব্যাপারে, কোন্ দুর্গজয়ের সময় আমরা প্রভুর সঙ্গে না ছিলাম? পূর্ব্বকাল স্মরণ করিয়া দেখুন, কঙ্কণদেশে আপনার সহিত কে ভ্রমণ করিত? শৈলচূড়ে, উপত্যকায়, পর্ব্বতগহ্বরে, তরঙ্গিণীতীরে কে আপনার সহিত দিবায় শিকার করিত, রজনীতে একত্র শয়ন করিত, বা দুর্গজয়ের পরামর্শ করিত? যশজী, মৃত বাজী, আর এই দাস তন্নজী। বাজী প্রভুর কার্য্যে হত হইয়াছে, আমাদেরও তাহা ভিন্ন অন্য বাসনা নাই! অনুমতি করুন অদ্য প্রভুর সঙ্গে যাই, জয়লাভ হইলে প্রভুর আনন্দে আনন্দিত হইব, যদি প্রভু বিনষ্ট হন, বিবেচনা করুন আমাদের এস্থানে জীবিত থাকিলে কোন উপকার নাই; আমাদের এরূপ বুদ্ধিবল নাই যে পরে রাজকার্য্যে কোন সাহায্য করি। আপনার বাল্যসুহৃদকে বঞ্চিত করিবেন না।"

শিবজী দেখিলেন তন্নজীর চক্ষে জল; মুগ্ধ হইয়া তন্নজী ও যশজীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ! তোমাদিগকে অদেয় আমার কিছুই নাই;—শীঘ্র, রণসজ্জা করিয়া লও।" দুইজনে বিদ্যুৎগতিতে দুর্গের নীচে অবতরণ করিলেন, তথায় বর্ষাকালের সায়ংকালিক কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশির ন্যায় রাশি রাশি সৈন্য সজ্জিত হইতেছিল। শিবজী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

দুঃখিনী জীজী একাকী একটী ঘরে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, পুত্রের অদ্যকার বিপদে রক্ষাপ্রার্থনা করিতেছিলেন, এমত সময় শিবজী আসিয়া বলিলেন—

"মাতঃ! আশীর্ব্বাদ করুন, বিদায় হই।"

জীজী স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন, "বৎস! আইস একবার তোমাকে আলিঙ্গন করি; কবে তোমার এ বিপদরাশি শেষ হইবে, কবে এ দুঃখিনীর শোক ও চিন্তা শেষ হইবে।"

শিব। "মাতঃ! আপনার আশীর্ব্বাদে কবে কোন্ বিপদ হইতে উদ্ধার না হইয়াছি? কোন্ যুদ্ধে জয়ী না হইয়াছি?"

জীজী। "বৎস! দীর্ঘ-জয়ী হও, ঈশানী তোমাকে রক্ষা করুন! সস্নেহে শিবজীর মস্তকে হাত দিলেন, দুই নয়ন বহিয়া অশ্রুজল শীর্ণ বক্ষঃস্থলের উপর পড়িতে লাগিল।

শিবজী সকলের নিকট বিদায় লইয়াছেন; এতক্ষণ তাঁহার দৃষ্টি স্থির ও স্বর অকম্পিত ছিল; এক্ষণ আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, চক্ষুর্দ্বয় ছল্ ছল্ করিতে লাগিল; উদ্বেগকম্পিতস্বরে বলিলেন—

"স্নেহময়ী জননি! আপনিই আমার ঈশানী, আপনাকে যেন ভক্তিভাবে চিরজীবন পূজা করি; আপনার আশীর্ব্বাদে সকল বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিব।" বীরশ্রেষ্ঠ মাতার চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন, মাতৃস্নেহের পবিত্র অশ্রুবারিতে সেই পবিত্র পদযুগল ধৌত করিলেন।

জীজী পুত্রকে হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন, ও বহু অশ্রুপাত করিয়া বিদারকালে বলিলেন, "বৎস! হিন্দুধর্ম্মের জয়সাধন কর; স্বয়ং দেবরাজ শম্ভু তোমার সাহায্য করিবেন।" শিবজী অশ্রুমোচন করিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে গেলেন।

সমস্ত সেনা সজ্জিত। শিবজী নিঃশব্দে অশ্বারোহণ করিলেন, নিঃশব্দে সৈন্যগণ দুর্গদ্বার অতিক্রম করিল।

দুর্গদ্বার অতিক্রম করিবার সময়ে একজন অতি অল্পবয়স্ক যোদ্ধা শিবজীর সম্মুখে আসিয়া শির নোয়াইল; শিবজী তাহাকে চিনিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন—

"রঘুনাথজী হাবিলদার! তোমার কি প্রার্থনা?"

রঘু। "প্রভু, যেদিন তোরণদুর্গ হইতে পত্রাদি আনিয়াছিলাম, সে দিন প্রসন্ন হইয়া পুরস্কার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।"

শিব। "অদ্য এই উৎকট ব্যাপারের প্রারম্ভে কি পুরস্কার চাহিতে আসিয়াছ?"

রঘু। "এই পুরস্কার চাই যে, ঐ উৎকট ব্যাপারে আমাকে লিপ্ত হইতে দিন; যে পঞ্চবিংশ মাউলী যোদ্ধার সহিত পুনানগরে প্রবেশ করিবেন, দাসকে তাহাদের সহিত আপনার সঙ্গে যাইতে আদেশ করুন।"

শিব। "কেন ইচ্ছাপূর্ব্বক এ সঙ্কটে আসিতেছ? তোমার এই বিষয়েই বা বিশেষ কি অধিকার আছে?"

রঘু। "রাজন্! আমি ক্ষুদ্রতম সেনা, আমার বিশেষ অধিকার কি থাকিবে? এইমাত্র আছে যে, আমার এ জগতে কেহ নাই, অন্যে মরিলে লোকে শোক করিবে, আমি এই আহবে মরিলে আক্ষেপ করিবে এরূপ জনমাত্র লোক নাই। আর যদি প্রভুকে কার্য্যদ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারি, জীবিত থাকিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারি, তবে,—তবে ভবিষ্যতে আমার মঙ্গল।"

রঘুনাথের সেই কৃষ্ণ কেশগুচ্ছগুলি ভ্রমরবিনিন্দিত নয়নের উপর পড়িয়াছে, সেইরূপ বালকের সরল উদার মুখমণ্ডলে যোদ্ধার স্থিরপ্রতিজ্ঞা বিরাজ করিতেছে। অল্পবয়স্ক যোদ্ধার এইরূপ কথা শুনিয়া ও উদার মুখ-মণ্ডল দেখিয়া শিবজী সন্তুষ্ট হইলেন, ও সঙ্গে পুনার ভিতর যাইতে অনুমতি দিলেন। রঘুনাথ আবার শির নত করিয়া পরে লম্ফ দিয়া অশ্বে অধিরোহণ করিলেন।

সিংহগড় হইতে পুনা পর্য্যন্ত সমস্ত পথে শিবজী নিজ সৈন্য রাখিলেন। সন্ধ্যার ছায়ায় নিঃশব্দে সেই পথের স্থানে স্থানে সেনা সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন। একটী দীপ জ্বলিলে বা সৈন্যেরা শব্দ করিলে পুনায় তাঁহার এই কার্য্য প্রকাশ হইতে পারে, সুতরাং নিঃশব্দে অন্ধকারে সৈন্য সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন।

সে কার্য্য শেষ হইল, রজনী জগতে গাঢ় অন্ধকার বিস্তার করিল, শিবজী, তন্নজী ও যশজী ২৫ জন মাত্র মাউলী লইয়া পুনার নিকটে একটী বৃহৎ বাগানে পঁহুছিয়া তথায় লুক্কায়িত রহিলেন। রঘুনাথ ছায়ার মত প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ রহিলেন।

আরও গাঢ়তর অন্ধকার সেই আম্রকাননকে আবৃত করিল, সন্ধ্যার শীতলবায়ু আসিয়া সেই কাননের মধ্যে মর্ম্মর শব্দ করিতে লাগিল, সন্ধ্যার পথিক একে একে সেই কাননের পার্শ্ব দিয়া পুনাভিমুখে চলিয়া যাইল, নিবিড় অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু দেখিল না, পত্রের মর্ম্মর শব্দ ভিন্ন আর কিছু শ্রবণ করিল না।

ক্রমে পুনার গোলমাল নিস্তব্ধ হইল, দীপাবলী নির্ব্বাণ হইল, নিস্তব্ধ নগরে কেবল প্রহরীগণ এক একবার উচ্চ শব্দ করিতে লাগিল, ও সময়ে সময়ে শৃগালের শব্দ বায়ুপথে আসিতে লাগিল।

ঢং ঢং ঢং সহসা শব্দ হইয়া উঠিল; শিবজীর হৃদয় চমকিত হইল; সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন, গলির মধ্যে শব্দ হইতেছিল, নগরের বাহির হইতে দেখা যায় না।

ঢং ঢং ঢং পুনরায় শব্দ হইল, আবার চাহিয়া দেখিলেন; বহুলোকে দীপাবলী লইয়া বাদ্য করিতে করিতে প্রশস্ত পথ দিয়া আসিতেছে;— এই বরযাত্রা!

বরযাত্রা নিকটে আসিল। পুনার চারিদিকে প্রাচীর নাই, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। পথ লোকে সমাকীর্ণ, ও নানা বাদ্যযন্ত্র দ্বারা অতি উচ্চ রব হইতেছে। অনেকে অশ্বারোহী, অধিকাংশ পদাতিক।

শিবজী নিঃশব্দে বাল্যসুহৃদ তন্নজী ও যশজীকে আলিঙ্গন করিলেন। পরস্পরে পরস্পরের দিকে চাহিলেন মাত্র। 'হয়ত এই শেষ বিদায়'—এই ভাব সকলের মনে জাগরিত হইল ও নয়নে ব্যক্ত হইল, কিন্তু বাক্যে অনাবশ্যক। নিঃশব্দে শিবজী ও তাঁহার লোক সেই যাত্রীদিগের সহিত মিশিয়া গেলেন।

যাত্রীগণ শায়েস্তাখাঁর বাটীর নিকট দিয়া যাইল, বাটীর কামিনীগণ গবাক্ষে আসিয়া সেই বহুলোকসমারোহ দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে যাত্রীগণ চলিয়া গেল, কামিনীগণও শয়ন করিতে গেলেন; যাত্রীদিগের মধ্যে প্রায় ত্রিংশৎ জন খাঁ সাহেবের গৃহের নিকট লুক্কায়িত রহিলেন। ক্রমে বরযাত্রার গোল থামিয়া গেল। শুভকার্য্য সম্পাদন হইল।

রজনী আরও গভীর হইল; শায়েস্তাখাঁর রন্ধনগৃহের উপর একটী গবাক্ষ ছিল, তথায় অল্প অল্প শব্দ হইতে লাগিল, খাঁ সাহেবের পরিবারের কামিনীগণ সকলে নিদ্রিত অথবা নিদ্রালু, সে শব্দ শুনিয়াও গ্রাহ্য করিলেন না।

একখানি ইষ্টকের পর আর একখানি, পর আর একখানি সরিল, ঝুর ঝুর করিয়া বালুকা পড়িল। নারীগণ তখন সন্দিগ্ধ হইয়া সেই স্থান দেখিতে আসিলেন, দেখিলেন ছিদ্রের ভিতর দিয়া একজন, পরে আর একজন, পরে আর একজন যোদ্ধা! পিপীলিকা সারের ন্যায় যোদ্ধাগণ গৃহে প্রবেশ করিতেছে। তখন চীৎকার শব্দ করিয়া যাইয়া শায়েস্তাখাঁর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে সমুদয় অবগত করিলেন।

শিবজী সন্ধিপ্রার্থনার মিনতি করিতেছেন, খাঁ সাহেব এইরূপ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন; সহসা জাগরিত হইয়া শুনিলেন, শিবজী পুনঃ হস্তগত করিয়া তাঁহার প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছেন।

পলায়নার্থে এক দ্বারে আসিলেন, দেখিলেন বর্ম্মধারী মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা! অন্য দ্বারে আসিলেন, তাহাই দেখিলেন। সভয়ে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিলেন, গবাক্ষ দিয়া পলাইবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমত সময়ে সভয়ে শুনিলেন "হর হর মহাদেও" বলিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ পার্শ্বের গৃহ পরিপূর্ণ করিল।

তখন রাজপুরী আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া চারিদিকে গোল হইল। প্রাসাদের রক্ষকগণ সহসা আক্রান্ত হইয়া হতজ্ঞান হইয়াছিল, অনেকেই হত বা আহত হইয়াছিল, তথাপি অবশিষ্ট লোক প্রভুর রক্ষার্থে দৌড়িয়া আসিল ও সেই পঞ্চবিংশ জন মাউলীকে চারিদিকে বেষ্টন করিল।

শীঘ্রই ভীষণ রবে সেই প্রাসাদ পরিপূরিত হইল; কোন ঘরের দীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে, অন্ধকারে মাউলীগণ পিশাচের ন্যায় চীৎকার করিয়া হত্যা করিতে লাগিল; কোন ঘরে মশালের আলোকে হিন্দু ও মুসলমান যুদ্ধ করিতেছে, কবাটের ঝন্‌ঝনা শব্দ, আক্রমণকারিদিগের মুহুর্মুহুঃ উল্লাসরব, ও আক্রান্ত ও আহতদিগের চীৎকারে ও আর্ত্তনাদে প্রাসাদ পরিপুরিত হইল। সেই সময়ে শিবজী বর্শাহস্তে লম্ফ দিয়া যোদ্ধাদিগের মধ্যে পড়িলেন। "সনাতন ধর্ম্মের জয় হউক" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, মাউলীগণ সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, মোগল প্রহরীগণ পলায়ন করিল, অথবা সমস্ত হত ও আহত হইল। শিবজী ভীষণ বর্শাঘাতে দ্বার ভগ্ন করিয়া শায়েস্তাখাঁর শয়নঘরে আসিয়া পড়িলেন।

সেনাপতির রক্ষার্থে তৎক্ষণাৎ কয়েকজন মোগল সেই ঘরে ধাবমান হইল; শিবজী দেখিলেন সর্ব্বসম্মুখে মৃত চাঁদখাঁর বিক্রমশালী পুত্র শমশের খাঁ! পিতা অপমানিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে, তথাপি পুত্র সেই প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ও অগ্রগণ্য। শিবজী এক মুহূর্ত্ত দণ্ডায়মান হইলেন; কোষে খড়্গ রাখিয়া বলিলেন, "যুবক, তোমার পিতার রক্তে এক্ষণও আমার হস্ত কলুষিত রহিয়াছে, তোমার জীবন লইব না, পথ ছাড়িয়া দেও।"

"কাফের! হত্যাকারীর এই দণ্ড!" শম্‌শের খাঁর নয়ন অগ্নিবৎ জ্বলন্ত, শিবজী আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইবার পূর্ব্বেই শম্‌শেরের উজ্জ্বল খড়্গ আপন মস্তকোপরি দেখিলেন।

মুহূর্ত্তের জন্য প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া ইষ্টদেবতা ভবানীর নাম লইলেন; সহসা দেখিলেন পশ্চাৎ হইতে একটী বর্শা আসিয়া খড়্গধারী শমসেরকে ভূতলশায়ী করিল। পশ্চাতে দেখিলেন রঘুনাথজী হাবিলদার!

"হাবিলদার! এ কার্য্য আমার স্মরণ থাকিবে।" কেবল এই মাত্র বলিয়া শিবজী অগ্রসর হইলেন।

এই অবসরে গবাক্ষ দিয়া রজ্জু অবলম্বন করিয়া শায়েস্তাখাঁ পলাইলেন। কয়েক জন মাউলী সেই গবাক্ষমুখে ধাবমান হইয়াছিল, একজন খড়্গের আঘাত করিয়াছিল তাহা শায়েস্তাখাঁর অঙ্গুলীতে লাগিয়া একটী অঙ্গুলী ছেদন হইল, কিন্তু শায়েস্তাখাঁ আর পশ্চাতে না দেখিযা পলায়ন করিলেন, তাঁহার পুত্র আবদুল ফতেখাঁ ও সমস্ত প্রহরী নিহত হইয়াছিল। তখন শিবজী দেখিলেন ঘর, প্রাঙ্গণ, বারন্দা রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে, স্থানে স্থানে প্রহরীগণের মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে, স্ত্রীলোক ও পলাতকগণের আর্ত্তনাদে প্রাসাদ পরিপূরিত হইতেছে, ও তখনও মাউলীগণ; মোগলদিগের ধ্বংস সাধনার্থ চারিদিকে ধাবমান হইতেছে। মশালের অস্পষ্ট আলোকে কাহারও মৃতদেহ, কাহারও ছিন্নমুণ্ড, কোথাও বা রক্তপ্রণালী ভীষণ দেখাইতেছিল। তখন শিবজী আপন মাউলীদিগকে নিকটে ডাকিলেন। সকল সময়ে সকল যুদ্ধেই তিনি জয়লাভ করিলে পর বৃথা প্রাণনাশ দেখিলে বিরক্ত হইতেন ও শত্রুরও সেরূপ প্রাণনাশ যাহাতে না হয় যথেষ্ট যত্ন করিতেন। আদেশ করিলেন, "আমাদের কার্য্যসিদ্ধ হইয়াছে, ভীরু শায়েস্তাখাঁ আর আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না; এক্ষণে দ্রুতবেগে সিংহগড়াভিমুখে চল।"

অন্ধকার রজনীতে শিবজী অনায়াসে পুনা হইতে বহির্গত হইলেন ও সিংহগড়ের দিকে ধাবমান হইলেন, প্রায় দুই ক্রোশ আসিয়া মশাল জ্বালিবার আদেশ দিলেন। বহুসংখ্যক্ মশাল জ্বলিল; পুনা হইতে শায়েস্তাখাঁ দেখিতে পাইলেন মহারাষ্ট্রসেনা নিরাপদে সিংহগড়ে উঠিল।

পর দিন প্রাতে ক্রুদ্ধ মোগলগণ সিংহগড় আক্রমণ করিতে আসিল, কিন্তু গড়ের কামানের গোলায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল, কর্ত্তাজী গুজর ও তাঁহার অধীনস্থ মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহিগণ বহুদূর পর্য্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করিয়া গেল।

অল্প বিপদে সাহসী যোদ্ধার আরও যুদ্ধপিপাসা বৃদ্ধি হয়, কিন্তু শায়েস্তাখাঁ সেরূপ যোদ্ধা ছিলেন না; তিনি আরংজীবকে একখানি পত্র লিখিলেন, তাহাতে নিজ সৈন্যের যথেষ্ট নিন্দা করিলেন ও যশোবন্ত অর্থে

বশীভূত হইয়া শিবজীর পক্ষাচরণ করিতেছে এইরূপ জানাইলেন। আরংজীব দুই জনকেই অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়া ডাকাইয়া পাঠাইলেন, ও নিজপুত্র সুলতান মোয়াজীমকে দক্ষিণে পাঠাইলেন, পরে তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য যশোবন্তকে পুনর্ব্বার পাঠাইলেন।

ইহার পর এক বৎসরের মধ্যে বিশেষ কোন যুদ্ধকার্য্য হইল না। ১৬৬৪ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভেই শিবজীর পিতা শাহজীর কাল হওয়ায় শিবজী সিংহগড়েই শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া পরে রায়গড়ে যাইয়া রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন ও নিজনামে মুদ্রা অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। আমরা এখন এই নবভূপতির নিকট বিদায় লইব।

পাঠক! বহুদিবস হইল তোরণদুর্গ হইতে আসিয়াছি, চল এই অবসরে একবার সেই দুর্গে যাইয়া কি হইতেছে দেখি।

দশম পরিচ্ছেদ।

আশা।

"মুদি পোড়া আঁখি বসি রসালের তলে,
ভ্রান্তিমদে মাতি ভাবি পাইব সত্বরে
পাদপদ্ম! কাঁপে হিয়া দুরুদুরু করি
শুনি যদি পদশব্দ!"

মধুসূদন দত্ত।

যেদিন রঘুনাথ তোরণদুর্গে আসিয়াছিলেন, যেদিন তাঁহার হৃদয় উন্মত্ত ও উৎক্ষিপ্ত হয়, সেই দিন প্রথম প্রেমের আনন্দময়ী লহরীতে আর একটী বালিকা-হৃদয় ভাসিয়া গিয়াছিল। ছাদে সন্ধ্যার সময় যখন সরযুর দৃষ্টি সহসা সেই তরুণ যোদ্ধার উপর পতিত হইল, বালিকার হৃদয় যেন সহসা অজ্ঞাতপূর্ব্ব উদ্বেগে চমকিত ও স্তম্ভিত হইল। আবার চাহিলেন, আবার সেই উদার বদনমণ্ডল, সেই উন্নত তরুণ যুদ্ধবেশধারী অবয়ব দেখিলেন, প্রথম প্রেমের তরঙ্গবেগে বালিকার হৃদয় উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

সেই উদ্বেগ-পরিপূর্ণ হৃদয়ে রঘুনাথকে ভোজন করাইতে যাইলেন, পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া দেব-বিনিন্দিত অবয়বের দিকে চাহিয়া রহিলেন, সময়ে সময়ে স্পন্দহীন হইয়া একেবারে চকিতের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। আবশ্যকমতে সম্মুখে আসিলেন, প্রেমবিদগ্ধা বালিকা তখনও নয়ন ফিরাইতে

পারিলেন না, যখন চারি চক্ষুর মিলন হইল, তখন লজ্জাবৃতবদনা ধীরে ধীরে সরিয়া আসিলেন।

সরিয়া আসিলেন, কিন্তু হৃদয়ে নূতন একটী ভাব উদয় হইল। রঘুনাথ তাঁহার দিকে সোদ্বেগে দৃষ্টি করিলেন কেন? রঘুনাথ এরূপ বিচলিত চিত্ত হইয়া ভোজন করিতেছেন কেন? তাঁহার দীর্ঘনিশ্বাস কি জন্য? হস্ত কাঁপিতেছে কিজন্য? জগদীশ্বর! ঐ দেবপুরুষ কি এই অভাগিনীকে মনে স্থান দিয়াছেন?

পরদিন আবার সেই তরুণ যোদ্ধাকে দেখিলেন, আবার হৃদয়, মন, প্রাণ সেই দিকে ধাবমান হইল। যখন বিদায় লইয়া যোদ্ধা অশ্বারুঢ হইয়া চলিয়া গেলেন, সরযুর প্রাণটীও লইয়া গেলেন, কেবল দেহমাত্র প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় সেই মন্দিরে দণ্ডায়মান রহিল। যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রস্থান করিলেন, পুরুষের মন উচ্চাভিলাষে যুদ্ধ-উল্লাসে স্ফীত হইতে লাগিল, রমণী একাকী গবাক্ষপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া নিঃশব্দে দর-বিগলিত ধারায় অশ্রু বিমোচন করিতেছিলেন, তাঁহার হৃদয় নিঃশব্দে বিদীর্ণ হইতে ছিল।

বালিকা একথা মুখ ফুটিয়া বলিবে কিরূপে, এ মর্ম্মভেদী দুঃখ জানাইবে কাহার কাছে?

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বালিকা গবাক্ষপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। অশ্ব ও অশ্বারোহী অনেকক্ষণ চলিয়াগিয়াছে, কিন্তু বালিকা নিস্পন্দে সেই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। দিবালোকে পর্ব্বতমালা অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে, তাহার উপর, যতদূর দেখা যায়, পর্ব্বতবৃক্ষ সমুদ্রের লহরীর মত বায়ুতে দুলিতেছে। উপরে পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে স্থানে স্থানে জলপ্রপাত পতিত হইতেছে, সেই স্বচ্ছ জল নদীরূপে বহিয়া যাইতেছে। নীচে সুন্দর উপত্যকায় গ্রামের কুটীর দেখা যাইতেছে, সুন্দর হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র সমস্ত দেখা যাইতেছে, তাহার মধ্য দিয়া পর্ব্বতকন্যা তরঙ্গিণী ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, ও মেঘবিবর্জ্জিত সূর্য্য এই সুন্দর দৃশ্যের উপর দিয়া আপন আলোক-হিল্লোল আনন্দে গড়াইয়া দিতেছেন। কিন্তু সরযু এ সমস্ত দেখিতেছিলেন না, তাঁহার মন এ সমস্ত দৃশ্যে ন্যস্ত ছিল না। তিনি কেবল একমাত্র পর্ব্বত-পথের দিকে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার মন সেই দিকে প্রধাবিত হইয়াছিল। চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া বালিকা আর কিছু দেখিতে পাইলেন না; তাঁহার নয়ন পুনরায় জলে আপ্লুত হইল, শীঘ্রই অবারিত ধারা বহিয়া গণ্ড ও বক্ষঃস্থল সিক্ত করিল। বালিকার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল।

শূন্যহৃদয়ে সরযুবালা সংসারকার্য্যে নিয়োজিত হইলেন; স্নেহময়ী কন্যা পিতার শুশ্রূষায় ব্যাপৃত হইলেন, তাঁহার হৃদয়ের চিন্তা অবক্তব্য ও অব্যক্ত, প্রফুল্ল মুখখানি কেবল ঈষৎ ম্লান, ধীরে ধীরে পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ধৈর্য্যই রমণীর প্রধান গুণ, ধৈর্য্যই রমণী বাল্যকাল অবধি অভ্যাস করেন। এই বিষম সংসারের নানা শোকদুঃখে, পীড়ায়, যাতনায়, বিষম উদ্বেগে সকল সময়েই নারী ধৈর্য্যধারণ করিয়া সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। অসহ্য শোকযাতনা হৃদয়ে গোপন রাখিয়া হাস্যমুখী স্বামীর সেবা করেন, দুর্ব্বহনীয় পীড়া তুচ্ছ করিয়া স্নেহময়ী সযত্নে সন্তানকে লালনপালন করেন। শুনিয়াছি পুরাকালে তাপসেরা ইন্দ্রিয়সুখ তুচ্ছ করিতেন, হেলায় সহস্র যাতনা সহ্য করিতেন। কিন্তু যখন আমি সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করি, প্রেমময়ী রমণীকে সহস্র যাতনা, সহস্র দুঃখ, সহস্র অপমান সহ্য করিয়াও স্বামীর দিকে একনিবিষ্টচিত্ত থাকিতে দেখি; যখন স্নেহময়ী জননীকে পীড়া, দারিদ্র্য, সংসারের অসংখ্য ও অসহ্য যন্ত্রণা হেলায় সহ্য করিয়া পুত্রকন্যাদিগকে সযত্নে লালনপালন করিতে দেখি, তখন আমি তাপসদিগের কথা বিস্মৃত হই, সংসারের মধ্যে গৃহস্থিনী তাপসীদিগের সহিষ্ণুতা দেখিয়া বিস্মিত হই। সরযুবালা রমণী, সুতরাং বাল্যকাল হইতে সহ্যগুণ অভ্যাস করিয়াছিলেন; নিঃশব্দে পিতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, হৃদয়ের উদ্বেগ নিঃশব্দে হৃদয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন।

সায়ংকালে পিতার ভোজনের সময় নিকটে বসিলেন; স্বহস্তে পিতার শয্যারচনা করিয়া দিলেন, পরে ধীরে ধীরে আপন শয়নাগারে যাইলেন, অথবা সেই নিস্তব্ধ রজনীতে পুনরায় ধীরে ধীরে সেই গবাক্ষপার্শ্বে যাইয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিয়া রহিলেন।

পুনরায় প্রভাত হইল, পুনরায় দিন গতে সন্ধ্যা হইল, সপ্তাহ অতীত হইল, মাসকাল অতিবাহিত হইল, সে তরুণযোদ্ধা আর আসিলেন না, তাঁহার কোন সংবাদও আসিল না। সরযুবালা সেই পর্ব্বতপথ চাহিয়া রহিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

চিন্তা।

"এস তুমি, এস নাথ, রণ পরিহরি,
ফেলি দূরে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, তূণ, ধনুঃ,
ত্যজি রথ পদব্রজে এস মোর পাশে।"

মধুসূদন দত্ত।

জনার্দ্দন স্বভাবতই সরলস্বভাব লোক ছিলেন, সমস্ত দিন শাস্ত্রানুশীলন বা দেবপূজায় রত থাকিতেন, প্রভাতে ও সায়ংকালে কিল্লাদারের নিকট সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, কদাচ বাটীতে থাকিতেন। তিনি একমাত্র কন্যাকে অতিশয় ভালবাসিতেন, ভোজনের সময় কন্যাকে নিকটে না দেখিলে তাঁহার আহার হইত না, রজনীতে কখন কখন শাস্ত্রের গল্প বলিতেন, সরযূ বসিয়া শুনিতেন। এতদ্ভিন্ন প্রায়ই আপন কার্য্যে রত থাকিতেন; কন্যাও পূর্ব্ববৎ পিতার সেবা করিতেন, গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতেন, তাঁহার হৃদয়ের চিন্তা ও কখন কখন ঈষৎ ম্লান মুখখানি জনার্দ্দন লক্ষ্য করেন নাই।

বালিকার হৃদয়ে সহসা যে ভাবগুলি উদয় হয়, তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না; একদিন সন্ধ্যাকালে ও একদিন প্রাতে সরযূর হৃদয়ে সহসা যে ভাবের উদ্রেক হইল, তাহা এক সপ্তাহে বা এক মাসের মধ্যেই বিলুপ্ত হওয়াই সম্ভব। যদি সরযূর মাতা থাকিত, বা ছোট ছোট ভগ্নী বা খেলিবার সঙ্গিনী থাকিত, বা জ্ঞাতিকুটুম্ব অনেকে থাকিত, তবে সেই মাতাকে দেখিয়া বা খেলায় রত হইয়া সেই নবভাব বিস্মরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু সরযূ জন্মাবধি একাকিনী, পিতা ভিন্ন তিনি আপনার লোক কাহাকেও কখন দেখেন নাই, কাহাকেও জানিতেন না, সুতরাং বাল্যকাল অবধিই ধীর, শান্ত, চিন্তাশীল। প্রথম যৌবনে যে রূপ দেখিয়া সহসা সরযূর হৃদয় আলোড়িত হইল, মন উন্মত্ত হইল, অপূর্ব্ব সুখের উচ্ছ্বাস হইল, সরযূ এখন সেই চিন্তায় মগ্ন হইলেন; দিনে, সায়ংকালে, প্রভাতে সেই চিন্তা করিতেন, সুতরাং সে মূর্ত্তি বিলুপ্ত না হইয়া ক্রমেই হৃদয়ে গভীরাঙ্কিত হইতে লাগিল।

সে চিন্তা কি? সরযূ সেই তরুণ সেনাপতির চিন্তা করিতেন। তিনি এতদিনে যুদ্ধের উল্লাসে মগ্ন হইয়াছেন, দুর্গ হস্তগত করিতেছেন, শত্রু ধ্বংস

করিতেছেন, বিক্রম ও বাহুবলে বীরনাম ক্রয় করিতেছেন, এখন কি আর এ অভাগিনীকে স্মরণ আছে? চিরকাল আমাকে স্মরণ রাখিবেন বলিয়াছিলেন, সে কথা কি এখন মনে আছে? পুরুষের মন! নানা কার্য্য, নানা চিন্তা, নানা শোক, নানা উল্লাসে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকে। জীবন আশাপূর্ণ, অদ্য এই কার্য্য সাধন করিব, কল্য অপর কার্য্য সিদ্ধ করিব, এইরূপ নানা আশায় অতিবাহিত হয়। আশা ফলবতী হউক আর নাই হউক, জীবন সর্ব্বদা উল্লাসপূর্ণ থাকে। রাজদ্বারে, যুদ্ধক্ষেত্রে, শোকগৃহে বা নাট্যশালায়, নানা কার্য্যে, নানা চিন্তায় হৃদয় পূর্ণ থাকে। কিন্তু অভাগিনী নারীর কি আছে? প্রেম আমাদের জীবন, প্রেম আমাদের জগৎ; জীবিতেশ্বর! সেটীতে যেন নৈরাশ করিও না। ধীরে ধীরে একবিন্দু জল সরযুর গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িল।

আবার চিন্তা আসিত;—তরুণযোদ্ধা কি এখনও এ অভাগিনীর কথা ভাবেন? এ কালে এ বয়সে কি তাঁহার মন স্থির আছে? হায়! নব নব আনন্দে আমার কথা অনেক দিন বিস্মৃত হইয়াছেন। তাঁহার রমণীর অভাব কি? সুখের অভাব কি? নবীন যোদ্ধা এতদিনে অভাগিনীকে বিস্মৃত হইয়াছেন। হায়! নদীর ঊর্ম্মি পার্শ্বস্থ পুষ্পটীকে লইয়া ক্ষণকাল খেলা করে, পুষ্প আনন্দে নাচিয়া উঠে; তাহার পর ঊর্ম্মি কোথায় চলিয়া যায়, পুষ্পটী শুকাইয়া যায়, কিন্তু জল আর ফেরে না! আমাদের হৃদয়, আমাদের জীবন পুরুষের খেলার দ্রব্য! মুহূর্ত্তে তাহাদের খেলা সাঙ্গ হয়, পরে রমণীর সমস্ত জীবন খেদ ও দুঃখপূর্ণ! নীরবে সরযু আর একবিন্দু জল মোচন করিলেন।

নিশীথে যখন সেই উন্নত দুর্গ ও চারিদিকে পর্ব্বতমালা চন্দ্রের সুধাকিরণে নিস্তব্ধে সুপ্ত হইত, তখন নীল আকাশ ও শুভ্র চন্দ্রের দিকে চাহিতে চাহিতে বালিকার হৃদয়ে কত ভাব উদয় হইত, কে বলিবে? বোধ হইত যেন সেই পর্ব্বত-পথ দিয়া একজন নবীন অশ্বারোহী আসিতেছেন, অশ্ব শ্বেতবর্ণ, আরোহীর সেইরূপ গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ ললাট ও নয়ন ঈষৎ আবৃত করিয়াছে। যেন দুর্গে আসিয়া অশ্বারোহী অবতরণ করিলেন, যেন তাঁহার মস্তকে সুবর্ণ-খচিত শিরস্ত্রাণ, বলিষ্ঠ সুগোল বাহুতে সুবর্ণের বাজু, দক্ষিণহস্তে সেই দীর্ঘ বর্শা; যেন যোদ্ধা আবার আহার করিতে বসিলেন, সরযু তাঁহাকে ভোজন করাইতেছেন; অথবা রজনীতে সেই ছাদে সরযু সেই যোদ্ধার হস্তধারণ করিয়া একবার মনের কথা খুলিয়া বলিতেছেন, হৃদয় ভরিয়া একবার কাঁদিতেছেন। যোদ্ধার প্রশান্ত শীতল

বক্ষে সরযু মুখখানি লুকাইয়া একবার প্রাণভরে কাঁদিতেছেন। উঃ! সেদিন কি কখন আসিবে? সে আনন্দময় প্রতিমা কি সরযু আর দেখিতে পাইবে?

চিন্তার শেষ নাই, অগাধ সমুদ্রের হিল্লোলের ন্যায় একটীর পর আর একটী আইসে, তাহার পর আর একটী। সরযু আবার ভাবিলেন, যেন যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তরুণ সেনাপতি বহু খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, বড় উপাধি পাইয়াছেন, কিন্তু সরযুকে ভুলেন নাই। যেন পিতা তাঁহার সহিত সরযুর বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন, যেন ঘর লোকে পরিপূর্ণ, চারিদিকে দীপালোক জ্বলিতেছে, বাদ্য বাজিতেছে, গীত হইতেছে, আর কত কি হইতেছে সরযু জানে না, ভাল দেখিতে পাইতেছে না। যেন সরযু কম্পিত-কলেবরে সেই দেবপ্রতিমূর্ত্তির নিকট বসিলেন, যেন যুবকের হস্তে আপন স্বেদাক্ত কম্পিত হস্তটী রাখিলেন, যেন রজনীতে সেই জীবিতেশ্বরকে পাইলেন। উঃ! আনন্দে বালিকা-হৃদয় স্ফীত হইতেছে, তিনি আনন্দাশ্রু সম্বরণ না করিতে পারিয়া সেই বীরের শীতল হৃদয়ে মস্তক স্থাপন করিয়া মুহুর্মুহুঃ ক্রন্দন করিতেছেন। সরযু! সরযু! পাগলিনী হইও না।

আবার চিন্তা আসিল। রঘুনাথ খ্যাতিপন্ন হয়েন নাই, রঘুনাথ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন নাই, রঘুনাথ দরিদ্র, কিন্তু সরযু সেই পরম ধনকে পাইয়াছেন। পর্ব্বতের নীচে ঐ যে সুন্দর উপত্যকা দেখা যাইতেছে, যেখানে শান্তবাহিনী নদী চন্দ্রালোকে ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, যেখানে হরিদ্বর্ণ সুন্দর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র চন্দ্রালোকে সুপ্ত রহিয়াছে, ঐ রমণীয় স্থানে অনেকগুলি কুটীরের মধ্যে যেন একটী ক্ষুদ্র কুটীর সরযুর! যেন দিবাবসানে সরযু স্বহস্তে রন্ধনকার্য্য সমাপন করিয়াছেন, যেন যত্নপূর্ব্বক জীবিতনাথের জন্য অন্ন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, কুটীরসম্মুখে সুন্দর দূর্ব্বার উপর বসিয়া রহিয়াছেন, পার্শ্বে শিশুসন্তান ক্রীড়া করিতেছে। যেন সরযু দূরক্ষেত্রের দিকে চাহিতেছেন, যেন সেই দিক হইতে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর একজন দীর্ঘকায় পুরুষ কুটীরাভিমুখে আসিতেছেন। সরযুর হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, শিশুসন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, যেন সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ আসিয়া প্রথমে শিশুকে, পরে শিশুর মাতাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিলেন। উঃ! সরযুর মস্তক ঘূরিতে লাগিল, সরযু ধন মান চাহে না, সুবর্ণ রৌপ্য চাহে না, খ্যাতি পদ চাহে না; ভগবন্! সরযুকে সেই ক্ষুদ্র কুটীর, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠটী দাও।

গভীর নিশীথে শ্রান্ত হইয়া সরযূ সেই ছাদে সুপ্ত হইয়া পড়িলেন; অনেকক্ষণ নিদ্রা যাইলেন; ভীষণ স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন ভয়ানক যুদ্ধক্ষেত্র, সহস্র মোগল, সহস্র মহারাষ্ট্রীয়ের ছিন্ন মস্তক বা ছিন্ন বাহু পতিত রহিয়াছে, ক্ষেত্র রক্তে আবৃত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে সেই নবীন যোদ্ধা পড়িয়া রহিয়াছেন! যোদ্ধার বক্ষঃস্থল হইতে রক্তস্রোত বহির্গত হইতেছে ও উজ্জ্বলতাশূন্য নয়নদ্বয় সরযূর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সরযূ শিহরিয়া চীৎকারশব্দে জাগরিত হইলেন, দেখিলেন সূর্য্য উদয় হইয়াছে, তাঁহার সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত ও এখনও কাঁপিতেছে, তাঁহার দীর্ঘ কেশপাশ, বাহু স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থলের উপর আলুলায়িতরূপে রহিয়াছে।

এইরূপে এক মাস, দুই মাস, তিন মাস অতিবাহিত হইল, কিন্তু সে নবীন যোদ্ধা আর আসিলেন না। গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসিল, তাহার পর সুন্দর শরৎকাল শুভ্র চন্দ্র ও তারাবলীকে সঙ্গে লইয়া যেন জগৎকে সুধাপূর্ণ ও শান্ত করিল, কিন্তু সরযূর তপ্ত-হৃদয় শান্ত হইল না। শীত আসিল, চলিয়া গেল, আবার মধুময় বসন্তকাল আসিল, পুষ্পগুলি দেখা দিল, বৃক্ষে বৃক্ষে পত্র মঞ্জরিত হইল, কিন্তু পূর্ব্ববসন্তে সরযূ যে মধুময় মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, মধুকালের সহিত তিনি আর ফিরিয়া আসিলেন না।

বৎসরকাল অতীত হইল, সরযূ সেই পর্ব্বতপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু সে পথে সে নবীন যোদ্ধা দেখা দিলেন না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নৈরাশ।

" বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি পড়ি ভূমিতলে
হারাই সতত জ্ঞান; চেতন পাইয়া
মিলি যবে আঁখি, দেখি তোমায় সম্মুখে!"

মধুসূদন দত্ত।

কয়েক মাসের চিন্তার অবশেষে সরযূর শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, মুখ ম্লান হইল, নয়ন দুটী ঈষৎ কালিমাবেষ্টিত হইল। যে লাবণ্য দেখিয়া দুর্গের সকলেই বিস্মিত হইতেন, সে অপূর্ব্ব প্রফুল্ল লাবণ্য আর নাই, শরীর শীর্ণ, ওষ্ঠ দুইটী শুষ্ক, নয়নের প্রফুল্ল জ্যোতি হ্রাস পাইয়াছে। শরীরে যত্ন নাই, মনেও প্রফুল্লতা নাই। জনার্দ্দন সময়ে সময়ে সস্নেহে জিজ্ঞাসা

করিতেন, "সরযু! তোমার শরীর কাহিল হইতেছে কেন?" অথবা, "সরযু! তোমার খাওয়া দাওয়ায় রুচি নাই কেন?" কিন্তু সরযু উত্তর দিতেন না, পিতা কিছু না জানিতে পারেন, এই জন্য ঈষদ্ধাস্য করিয়া অন্য কথা আনিতেন, সুতরাং সরল-স্বভাব জনার্দ্দন কিছুই জানিতে পারিলেন না।

কিন্তু অগ্নি বস্ত্রাবৃত হইলে সেই বস্ত্রকে দাহ করে, যত্নসঙ্গোপিত চিন্তা সরযুর হৃদয় স্তরে স্তরে দগ্ধ করিতে লাগিল। শরীর আরও অবসন্ন হইতে লাগিল, বদনমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল, চক্ষুর্দ্বয় কোটরপ্রবিষ্ট হইল, বালিকার শরীর আর সহ্য করিতে পারিল না, সরযু সঙ্কটজনক পীড়াক্রান্ত হইলেন। ভীষণ জ্বরে শরীর দগ্ধ করিতে লাগিল, বালিকা জ্বালায় অস্থির হইয়া "জল" "জল" করিতে লাগিল, অথবা সময়ে সময়ে অজ্ঞান হইয়া নানারূপ কথা কহিতে লাগিল।

জনার্দ্দন যৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন, কিন্তু কারণ জানিতেন না। শারীরিক পীড়ামাত্র বিবেচনা করিয়া প্রসিদ্ধ চিকিৎসকদিগকে আনয়ন করিয়া কন্যার চিকিৎসা করাইলেন।

বালিকার অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া চিকিৎসকেরাও ভীত হইল। বালিকার শরীর কখন কখন ঘর্ম্মে আপ্লুত হইত, কখন বা শীতে কণ্টকিত হইয়া উঠিত। সর্ব্বদাই অজ্ঞান অবস্থায় থাকিত, নানারূপ কথা উচ্চারণ করিত, কিন্তু তাহা এরূপ তীব্র ও অস্পষ্ট যে কিছুই বুঝা যাইত না।

সূক্ষ্ম রক্তশূন্য অঙ্গুলীগুলি সর্ব্বদাই নড়িত, কখন কখন বালিকা বাহু প্রসারণ করিত, সময়ে সময়ে শিহরিয়া উঠিত, সময়ে সময়ে চীৎকার শব্দ করিয়া উঠিত।

উঃ! সেই রোগীর মনে কত সময়ে কতরূপ চিন্তার উদ্রেক হইত, তাহার স্বপ্নে কতরূপ আকৃতির আবির্ভাব হইত, তাহা কে বলিবে?

কখন সম্মুখে বিস্তীর্ণ মরুভূমি দেখিত, বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে, সূর্য্যের প্রখর তাপে সে বালুকা উত্তপ্ত হইয়াছে, সেই মরুভূমিতে সেই রৌদ্রে বালিকা একাকী গমন করিতেছে। উঃ! তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া যাইতেছে, জল! জল! একবিন্দু জল দিয়া প্রাণরক্ষা কর, গাত্রচর্ম্ম দগ্ধ হইতেছে, জল! জল! জল! সে মরুভূমিতে বৃক্ষ নাই, গ্রাম নাই, কেবল তপ্ত বালুকা, সরযুর পদ দগ্ধ হইতেছে। আকাশে মেঘ নাই, অথবা যাহা আছে তাহাতে উত্তাপ অধিকতর বৃদ্ধি করিতেছে। সরযুকে কে জল দিবে? সহসা অট্টহাস্য শুনা যাইল, সরযু সেই আকাশের দিকে চাহিয়া

দেখিলেন, রঘুনাথ তাঁহার কষ্ট দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া হাসিতেছেন; বালিকা ক্রোধে খেদে তর্জ্জন করিয়া উঠিল। সুপ্তরোগী চীৎকার করিয়া উঠিল, চিকিৎসকগণ ভীত হইল।

আবার স্বপ্ন দেখিল। নিবিড় বন অন্ধকার, জনশূন্য! সেই বনের মধ্য দিয়া সরযু বেগে পলাইতেছে, একটা ব্যাঘ্র তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান হইতেছে। চীৎকার শব্দ করিয়া সরযু পলাইতেছে, তাঁহার শব্দে বন প্রতিধ্বনিত হইতেছে, বনের কণ্টকে শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, পদযুগল ক্ষতবিক্ষত হইতেছে, কিন্তু ভয়ে দাঁড়াইতে পারে না। উঃ! শরীর জ্বলিতেছে, পা জ্বলিতেছে, এ জ্বালা কিছুতে নিবারণ হয় না! সহসা সম্মুখে কি দেখিল? দেখিল সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, ভীত সরযুকে বামহস্তে রক্ষা করিলেন, দক্ষিণহস্ত চালনায় খড়্গদ্বারা ব্যাঘ্রকে ধরাশায়ী করিলেন। উঃ! সরযুর প্রাণ শীতল হইল; শ্রান্ত রোগীর অস্থিরতা নিবারণ হইল, রোগী গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল। চিকিৎসকগণ এই সুলক্ষণ দেখিয়া সেদিন চলিয়া গেলেন।

এইরূপে প্রায় একমাস পর্য্যন্ত সরযু রোগগ্রস্ত ও অজ্ঞান হইয়া রহিল। সময়ে সময়ে রোগের এরূপ তীব্রতা হইত যে, চিকিৎসকেরাও জীবন-আশা ত্যাগ করিতেন। জনার্দ্দন স্ত্রীর মৃত্যু অবধি একরূপ উদাসীন হইয়াছিলেন, শাস্ত্রানুশীলনে ও পূজাকার্য্যেই রত থাকিতেন, একদিনের জন্যও শাস্ত্রপাঠে নিবৃত্ত থাকিতেন না। কিন্তু অদ্য সংসারের মায়া কাহাকে বলে বুঝিলেন; বৃদ্ধ নিরানন্দে সেই শয্যার নিকট বসিয়া থাকিতেন, স্নেহময়ী কন্যার জন্য হৃদয় শোকে উথলিতে লাগিল, সেই কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, নিশীথে অনিদ্র হইয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেন। অনেক দিনে, অনেক যত্নে, ক্রমে ঔষধিসেবনে রোগের উপশম হইতে লাগিল; অনেক দিন পরে সরযু শয্যা হইতে উঠিলেন, অন্ন আহার করিলেন, এদিক্ ওদিক্ পদচারণ করিতে সমর্থ হইলেন, কিন্তু তখন বদনমণ্ডল একেবারে পাণ্ডুবর্ণ, শরীরে যেন রক্তমাংস কিছুই নাই।

রজনী একপ্রহর হইয়াছে; ক্ষীণ, দুর্ব্বল সরযু ছাদে উপবেশন করিয়া গ্রীষ্মকালের মন্দ মন্দ নৈশ বায়ু সেবন করিতেছেন। তিনি এখনও অতিশয় ক্ষীণ, শরীরের জ্বালা এখনও সম্পূর্ণরূপে যায় নাই, এই জন্যই বায়ুসেবন করিতে ভালবাসিতেন।

ধীরে ধীরে গত গ্রীষ্মের কথা মনে আসিতে লাগিল, যে যুবক তাঁহাকে বৃথা আশা দিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারই কথা মনে আসিতেছিল। চিন্তার

তীব্রতা এখন নাই, কেননা শরীর অতি দুর্ব্বল, চিন্তাশক্তিও দুর্ব্বল। যেমন মন্দ মন্দ গতিতে সরযু পদচারণ করিতে পারিতেন, তাঁহার চিন্তাশক্তিও সেইরূপ ধীরে ধীরে পূর্ব্ববৎসরের কথা জাগরিত করিতেছিল।

নিশির মন্দ মন্দ বায়ুতে যেন ধীরে ধীরে পূর্ব্বস্মৃতি আনিতে লাগিলেন; গলদেশে সেই কণ্ঠমালা দুলিতেছিল, সেইটীর দিকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে একবিন্দু জল শুষ্ক গণ্ডস্থল দিয়া গড়াইয়া পড়িল; ভাবিলেন, "যদিও তিনি আমাকে বিস্মৃত হইয়াছেন, আমি কি তাঁহাকে ভুলিতে পারি? যতদিন জীবিত থাকিব এই কণ্ঠমালা সযত্নে হৃদয়ে ধারণ করিব।" আর একবিন্দু জল গড়াইয়া পড়িল, কণ্ঠমালা দিবার সময় যে মিষ্ট কথাগুলি রঘুনাথ বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইল; রঘুনাথের মুখখানি মনে পড়িল, বোধ হইল যেন রঘুনাথ সেই মিষ্টস্বরে আবার ডাকিলেন, "সরযু!"

সরযু শিহরিয়া উঠিলেন, পরে খেদে অল্প হাসিয়া ভাবিলেন, "হায়! আমি জ্ঞান হারাইলাম না কি? সকল সময়ে তাঁহাকে দেখিতে পাই, এখনই বোধ হইল যেন তিনি সেই মিষ্টস্বরে আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন! ভগবান্! এ বিড়ম্বনা কেন?"

আবার সেই কোকিল-বিনিন্দিত শব্দ শুনিতে পাইলেন—"সরযু!" সরযু চমকিত হইয়া পশ্চাৎদিকে চাহিলেন, দেখিলেন—রঘুনাথ!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মিলন।

"দেখিব প্রেমের স্বপ্ন জাগি হে দুজনে!"

মধুসূদন দত্ত।

দেখিতে দেখিতে রঘুনাথ নিকটে আসিলেন, সহসা নত হইয়া সরযুর পদযুগল ধরিয়া বলিলেন, "সরযু! আমাকে ক্ষমা কর, আমার মত পাতকী এ জগতে নাই, কিন্তু তুমি আমাকে মার্জ্জনা কর।" রঘুনাথের চক্ষু-জলে সেই পদযুগল সিক্ত হইল।

আনন্দে, বিস্ময়ে, লজ্জায়, সরযু বাক্‌শূন্য হইলেন, রঘুনাথকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন। আর কি করিলেন তিনি জানেন না, আনন্দে তাঁহার শরীর বায়ুতাড়িত পত্রের মত কাঁপিতেছিল। যাঁহার প্রেমময় মুখখানি

একবৎসর অবধি চিন্তা করিতেছিলেন, যাঁহার উপর হৃদয়, মন, প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন, জগদীশ্বর! সরযূ কি সেই হারাধন ফিরিয়া পাইলেন?

রঘুনাথ পুনরায় কম্পিতস্বরে বলিলেন, "সরযূ! তুমি আমার চিন্তা করিয়াছিলে, তুমি পীড়িত হইয়াছিলে, সেই পীড়ায় তুমি আমার নাম করিয়াছিলে;—আর আমি,—আমি কোথায় ছিলাম? সরযূ এ পাপিষ্ঠকে কি তুমি মার্জ্জনা করিতে পার?" সরযূ চাহিয়া দেখিলেন, চন্দ্রালোকে দেখিলেন সেই কৃষ্ণকেশ-শোভিত, উদার, দেবনিন্দিত মুখখানি সিক্ত,—সেই ভ্রমর-নিন্দিত নয়ন হইতে অশ্রু বহিয়া পড়িতেছে! সরযূর নয়নও শুষ্ক রহিল না।

রঘুনাথ আবার বলিলেন, "উঃ! ঐ পাণ্ডু-বদন দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে; আমি তোমাকে কত শোক দিয়াছি; তুমি আমাকে কি মনে করিয়াছিলে?" পরে ধীরে ধীরে আপন বক্ষের উপর সরযূর হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, "কিন্তু সরযূ! যদি তুমি এই হৃদয়ের ভাব জানিতে; দিবাভাগে, নিশীথে, শিবিরে, ক্ষেত্রে, যুদ্ধমধ্যে ঐ দেবী-বিনিন্দিত মূর্ত্তি কত ভাবিয়াছি যদি জানিতে, তবে বোধ হয় তোমাকে যে দারুণ কষ্ট দিয়াছি তাহাও মার্জ্জনা করিতে। জগদীশ্বর! আমি কি জানিতাম যে সরযূবালা এ অভাগার জন্য চিন্তা করেন, এ অভাগাকে মনে রাখিয়াছেন?"

পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিলেন, চারি চক্ষুর মিলন হইল, চারি চক্ষুই জলে ছল্ ছল্ করিতেছে, উভয়ের হৃদয় স্ফীত হইতেছে, সরযূর দুইটী হাত রঘুনাথ স্বহস্তে ধারণ করিয়াছেন, উভয়ের হৃদয় পরিপূর্ণ, মুখে আর বাক্য নাই; মন, প্রাণ, হৃদয়ের বেগবতী চিন্তা যেন সেই সজল নয়নে প্রকাশ পাইতেছে!

চন্দ্র! রঘুনাথ ও সরযূর উপর সুধাবর্ষণ কর; তুমি নিশীথে জাগরণ করিয়া সকল দেখিতে পাও, কিন্তু জগতে এরূপ দৃশ্য আর দেখ নাই। তরুণ বয়সে যখন মন প্রথম প্রেম-উল্লাসে উৎক্ষিপ্ত হয়, যখন নবজাত সূর্য্যরশ্মির ন্যায় নবজাত প্রেমের আনন্দ-হিল্লোল মানস-জগতে গড়াইতে থাকে, যখন বহু বিচ্ছেদের পর পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া উন্মত্তপ্রায় হয়, যখন পরস্পরের প্রেমে আনন্দিত হইয়া উভয়ে জগৎ বিস্মৃত হয়, স্থানকাল বিস্মৃত হয়, দোষগুণ বিস্মৃত হয়, নীচে পৃথিবী, উপরে আকাশ বিস্মৃত হয়, কেবল সেই প্রণয়সুখ ভিন্ন সমুদয় বিস্মৃত হয়,—তখন, তখনই যেন এ জগতে ইন্দ্রপুরী অবতীর্ণ হয়!

চন্দ্র! আরও সুধাবর্ষণ কর। বায়ু! ধীরে ধীরে বহিয়া যাও; এরূপ সুখের স্থানে তুমি কখনও বহিয়া যাও নাই। সরযু অনুচিত কার্য্য করিতেছেন তাহা জানেন না, অজ্ঞাত পুরুষের হস্তধারণ করিয়া আছেন তাহা জানেন না; কেবল যে মূর্ত্তি একবৎসরকাল ধ্যান করিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ দেখিতেছেন এইমাত্র জানেন, কেবল সেই নবীন মুখমণ্ডল, সেই চক্ষু, সেই কেশ, সেই ওষ্ঠ দেখিতেছিলেন, এইমাত্র জানেন। আর রঘুনাথ! একি ভদ্রোচিত কার্য্য? রঘুনাথ জানেন না, রঘুনাথ উন্মত্ত!

সেই চন্দ্রালোকে নিস্তব্ধ নিশাকালে রঘুনাথ সংক্ষেপে আপন বিবরণ সরযুকে জানাইলেন, সরযু পুলকিতশরীরে সেই মিষ্ট কথাগুলি শুনিতে লাগিলেন। একবৎসরকাল অবধি রঘুনাথ নানা স্থানে, নানা যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তোরণে আসিবার জন্য একদিনেরও সাবকাশ পান নাই। এক্ষণে শিবজী রায়গড়ে যাইয়া রাজা উপাধি লইয়াছেন, দেশশাসন-প্রণালীতে মনোনিবেশ করিয়াছেন, রঘুনাথ বিদায় পাইয়াছেন। রঘুনাথ দরিদ্র হাবেলদার মাত্র, তাঁহার নাম নাই, অর্থ নাই, পদ নাই, তিনি সরযু-রত্নকে কিরূপে পাইবেন? জগদীশ্বর সহায় হউন, রঘুনাথ চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না, রঘুনাথ সেই রত্নটি কুড়াইয়া বক্ষে ধারণ করিবেন, অথবা চেষ্টায় অকিঞ্চিৎকর জীবন দান করিবেন। রঘুনাথ অদ্যই দুর্গে আসিয়াছেন, আসিয়াই সরযুর পীড়ার কথা শুনিয়াছিলেন, রাত্রিতে একবার সরযুকে গোপনে থাকিয়া দেখিবেন বলিয়া ধীরে ধীরে ছাদে আসিয়াছিলেন। কিন্তু সে পাণ্ডুবদন দেখিয়া আত্মসম্বরণ করিতে পারেন নাই, ধীরে ধীরে নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, নিকটে আসিয়াছেন, তাহাতে যদি দোষ হইয়া থাকে, সরযু তাহা মার্জ্জনা করিবেন। রঘুনাথ পুনরায় কল্যই চলিয়া যাইবেন, কিন্তু দেহে যতদিন প্রাণ থাকিবে, সরযুর চিন্তা, সরযুর মুখখানি কখনও বিস্মৃত হইবেন না! সরযুকে এক একবার এই দরিদ্র সেনার জন্য চিন্তা করিবেন।

পুলকিতশরীরে সরযু মধুর কথাগুলি শুনিতেছিলেন, আহা! তাঁহার তাপিত হৃদয় শীতল হইল, দগ্ধ শরীর জুড়াইল। কিন্তু রাত্রি অধিক হইয়াছে, পিতা শয়ন করিয়াছেন, সরযুর কি রঘুনাথের নিকট বসিয়া থাকা উচিত? এই কথা সহসা মনে জাগরিত হওয়ায় সরযু উঠিলেন, ধীরে ধীরে রঘুনাথের হস্ত হইতে আপন হস্ত ছাড়াইয়া লইলেন, পরে বলিলেন—

"রঘুনাথ!" সেই মিষ্ট নামটী উচ্চারণ করিয়াই লজ্জায় অধোবদন হইলেন। রঘুনাথের হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। বলিলেন, "সরযু! সরযু! আর একবার ঐ মিষ্টস্বরে ঐ নামটী উচ্চারণ কর, এক বৎসরের চিন্তা অদ্য বিস্মৃত হইব, এক বৎসরের কষ্ট অদ্য তুচ্ছজ্ঞান করিব।"

সরযু লজ্জা সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "রঘুনাথ! জগদীশ্বর তোমাকে নিরাপদে রাখুন, তোমাকে জয়ী করুন! এ অভাগিনীর তাহা ভিন্ন অন্য প্রার্থনা নাই। তাহা ভিন্ন জীবনে অন্য চিন্তা নাই।" ধীরে ধীরে সরযু শয়নাগারে যাইলেন।

সেদিন রঘুনাথ তোরণ-দুর্গে রহিলেন, পরদিন প্রাতে কিল্লাদারের নিকট বিদায় লইয়া দুর্গ ত্যাগ করিলেন।

কতিপয় মাস অতিবাহিত হইল; সরযুর চিন্তা পূর্ব্ববৎ বলবতী, কিন্তু পূর্ব্ববৎ খেদযুক্তা নহে। তিনি আনন্দের, সুখের চিন্তাই করিতেন; মায়াবিনী আশা কাণে কাণে বলিত, "শীঘ্র যুদ্ধ শেষ হইবে, শীঘ্র রঘুনাথ জয়ী হইবেন, তখন তিনি এ অভাগিনীকে বিস্মৃত হইবেন না।" সরযুর শরীরও পূর্ব্ববৎ পুষ্টতা ও লাবণ্য ধারণ করিল। দেখিয়া জনার্দ্দন পুনরায় নিশ্চিত হইলেন, পুনরায় শাস্ত্রানুশীলনে মন দিলেন।

কয়েক মাস পরে সংবাদ আসিল, যে সম্রাট অম্বরাধিপতি জয়সিংহকে শিবজীর সহিত যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছেন। জনার্দ্দন পূর্ব্বপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বড়ই উৎসুক হইলেন; কিল্লাদারের অনুমতি লইয়া তোরণ-দুর্গ হইতে যাত্রা করিলেন। জনার্দ্দন সরলহৃদয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে শত্রুশিবিরে যাইতে দিতে কিল্লাদার বা শিবজী কোন আপত্তি করিলেন না; বিশেষ ভদ্রাচরণদ্বারা জয়সিংহের সহিত সন্ধিস্থাপন হয় শিবজীর এই ইচ্ছা ছিল, জয়সিংহের সহিত যুদ্ধে তিনি কদাপি সম্মত ছিলেন না।

সমস্ত স্থির হইল, জনার্দ্দন কন্যার সহিত তোরণদুর্গ ত্যাগ করিলেন, কন্যার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল!—কেন?

সরযুর চিন্তামালিন্য দূর হইল, সরযুর লাবণ্য ফুটিয়া বাহির হইল, সরযুর হৃদয়াশয় দুরু দুরু করিতেছে, সরযুর মুখে সর্ব্বদা হাসি!

সরযুর আনন্দে পিতা আরও আনন্দিত হইলেন, উভয়ে নিরাপদে রাজা জয়সিংহের শিবিরে পৌঁছিলেন। পাঠক! আমরা তোরণদুর্গে থাকিয়া কি করিব, চল আমরাও সেই স্থানে যাই।

চতুৰ্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রাজা জয়সিংহ।

"নরকুলোত্তম তুমি——————
বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে।"
মধুসূদন দত্ত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আরংজীব শায়েস্তাখাঁ ও যশোবন্তসিংহ উভয়কেই অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন, ও নিজ পুত্র স্থলতান মোয়াজীমকে দক্ষিণে প্রেরণ করেন, ও তাঁহার সহায়তার জন্য যশোবন্তকে পুনরায় প্রেরণ করেন। তাঁহারাও বিশেষ ফললাভ করিতে না পারায় সম্রাট্ অবশেষে তাঁহাদের স্থানান্তরিত করিয়া অম্বরাধিপতি প্রসিদ্ধনামা রাজা জয়সিংহ ও তাঁহার সহিত দিলাওয়রখাঁ নামক একজন বিক্রমশালী আফগান সেনাপতিকে দক্ষিণে প্রেরণ করিলেন। ১৬৬৫ খৃঃ অব্দের চৈত্রমাসের শেষযোগে জয়সিংহ পুনায় উপস্থিত হইলেন। শায়েস্তাখাঁর ন্যায় নিরুৎসাহ হইয়া বসিয়া না থাকিয়া তিনি দিলাওয়রখাঁকে পুরন্দর দুর্গ আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন, ও স্বয়ং সিংহগড় বেষ্টন করিয়া রাজগড় পর্য্যন্ত সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন।

শিবজী হিন্দু-সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ, বিশেষ জয়সিংহের নাম, সৈন্যসংখ্যা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ ও পরাক্রম তাঁহার নিকট অবিদিত ছিল না। সেরূপ পরাক্রান্ত সেনাপতি বোধ হয় সম্রাট্ আরংজীবের আর কেহই ছিলেন না, ও তাৎকালিক ফরাসী ভ্রমণকারী বর্ণীয়র লিখিয়া গিয়াছেন যে, বোধ হয় সমগ্র ভারতবর্ষে জয়সিংহের ন্যায় বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, দূরদর্শী লোক আর একজনও ছিলেন না। শিবজী প্রথম হইতেই ভগ্নোদ্যম হইলেন, ও বার বার জয়সিংহের নিকট সন্ধিপ্রস্তাব পাঠাইতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি জয়সিংহ চতুর শিবজীকে জানিতেন, এ সমস্ত প্রস্তাব বিশ্বাস করিলেন না, অবশেষে শিবজীর বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্ত ন্যায়শাস্ত্রী দূতবেশে জয়সিংহের নিকট আসিলেন, ও রাজাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন যে, শিবজী রাজা জয়সিংহের সহিত চতুরতা করিতেছেন না, তিনিও ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রোচিত সম্মান তিনি জানেন। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের এই সত্যবাক্য রাজা জয়সিংহ বিশ্বাস করিলেন, তখন ব্রাহ্মণের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "দ্বিজবর! আপনার বাক্যে আমি

আশ্বস্ত হইলাম; রাজা শিবজীকে জানাইবেন যে দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহার বিদ্রোহাচরণ মার্জ্জনা করিবেন, পরন্তু তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিবেন, সেজন্য আমি বাক্যদান করিতেছি। আপনার প্রভুকে বলিবেন, আমি রাজপুত, রাজপুতের বাক্য অন্যথা হয় না।" রঘুনাথ এই আশ্বাসবাক্য শিবজীর নিকট লইয়া গেলেন।

ইহার কয়েক দিন পর বর্ষাকালে রাজা জয়সিংহ আপন শিবিরে সভার মধ্যে বসিয়া রহিয়াছেন, একজন প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল—

"মহারাজের জয় হউক! রাজা শিবজী স্বয়ং বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছেন।"

সভাসদ্ সকলে বিস্মিত হইলেন, রাজা জয়সিংহ স্বয়ং শিবজীকে আহ্বান করিতে শিবিরের বাহিরে যাইলেন। বহু সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে আহ্বান ও আলিঙ্গন করিয়া শিবিরাভ্যন্তরে আনিলেন ও রাজগদিতে আপনার দক্ষিণদিকে বসাইলেন।

শিবজীও এইরূপ সমাদর পাইয়া যথেষ্ট সম্মানিত হইলেন। রাজা জয়সিংহ ক্ষণেক মিষ্টালাপ করিয়া অবশেষে বলিলেন, "রাজন্! আপনি আমার শিবিরে আসিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন, এই শিবির আপনার গৃহের ন্যায় বিবেচনা করিবেন।"

শিব। "রাজন্! এ দাস কবে আপনার আজ্ঞাপালনে বিমুখ? রঘুনাথপন্ত দ্বারা আপনি দাসকে আসিতে আদেশ করিয়াছিলেন, দাস উপস্থিত হইয়াছে। আপনার মহৎ আচরণে আমিই সম্মানিত হইয়াছি।"

জয়। "হাঁ, রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রীকে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা স্মরণ আছে। রাজন্! আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা করিব, দিল্লীশ্বর আপনার বিদ্রোহাচরণ মার্জ্জনা করিবেন, আপনাকে রক্ষা করিবেন, আপনাকে যথেষ্ট সম্মান করিবেন, এ বিষয়ে আমি বাক্যদান করিয়াছি, এ সমস্ত করিব, রাজপুতের কথা অন্যথা হয় না।"

এইরূপে ক্ষণেক কথোপকথনের পর সভাভঙ্গ হইল; শিবিরে শিবজী ও জয়সিংহ ভিন্ন আর কেহই রহিলেন না; তখন শিবজী কপটানন্দ-চিহ্ন ত্যাগ করিলেন; হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। জয়সিংহ দেখিলেন তাঁহার চক্ষে জল।

বলিলেন—"রাজন্! আপনি যদি আত্মসমর্পণ করিয়া ক্ষুন্ন হইয়া থাকেন, সে খেদ নিষ্প্রয়োজন। আপনি বিশ্বাস করিয়া আমার নিকটে আসিয়াছেন, রাজপুত বিশ্বস্তের উপর হস্তক্ষেপ করিবে না। অদ্যই রজনীতে আমার

অশ্বশালা হইতে অশ্ব বাছিয়া লউন, পুনরায় প্রস্থান করুন, আপনি নিরাপদে আসিয়াছেন, নিরাপদে যাইবেন, আমার আদেশে কোনও রাজপুত আপনার উপর হস্তক্ষেপ করিবে না। পরে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি ভাল, না পারি ক্ষতি নাই, কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কদাচ বিস্মরণ করিব না।"

রাজা জয়সিংহের এতদূর মাহাত্ম্য দেখিয়া শিবজী বিস্মিত হইলেন; ধীরে ধীরে বলিলেন—

"মহারাজ! ভবাদৃশ লোকের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি, তাহাতে খেদ নাই। বাল্যকাল অবধি যে হিন্দু-ধর্ম্মের জন্য, যে হিন্দুগৌরবের জন্য চেষ্টা করিয়াছি, সে মহদুদ্যম, সে উন্নত উদ্দেশ্য, অদ্য এককালে বিনষ্ট হইল, সে চিন্তায় হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, কিন্তু সে বিষয়েও মনস্থির করিয়াই আপনার শিবিরে আসিয়াছিলাম, সেজন্যও এখন খেদ করিতেছি না।"

জয়। "তবে কিজন্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন?"

শিব। "বাল্যকাল হইতে আপনাদের গৌরব-গীত গাইতে ভাল-বাসিতাম; অদ্য দেখিলাম সে গীত মিথ্যা নহে, জগতে যদি মাহাত্ম্য, সত্য, ধর্ম্ম থাকে, তবে রাজপুত শরীরে আছে। এ রাজপুত কি যবনাধীনতা স্বীকার করিবেন? মহারাজা জয়সিংহ কি যবন আরংজীবের সেনাপতি?"

জয়। "ক্ষত্রিয়রাজ! সেটী প্রকৃত দুঃখের কারণ। কিন্তু রাজপুতেরা সহজে অধীনতা স্বীকার করেন নাই, যতদিন সাধ্য দিল্লীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; বিধির নির্ব্বন্ধে পরাধীন হইয়াছেন। মেওয়ারের বীর-প্রবর প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপ অসাধ্য সাধনেরও যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্ততিও দিল্লীর করপ্রদ, এ সমস্ত বোধ হয় মহাশয় অবগত আছেন।"

শিব। "আছি। সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি যাঁহাদের সহিত আপনাদিগের এতদিনের বৈরভাব, তাঁহাদের কার্য্যে আপনি এরূপ যত্ন-শীল কিজন্য?"

জয়। "যখন দিল্লীশ্বরের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছি, তখন তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির জন্য সত্যদান করিয়াছি; যে বিষয়ে সত্যদান করিয়াছি তাহা করিব।"

শিব। "সকলের নিকট সকল সময় কি সত্য পালনীয়? যাঁহারা আমাদের দেশের শত্রু, ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচারী, তাঁহাদের সহিত কি সত্য-সম্বন্ধ?"

জয়। "আপনি ক্ষত্রিয় হইয়া একথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রাজপুতকে একথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রাজপুতের ইতিহাস পাঠ করুন, সহস্র বৎসর মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, কখনও সত্য লঙ্ঘন করেন নাই। কখন জয়লাভ করিয়াছেন, অনেক সময়ে পরাস্ত হইয়াছেন, কিন্তু জয়ে, পরাজয়ে, সম্পদে, আপদে, সর্ব্বদা সত্যপালন করিয়াছেন। এখন আমাদের সে গৌরবের স্বাধীনতা নাই, কিন্তু সত্যপালনের গৌরব আছে। দেশে, বিদেশে, মিত্রমধ্যে, শত্রুমধ্যে রাজপুতের নাম গৌরবান্বিত! ক্ষত্রিয়রাজ টোডরমল্ল বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন, মানসিংহ কাবুল হইতে উড়িশ্যা পর্য্যন্ত দিল্লীশ্বরের বিজয়পতাকা লইয়াছিলেন, কেহ কখনও ন্যস্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, মুসলমান সম্রাটের নিকটও যাহা সত্য করিয়াছিলেন তাহা পালন করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্ররাজ! রাজপুতের কথাই সন্ধিপত্র, অনেক সন্ধিপত্র লঙ্ঘন হইয়াছে, রাজপুতের কথা লঙ্ঘন হয় নাই!"

শিব। "মহারাজ যশোবন্তসিংহ হিন্দুধর্ম্মের একজন প্রধান প্রহরী তিনি মুসলমানের জন্য হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।"

জয়। "যশোবন্ত বীরশ্রেষ্ঠ, যশোবন্ত হিন্দুধর্ম্মের প্রহরী সন্দেহ নাই। তাঁহার মাড়ওয়ারদেশ মরুভূমিময়, তাঁহার মাড়ওয়ারী সেনা অপেক্ষা কঠোর জাতি ও সাহসী সেনা জগতে নাই। যদি যশোবন্ত সেই মরুভূমিতে বেষ্টিত হইয়া সেই সেনার সহায়ে হিন্দুস্বাধীনতা রক্ষার, হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার যত্ন করিতেন, আমি তাঁহাকে সাধুবাদ করিতাম। যদি জয়ী হইয়া আরংজীবকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীতে হিন্দুপতাকা উড্ডীন করিতেন, ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিতেন, আমি তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া সম্মান করিতাম। অথবা যদি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে বীরপ্রবর প্রতাপের ন্যায় সেই মরুভূমে প্রাণত্যাগ করিতেন, আমি তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতাম। কিন্তু যেদিন তিনি দিল্লীশ্বরের সেনাপতি হইয়াছেন, সেই দিন তিনি মুসলমানের কার্য্যসাধনে ব্রতী হইয়াছেন। সে কার্য্য ভাল হউক, মন্দ হউক, ব্রত গ্রহণ করিয়া গোপনে লঙ্ঘন করা ক্ষত্রোচিত কার্য্য হয় নাই; যশোবন্ত কলঙ্কে আপন যশোরাশি ম্লান করিয়াছেন। তিনি সিপ্রানদীতীরে আরংজীবের নিকট পরাস্ত হইয়া অবধি আরংজীবের অতিশয় বিদ্বেষী, নচেৎ তিনি এ গর্হিত কার্য্য করিতেন না।"

চতুর শিবজী দেখিলেন জয়সিংহ যশোবন্ত নহেন। ক্ষণেক পর আবার বলিলেন—

"হিন্দুধর্ম্মের উন্নতিচেষ্টা কি গর্হিত কার্য্য? হিন্দুকে ভ্রাতা মনে করিয়া সহায়তা করা কি গর্হিত কার্য্য?"

জয়। "আমি তাহা বলি নাই। যশোবন্ত কেন আরংজীবের কার্য্য ত্যাগ করিয়া জগতের সাক্ষাতে, ঈশ্বরের সাক্ষাতে, আপনার সহিত যোগ দিলেন না? আপনি যেরূপ স্বাধীনতার চেষ্টা করিতেছেন, তিনি সেইরূপ করিলেন না কিজন্য? সম্রাটের কার্য্যে থাকিয়া গোপনে বিরুদ্ধাচরণ করা কপটাচরণ। ক্ষত্রিয়রাজ! কপটাচরণ কি ক্ষত্রোচিত কার্য্য?"

শিব। "তিনি আমার সহিত প্রকাশ্যে যোগ দিলে দিল্লীশ্বর অন্য সেনাপতি পাঠাইতেন, সম্ভবতঃ আমরা উভয়ে পরাস্ত ও হত হইতাম।"

জয়। "যুদ্ধে মরণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? ক্ষত্রিয় কি যুদ্ধে মরণ ডরে?"

শিবজীর মুখ আরক্ত হইল, তিনি বলিলেন,—

"রাজপুত! মহারাষ্ট্রীয়েরাও মৃত্যু ডরে না, যদি এই অকিঞ্চিৎকর জীবন দান করিলে আমার উদ্দেশ্য সাধন হয়, হিন্দু-স্বাধীনতা, হিন্দু-গৌরব পুনঃস্থাপিত হয়, তবে ভবানীর সাক্ষাতে এই মুহূর্ত্তে এই বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিব, অথবা রাজপুত! তুমি অব্যর্থ বর্শা ধারণ কর, এই হৃদয়ে আঘাত কর, সহাস্যবদনে প্রাণত্যাগ করিব। কিন্তু যে হিন্দু-গৌরবের বিষয় বাল্যকালে স্বপ্ন দেখিতাম, যাহার জন্য শত যুদ্ধ যুঝিলাম, শত শত্রুকে পরাস্ত করিলাম, এই বিংশ বৎসর পর্ব্বতে, উপত্যকায়, শিবিরে, শত্রুমধ্যে, দিবসে, সায়ংকালে, গভীর নিশীথে, চিন্তা করিয়াছি; আমি মরিলে সে হিন্দুধর্ম্মের, সে হিন্দু-স্বাধীনতার, সে হিন্দু-গৌরবের কি হইবে? যশোবন্ত ও আমি প্রাণ দিলে কি সে সমস্ত রক্ষা হইবে?"

জয়সিংহ শিবজীর তেজস্বী কথাগুলি শ্রবণ করিলেন, চক্ষুতে জল দেখিলেন, কিন্তু পূর্ব্ববৎ স্থিরভাবে ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—

"সত্যপালনে যদি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা না হয়, সত্য লঙ্ঘনে হইবে? বীরের শোণিতে যদি স্বাধীনতা-বীজ অঙ্কুরিত না হয়, তবে বীরের চাতুরীতে হইবে?"

শিবজী পরাস্ত হইলেন। অনেকক্ষণ পর পুনরায় ধীরে ধীরে বলিলেন—

"মহারাজ! আমি আপনাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করি, আপনার ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ তীক্ষ্ণবুদ্ধি যোদ্ধা আমি কখনও দেখি নাই, আমি আপনার পুত্রতুল্য।

একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, আপনি পিতৃতুল্য সৎপরামর্শ দিন্। আমি বাল্যকালে যখন কঙ্কণপ্রদেশের অসংখ্য পর্ব্বত ও উপত্যকায় ভ্রমণ করিতাম, আমার হৃদয়ে নানারূপ চিন্তা আসিত, স্বপ্ন উদয় হইত। ভাবিতাম যেন সাক্ষাৎ ভবানী আমাকে স্বাধীনতা স্থাপনের জন্য আদেশ করিতেছেন, যেন দেবালয়সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে, ব্রাহ্মণদিগের সম্মান বৃদ্ধি করিতে, গোবৎসাদি রক্ষা করিতে, ধর্ম্মবিরোধী মুসলমানদিগকে দূর করিতে দেবী সাক্ষাৎ উত্তেজনা করিতেছেন। আমি বালক ছিলাম, সেই স্বপ্নে ভুলিলাম, সদর্পে খড়্গ গ্রহণ করিলাম, বীরশ্রেষ্ঠদিগকে জড় করিলাম, দুর্গ অধিকার করিতে লাগিলাম। যৌবনেও সেই স্বপ্ন দেখিয়াছি,—হিন্দুনামের গৌরব, হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য, হিন্দু-স্বাধীনতা সংস্থাপন! সেই স্বপ্নবলে দেশ জয় করিয়াছি, শত্রু জয় করিয়াছি, রাজ্য বিস্তার করিয়াছি, দেবালয় স্থাপন করিয়াছি! ক্ষত্রিয়রাজ! আমার এ উদ্দেশ্য কি মন্দ? এ স্বপ্ন কি অলীক স্বপ্নমাত্র?—আপনি পুত্রকে উপদেশ দিন্।"

বহুদূরদর্শী, ধর্ম্মপরায়ণ রাজা জয়সিংহ ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; পরে গম্ভীরস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "রাজন্! আপনার উদ্দেশ্য অপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য আমি জানি না, আপনার স্বপ্ন অপেক্ষা প্রকৃত আর কিছুই আমি জানি না। শিবজী! তোমার মহৎ উদ্দেশ্য আমার নিকট অবিদিত নাই, আমি শত্রুর নিকট, মিত্রের নিকট তোমার উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিয়াছি, পুত্র রামসিংহকে তোমার উদাহরণ দেখাইয়া শিক্ষা দিয়াছি, রাজপুত স্বাধীনতার গৌরব এখনও বিস্মৃত হয় নাই। আর শিবজী! তোমার স্বপ্নও স্বপ্ন নহে; চারিদিকে যত দেখি, মনে মনে যত চিন্তা করি, বোধ হয় মোগলরাজ্য আর থাকে না,—যত্ন, চেষ্টা সকলই বিফল! মুসলমান-রাজ্য কলঙ্করাশিতে পূর্ণ হইয়াছে, বিলাসপ্রিয়তায় জর্জ্জরিত হইয়াছে, পতনোন্মুখ গৃহের ন্যায় আর দাঁড়াইতে পারে না। শীঘ্র কি বিলম্বে এই প্রাসাদতুল্য মোগলরাজ্য বোধ হয় ধূলিসাৎ হইবে, তাহার পর পুনরায় হিন্দুর প্রাধান্য। মহারাষ্ট্রীয় জীবন অঙ্কুরিত হইতেছে, মহারাষ্ট্রীয় যৌবন-তেজে বোধ হয় ভারতবর্ষ প্লাবিত হইবে। শিবজী! তোমার স্বপ্ন স্বপ্ন নহে, ভবানী তোমাকে মিথ্যা উত্তেজনা করেন নাই।"

উৎসাহে, আনন্দে শিবজীর শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল; তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তবে ভবাদৃশ মহাত্মা সেই পতনোন্মুখ মোগল প্রাসাদের একমাত্র স্তম্ভস্বরূপ রহিয়াছেন কি জন্য?"

জয়। “সত্যপালন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, যাহা সত্য করিয়াছি তাহা পালন করিব। কিন্তু অসাধ্য সাধন হয় না, পতনোম্মুখ গৃহ পতিত হইবে।”

শিব। “ভাল, সত্য পালন করুন, কপটাচারী আরংজীবের নিকটও আপনার ধর্ম্মাচরণ দেখিয়া দেবতারাও বিস্মিত হইয়া আপনার সাধুবাদ করিবেন; কিন্তু আমি আরংজীবের নিকট কখনও সত্য করি নাই, আমি যদি চাতুরীদ্বারায়ও স্বধর্ম্মের উন্নতি সাধনের প্রয়াস পাইয়া থাকি, আরংজীবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকি, তবে সে চাতুরী কি নিন্দনীয় ?”

জয়। “ক্ষত্রিয়রাজ! চাতুরী যোদ্ধার পক্ষে সকল সময়ে নিন্দনীয়, কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে চাতুরী অধিকতর নিন্দনীয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের গৌরববৃদ্ধি অনিবার্য্য, বোধ হয় তাঁহাদের বাহুবল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে, বোধ হয় তাঁহারা ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইবেন। কিন্তু শিবজী! অদ্য যে শিক্ষা আপনি দিতেছেন, সে শিক্ষা কদাচ ভুলিব না। আমার কথায় দোষ গ্রহণ করিবেন না, অদ্য আপনি নগর লুণ্ঠন করিতে শিখাইতেছেন, কল্য তাঁহারা ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিবে, অদ্য আপনি চতুরতা দ্বারা জয়লাভ করিতে শিখাইতেছেন, পরে তাহারা সম্মুখ যুদ্ধ কখনই শিখিবে না। যে জাতি অচিরে ভারতের অধীশ্বর হইবে, আপনি সেই জাতির বাল্যগুরু, গুরুর ন্যায় ধর্ম্মশিক্ষা দিন্। অদ্য আপনি মন্দ শিক্ষা দিলে শতবর্ষ পর্য্যন্ত দেশে দেশে সেই শিক্ষার ফল দৃষ্ট হইবে। বৃদ্ধ বহুদর্শী রাজপুতের কথা গ্রহণ করুন, মহারাষ্ট্রীয়দিগকে সম্মুখরণ শিক্ষা দিন, চতুরতা বিস্মৃত হইতে বলুন, আপনি হিন্দুশ্রেষ্ঠ! আপনার মহৎ উদ্দেশ্য আমি শত শতবার ধন্যবাদ করিয়াছি, আপনি এই উন্নত শিক্ষা না দিলে কে দিবে? মহারাষ্ট্রের শিক্ষাগুরু! সাবধান! আপনার প্রত্যেক কার্য্যের ফল বহুকালব্যাপী, বহুদেশব্যাপী হইবে!”

এই মহৎ বাক্য শুনিয়া শিবজী ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন—

“আপনি গুরুর গুরু! আপনার উপদেশগুলি শিরোধার্য্য; কিন্তু অদ্য আমি আরংজীবের অধীনতা স্বীকার করিলাম, শিক্ষা কবে দিব ?”

জয়। জয় পরাজয়ের স্থিরতা নাই। অদ্য আমার জয় হইল, কল্য তোমার জয় হইতে পারে; অদ্য তুমি আরংজীবের অধীন হইলে, ঘটনাক্রমে কল্য স্বাধীন হইতে পার।”

শিব। "জগদীশ্বর তাহাই করুন, কিন্তু আপনি আরংজীবের সেনাপতি থাকিতে আমার স্বাধীন হওয়ার আশা বৃথা। স্বয়ং ভবানী হিন্দু-সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।"

জয়সিংহ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"শরীর ক্ষণভঙ্গুর, এ বৃদ্ধ শরীর কত-দিন থাকিবে?—কিন্তু যতদিন থাকিবে সত্যপালনে বিরত হইবে না।"

শিব। "আপনি দীর্ঘজীবী হউন।"

জয়। "শিবজী! এক্ষণে বিদায় দিন্;—আমি আরংজীবের পিতার নিকট কার্য্য করিয়াছি, এক্ষণে আরংজীবের অধীনে কার্য্য করিতেছি, যতদিন জীবিত থাকিব, দিল্লীর এ বৃদ্ধ সেনা বিদ্রোহাচরণ করিবে না;—কিন্তু ক্ষত্রিয়প্রবর! নিশ্চিন্ত থাক, মহারাষ্ট্রের গৌরব, হিন্দুর প্রাধান্য অনিবার্য্য! বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য কর, বহুদর্শিতার কথা গ্রাহ্য কর, মোগলরাজ্য আর থাকে না, হিন্দু তেজ আর নিবারিত হয় না, তখন দেশে দেশে হিন্দুর গৌরবনাম, তোমার গৌরবনাম প্রতিধ্বনিত হইবে।"

শিবজী অশ্রুপূর্ণলোচনে জয়সিংহকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"ধর্ম্মাত্মন্! আপনার মুখে পুষ্পচন্দন পড়ুক, আপনার কথাই যেন সার্থক হয়! আপনার সহিত যুদ্ধ করিব না, আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি; কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে পুনরায় স্বাধীন হইতে পারি, তবে ক্ষত্রিয়প্রবর! আর একদিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব, আর একদিন পিতার চরণোপান্তে বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করিব।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গবিজয়।

"চৌদিকে এবে সমরতরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ নির্ঘোষে।"

মধুসূদন দত্ত।

শীঘ্রই সন্ধিস্থাপন হইল। শিবজী মোগলদিগের নিকট হইতে যে যে দুর্গ জয় করিয়াছিলেন তাহা ফিরাইয়া দিলেন, বিলুপ্ত আহম্মদনগর রাজ্যের মধ্যে যে দ্বাত্রিংশৎ দুর্গ অধিকার বা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও ২০টী ফিরাইয়া দিলেন, অবশিষ্ট দ্বাদশটীমাত্র আরংজীবের অধীনে জায়গীর-স্বরূপ রাখিলেন। যে প্রদেশ তিনি সম্রাটকে দিলেন তাহার বিনিময়ে

বিজয়পুর রাজ্যের অধীনস্থ কতক প্রদেশ সম্রাট্ শিবজীকে দান করিলেন, ও শিবজীর অষ্টমবর্ষীয় বালক শম্ভুজী পাঁচ হাজারীর মনসবদার পদ প্রাপ্ত হইলেন।

শিবজীর সহিত যুদ্ধসমাপ্তির পর রাজা জয়সিংহ বিজয়পুরের রাজ্য ধ্বংস করিয়া সেই প্রদেশ দিল্লীশ্বরের অধীনে আনিবার যত্ন করিতে লাগিলেন। শিবজীর পিতা বিজয়পুরের সহিত শিবজীর যে সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন, শিবজী তাহা লঙ্ঘন করেন নাই, কিন্তু শিবজীর বিপদ্‌কালে বিজয়পুরের সুলতান সন্ধি বিস্মরণ হইয়া শিবজীর রাজ্য আক্রমণ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। সুতরাং শিবজী এক্ষণে জয়সিংহের পক্ষাবলম্বন করিয়া বিজয়পুরের সুলতান আলীআদিলশাদের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন, এবং আপন মাউলী সৈন্যদ্বারা বহুসংখ্যক্ দুর্গ হস্তগত করিলেন।

জয়সিংহের সহিত শিবজীর সদ্ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ও পরস্পরের মধ্যে অতিশয় স্নেহ জন্মাইল। উভয়ে সর্ব্বদাই একত্র থাকিতেন ও যুদ্ধে পরস্পরের সহায়তা করিতেন। বলা বাহুল্য যে শিবজীর একজন তরুণ হাবেলদার সর্ব্বদাই জয়সিংহের একজন পুরোহিতের সদনে যাইতেন। নাম বলিবার কি আবশ্যক আছে?

সরলস্বভাব পুরোহিত জনার্দ্দনও ক্রমে রঘুনাথকে পুত্রবৎ দেখিতে লাগিলেন, সর্ব্বদাই গৃহে আহ্বান করিতেন; রঘুনাথও যখন পারিতেন পুরোহিতের আবাসস্থান আপন আবাসস্থান করিতেন। এরূপ অবস্থায় রঘুনাথ ও সরযুর সর্ব্বদাই দেখা হইত, সর্ব্বদাই কথা হইত, উভয়ের জীবন, মন, প্রাণ প্রথম প্রণয়ের অনির্ব্বচনীয় আনন্দলহরীতে প্লাবিত হইতে লাগিল। জগতে রঘুনাথ ও সরযু অপেক্ষা কে সুখী? সরলচিত্ত জনার্দ্দন তাহাদিগের হৃদয়ের ভাব কিছুই বুঝিতেন না, কখন কখন তাঁহাদিগকে একত্র দেখিতেন বা কথা কহিতে দেখিতেন, কিন্তু রঘুনাথ "বাড়ীর ছেলে," নিষেধ করিতেন না। রঘুনাথও জনার্দ্দনকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

কয়েক মাসের মধ্যে বিজয়পুর-অধীনস্থ অনেকগুলি দুর্গ হস্তগত করিয়া শিবজী অবশেষে একটী অতিশয় দুর্গম পর্ব্বতদুর্গ লইবার মানস করিলেন। তিনি কবে কোন্ দুর্গ আক্রমণ করিবেন পূর্ব্বে শত্রুকে তাহার সংবাদ দিতেন না, নিজের সৈন্যেরাও পূর্ব্বে কিছুমাত্র জানিতে পারিত না। দিবাভাগে সেই দুর্গ হইতে ৫।৬ ক্রোশ দূরে জয়সিংহের শিবিরের

নিকটই তাঁহার শিবির ছিল, সায়ংকালে এক সহস্র মাউলী ও মহারাষ্ট্রীয় সেনাকে প্রস্তুত হইতে কহিলেন,, একপ্রহর রজনীর সময় গভীর অন্ধকারে প্রকাশ করিলেন যে রুদ্রমণ্ডল দুর্গ আক্রমণ করিবেন। নিঃশব্দে সেই এক সহস্র সেনাসমেত দুর্গাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন।

অন্ধকার নিশীথে নিঃশব্দে দুর্গতলে উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে সমভূমি, তাহার মধ্যে একটী উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর রুদ্রমণ্ডল দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। পর্ব্বতে উঠিবার একমাত্র পথ আছে, এক্ষণে যুদ্ধকালে সেই পথ রুদ্ধ হইয়াছে; অন্যান্য দিকে উঠা অতিশয় কষ্টসাধ্য, পথ নাই, কেবল জঙ্গল ও শিলারাশিপরিপূর্ণ। শিবজী সেই কঠোর দুর্গম স্থান দিয়া সেনাগণকে পর্ব্বত আরোহণ করিবার আদেশ দিলেন; তাঁহার মাউলী ও মহারাষ্ট্রীয় সেনা যেন পর্ব্বত-বিড়ালের ন্যায় সেই বৃক্ষ ধরিয়া শৈল হইতে শৈলান্তরে লম্ফ দিতে দিতে পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিল। কোন স্থানে দাঁড়াইয়া, কোন স্থানে বসিয়া, কোথাও বৃক্ষের ডাল ধরিয়া লম্বমান হইয়া, কোথাও বা লম্ফ দিয়া সৈনাগণ অগ্রসর হইতে লাগিল, মহারাষ্ট্রীয় সেনা ভিন্ন আর কোন জাতীয় সৈন্য এরূপ পর্ব্বত আরোহণে সমর্থ কি না সন্দেহ। সহস্র সেনা এইরূপে পর্ব্বত আরোহণ করিতেছে, কিন্তু শব্দমাত্র নাই, নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর নিশীথে কেবল নৈশবায়ু এক একবার সেই পর্ব্বতবৃক্ষের মধ্য দিয়া মর্ম্মরশব্দে বহিয়া যাইতেছে।

অর্দ্ধেক পথ উঠিলে পর শিবজী সহসা দেখিলেন উপরে দুর্গপ্রাচীরের উপর একটী উজ্জ্বল আলোক। চিন্তাকুল হইয়া ক্ষণেক দণ্ডায়মান রহিলেন; শত্রুরা কি তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শুনিতে পাইয়াছেন? নচেৎ প্রাচীরের উপর এরূপ আলোক কেন? আলোকের কিরণ দুর্গের নীচে পর্য্যন্ত পতিত হইয়াছে, যেন দুর্গবাসিগণ শত্রুপ্রতীক্ষা করিয়াই এই আলোক জ্বালিয়াছে, যে অন্ধকারে আবৃত হইয়া কেহ দুর্গ আক্রমণ করিতে না পারে। ক্ষণকাল চিন্তাকুল হইয়া সেই আলোকের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে নিজ সৈন্যগণকে আরও সতর্কভাবে বৃক্ষ ও শৈলরাশির অন্তরাল দিয়া ধীরে ধীরে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন। নিঃশব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ সেই পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিল, যেখানে বড় বৃক্ষ, যেখানে ঝোপ, যেখানে শৈলরাশি, সেই সেই স্থান দিয়া বুকে হাঁটিয়া উঠিতে লাগিল, শব্দমাত্র নাই, অন্ধকারে নিঃশব্দে শিবজী সেই পর্ব্বতে উঠিতে লাগিল।

ক্ষণেক পর একটী পরিষ্কার স্থানের নিকট আসিয়া পড়িল, উপর হইতে আলোক তথায় স্পষ্টরূপে পতিত হইয়াছে, সেস্থান দিয়া সৈন্য যাইলে

উপর হইতে দেখা যাওয়ার অতিশয় সম্ভাবনা। শিবজী পুনরায় দণ্ডায়মান হইলেন; বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া এদিকে ওদিকে দেখিতে লাগিলেন, সম্মুখে দেখিলেন প্রায় ১০০ হস্ত পরিমাণ স্থানে বৃক্ষমাত্র নাই, পরে পুনরায় বৃক্ষশ্রেণী রহিয়াছে। এই ১০০ হস্ত কিরূপে যাওয়া যায়? পার্শ্বে দেখিলেন, যাইবার কোন উপায় নাই, নীচে দেখিলেন, অনেক দূর আসিয়াছেন, পুনরায় নীচে যাইয়া অন্য পথ অবলম্বন করিলে দুর্গে আসিবার পূর্ব্বেই প্রাতঃকাল হইতে পারে। শিবজী ক্ষণেক নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন, পরে বাল্যকালের সুহৃদ্ বিশ্বাসী মাউলী যোদ্ধা তন্নজী মালশ্রীকে ডাকাইলেন; দুইজনে সেই বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষণেক অতি মৃদুস্বরে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পর তন্নজী চলিয়া যাইলেন, শিবজী অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহার সমস্ত সৈন্য নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে তন্নজী ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার শরীর সিক্ত, কেশ ও সমস্ত পরিচ্ছদ হইতে জল পড়িতেছে। তিনি শিবজীর নিকট আসিয়া অতি মৃদুস্বরে কি কহিলেন; শিবজী ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তাহাই হউক, অন্য উপায় নাই।" তিনি পুনরায় সেনাদিগকে চলিবার আদেশ দিলেন, তন্নজী অগ্রে অগ্রে চলিলেন।

বৃষ্টির জল অবতরণ দ্বারা এক স্থানে প্রস্তর ক্ষয় পাইয়া প্রণালীর ন্যায় হইয়াছিল। দুই পার্শ্ব উচ্চ, মধ্য গভীর, বৃষ্টির সময় সেই গভীর স্থান জলে পরিপূরিত হইত, এখনও তাহাতে জল আছে। সেই জল ভাঙ্গিয়া বুকে হাঁটিয়া যাইলে পর সম্ভবতঃ দুই পার্শ্বে উচ্চ পাড় থাকায় শত্রুরা দেখিতে পাইবে না, এই পরামর্শ স্থির হইল ও সমস্ত সৈন্য ধীরে ধীরে সেই স্রোতের মধ্য দিয়া পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিল। শত সহস্র শিলাখণ্ডের উপর দিয়া নিস্তব্ধ অন্ধকার রজনীতে অনন্তনাদে পর্ব্বত-জল অবতরণ করিতেছে, সেই শিলাখণ্ডের উপর দিয়া সেই জল ভাঙ্গিয়া সহস্র সেনা নিঃশব্দে পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিল। অচিরাৎ উপরিস্থ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিল, শিবজী মনে মনে ভবানীকে ধন্যবাদ করিলেন।

সহসা তাঁহার পার্শ্বস্থ একজন সেনা পতিত হইল, শিবজী দেখিলেন তাহার বক্ষঃস্থলে তীর লাগিয়াছে! আর একটী তীর, আর একটী, আরও বহুসংখ্যক তীর! শত্রুগণ জাগরিত হইয়া রহিয়াছে, শিবজীর সৈন্য জলপ্রণালী দিয়া আরোহণ করিবার সময় তাহাদের সন্দেহ হওয়ায় তাহারা সেইদিকে তীর নিক্ষেপ করিয়াছে।

শিবজীর সমস্ত সৈন্য বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইল, তীরনিক্ষেপ থামিয়া গেল, শিবজী বুঝিলেন শত্রুরা সন্দেহ করিয়াছে মাত্র, এখনও স্পষ্ট বুঝিতে পারে নাই। তিনি দুর্গদিকে চাহিয়া দেখিলেন, একটী আলোকের স্থলে দুই তিনটী প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, সময়ে সময়ে প্রহরিগণ এদিক্ ওদিক্ যাইতেছে। তখন তিনি দুর্গপ্রাচীর হইতে কেবলমাত্র ৩০০ হস্ত দূরে। বুঝিলেন সৈন্যগণ সতর্কিত হইয়াছে, ভীষণ যুদ্ধ বিনা অদ্য দুর্গ হস্তগত হইবার নহে!

শিবজীর চিরসহচর তন্নজী মালশ্রীও এ সমস্ত দেখিলেন; ধীরে ধীরে বলিলেন, "রাজন্! এক্ষণও নামিয়া যাইবার সময় আছে, অদ্য দুর্গ হস্তগত না হয় কল্য হইবে, কিন্তু অদ্য চেষ্টা করিলে সকলের বিনাশ হইবার সম্ভাবনা আছে।" বিপদরাশির মধ্যে শিবজীর সাহস ও উৎসাহ সহস্রগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত। তিনি বলিলেন, "জয়সিংহের নিকট যাহা বলিয়াছি তাহা করিব, অদ্য রুদ্রমণ্ডল লইব অথবা এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিব।" শিবজীর নয়নদ্বয় উজ্জ্বল, স্বর স্থির ও অকম্পিত, তন্নজী দেখিলেন অন্য পরামর্শ বৃথা, বলিলেন, "বিপদের সময় প্রভু-পার্শ্ব ভিন্ন তন্নজীর অন্য স্থল নাই, অগ্রসর হউন।"

শিবজী নিস্তব্ধে সেই বৃক্ষ-শ্রেণীর ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শত্রুকে ভুলাইবার জন্য একশত সৈন্যকে দুর্গের অপর পার্শ্বে যাইয়া গোল করিতে আদেশ করিলেন। একদণ্ড কালের মধ্যে দুর্গের অপর পার্শ্বে গোল শুনা যাইল, সেইদিক্ হইতে শিবজী দুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া দুর্গস্থ প্রহরী ও সৈন্য সকলে সেই দিকে ধাবমান হইল, এদিকে প্রাচীরোপরি যে দুই তিনটী আলোক জ্বলিতেছিল তাহা নিবিয়া যাইল! তখন শিবজী বলিলেন, "মহারাষ্ট্রীয়গণ! শত যুদ্ধে তোমরা আপন বিক্রমের পরিচয় দিয়াছ, শিবজীর নাম রাখিয়াছ, অদ্য আর একবার সেই পরিচয় দাও। তন্নজী! বাল্যকালের সৌহৃদ্যের পরিচয় অদ্য প্রদান কর।" পরে রঘুনাথজীউকে পার্শ্বে দেখিয়া বলিলেন, "হাবেলদার! একদিন আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছিলে, অদ্য আমার মান বাঁচাও।" প্রভুবাক্যে সকলের হৃদয় সাহসে পরিপূরিত হইল, নিঃশব্দে সেই গভীর অন্ধকারে সকলে অগ্রসর হইলেন, অচিরে দুর্গপ্রাচীরের নিকট পঁহুছিলেন। রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, আকাশে আলোক নাই, জগতে শব্দ নাই, কেবল রহিয়া রহিয়া নৈশ বায়ু সেই পর্ব্বতবৃক্ষের ভিতর দিয়া মর্ম্মরশব্দে প্রবাহিত হইতেছে।

রুদ্রমণ্ডলের প্রাচীর হইতে শিবজী পঞ্চাশৎ হস্ত দূরে আছেন, এমন সময় দেখিলেন প্রাচীরের উপর একজন প্রহরী;—বৃক্ষের ভিতর শব্দ শ্রবণ করিয়া প্রহরী পুনরায় এইদিকে আসিয়াছে। একজন মাউলী নিঃশব্দে একটী তীর নিক্ষেপ করিল,—হতভাগা প্রহরীর মৃত শরীর প্রাচীরের বাহিরে পতিত হইল।

সেই শব্দ শুনিয়া আর এক জন, দুই জন, দশ জন, শত জন, ক্রমে দুই তিন শত জন প্রাচীরের উপর ও নীচে জড় হইল; শিবজী রোষে ওষ্ঠের উপর দন্তস্থাপন করিলেন, আর লুক্কায়িত থাকিবার উপায় দেখিলেন না, সৈন্যকে অগ্রসর হইবার আদেশ দিলেন।

তৎক্ষণাৎ মহারাষ্ট্রীয়দিগের "হর হর মহাদেও" ভীষণনাদ গগনে উত্থিত হইল, এক দল প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার জন্য দৌড়াইয়া গেল, আর এক দল বৃক্ষের ভিতর থাকিয়াই ক্ষিপ্রহস্তে প্রাচীরারোহী মুসলমানদিগকে তীরদ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল। মুসলমানেরাও শত্রুর আগমনে কিছু ভয়ভীত না হইয়া "আল্লাহু আকবর" শব্দে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিল, কেহ বা প্রাচীরের উপর হইতে তীর ও বর্শা নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কেহ বা উৎসাহপরিপূর্ণ হইয়া প্রাচীর হইতে লম্ফ দিয়া আসিয়া বৃক্ষমধ্যেই মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করিল।

শীঘ্রই সেই প্রাচীরতলে ও বৃক্ষমধ্যে ভীষণ কাণ্ড হইয়া উঠিল। প্রাচীরের উপরিস্থ মুসলমানেরা সবল বর্শাচালনে আক্রমণকারিদিগকে হত করিতে লাগিল, তাহারাও অব্যর্থ তীরসঞ্চালনে মুসলমানদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। রাশি রাশি মৃতদেহে প্রাচীর-পার্শ্ব পরিপূর্ণ হইল, যোদ্ধাগণ সেই মৃতদেহের উপর দণ্ডায়মান হইয়াই খড়্গ বা বর্শা-চালন করিতে লাগিল, রক্তে আক্রান্ত ও আক্রমণকারিদিগের শরীর রঞ্জিত হইয়া যাইল। শত শত মুসলমানেরা বৃক্ষের ভিতর পর্য্যন্ত আসিয়াছিল; শিবজীর মাউলীগণ একেবারে ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, প্রবলপ্রতাপ আফগানেরাও যুদ্ধে অপটু নহে; রক্তস্রোত সেই পর্ব্বত দিয়া বহিয়া পড়িতে লাগিল। বৃক্ষের অন্তরালে ঝোপের ভিতর, শিলারাশির পার্শ্বে শত শত মহারাষ্ট্রীয়গণ দণ্ডায়মান হইয়া অব্যর্থ তীর ও বর্শা সঞ্চালন করিতে লাগিল, বৃক্ষপত্র ও বৃক্ষশাখার ভিতর দিয়া অবারিতস্রোতে সেই তীর আক্রান্তদিগের সংখ্যা ক্ষীণতর করিতে লাগিল, আক্রমণকারী ও আক্রান্তদিগের ঘন ঘন সিংহনাদে ও আর্ত্তদিগের আর্ত্ত-নাদে সেই নৈশ গগন কম্পিত হইতে লাগিল।

সহসা এ সমস্ত শব্দকে ডুবাইয়া প্রাচীর হইতে "শিবজীকি জয়" এইরূপ বজ্রনাদ উত্থিত হইল মুহূর্ত্তের জন্য সকলেই সেইদিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, শত্রুসৈন্য ভেদ করিয়া মৃতদেহরাশির উপর দাঁড়াইয়া, রক্তাপ্লুত বর্শার উপর ভর দিয়া একজন মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা এক লম্ফে রুদ্রমণ্ডলের প্রাচীরের উপর উঠিয়াছেন; তথায় পাঠানদিগের পতাকা পদাঘাতে ফেলিয়া দিয়াছেন, পতাকাধারী ও দুই একজন প্রহরীকে বর্শা ও খড়্গ চালনে হত করিয়াছেন, প্রাচীরোপরি দণ্ডায়মান হইয়া সেই অপূর্ব্ব যোদ্ধা বজ্রনাদে "শিবজীকি জয়" শব্দ করিয়াছিলেন, সেই যোদ্ধা রঘুনাথজী হাবেলদার!

হিন্দু ও মুসলমান এক মুহূর্ত্তের জন্য যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে তারকালোকে সেই দীর্ঘমূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি করিল। যোদ্ধার লৌহনির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ তারকালোকে চক্‌মক্‌ করিতেছে, হস্ত, বাহু, পদদ্বয় রক্তে আপ্লুত, বিশাল বক্ষের চর্ম্মে দুই একটী তীর লাগিয়া রহিয়াছে, দীর্ঘহস্তে রক্তাপ্লুত অতি দীর্ঘ বর্শা, উজ্জ্বল নয়ন গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশে আবৃত। শত্রুরাও পোতের সম্মুখে ঊর্ম্মিরাশির ন্যায়, এই যোদ্ধার দুই পার্শ্বে মুহূর্ত্তের জন্য সচকিতে সরিয়া গেল, সেই দীর্ঘ বর্শাধারীর নিকট সহসা কেহ আসিল না, মুহূর্ত্তের জন্য বোধ হইল যেন স্বয়ং রণদেব দীর্ঘ-বর্শাহস্তে আকাশ হইতে প্রাচীরোপরি অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ক্ষণকাল মাত্র সকলে নিস্তব্ধ রহিল; পরেই আফগানগণ শত্রু প্রাচীরে উঠিয়াছে দেখিয়া চারিদিক্‌ হইতে বেগে আসিতে লাগিল; রঘুনাথকে চারিদিকে শত্রুদল কৃষ্ণমেঘের ন্যায় আসিয়া বেষ্টন করিল। রঘুনাথ খড়্গ বর্শাচালনে অদ্বিতীয়, কিন্তু শত লোকের সহিত যুদ্ধ অসম্ভব, রঘুনাথের জীবন সংশয়!

কিন্তু মাউলীগণও ক্ষান্ত রহিল না। রঘুনাথের বিক্রম দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া সকলে সেই প্রাচীরের দিকে ধাবমান হইল; ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া প্রাচীরে উঠিল, রঘুনাথের চারিদিকে বেষ্টন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, দশ, পঞ্চাশ, দুই তিন শত জন সেই প্রাচীরের উপর বা উভয় পার্শ্বে আসিয়া জড় হইল, ছুরিকা ও খড়্গাঘাতে পাঠানদিগের সারি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পথ পরিষ্কার করিল, মহানাদে দুর্গ পরিপূরিত করিল! সহস্র মহারাষ্ট্রীয়ের সহিত দুই তিন শত পাঠানের যুদ্ধ করা সম্ভব নহে, তাহারা মহারাষ্ট্রীয়ের গতিরোধ করিতে পারিল না, কিন্তু তখনও সিংহবীর্য্য প্রকাশ করিয়া গতিরোধের চেষ্টা করিতেছে।

সেই তুমুল হত্যাকাণ্ডের মধ্যে আর একটী বজ্রনাদ উত্থিত হইল; শিবজী ও তন্নজী প্রাচীর হইতে লম্ফ দিয়া দুর্গের ভিতরদিকে ধাবমান হইতেছেন; সৈন্যগণ বুঝিল, আর এস্থানে যুদ্ধের আবশ্যক নাই, সকলেই প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুর্গের ভিতরদিকে ধাবমান হইল। পাঠানগণ প্রায় হত কি আহত, মহারাষ্ট্রীয়দিগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে অসমর্থ!

শিবজী বিদ্যুৎগতিতে কিল্লাদারের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন, সে প্রাসাদ অতিশয় কঠিন ও সুরক্ষিত, সহস্র মহারাষ্ট্রীয়ের বর্শাঘাতে প্রাচীর ও দ্বারদেশ কম্পিত হইল, কিন্তু ভাঙ্গিল না। শিবজীর আদেশ অনুসারে মহারাষ্ট্রীয়েরা সেই প্রাসাদ বেষ্টন করিল ও বাহিরের প্রহরী সকলকে হত করিল। শিবজী তখন বজ্রনাদে কিল্লাদারকে বলিলেন, "দ্বার খুলিয়া দাও, নচেৎ প্রাসাদ দাহ করিব, প্রাসাদবাসী সকলে বিনষ্ট হইবে।" নির্ভীক পাঠান উত্তর করিলেন, "অগ্নিতে দাহ হইব, কিন্তু কাফেরের সম্মুখে দ্বার খুলিব না।"

তৎক্ষণাৎ শত মহারাষ্ট্রীয় মশাল আনিয়া দ্বারে জানালায় অগ্নিদান করিতে লাগিল। উপর হইতে কিল্লাদার ও তাঁহার সঙ্গিগণ তীর ও বর্শা-নিক্ষেপে প্রাসাদে অগ্নিদান নিবারণ করিবার চেষ্টা পাইলেন, শত মহারাষ্ট্রীয় মশালহস্তে ভূতলশায়ী হইল, কিন্তু অগ্নি জ্বলিল।

প্রথমে দ্বার, গবাক্ষ, পরে কড়িকাট, পরে সেই বিস্তীর্ণ প্রাসাদ সমস্ত অগ্নিতে জ্বলিয়া উঠিল, সেই প্রচণ্ড আলোক ভীষণনাদে আকাশের দিকে ধাবমান হইল, ও রজনীর অন্ধকারকে আলোকময় করিল। দুর্গের উপরে, নীচের পল্লিগ্রামে, বহুদূর পর্য্যন্ত পর্ব্বতে ও উপত্যকায় সেই আলোকস্তম্ভ দৃষ্ট হইল, সেই দাহের শব্দ শ্রুত হইল, সকলে জানিল শিবজীর দুর্দ্দমনীয় ও অপ্রতিহত সেনা মুসলমান-দুর্গ জয় করিয়াছে!

বীরের যাহা সাধ্য পাঠান কিল্লাদার রহমৎখাঁ তাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সঙ্গের যোদ্ধার সহিত বীরের ন্যায় মরিতে বাকি ছিল। যখন গৃহ অগ্নিপূর্ণ হইল, রহমৎখাঁ ও সঙ্গিগণ লম্ফ দিয়া ছাদ হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলেন, এক একজন এক এক মহাবীরের ন্যায় খড়্গ চালনা করিতে লাগিলেন, সেই খড়্গ চালনায় বহু মহারাষ্ট্রীয় হত হইল।

সকলে সেই মুসলমানদিগকে বেষ্টন করিল, তাঁহারা শত্রুর মধ্যে চমৎকার পরাক্রম প্রকাশ করিয়া একে একে হত হইতে লাগিলেন। একজন, দুইজন, দশজন হত হইলেন। রহমৎ খাঁ আহত ও ক্ষীণ, তথনও সিংহ-বীর্য্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছে,

চারিদিকে খড়্গ উত্তোলিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনের আশা নাই, এরূপ সময় উচ্চৈঃস্বরে শিবজীর আদেশ, শ্রুত হইল, "কিল্লাদারকে বন্দী কর, বীরের প্রাণসংহার করিও না।" ক্ষীণ আহত আফগানের হস্ত হইতে খড়্গ কাড়িয়া লইল, তাঁহার হস্ত বন্ধন করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিল।

মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রাসাদের অগ্নি নির্ব্বাণ করিতেছে এমত সময় শিবজী দেখিলেন দুঃর্গের অপর পার্শ্ব হইতে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় প্রায় ছয়শত আফগান সৈন্য রাশীকৃত হইয়া আসিতেছে। শিবজী দুর্গপ্রাচীর আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে যে একশত সেনাকে অপর পার্শ্বে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহারা সেই দিকে গোল করাতে দুর্গের অধিকাংশ সেনা সেই দিকেই গিয়াছিল ; ধূর্ত্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ ক্ষণেক বৃক্ষের অন্তরাল হইতে যুদ্ধ করিয়া ক্রমে ক্রমে পলায়ন করিতে লাগিল, তাহাতে মুসলমানেরা উৎসাহিত হইয়া পর্ব্বতের তল পর্য্যন্ত সেই একশত মহারাষ্ট্রীয়ের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, অপর দিকে শিবজী আক্রমণ করিয়া যে দুর্গ হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহা তাহারা কিছুমাত্র জানিতে পারে নাই।

পরে যখন প্রাসাদের আলোকে ক্ষেত্র, গ্রাম, পর্ব্বত ও উপত্যকা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, তখন সেই অধিকাংশ মুসলমানগণ আপনাদিগের ভ্রম জানিতে পারিয়া পুনরায় দুর্গারোহণ করিয়া শত্রু বিনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। শিবজী অল্পসংখ্যক্ সেনাকে পরাস্ত করিয়া দুর্গজয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে অপর পার্শ্ব হইতে পাঁচ কি ছয়শত যোদ্ধা আসিতেছে দেখিয়া তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল।

সুতীক্ষ্ণ নয়নে দেখিলেন দুর্গের মধ্যে কিল্লাদারের প্রাসাদই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম স্থান। চারিদিকে পরিখা, তাহার পর প্রস্তরময় প্রাচীর, অগ্নিতে সে প্রাচীরের কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই। তাহার মধ্যে প্রাসাদ, প্রাসাদের দ্বার ও গবাক্ষ জ্বলিয়া গিয়াছে, কোথাও বা ঘর পড়িয়া প্রস্তররাশি হইয়াছে। তীক্ষ্ণনয়ন শিবজী মুহূর্ত্তের মধ্যে দেখিলেন, অধিক সংখ্যক্ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার স্থল ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর হইতে পারে না।

মুহূর্ত্ত মধ্যে মনে সমস্ত ধারণা করিলেন ; স্বয়ং তন্নজী ও দুইশত সেনা সেই প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, প্রাচীরের পার্শ্বে তিরন্দাজ রাখিলেন, দ্বারগবাক্ষের পার্শ্বে পার্শ্বে তিরন্দাজ রাখিলেন, ছাদের উপর বর্শাধারী যোদ্ধাগণকে সন্নিবেশিত করিলেন ; কোথাও প্রস্তর পরিষ্কার করিলেন, কোথাও অধিক প্রস্তর একত্র করিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত প্রস্তুত। তখন হাস্য

করিয়া তন্নজীকে কহিলেন, "এই আমাদের শেষ উপায়, কিন্তু শত্রুকে এই স্থানে আসিতে দিবার পূর্ব্বেই বোধ হয় পরাস্ত করা যাইতে পারে, অন্ধকারে সহসা আক্রমণ করিলে তাহারা ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবে। তন্নজী দুইশত সৈন্যসহিত এইস্থানে অবস্থিতি কর, আমি একবার উদ্যোগ করিয়া দেখি।"

তন্নজী। "তন্নজী এ স্থানে অবস্থিতি করিবে না, একজন মহারাষ্ট্রীয়ও এস্থানে অবস্থিতি করিবে না! ক্ষত্রিয়রাজ! সম্মুখ যুদ্ধে সকলেই পটু, কিন্তু যদি এস্থান আক্রান্ত হয় তবে আপনি না থাকিলে কাহার কৌশলবলে এ প্রাসাদ রক্ষিত হইবে?"

শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তন্নজী! তোমার কথাই ঠিক! আমি সম্মুখে শত্রু দেখিয়া যুদ্ধলুব্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু না, এই স্থানেই আমার থাকা কর্ত্তব্য। আমার হাবিলদারদিগের মধ্যে কে তিন শত মাত্র সেনা লইয়া ঐ আফগানগণকে অন্ধকারে সহসা আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিতে পারিবে?"

পাঁচ, সাত, দশ জন হাবিলদার একেবারে দণ্ডায়মান হইলেন, সকলে গোল করিয়া উঠিল। রঘুনাথ তাহাদের একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না, নিঃশব্দে মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

শিবজী ধীরে ধীরে সকলের দিকে চাহিয়া, পরে রঘুনাথকে দেখিয়া বলিলেন, "হাবেলদার! তুমি ইহাদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ, কিন্তু ঐ বাহুতে অসুরবীর্য্য ধারণ কর, অদ্য তোমার বিক্রম দেখিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছি। রঘুনাথ! তুমিই অদ্য দুর্গবিজয় আরম্ভ করিয়াছ, তুমিই শেষ কর।"

রঘুনাথ নিঃশব্দে ভূমি পর্য্যন্ত শির নমাইয়া তিন শত সেনার সহিত বিদ্যুৎগতিতে নয়নের বহির্গত হইলেন।

শিবজী তন্নজীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঐ হাবেলদার রাজপুতজাতীয়; উহার মুখমণ্ডল ও আচরণ দেখিলে কোন উন্নত বীরবংশোদ্ভব বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু হাবেলদার কখন বংশের বিষয় একটী কথাও বলে না, আপন অসাধারণ সাহস সম্বন্ধে একটী গর্ব্বিত বাক্যও উচ্চারণ করে না, কেবল যুদ্ধকালে, বিপদ্‌কালে, সেই সাহস ও বিক্রম কার্য্যে পরিণত করে! একদিন পুনায় আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, অদ্য রঘুনাথই দুর্গবিজয়ে অগ্রসর,—আমি এপর্য্যন্ত কোনও পুরস্কার দিই নাই, কল্য রাজসভায় রাজা জয়সিংহের সম্মুখে রঘুনাথ সাহসের উচিত পুরস্কার পাইবেন।"

রঘুনাথজী যুদ্ধের কৌশল শিক্ষা করেন নাই, করিতে চেষ্টাও করেন নাই; একেবারে তিন শত মাউলীর সহিত বর্শাহস্তে দুর্দমনীয় ভীষণ বেগে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিলেন। ত্রিংশৎ হস্ত দূর হইতে সকলে অব্যর্থ বর্শা নিক্ষেপ করিল, পরে "হর হর মহাদেও" ভীষণ নাদে ব্যাঘ্রের মত লম্ফ দিয়া মুসলমানদিগের মধ্যে যাইয়া পড়িল। সে বেগ অমানুষিক ও অনিবার্য্য, মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রবলপরাক্রান্ত আফগানশ্রেণী ছারখার ও ভিন্ন হইয়া গেল, উন্মত্ত মাউলীদিগের অবারিত ছুরিকা ও খড়্গ আঘাতে আফগানগণ নিপতিত হইতে লাগিল।

কিন্তু আফগানগণও যুদ্ধবিষয়ে অপটু নহেন; শ্রেণীচ্যুত হইয়াও হটিল না, পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে যুদ্ধনিনাদ করিয়া মাউলীদিগকে বেষ্টন করিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে যে দৃশ্য দৃষ্ট হইল তাহার বর্ণনা দুঃসাধ্য। নিবিড় অন্ধকারে শত্রু মিত্র দেখা যায় না, আপন হস্তের অসি ভাল দেখা যাইতেছে না, মৃতদেহে সেইস্থান পরিপূর্ণ হইল, রক্ত স্রোতরূপে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, বর্শা, খড়্গ, ছুরিকা অবারিত পরিচালিত হইতেছে, যুদ্ধনিনাদে মেদিনী ও গগন পরিপূরিত হইতেছে; বোধ হয় যেন এ মনুষ্যের যুদ্ধ নহে, শত সহস্র রক্তলোলুপ ক্ষুধিত ব্যাঘ্র পৈশাচিক শব্দে পরস্পরকে নখদ্বারা বিদীর্ণ করিতেছে।

ঘন ঘন ভীষণ নাদে বেষ্টনকারী আফগানগণ মুহুর্মুহুঃ সেই তিন শত যোদ্ধাকে আক্রমণ করিতেছে, কিন্তু সে অপূর্ব্ব যোদ্ধৃশ্রেণী কম্পিত হইল না। সমুদ্রের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জনে মুসলমানেরা সেই বীর-প্রাচীরে আঘাত করিতেছে, কিন্তু পর্ব্বততুল্য সেই বীর-প্রাচীর অনায়াসে সে আঘাত প্রতিহত করিতেছে। মৃতের শরীরে চারিদিকে প্রাচীরের ন্যায় হইয়াছে, মাউলীদিগের সংখ্যা ক্রমে ক্ষীণ হইতেছে, আফগানগণ পুনঃ পুনঃ অধিকতর বেগে আক্রমণ করিতেছে, কিন্তু সে শ্রেণী ভিন্ন হইল না।

সহসা "শিবজীকি জয়" এইরূপ বজ্রনাদ হইল, সকলে চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, দুর্গের তিন চারি স্থলে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা অগ্নিতে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে ও সেইদিক্ হইতে যুদ্ধনিনাদ করিয়া আরও মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য আসিতেছে। যে একশত জন মহারাষ্ট্রীয় ধূর্ত্ততার সহিত আফগান সৈন্য দুর্গের বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল, আফগানগণ দুর্গে প্রত্যাগমন করিলে তাহারাই পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক্ষণে সেইদিক্ হইতে আসিয়া কয়েকটী গৃহে অগ্নিদান করিয়া মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিল। আফগানদিগের দুর্গ শত্রু-হস্তগত হইয়াছে, প্রাসাদ জ্বলিয়া গিয়াছে, অন্যান্য অট্টালিকা

জ্বলিতেছে, সম্মুখে শত্রু, পশ্চাতে শত্রু, মনুষ্যের যাহা সাধ্য তাহারা করিয়াছিল, আর পারিল না, একেবারে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল, মহারাষ্ট্রীয়গণ পশ্চাদ্ধাবন করিয়া শত শত শত্রু বিনষ্ট করিল। রঘুনাথ তখন উচ্চৈঃস্বরে আদেশ দিলেন, "পলাতককে বন্দী কর, হত্যা করিও না; শিবজীর আদেশ পালন কর।" পলাতকগণ অস্ত্র বিসর্জ্জন করিয়া প্রাণ যাচ্ঞা করিল,—তাঁহাদিগের প্রাণরক্ষা হইল।

তখন রঘুনাথ দুর্গের অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া প্রাচীরের স্থানে স্থানে প্রহরী সংস্থাপন করিলেন; গোলা, বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্রের ঘরে আপন প্রহরী সন্নিবেশিত করিলেন, বন্দীদিগকে একটী ঘরে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন; দুর্গের সমস্ত ঘর সমস্ত স্থান হস্তগত করিয়া সুরক্ষার আদেশ দিয়া শিবজীর নিকট যাইয়া শির নমাইয়া সমস্ত সমাচার নিবেদন করিলেন।

উষার রক্তিমাচ্ছটা পূর্ব্বদিকে দৃষ্ট হইল; প্রাতঃকালের সুমন্দ শীতল বায়ু ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতে লাগিল; সমস্ত দুর্গ শব্দশূন্য, নিস্তব্ধ! যেন এই সুন্দর শান্ত পাদপমণ্ডিত পর্ব্বতশেখর যোগীঋষির আশ্রম,—যেন যুদ্ধের পৈশাচিক রব কখন এস্থানে শ্রুত হয় নাই!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বিজেতার পুরস্কার।

"ছিন্ন তুষারের ন্যায় বাল্য বাঞ্ছা দূরে যায়,
তাপদগ্ধ জীবনের মন্দ বায়ু প্রহারে।
পড়ে থাকে দূরগত জীর্ণ অভিলাষ যত,
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দুর্গপ্রাকারে॥"

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরদিন অপরাহ্নে সেই দুর্গোপরি অপরূপ সভা সন্নিবেশিত হইল। রৌপ্যবিনির্ম্মিত চারি স্তম্ভের উপর রক্তবর্ণের চন্দ্রাতপ, নীচেও রক্তবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত রাজগদীর উপর রাজা জয়সিংহ ও রাজা শিবজী উপবেশন করিয়া আছেন। চারি পার্শ্বে সৈন্যগণ বন্দুক লইয়া শ্রেণীবদ্ধে, দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই বন্দুকের কিরীচ হইতে রক্তবর্ণের পতাকা অপরাহ্নের বায়ুহিল্লোলে নৃত্য করিতেছে। চারিদিকে শত শত লোক দিল্লীশ্বরের ও জয়সিংহ ও শিবজীর জয়নাদ করিতেছে।

জয়সিংহ সহাস্যবদনে বলিলেন, "আপনি দিল্লীশ্বরের পক্ষাবলম্বন করিয়া অবধি তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়াছেন। এ উপকার দিল্লীশ্বর কখনই বিস্মৃত হইবেন না, আপনার সকল চেষ্টার জয় হইয়াছে।"

শিবজী। "যেখানে জয়সিংহ সেইখানে জয়।"

সভাসদ্গণ সকলে সাধুবাদ করিল। জয়সিংহ আবার বলিলেন, "বোধ করি আমরা শীঘ্রই বিজয়পুর হস্তগত করিতে পারিব, আপনি এক রাত্রির মধ্যে এই দুর্গ অধিকার করিবেন তাহা আমি কখনই আশা করি নাই!"

শিব। "মহারাজ! দুর্গ-বিজয় বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করিয়াছি। তথাপি যেরূপ অনায়াসে দুর্গ লইব বিবেচনা করিয়াছিলাম, সেরূপ পারি নাই।"

জয়। "কেন?"

শিব। "মুসলমানদিগকে সুপ্ত পাইব বিবেচনা করিয়াছিলাম, দেখিলাম সকলে জাগ্রত ও সসজ্জ! পূর্ব্বে কখনও দুর্গজয় করিতে এরূপ যুদ্ধ করিতে হয় নাই।"

জয়। "বোধ করি এক্ষণ যুদ্ধের সময় বলিয়া রজনীতে সর্ব্বদাই শত্রুরা সসজ্জ থাকে।"

শিব। "সত্য, কিন্তু এত দুর্গ জয় করিয়াছি, কোথাও সৈন্যগণকে এরূপ প্রস্তুত দেখি নাই।"

জয়। "শিক্ষা পাইয়া ক্রমে সতর্ক হইতেছে। কিন্তু সতর্কই থাকুক অথবা নাই থাকুক, রাজা শিবজীর গতি অবারিত, শিবজীর জয় অনিবার্য্য!"

শিব। "মহারাজের প্রসাদে দুর্গ জয় হইয়াছে বটে, কিন্তু কল্য রজনীর ক্ষতি জীবনে পূরণ হইবে না। সহস্র আক্রমণকারীর মধ্যে পঞ্চশত জনকে আমি আর এ জীবনে দেখিব না, সেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিশ্বস্ত সেনা বোধ হয় আর পাইব না।" শিবজী ক্ষণেক শোকাকুল হইয়া রহিলেন। পরে বন্দীগণকে আনয়নের আদেশ করিলেন।

রহমৎখাঁর অধীনে সহস্র সেনা সেই দুর্গম দুর্গ রক্ষা করিত, কল্যকার যুদ্ধের পর কেবল তিনশত মাত্র জীবিত আছে। সকলের হস্তদ্বয় পশ্চাৎদিকে বদ্ধ, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সকলে সভাসম্মুখে উপস্থিত হইল।

শিবজী আদেশ করিলেন, "সকলের হস্ত খুলিয়া দাও। আফগান সেনাগণ! তোমরা বীরের নাম রাখিয়াছ, তোমাদের আচরণে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমরা স্বাধীন। ইচ্ছা হয় দিল্লীশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত হও, নচেৎ

আপন প্রভু বিজয়পুরের সুলতানের নিকট চলিয়া যাও,—আমার আদেশে কেহ তোমাদিগের কেশাগ্র স্পর্শ করিবে না।"

শিবজীর এই সদাচরণ দেখিয়া কেহই বিস্মিত হইল না; সকল যুদ্ধে, সকল দুর্গবিজয়ের পর তিনি বিজিতদিগের প্রতি যথেষ্ট দয়াপ্রকাশ ও সদাচরণ করিতেন; তাঁহার বন্ধুগণ কখন কখন তাঁহাকে এজন্য দোষ দিতেন, কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। শিবজীর সদাচরণে বিস্মিত হইয়া আফগানগণ অনেকেই দিল্লীশ্বরের বেতনভোগী হইতে স্বীকার করিল।

পরে শিবজী কিল্লাদার রহমৎখাঁকে আনিবার আদেশ দিলেন। তাঁহারও হস্তদ্বয় পশ্চাৎদিকে বদ্ধ, তাঁহার ললাটে খড়্গের আঘাত, বাহুতে তীর বিদ্ধ হইয়া ক্ষত হইয়াছে, কিন্তু বীর তখনও সদর্পে সভা-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, সদর্পে শিবজীর দিকে চাহিলেন।

শিবজী সেই বীরশ্রেষ্ঠকে দেখিয়া স্বয়ং আসনত্যাগ করিয়া খড়্গের দ্বারা হস্তের রজ্জু কাটিয়া ফেলিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—

—"বীরপ্রধান! যুদ্ধের নিয়মানুসারে আপনার হস্তদ্বয় বদ্ধ হইয়াছিল, আপনি এক রজনী বন্দীরূপে ছিলেন, আমার সে দোষ মার্জ্জনা করুন, আপনি এক্ষণে স্বাধীন; আপনার বীরত্বের কথা কি বলিব; জয় পরাজয় ভাগ্যক্রমে ঘটে, কিন্তু আপনার ন্যায় যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমিই সম্মানিত হইয়াছি।"

রহমৎখাঁ প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রত্যাশা করিতেছিলেন, তাহাতেও তাঁহার স্থির গর্ব্বিত নয়নের একটী পত্রও কম্পিত হয় নাই; কিন্তু শিবজীর এই অসাধারণ ভদ্রতা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইল। যুদ্ধসময়ে শত্রুমধ্যে কেহ কখনও রহমৎখাঁর কাতরতা-চিহ্ন দেখেন নাই, অদ্য বৃদ্ধের দুই উজ্জ্বল চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। রহমৎখাঁ মুখ ফিরাইয়া তাহা মোচন করিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন—

"ক্ষত্রিয়রাজ! কল্য নিশীথে আপনার বাহুবলে পরাস্ত হইয়াছিলাম, অদ্য আপনার ভদ্রাচরণে তদধিক পরাস্ত হইলাম। যিনি হিন্দু ও মুসলমানদিগের অধীশ্বর, যিনি পাদসাহের উপর পাদসাহ, জমীন ও আসমানের সুলতান, তিনি এইজন্য আপনাকে নূতন রাজ্য বিস্তারের ক্ষমতা দিয়াছেন।" বৃদ্ধের নয়ন হইতে আর দুই বিন্দু জল পড়িল।

রাজা জয়সিংহ কহিলেন, "পাঠানরাজ! আপনারও উচ্চপদের যোগ্যতা আপনি প্রমাণ করিয়াছেন। দিল্লীশ্বর আপনার ন্যায় সেনা পাইলে আরও পদবৃদ্ধি করিবেন সন্দেহ নাই। দিল্লীশ্বরকে কি লিখিতে

পারি যে আপনার ন্যায় বীরশ্রেষ্ঠ তাঁহার সৈন্যের একজন প্রধান কর্ম্মচারী হইতে সম্মত হইয়াছেন?"

রহমৎখাঁ উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আপনার প্রস্তাবে আমি যথেষ্ট সম্মানিত হইলাম, কিন্তু আজীবন যাঁহার কার্য্য করিয়াছি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব না; যতদিন এ হস্ত খড়্গ ধরিতে পারিবে, বিজয়পুরের জন্য ধরিবে।"

শিবজী বলিলেন, "তাহাই হউক। আপনি অদ্য রাত্রি বিশ্রাম করুন, কল্য প্রাতে আমার একদল সেনা আপনাকে বিজয়পুর পর্য্যন্ত নিরাপদে পঁহুছিয়া দিবে।" এই বলিয়া রহমৎখাঁকে যথোচিত সম্মান ও শুশ্রূষা করিবার জন্য কয়েক জন প্রহরীকে আদেশ দিলেন।

রহমৎখাঁ স্থিরনেত্রে ক্ষণেক শিবজীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ক্ষত্রিয়বর! আপনি আমার সহিত ভদ্রাচরণ করিয়াছেন, আমি অভদ্রাচরণ করিব না, আপনার নিকট কোন বিষয় গোপন রাখিব না। আপনার সেনার মধ্যে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, সকলে প্রভুভক্ত নহে। কল্য দুর্গাক্রমণের গোপনানুসন্ধান আমি পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই জন্যই সমস্ত সেনা সমস্ত রাত্রি সসজ্জ ও প্রস্তুত ছিল। অনুসন্ধানদাতা আপনারই এক জন সেনা। ইহার অধিক বলিতে পারি না, সত্য লঙ্ঘন করিব না।" রহমৎখাঁ ধীরে ধীরে প্রহরিগণের সহিত প্রাসাদাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

রোষে শিবজীর মুখমণ্ডল একবারে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার বন্ধুগণ বুঝিলেন এক্ষণে পরামর্শ দেওয়া বৃথা, তাঁহার সৈন্যগণ বুঝিল অদ্য প্রমাদ উপস্থিত।

জয়সিংহ শিবজীকে এতদবস্থায় দেখিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "ক্ষান্ত হউন, একের দোষে সমস্ত সৈন্যের উপর ক্রোধ অনুচিত।" পরে শিবজীর সৈন্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

"এই দুর্গ আক্রমণ করা হইবে তোমরা কখন্ জানিয়াছিলে?"

সৈন্যগণ উত্তর দিল, "এক প্রহর রজনীতে।"

জয়। "তাহার পূর্ব্বে কেহই এ কথা জানিতে না?"

সৈন্য। "রজনীতে কোন একটী দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে জানিতাম; এই দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে তাহা জানিতাম না।"

জয়। "ভাল, কোন্ সময়ে তোমরা দুর্গে পৌঁছিয়াছিলে?"

সৈন্য। "অনুমান দেড়প্রহর রজনীর সময়।"

জয়। "উত্তম ; এক প্রহর হইতে দেড়প্রহর মধ্যে তোমরা সকলেই কি একত্র ছিলে ? 'অমুক উপস্থিত নাই,' 'অমুক কোথায় গিয়াছে ?' 'অমুক আসিল না কেন ?' তোমাদিগের মধ্যে এরূপ প্রশ্ন হয় নাই ? যদি হইয়া থাকে প্রকাশ কর। দেখ একজনের জন্য সহস্র জনের গ্লানি অনুচিত ; তোমরা দেশে দেশে পর্ব্বতে পর্ব্বতে গ্রামে গ্রামে মহাবীর রাজা শিবজীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছ, রাজা তোমাদিগকে বিশ্বাস করেন, তোমরাও এরূপ প্রভু কখনও পাইবে না। আপনাদিগকে বিশ্বাসের যোগ্য প্রমাণ কর, যদি কেহ বিদ্রোহী থাকে তাহাকে আনিয়া দাও, যদি সে কল্য রজনীর যুদ্ধে মরিয়া থাকে তাহার নাম কর, অন্যায় সন্দেহে কেন সকলের মান কলুষিত হইতেছে ?"

সৈন্যগণ তখন কল্যকার কথা স্মরণ করিতে লাগিল, পরস্পরে কথা কহিতে লাগিল ; শিবজীর রোষ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল, কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বলিলেন, "মহারাজ ! অদ্য যদি সেই কপট যোদ্ধাকে বাহির করিয়া দিতে পারেন, আমি চিরকাল আপনার নিকট ঋণী থাকিব।"

চন্দ্ররাও নামে একজন জুমলাদার অগ্রসর হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—"রাজন্ ! কল্য এক প্রহর রজনীর সময় যখন আমরা যুদ্ধযাত্রা করি, তখন আমার অধীনস্থ একজন হাবেলদারকে অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই, যখন দুর্গতলে পঁহুছিলাম তখন তিনি আমাদের সহিত যোগ দিলেন।"

ভীষণস্বরে শিবজী বলিলেন, "সে কে, এখনও জীবিত আছে ?"

বিদ্রোহীর নাম শুনিবার জন্য সকলে নিস্তব্ধ !—একটী নিশ্বাসের শব্দও শুনা যাইতেছে না, সভাতলে একটী সূচিকা পড়িলে বোধ হয় তাহার শব্দ শুনা যায়। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে চন্দ্ররাও ধীরে ধীরে বলিলেন,—"রঘুনাথজী হাবেলদার !"

সকলে নির্ব্বাক, বিস্ময়স্তব্ধ !

চন্দ্ররাও একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু রঘুনাথের আগমনাবধি সকলে চন্দ্ররাওয়ের নাম ও বিক্রম বিস্মৃত হইয়াছিলেন। মানবপ্রকৃতিতে ঈর্ষ্যার ন্যায় ভীষণ বলবতী প্রবৃত্তি আর নাই।

শিবজীর মুখমণ্ডল পুনরায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল, ওষ্ঠে দন্ত স্থাপন করিয়া চন্দ্ররাওকে লক্ষ্য করিয়া সরোষে বলিলেন—

"নিন্দুক, কপটাচারি ! তোর নিন্দায় রঘুনাথের যশোরাশি স্পর্শ করিবে না, রঘুনাথের আচরণ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কিন্তু মিথ্যা নিন্দুকের শাস্তি সৈন্যেরা দেখুক।"

সেই বজ্রহস্তে শিবজী লৌহবর্শা উত্তোলন করিয়াছেন, সহসা রঘুনাথ সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—

"মহারাজ! প্রভু চন্দ্ররাওয়ের প্রাণসংহার করিবেন না, তিনি মিথ্যা-বাদী নহেন, আমার দুর্গতলে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল।"

আবার সভাস্থল নিস্তব্ধ, নিঃশব্দে সমস্ত সৈন্য রঘুনাথের দিকে অবলোকন করিতেছে।

শিবজী ক্ষণকাল প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে ললাটের স্বেদবিন্দু মোচন করিয়া বলিলেন,—"উঃ! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? তুমি রঘুনাথ তুমি এই কার্য্য করিয়াছ! তুমি যে প্রাচীর লঙ্ঘনের সময় অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া একাকী অগ্রসর হইয়াছিলে, পরে তিনশত সেনা মাত্র লইয়া দ্বিগুণ সংখ্যক্ আফগানকে পরাস্ত করিয়াছিলে, তুমি বিদ্রোহাচরণ করিয়া কিল্লাদারকে পূর্ব্বে আক্র-মণ-সংবাদ দিয়াছিলে?" শিবজীর নয়ন হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল।

রঘুনাথ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "প্রভু, আমি সে দোষে নির্দ্দোষী।" দীর্ঘকায় নির্ভীক তরুণ যোদ্ধা শিবজীর অগ্নিদৃষ্টির সম্মুখে নিষ্কম্প হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, চক্ষের পলক পড়িতেছে না, একটী পত্র পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে না। সভাস্থ সকলে, চারিদিকে অসংখ্য লোক সকলে রঘুনাথের দিকে তীব্র দৃষ্টি করিতেছে। রঘুনাথজী স্থির, অবিচলিত, অকম্পিত; তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল কেবল গভীর নিশ্বাসে স্ফীত হইতেছে! কল্য যেরূপ অসংখ্য শত্রুমধ্যে প্রাচীরোপরি একাকী দণ্ডায়মান হইয়া-ছিলেন, অদ্য তদপেক্ষা অধিক সঙ্কট মধ্যে যোদ্ধা সেইরূপ ধীর, সেইরূপ অবিচলিত।

শিবজী তর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"তবে কি জন্য আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া এক প্রহর রজনীর সময় অনুপস্থিত ছিলে?"

রঘুনাথের ওষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল, কোন উত্তর না করিয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রঘুনাথকে নির্ব্বাক দেখিয়া শিবজীর সন্দেহ বৃদ্ধি হইল; নয়নদ্বয় পুনরায় রক্তবর্ণ হইল, ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিলেন—

"কপটাচারি! এইজন্য এরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলে? কিন্তু কুক্ষণে শিবজীর নিকট ছলনা চেষ্টা করিয়াছিলে।"

রঘুনাথ সেইরূপ ধীর অকম্পিতস্বরে বলিলেন,—"রাজন্! ছলনা, কপটাচরণ আমার বংশের রীতি নহে,—বোধ হয় প্রভু চন্দ্ররাও তাহা

জানিতে পারেন।” অদ্য প্রথমে রঘুনাথ আপন বংশের উল্লেখ করিলেন।

রঘুনাথের স্থিরভাব শিবজীর ক্রোধে আহুতিস্বরূপ হইল, তিনি কর্কশ-ভাবে বলিলেন—

“পাপিষ্ঠ! নিষ্কৃতিচেষ্টা বৃথা! ক্ষুধার্ত্ত সিংহের গ্রাসে পড়িয়া পলায়ন করিতে পার, কিন্তু শিবজীর জ্বলন্ত ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ নাই।”

রঘুনাথ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, “আমি মহারাজের নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করি না, মনুষ্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি না; জগদীশ্বর আমার দোষ মার্জ্জনা করুন।”

ক্ষিপ্তপ্রায় শিবজী বর্শা উত্তোলন করিয়া বজ্রনাদে আদেশ করিলেন—

“বিদ্রোহাচরণের শাস্তি প্রাণদণ্ড।”

রঘুনাথ সেই বজ্রমুষ্টিতে সেই তীক্ষ্ণ বর্শা দেখিলেন, সেই অবিচলিত স্বরে বলিলেন—“যোদ্ধা মরণে প্রস্তুত আছে, বিদ্রোহাচরণ সে করে নাই।”

শিবজী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, অব্যর্থ মুষ্টিতে সেই বর্শা কম্পিত হইতেছে এরূপ সময়ে রাজা জয়সিংহ তাঁহার হস্তধারণ করিলেন।

তখন শিবজীর মুখমণ্ডল ক্রোধে বিকৃত হইয়াছিল, শরীর কম্পিত হইতেছিল, তিনি জয়সিংহের প্রতিও সমুচিত সম্মান বিস্মৃত হইলেন, কর্কশ-স্বরে কহিলেন—

“হস্ত ত্যাগ করুন; রাজপুতদিগের কি নিয়ম জানি না, জানিতে চাহি না, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সনাতন নিয়ম—বিদ্রোহীর শাস্তি প্রাণদণ্ড; শিবজী সেই নিয়ম পালন করিবে।”

জয়সিংহ কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “ক্ষত্রিয়রাজ! অদ্য যাহা করিবেন, কল্য তাহা অন্যথা করিতে পারিবেন না। এই যোদ্ধার অদ্য প্রাণদণ্ড করিলে চিরকাল সেজন্য অনুতাপ করিবেন! যুদ্ধ-নিয়মে আপনি পারদর্শী, কিন্তু বৃদ্ধ যে পরামর্শ দিতেছে তাহা অবহেলা করিবেন না।”

শিবজী জয়সিংহের ভদ্রতা দেখিয়া ঈষৎ অপ্রতিভ হইলেন, কহিলেন, “তাত। আমার পরুষবাক্য মার্জ্জনা করুন, আপনার কথা কখনও অবহেলা করিব না; কিন্তু শিবজী বিদ্রোহীকে ক্ষমা করিবে তাহা কখন মনে ভাবে নাই।” পরে রঘুনাথের দিকে চাহিয়া কহিলেন—

“হাবেলদার! রাজা জয়সিংহ তোমার জীবনরক্ষা করিলেন, কিন্তু আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, শিবজী বিদ্রোহীর মুখদর্শন করিতে চাহে

না।" তৎক্ষণাৎ পুনরায় বলিলেন, "অপেক্ষা কর; দুই বৎসর হইল তোমার কোষের ঐ অসি আমিই তোমাকে দিয়াছিলাম, বিদ্রোহীর হস্তে আমার অসির অবমাননা হইবে না। প্রহরিগণ! অসি কাড়িয়া লও, পরে বিদ্রোহীকে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া দাও।" প্রহরিগণ সেইরূপ করিল।

রঘুনাথের যখন প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, রঘুনাথ সে সময়ে অবিচলিত ছিলেন, কিন্তু প্রহরিগণ যখন অসি কাড়িয়া লইতেছিল, তখন তাঁহার শরীর ঈষৎ কম্পিত হইল, নয়নদ্বয় আরক্ত হইল। কিন্তু তিনি সে ভীষণ উদ্বেগ সংযম করিলেন, শিবজীর দিকে একবার চাহিয়া মৃত্তিকা পর্য্যন্ত শির নমাইয়া নিঃশব্দে দুর্গ হইতে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইয়া জগৎ আবৃত করিতেছে, একজন পথিক একাকী নিঃশব্দে পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রান্তরাভিমুখে গমন করিলেন। প্রান্তর পার হইলেন, একটী গ্রামে উপস্থিত হইলেন, সেটী পার হইয়া আর একটী প্রান্তরে আসিলেন। অন্ধকার গভীরতর হইল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রহিয়া রহিয়া নৈশ বায়ু বহিয়া যাইতেছে, অন্ধকারে সে পথিককে আর দেখা গেল না, তাহার পর আর কেহ সে পথিককে দেখিতে পাইল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্ররাও জুমলাদার।

"আমা হইতে অন্য যদি কেহ
অধিক গৌরব ধরে, দহে যেন দেহ,
হৃদে জ্বলে হলাহল।————"

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

চন্দ্ররাও জুমলাদারের সহিত আমাদের এই প্রথম পরিচয়, তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি, অসাধারণ বীর্য্য, অসাধারণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। তাঁহার বয়স রঘুনাথ অপেক্ষা ৫।৬ বৎসর অধিকমাত্র, কিন্তু দূর হইতে দেখিলে সহসা তাঁহাকে পঞ্চত্রিংশৎ বৎসরের লোক বলিয়া বোধ হয়। প্রশস্ত ললাটে এই বয়সেই দুই একটী চিন্তার গভীর রেখা অঙ্কিত রহিয়াছে, মস্তকের কেশ দুই একটী শুক্ল। নয়ন অতিশয় উজ্জ্বল ও তেজোব্যঞ্জক,

কিন্তু চন্দ্ররাওকে যাঁহারা বিশেষ করিয়া জানিতেন, তাঁহারা বলিতেন যে চন্দ্ররাওয়ের তেজ ও সাহস যেরূপ দুর্দ্দমনীয়, গভীর দূরদর্শী চিন্তা এবং ভীষণ অনিবার্য্য স্থিরপ্রতিজ্ঞাও সেইরূপ। সমস্ত মুখমণ্ডলে এই দুইটী ভাব বিশেষরূপে ব্যক্ত হইত। দেহ যেন লৌহনির্ম্মিত ও অসীম পরাক্রান্ত, যাঁহারা চন্দ্ররাওয়ের অসীম পরাক্রম, বিজাতীয় ক্রোধ, গভীর বুদ্ধি ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার বিষয় জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারা কখনই সেই অল্পভাষী স্থিরপ্রতিজ্ঞ ভয়ানক জুমলাদারের সহিত বিবাদ করিতেন না। এ সমস্ত ভিন্ন চন্দ্ররাওয়ের আর একটী গুণ বা দোষ ছিল, তাহা কেহই বিশেষরূপে জানিত না। বিজাতীয় উচ্চাভিলাষে তাঁহার হৃদয় দিবারাত্র জ্বলিত। অসাধারণ বুদ্ধি-সঞ্চালনে আত্মোন্নতির পথ আবিষ্কার করিতেন, অতুল দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত সেই পথ অবলম্বন করিতেন, খড়্গাহস্তে সেই পথ পরিষ্কার করিতেন; শত্রু হউক, মিত্র হউক, দোষী হউক, নির্দ্দোষী হউক, অপকারী হউক বা পরম উপকারী হউক, সে পথের সম্মুখে যিনি পড়িতেন, উচ্চাভিলাষী চন্দ্ররাও নিঃসঙ্কোচে পতঙ্গবৎ তাহাকে পদ-দলিত করিয়া নিজ পথ পরিষ্কার করিতেন। অদ্য বালক রঘুনাথ ঘটনাবশতঃ সেই পথের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন, তাহাকে পতঙ্গবৎ দলিত করিয়া জুমলাদার পথ পরিষ্কার করিলেন। এরূপ অসাধারণ পুরুষের পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানা আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথের বংশ-বৃত্তান্তও কিছু কিছু জানিতে পারিব।

তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত তিনি প্রকাশ করিতেন না, আমরাও জানি না, অতি উন্নত রাজপুতকুলোদ্ভূত বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন। রাজা যশোবন্ত-সিংহের একজন প্রধান সেনানী গজপতিসিংহ চন্দ্ররাওকে বাল্যকালে লালনপালন করিয়াছিলেন। অনাথ বালক গজপতির গৃহের কার্য্য করিত, গজপতির পুত্রকন্যাকে যত্ন করিত ও সেই সংসারের মধ্যে থাকিয়া কাল-যাপন করিত।

যখন চন্দ্ররাওয়ের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষমাত্র, তখনই গজপতি তাঁহার গভীর চিন্তা ও বুদ্ধি, ও দুর্দ্দমনীয় তেজ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, নিজ পুত্র রঘুনাথের ন্যায় চন্দ্ররাওকে ভাল বাসিতেন ও এই কোমল বয়সেই আপন অধীনে সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন।

সৈনিকের ব্রতধারণ করিয়া অবধিই চন্দ্ররাও দিন দিন যে বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া প্রাচীন যোদ্ধাগণও বিস্মিত হইত। যুদ্ধে যেস্থানে অতিশয় বিপদ্, যেস্থানে প্রাণনাশের অতিশয় সম্ভাবনা, যেস্থানে শত্রু ও মিত্রের শব রাশীকৃত হইতেছে, রক্তস্রোত বহিয়া

যাইতেছে, ধূলি ও ধূমে গগন আচ্ছাদিত হইতেছে, যোদ্ধার ভীষণ হুঙ্কারে ও আর্ত্তের আর্ত্তনাদে কর্ণ বিদীর্ণ হইতেছে,—তথায় অন্বেষণ কর, পঞ্চদশ বর্ষের বালক নিঃশব্দে অসুর-বীর্য্য প্রকাশ করিতেছে ; মুখে রব নাই, কিন্তু নয়ন অগ্নির ন্যায় প্রজ্জলিত, ললাট কুঞ্চিত ও বিজাতীয় ক্রোধচ্ছায়ায় কৃষ্ণবর্ণ! যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে যেস্থানে যুদ্ধজয়ী সেনাগণ একত্র হইয়া রজনীতে গীত বাদ্য করিতেছে, হাস্য ও আমোদ করিতেছে,—চন্দ্ররাও তথায় নাই ; অল্পভাষী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালক শিবিরের অন্ধকারে একাকী বসিয়া রহিয়াছে, অথবা কুঞ্চিতললাটে প্রান্তরে বা নদীতীরে একাকী সায়ংকালে পদচারণ করিতেছে। চন্দ্ররাওয়ের উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সাধিত হইল, তিনি এক্ষণে অজ্ঞাত রাজপুতশিশু নহেন, তাঁহার পদবৃদ্ধি হইয়াছে, গজপতি সিংহের অধীনস্থ সমস্ত সেনার মধ্যে চন্দ্ররাও এক্ষণে একজন অসাধারণ সাহসী তেজস্বী বীর বলিয়া পরিচিত। মর্য্যাদাবৃদ্ধির সহিত চন্দ্ররাওয়ের উচ্চাভিলাষ ও গর্ব্ব অধিকতর বৃদ্ধি পাইল।

একদিন একটী যুদ্ধে চন্দ্ররাওয়ের বিক্রম দেখিয়া গজপতি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন, বিজয়ের পর চন্দ্ররাওকে নিকটে ডাকিয়া সকলের সম্মুখে যথোচিত সম্মান করিয়া বলিলেন, "চন্দ্ররাও! অদ্য তোমার সাহসেই আমাদিগের যুদ্ধে জয় হইয়াছে, ইহার পুরস্কার তোমাকে কি দিতে পারি?" চন্দ্ররাও মুখ অবনত করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "প্রভুর সাধুবাদে দাস যথেষ্ট পুরস্কৃত হইয়াছে, আর অধিক সে কি চাহিতে পারে?" গজপতি সস্নেহে বলিলেন, "মনে ভাবিয়া দেখ, যাহা ইচ্ছা হয় প্রকাশ করিয়া বল। অর্থ, ক্ষমতা, পদবৃদ্ধি,—চন্দ্ররাও! তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নাই।" চন্দ্ররাও ধীরে ধীরে নয়ন উঠাইয়া বলিলেন—

"রাজপুত বীর কখনও অঙ্গীকার অন্যথা করেন না জগতে বিদিত আছে। বীরশ্রেষ্ঠ! আপনার কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে আমার সহিত বিবাহ দিন্।"

সভাস্থ সকলে নির্ব্বাক্, নিস্তব্ধ! গজপতির মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, ক্রোধে তাঁহার শরীর কম্পিত হইল ; অসি কোষ হইতে অর্দ্ধেক নিষ্কোষিত করিলেন, কিন্তু সে ক্রোধ কথঞ্চিৎ সংযম করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন—

"অঙ্গীকার পালনে স্বীকৃত আছি, কিন্তু তোমার মহারাষ্ট্রদেশে জন্ম, রাজপুতদুহিতাদিগের দস্যু মহারাষ্ট্রীয়ের সহিত পর্ব্বতকন্দরে ও জঙ্গলমধ্যে থাকিবার অভ্যাস নাই। অগ্রে লক্ষ্মীর উপযুক্ত বাসস্থান নির্ম্মাণ কর,

পরে মহারাষ্ট্রীয় ভৃত্যের সহিত রাজবংশীয়া বালিকার বিবাহ দিবার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করা যাইবে। এখন অন্য কোন যাচ্ঞা আছে?"

সভাস্থ সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, চন্দ্ররাও ধীরে ধীরে বলিলেন, অন্য কোন যাচ্ঞা এক্ষণে নাই, যখন থাকিবে প্রভুকে জানাইব।"

সভা ভঙ্গ হইল, সকলে নিজ নিজ শিবিরে গমন করিল, উদারচেতা গজপতি চন্দ্ররাওয়ের প্রতি ক্রোধ অচিরাৎ বিস্মৃত হইলেন, সেদিনকার কথা শীঘ্র বিস্মৃত হইলেন। চন্দ্ররাও সে কথা বিস্মৃত হইলেন না, সেই দিন সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে আপন শিবিরে পদচারণ করিতে লাগিলেন, প্রায় দুই দণ্ড এইরূপে পদচারণ করিলেন, শিবির অন্ধকার, কিন্তু তাহা অপেক্ষা দুর্ভেদ্য অন্ধকার চন্দ্ররাওয়ের হৃদয় ও ললাটে বিরাজ করিতেছিল। তাঁহার সে সময়ের ভাব বর্ণনা করিতে আমারা অশক্ত, সে সময়ে তাঁহার মুখের ভীষণ আকৃতি দেখিলে বোধ হয় স্বয়ং মৃত্যুও চকিত হইতেন।

দুই দণ্ডের পর চন্দ্ররাও একটী দীপ জ্বালিলেন,—একখানি পুস্তকে সযত্নে কি লিখিলেন, পুস্তকখানি বন্ধ করিলেন, আবার খুলিলেন, আবার দেখিলেন, আবার বন্ধ করিলেন। ঈষৎ বিকট হাস্য মুখমণ্ডলে দেখা গেল।

তাঁহার একজন বন্ধু ইতিমধ্যে শিবিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চন্দ্র! কি লিখিতেছ?" চন্দ্ররাও সহজ অবিচলিত স্বরে বলিলেন, "কিছু নহে, হিসাব লিখিয়া রাখিতেছি, আমি কাহার নিকট কি ধারি তাহাই লিখিতেছি।"

বন্ধু চলিয়া গেল! চন্দ্ররাও পুনরায় পুস্তকখানি খুলিলেন। সেটী যথার্থই হিসাবের পুস্তক, চন্দ্ররাও একটী ঋণের কথাই লিখিয়াছিলেন। পুনরায় পুস্তক বন্ধ করিয়া দীপ নির্ব্বাণ করিলেন।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে আরংজীবের সহিত যশোবন্তের উজ্জয়িনী সন্নিধানে মহাযুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে গজপতিসিংহ হত হয়েন, কিন্তু যে তীর তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করে তাহা শত্রুহস্তনিক্ষিপ্ত নহে।

তাহার পর যখন যশোবন্তের রাজ্ঞী পতির সেই যুদ্ধে পরাজয়ের কথা শুনিয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিলেন, তখন একজন সংবাদ দিল যে গজপতি নামক একজন সেনানীর ভীরুতা ও কপটাচারিতাতেই পরাজয় সাধন হইয়াছে। রাজ্ঞী সে সময়ে বিচার করিতে অসমর্থ, আদেশ করিলেন যে কপটাচারীর সন্তানসন্ততি মাড়ওয়ার হইতে দূরীকৃত হয়, ও সমস্ত সম্পত্তি রাজাধীনে নীত হয়! গজপতির কপটাচারিতার সংবাদ কে দিল তাহা স্পষ্ট প্রকাশ হইল না।

গজপতির অনাথা বালক ও বালিকা মাড়ওয়ার হইতে দূরীকৃত হইয়া পদব্রজে অন্য দেশে যাইতেছিল। রঘুনাথের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ, লক্ষ্মীর নয় বৎসর মাত্র, সঙ্গে কেবল একমাত্র পুরাতন ভৃত্য। রাজ্ঞীর ভয়ে হতভাগাদিগের প্রতি দয়াপ্রকাশ করিতেও কেহ সাহস করিল না। পথিমধ্যে একদল দস্যু সেই ভৃত্যকে হত্যা করিয়া বালকবালিকাকে মহারাষ্ট্রদেশে লইয়া যাইল। বালক অল্পবয়সেই তেজস্বী, রজনীযোগে দস্যুদিগের শিবির হইতে পলায়ন করিল, বালিকাকে দস্যুপতি বলপূর্ব্বক বিবাহ করিলেন। তিনি চন্দ্ররাও!

তীক্ষ্ণবুদ্ধি চন্দ্ররাওয়ের মনোরথ কতকপরিমাণে পূর্ণ হইল। গজপতির সংসার হইতে প্রভূত অর্থ ও মণিমাণিক্য আনিয়াছিলেন, বিস্তীর্ণ জায়গীর কিনিলেন, মহারাষ্ট্রে একজন সমাদৃত সম্ভ্রান্ত লোক হইলেন। "টাকা থাকিলে সব সাজে,"—চন্দ্ররাওয়ের বংশ এক পুরাতন রাজপুতবংশ হইতে উদ্ভূত, এ কথা কেহ অবিশ্বাস করিল না, তিনি প্রসিদ্ধনামা রাজপুত গজপতিসিংহের একমাত্র দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছেন সকলে দেখিতে পাইল, তাহার যথার্থ সাহস বিক্রম দেখিয়া শিবজী তাঁহাকে জুমলাদারের পদ দিলেন, তাঁহার বিপুল অর্থ, জায়গীর ও বাহ্যাড়ম্বর দেখিয়া সকলে তাঁহাকে সমাজে সমাদর করিলেন। চন্দ্ররাও আরও দুই তিনটী বড় ঘরে বিবাহ করিলেন, বড় লোকের সহিত মিশিতে লাগিলেন, বড় রকম চাল অবলম্বন করিলেন। আর কি করিলেন বলার আবশ্যক কি? যে সমস্ত সুন্দর কৌশলে আমরাই "বড়লোক" হই, সমাজের শিরোভূষণ হই, পদমর্যাদা বৃদ্ধি করি, সঙ্গে সঙ্গে দম্ভ ও গাম্ভীর্য্যও বৃদ্ধি করি,—চন্দ্ররাও তাহাই করিলেন। তবে চন্দ্ররাও অসভ্য, তিনি স্বহস্তে পিতাস্বরূপ গজপতিকে হনন করিয়া সে উন্নত বংশের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন,—আমারা সুসভ্য, আমরা চাতুরী ও মোকদ্দমাস্বরূপ সুন্দর উপায়ে কত সোণার সংসার ছারখার করি, কেহ নিন্দা করিতে পারেন না, কেন না এ সভ্য "আইনসঙ্গত" উপায়। চন্দ্ররাও অসভ্য, যুদ্ধে ভীষণ বিক্রম প্রকাশ করিয়া রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া আপন পদবৃদ্ধির চেষ্টা পাইতেন, দেশে দেশে যশোবিস্তারের চেষ্টা পাইতেন। আমরা সুসভ্য, বক্তৃতাস্বরূপ বাগযুদ্ধে বা সংবাদপত্রস্বরূপ লেখনীযুদ্ধে ভীষণ বিক্রম দেখাইয়া রাজার নিকট উপাধি প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করি, অচিরে "দেশহিতৈষী মহল্লোক" হইয়া উঠি! চারিদিকে জয়ধ্বনি বাজিতে থাকে, সংবাদপত্রের ভেরী বাজিতে থাকে, দেশে দেশে সে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে—আমরা "বড়লোক।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্মীবাই।

"স্বামী বনিতার পতি, স্বামী বনিতার গতি,
স্বামী বনিতার যে বিধাতা।
স্বামী বনিতার ধন, স্বামী বিনা অন্যজন,
কেহ নহে সুখ মোক্ষদাতা॥"
মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় রঘুনাথ দস্যুবেশী চন্দ্ররাও দ্বারা আক্রান্ত হইয়া রাজস্থান হইতে মহারাষ্ট্রদেশে নীত হইয়াছিলেন। এক দিন রজনী-যোগে তিনি পলায়ন করেন, পর্ব্বতকন্দরে, বনমধ্যে, প্রান্তরে, বা গৃহস্থের বাটীতে কয়েক দিন লুক্কায়িত থাকেন, সুন্দর অনাথ অল্পবয়স্ক বালককে দেখিয়া কেহই মুষ্টিভিক্ষা দিতে পরাঙ্মুখ হইত না।

তাহার পর পাঁচ ছয় বৎসর রঘুনাথ নানা স্থানে নানা কষ্টে অতি-বাহিত করিল। সংসারস্বরূপ অনন্ত সাগরে অনাথ বালক একাকী ভাসিতে লাগিল! নানা দেশে পর্য্যটন করিল, নানা লোকের নিকট ভিক্ষা বা দাসত্ববৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিল। পূর্ব্ব গৌরবের কথা, পিতার বীরত্ব ও সম্মানের কথা বালকের মনে সর্ব্বদাই জাগরিত হইত, কিন্তু অভিমানী বালক সে কথা, সে দুঃখ কাহাকেও বলিত না, কখন কখন দুঃখভার সহ্য করিতে না পারিলে নিঃশব্দে প্রান্তরে বা পর্ব্বত-শৃঙ্গোপরি উপবেশন করিয়া একাকী প্রাণ ভরিয়া রোদন করিত, পুনরায় চক্ষের জল মোচন করিয়া স্বকার্য্যে যাইত।

বয়োবৃদ্ধির সহিত বংশোচিত ভাব হৃদয়ে যেন আপনিই জাগরিত হইতে লাগিল। অল্পবয়স্ক ভৃত্য গোপনে কখন কখন প্রভুর শিরস্ত্রাণ মস্তকে ধারণ করিত, প্রভুর অসি কোষে ঝুলাইত! সন্ধ্যার সময় প্রান্তরে বসিয়া দেশীয় চারণদিগের গান উচ্চৈঃস্বরে গাইত, নৈশপথিকেরা পর্ব্বতগুহায় সংগ্রাম সিংহ বা প্রতাপের গীত শুনিয়া চমকিত হইত। যখন অষ্টাদশ বৎসর বয়স তখন রঘুনাথ শিবজীর কীর্ত্তি, শিবজীর উদ্দেশ্য, শিবজীর বীর্য্যের কথা চিন্তা করিতেন। রাজস্থানের ন্যায় মহারাষ্ট্রীয়দেশ স্বাধীন হইবে, শিবজী দক্ষিণ-দেশে হিন্দুরাজ্য বিস্তার করিবেন, চিন্তা করিতে করিতে বালকের হৃদয়

উৎসাহে পূর্ণ হইল, তিনি শিবজীর নিকট যাইয়া একটী সামান্য সেনার কার্য্য প্রার্থনা করিলেন।

শিবজী লোক চিনিতে অদ্বিতীয়, কয়েক দিনের মধ্যে রঘুনাথকে চিনিলেন, একটী হাবেলদারী পদে নিযুক্ত করিলেন ও তাহার কয়েক দিবস পরেই তোরণদুর্গে পাঠাইলেন। পথে রঘুনাথের সহিত আমাদিগের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

রঘুনাথ হাবেলদারী পদ পাইয়াছিলেন বলা হইয়াছে। রঘুনাথের শিবজীর নিকট আগমনের সময় চন্দ্ররাও জুমলাদারের অধীনে একজন হাবেলদারের মৃত্যু হয়, তাহারই পদ রঘুনাথ প্রাপ্ত হয়েন। রঘুনাথ চন্দ্ররাওকে পিতার পুরাতন ভৃত্য ও আপন বাল্যসুহৃৎ বলিয়া চিনিলেন, পিতৃহন্তা, বা দস্যুরূপী, বা ভগিনীপতি বলিয়া জানিতেন না, সুতরাং তিনি সানন্দে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে যাইলেন। চন্দ্ররাও রঘুনাথকে অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু অল্পভাষী জুমলাদারের ললাট অদ্য পুনরায় কুঞ্চিত হইল।

দিনে দিনে রঘুনাথজীর সাহস ও বিক্রমের যশ অধিক বিস্তার হইতে লাগিল, চন্দ্ররাওয়ের চিন্তা গভীরতর হইল। পতঙ্গ বা কীট আমাদের পথের সম্মুখে আসিলে আমরা পদসঞ্চালন দ্বারা দুর্ভাগ্যকে হত করিয়া পথ পরিষ্কার করি,—চন্দ্ররাওও কোন দিন গোপনে রঘুনাথকে হনন করিয়া আপন পথ পরিষ্কার করিবেন ভাবিলেন। কিন্তু যখন রঘুনাথের যশোরাশি তাঁহার নিজের যশকেও ম্লান করিল, যখন লোকে বালকের সাহস দেখিয়া বিক্রমশালী চন্দ্ররাওয়ের বিক্রমও বিস্মৃত হইতে লাগিল, চন্দ্ররাও তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'এ বালককে ভীষণতর শাস্তি দেওয়া আবশ্যক,—ইহার যশ বিনষ্ট করিব।' চিন্তা করিতে করিতে চন্দ্ররাওয়ের নয়ন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, মৃত্যুর ছায়া যেন সেই কুঞ্চিত ললাটকে আবৃত করিল।

চন্দ্ররাওয়ের স্থির প্রতিজ্ঞা কখনও বিচলিত হইত না, গভীর মন্ত্রণা কখনও ব্যর্থ হইত না। অদ্য রঘুনাথজী দৈবযোগে প্রাণে রক্ষা পাইলেন, কিন্তু বিদ্রোহী কপটাচারী বলিয়া শিবজীর কার্য্য হইতে দূরীকৃত হইলেন।

চন্দ্ররাওও শিবজীর নিকট কয়েক দিনের বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটী যাইলেন। পাঠক! চল আমরাও একবার বড়লোকের বাটী সভয়ে প্রবেশ করি।

জুমলাদার বাটী আসিলেন, বহির্দ্বারে নহবৎ বাজিতে লাগিল, দাস-দাসী সসব্যস্তে প্রভুর সম্মুখে আসিল, গৃহিণীগণ পতিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বেশভূষা করিতে লাগিলেন, প্রতিবাসীগণ সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, অচিরে চন্দ্ররাওয়ের আগমন-বার্ত্তা সমগ্র গ্রামে রাষ্ট্র হইল।

সায়ংকালে চন্দ্ররাও অন্তঃপুরে আসিলেন, লক্ষ্মীবাই ভক্তিভাবে স্বামীর চরণে প্রণত হইলেন, পরে আহারাদির আয়োজন করিয়া স্বামীকে আহ্বান করিলেন। চন্দ্ররাও আহারে বসিলেন, লক্ষ্মীবাই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মীবাই যথার্থ লক্ষ্মীস্বরূপা, শান্ত, ধীর, বুদ্ধিমতী, পতিব্রতা। বাল্য-কালে পিতার আদরের কন্যা ছিলেন, কিন্তু কোমল বয়সে বিদেশে অপরি-চিত লোকের মধ্যে অল্পভাষী কঠোরস্বভাব স্বামীর হস্তে পড়িলেন, বৃক্ষ হইতে উৎপাটিত কোমল পুষ্পের ন্যায় দিন দিন শুষ্ক হইতে লাগিলেন। নয় বৎসরের বালিকার জীবন শোকাচ্ছন্ন হইল, কিন্তু সে শোক কাহাকে জানাইবে? কে দুটা কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিবে? বালিকা পূর্ব্বকথা স্মরণ করিত, পিতার কথা স্মরণ করিত, প্রাণের সহোদরের কথা স্মরণ করিত, আর গোপনে অশ্রু বর্ষণ করিত।

শোকে পড়িলে, কষ্টে পড়িলে, আমাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়, আমাদের হৃদয় ও মন শান্ত, সহিষ্ণু হয়। বালিকা দুই এক বৎসরের মধ্যেই সংসারের কার্য্য করিতে লাগিলেন, স্বামীর সেবায় রত হইলেন। হিন্দু-রমণীর পতি ভিন্ন আর কি গতি আছে? স্বামী যদি সহৃদয় ও সদয় হয়েন নারী আনন্দে ভাসিয়া তাঁহার সেবা করেন, স্বামী নির্দ্দয় ও বিমুখ হইলেও নারীর পতি-সেবা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? চন্দ্ররাওয়ের হৃদয়ে প্রণয় বলিয়া কোন পদার্থ ছিল না, অভিমান, জিঘাংসা, উচ্চাভিলাষ, অপূর্ব্ব বিক্রমে সে হৃদয় পূর্ণ; তথাপি তিনি স্ত্রীর প্রতি নির্দ্দয় ছিলেন না, দাসী লক্ষ্মীবাইয়ের প্রতি সদয় ব্যবহারই করিতেন, লক্ষ্মীও দাসীস্বরূপ স্বামীর যথেষ্ট সেবা করিতেন, স্বামীর স্বভাব জানিয়া সর্ব্বদা ভীত থাকিতেন, একটী মিষ্ট কথা শুনিলে আপনাকে পরম ভাগ্যবতী বিবেচনা করিতেন, স্বামীর একান্ত প্রণয় কি, কখন জানিতেন না, সুতরাং কখন আশা করেন নাই।

এইরূপে সংসারকার্য্যে ও পতিসেবায় এক বৎসরের পর আর এক বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল, ধীর শান্ত লক্ষ্মী যৌবন প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু সে যৌবন কি শান্ত, নিরুদ্বেগ! পূর্ব্বের কথা প্রায় ভুলিয়া গেলেন, অথবা যদি সায়ংকালে কখন রাজস্থানের কথা মনে উদয় হইত, বাল্যকালের সুখ,

বাল্যকালের ক্রীড়া ও প্রাণের ভ্রাতা রঘুনাথের কথা মনে হইত, যদি নিঃশব্দে দুই এক বিন্দু অশ্রু সেই সুন্দর রক্তশূন্য গণ্ডস্থল দিয়া গড়াইয়া যাইত, লক্ষ্মী সে অশ্রুবিন্দু মোচন করিয়া পুনরায় গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন।

ক্রমে চন্দ্ররাও আরও চারি পাঁচটী দারপরিগ্রহ করিলেন, কাহারও উচ্চ বংশের জন্য, কাহার বিপুল অর্থের জন্য, কাহারও বিস্তীর্ণ জায়গীরের জন্য, এই সকল কন্যা গ্রহণ করিলেন। চন্দ্ররাও বালক নহেন, প্রণয় বা সৌন্দর্য্যের জন্য কাহাকেও বিবাহ করেন নাই। তথাপি লক্ষ্মীবাই ঘরের গৃহিণী বটে,—তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য্যের জন্য নহে, তিনি প্রথম স্ত্রী ও প্রসিদ্ধ রাজপুতবংশ-সমুদ্ভূতা এই জন্য। চন্দ্ররাও সকলকেই ভূরি ভূরি গহনা, ভূরি ভূরি অর্থ ও বহুমূল্য বস্ত্রাদি দিতেন, কেহ কোথাও যাইলে অনেক দাস দাসী, অশ্ব, হস্তী, পদাতিক ও বাদ্যকর সঙ্গে দিতেন, সকলেই জানিতে পারিতেন চন্দ্ররাওয়ের পরিবার যাইতেছেন। এ সমস্ত আড়ম্বর তাঁহার আপনার মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য রমণীদিগের মনস্তুষ্টির জন্য তত নহে। বাটীতে সকল রমণীই পতিকে সমান ভয় করিতেন, দাসীর ন্যায় সকলেই প্রভুর সেবা করিতেন।

চন্দ্ররাও আহারে বসিয়াছেন, লক্ষ্মীবাই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যজন করিতেছেন। লক্ষ্মীবাইয়ের বয়ঃক্রম এক্ষণে সপ্তদশ বর্ষ। অবয়ব কোমল, উজ্জ্বল ও লাবণ্যময়, কিন্তু ঈষৎ ক্ষীণ। ভ্রূযুগল কি সুন্দর সুচিক্কণ, যেন সেই পরিষ্কার শান্ত ললাটে তুলী দ্বারা ন্যস্ত। শান্ত, কোমল, কৃষ্ণ নয়ন দুটীতে যেন চিন্তা আপনার আবাসস্থান করিয়াছে। গণ্ডস্থল সুন্দর, সুচিক্কণ, কিন্তু ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, সমস্ত শরীর শান্ত ও ক্ষীণ। যৌবনের অপরূপ সৌন্দর্য্য বিকশিত রহিয়াছে, কিন্তু যৌবনের প্রফুল্লতা, উন্মত্ততা কৈ? আহা! রাজস্থানের এই অপূর্ব্ব পুষ্পটী মহারাষ্ট্রে সেইরূপ সৌন্দর্য্য ও সুঘ্রাণ বিতরণ করিতেছে, কিন্তু জীবনাভাবে শুষ্ক, নতশির। পদ্মাসনা লক্ষ্মীর ন্যায় লক্ষ্মীবাইয়ের চারু নয়ন, সুদীর্ঘ কৃষ্ণ কেশভার, কোমল সুগোল দেহ দেখিতেছি, কিন্তু যৌবনের প্রফুল্ল সূর্য্যকিরণ নাই, জীবনাকাশ চিন্তামেঘাচ্ছন্ন।

চন্দ্ররাও গজপতিকে হনন করিয়াছেন, লক্ষ্মী ততদূর জানিতেন না, কিন্তু স্বার্থসাধনের জন্য পিতার বংশের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন তাহা চন্দ্র-রাওয়ের আচরণে ও কখন কখন দুই একটী কথা হইতে বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ভয়ে সে বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেন না।

একদিন চন্দ্ররাও লক্ষ্মীকে জানাইলেন যে তাঁহার ভ্রাতা চন্দ্ররাওয়ের অধীনে হাবেলদার হইয়াছে ও যশোলাভ করিয়াছে। কথাটী সাঙ্গ হইলে চন্দ্র ঈষৎ হাসিলেন; লক্ষ্মী স্বামীকে জানিতেন, সে হাসি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ শুকাইয়া গেল।

রঘুনাথ কেমন আছেন, কি করিতেছেন, ইত্যাদি নানা ভাবনা সর্ব্বদাই লক্ষ্মীব মনে জাগরিত হইত, কিন্তু স্বামীকে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন না, স্বামী বাটী আসিলে তাঁহার অধীনস্থ পদাতিক বা ভৃত্যাদিগকে অর্থে বশ করিয়া গোপনে সংবাদ জানিতেন। তাঁহার মনে সর্ব্বদাই ভয় হইত পাছে স্বামী ভ্রাতার অনিষ্টসাধন করেন। কি জন্য এরূপ ভয় হইত তিনি জানিতেন না।

একদিন স্বামীর দুই একটী মিষ্টবাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া লক্ষ্মী স্বামীর পদযুগলের নিকট বসিয়া বলিলেন—"দাসীর একটী নিবেদন আছে, কিন্তু বলিতে ভয় করে।"

চন্দ্ররাও শয়ন করিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছিলেন, সস্নেহে বলিলেন—"কি বল না।"

লক্ষ্মী বলিলেন, "আমার ভ্রাতা বালক, অজ্ঞান।"

চন্দ্ররাওয়ের মুখ গম্ভীর হইল।

লক্ষ্মী ভীত হইলেন, কিন্তু তথাপি ভাবিলেন কপালে যাহা থাকে আজ বলিব। প্রকাশ্যে বলিলেন—

"সে আপনার ভৃত্য, আপনারই অধীন।" চন্দ্ররাও ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—

"না, সে আমা অপেক্ষাও সাহসী বলিয়া পরিচিত।"

বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝিতে পারিলেন তিনি যাহা ভয় করিতেছিলেন তাহাই ঘটিয়াছে,—চন্দ্ররাও রঘুনাথের উপর যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ! ভয়ে কম্পিত হইয়া বলিলেন—

"বালক যদি দোষ করে, আপনি না মার্জ্জনা করিলে কে করিবে?"

চন্দ্ররাও পরুষস্বরে বলিলেন, "নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকের নিকট চন্দ্ররাও পরামর্শ লন না, বিরক্ত করিও না?"

লক্ষ্মী বুঝিলেন চন্দ্ররাওয়ের শরীরে ক্রোধের উদ্রেক হইতেছে; অন্য বিষয় হইলে আর একটী কথা কহিতেও সাহস করিতেন না, কিন্তু ভ্রাতার জন্য স্নেহময়ী ভগ্নী কি না করিতে পারে? চন্দ্ররাওয়ের পদে লুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিয়া বলিলেন, "দাসীর নিকট প্রতিজ্ঞা করুন রঘুনাথের আপনি কোন অনিষ্ট করিবেন না।"

চন্দ্ররাওয়ের নয়ন আরক্ত হইল, তিনি লক্ষ্মীকে সজোরে পদাঘাত করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তাহার পর চন্দ্ররাও অদ্যই প্রথম বাটী আসিয়াছেন, রঘুনাথের যাহা ঘটিয়াছে লক্ষ্মী তাহা জানেন না, কিন্তু তাঁহার হৃদয় চিন্তাকুল, মুখ ফুটিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না, রজনীতে স্বামী নিদ্রিত হইলে ভৃত্যদিগের নিকট ভ্রাতার সংবাদ লইবেন, মনে স্থির করিয়াছিলেন।

চন্দ্ররাওয়ের আহার সমাপন হইল, তিনি শয়নাগারে যাইলেন, লক্ষ্মী তাম্বুলহস্তে তথায় যাইলেন। চন্দ্ররাও তাম্বুল লইয়া বলিলেন—

"এখন যাও, আমার বিশেষ কার্য্য আছে, যখন ডাকিব, আসিও।" লক্ষ্মীর সহিত এই তাঁহার প্রথম সম্ভাষণ। লক্ষ্মী ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহিরে যাইলেন, চন্দ্ররাও সতর্কভাবে দ্বাররুদ্ধ করিলেন।

ধীরে ধীরে একটী গুপ্তস্থান হইতে একটী বাক্স বাহির করিলেন, সেটী খুলিলেন, একখানি পুস্তক বাহির করিলেন। দেখিতে হিসাবের পুস্তক। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে গজপতিকর্ত্তৃক যে দিন সভায় অবমানিত হইয়াছিলেন, সে দিন সেই পুস্তকে একটী ঋণের কথা লিখিয়াছিলেন, সেই পাত খুলিলেন, সুন্দর স্পষ্ট হস্তাক্ষর সেইরূপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে;—

"মহাজন..............................গজপতি;
ঋণ.. .. ..অবমাননা;
পরিশোধ হইবে...............তাঁহার হৃদয়ের শোণিতে,
তাঁহার সম্পত্তি নাশে,
তাঁহার বংশের অবমাননায়।"

একবার, দুইবার, এই অক্ষরগুলি পড়িলেন; ঈষৎ হাস্য সেই বিকট মুখমণ্ডলে দেখা দিল, সেইস্থানে লিখিলেন—

"অদ্য পরিশোধ হইল।"

তারিখ দিয়া পুস্তক বন্ধ করিলেন।

দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া লক্ষ্মীকে ডাকিলেন, লক্ষ্মী ভক্তিভাবে স্বামীর নিকটে আসিলেন; চন্দ্ররাও লক্ষ্মীর হস্ত ধারণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "অনেক দিনের একটী ঋণ অদ্য পরিশোধ করিয়াছি।"

লক্ষ্মী শিহরিয়া উঠিলেন!

চন্দ্ররাওয়ের সুন্দর অনিন্দনীয় হিসাবে অদ্য একটী ভুল হইল। এ ঋণপরিশোধকার্য্য অদ্য সমাপ্ত হয় নাই,—আর এক দিন হইবে।

—

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ঈশানী-মন্দির।

"—————————————হেরিলা অদূরে
সরোবর, কূলে তার চণ্ডীর দেউল।"

মধুসূদন দত্ত।

পরাক্রান্ত জায়গীরদার ও জুমলাদার চন্দ্ররাওয়ের বাটী হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে ঈশানীর একটী মন্দির ছিল। অনতিউচ্চ একটী পর্ব্বত-শৃঙ্গে সেই মন্দির অতিপ্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মন্দির সম্মুখে প্রস্তর রাশি সোপানরূপে খোদিত ছিল, নীচে একটী পর্ব্বততরঙ্গিণী কুল্‌কুল্‌ শব্দ করিয়া সেই সোপানের পদ প্রক্ষালন করিয়া বহিয়া যাইত। পুরাকাল অবধি অসংখ্য যাত্রী ও উপাসক এই পুণ্য-নদীতে স্নান করিয়া সোপান আরোহণ করিয়া ঈশানীর পূজা দিত, অদ্য পর্য্যন্ত মন্দিরের গৌরব বা যাত্রীসংখ্যা হ্রাস হয় নাই। মন্দিরের পশ্চাতে, পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশ বহু পুরাতন বৃক্ষ দ্বারা আবৃত, চূড়া হইতে নীচে সমতল ভূমি পর্য্যন্ত সেই বৃক্ষশ্রেণী ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না। দিবাযোগেও সেই বিশাল বৃক্ষশ্রেণী ঈষৎ অন্ধকার করিত, সেই সুস্নিগ্ধ ছায়াতে ঈশানী-মন্দিরের পূজক ও ব্রাহ্মণেরা নিজ নিজ কুটীরে বাস করিত। সেই পুণ্য সুস্নিগ্ধ স্থান দেখিলেই বোধ হয় যেন তথায় শান্তিরস ভিন্ন অন্য কোন ভাবের উদ্রেক হয় নাই, ভারতবর্ষের পবিত্র পুরাণকথা বা বেদমন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শব্দ সেই পুরাতন পাদপবৃন্দ শ্রবণ করে নাই। বহু যুদ্ধ, অসংখ্য হত্যা-কাণ্ডে মহারাষ্ট্রদেশ ব্যতিব্যস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইতেছিল, কিন্তু হিন্দু কি মুসল-মান কেহই এই ক্ষুদ্র শান্ত পর্ব্বতমন্দির আহবের ভীষণ স্বরে কলুষিত করেন নাই।

রজনী এক প্রহরের সময় একজন পথিক একাকী সেই শান্ত কাননের মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। পথিকের হৃদয় কি উদ্বেগ-পরিপূর্ণ! প্রশস্ত ললাট কুঞ্চিত, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, নয়ন হইতে উন্মত্ততার অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছিল। পথিক ক্ষণেক দ্রুতবেগে এদিক্ ওদিক্ পদ-চারণ করিতেছিলেন, ক্ষণেক বা স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রোষে ওষ্ঠের উপর দন্তস্থাপন করিতেছিলেন,

ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহির্গত হইতেছিল। রোষে, জিঘাংসায়, বিষাদে, অদ্য রঘুনাথের হৃদয় একেবারে দগ্ধ করিতেছিল।

অনেক ক্ষণ পদচারণ করিতে লাগিলেন, শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়াছে, তথাপি হৃদয়ের উদ্বেগ নিবারণ হয় না; শ্রান্তি বশতঃ কখন পাদপে ভর দিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করেন, পুনরায় নূতন চিন্তায় উত্তেজিত হইয়া শ্রান্তি বিস্মৃত হয়েন, পুনরায় শীঘ্র বেগে পদচারণ করেন। রঘুনাথ উন্মত্তপ্রায়! এ ভীষণ চিন্তার আশু উপশম না হইলে রঘুনাথের বিবেচনা-শক্তি বিচলিত বা লুপ্ত হইবে। প্রকৃতি ভীষণ চিকিৎসক! এই বিষম সংসারে শেলসম যে দুঃখ হৃদয় বিদীর্ণ করে, অগ্নিসম যে চিন্তা শরীর শোষণ ও দাহ করে, যে মানসিক রোগের ঔষধ নাই, চিকিৎসা নাই, প্রকৃতি চিন্তাশক্তি লোপ করিয়া তাহার উপশম করে। উন্মত্ততাই কত শত হত-ভাগার আরোগ্য! কত সহস্র হতভাগা এই আরোগ্য দিবানিশি প্রার্থনা করে, কিন্তু প্রাপ্ত হয় না!

শরীর অবসন্ন হইল, রঘুনাথ অগত্যা একটী পাদপতলে উপবেশন করিলেন, নিশ্চেষ্টভাবে বৃক্ষে ভর দিয়া উপবেশন করিলেন।

সেই পাদপের অনতিদূরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ পুরাণ পাঠ করিতেছিলেন। আহা! সেই সঙ্গীতপূর্ণ পুণ্যকথা যেন শান্তনিশীথে, শান্ত কাননে অমৃত বর্ষণ করিতেছিল, নক্ষত্র বিভূষিত নৈশ গগন-মণ্ডলে ধীরে ধীরে উত্থিত হইতেছিল। এখনও কাশী বা মথুরার পুরাতন মন্দিরে সূর্য্যোদয়ে বা সুস্নিগ্ধ সায়ংকালে সহস্র ব্রাহ্মণে সেই অনন্ত পুরাণ কথা বা বেদমন্ত্র পাঠ করেন, যখন সেই পুণ্যধামে বহুদেশের বহুযাত্রীর সমাগম দেখি, সনাতন মন্দিরে সনাতন-ধর্ম্মের গৌরব দেখি, সায়ংকালের আরতিশব্দ বা শত মন্দিরের ঘণ্টা ও শঙ্খরব গগনে যুগপৎ উত্থিত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের ব্রাহ্মণেরা চারিদিকে উপবেশন করিয়া গম্ভীর স্বরে বেদপাঠ বা পুরাণ অধ্যয়ন করিতে থাকেন, তখন আমি দেশকাল বিস্মৃত হই, আধুনিক সময় ও আধুনিক জীবনের ভীষণ গণ্ডগোল বিস্মৃত হই, হৃদয়ে নানা স্বপ্নের উদয় হয়, বোধ হয়, যেন সেই প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে বাস করিতেছি, চারিদিকে সেই পুরাকালের লোক, পুরাকালের সমাজ ও সভ্যতা, পুরা-কালের শান্তি ও সুস্নিগ্ধতা!

সেই সমস্ত মহৎ কথা, পুণ্য কথা; শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণমুখোচ্চারিত হইয়া সেই শান্ত নৈশ কাননে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, অচেতন পাদপকেও যেন সচেতন করিতে লাগিল, শাখাপত্র যেন সেই গীত কুতূহলে

গান করিতে লাগিল, বায়ু সেই গীত বিস্তার করিতে লাগিল, মানবহৃদয় কখন বা প্রফুল্লিত, কখন বা উৎসাহিত, কখন বা গলিত হইতে লাগিল।

কত সহস্র বৎসর হইতে এই পুণ্যকথা ভারতবর্ষে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সুন্দর বঙ্গদেশে, তুষারপূর্ণ কৈলাসবেষ্টিত দূর কাশ্মীরে, বীরপ্রসূ রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রভূমিতে, সাগরপ্রক্ষালিত কর্ণাট ও দ্রাবিড়ে, সহস্র বৎসর অবধি এই গীত ধ্বনিত হইতেছে। যেন চিরকালই এই গীত ধ্বনিত হয়, আমরা যেন এ শিক্ষা কখন বিস্মৃত না হই। গৌরবের দিনে এই অনন্ত গীতে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল, ও অযোধ্যা, মিথিলা, হস্তিনা, মগধ, উজ্জয়িনী, দিল্লী প্রভৃতি দেশ বীরত্বে ও যশে প্লাবিত করিয়াছিল। দুর্দ্দিনে এই গীত গাইয়া সমরসিংহ, সংগ্রামসিংহ, প্রতাপসিংহ, হৃদয়ের শোণিত দিয়াছিলেন, এই মহামন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া শিবজী পুনরায় পুরাকালের গৌরব সাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন। অদ্য ক্ষীণ দুর্ব্বল হিন্দুদিগের আশ্বাসের স্থল, ক্রন্দনের স্থল, এই পূর্ব্ব গীতমাত্র, যেন বিপদে, বিষাদে, দুর্ব্বলতায় আমরা পূর্ব্বকথা না বিস্মৃত হই, যতদিন জীবন থাকে যেন হৃদয়-যন্ত্র এই গীতের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হইতে থাকে!

নব্য পাঠক! তুমি ইলিযদ পাঠ করিয়াছ, দান্তে, শেক্সপীয়র, মিল্টন্ পাঠ করিয়াছ, সাদী ও ফরদুসী পাঠ করিয়াছ, কিন্তু হৃদয় অন্বেষণ কর, হৃদয়ের অন্তরে কোন্ কথাগুলি সরসভাবপূর্ণ বোধ হয়? হৃদয় কোন্ কথায় অধিকতম আলোড়িত, প্রোৎসাহিত বা মুগ্ধ হয়? ভীষ্মাচার্য্যের অপূর্ব্ব বীরত্ব-কথা! দুঃখিনী সীতার অপূর্ব্ব পতিব্রতা-কথা! এই কথা হিন্দুমাত্রেরই হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত রহিয়াছে,—এ কথা যেন হিন্দুজাতি কখন বিস্মৃত না হয়!

পাঠক! একত্র বসিয়া এক একবার প্রাচীন গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক সময়ের রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় বীরত্বের কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশে এই অকিঞ্চিৎকর উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছি। যদি সেই সমস্ত কথা স্মরণ করাইতে সক্ষম হইয়া থাকি তবেই যত্ন সফল হইয়াছে,—নচেৎ পুস্তক দূরে নিক্ষেপ কর, লেখক তাহাতে ক্ষুণ্ন হইবে না।

শান্তকাননে পবিত্র পুরাণকথা ও সঙ্গীত রঘুনাথের তপ্ত ললাটে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল, উদ্বিগ্ন হৃদয়ে শান্তি সেচন করিতে লাগিল। হতভাগার উন্মত্ততা ক্রমে হ্রাস পাইল, সেই মহৎ কথার নিকট আপনার শোক ও দুঃখ কি অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল! আপনার মহৎ উদ্দেশ্য ও বীরত্ব কি

ক্ষুদ্র বোধ হইল! ক্রমে চিন্তাহারিণী নিদ্রা রঘুনাথকে অঙ্কে গ্রহণ করিলেন। রঘুনাথের শ্রান্ত অবসন্ন শরীর সেই বৃক্ষমূলে শয়িত হইল।

রঘুনাথ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। আজি কিসের স্বপ্ন? আজি কি গৌরবের স্বপ্ন দেখিতেছেন, দিন দিন পদোন্নতি, দিন দিন বিক্রম ও যশোবিস্তারের স্বপ্ন দেখিতেছেন? হায়! রঘুনাথের জীবনের সে স্বপ্ন ভগ্ন হইয়াছে, সে চিন্তা শেষ হইয়াছে, মরীচিকা-পূর্ণ সংসারের সে একটী মরীচিকা বিলুপ্ত হইয়াছে।

রঘুনাথ কি যুদ্ধক্ষেত্রের স্বপ্ন দেখিতেছেন? শত্রুকে বিনাশ করিতেছেন, দুর্গ জয় করিতেছেন, যোদ্ধার কার্য্য করিতেছেন, সেই স্বপ্ন দেখিতেছেন? রঘুনাথের সে উদ্যম শেষ হইয়াছে, সে স্বপ্নও বিলুপ্ত হইয়াছে।

একে একে যৌবনের উদ্যমগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে, আশাদীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে, এই অন্ধকার রজনীতে শ্রান্ত বন্ধুহীন যুবকের হৃদয়ে বহু দিনের কথা পূর্ব্ব জীবনের স্মৃতির ন্যায় জাগরিত হইতেছে! শোকভারে হৃদয় আক্রান্ত হইলে, আশা, সুখ, গৌরব আমাদের নিকট বিদায় লইলে, বন্ধুহীন জনের যে কথা স্মরণ হয়, রঘুনাথ সে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। স্নেহময়ী মাতার স্নেহসিক্ত মুখখানি মনে জাগরিত হইল, পিতার দীর্ঘ অবয়ব ও প্রশস্ত ললাট মনে হইল, বাল্যকালে সেই দূর মাড়ওয়ারে ক্রীড়া করিতেন, হাস্য-ধ্বনিতে চারি দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেন, সেই কথা স্মরণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বাল্যকালের সহচরী, শান্ত, ধীর প্রাণের ভগিনী লক্ষ্মীকে মনে পড়িল; আহা! সে স্নেহময়ী ভগিনীকে কি আর জীবনে দেখিতে পাইবেন? আজি সে সোণার সংসার কোথায়, সে প্রফুল্ল আশালহরী কোথায়, এই শোকের দিনে সন্তাপের দিনে যাহার সান্ত্বনা বাক্যে প্রাণ জুড়াইবে এরূপ হৃদয়ের সহোদরা কোথায়? নিদ্রিতের মুদিত নয়ন হইতে এক বিন্দু অশ্রু ভূমিতে গড়াইয়া পড়িল।

নিদ্রিত রঘুনাথ সেই স্নেহময়ীর মুখখানি চিন্তা করিতে করিতে নয়ন উন্মীলিত করিলেন। কি দেখিলেন? বোধ হইল যেন লক্ষ্মী স্বয়ং ভ্রাতার শিরোদেশ আপন অঙ্কে স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, কোমল শীতল হস্ত ভ্রাতার উষ্ণ ললাটে স্থাপন করিয়া হৃদয়ের উদ্বেগ দূর করিতেছেন, সহোদরার স্নেহ-পূর্ণ নয়নে যেন সহোদরের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। আহা! বোধ হইল যেন শোকে বা চিন্তায়, লক্ষ্মীর প্রফুল্ল মুখখানি শুষ্ক হইয়াছে, নয়ন দুইটী সেইরূপ স্থির, প্রশস্ত, স্নিগ্ধ, কিন্তু শোকের আবাসস্থান!

রঘুনাথ নয়ন মুদিত করিলেন, আর এক বিন্দু অশ্রু বর্ষণ করিলেন, বলিলেন, "ভগবন্ অনেক সহ্য করিয়াছি, কেন বৃথা আশায় হৃদয় ব্যথিত করিতেছ?"

যেন কোমল হস্তে রঘুনাথের অশ্রুবিন্দু বিমুক্ত হইল। রঘুনাথ পুনরায় নয়ন উন্মীলিত করিলেন, এ স্বপ্ন নহে,—তাঁহার প্রাণের সহোদরাই তাঁহার মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া সেই বৃক্ষমূলে বসিয়া রহিয়াছেন!

উঃ! রঘুনাথের হৃদয় আলোড়িত হইল; তিনি লক্ষ্মীর হাত দুইটী আপন তপ্ত হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সেই স্নেহপূর্ণ মুখের দিকে চাহিলেন;—তাঁহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না, নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল, অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া চীৎকার শব্দ করিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! তোমাকে কি এজীবনে আবার দেখিতে পাইলাম? অন্য সুখ দূর হউক, অন্য আশা দূর হউক, লক্ষ্মী! তোমার হতভাগ্য ভ্রাতাকে নিকটে স্থান দিও, সে এ জীবনে আর কিছু চাহে না।" লক্ষ্মীও শোক সম্বরণ করিতে পারিলেন না, ভ্রাতার হৃদয়ে আপন মুখ লুকাইয়া একবার প্রাণভরে কাঁদিলেন। আহা! এ ক্রন্দনে যে সুখ, জগতে কি রত্ন আছে, স্বর্গে কি সুখ আছে যাহা অভাগাগণ সে সুখের নিকট তুচ্ছজ্ঞান না করে?

পরস্পরকে বহুদিন পর পাইয়া পরস্পরে অনেকক্ষণ বাক্‌শূন্য হইয়া রহিলেন। বহুদিনের কথা, বাল্যকালের কথা রহিয়া রহিয়া হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল, সুখের লহরীর সহিত শোকের লহরী মিশ্রিত হইয়া হৃদয় উছলিতে লাগিল; থাকিয়া থাকিয়া দরবিগলিত ধারায় উভয়ের হৃদয় ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

ভগিনীর ন্যায় এজগতে আর স্নেহময়ী কে আছে, ভ্রাতৃস্নেহের ন্যায় আর পবিত্র স্নেহ কি আছে? আমরা সে ভালবাসা বর্ণন করিতে অশক্ত, সহৃদয় পাঠক! রঘুনাথ ও লক্ষ্মীর মনের ভাব অনুভব করুন।

অনেকক্ষণ পরে দুইজনের হৃদয় শীতল হইল; তখন লক্ষ্মী আপন অঞ্চল দিয়া ভ্রাতার নয়নের জল মোচন করিয়া বলিলেন, "ঈশানীর ইচ্ছায় কত অনুসন্ধান পর আজ তোমাকে দেখিতে পাইলাম, আহা, আজ আমার কি পরম সুখ; দুঃখিনীর কপালে কি এত সুখ ছিল!" ক্ষণেক পর আপন অশ্রুবিন্দু বিমোচন করিয়া বলিলেন, "ভাই, এই শীতল বাতাসে আর থাকিলে তোমার অসুখ হইবে, চল মন্দিরের ভিতর যাই;

আমি আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিব না।” উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

ভ্রাতা ভগিনী মন্দির-অভ্যন্তরে আসিলেন, লক্ষ্মী একটী স্তম্ভের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, শ্রান্ত রঘুনাথ পূর্ব্ববৎ লক্ষ্মীর অঙ্কে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিলেন, মৃদুস্বরে উভয়ে গভীর অন্ধকার রজনীতে পূর্ব্ব-কথা কহিতে লাগিলেন।

ধীরে ধীরে ভ্রাতার ললাটে ও দেহে হস্ত বুলাইয়া লক্ষ্মী কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, রঘুনাথ তাহার উত্তর করিতে লাগিলেন। দস্যুহস্ত হইতে পলায়ন করিয়া অনাথ বালক কোন্ কোন্ দেশে বিচরণ করিয়াছিলেন, কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, তাহাই বলিতে লাগিলেন। কখন মহারাষ্ট্রীয় কৃষকদিগের সহিত চাষ করিতেন, কখন গো বৎস বা মেষপাল রক্ষা করিতেন, মেষের সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতে, উপত্যকায়, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ভ্রমণ করিতেন বা নির্জ্জনে বসিয়া চরণদিগের গীত গাইতেন। কখন সায়ংকালে নদীকূলে একাকী বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে সেই গীত গাইয়া হৃদয়কে শান্ত করিয়াছেন, কখন প্রত্যূষে অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বকথা স্মরণে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছেন। পর্ব্বতসঙ্কুল কঙ্কণ-প্রদেশে কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিয়াছেন, এক জন মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকের অধীনে কার্য্য করিতেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত যুদ্ধ ব্যবসায়ে উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, অবশেষে মহানুভব শিবজীর নিকট উপস্থিত হইয়া সৈনিকের পদ গ্রহণ করেন। আজি তিন বৎসর হইল সেই কার্য্য করিয়াছেন, জগদীশ্বর জানেন তিনি কার্য্যে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু সেই চন্দ্ররাওয়ের ষড়যন্ত্রে অদ্য অপমানিত হইয়া দেশে দেশে নিরাশ্রয়রূপে ভ্রমণ করিতেছেন। এক্ষণে জীবনে তাঁহার উদ্দেশ্য মাত্র নাই, পিতার ন্যায় যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া এ অসার জগৎ পরিত্যাগ করিবেন।

ভ্রাতার দুঃখকাহিনী শুনিতে শুনিতে স্নেহময়ী ভগিনী নিঃশব্দে অবারিত অশ্রু বর্ষণ করিতেছিলেন; তিনি নিজের শোক সহ্য করিতে পারেন, ভ্রাতার দুঃখে একেবারে ব্যাকুল হইলেন। যখন সে কথা শেষ হইল, কথঞ্চিৎ শোক সম্বরণ করিয়া আপনার কি পরিচয় দিবেন তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। চন্দ্ররাওয়ের উপর ভ্রাতার যে বিজাতীয় ক্রোধ তাহা তিনি বুঝিলেন, চন্দ্ররাওয়ের স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিলে ভ্রাতার হৃদয়ে কি কষ্ট হইবে, তাহাও বুঝিলেন। ধীরে ধীরে অশ্রুজল মোচন করিয়া বলিলেন;—

"মহারাষ্ট্রদেশে আসিবার অনতিপরেই একজন সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্র জায়গীরদার তাঁহাকে বিবাহ করেন। নারী স্বামীর নাম করে না কিন্তু গগনের শশধরের নামই তাঁহার স্বামীর নাম, গগনের শশধরের ন্যায় তাঁহার ক্ষমতা ও গৌরবজ্যোতির চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার বিপুল সংসারে লক্ষ্মী সুখে আছেন, প্রভুও দাসীর উপর অনুগ্রহ করেন, সে অনুগ্রহে দাসী সুখে আছেন। এ জীবনে তাঁহার আর কোন বাসনা নাই, কেবল প্রাণের ভ্রাতাকে সুখে থাকিতে দেখিলেই তাঁহার জীবন সার্থক হয়।

রঘুনাথের সংবাদ তিনি মধ্যে মধ্যে পাইতেন, তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন। অদ্য সেই কামনায় মন্দিরে পূজা দিতে আসিয়াছিলেন, সহসা মন্দিরপার্শ্বে বৃক্ষমূলে প্রাণের ভ্রাতাকে পুনরায় পাইলেন।

এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়া লক্ষ্মী ভ্রাতার হৃদয়ে শেলসম দুঃখ উৎপাটন করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী দুঃখিনী, দুঃখের ব্যথা জানিতেন। লক্ষ্মী নারী, দুঃখ সান্ত্বনা করিতে জানিতেন। সহিষ্ণু হইয়া নিজ দুঃখ সহ্য করা ও সান্ত্বনা দিয়া পরের দুঃখ দূর করাই নারীর ধর্ম্ম।

অনেক প্রকার প্রবোধবাক্য দিয়া ভ্রাতার মন শান্ত করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "আমাদিগের জীবনই এইরূপ, সকল দিন সমান থাকে না। ভগবান্ যে সুখ দেন তাহা আমরা ভোগ করি, যদি একদিন দুঃখ পাই তাহা কি সহ্য করিতে বিমুখ হইব? মানবজন্মই দুঃখময়, যদি আমরা দুঃখ সহ্য না করিব তবে কে করিবে? সুদিন দুর্দ্দিন সকলেরই আছে,—দুর্দ্দিনে যেন আমরা সেই বিধাতার নাম লইয়া নিজ শোক বিস্মৃত হই। তিনিই একদিন পিত্রালয়ে আমাদের সুখ দিয়াছিলেন, তিনিই অদ্য কষ্ট দিয়াছেন, তিনিই পুনরায় সে কষ্ট মোচন করিবেন।"

লক্ষ্মী পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—

"ভাই! এ নৈরাশ দূর কর; এরূপ অবস্থায় থাকিলে শরীর কতদিন থাকিবে? আহারনিদ্রা ত্যাগ করিলে মনুষ্য-জীবন কত দিন থাকে?"

রঘুনাথ। "থাকিবার আবশ্যক কি? যেদিন বিদ্রোহী বলিয়া সৈনিকের নামে কলঙ্ক পড়িল, সেই দিন সৈনিকের জীবন গেল না কি জন্য?"

লক্ষ্মী। "তোমার ভগ্নী লক্ষ্মীকে চিরদুঃখিনী করিবে এই কি ইচ্ছা? দেখ ভাই, আমার আর এজগতে কে আছে? পিতা নাই, মাতা নাই, জগৎসংসারে কেহ নাই। তুমিও কি দুঃখিনী লক্ষ্মীর প্রতি সমস্ত মমতা

ভুলিলে? বিধাতা কি এ হতভাগিনীর উপর একেবারে বিমুখ হইলেন?" লক্ষ্মীর নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল।

রঘুনাথ ক্ষুব্ধ হইয়া সস্নেহে লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মী! তুমি আমাকে ভালবাস তাহা জানি, তোমাকে যেদিন কষ্ট দিব সে দিন যেন ঈশ্বর আমার প্রতি বিমুখ হন। কিন্তু ভগিনী! এ জীবনে আর আমার সুখ নাই,—তুমি স্ত্রীলোক সৈনিকের শোক বুঝিবে কিরূপে, জীবন অপেক্ষা আমাদিগের সুনাম প্রিয়, মৃত্যু অপেক্ষা কলঙ্ক ও অপযশ সহস্রগুণে কষ্টকর! সেই কলঙ্কে রঘুনাথের নাম কলুষিত হইয়াছে!"

লক্ষ্মী। "তবে সেই কলঙ্ক দূর করিবার চেষ্টায় কেন বিমুখ হও? মহানুভব শিবজীর নিকট যাও, তাহার ক্রোধ দূর হইলে তিনি অবশ্যই তোমার কথা শুনিবেন, তোমার দোষ নাই, বুঝিবেন।"

রঘুনাথ উত্তর করিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, চক্ষু হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল। বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝিলেন পিতার অভিমান, পিতার দর্প, পুত্রে বর্তমান। তিনি প্রাণ থাকিতে অন্যায়াচারীর নিকট আবেদন করিবেন না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী ভ্রাতার অন্তরের ভাব বুঝিয়া সেইরূপ প্রস্তাব করিলেন। বলিলেন, "মার্জ্জনা কর, আমি স্ত্রীলোক, সমস্ত বুঝি না। কিন্তু যদি শিবজীর নিকট যাইতে অস্বীকার কর কার্য্যদ্বারা কেন আপন যশ রক্ষা কর না? পিতা বলিতেন, 'সেনার সাহস ও প্রভুভক্তি সমস্ত কার্য্যে প্রকাশ হয়' যদি বিদ্রোহী বলিয়া তোমাকে কেহ সন্দেহ করিয়া থাকে, অসিহস্তে কেন সে সন্দেহ খণ্ডন কর না।"

উৎসাহে রঘুনাথের নয়ন ধক্ ধক্ করিতে লাগিল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,, "কিরূপে?"

লক্ষ্মী। "শুনিয়াছি শিবজী দিল্লী যাইতেছেন, তথায় সহস্র ঘটনা ঘটিতে পারে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৈনিকের আত্মপরিচয় দিবার সহস্র উপায় থাকিতে পারে। আমি স্ত্রীলোক, আমি কি জানিব বল? কিন্তু তোমার পিতার ন্যায় সাহস, তাঁহারই ন্যায় বীরত্ব, প্রতিজ্ঞা করিলে তোমার কোন্ উদ্দেশ্য না সফল হইতে পারে?"

রঘুনাথের যদি অন্য চিন্তার সময় থাকিত তবে বুঝিতেন কনিষ্ঠা লক্ষ্মী মানব-হৃদয়শাস্ত্রে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহেন; যে ঔষধি আজি রঘুনাথের হৃদয়ে ঢালিয়াছিলেন, তাহাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে শোকসন্তাপ দূর হইল, সৈনিকের হৃদয় পূর্ব্ববৎ উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিল।

রঘুনাথ অনেকক্ষণ নিষ্পন্দে চিন্তা করিলেন, তাঁহার নয়ন, উল্লাসোৎফুল্ল মুখমণ্ডল সহসা নব গৌরব ধারণ করিল। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন—

"লক্ষ্মী! তুমি বালিকা, কিন্তু তোমার কথা শুনিতে শুনিতে আমার মনে নূতন ভাবের উদয় হইল। আমার জীবন আর নিরুদ্দেশ্য নহে, আমার হৃদয় উৎসাহশূন্য নহে। ভগবান সহায় হউন, রঘুনাথজী বিদ্রোহী নহে, ভীরু নহে, এ কথা এখনও প্রচার হইবে। কিন্তু তুমি বালিকা, তোমার নিকট এ সমস্ত কহি কেন, তুমি আমার হৃদয়ের ভাব কি বুঝিবে?"

লক্ষ্মী ঈষৎ হাসিলেন, ভাবিলেন, 'রোগ নির্ণয় করিলাম আমি ঔষধি দিলাম আমি, তথাপি কিছু বুঝি না?' প্রকাশ্যে বলিলেন, "ভাই! তোমার উৎসাহ দেখিয়া আমার প্রাণ জুড়াইল। তোমার মহৎ উদ্দেশ্য আমি কিরূপে বুঝিব? কিন্তু যাহাই হউক তোমার কনিষ্ঠ ভগিনী যত দিন বাঁচিবে, তুমি পূর্ণমনোরথ হও জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে।"

রঘুনাথ। "আর লক্ষ্মী! আমি যত দিন বাঁচিব, তোমার স্নেহ, তোমার ভালবাসা কখন বিস্মৃত হইব না।"

অনেকক্ষণ পরে লক্ষ্মী অধোবদনে ধীরে ধীরে কহিলেন,—

"আমার আর একটী কথা আছে, কিন্তু কহিতে ভয় হইতেছে।"

রঘু। "লক্ষ্মী! আমার নিকট তোমার কি কথা বলিতে ভয় হয়? আমি তোমার সহোদর, সহোদরের নিকট কি ভয়?"

লক্ষ্মী। "চন্দ্ররাও নামে একজন জুমলাদার বোধ হয় তোমার অপকার করিয়াছেন।"

রঘুনাথের হাস্য দূর হইল, রোষে জিঘাংসায় ওষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপন করিলেন। বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না।

কম্পিতস্বরে দুঃখিনী লক্ষ্মী বলিলেন, "জিঘাংসা মহল্লোকের অনুচিত। ভাই, অঙ্গীকার কর তাঁহার অনিষ্ট করিবে না।"

রঘুনাথ কর্কশভাবে বলিলেন—

"তিনি যদি আমার সহোদর ভ্রাতা হইতেন তথাপি কপটাচারীকে মার্জ্জনা করিতাম না,—এই অসি দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিব। সে পামরের নাম করিয়া কেন তোমার পবিত্র মুখ কলুষিত করিতেছ?"

লক্ষ্মী স্বভাবতঃ স্থির, শান্ত, বুদ্ধিমতী, কিন্তু স্বামীনিন্দা সহ্য করিতে পারিলেন না। সজলনয়নে সরোষে বলিলেন—

"ভ্রাতার নিকট পূর্ব্বে কখনও আমি কোন ভিক্ষা করি নাই; একটী কথা বলিলাম তাহা রাখিলে না; আমি পাপীয়সী, আমরা সকলে পামর; বিদায় দাও, আর জন্মের মত ভগিনীকে দেখিতে পাইবে না।"

সস্নেহে, সজলনয়নে রঘুনাথ বলিলেন—

"লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! তোমাকে কবে আমি মন্দ কথা বলিয়াছি? চন্দ্ররাওকে আমি মার্জ্জনা করিতে পারি না, কেন সে ভিক্ষা করিতেছ?"

লক্ষ্মী ঝর্ ঝর্ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন,—"অনাথা ভগিনীর প্রতি কত ভালবাসা আছে তাহাই জানিবার জন্য। ভাই! তাহা জানিলাম। এক্ষণে বিদায় দাও, দুঃখিনীর অন্য ভিক্ষা নাই।"

রঘুনাথ সজলনয়নে অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন, "লক্ষ্মী! চন্দ্ররাওয়ের জন্য তুমি কেন যাচ্ঞা করিতেছ জানি না, তাহাকে কখনও মার্জ্জনা করিব মনে করি নাই; কিন্তু তোমার নিকট অদেয় আমার কিছুই নাই। এই ঈশানী-মন্দিরে প্রতিজ্ঞা করিতেছি চন্দ্ররাওয়ের অনিষ্ট করিব না। আমি তাহার দোষ মার্জ্জনা করিলাম—জগদীশ্বর তাঁহাকে মার্জ্জনা করুন।"

লক্ষ্মী হৃদয়ের সহিত বলিলেন, "জগদীশ্বর তাঁহাকে মার্জ্জনা করুন।"

পূর্ব্বদিকে প্রভাতের আলোকচ্ছটা দেখা যাইল। লক্ষ্মী তখন অনেক অশ্রুবর্ষণ করিয়া সস্নেহে ভ্রাতার নিকট বিদায় লইলেন, বলিলেন— "আমার সঙ্গে বাটীর অন্য লোক মন্দিরে আসিয়াছে, এখনও সকলে নিদ্রিত আছে, এইক্ষণেই আমি না যাইলে জানিতে পারিবে। এখন চলিলাম, পরমেশ্বর তোমার মনোরথ পূর্ণ করুন।"

"পরমেশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন," এই বলিয়া সস্নেহে লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইয়া রঘুনাথও মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইলাম, পাঠক! চল আমরা হতভাগিনী সরযুর নিকট বিদায় লইয়া আইসি।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সীতাপতি গোস্বামী।

"যাও যুদ্ধে, তোমা অদ্য করি অভিষেক,
* * * *
"যাও যশোবিমণ্ডিত হইয়া আবার
"এইরূপে আসি পুনঃ দাঁড়াও সাক্ষাতে।"
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রুদ্রমণ্ডল দুর্গ আক্রমণদিনে রঘুনাথের যাইতে কিজন্য বিলম্ব হইয়াছিল, পাঠক মহাশয় অবশ্যই উপলব্ধি করিয়াছেন। যুদ্ধগমনপূর্ব্বে রঘুনাথ প্রাণভরে একবার সরযুকে দেখিতে আসিয়াছিলেন; সাশ্রুনয়নে সরযু রঘুনাথকে বিদায় দিয়াছিলেন। সরযু সেই দিন নয়নের মণি হারাইলেন, জীবনের জীবন হারাইলেন।

এক দিন, দুই দিন অতিবাহিত হইল, রঘুনাথের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। আশা প্রথমে কাণে কাণে বলিতে লাগিল—"রঘুনাথ যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছেন, রঘুনাথ রাজসম্মানিত হইয়াছেন, বিজয়ী শীঘ্র উল্লাসিত-হৃদয়ে সরযুপার্শ্বে আসিলেন, পরম কুতূহলে সরযুর হস্ত ধরিয়া যুদ্ধের গল্প বলিতেন।" অশ্বের খুরশব্দ হইলেই সরযুর হৃদয় উদ্বেগপূর্ণ হইত, তিনি গবাক্ষ দিয়া চাহিয়া দেখিতেন, পুনরায় ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিতেন। গৃহে দ্রুতপদবিক্ষেপ শুনিলে সরযু চমকিয়া উঠিতেন, পুনরায় নীরবে বসিয়া থাকিতেন।

দিন গেল, রজনী আসিল, পুনরায় দিবস আসিল, এক দিন, দুই দিন, তিন দিন গেল, রঘুনাথ আর আসিলেন না। সরযু সেই পথ চাহিয়া চাহিয়া শ্রান্ত হইলেন, আশা চিন্তায় পরিণত হইল, বালিকার গণ্ডস্থল ক্রমে শুষ্ক হইল, চক্ষুদ্বয় ক্ষণে ক্ষণে জলপূর্ণ হইতে লাগিল; রঘুনাথ আসিলেন না!

সে চিন্তার অব্যক্তব্য যাতনা প্রকাশ করা যায় না; বালিকা কাহাকে সে কথা বলিবেন? নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, নীরবে গবাক্ষপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতেন, অথবা সায়ংকালে সেই ছাদে উঠিয়া সেই অন্ধকার-পরিপূর্ণ প্রান্তরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শ্রান্ত হইতেন না। সেই উন্নত দেহ কি দূরে দেখা যাইতেছে? সরযুর যোদ্ধা কি যুদ্ধ-উল্লাসে সরযুকে বিস্মৃত

হইলেন ? যুদ্ধে কি কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে ? সহসা অশ্রুজলে সরযুর নয়ন আপ্লুত হইল, শুষ্ক গণ্ডস্থল দিয়া ধারা বহিয়া পড়িতে লাগিল !

সহসা বজ্রের ন্যায় সংবাদ আসিল, রঘুনাথ বিদ্রোহী, বিদ্রোহাচরণজন্য অবমানিত হইয়া দূরীকৃত হইয়াছেন ! প্রথম মুহূর্ত্তে সরযু চকিতের ন্যায় রহিলেন, কথার অর্থ তাঁহার বোধগম্য হইল না। ক্রমে ললাট রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, রক্তোচ্ছ্বাসে মুখমণ্ডল রঞ্জিত হইল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, নয়ন হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল। দাসীকে বলিলেন, "কি বলিলি, রঘুনাথ বিদ্রোহী ? রঘুনাথ মুসলমানদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন ? কিন্তু তুই নির্ব্বোধ, তোকে কি বলিব, সম্মুখ হইতে দূর হ !" শান্ত, ধীরস্বভাব সরযুকে এবম্বিধ ক্রুদ্ধ দেখিয়া দাসী বিস্মিত হইল, সসব্যস্তে সরিয়া গেল।

ক্রমে যুদ্ধ হইতে একে একে অনেক সৈন্য আসিতে লাগিল, সকলে বলিতে লাগিল, "রঘুনাথ বিদ্রোহী !" বার বার সরযু এই কথা শুনিতে লাগিলেন ; তাঁহার সখীগণ সরযুকে এই কথা বলিলেন ; বৃদ্ধ জনার্দ্দন সাশ্রুলোচনে বলিতে লাগিলেন যে, কে জানে সেই সুন্দর উদারমূর্ত্তি বালকের মনে এরূপ ক্রুরতা ছিল ? সরযু সমস্ত শুনিলেন, কোন উত্তর করিলেন না, রঘুনাথের বীরত্বে ও সত্যব্রততায় সরযুর যে স্থির অবিচলিত বিশ্বাস ছিল, মুহূর্ত্তের জন্য তাহা বিলুপ্ত হইল না। তিনি কাহাকেও কোন উত্তর দিলেন না, তাঁহার মুখমণ্ডল অদ্য আরক্ত, নয়ন জলশূন্য !

এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে পর এক দিন সন্ধ্যার সময় সরযু সরোবরতীরে যাইলেন ; হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া ধীরে ধীরে চিন্তিত-ভাবে গৃহাভিমুখে আসিতে লাগিলেন।

সহসা পথিমধ্যে সেই নৈশ অন্ধকারে জটাজুটধারী দীর্ঘকায় একজন গোস্বামীকে দেখিতে পাইলেন, ঈষৎ বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন ; যত গোস্বামীর দিকে দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার তেজঃপূর্ণ অবয়ব দেখিয়া সরযুর হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব হইতে লাগিল।

ক্ষণেক পর একটী বিষয় চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"প্রভু ! একজন অসহায় নারী আপনার আশ্রয় যাচ্ঞা করিতে আসিয়াছে, তাহাকে ক্ষমা করুন।"

গোস্বামী সরযুর দিকে চাহিলেন, ক্ষণেক স্থিরভাবে দেখিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন—

"রমণি, আপনার উদ্দেশ্য আমি অবগত আছি, কোন যবক যোদ্ধার কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছেন।"

সরযু অধিকতর ভক্তিসহকারে বলিলেন,—

"ভগবন! আপনার গণনাশক্তি অসাধারণ,—যদি অনুগ্রহ করিয়া আরও কিছু বলেন, তবে বাধিত হই।"

গোস্বা। "জগতে সকলে তাহাকে বিদ্রোহী বলিয়া জানে।"

সরযু। "প্রভুর অজ্ঞাত কিছুই নাই। প্রকৃত অবস্থা কি?"

গোস্বা। "মহারাজ শিবজী তাঁহাকে বিদ্রোহী জানিয়াই দূর করিয়া দিয়াছেন।"

সরযুর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল, আরক্তনয়নে কহিলেন, "তপস্যা প্রবঞ্চনা বিশ্বাস করিব, কিন্তু রঘুনাথকে বিদ্রোহী বিশ্বাস করিব না! গোস্বামিন্, আমি বিদায় হই।"

গোস্বামীর নয়ন সহসা জলপূর্ণ হইল,—ধীরে ধীরে বলিলেন, "আরও কিছু আমার বক্তব্য আছে।"

সরযু। "নিবেদন করুন।"

গোস্বা। "মনুষ্যহৃদয় অবগত হওয়া মনুষ্যগণনার অসাধ্য, যোদ্ধার হৃদয়ে কি ছিল জানিবার একমাত্র উপায় আছে।

"শাস্ত্রে লিখে প্রণয়িনীর হৃদয় প্রণয়ীর হৃদয়ের দর্পণস্বরূপ; যদি রঘুনাথের যথার্থ প্রণয়িনী কেহ থাকে, তাঁহার নিকট গমন করুন, তাঁহার হৃদয়ের ভাব কি জিজ্ঞাসা করুন, তাঁহার হৃদয়ের চিন্তা মিথ্যাবাদিনী নহে।" গোস্বামী তীব্রদৃষ্টিতে সরযুর দিকে চাহিতেছিলেন।

সরযু আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "জগদীশ্বর তোমাকে ধন্যবাদ করি, তুমি আমার হৃদয়ে এতক্ষণে শান্তিদান করিলে। সেই উন্নতচরিত্র যোদ্ধার প্রণয়িনী হইবার যে আশা করে, জীবন থাকিতে রঘুনাথের সত্যব্রতত্বে তাহার স্থির বিশ্বাস বিচলিত হইবে না। হৃদয়েশ! জগতে তোমার অন্যায় নিন্দা করুক, কিন্তু একজন দুঃখিনী বিপদে সম্পদে চিরকাল তোমার যশোগান গাইবে।" সরযুর নয়নযুগল এতক্ষণে জলপূর্ণ হইল, গোস্বামী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়াছিলেন,—তাঁহার দুই নয়ন শুষ্ক ছিল না, তাপসের শান্ত হৃদয় উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল।

ক্ষণেক পর কষ্টে আত্মসংযম করিয়া গোস্বামী বলিলেন,—

"ভদ্রে! আপনার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে, যে আপনিই সেই যোদ্ধার প্রকৃত প্রণয়িনী। আমি দেশে দেশে পর্য্যটন করি, সম্ভবতঃ রঘুনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে পারে;—আপনার তাঁহাকে কিছু বক্তব্য আছে?"

গোস্বামীর সম্মুখে রঘুনাথকে হৃদয়েশ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, স্মরণ করিয়া সরযু ঈষৎ লজ্জিত হইলেন; কিন্তু সে ভাব সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—

"প্রভুর সহিত তাঁহার সম্প্রতি সাক্ষাৎ হইয়াছিল?"

গোস্বা। "কল্য রজনীতে ঈশানী-মন্দিরে সাক্ষাৎ হইয়াছিল।"

সরযু। "রঘুনাথ আপাততঃ কি করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, প্রভু কি অবগত আছেন?"

গোস্বা। "নিজ বাহুবলে, নিজ কার্য্যগুণে অন্যায় অপযশ তিরোহিত করিবেন, অথবা সেই চেষ্টায় প্রাণদান করিবেন।"

সরযু। "ধন্য বীরপ্রতিজ্ঞা! প্রভু! যদি তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয়, বলিবেন সরযু রাজপুতবালা, জীবন অপেক্ষা যশ অধিক জ্ঞান করে! বলিবেন, সরযু যতদিন জীবিত থাকিবে রঘুনাথকে কলঙ্কশূন্য বীর বলিয়া তাঁহারই চিন্তা করিবে, তাঁহারই যশোগীত গাইবে। ভগবান্ অবশ্য রঘুনাথের যত্ন সফল করিবেন।"

গোস্বা। "ভগবান্ তাহাই করুন! কিন্তু ভদ্রে! সত্যের সর্ব্বদা জয় হয় না,—বিশেষ রঘুনাথ যে দুরূহ উদ্যমে প্রবৃত্ত হইতেছে তাহাতে তাঁহার প্রাণসংশয়ও আছে।"

সরযুর নয়নদ্বয় সহসা জলপূর্ণ হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সদর্পে সে জল মোচন করিয়া বলিলেন,—

"রাজপুতের সেই ধর্ম্ম! আপনি তাঁহাকে জানাইবেন, যদি কর্ত্তব্য-সাধনে হৃদয়েশের প্রাণবিয়োগ হয়,—তাঁহার দাসী তাঁহার যশোগীত গাইতে গাইতে উল্লাসে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে!"

উভয়ে ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; গোস্বামীর বাক্‌শক্তি ছিল না। অনেকক্ষণ পরে সরযু জিজ্ঞাসা করিলেন, "রঘুনাথ আর কিছু আপনার নিকট বলিয়াছিলেন?"

গোস্বামী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া উদ্বেগকম্পিতস্বরে বলিলেন—"আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বিদ্রোহী বলিয়া জগৎ যাহাকে ঘৃণা করিবে আপনি কি তাহাকে হৃদয়ে স্থান দিবেন? জগতে যাহার নাম উচ্চারণ করিবে না, আপনি কি মনে মনে তাহার নাম স্মরণ করিবেন? জগতে কি একজনও বিদ্রোহী রঘুনাথকে নির্দ্দোষী বলিয়া জানিবেন;—ঘৃণিত, অবমানিত, দূরীকৃত রঘুনাথকে ঐ শীতল হৃদয়ে স্থান দিবেন?" সন্ন্যাসীর কণ্ঠরোধ হইল।

সরযূ বলিলেন, "প্রভু! সে বিষয় কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন? সরযূ রাজপুতবালা, অবিশ্বাসিনী নহে।"

গোস্বা। "জগদীশ্বর! তবে আর তাঁহার হৃদয়ে কষ্ট নাই, লোকে যদি মন্দ বলে, তিনি জানিবেন একজন এখনও রঘুনাথকে বিশ্বাস করে! এক্ষণে বিদায় দিন্; আমি এই কথাগুলি বলিলে রঘুনাথের হৃদয়ে শান্তিসেচন হইবে!"

সজলনয়নে সরযূ বলিলেন, "আরও বলিবেন, তাঁহার উন্নত উদ্দেশ্য আমি প্রতিরোধ করিব না, অসিহস্তে যশের পথ পরিষ্কার করুন, যিনি জগতের আদিপুরুষ, তিনি তাঁহার সহায় হইবেন! আর যদি এই উদ্যমে তাঁহার কোন অমঙ্গল ঘটে, জানিবেন, তাঁহার চিরবিশ্বাসিনী সরযূও এ অকিঞ্চিৎকর জীবন বিসর্জ্জন করিবে!"

উভয়ে পুনরায় নীরব হইয়া রহিলেন। সরযূ বলিলেন, "প্রভু! আমার হৃদয় শান্ত করিয়াছেন, প্রভুর নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি?"

গোস্বামী চিন্তা করিয়া বলিলেন, "সীতাপতি গোস্বামী!"

রজনী জগতে গভীরতর অন্ধকার ঢালিতে লাগিল! সেই অন্ধকারে একজন গোস্বামী একাকী রায়গড় দুর্গাভিমুখে গমন করিতেছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

রায়গড় দুর্গ।

"ধিক্ দেব, ঘৃণাশূন্য, অক্ষুব্ধ হৃদয়,
এত দিন আছ এই অন্ধতমপুরে,
দেবত্ব, বিভব, বীর্য্য, সর্ব্ব তেয়াগিয়া,
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজ্জ্বলি?"

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর, শিবজীর তদানীন্তন রাজধানী রায়গড়ে রজনী দ্বিপ্রহরের সময় একটী সভা সন্নিবেশিত হইয়াছে। শিবজীর প্রধান প্রধান সেনাপতি, মন্ত্রী, কর্ম্মচারী ও দূরদর্শী বিচক্ষণ পুরোহিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। পরাক্রান্ত যোদ্ধা, ধীশক্তি-সম্পন্ন মন্ত্রী, শীর্ণতনু শুক্লকেশ বহুদর্শী ন্যায়শাস্ত্রী, সভাতল সুশোভিত করিয়াছেন; যুদ্ধব্যবসায়ে, বুদ্ধিসঞ্চালনে, বা বিদ্যাবলে ইহাঁরাই শিবজীর

চিরসহায়তা করিয়াছেন, শিবজীর ন্যায় ইঁহাদেরও হৃদয় স্বদেশানুরাগে পূর্ণ, হিন্দুদিগের গৌরব সাধন জন্য ইঁহারা দিনে দিনে মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে অনিদ্র হইয়া চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু অদ্য সে চেষ্টা কোথায়, সে উৎসাহ কোথায়? সভাস্থল নীরব, শিবজী নীরব, মহারাষ্ট্রীয় বীরগণ অদ্য মহারাষ্ট্রীয় গৌরবলক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইবার জন্য সমবেত হইয়াছেন!

অনেকক্ষণ পর শিবজী মুরেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"পেশওয়াজী! আপনি তবে এই পরামর্শ দিতেছেন, সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়াছি, তাঁহার অধীন জায়গীরদার হইয়া থাকিব? মহারাষ্ট্রীয় গৌরব-রবি চিরান্ধকারে মগ্ন হইবে?"

মুরেশ্বর। "মনুষ্যের যাহা সাধ্য আপনি তাহা করিয়াছেন, বিধির নির্ব্বন্ধ কে লঙ্ঘন করিতে পারে?"

পুনরায় সভাস্থ সকলে নীরব।

পুনরায় শিবজী বলিলেন—

"স্বর্ণদেব! যখন আপনি আমার আদেশে এই সুন্দর প্রশস্ত রায়গড় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তখন ইহা রাজার রাজধানী স্বরূপ নির্ম্মাণ করেন, না সামান্য জায়গীরদারের আবাসস্থান বলিয়া নির্ম্মাণ করেন?"

আবাজী স্বর্ণদেব ক্ষুণ্ণস্বরে উত্তর করিলেন—

"ক্ষত্রিয়রাজ! ভবানীর আদেশে এক দিন স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, ভবানীর আদেশে সে চেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়াছেন, তাহাতে আক্ষেপ অবিধেয়। যখন রায়গড় নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম তখন কে জানিত হিন্দুসেনাপতি জয়সিংহ সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইবেন? ঈশানী স্বয়ং হিন্দুসেনাপতির সহিত যুদ্ধ নিষেধ করিয়াছেন।"

অন্নজী দত্ত কহিলেন, "মহারাজ! পূর্ব্বেই আমরা দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজা জয়সিংহের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছি, সে বিষয় অদ্য পুনরুত্থাপন করিয়া আক্ষেপ করিলে ফল কি? যাহা অনিবার্য্য তাহা হইয়াছে, অধুনা আপনার দিল্লীগমনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা বিবেচনা করুন।"

শিবজী কহিলেন, "অন্নজী! আপনার কথা সত্য, কিন্তু যে আশা, যে উৎসাহ, যে চেষ্টা হৃদয়ে বহুকালাবধি স্থান পাইয়াছে, তাহা সহজে উৎপাটিত হয় না।" ক্ষণেক চিন্তার পর বলিলেন, "ঐ যে উন্নত পর্ব্বত-শ্রেণী চন্দ্রালোকে দৃষ্ট হইতেছে, বাল্য-সুহৃদ্‌ অন্নজী মালশ্রী! ঐ পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া বা উপত্যকায় ভ্রমণ করিতে করিতে হৃদয়ে কত স্বপ্নের আবির্ভাব হইত তাহা কি স্মরণ হয়? পুনরায় মহারাষ্ট্রদেশ স্বাধীন

হইবে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে, যুধিষ্ঠির বা রামচন্দ্রের ন্যায় সসাগরা ধরার অধিপতি হিমালয় হইতে সাগরকূল পর্য্যন্ত সমগ্রদেশ শাসন করিবেন! ঈশানি! যদি এ আশা অলীক স্বপ্নমাত্র' তবে এরূপ স্বপ্নে কেন বালকের হৃদয় চঞ্চল করিয়াছিলে?"

এই কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইল; সকলে নীরব, সভায় শব্দমাত্র নাই,—সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে ঘরের এক প্রান্তে ঈষৎ অন্ধকার স্থান হইতে একটী গম্ভীর-স্বর শ্রুত হইল, "ঈশানী প্রবঞ্চনা করেন না; রাজন্! তীক্ষ্ণহস্তে অসি ধারণ করুন, অধ্যবসায় সহিত এই উন্নত পথ অনুসরণ করুন,—স্বপ্ন এখনও সফল হইবে!"

চকিত হইয়া শিবজী চাহিয়া দেখিলেন, জটাজূটধারী, বিভূতি-ভূষিত-অঙ্গ নবীন গোস্বামী সীতাপতি!

উৎসাহে শিবজীর নয়ন জ্বলিতে লাগিল, বলিলেন, "গোঁসাইজী! তুমি বাল্য-উৎসাহ আমার হৃদয়ে পুনরুদ্রেক করিতেছ,—বাল্য-কথা পুনরায় স্মরণ হইতেছে! তাত, দাদাজী কানাইদেব মৃত্যুশয্যায় শয়িত হইয়া আমাকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, 'বৎস! তুমি যে চেষ্টা করিতেছ তদপেক্ষা মহত্তর চেষ্টা নাই। এই উন্নত পথ অনুসরণ কর, দেশের স্বাধীনতা সাধন কর, ব্রাহ্মণ, গোবৎসাদি ও কৃষকগণকে রক্ষা কর, দেবালয় কলুষিতকারীকে শাস্তিপ্রদান কর, ঈশানী যে উন্নত পথ তোমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই পথ অনুধাবন কর।' বিংশতি বৎসর পরে অদ্যাপি দাদাজীর গম্ভীরস্বর আমার কর্ণকুহরে শব্দিত হইতেছে,—দাদাজী কি প্রবঞ্চনাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন?"

পুনরায় সেই গোস্বামী সেই গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"কানাইদেব প্রবঞ্চনাবাক্য উচ্চারণ করেন নাই, উন্নত পথ অনুসরণ করিলে অবশ্যই উন্নত ফললাভ হইবে,—পথমধ্যে যদি আমরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া উদ্দেশ্য হারাইয়া নিরস্ত হই, সে কি তাত দাদাজী কানাইদেবের প্রবঞ্চনা, না আমাদের ভীরুতা?"

"ভীরুতা" শব্দ উচ্চারণমাত্র সভাতে গোলযোগ উপস্থিত হইল; বীরদিগের কোষে অসি ঝন্‌ঝনা শব্দ করিল,—ক্রোধী চন্দ্ররাও জুমলাদার গোস্বামীর গলদেশ সজোরে ধারণ করিলেন। সীতাপতি ধীর, ভয়শূন্য,—ধীরে ধীরে আপন বজ্রহস্তে চন্দ্ররাওয়ের হস্ত ছাড়াইয়া যেন পতঙ্গবৎ সেই জুমলাদারকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বিস্মিত হইয়া সকলে বুঝিলেন গোস্বামীর চিরজীবন কেবল যাগযজ্ঞে অতিবাহিত হয় নাই!

গোস্বামী পুনরায় গম্ভীরস্বরে বলিলেন—

"রাজন্! গোস্বামীর বাচালতা ক্ষমা করুন, যদি অন্যায় কথা উচ্চারণ করিয়া থাকি ক্ষমা করুন; কিন্তু মদীয় উপদেশ সত্য কি অলীক, ক্ষত্রিয়-রাজ! আপন বীরহৃদয়কে জিজ্ঞাসা করুন; যিনি জায়গীরদারের পদবী হইতে রাজপদবী গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি অসিহস্তে বহু বিপদ, বহু সঙ্কট হইতে স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার করিয়াছেন, যিনি পর্ব্বতে, উপত্যকায়, গ্রামে, অটবীতে বীরত্বের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছেন, তিনি কি সে বীরত্ব বিস্মরণ হইবেন, সে স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিবেন? বালসূর্য্যের ন্যায় যে হিন্দুরাজ্যের তেজ চারিদিকে অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া উদয় হইতেছে,—সে সূর্য্য কি অকালে অস্ত যাইবে? রাজন্! হিন্দু-গৌরব-লক্ষ্মী আপনাকে বরণ করিয়াছেন, আপনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন? আমি ধর্ম্মব্যবসায়ী মাত্র, আমার পরামর্শ দিবার অধিকার নাই, স্বয়ং বিবেচনা করুন।"

সভাস্থ সকলে নীরব—শিবজী নীরব, কিন্তু তাঁহার নয়ন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল!

অনেক ক্ষণ পরে শিবজী গোস্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—

"স্বামিন্! আপনার সহিত অল্পদিনই আমার পরিচয় হইয়াছে,—আপনি দেব কি মনুষ্য জানি না, কিন্তু দৈববাণী হইতে আপনার কথা অধিক মিষ্ট, হৃদয়ে গভীরতর অঙ্কিত হইতেছে! একটী কথা জিজ্ঞাসা করি;—হিন্দু-সেনাপতির তুমুল প্রতাপ, তীক্ষ্ণ রণকৌশল, অসংখ্য রাজপুত-সেনা, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করে এরূপ সৈন্য আমাদের কোথায়?"

সীতাপতি। "রাজপুতগণ বীরাগ্রগণ্য, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়গণও দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করে না, জয়সিংহ রণপণ্ডিত, কিন্তু শিবজীও ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পরাজয় আশঙ্কা করিলেই পরাজয় হয়। পুরুষ-সিংহ! বিপদ্ তুচ্ছ করিয়া, দৈব সংহনন করিয়া, কার্য্যসাধন করুন, ভারত-বর্ষে এরূপ হিন্দু নাই যে আপনার যশোগান না করিবে, আকাশে এরূপ দেবতা নাই যিনি আপনার সহায়তা না করিবেন!" সভাস্থল পুনঃস্তম্ভিত।

শিবজী। "মানিলাম, কিন্তু হিন্দুতে হিন্দুতে যুদ্ধ করিয়া রুধিরস্রোতে দেশ প্লাবিত করিবে, সে কি মঙ্গল, সে কি পুণ্যকর্ম্ম?"

সীতাপতি। "না—কিন্তু সে পাপে কে পাতকী? যিনি স্বজাতির জন্য, স্বধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করেন, না যিনি মুসলমান অর্থভুক্ হইয়া স্বজাতির বৈরাচরণ করেন, তিনি?"

শিবজী পুনরায় নীরব হইয়া রহিলেন, প্রায় একদণ্ড কাল নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাঁহার বিশাল হৃদয় কত ভীষণ চিন্তালহরীতে আলোড়িত হইতেছিল, কে বলিবে? এক দণ্ডকাল পর ধীরে ধীরে মস্তক উঠাইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন—

"সীতাপতি! অদ্য জানিলাম মহারাষ্ট্র দেশ এখনও বীরশূন্য হয় নাই, এখনও পরাধীন হইবে না। পুনরায় যুদ্ধ হইবে,—সে যুদ্ধের দিনে আপনা অপেক্ষা বিচক্ষণ মন্ত্রী বা সাহসী সহযোগী আমি আকাঙ্ক্ষা করি না। কিন্তু সে যুদ্ধের দিন এখনও আইসে নাই। আমি পরাজয় আশঙ্কা করিতেছি না, স্বধর্ম্মী-নাশ আশঙ্কা করিতেছি না, অন্য একটী কারণে আপাততঃ যুদ্ধে বিমুখ হইতেছি, শ্রবণ করুন।

যে মহৎ ব্রত ধারণ করিয়াছি তাহা সাধনার্থ কত ষড়যন্ত্র, কত গুপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছি, আপনার নিকট অগোচর নাই। কত হত্যা করিয়াছি, কত সন্ধিবাক্য বিস্মরণ হইয়াছি, কত গর্হিত কার্য্যে শিবজীর নাম কলুষিত রহিয়াছে! দেবদেব মহাদেব জানেন আপনার লাভের জন্য এ সমস্ত করি নাই,—হিন্দু-গৌরব পুনরুদ্দীপ্ত হইবে, শিবজীর কেবল এই একমাত্র উদ্দেশ্য!

"অদ্য হিন্দু ধর্ম্মের অবলম্বনস্বরূপ, হিন্দু প্রতাপের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ মহারাজ জয়সিংহের সহিত সন্ধি করিয়াছি,—শিবজী সে সন্ধি লঙ্ঘন করিতে অপারক! বিধর্ম্মীর সহিত কপটাচারণ করিয়াছি,—ভগবান সে পাপ ক্ষমা করুন,—মহানুভব রাজপুতের সহিত কপটাচরণ শিবজী জীবন থাকিতে করিবে না।

"ধর্ম্মাত্মা এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন, 'সত্যপালনে যদি সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের রক্ষা না হয়, সত্যলঙ্ঘনে হইবে!' সে কথা অদ্যাপি আমি বিস্মৃত হই নাই,—সে কথা অদ্য বিস্মরণ হইব না।

"সীতাপতি! আরংজীব যদি আমাদের সন্ধির কথা লঙ্ঘন করেন, তখন আপনার পরামর্শ গ্রহণ করিব, তখন শিবজী দুর্ব্বল হস্তে খড়্গ ধরিবে না। কিন্তু জয়সিংহের সহিত এই সন্ধি লঙ্ঘন করিতে শিবজী অপারক।"

সভাসদ্ সকলে নীরব হইয়া রহিলেন। ক্ষণেক পর অন্নজী বলিলেন—

"মহারাজ! আর একটী কথা আছে—আপনি কি দিল্লী যাওয়া স্থির করিয়াছেন?"

শিবজী। "সে বিষয়েও আমি জয়সিংহকে বাক্যদান করিয়াছি।"

অন্নজী। "মহারাজ আরংজীবের চতুরতা জানেন, তাঁহার কথা বিশ্বাস করিবেন? তিনি আপনাকে কি মনোরথে আহ্বান করিয়াছেন তাহা কি আপনি অনুভব করিতে পারেন না?"

শিবজী। "অন্নজী! জয়সিংহ স্বয়ং বাক্যদান করিয়াছেন যে দিল্লী-গমনে আমার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবে না।"

অন্নজী। "কপটাচারী আরংজীব যদি আপনাকে বন্দী করেন বা হত্যা করেন, তখন জয়সিংহ কিরূপে আপনাকে রক্ষা করিবেন?"

শিবজী। "সন্ধি লঙ্ঘনের ফল তিনি অবশ্যই ভোগ করিবেন। দত্তজী! মহারাষ্ট্রভূমি বীরপ্রসবিনী, আরংজীব এরূপ আচরণ করিলে মহারাষ্ট্র দেশে যে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইবে সাগরের জলে তাহা নিবারিত হইবে না, আরংজীব ও সমস্ত দিল্লীর সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া যাইবে! পাপের ফল নিশ্চয়ই ফলিবে!"

শিবজীকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া আর কেহ নিষেধ করিলেন না। ক্ষণেক পর শিবজী বলিলেন—

"আর একটী কথা আছে, পেশওয়াজী মুরেশ্বর! আবাজী স্বর্ণদেব! অন্নজী দত্ত! আপনাদিগের ন্যায় প্রকৃত বন্ধু আমার অতি বিরল,—আপনাদিগের ন্যায় কার্য্যক্ষম বিচক্ষণ পণ্ডিত মহারাষ্ট্রদেশে বিরল। আমার অবর্ত্তমানে মহারাষ্ট্রদেশ আপনারা তিন জনে শাসন করিবেন, আপনাদিগের আদেশ আমার আদেশের ন্যায় সকলে পালন করিবে, এরূপ আজ্ঞা দিয়া যাইব।"

মুরেশ্বর, স্বর্ণদেব ও অন্নজী শাসনভার গ্রহণ করিলেন। অন্নজী মালশ্রী তখন বলিলেন, "ক্ষত্রিয়রাজ! আমার একটী আবেদন আছে। বাল্যকাল হইতে আপনার সঙ্গ ত্যাগ করি নাই, অনুমতি করুন, আপনার সহিত দিল্লী যাত্রা করি।"

সজলনয়নে শিবজী বলিলেন, "মালশ্রী! তোমার নিকট আমার অদেয় কিছুই নাই,—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।"

সীতাপতি ক্ষণেক পর বলিলেন, "রাজন্! তবে আমাকে বিদায় দিন, আমার ব্রতসাধনার্থ বহু তীর্থে যাইতে হইবে। জগদীশ্বর আপনাকে নিরাপদে রাখুন।"

শিবজী। "নবীন গোস্বামিন্! কুশলে তীর্থযাত্রা করুন! যুদ্ধের সময় আপনাকে পুনরায় স্মরণ করিব, আপনা অপেক্ষা প্রকৃত যোদ্ধা আমি দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করি না। আপনার মত অল্প বয়সেই এরূপ তেজঃ, সাহস ও বীরত্ব আমি আর কাহারও দেখি নাই।"

পরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অপরিস্ফুটস্বরে বলিলেন—"কেবল আর এক জনকে জানিতাম!"

সভা ভঙ্গ হইল। শিবজী শয়নাগারে যাইয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, নবীন গোস্বামীর উৎসাহ-বাক্য বার বার মনে উদ্রেক হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর নিদ্রিত হইলেন, নিদ্রায়ও যেন সেই উৎসাহ-বাক্য শুনিতে লাগিলেন, সেই বীরভঙ্গী দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বপ্নে সকল ঠিক দেখা যায় না, অবস্থা ও রূপের পরিবর্তন হয়। শিবজী স্বপ্নে সেই উত্তেজনা-বাক্য শুনিতে লাগিলেন, কিন্তু বক্তা যেন সে নবীন গোস্বামী নহে, বক্তা রঘুনাথজী হাবিলদার!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পৃথুরায়ের দুর্গ।

"চলেছে চাহিয়া দেখ,
যোদ্ধা, যোদ্ধা এক এক
কাল পরাজয় করি দেবমূর্ত্তি ধরিয়া।
* * * *
জন্মিবে পুরুষগণ
বীর যোদ্ধা অগণন,
রাখিবে ভারত নাম ক্ষিতপৃষ্ঠে আঁকিয়া।"

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৬৬৬ খৃঃ অব্দের বসন্তকালে পঞ্চশত অশ্বারোহী ও এক সহস্র পদাতিক মাত্র লইয়া শিবজী দিল্লীর নিকট উপস্থিত হইলেন। নগরের প্রায় ছয় ক্রোশ দূরে শিবির সংস্থাপিত করিয়াছেন, সেনাগণ বিশ্রাম করিতেছে, শিবজী চিন্তিতমনে এদিক্ ওদিক্ পরিভ্রমণ করিতেছেন। দিল্লী আসিয়া কি ভাল করিয়াছেন? মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করা কি বীরোচিত কার্য্য হইয়াছে? এখনও কি প্রত্যাবর্ত্তনের উপায় নাই? এইরূপ সহস্র চিন্তা শিবজীর মহৎ হৃদয় আলোড়িত করিতেছে। যোদ্ধার মুখমণ্ডল গম্ভীর, ললাট চিন্তারেখায় অঙ্কিত,—বিপদ্‌কালে, যুদ্ধকালেও কেহ শিবজীর মুখমণ্ডল এরূপ চিন্তাঙ্কিত দেখে নাই।

শিবজীর সঙ্গে সঙ্গে কেবল তাঁহার তেজস্বী উগ্রস্বভাব নয় বৎসরের বালক শম্ভুজী ভ্রমণ করিতেছেন, এক একবার পিতার গম্ভীর মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, পিতার হৃদয়ের ভাব কতক কতক বুঝিতে পারিতেছিলেন।

রঘুনাথপন্ত ন্যায়শাস্ত্রী নামক শিবজীর পুরাতন মন্ত্রী কিছু পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিলেন।

দুই জনে অনেকক্ষণ ভ্রমণ করিতেছিলেন। শিবজীর হৃদয় ভীষণ চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত ও উৎক্ষিপ্ত। অনেকক্ষণ পর তিনি মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ন্যায়শাস্ত্রী, আপনি কখনও দিল্লীতে আসিয়াছিলেন?"

রঘুনাথ। "বাল্যকালে দিল্লীনগর দেখিয়াছিলাম।"

শিব। "তবে সম্মুখে ঐ বহুবিস্তীর্ণ প্রাচীরের ন্যায় কি দেখা যাইতেছে বলিতে পারেন? আপনি অনন্যমনা হইয়া ঐ দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন কিজন্য?"

রঘুনাথ। "মহারাজ! ভারতবর্ষের শেষ হিন্দুরাজা পৃথুরায়ের দুর্গ-প্রাচীর দেখা যাইতেছে।"

শিবজী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "হায়! এই সে পৃথুরায়ের দুর্গ! এই স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল! এই স্থানে তিনি একবার ঘোরীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। হা! ন্যায়শাস্ত্রী!

"সেদিন ঐ প্রাচীরের প্রত্যেক স্তম্ভ হইতে বিজয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল, ঐ মরুভূমিস্থলে প্রশস্ত নগর বিজয়বাদ্যে শব্দিত হইয়াছিল, সমরবিজয়ী হিন্দুসেনার কোলাহলে গগনমার্গ বিদীর্ণ হইয়াছিল। সেদিন হিমালয় হইতে কাবেরী পর্য্যন্ত হিন্দুবীরগণ সবলহস্তে স্বাধীনতা রক্ষা করিত,—হিন্দুললনাগণ উল্লাসে স্বাধীনতা গান গাইত! কিন্তু স্বপ্নের ন্যায় সে দিন গত হইয়াছে, ঐ পুরাতন দুর্গের নিকট পৃথুরায় অন্যায় সমরে হত হইলেন, পুণ্য ভারতস্থান অন্ধকারে আবৃত হইল! দিবসের আলোক গত হয়, পুনরায় দিবস আইসে, শীতকালে বিলুপ্ত পত্র কুসুম বসন্তে আবার দেখা যায়, ভারতের গৌরবদিন কি আর দেখা দিবে না? এক দিন ভরসা করিয়াছিলাম, সেই গৌরবের দিন আবার আসিবে, সে আশা কি ফলবতী হইবে?"

শিবজী অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন; তাঁহার হৃদয় চিন্তায় আলোড়িত হইতেছিল। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "দেবদেব মহাদেব

তোমার হস্তে প্রচণ্ড ত্রিশূল নিশ্চেষ্ট বা নিদ্রিত ছিল? সংহারক! কেন ধর্ম্মবিনাশিদিগকে সংহার করিলে না?"

রঘুনাথ। "কে বলিবে, কেন? যাঁহারা হিন্দুরাজ্য বিনাশ করিলেন, তাঁহারা হিন্দু-দেবমণ্ডলীরও অবমাননা করিতে ক্রুটী করেন নাই;—সেই ভীষণপাতকের প্রমাণ অক্ষয় প্রস্তরে খোদিত আছে, সে পাপের প্রতিশোধ এখনও হয় নাই!"

কম্পিতস্বরে শিবজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ন্যায়শাস্ত্রী! আপনার কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, কোথায় সে প্রমাণ খোদিত আছে?"

রঘুনাথ "সন্নিকটে" এই বলিয়া অনতিদূরে একটী পুরাতন প্রস্তর-নির্ম্মিত দেবমন্দিরে শিবজীকে লইয়া গেলেন, বলিলেন, "চারিদিক্ অবলোকন করুন।"

শিবজী। "দেখিতেছি, মধ্যে প্রাঙ্গণ, চারিদিকে সুন্দর প্রস্তরস্তম্ভসার! একটী সুন্দর দেবমন্দির ছিল,—কালে ভগ্ন হইয়াছে। দেবের অবমাননা-চিহ্ন কোথায় খোদিত আছে?"

রঘুনাথ। "তীক্ষ্ণদৃষ্টি করুন, এই সুন্দর স্তম্ভসারের একটী স্তম্ভও ভগ্ন হয় নাই,—তাহার উপর অঙ্কিত দেবমূর্ত্তিগুলিও ভগ্ন হয় নাই, কিন্তু নিরীক্ষণ করুন, একটী মূর্ত্তিরও মুখমণ্ডল দৃষ্ট হইবে না! কালে স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলিত, ধর্ম্ম-বিদ্বেষী যবনেরা স্তম্ভগুলি রাখিয়াছে; কিন্তু সহস্র দেবমূর্ত্তির মধ্যে প্রত্যেক মূর্ত্তির মুখমণ্ডল মাত্র স্বহস্তে ভগ্ন করিয়াছে! বাসনা, যে দেশ বিদেশ হইতে লোক আসিয়া চিরকাল দেখিতে পাইবে, যবনগণ হিন্দুদেবের অবমাননা করিয়াছেন,—যত দিন এই অক্ষয় স্তম্ভসার থাকিবে, তত দিন জগতে হিন্দুধর্ম্মের অবমাননা ঘোষণা করিবে!

"অদ্যাপি সেই পুরাতন মন্দিরের সুন্দর স্তম্ভসার বিদ্যমান রহিয়াছে, অদ্যাপি প্রতিস্তম্ভে বহু দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে,—প্রত্যেক মূর্ত্তির মুখমণ্ডল বিকৃত বা ভগ্ন, প্রথম মুসলমান আক্রমণকারিদিগের ভীষণ ধর্ম্ম-বিদ্বেষের পরিচয় দিতেছে!"

শিবজীর স্বভাবতই হিন্দুধর্ম্মে অতিশয় ভক্তি ছিল, এই স্তম্ভসার দেখিতে দেখিতে তাঁহার নয়ন আরক্ত হইয়া উঠিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল। রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রী আরও বলিতে লাগিলেন—

"এদিকে হিন্দুর অবমাননা, অন্যদিকে যবনের গৌরব! এই যে সম্মুখে উচ্চ স্তম্ভ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, এটী কুতবমিনার, কুতব্-

ঘোষণা করিতেছে! এই

দেখুন আলটমশ্ প্রভৃতি যবন রাজাদিগের গোরস্থানের উপর কিরূপ উন্নত সুন্দর প্রস্তরহর্ম্ম্যাদি নির্ম্মিত হইয়াছে; এই একটী মসজীদ্ প্রস্তুত হইতেছিল, ঐ পুরাতন হিন্দু-দেবালয় ভগ্ন হইয়া উহারই প্রস্তরদ্বারা মসজীদ্ উঠিতেছিল! সমগ্র ভারতবর্ষে এইরূপ! সকল স্থানে পরাভূত হিন্দুদিগের গৌরবচিহ্ন একে একে বিলীন হইতেছে, তাহার উপর বিজয়ী যবনের গৌরবস্তম্ভ উত্থিত হইতেছে; এই কুতবমিনারের উপর আরোহণ করুন; মসজীদের পরে মসজীদ, গোরস্থানের পরে গোরস্থান,—দূরে দিল্লীর অপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য প্রাসাদ ও হর্ম্ম্যাবলী লক্ষিত হইবে, কিন্তু পুরাকালের হস্তিনাপুর ইন্দ্রপুরীতুল্য ইন্দ্রপ্রস্থ বিলীন হইয়াছে,—তাহার একটী স্তম্ভ বা একটী মন্দিরও নয়নগোচর হইবে না।"

নিঃশব্দে শিবজী ও শম্ভুজী ও রঘুনাথপন্ত কুতবমিনারের উপর উঠিলেন,—সেরূপ উন্নত স্তম্ভ বোধ হয় জগতে আর নাই। নিঃশব্দে পূর্ণহৃদয়ে শিবজী চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন;—এই স্থানে কি জগদ্বিখ্যাত হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল, এস্থানে কি প্রাতঃস্মরণীয় যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃসহ বাস করিয়াছিলেন,—এস্থানে কি সেই পুণ্যকালে সেই পুণ্যলোক রাজত্ব করিয়া সসাগরা ধরায় আর্য্য-গৌরব বিস্তার করিয়াছিলেন, মহর্ষি বেদব্যাস কি এই স্থানে অধিবাস করিতেন? ভীষ্মাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, অর্জ্জুন, ভারতের অতুল বীরবৃন্দ কি ইহারই নিকট আপন আপন বীর্য্য প্রকাশ করিয়া অক্ষয় যশোলাভ করিয়াছেন,—কুন্তী, দ্রৌপদী, গান্ধারী, ভারতের প্রাতঃস্মরণীয়া ললনাগণ কি এই স্থান পবিত্র করিয়াছিলেন?—শিবজীর বাক্‌শক্তি রোধ হইল, দুই নয়ন দিয়া জল বহিতে লাগিল,—গদ্‌গদ্‌স্বরে বলিলেন,—

"দেবতুল্য পূর্ব্বপুরুষগণ! আপনাদিগকে প্রণাম করি! আমাদের বাহু বলশূন্য, আমাদের নয়ন তিমিরাবৃত, আমাদের হৃদয় ক্ষীণ! ঐ নীল নভোমণ্ডল হইতে প্রসন্ন হইয়া আলোক দান করুন,—বল দান করুন,—যেন হিন্দুনাম পুনর্ব্বার উন্নত করিতে পারি,—নচেৎ সেই উদ্যমেই যেন মৃত্যু হয়! এ জীবনে অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই!"

শম্ভুজীর হৃদয়ও পূর্ণ হইল, তাঁহারও নয়ন হইতে ঝরঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

শিবজী চারিদিক্ দেখিতে লাগিলেন, ছয় শত বৎসরাবধি মুসলমানগণ রাজ্য করিয়াছেন, তাহার চিহ্ন যেন সেইস্থানে অঙ্কিত রহিয়াছে! অসংখ্য মস্‌জীদ্, অসংখ্য মুসলমান সম্রাটের গোরস্থান, অথবা অসংখ্য ভগ্ন ও চূর্ণ প্রাসাদের অবশিষ্টাংশ সেই কুতবমিন[illegible] দিল্লী পর্য্যন্ত

ছয় ক্রোশ পথ ব্যাপিয়া দেখা যাইতেছে। করালকাল হিন্দু ও যবনের মধ্যে বিভিন্নতা জানে না,—শত শত বৎসরে সহস্র সহস্র মানবকীটে যে সমস্ত হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ করে, হেলায় ভূমিসাৎ করিয়া যায়।

সেদিক্ হইতে নয়ন ফিরাইয়া শিবজী পুনরায় সেই পৃথুর দুর্গপ্রাচীরের দিকে দেখিলেন, অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া রঘুনাথের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—

"ন্যায়শাস্ত্রী! বাল্যকালে কঙ্কণপ্রদেশের কথা শুনিতাম, পৃথুরায়ের বিষয় যে যে কথা শুনিতাম, অদ্য যেন তাহা নয়নে দেখিতেছি! বোধ হইতেছে যেন ঐ ভগ্ন দুর্গ প্রাসাদপূর্ণ,—বহুজনাকীর্ণ, পতাকা ও তোরণ-শোভিত একটী বিস্তীর্ণ নগর! যেন রাজসভায় পাত্রমিত্রবেষ্টিত হইয়া রাজা বসিয়া আছেন,—বাহিরে যতদূর দেখা যায়,—পথে ঘাটে, বাটীতে, প্রাঙ্গণে, নদীতীরে নাগরিকগণ আনন্দে উৎসব করিতেছে! যেন বহুবিস্তীর্ণ বাজারে ক্রয়বিক্রয় হইতেছে,—উদ্যানে লোকে আনন্দে নৃত্যগীত করিতেছে, সরোবর হইতে ললনাগণ কলস করিয়া জল লইয়া যাইতেছে, প্রাসাদসম্মুখে সেনাগণ সসজ্জ দণ্ডায়মান রহিয়াছে; অশ্ব, হস্তী, রথ দণ্ডায়মান রহিয়াছে ও বাদ্যকর সানন্দে বাদ্য করিতেছে! যেন প্রভাতের সূর্য্য এই অপরূপ দৃশ্যের উপর সুন্দর রশ্মি বর্ষণ করিতেছেন,—যেন এমত সময়ে মহম্মদ ঘোরের দূত রাজসভায় প্রবেশ করিল।

"অন্যান্য কথার পর দূত বলিল, 'মহারাজ! মহম্মদ-ঘোর আপনার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ মাত্র লইয়া সন্ধিস্থাপন করিতে সম্মত আছেন তাহাতে আপনার কি মত?'

"মহানুভব চোহান্ উত্তর করিলেন—

"'যবে সূর্য্যদেব আকাশে অন্য একটী সূর্য্যকে স্থান দিবেন, পৃথুরায় সেই দিন স্বীয় রাজ্যে অন্য রাজাকে স্থান দিবেন!' রাজবাক্যশ্রবণে জয় জয়নাদে সেই প্রশস্তপ্রাসাদ শব্দিত হইল,—জয় জয়নাদে প্রশস্ত নগর শব্দিত হইল!

"দূত পুনরায় বলিল, 'মহারাজ! আপনার শ্বশুর মহাশয় মহম্মদ ঘোরের সহিত সন্ধি করিয়াছেন,—আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমান ও রাঠোর সৈন্য একত্রিত দেখিতে পাইবেন।'

"পৃথুরায় উত্তর করিলেন, 'শ্বশুর মহাশয়কে প্রণাম জানাইবেন ও বলিবেন, আমিও স্বয়ং যাইতেছি,—অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করি-

"অবিলম্বে চোহান সৈন্য ঐ প্রশস্ত দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল,—তেরৌরীর যুদ্ধে যবন ও রাঠোর সৈন্য পৃথুরায়ের সম্মুখে বায়ুতাড়িত ধূলিবৎ উড়িয়া গেল,—আহত ঘোরী কষ্টে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন।"

ক্ষণেক পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—

"রঘুনাথ! সেদিন আমাদের গিয়াছে; কিন্তু তথাপি এস্থানে দণ্ডায়মান হইলে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্মরণ করিলে স্বপ্নের ন্যায় নব নব আশা মনে উদয় হয়। এই বিশাল কীর্ত্তিক্ষেত্র চিরদিন তিমিরাবৃত থাকিবে না; ভারতের পূর্ব্বদিন এখনও উদিত হইতে পারে। জগদীশ্বর রুগ্নকে আরোগ্যদান করেন, দুর্ব্বলকে বলদান করেন, জীর্ণ পদদলিত ভারতসন্তানকে তিনিই উন্নত করিতে পারেন।"

নিঃশব্দে সকলে কুতবমিনার হইতে অবতীর্ণ হইলেন; নিঃশব্দে শিবিরাভিমুখে যাইলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

রামসিংহ।

"বাপের সদৃশ বীর, সমান সমান।"
কাশীরাম দাস।

শিবজী ও তাঁহার পুত্র শম্ভুজী শিবিরে উপবেশন করিয়া আছেন, এমত সময় একজন প্রহরী আসিয়া বলিল—

"মহারাজ জয়সিংহের পুত্র রামসিংহ অন্য একজন সৈনিক সহিত সম্রাট-আদেশে মহারাজকে দিল্লীতে আহ্বান করিতে আসিয়াছেন। উভয়ে দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন।"

শিব। "সাদরে লইয়া আইস।"

উগ্রস্বভাব শম্ভুজী বলিলেন, "পিতঃ! আপনাকে আহ্বান করিতে আরংজীব কেবল দুইজন মাত্র দূত পাঠাইয়াছেন? এ অবমাননা সহ্য করিবেন?"

শিবজীও এই আরংজীবকৃত অবমাননায় মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু সে ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। ক্ষণেক পরই রামসিংহ শিবিরে প্রবেশ করিলেন। রাজপুত যুবক পিতার ন্যায় তেজস্বী ও বীর, পিতার

ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ ও সত্যপ্রিয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী যুবকের মুখমণ্ডল দেখিয়াই তাঁহার উদার ও অকপট চরিত্র বুঝিলেন, তথাপি আরংজীবের কোন কু অভিসন্ধি আছে কি না, দিল্লীপ্রবেশে বিপদ্ আছে কি না, কথাচ্ছলে জানিবার প্রয়াস্ করিলেন। রামসিংহ পিতার নিকট শিবজীর বীর্য্য ও প্রতাপের কথা অনেক শুনিয়াছিলেন, সবিস্ময়নয়নে মহারাষ্ট্র বীরপুরুষের দিকে অবলোকন করিলেন। শিবজী রামসিংহকে আলিঙ্গন ও যথোচিত সম্মানপুরঃসর অভ্যর্থনা করিলেন। ক্ষণেক পর রামসিংহ কহিলেন—

"মহারাজকে পূর্ব্বে আমি কখনও দেখি নাই, কিন্তু পিতার নিকট আপনার যশোবার্ত্তা বিস্তর শুনিয়াছি, অদ্য আপনার ন্যায় স্বদেশপ্রিয় ধর্ম্মপরায়ণ বীরপুরুষকে দেখিয়া আমার নয়ন সার্থক হইল।"

শিব। "আমারও অদ্য পরম সৌভাগ্য। আপনার পিতার তুল্য বিচক্ষণ, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যপ্রিয় বীরপুরুষ রাজস্থানেও বিরল, দিল্লী আগমনের সময় যে তাঁহার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল ইহা সুলক্ষণ সন্দেহ নাই।"

রাম। "মহাশয়! দিল্লী আগমন করিতেছেন শুনিয়াই সম্রাট্ আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, কখন্ নগর প্রবেশ করিতে অভিলাষ করেন?"

শিব। "প্রবেশসম্বন্ধে আপনি কি পরামর্শ দেন?" শিবজী তীক্ষ্ণনয়নে রামসিংহের দিকে চাহিতেছিলেন।

অকপটস্বরে রামসিংহ উত্তর করিলেন—

"আমার বিবেচনায় এইক্ষণই প্রবেশ করা বিধেয়, বিলম্ব হইলে বায়ু উত্তপ্ত হইবে, গ্রীষ্ম দুঃসহনীয় হইবে।"

রামসিংহের সরল উত্তর শুনিয়া শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—

"সে কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, আপনি দিল্লীতে অধুনা বাস করিতেছেন, আপনার নিকট কোনও সংবাদ অবিদিত নাই, আমার পক্ষে দিল্লীপ্রবেশ কতদূর বুদ্ধির কার্য্য তাহা আপনি অবশ্যই জানেন।"

উদারচেতা রামসিংহ এতক্ষণ পর শিবজীর মনোগত ভাব বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—

"ক্ষমা করুন, আমি আপনার উদ্দেশ্য পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। আমি আপনার অবস্থায় হইলে চিরকাল পর্ব্বতে বাস করিতাম, নিজের অসির উপর নির্ভর করিতাম, অসির তুল্য প্রকৃত বন্ধু আর নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমি অজ্ঞমাত্র,—পিতা আপনাকে যখন দিল্লী আসিতে পরামর্শ দিয়াছেন,

তখন আপনি আসিয়া ভালই করিয়াছেন। তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তাঁহার পরামর্শ কখনও ব্যর্থ হয় না।"

শিবজী বুঝিলেন, দিল্লীতে তাঁহাকে রুদ্ধ করিবার জন্য কোনও কল্পনা হয় নাই, অথবা যদি হইয়া থাকে, রামসিংহ তাহা জানেন না। তখন পুনরায় বলিলেন—

"হাঁ! আপনার পিতাই আমাকে আসিতে পরামর্শ দিয়াছেন,—আমার আসিবার সময় তিনি আরও বাক্যদান করিয়াছেন, তাহাও বোধ হয় আপনি অবগত আছেন।"

রামসিংহ। "আছি, দিল্লী আগমনে আপনার কোনও বিপদ হইবে না, কোনও অনিষ্ট হইবে না, সে বিষয়ে তিনি আপনাকে বাক্যদান করিয়াছেন, সে বিষয়ে তিনি আমাকেও আদেশ করিয়াছেন।"

শিব। "তাহাতে আপনার কি মত?"

রাম। "পিতার আদেশ অবশ্য পালনীয়, রাজপুতের বাক্য লঙ্ঘন হয় না,—পিতার বাক্য যাহাতে লঙ্ঘন না হয়, আপনি নিরাপদে স্বদেশে যাইতে পারেন, সে বিষয়ে দাসের যত্নের কোনও ত্রুটী হইবে না।"

শিবজীর মন নিরুদ্বেগ হইল। আর সন্দেহ না করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—

"তবে আপনারই পরামর্শ গ্রহণ করিব; বিলম্ব করিলে বায়ু উত্তপ্ত হইবে, চলুন এইক্ষণই দিল্লী প্রবেশ করি।"

অচিরে সকলে দিল্লীর অভিমুখে চলিলেন।

সমস্ত পথ পুরাতন মুসলমান-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষে পরিপূর্ণ। প্রথম মুসলমানেরা দিল্লী জয় করিয়া পৃথুরায়ের পুরাতন দুর্গের নিকট আপনাদিগের রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সুতরাং প্রথম সম্রাট্‌দিগের মস্‌জীদ, প্রাসাদ ও সমাধি-মন্দিরের ভগ্নাবশিষ্ট সেই স্থানে দৃষ্ট হয়. কালক্রমে নূতন নূতন সম্রাট্ আরও উত্তরে নূতন নূতন প্রাসাদ ও রাজবাটী নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন, ক্রমে নগর উত্তরাভিমুখে চলিল! শিবজী যাইতে যাইতে কত প্রাসাদ, কত মসজীদ ও মিনার, কত স্তম্ভ ও সমাধি-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিলেন তাহা গণনা করিতে পারিলেন না। রামসিংহ শিবজীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন ও নানা স্থানের পরিচয় দিতে লাগিলেন, উভয়ে উভয়ের গুণের পরিচয় পাইলেন, উভয়ের মধ্যে অচিরে সৌহৃদ্য জন্মিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী স্থির করিলেন, যদি দিল্লীতে কোনও বিপদ্ হয়, একজন প্রকৃত বন্ধু পাইব।

পথিমধ্যে লোদীবংশীয় সম্রাট্‌দিগের প্রকাণ্ড সমাধিমন্দির সকল দৃষ্ট হইল, প্রত্যেক রাজার কবরের উপর এক একটী গম্বুজ ও অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। আফ্‌গানদিগের গৌরব-সূর্য্য যখন অস্তমিত হয়, তখন এই স্থানে দিল্লী ছিল, পরে আরও উত্তরে সরিয়া গিয়াছে।

তাহার পর হুমাউনের প্রকাণ্ড সমাধিমন্দির। তাহার পরে "চৌষট্‌ খম্বা," অর্থাৎ শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত, চতুঃষষ্টি স্তম্ভযুক্ত প্রকাণ্ড সুন্দর অট্টালিকা। তাহার পশ্চাতে অসংখ্য গোরস্থান। পৃথুরায়ের দুর্গ হইতে আধুনিক দিল্লী পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে শিবজীর বোধ হইল যেন সেই পথেই ভারতবর্ষের ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে। এক একটী প্রাসাদ বা অট্টালিকা সেই ইতিহাসের এক একটী পত্র, এক একটী গোরস্থান এক একটী অক্ষর, করাল কাল সেই ইতিহাসলেখক; নচেৎ এরূপ অক্ষরে ইতিহাস কেন লিখিত হইবে?

শিবজী আরও আসিতে লাগিলেন। দিল্লীর প্রাচীরের নিকটে আসিলে রামসিংহ সগর্ব্বে একটী মন্দির দেখাইয়া বলিলেন—

"রাজন্‌, ঐ যে মন্দির দেখিতেছেন,—পিতা জ্যোতিষ-গণনার্থ ঐ মান-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন; বহুদেশের পণ্ডিতেরা ঐ মন্দিরে আসিয়া রজনীতে নক্ষত্র গণনা করেন।"

শিব। "আপনার পিতা যেরূপ বীর সেইরূপ বিজ্ঞ, জগতে এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন লোক অতি বিরল; শুনিয়াছি পুণ্য কাশীধামেও তিনি ঐরূপ মান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

রাম। "যাহা আজ্ঞা করিলেন সত্য।" অচিরে দিল্লীর প্রাচীরের ভিতর সকলে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশ করিবার সময় শিবজীর ঈষৎ হৃদ্‌কম্প হইল,—তিনি অশ্ব থামাইলেন। একবার পশ্চাৎদিকে চাহিলেন, একবার মনে চিন্তা উদয় হইল যে, "এখনও স্বাধীন আছি, পরক্ষণেই বন্দী হইতে পারি।" তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মপরায়ণ জয়সিংহের নিকট যে বাক্যদান করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ হইল, জয়সিংহের পুত্রের উদার মুখমণ্ডল দেখিলেন,—ভবানীর নাম লইলেন ও নিজ কোষে "ভবানী" নামক অসিকে মনে মনে স্মরণ করিয়া দিল্লীদ্বার প্রবেশ করিলেন।

স্বাধীন মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা সেই মুহূর্ত্তে বন্দী হইলেন!

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

দিল্লীনগর।

"ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা;
নাচিছে নর্ত্তকী-বৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক; * * *
দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা ফলফুলে;
গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ; বাতায়নে বাতী;
জনস্রোতঃ রাজপথে বহিছে কল্লোলে।"

মধুসূদন দত্ত।

দিল্লী অদ্য মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে! আরংজীব স্বয়ং জাঁকজমকপ্রিয় ছিলেন না; কিন্তু রাজকার্য্য সাধনার্থ সময়ে সময়ে জাঁকজমক আবশ্যক তাহা বিশেষরূপে জানিতেন। অদ্য শিবজী দরিদ্র মহারাষ্ট্র দেশ হইতে বিপুল অর্থশালী মোগল রাজধানীতে আসিয়াছেন; মোগলদিগের ক্ষমতা, সম্পত্তি ও অর্থের প্রাচুর্য্য দেখিলে শিবজী আপন হীনতা বুঝিতে পারিবেন, মোগলদিগের সহিত যুদ্ধের অসম্ভাবিতা বুঝিতে পারিবেন, এই উদ্দেশ্যে আরংজীব অদ্য প্রচুর জাঁকজমকের আদেশ দিয়াছিলেন। সম্রাটের আদেশে দিল্লীনগরী উৎসবের দিনে কুল-ললনার ন্যায় অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিয়াছে!

শিবজী ও রামসিংহ একত্রে রাজপথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। পথ দিয়া অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক গমনাগমন করিতেছে, নগর লোকারণ্য হইয়াছে! বণিকগণ বাজারে দোকানে বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য রাশি করিয়া রাখিয়াছে; উৎকৃষ্ট বস্ত্র, বহুমূল্য স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার, অপূর্ব্ব খাদ্যসামগ্রী, অপর্য্যাপ্ত গৃহানুকরণদ্রব্য দেখিতে দেখিতে শিবজী রাজপথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। কোথাও গৃহের উপর দিয়া নিশান উড়িতেছে, কোথাও সুপরিচ্ছদে গৃহস্থেরা বারন্দায় বসিয়া রহিয়াছে, কোথাও বা গবাক্ষ দিয়া কুলকামিনীগণ প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র যোদ্ধাকে দেখিতেছে। পথে অসংখ্য শকট, শিবিকা, হস্তী ও অশ্ব; রাজা, মনসবদার, সেখ, আমীর ও ওমরাহগণ গমনাগমন করিতেছেন; অশ্বারোহীগণ তীব্রবেগে যেন নগর কাঁপাইয়া যাইতেছে; সুন্দর অলঙ্কার ও রক্তবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া শুণ্ড নাড়িতে নাড়িতে গজেন্দ্রগমনে গজেন্দ্রগণ চলিয়া যাইতেছে; হুহুঙ্কার শব্দে শিবিকাবাহকগণ যেন আরোহীর পদমর্য্যাদা চীৎকারশব্দের

দ্বারা প্রচার করিয়া চলিয়া যাইতেছে! শিবজী এরূপ নগর কখনও দেখেন নাই, কোথায় পুনা বা রায়গড়! যাইতে যাইতে রামসিংহ দূরে তিনটী শ্বেত গম্বুজ দেখাইয়া বলিলেন—

"ঐ দেখুন জুম্মা মস্‌জীদ্! সম্রাট্ শাহজিহান জগতের অর্থ একত্র করিয়া ঐ উন্নত প্রশস্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি ওরূপ মস্‌জীদ্ জগতে আর নাই।" শিবজী বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে দেখিলেন, রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া মস্‌জীদের প্রাচীর দেখা যাইতেছে, তাহার উপর সুন্দর শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত তিনটী গম্বুজ ও দুই দিকে দুই মিনার যেন গগন ভেদ করিয়া উঠিয়াছে।

এই অপরূপ মস্‌জীদের সম্মুখেই রাজপ্রাসাদ ও দুর্গের বিস্তীর্ণ রক্তবর্ণ-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত প্রাচীর দৃষ্ট হইল। দুর্গের পশ্চাতে যমুনা নদী, সম্মুখে দুর্গ ও মস্‌জীদের মধ্যে বিস্তীর্ণ রাজপথ শব্দপূর্ণ ও লোকারণ্য! সেই স্থানের ন্যায় আর একটী স্থান ভারতবর্ষে ছিল না, জগতে ছিল কি না, সন্দেহ। দুর্গের প্রাচীরের উপর সহস্র নিশান বায়ুপথে উড়িতেছে, যেন জগতে মোগল সম্রাটের ক্ষমতা ও গৌরব প্রকাশ করিতেছে! দুর্গদ্বারে একজন প্রধান মনসবদারের প্রশস্ত শিবির; মনসবদার দুর্গদ্বার রক্ষা করিতেছেন। সম্মুখে সেনা রেখায় রেখায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বন্দুকের কিরিচশ্রেণী সূর্য্যালোকে ঝক্‌মক্ করিতেছে, প্রত্যেক কিরিচ হইতে রক্তবস্ত্রের নিশান বায়ুমার্গে উড়িতেছে। দুর্গসম্মুখে অসংখ্য লোক অসংখ্য প্রকার দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় করিতে আসিয়াছে, দুর্গপ্রাচীর হইতে মস্‌জীদ-প্রাচীর পর্য্যন্ত ও উত্তর দক্ষিণে যতদূর পথ দেখা যায়, সমস্ত শব্দপূর্ণ ও লোকারণ্য! অশ্বারোহী, গজারোহী বা শিবিকারোহী ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান পদাভিষিক্ত পুরুষ বহুলোকসমন্বিত হইয়া বহু সমারোহে সর্ব্বদাই দুর্গদ্বার ভিতর বা বাহিরে আসিতেছেন। তাঁহাদিগের পরিচ্ছদ-শোভায় নয়ন ঝলসিত হইতেছে, লোকের কলরবে কর্ণ বিদীর্ণ হইতেছে! সকল শব্দকে নিমগ্ন করিয়া মধ্যে মধ্যে শিবিরের মধ্য হইতে কামানের শব্দ নগর কম্পিত করিতেছে ও রাজাধিরাজ আলমগীর অর্থাৎ জগতের অধিপতির ক্ষমতাবার্ত্তা জগৎসংসারে প্রচার করিতেছে!

বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে ক্ষণেক এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শিবজী রামসিংহের সহিত দুর্গদ্বার অতিক্রম করিয়া দুর্গপ্রবেশ করিলেন।

প্রবেশ করিয়া শিবজী যাহা দেখিলেন তাহাতে বিস্মিত হইলেন। চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ "কারখানায়" অসংখ্য শিল্পকারগণ রাজ-ব্যবহার্য্য নানাবিধ

দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে,—অপূর্ব্ব সুবর্ণ ও রৌপ্যখচিত বস্ত্র, মল্‌মল্‌ মসলিন বা ছিট,—বহুমূল্য গালিচা, চন্দ্রাতপ, তাম্বু বা পরদা, সুন্দর পরিধেয়, উষ্ণীষ, শাল বা গাত্রাভরণ, অপরূপ সুবর্ণ, রৌপ্য ও মণিমাণিক্যের বেগম-পরিধেয় অলঙ্কার, সুন্দর চিত্র, সুন্দর কারুকার্য্য, সুন্দর কাষ্ঠ বা শ্বেত প্রস্তরের গৃহানুকরণ দ্রব্য, রাশি রাশি নীল, পীত, রক্তবর্ণ বা হরিদ্বর্ণ প্রস্তরের নানারূপ খেলনাদ্রব্য, কত বর্ণনা করিব! ভারতবর্ষে যত অপূর্ব্ব শিল্পকার ছিল, সম্রাট-আদেশে তাহারা মাসিক বেতন পাইয়া প্রতিদিন দুর্গে কার্য্য করিতে আসিত। সম্রাট্ রাজকার্য্যার্থ বা নিজ প্রয়োজনের জন্য যে কোন বস্তু আবশ্যক বোধ করিতেন, বিলাসিনী বেগমগণ যতরূপ অপূর্ব্ব "ফরমায়েশ" করিতেন, প্রাসাদবাসিদিগের যাহা কিছু প্রয়োজন হইত, সমস্ত এই স্থানে প্রস্তুত হইত।

শিবজী এ সমস্ত দেখিবার সময় পাইলেন না। অসংখ্য লোকের মধ্য দিয়া "দেওয়ান আম" নামক উন্নত প্রশস্ত রক্তবর্ণ প্রস্তর-বিনির্ম্মিত প্রাসাদের নিকট আসিলেন। সম্রাট্ সচরাচর এই স্থানেই সভা অধিবেশন করেন,—কিন্তু অদ্য যেন শিবজীকে প্রাসাদের সমস্ত গৌরব দেখাইবার জন্যই,—আরও ভিতরে সুন্দর শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত নানারূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত জগতে অতুল্য "দেওয়ান খাস" নামক প্রাসাদে সভা অধিবেশন করিয়াছিলেন। শিবজী সেই স্থানে যাইলেন, দেখিলেন প্রাসাদের ভিতর রত্নমাণিক্য বিনির্ম্মিত সূর্য্যরশ্মিপ্রতিঘাতী ময়ূর-সিংহাসনের উপর সম্রাট্ আরংজীব উপবেশন করিয়া আছেন, সম্রাটের চারিদিকে রৌপ্য-বিনির্ম্মিত রেল, তাহার সম্মুখে ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য রাজা, মনসবদার, ওমরাহ ও বীরপুরুষ এবং অসংখ্য লোক নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রামসিংহ শিবজীর পরিচয় দান করিয়া রাজসদনে উপস্থিত হইলেন।

শিবজী অদ্য দিল্লীনগরের অসাধারণ শোভা দেখিয়াই আরংজীবের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এক্ষণে রাজসদনে আসিয়া সেই বিষয় আরও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। যিনি বিংশতি বৎসর তুমুল যুদ্ধ করিয়া আপনার ও স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি সম্প্রতি সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া যুদ্ধে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন, যিনি এতদূর স্বীকার করিয়া মহারাষ্ট্রদেশ হইতে সম্রাট্‌কে দর্শন করিতে দিল্লী পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, সম্রাট্ তাঁহাকে এইরূপে আহ্বান করিলেন? সামান্য সেনাপতিকেও ইহা অপেক্ষা সম্মান করিতেন, শিবজী অদ্য একজন সামান্য কর্ম্মচারীর ন্যায় নম্রভাবে রাজসদনে দণ্ডায়মান! শিবজীর ধমনীতে উষ্ণ শোণিত

বহিতে লাগিল,—কিন্তু এক্ষণে নিরুপায়! সামান্য রাজকর্ম্মচারীর ন্যায় সম্রাট্‌কে "তসলীম" করিয়া রীতিমত "নজর" দান করিলেন। আরংজীবের দূর উদ্দেশ্য সাধন হইল,—জগৎ-সংসার জানিল, শিবজী জানিল, শিবজী ও আরংজীব সমকক্ষ নহেন, দাসের প্রভুর সহিত, ক্ষীণের বলিষ্ঠের সহিত যুদ্ধ করা মূর্খতা!

এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ আরংজীব্ "নজর" গ্রহণ করিয়া কোন বিশেষ সমাদর না করিয়া শিবজীকে "পাঁচ হাজারী" অর্থাৎ পঞ্চ সহস্র সেনার সেনাপতিদিগের মধ্যে স্থান দিলেন। শিবজীর নয়ন তখন অগ্নিবৎ প্রজ্জ্বলিত হইল, শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, তিনি ওষ্ঠের উপর দন্তস্থাপন করিলেন, অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "শিবজী পাঁচ হাজারী? সম্রাট্ যখন মহারাষ্ট্রে যাইবেন, দেখিবেন শিবজীর অধীনে কত পাঁচ হাজারী আছে! দেখিবেন, তাহারা দুর্ব্বলহস্তে অসিধারণ করে না!" শিবজীর পার্শ্বস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ এই কথা শুনিতে পাইল, সম্রাটের কাণে এ কথা উঠিল।

অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদন হইলে সভাভঙ্গ হইল। সম্রাট্ গাত্রোত্থান করিয়া পার্শ্বস্থ উচ্চ শ্বেতপ্রস্তরবিনির্ম্মিত বেগমমহলে গেলেন, নদীর স্রোতের ন্যায় দুর্গ হইতে অসংখ্য লোকস্রোত নির্গত হইতে লাগিল, যে যাহার আবাসস্থানে যাইল, সাগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ দিল্লীনগরে অচিরে লোকস্রোত লীন হইয়া গেল।

শিবজীর আবাসের জন্য একটী বাটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; রোষে, অভিমানে সন্ধ্যার সময় শিবজী সেই বাটীতে আসিলেন, একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পর রাজসদন হইতে সংবাদ আসিল, যে অদ্য সম্রাটের সম্মুখে শিবজী যে কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সম্রাট তাহা শুনিয়াছেন, সম্রাট্ শিবজীকে অন্য দণ্ড দিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু ভবিষ্যতে শিবজী রাজসাক্ষাৎ পাইবেন না, রাজসভায় স্থান পাইবেন না।

শিবজী বুঝিলেন, ভবিষ্যৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইতেছে; ব্যাধে যেরূপ সিংহকে ধরিবার জন্য জাল পাতে, ক্রুর দুষ্টবুদ্ধি আরংজীব সেইরূপ ধীরে ধীরে শিবজীকে বন্দী করিবার জন্য মন্ত্রণাজাল পাতিতেছেন! "এ জাল বিদীর্ণ করিয়া কি পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিব?" পুনরায় নীরবে প্রায় একদণ্ডকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শেষে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "হা সীতাপতি গোস্বামিন্! মিত্রপ্রবর! চিরযুদ্ধের পরামর্শ তুমিই দিয়াছিলে,—তখন তোমার পরামর্শ

গ্রাহ্য করিলাম না, তোমার গরীয়সী কথা এখনও আমার কর্ণে শব্দিত হইতেছে!—আরংজীব! সাবধান! শিবজী এ পর্য্যন্ত তোমার নিকট সত্য-পালন করিয়াছে,—তাহার সহিত অসত্য বা খল আচরণ করিও না, কেননা শিবজীও সে বিদ্যায় শিশু নহেন। যদি কর, ভবানী সাক্ষী থাকুন, মহারাষ্ট্রদেশে যে সমরানল প্রজ্বলিত করিব, তাহাতে এই সুন্দর দিল্লীনগর, এই বিপুল মুসলমান সাম্রাজ্য দগ্ধ হইয়া যাইবে!"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

নিশীথে আগন্তুক।

"কে তুমি——————
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ।"

মধুসূদন দত্ত।

কয়েক দিনের মধ্যে শিবজী আরংজীবের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন; শিবজী আর স্বদেশে না যাইতে পারেন, চিরকাল দিল্লীতে বন্দী হইয়া থাকেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা আর কখনও স্বাধীন না হয়, এই আরংজীবের উদ্দেশ্য! শিবজী সম্রাটের এই কপটাচরণে যৎপরোনাস্তি রুষ্ট হইলেন, কিন্তু রোষ গোপন করিয়া দিল্লী হইতে প্রস্থানের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শিবজীর চিরবিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্ত ন্যায়শাস্ত্রী সর্ব্বদা শিবজীর সহিত এই বিষয় আলোচনা করিতেন ও নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতেন।

অনেক যুক্তি করিয়া উভয়ে স্থির করিলেন যে, প্রথমে দেশ প্রত্যাগমনের জন্য সম্রাটের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করা বিধেয়,—অনুমতি না দিলে অন্য উপায় উদ্ভাবন করা যাইবে।

ন্যায়শাস্ত্রী পণ্ডিতপ্রবর ও বাক্‌পটুতায় অগ্রগণ্য, তিনি শিবজীর আবেদন রাজ-সদনে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন।

আবেদনপত্রে শিবজী যে যে কারণে দিল্লীতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তারিতরূপে লিখিত হইল। শিবজী মোগল সৈন্যের সহায়তা করিয়া যে যে কার্য্যসাধন করিয়াছিলেন, আরংজীব যে যে বিষয় অঙ্গীকার করিয়া শিবজীকে দিল্লীতে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাও স্পষ্টাক্ষরে দর্শিত হইল। তাহার পর শিবজী প্রার্থনা করিলেন যে, "আমি যে কার্য্য

সাধন করিতে অঙ্গীকার করিয়াছি তাহা এখনও সাধন করিতে প্রস্তুত আছি, বিজয়পুর ও গলখন্দ-রাজ্য সম্রাটের অধীনে আনিতে যতদূর সাধ্য সাহায্য করিব। অথবা যদি সম্রাট্ আমার সহায়তা গ্রহণ না করেন, অনুমতি দিন আমি নিজের জায়গীরে প্রত্যাবর্ত্তন করি, কেননা হিন্দুস্থানের জলবায়ু আমার পক্ষে ও আমার সঙ্গী ও সেনার পক্ষে যৎপরোনাস্তি অস্বাস্থ্যকর, এদেশে আমাদের থাকা সম্ভব নহে।” রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রী এইরূপ আবেদনপত্র সম্রাট-সদনে উপস্থিত করিলেন, সম্রাট্ উত্তর পাঠাইলেন, উত্তরে নানা কথা লিখা আছে, কিন্তু শিবজীর প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি নহেই! শিবজী স্পষ্ট বুঝিলেন তাঁহাকে চিরবন্দী করাই সম্রাটের একমাত্র উদ্দেশ্য। তখন দিন দিন পলায়নের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

উপরি উক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর এক দিন সন্ধ্যার সময় শিবজী গবাক্ষপার্শ্বে চিন্তিতভাবে উপবেশন করিয়া আছেন। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু এখনও অন্ধকার হয় নাই, রাজপথ দিয়া লোকের স্রোত এখনও অবিরত বহিয়া যাইতেছে। কত দেশের লোক কতরূপ পরিচ্ছদে কত কার্য্যে এই রাজধানীতে আসিয়াছে! দিল্লী অসংখ্য সৈনিকের বাসস্থান, সর্ব্বদাই প্রশস্ত পথ দিয়া দুই এক জন সৈনিক যাইতে দেখা যাইতেছে। কখন কখন দুই এক জন শ্বেতাঙ্গ মোগল সদর্পে যাইতেছেন, অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ শত শত দেশীয় হিন্দু বা মুসলমান সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, দুই এক জন কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রীও কখন কখন দেখা যাইতেছে। পারস্য, আরব, তাতার ও তুরস্ক দেশ হইতে বণিক বা মসাফের এই সমৃদ্ধ নগরীতে গমনাগমন করিতেছে, মুসলমান বা হিন্দু সেনাপতি রাজা বা মন্‌সবদার বহুলোকসমন্বিত হইয়া মহাসমারোহে হস্তী বা অশ্ব বা শিবিকায় আরোহণ করিয়া যাইতেছেন, তদপেক্ষা উচ্চরবে বিক্রেতাগণ আপন আপন পণ্যদ্রব্য মস্তকে লইয়া চীৎকার করিতেছে, এতদ্ভিন্ন সহস্র অন্যান্য লোক সহস্র কার্য্যে জলের স্রোতের ন্যায় যাতায়াত করিতেছে!

ক্রমে এই জনস্রোত হ্রাস পাইতে লাগিল। দিল্লীর অসংখ্য দোকানদার আপন আপন দোকান বন্ধ করিতে লাগিল। নগরের অনন্ত কলরব যেন ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইল, দুই একটী বাটীর গবাক্ষভিতর হইতে দীপশিখা দেখা যাইতে লাগিল, অনন্ত হর্ম্ম্যশ্রেণীর মধ্যে দূরস্থ অট্টালিকাগুলি ক্রমে অন্ধকারে আবৃত হইতে লাগিল। আকাশে দুই একটী তারা দেখা দিল, পশ্চিমদিকে রক্তিমাচ্ছটা আর নাই, শিবজী পূর্ব্বদিকে চাহিলেন;—দিল্লীর

উন্নত প্রাচীর, তাহার পর শান্ত বিস্তীর্ণ দিগন্তপ্রবাহিণী যমুনানদী সায়ংকালের নিস্তব্ধতায় অনন্ত সাগরাভিমুখে বহিয়া যাইতেছে!

সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে জুম্মা মস্‌জীদ হইতে আজানের পবিত্র শব্দ উত্থিত হইল, যেন সে গম্ভীর শব্দ ধীরে ধীরে চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল, যেন ধীরে ধীরে মানবের মন আকর্ষণ করিয়া গগনে উত্থিত হইতে লাগিল! শিবজী মুসলমান-ধর্ম্ম-বিদ্বেষী, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও স্তব্ধ হইয়া সেই সায়ংকালীন সুদূর-উচ্চারিত গম্ভীর শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অন্ধকারে পুনরায় চাহিলেন, কেবল জুম্মা মস্‌জীদের শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত গম্বুজ সুনীল আকাশপটে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, কেবল প্রাসাদের রক্তবর্ণ উন্নত প্রাচীর যেন দূরে পর্ব্বতশ্রেণীর মত দৃষ্ট হইতেছে! এতদ্ভিন্ন সমস্ত নগর অন্ধকারে আচ্ছাদিত, নৈশ নিস্তব্ধতায় স্তব্ধ!

রজনী গভীর হইল, কিন্তু শিবজীর চিন্তাসূত্র এখনও ছিন্ন হইল না। অদ্য পূর্ব্বকথা একে একে হৃদয়ে জাগরিত হইতেছিল। বাল্যকালের সুহৃদ্বর্গ, বাল্যকালের আশা, ভরসা, উদ্যম;—সাহসী উন্নতচরিত্র পিতা শাহজী, পিতৃতুল্য বাল্যসুহৃদ্ দাদাজী কানাইদেব, গরীয়সী মাতা জীজী!—যিনি মহারাষ্ট্রের জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াছিলেন, যিনি বীরমাতার ন্যায় বালককে বীরকার্য্যে ব্রতী করিয়াছেন, বিপদে আশ্বাস দিয়াছেন, আহবে উৎসাহ দিয়াছেন!

তাহার পর যৌবনের উন্নত আশা, ভীষণ কার্য্যপরম্পরা, দুর্গ-বিজয়, দেশ-বিজয়, রাজ্য-বিজয়, বিপদের পর বিপদ্, যুদ্ধের পর যুদ্ধ, অপূর্ব্ব জয়লাভ, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ, দুর্দ্দমনীয় উচ্চাভিলাষ! বিংশ বৎসর পর্য্যালোচনা করিলেন, প্রতিবৎসর অপূর্ব্ব বিজয়ে বা অসমসাহসী কার্য্যে অঙ্কিত ও সমুজ্জ্বল!

সে কার্য্যপরম্পরা কি ব্যর্থ? সে আশা কি মায়াবিনী?—না এখনও ভবিষ্যৎ-আকাশে গৌরব-নক্ষত্র লীন রহিয়াছে, এখনও ভারতবর্ষে যবনরাজ্যের অবসান হইবে, হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তির মস্তকের উপর রাজচ্ছত্র উন্মীলিত হইবে?

এই প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, এরূপ সময়ে দ্বিপ্রহর রজনীর ঘণ্টা বাজিল, রাজপ্রাসাদের নাগ্‌রাখানা হইতে সে শব্দ উত্থিত হইয়া সমস্ত বিস্তীর্ণ নগর ব্যাপ্ত হইল, নৈশ নিস্তব্ধতার গম্ভীর শব্দ বহুদূর পর্য্যন্ত শ্রুত হইল।

আকাশগর্ভে সে শব্দ এখনও লীন হয় নাই, এরূপ সময়ে শিবজী উন্মীলিত গবাক্ষদ্বারে একটী দীর্ঘ মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন; কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার আকাশপটে যেন দীর্ঘ-নিশ্চেষ্ট প্রতিকৃতি।

বিস্মিত হইয়া শিবজী দণ্ডায়মান হইলেন, সেই আকৃতির প্রতি তীব্রদৃষ্টি করিলেন, কোষ হইতে অসি অর্দ্ধেক বহির্গত করিলেন। অপরিচিত আগন্তুক তাহা গ্রাহ্য না করিয়া, লক্ষ্য না করিয়া ধীরে ধীরে গবাক্ষভিতর দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, ধীরে ধীরে ললাট ও ভ্রূযুগলের উপর হইতে নৈশ শিশির মোচন করিলেন।

শিবজী তীক্ষ্ণনয়নে দেখিলেন, আগন্তুকের মস্তকে জটাজূট, শরীরে বিভূতি; হস্তে বা কোষে অসি বা ছুরিকা বা কোনও প্রকার অস্ত্র নাই;—তবে আগন্তুক শিবজীকে হত্যা করিবার জন্য সম্রাট-প্রেরিত চর নহে। তবে আগন্তুক কে?

তীক্ষ্ণনয়নে অন্ধকার ঘরের ভিতরও শিবজীকে লক্ষ্য করিয়া আগন্তুক বলিলেন—

"মহারাজের জয় হউক।"

অন্ধকারে আগন্তুকের আকৃতি দেখিয়া শিবজী তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠশব্দ শ্রবণমাত্র চিনিতে পারিলেন। জগতে প্রকৃত বন্ধু অতি বিরল; বিপদের সময়, চিন্তার সময় এরূপ বন্ধুকে পাইলে হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠে। শিবজী সীতাপতি গোস্বামীকে প্রণাম ও সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলেন, একটী দীপ জ্বালিলেন, পরে অতিশয় উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"বন্ধুপ্রবর! রায়গড়ের সংবাদ কি? আপনি তথা হইতে কবে কিরূপে আসিলেন? এতদূরেই বা কি প্রয়োজনে আসিলেন, ও অদ্য নিশীথে সহসা গবাক্ষদ্বার দিয়া আসিবারই বা অর্থ কি?"

সীতাপতি উত্তর করিলেন, "মহারাজ! রায়গড়ের সংবাদ সমস্ত কুশল; আপনি যে সচীবপ্রবরের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়াছেন, তাহাতে অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু এ বিষয় আমি বিশেষ জানি না, কেননা আপনি রায়গড় পরিত্যাগ করিবার পরে অধিক কাল আমি তথায় ছিলাম না। পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছিলাম, আমার কঠোর ব্রতসাধনার্থে আমাকে দেশে দেশে পর্য্যটন করিতে হয়,—সেই প্রয়োজনেই মথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শনার্থ দিল্লী আসিয়াছি। প্রভুর সহিত যখন সাক্ষাৎ করি তখনই আমার সৌভাগ্য, দিবাই কি, নিশাই কি?"

শিব। "তথাপি কোনও বিশেষ কারণ না থাকিলে গবাক্ষ দিয়া দ্বিপ্রহর নিশীথে আসিতেন না। কি কারণ প্রকাশ করিয়া বলুন।

সীতা। "নিবেদন করিতেছি; কিন্তু পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করি, প্রভু আসিয়া অবধি কুশলে আছেন?",

শিব। "শারীরিক কুশলে আছি,—শত্রুমধ্যে মনের কুশল কোথায়?"

সীতা। "প্রভুর সহিত ত সম্রাটের সন্ধিই আছে, আপনার শত্রু কোথায়?"

শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "সর্পের সহিত ভেকের সহিত সন্ধি কতক্ষণ স্থায়ী? সীতাপতি! আপনি অবশ্যই সমস্ত অবগত আছেন, আর আমাকে লজ্জা দিবেন না। যদি রায়গড়ে আপনার বীরোপযোগী পরামর্শ শুনিতাম তাহা হইলে কঙ্কণদেশের ভীষণ পর্ব্বত ও উপত্যকার মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের জন্য অদ্যাপিও যুদ্ধ করিতে পারিতাম, খল সম্রাটের কথায় বিশ্বাস করিয়া থানার মধ্যে পড়িতাম না,—দিল্লীনগরে বন্দী হইতাম না।"

সীতা। "প্রভু আত্মতিরস্কার করিবেন না, মনুষ্যমাত্রই ভ্রান্তির অধীন, এ জগৎ ভ্রমপরিপূর্ণ। বিশেষ এ বিষয়ে আপনার দোষমাত্র নাই,—আপনি সন্ধিবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সদাচরণ প্রদর্শনপূর্ব্বক এস্থানে আসিয়াছেন, যিনি অসদাচরণ ও কপটাচরণে দোষী, জগদীশ্বর অবশ্য তাঁহার সমুচিত দণ্ড দিবেন। প্রভু! খলতার জয় নাই,—অদ্য আরংজীব যে পাপ করিয়া আপনাকে রুদ্ধ করিবার আশা করিয়াছেন, সেই পাপে সবংশে নিধন হইবেন। মহারাজ! আপনি রায়গড়ে যে কথা বলিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রদেশে সে কথা এখনও কেহ বিস্মরণ হয় নাই;—আরংজীব যদি কপটাচরণ করেন, তবে মহারাষ্ট্রদেশে যে যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত হইবে, সমস্ত মোগল সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া যাইবে।"

উৎসাহে, উল্লাসে শিবজীর নয়ন জ্বলিতে লাগিল. তিনি বলিলেন—

"সীতাপতি! সে ভরসা এখনও লোপ হয় নাই। এখনও আরংজীব দেখিবেন মহারাষ্ট্রজীবন লোপ পায় নাই! কিন্তু হায়! যে সময়ে আমার বীরাগ্রগণ্য সৈন্যেরা মোগলদিগের সহিত তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হইবে, সে সময়ে আমি কি দূর দিল্লীনগরে নিশ্চেষ্ট বন্দীস্বরূপ থাকিব?"

সীতা। "যবে গগনসঞ্চারী বায়ুকে আরংজীব জালদ্বারা রুদ্ধ করিতে পারিবেন, তখন আপনাকে বন্দী রাখিতে পারিবেন, তাহার পূর্ব্বে নহে!"

শিবজী ঈষৎ হাস্য করিলেন; পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "তবে বোধ করি আপনি কোন পলায়নের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাই বলিবার জন্য এরূপ গুপ্তভাবে অদ্য রজনীতে আমার গৃহে আসিয়াছেন!"

সীতা। "প্রভু তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রভুর নিকট কিছুই গোপন রাখিতে পারি, এরূপ সম্ভাবনা নাই।"

শিব। "সে উপায় কি?"

সীতা। "অন্ধকার রজনীতে প্রভু অনায়াসে ছদ্মবেশে গৃহ হইতে বাহির হইতে পারেন। দিল্লীর চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, কিন্তু পূর্ব্বদিকে একস্থানে সেই প্রাচীরে লৌহশলাকা স্থাপিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা মহারাষ্ট্রীয় বীরের অসাধ্য নহে। অপর পার্শ্বে ক্ষুদ্র তরীতে অষ্টজন বাহক আছে, নিমেষমধ্যে মথুরায় পঁহুছিবেন। তথায় প্রভুর অনেক বন্ধু আছে, অনেক হিন্দু-দেবালয়ে অনেক ধর্ম্মাত্মা পুরোহিত আছেন, তথা হইতে প্রভু অনায়াসে স্বদেশে যাইতে পারিবেন।"

শিব। "আমি আপনার উদ্যোগে যথেষ্ট বাধিত হইলাম, আপনি যে প্রকৃত বন্ধু তাহার আর একটী নিদর্শন পাইলাম। কিন্তু মনে করুন প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের সময় কেহ আমাকে দেখিতে পাইল, তখন পলায়ন দুঃসাধ্য,—আরংজীবহস্তে নিশ্চয় মৃত্যু।"

সীতা। "প্রাচীরের যেস্থানে লৌহশলাকা দেওয়া আছে তাহার অনতিদূরে আপনার সেনার মধ্যে দশ জন খড়্গহস্তে ছদ্মবেশে লুক্কায়িত আছে। যদি কেহ প্রভুকে দেখিতে পায় বা গতিরোধ করে, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়।"

শিব। "ভাল, নৌকায় গমনকালে তীরস্থ কোন প্রহরী যদি সন্দেহপ্রযুক্ত নৌকা ধরিতে চাহে?"

সীতা। "অষ্টজন নৌকাবাহক ছদ্মবেশী আপনারই অষ্টজন যোদ্ধা। তাহাদিগের শরীর বর্ম্মাচ্ছাদিত, তূণ পরিপূর্ণ। সহসা নৌকা কেহ রোধ করিতে পারে তাহার সম্ভাবনা নাই।"

শিব। "মথুরায় পঁহুছিয়া যদি প্রকৃত বন্ধু না পাই?"

সীতা। "আপনার পেশওয়ার ভগিনীপতি মথুরায় আছেন, তিনি আপনার চির-পরিচিত ও বিশ্বস্ত তাহা আপনিই জানেন। আমি অদ্য তাঁহার নিকট হইতে আসিতেছি, তিনি সমস্ত প্রস্তুত রাখিয়াছেন, তাঁহার পত্র পাঠ করুন।"

বস্ত্রের ভিতর হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া শিবজীর হস্তে দিলেন। শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া পত্র ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—

"আপনি পাঠ করিয়া শুনান্।" সীতাপতি লজ্জিত হইলেন, তাঁহার তখন স্মরণ হইল যে শিবজী আপন নাম লিখিতেও জানিতেন না, কখনও লেখাপড়া শিখেন নাই!

সীতাপতি পত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন। যাহা যাহা আবশ্যক, মুরেশ্বরের কুটুম্ব সমস্ত স্থির করিয়াছেন, পত্রে বিস্তীর্ণ লিখা আছে; শুনিয়া শিবজী বলিলেন—

"গোস্বামিন্! আপনার সমস্ত জীবন যাগযজ্ঞে অতিবাহিত হইয়াছে কখনই বোধ হয় না, শিবজীর প্রধান মন্ত্রীও আপনার অপেক্ষা সুন্দররূপে উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিত না! কিন্তু এখনও একটী কথা আছে; আমি পলাইলে আমার পুত্র কোথায় থাকিবে, আমার বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্ত, প্রিয়সুহৃদ্ অন্নজী মালশ্রী, আমার সেনাগণ কোথায় থাকিবে? ইহারা কিরূপে আরংজীবের কোপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে?"

সীতা। "আপনার পুত্র, প্রিয়সুহৃদ্ ও মন্ত্রীবর আপনার সহিত অদ্য রজনীতেই যাইতে পারে;—আপনার সেনাগণ দিল্লীতে থাকিলে হানি নাই,—আরংজীব তাহাদিগকে লইয়া কি করিবেন, অগত্যা ছাড়িয়া দিবেন।"

শিব। "সীতাপতি! আপনি আরংজীবকে জানেন না; তিনি ভ্রাতৃদিগকে বধ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন।"

সীতা। "যদি আপনার সেনাগণের উপর কঠোর আদেশ দেন, কোন্ মহারাষ্ট্র এরূপ ভীরু যে আপনার নিরাপদবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া উল্লাসের সহিতপ্রাণ বিসর্জ্জন না করিবে?"

শিবজী ক্ষণেক নীরবে চিন্তা করিলেন; পরে মহানুভব ধীরে ধীরে বলিলেন—

"গোস্বামিন্! আমি আপনার চেষ্টা, আপনার উদ্যোগের জন্য আপনার নিকট চিরবাধিত রহিলাম, কিন্তু শিবজী তাহার বিশ্বস্ত ও চিরপালিত, ভৃত্যদিগকে বিপদে রাখিয়া আপনার উদ্ধার চাহে না; এরূপ ভীরুতার কার্য্য কখনও করিবে না। সীতাপতি! অন্য উপায় উদ্ভাবন করুন, নচেৎ চেষ্টা ত্যাগ করুন!"

সীতা। "অন্য উপায় নাই!"

শিব। "তবে সময় দিন্, শিবজীর এই প্রথম বিপদ্ নহে, উপায় উদ্ভাবনে কখনও পরাঙ্মুখ হয় নাই।"

সীতা। "সময় নাই! অদ্য রজনীতে প্রভু পলায়ন করুন; নতুবা কল্য আপনার পলায়ন নিষিদ্ধ!"

শিব। "আপনি কোন্ যোগবলে এরূপ জানিলেন জানি না, কিন্তু আপনার গণনা যদি যথার্থও হয়, তথাপি শিবজীর অন্য উত্তর নাই;—

শিবজী আশ্রিত প্রতিপালিত লোককে বিপদে রাখিয়া আত্মপরিত্রাণ করিবে না। গোস্বামিন্! এ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে!”

সীতা। “প্রভু! বিশ্বাসঘাতকের শাস্তিদান করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, আরংজীবকে শাস্তিদান করুন,—সেই দূর মহারাষ্ট্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করুন, তথা হইতে সাগরতরঙ্গের ন্যায় সমরতরঙ্গ প্রবাহিত করুন, অচিরে আরংজীবের সুখস্বপ্ন ভগ্ন হইবে, অচিরে এই পাপপূর্ণ সাম্রাজ্য অতল জলে মগ্ন হইবে।”

শিব। “সীতাপতি! যিনি জগতের রাজা তিনি বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিবেন? আমার কথা অবধারণা করুন, তাহার অধিক বিলম্ব নাই;—শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবে না।”

সীতা। “প্রভু! এখনও এ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করুন, এখনও বিবেচনা করিয়া আদেশ করুন; কল্য বিবেচনার সময় থাকিবে না,—কল্য আপনি বন্দী!”

শিব। “তাহাই হউক;—শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবে না, শিবজীর প্রতিজ্ঞা অবিচলিত!”

সীতা। “তবে আদেশ দিন্, আমি বিদায় হই।” অতিশয় ক্ষীণ দুঃখের স্বরে সীতাপতি এই কথাগুলি বলিলেন। শিবজী চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার নয়নে জলবিন্দু।

তখন সস্নেহে সীতাপতির হস্ত ধরিয়া বলিলেন—“গোস্বামিন্! দোষ গ্রহণ করিবেন না; আপনার যত্ন, আপনার চেষ্টা, আপনার ভালবাসা আমি জীবন থাকিতে ভুলিব না; রায়গড়ে আপনার বীরপরামর্শ, দিল্লীতে আমার উদ্ধারার্থ আপনার এতদূর উদ্যোগ চিরকাল আমার হৃদয়ে জাগরিত থাকিবে! বিদায় কিজন্য? যতদিন দিল্লীতে থাকিবেন, আমার, এই অট্টালিকায় থাকুন, এস্থানে আমার বিপদ আছে, আপনার নাই।”

সীতা। “প্রভু! আপনার মিষ্টবাক্যে যথোচিত পুরস্কৃত হইলাম; জগদীশ্বর জানেন আপনার সঙ্গে থাকা ভিন্ন আমার আর অন্য অভিলাষ নাই; কিন্তু আমার ব্রত অলঙ্ঘনীয়, ব্রতসাধনের জন্য নানাস্থানে নানা কার্য্যে যাইতে হয়, এখানে অবস্থিতি অসম্ভব।”

শিব। “এ কি অসাধারণ ব্রত জানি না; কিন্তু দিবসে একদিনও আপনার সাক্ষাৎ পাইলাম না; রজনীযোগে অন্ধকারে এইরূপ রক্তচন্দনাবৃত হইয়া জটাধারণ করিয়া এক একবার দেখা দেন, দুই একটী বাক্যে আমার হৃদয় পর্য্যন্ত আলোড়িত করেন, পুনরায় কোথায়, চলিয়া

যান আর দেখিতে পাই না! সীতাপতি! এ কি কঠোর ব্রতধারণ করিয়াছেন?"

সীতা। "সমস্ত এক্ষণে কিরূপে বিস্তার করিয়া বলিব, সাধনের একটী অঙ্গ এই যে, দিবসে রাজদর্শন নিষিদ্ধ!"

শিব। "ভাল, এ ব্রত কি উদ্দেশ্যে ধারণ করিয়াছেন?"

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া সীতাপতি বলিলেন—"আমার ললাটে একটী অমঙ্গল লিখন আছে,—আমার ইষ্টদেবতা, যাঁহাকে আমি বাল্যকাল হইতে প্রাণের সহিত পূজা করিয়াছি, যাঁহার নাম জপ করিয়া জীবন দিতে আমি আনন্দ বোধ করিব, বিধির নির্ব্বন্ধে তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট! সেই অসন্তোষ খণ্ডনার্থ এই ব্রতধারণ করিয়াছি।"

শিব। "এ অমঙ্গল কে গণনা করিয়া আপনাকে জানাইল? কে বা আপনাকে অমঙ্গল খণ্ডনার্থ এ ব্রত ধারণ করিতে বলিল?"

সীতা। "কার্য্যবশতঃ আমি স্বয়ংই প্রথমটী জানিতে পারিলাম; ঈশানী-মন্দিরে একজন সতী সাধ্বী যোগিনী আমাকে এই ব্রতধারণ করিবার আদেশ করিয়াছেন। যদি সফল হই, তবে সে ভগিনীসম স্নেহময়ীর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিব; যদি কৃতার্থ না হই, তবে এ অকিঞ্চিৎকর জীবন ত্যাগ করিব। যাঁহার সন্তোষার্থ জীবনধারণ করিতেছি, তিনি অসন্তুষ্ট থাকিলে এ জীবনে আবশ্যক কি?"

শিবজী দেখিলেন, গোস্বামীর নয়নে জলবিন্দু,—তাঁহার নিজের চক্ষুও শুষ্ক রহিল না; বলিলেন—

"সীতাপাতি! যাহা বলিলেন যথার্থ; যাহার জন্য প্রাণপণ করি, তাঁহার তিরস্কার, তাঁহার অসন্তোষ অপেক্ষা জগতে মর্ম্মভেদী দুঃখ আর নাই।"

সীতা। "প্রভু! কি এ যাতনা কখনও ভোগ করিয়াছেন?"

শিব। "জগদীশ্বর আমাকে মার্জ্জনা করুন, আমি একজন নির্দ্দোষী বীরপুরুষকে এই যাতনা দিয়াছি;—সে বালকের কথা মনে হইলে এখনও আমার সময়ে সময়ে হৃদয়ে বেদনা হয়।"

প্রায় উদ্বেগরুদ্ধকণ্ঠে সীতাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাঁহার নাম কি?"

শিবজী বলিলেন, "রঘুনাথজী হাবেলদার!"

ঘরের দীপ সহসা নির্ব্বাণ হইল।

শিবজী প্রদীপ জ্বালিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় অতি কষ্টোচ্চারিতস্বরে সীতাপতি বলিলেন, "দীপ অনাবশ্যক,—বলুন,—শ্রবণ করিতেছি!"

শিব। "আর কি বলিব! তিন বৎসর অতীত হইয়াছে সেই বালকবেশী বীরপুরুষ আমার নিকট আইসে ও সৈনিকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহার বদনমণ্ডল উদার; সীতাপতি! আপনারই ন্যায় তাহার উন্নত ললাট ও উজ্জ্বল নয়ন ছিল। বালকের বয়স আপনা অপেক্ষা অল্প; আপনার ন্যায় বুদ্ধির প্রখরতা ছিল না, কিন্তু সেই উন্নত হৃদয়ে আপনার ন্যায়ই দুর্দ্দমনীয় বীরত্ব ও অকুতোভয়তা সর্ব্বদা বিরাজ করিত! আপনার বলিষ্ঠ উন্নত দেহ যখন দেখি,—আপনার পরিষ্কার কণ্ঠস্বর যখন শুনি, আপনার বীরোচিত বিক্রম যখন আলোচনা করি, সেই বালকের কথা সর্ব্বদাই হৃদয়ে জাগরিত হয়।"

"তাহার পর?"

"সেই বালককে যে দিন প্রথম দেখিলাম, সেই দিন প্রকৃত বীর বলিয়া চিনিলাম; সেই দিন আমার নিজের একখানি অসি তাহাকে দান করিলাম;—রঘুনাথ সে অসির অবমাননা করে নাই। বিপদের সময় সর্ব্বদা আমার ছায়ার ন্যায় নিকটে থাকিত, যুদ্ধের সময় দুর্দ্দমনীয় তেজে শত্রু-রেখা ভেদ করিয়া, মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া, সিংহনাদে অগ্রসর হইত! এখনও বোধ হয় তাহার সেই বীর আকৃতি, সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ, সেই উজ্জ্বল নয়ন আমি দেখিতে পাইতেছি?"

"তাহার পর?"

"এক যুদ্ধে আমার জীবনরক্ষা করিয়াছিল, অন্য এক যুদ্ধে তাহারই বিক্রমে দুর্গজয় হইয়াছিল, কত যুদ্ধে আপন অসাধারণ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল!"

"তাহার পর?"

"আর জিজ্ঞাসা করেন কি জন্য; আমি একদিন ভ্রমে পতিত হইয়া সেই চিরবিশ্বাসী অনুচরকে অবমাননা করিয়া কার্য্য হইতে দূর করিয়া দিলাম; শেষ পর্য্যন্তও রঘুনাথ একটীও কর্কশ কথা উচ্চারণ করে নাই; যাইবার সময়ও আমার দিকে মস্তক নত করিয়া চলিয়া গেল।" শিবজীর কণ্ঠরুদ্ধ হইল, নয়ন দিয়া অশ্রু বহিয়া পড়িতে লাগিল।

অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিতে পারিলেন না; অনেকক্ষণ পরে সীতাপতি বলিলেন—

"আক্ষেপের কারণ কি? দোষীর দণ্ডই রাজধর্ম্ম।"

শিব। "দোষী! রঘুনাথের উন্নত চরিত্রে দোষ স্পর্শে না, আমি কি কুক্ষণে ভ্রান্ত হইলাম জানি না। রঘুনাথের যুদ্ধস্থানে আসিতে বিলম্ব

হইয়াছিল, আমি তাহাকে বিদ্রোহী মনে করিলাম। মহানুভব জয়সিংহ পরে এবিষয় অনুসন্ধান করিয়াছিলেন,—জানিয়াছেন যে তাঁহার একজন পুরোহিতের নিকট রঘুনাথ যুদ্ধপূর্ব্বে আশীর্ব্বাদ লইতে গিয়াছিল, সেই-জন্যই বিলম্ব হইয়াছিল। নির্দ্দোষীকে আমি অবমাননা করিয়াছিলাম, শুনিয়াছি সেই অবমাননায় রঘুনাথ প্রাণত্যাগ করিয়াছে। যুদ্ধে সে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, আমি তাঁহার প্রাণবিনাশ করিয়াছি।"

শিবজীর কথা সাঙ্গ হইল; তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন; অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পরে ডাকিলেন—"সীতাপতি!"

কোনও উত্তর পাইলেন না। কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া প্রদীপ জ্বালিলেন,—সীতাপতি ঘরের মধ্যে নাই! সীতাপতি গোস্বামী সহসা অদৃশ্য হইলেন কি জন্য? সীতাপতি গোস্বামী কে?

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

আরংজীব।

"আপনি কাটারি মারি আপনার পায়।
অহঙ্কার ক'রে ডিঙ্গা ডুবালি দরিয়ায়॥
বুদ্ধিমান হ'য়ে জ্ঞান হারালি হতভাগা।
শিরে কৈলে সর্পাঘাত কোথা বাঁধ্‌বি তাগা॥

*　　*　　*　　*

সর্ব্বশাস্ত্র পড়ি বেটা হলি হতমূর্খ।
ব'লে কথা বুঝিস্‌ নাহি এই বড় দুঃখ॥"

কীর্ত্তিবাস ওঝা।

পরদিন প্রায় এক প্রহর বেলার সময় শিবজীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, জাগরিত হইয়াই রাজপথে একটী গোলযোগ শুনিলেন, উঠিয়া গবাক্ষ দিয়া নিম্নদিকে চাহিলেন, যাহা দেখিলেন তাহাতে চকিত ও স্তম্ভিত হইলেন,—

দেখিলেন বাটীর পশ্চাতে, দুই পার্শ্বে, সম্মুখদ্বারে অস্ত্রহস্তে প্রহরীগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বিশেষ পরিচয় না পাইলে বাহিরের লোককে গৃহে প্রবেশ করিতে দিতেছে না, গৃহের লোককে বাহিরে যাইতে দিতেছে না।

দেখিয়া সীতাপতির কথা স্মরণ হইল, কল্য তিনি পলাইতে পারিতেন, অদ্য আরংজীবের বন্দী!

তখন বিশেষ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; জানিলেন যে, তিনি সম্রাটের নিকট স্বদেশ যাইবার প্রার্থনা করিয়া অবধি আরংজীবের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল, সেই সন্দেহ প্রযুক্তই সম্রাট্ নগরের কোত-ওয়ালকে আদেশ করিয়াছিলেন, যে শিবজীর বাটীর চতুর্দ্দিকে দিবারাত্র প্রহরী থাকিবে, শিবজী বাটী হইতে কোথাও যাইলে সেই লোক সঙ্গে সঙ্গে যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিবে। শিবজী তখন বুঝিতে পারিলেন যে, হিতৈষী সীতাপতি গোস্বামী গণনা দ্বারা বা কোনও অনুসন্ধানে আরংজীবের এই আদেশের কথা জানিতে পারিয়া পূর্ব্বেই শিবজীর পলায়নের সমস্ত আয়োজন করিয়া রজনী দ্বিপ্রহরের সময় সংবাদ দিতে আসিয়াছিলেন। মনে মনে সীতাপতিকে সহস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

আরংজীবের কপটাচারিতা এতদিনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। প্রথমে শিবজীকে বহু সমাদরপূর্ব্বক পত্র লিখিয়া দিল্লীতে আহ্বান করিলেন,—শিবজী আসিলে তাঁহাকে রাজসভায় অবমাননা করিলেন, পরে রাজসভায় যাইতে নিষেধ করিলেন, তৎপরে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে নিষেধ করিলেন, তৎপরে প্রকৃত বন্দী করিলেন। কোন কোন অজগর সর্প গো-মহিষাদি ভক্ষণ করিবার পূর্ব্বে যেরূপ আপন দীর্ঘ শরীর ভক্ষ্যের চতুর্দ্দিকে জড়াইয়া জড়াইয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে, পরে ইচ্ছানুসারে দংশন করে, ক্রূর আরংজীবও সেইরূপ কপটতাজালে শিবজীকে ক্রমে সম্পূর্ণ অধীন করিয়া পরে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। মানস-চক্ষে অতীত ও বর্ত্তমান সমুদায় ঘটনা মুহূর্ত্তমধ্যে দৃষ্টি করিয়া শিবজী শত্রুর নিগূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন, বুঝিয়া রোষে অভিমানে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। দ্রুত পদবিক্ষেপে সেই গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার অধরোষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপিত রহিয়াছে, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। অনেকক্ষণ পর অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন—

"আরংজীব! শিবজীকে এখনও জান না; চতুরতায় আপনাকে অদ্বিতীয় মনে কর, কিন্তু শিবজীও সে বিদ্যায় বালক নহে। * * এই ঋণ একদিন পরিশোধ করিব,—দাক্ষিণাত্য হইতে হিন্দুস্থান পর্য্যন্ত সমরাগ্নি প্রজ্জলিত হইবে!"

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্তকে ডাকাইলেন। প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রী উপস্থিত হইলেন, শিবজীর আজ্ঞায় সম্মুখে উপবেশন করিলেন।

শিবজী বলিলেন—"পণ্ডিতপ্রবর! আপনি আরংজীবের খেলা দেখিতেছেন;—এই খেলা আমাদেরও খেলিতে হইবে; আপনার প্রসাদে শিবজী এ খেলায় অপরিপক্ক নহে,—খেলিবে।

"অদ্য আমরা বন্দী হইয়াছি, আমি কল্য রজনীতে ইহার সংবাদ পাইয়াছিলাম; কিন্তু অনুচরবর্গকে পূর্ব্বে পরিত্রাণ না করিয়া আমার আত্মপরিত্রাণের ইচ্ছা নাই, সে বিষয়ে আপনার উপদেশ কি?"

ন্যায়শাস্ত্রী অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—"আপনার অনুচরদিগের স্বদেশগমনের জন্য সম্রাটের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করুন, এক্ষণে আপনাকে বন্দী করিয়াছেন, আপনার অনুচরসংখ্যা যত হ্রাস হয় তাহাতে সম্রাট্‌ আহ্লাদিত ভিন্ন দুঃখিত হইবেন না। আমি বিবেচনা করি, অনুমতি চাহিলেই পাইবেন।"

শিবজী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন—"মন্ত্রিবর, আপনার পরামর্শই শ্রেয়ঃ, আমারও বোধ হয় ধূর্ত্ত আরংজীব এবিষয়ে আপত্তি করিবেন না।"

সেই মর্ম্মে একখানি আবেদনপত্র প্রস্তুত হইল; শিবজী যাহা মনে করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল; শিবজীর অনুচরেরা সকল দিল্লী হইতে প্রস্থান করিবে শুনিয়া সম্রাট্‌ আহ্লাদিত হইয়া তাহাদিগের সকলকে এক একখানি অনুমতিপত্র দান করিলেন। শিবজী কয়েক দিন মধ্যে সেই সমস্ত অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইলেন, মনে মনে বলিলেন,—

"মূর্খ! শিবজীকে বন্দী রাখিবেন? এখন একজন অনুচরের বেশ ধরিয়া ইহার মধ্যে একখানি অনুমতি পত্র লইয়া দিল্লীত্যাগ করিলে কি করিতে পার? যাহা হউক অনুচরবর্গ এখন নিরাপদে যাইবে, শিবজী আপনার জন্য উপায় উদ্ভাবনা করিতে সক্ষম।"

* * * *

পাঠক! যিনি অসাধারণ চতুরতা, বুদ্ধিকৌশল ও রণনৈপুণ্যে ভ্রাতৃগণকে পরাস্ত করিয়া, বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করিয়া দিল্লীর ময়ূরসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, যিনি কাশ্মীর হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের অধিপতি হইয়াও পুনরায় দাক্ষিণাত্যদেশ জয় করিয়া সমগ্র ভারতের একাধীশ্বর হইবার মহৎসঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যিনি অদ্য চতুরতা দ্বারা মহাবীর শিবজীকেও বন্দী করিয়াছিলেন, চল একবার সেই ক্রুর, কপটাচারী, অথচ সাহসী, দূরদর্শী, আরংজীবের প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মনের ভাবগুলি নিরীক্ষণ করি।

রাজকার্য্য সমাধা হইয়াছে, আরংজীব "গোসলখানা" নামক সভা-গৃহের পার্শ্বস্থ একটী ঘরে উপবেশন করিয়া আছেন। সেটী মন্ত্রীদিগের সহিত গুপ্ত পরামর্শের স্থল, কিন্তু অদ্য আরংজীব একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, কখন কখন ললাটে গভীর চিন্তার রেখা দেখা যাইতেছে, কখন বা উজ্জ্বল নয়নে ও কম্পিত অধরে রোষ বা অভিমান বা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, কখন বা মন্ত্রণা-সফলতাজনিত সন্তোষে সেই ওষ্ঠপ্রান্ত হাস্যরেখায় অঙ্কিত হইতেছে। সম্রাট্ কি করিতেছেন? আপন বুদ্ধিবলে সমস্ত হিন্দুস্থানের একাধীশ্বর হইয়াছেন সেই কথা স্মরণ করিতেছেন? হিন্দুধর্ম্মের আরও অবমাননা অথবা রাজপুত বা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আরও পদদলিত করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন? শিবজীকে বন্দী করিয়া মনে মনে উল্লাসিত হইতেছেন? জানি না সম্রাটের কি চিন্তা, তাঁহার সভার মধ্যে, ভারতবর্ষের মধ্যে কোনও লোক, কোনও সেনাপতি, কোনও মন্ত্রীকে সন্দিগ্ধমনা আরংজীব কখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না,—মনের ভাব বলিতেন না। নিজের বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে সকলকে পুত্তলিকার ন্যায় চালাইবেন, সমগ্রদেশ সুন্দর শাসন করিবেন, আরংজীবের এই উদ্দেশ্য। বাসুকী যেরূপ নিজ মস্তকে এই জগৎ ধারণ করিতেছেন, বিশ্রাম চাহেন না, কাহারও সহায়তা চাহেন না, আরংজীব নিজের অসাধারণ মানসিক বলে ভারতে সাম্রাজ্যের শাসনকার্য্য একাকী বহন করিবার মানস করিয়াছিলেন, কাহারও পরামর্শ চাহিতেন না।

অনেকক্ষণ উপবেশন করিয়াছিলেন, এরূপ সময় একজন সৈনিক তস্‌লীম করিয়া বলিল—

"সম্রাটের জয় হউক! জহাঁপানা! দানেশমন্দ নামক আপনার সভাসদ্ আপনার সাক্ষাৎ অভিলাষী, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন।"

সম্রাট্ দানেশমন্দ্‌কে আসিতে আজ্ঞা দিলেন, চিন্তারেখাগুলি ললাট হইতে অপসৃত করিলেন, সুন্দর হাস্য মুখে ধারণ করিলেন।

দানেশমন্দ্ আরংজীবের মন্ত্রী ছিলেন না, রাজকার্য্যে পরামর্শ দিতে সাহস করিতেন না। তবে তিনি পারস্য ও আরবী ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত, সুতরাং সম্রাট্ তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করিতেন, কখন কখন কোন কোন কথায় বাক্যচ্ছলে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। উদারচেতা দানেশমন্দ্ প্রায়ই উদার সরল পরামর্শ দিতেন; আরংজীবের জ্যেষ্ঠ দারা যখন বন্দী হয়েন, দানেশমন্দ্ তাঁহার প্রাণরক্ষার পরামর্শই দিয়াছিলেন। এবম্বিধ পরামর্শ কুটীল আরংজীবের মনোগত হইত না,—আরংজীব

তাঁহাকে অল্পবুদ্ধি ও অদূরদর্শী বলিয়া মনে করিতেন,—তথাপি তাঁহার বিদ্যা ও ধন ও পদ-মর্য্যাদার জন্য সম্যক্ আদর করিতেন। সরলস্বভাব বৃদ্ধ দানেশমন্দ্ সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিয়া উপবেশন করিলেন।

বলিলেন—

"এ সময়ে জহাঁপানার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসা দাসের ধৃষ্টতা,—কেননা এ সময় সম্রাট্ রাজকার্য্যের পর বিশ্রাম করেন। তবে যে আসিয়াছি, কেবল আপনি অনুগ্রহ করেন এই নিমিত্ত; পারস্য কবি সুন্দর লিখিয়াছে, 'সূর্য্যের দিকে জগতের সকল প্রাণী সকল সময়ে চাহিয়া দেখে, সূর্য্য কি তাহাতে বিরক্ত বা কিরণদানে বিরত হন'?"

সম্রাট্ সহাস্যবদনে বলিলেন, "দানেশমন্দ্! অন্যের সম্বন্ধে যাহাই হউক, আপনি সর্ব্বসময়েই সমাদরের পাত্র।"

এইরূপ মিষ্টালাপ ক্ষণেক হইলে পর দানেশমন্দ্ অন্য কথা আনিলেন; বলিলেন—

"জহাঁপানা! "আলমগীর" নাম সার্থক করিবেন! সমস্ত হিন্দুস্থান আপনার পদতলে রহিয়াছে, এক্ষণে দাক্ষিণাত্য জয় করিতেও বড় বিলম্ব নাই।"

ঈষৎ হাস্য করিয়া আরংজীব বলিলেন—

"কেন, সে বিষয়ে আমার কি উদ্যোগ দেখিলেন?"

দানে। "দক্ষিণদেশের প্রধান শত্রু আপনার পদতলে।"

আরং। "শিবজীর কথা বলিতেছেন? হাঁ ইন্দুর কলে পড়িয়াছে!" তৎক্ষণাৎ আপন মন্ত্রণা গোপনার্থে বলিলেন, "দানেশমন্দ্! আপনি আমাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই জানেন, দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই সম্মান করা আমার উদ্দেশ্য। শিবজী ধূর্ত্ত বিদ্রোহী হউক, যোদ্ধা বটে, তাহাকে সম্মানার্থই দিল্লীতে আনিয়াছিলাম। রাজসভায় সমুচিত সম্মান করিয়া তাহাকে বিদায় দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সে এরূপ মূর্খ যে, রাজসভায় অসদাচরণ করিয়াছিল। আমি তাহাকে বন্দী করিতে বা তাহার প্রাণ লইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, সুতরাং অন্য শাস্তি না দিয়া কেবল রাজসভায় আসিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন শুনিতেছি, যে দিল্লীর মধ্যেই সে অনেক সন্ন্যাসী ও বিদ্রোহীর সহিত পরামর্শ করে, সুতরাং কোনও রূপ অনিষ্ট না কবিতে পারে এইজন্যই কোতওয়ালকে দৃষ্টি রাখিতে কহিয়াছি। কয়েকদিন পর সম্মানপূর্ব্বক বিদায় দিব।"

দানে। "সম্রাটের এ আদেশ শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম।"

আরং। "কেন?" আরংজীবের মুখে সেইরূপ হাস্য,—কিন্তু তীক্ষ্ণ-নয়নে দানেশমন্দের মুখের দিকে চাহিতেছিলেন, তাঁহার অন্তরের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

উদারচেতা দানেশমন্দ্ বলিলেন, "সম্রাট্‌কে পরামর্শ দি আমার কি সাধ্য, কিন্তু জহাঁপানা! যদি শিবজীর প্রতি দয়ালু আচরণ না করিতেন, যদি তাহাকে চিরকালের জন্য বন্দী করিতেন, তাহা হইলে মন্দ লোকে নানারূপ অখ্যাতি করিত, বলিত, 'যে শিবজীকে আহ্বান করিয়া রুদ্ধ করা ন্যায়সঙ্গত নহে।"

আরংজীব ঈষৎ কোপ সঙ্গোপন করিয়া সেইরূপ হাস্যবদনে বলিলেন—

"দানেশমন্দ্! মন্দ লোকের কথায় দিল্লীশ্বরের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, তবে সুবিচার ও দয়া সিংহাসনের শোভন, সুবিচার করিয়া শিবজীর দোষের জন্য তাহাকে সতর্ক করিয়া দিব, পরে দয়াপ্রকাশে তাহাকে সসম্মানে বিদায় দিব।"

দানে। "এরূপ সদাচরণেই জহাঁপানার প্রপিতামহ আকবর দেশ-শাসন করিয়াছিলেন, এরূপ সদাচরণে আপনারও খ্যাতি ও ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে।"

আরং। "সে কিরূপ?"

দানে। "সম্রাটের অগোচর কিছুই নাই। দেখুন, আকবরশাহ যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন সমস্ত সাম্রাজ্য শত্রুসঙ্কুল ছিল; রাজস্থানে, বিহারে, দাক্ষিণাত্যে, সর্ব্বস্থানেই বিদ্রোহী ছিল, দিল্লীর সন্নিকট স্থানও শত্রুশূন্য ছিল না। তাঁহার মৃত্যুকালে সমস্ত সাম্রাজ্য নিঃশত্রু ও নির্ব্বিরোধ হইয়াছিল,—যাহারা পূর্ব্বে পরম শত্রু ছিল, সেই রাজপুতেরাই বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিয়া কাবুল হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত দিল্লীশ্বরের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করে! এ জয়সাধন কিরূপে হইয়াছিল? কেবল বাহুবলে? কেবল সাহসে? তৈমুরের বংশে কাহারও সাহস বা বাহুবলের অভাব নাই,—তবে আর কেহ এরূপ জয়সাধন করিতে পারেন নাই কি জন্য? না জহাঁপানা! কেবল সদাচরণেই এরূপ জয়লাভ হইয়াছিল। তিনি শত্রুদিগের প্রতি সদাচরণ করিতেন, অধীন হিন্দুদিগের বিশ্বাস করিতেন, হিন্দুরাও এবম্বিধ সম্রাটের বিশ্বাসভাজন হইবার চেষ্টা করিত, মানসিংহ, টোডরমল্ল, বীরবল প্রভৃতি হিন্দুগণই মুসলমান সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ হইয়াছিলেন। উত্তম ব্যক্তিকেও অবিশ্বাস করিলে সে ক্রমে অধম হইয়া যায়, অধম কাফেরের প্রতিও সদাচরণ ও

বিশ্বাস করিলে তাহারা ক্রমে বিশ্বাসযোগ্য হয়; মানবের এই প্রকৃতি,—শাস্ত্রের এই লিখন। আমাদের দক্ষিণদেশের যুদ্ধে শিবজী অনেক সহায়তা করিয়াছেন; জহাঁপানা! তাঁহাকে সম্মান করিলে তিনি যতদিন জীবিত থাকিবেন, দক্ষিণদেশে মোগল সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ থাকিবেন!"

দানেশমন্দ্ কিজন্য সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, পাঠক বোধ হয় এতক্ষণে বুঝিয়াছেন। দিল্লীশ্বর শিবজীকে আহ্বান করিয়া বন্দী করায় জ্ঞানী ও সদাচারী মুসলমান সভাসদ্ মাত্রেই লজ্জিত হইয়াছিলেন; দানেশমন্দ্‌কে সম্রাট্ সমাদর করিতেন, তিনি কোনরূপে কথাচ্ছলে সম্রাটের কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ উদ্দেশ্য তাঁহাকে দেখাইয়া দিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। শিবজীর প্রতি ভদ্রাচরণ করিয়া সম্রাট্ তাঁহাকে স্বদেশে যাইতে দেন, দানেশমন্দ্ এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন। দানেশমন্দ্ জানিতেন না যে হস্তদ্বারা প্রকাণ্ড ভূধরকে বিচলিত করা যায়, কিন্তু পরামর্শদ্বারা আরংজীবের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও গভীর উদ্দেশ্যগুলি বিচলিত করা যায় না।

দানেশমন্দের উদার সারগর্ভ কথাগুলি কুটিল আরংজীবের নিকট অতিশয় নির্ব্বোধের কথার ন্যায় বোধ হইল। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—

"হাঁ, দানেশমন্দ্ যেরূপ শাস্ত্রবিশারদ, মানব-হৃদয়ও সেইরূপ পাঠ করিয়াছেন, দেখিতেছি। দক্ষিণদিকে শিবজী স্তম্ভ স্থাপিত করিবেন, রাজস্থানে ত বিদ্রোহীগণ স্তম্ভস্থাপন পূর্ব্বেই করিয়াছে; কাশ্মীর পুনরায় স্বাধীন করিয়া দিব ও বঙ্গদেশে পাঠানদিগকে পুনরায় সমাদরপূর্ব্বক আহ্বান করিব,—এই চতুঃস্তম্ভের উপর মোগল সাম্রাজ্য সুন্দর ও সুদৃঢ় স্থাপিত হইবে!"

দানেশমন্দের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "সম্রাটের পিতা দাসকে অনুগ্রহ করিতেন, সম্রাট্‌ও যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন, সেইজন্য কখন কখন মনের কথা বলি,—নচেৎ জহাঁপানাকে পরামর্শ দি, এরূপ বিদ্যাবুদ্ধি নাই।"

আরংজীব দানেশমন্দ্‌কে নির্ব্বোধ সরল জানিয়াও তাঁহার সেই সরলতার জন্য তাঁহাকে ভাল বাসিতেন,— তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছেন দেখিয়া বলিলেন—

"দানেশমন্দ্! আমার কথার দোষ গ্রহণ করিও না। আকবরশাহ বুদ্ধিমান ছিলেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু কাফের ও মুসলমানকে সমানচক্ষে

দেখিয়া তিনি কি ধর্ম্ম-সঙ্গত আচরণ করিয়াছিলেন? আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি,—আমাদের সামান্য দৈনিক কার্য্য সম্পাদনকালেও দেখিতে পাই যে, আপনি করিলে যেরূপ কার্য্য হয়, পরের হস্তে সেরূপ হয় না। এরূপ বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসনকার্য্যও সেইরূপ পরের উপর বিশ্বাস না করিয়া স্বয়ং সম্পাদন করিলে কি ভাল হয় না? নিজ বাহুবলে যদি সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন করিতে সমর্থ হই, কিজন্য ঘৃণিত কাফেরদিগের সহায়তা গ্রহণ করিব? আরংজীব বাল্যাবস্থা অবধি নিজ অসির উপর নির্ভর করিয়াছে, নিজ অসিদ্বারা সিংহাসনের পথ পরিষ্কার করিয়াছে, নিজ অসিদ্বারা দেশ-শাসন করিবে, কাহারও সহায়তা চাহিবে না, কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না।"

দানে। "জহাঁপানা! স্বহস্তে দৈনিক কার্য্য নির্ব্বাহ করা যায়, কিন্তু এরূপ সাম্রাজ্য শাসন কি সহায়তা ভিন্ন সম্পাদিত হয়? বঙ্গদেশ, দক্ষিণ-দেশ প্রভৃতি স্থানে কি সর্ব্বসময়ে আপনি বর্ত্তমান থাকিতে পারেন? অন্য কাহাকেও নিযুক্ত না করিলে কার্য্য কিরূপে সম্পাদিত হইবে?"

আরং। "অবশ্য ভৃত্য নিযুক্ত করিব, কিন্তু তাহারা চিরকাল ভৃত্যের ন্যায় থাকিবে, যেন প্রভু হইতে না চাহে! অদ্য আমি যাহাকে অধিক ক্ষমতা দিব, কল্য সে সেই ক্ষমতা আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে পারে; অদ্য যাহাকে অধিক বিশ্বাস করিব, কল্য সে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে। এ অবস্থায় ক্ষমতা ও বিশ্বাস অন্যে ন্যস্ত না করিয়া আপনাতে রাখাই ভাল। দানেশমন্দ! তুমি যখন অশ্বে আরোহণ কর, অশ্বকে বল্গা ও গুণের দ্বারা সম্পূর্ণ বশীভূত কর, যেদিকে ফিরাও সেইদিকে যাইতে বাধ্য হয়। সম্রাটেরও সেইরূপে শাসন করা উচিত, কাহাকেও বিশ্বাস করিও না, কাহারও হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত করিও না, সমস্ত ক্ষমতা নিজহস্তে রাখিবে, কর্ম্মচারী ও সেনাপতিদিগকে সম্পূর্ণরূপে বশীকরণপূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট কার্য্যগ্রহণ করিবে।"

দানে। "প্রভু! মনুষ্য ত অশ্ব নহে, তাহাদিগের মহত্ত্ব আছে, নিজ নিজ সম্মান-জ্ঞান আছে।"

আরং। "মনুষ্য অশ্ব নহে তাহা জানি; সেইজন্যই অশ্বকে বল্গাদ্বারা চালাই, মনুষ্যকে উন্নতির আশা ও শাস্তির ভয়ের দ্বারা চালাই। যে উত্তম কার্য্য করিবে তাহাকে পুরস্কার দিব, যে অধম কার্য্য করিবে তাহাকে শাস্তি দিব। পুরস্কার-আশা ও শাস্তি-ভয়ে সকলে কার্য্য করিবে; ক্ষমতা, বিশ্বাস, মন্ত্রণা আরংজীব নিজহৃদয়ে ও নিজ বাহুবলে ন্যস্ত রাখিবে।"

দানে। প্রভু! পুরস্কার-আশা ও শাস্তি-ভয় ভিন্ন মনুষ্যহৃদয়ে ত অন্য ভাবও আছে। মনুষ্যের মহত্ত্ব আছে, উচ্চাভিলাষ আছে, নিজ সম্মান-জ্ঞান আছে! যে শাস্তিভয়ে কার্য্য করে, সে কোনরূপে কেবল কার্য্য সমাপ্ত করিয়া নিরস্ত থাকে; কিন্তু যাহাকে আপনি সম্মান করেন, সমাদর করেন, ক্ষমতা দিয়া বিশ্বাস করেন, সে আপনাকে সেই সমাদর ও বিশ্বাসের উপযোগী প্রমাণ করিবার জন্য প্রভুকার্য্যে নিজের ধন, মান, প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিয়াছে, এরূপ উদাহরণও শাস্ত্রে দেখা যায়।"

আরংজীব সহাস্যে বলিলেন—

"দানেশমন্দ্‌! আমি তোমার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ নহি; কবিতায় যাহা লিখে তাহা বিশ্বাস করি না। মানবপ্রকৃতি আমার শাস্ত্র; মানবের মহত্ত্ব আমি অল্প দেখিয়াছি। শঠতা, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা অনেক দেখিয়াছি। সেই শাস্ত্র পাঠ করিয়া আমি নিজহস্তে ক্ষমতা রাখিতে শিখিয়াছি, সেইজন্য কাফেরদিগের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করিয়াছি, বিদ্রোহোন্মুখ রাজপুতদিগের উপর কঠোর শাসন করিব, মহারাষ্ট্রদেশ নিঃশত্রু করিব, বিজয়পুর ও গলখন্দ জয় করিব, হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত আরংজীব একাকী শাসন করিবে, কাহারও সহায়তা লইবে না। আলমগীর নিজের নাম সার্থক করিবে।"

উৎসাহে সম্রাটের নয়ন উজ্জ্বল হইয়াছিল, তিনি মনের গভীর অভীষ্ট কখন কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না, অদ্য কথায় কথায় অনেকটা হঠাৎ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি দানেশমন্দের উদার চরিত্র জানিতেন, তাঁহার নিকট দুই একটী কথা কহিলে কোনও হানি নাই, জানিতেন।

ক্ষণেক পর ঈষৎ হাস্য করিয়া আরংজীব বলিলেন, "সরলস্বভাব বন্ধু! অদ্য আমার অভীষ্ট ও মন্ত্রণা কিছু কিছু বুঝিতে পারিলে?"

তীক্ষ্ণবুদ্ধি আরংজীব যদি আপনার গভীর মন্ত্রণা কিয়দংশ ত্যাগ করিয়া সেইদিন সরল দানেশমন্দের সরল পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্য বোধ হয় এত শীঘ্র ধ্বংস প্রাপ্ত হইত না!

এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন এরূপ সময়ে সৈনিক পুনরায় আসিয়া সংবাদ দিল—

"রামসিংহ জহাঁপানার সাক্ষাৎ অভিলাষী, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন।"

সম্রাট্‌ আদেশ করিলেন,—"আসিতে দাও।

ক্ষণেক পর রাজা জয়সিংহের পুত্র রাজসদনে উপস্থিত হইলেন।

রামসিংহের সহিত পাঠকের পূর্ব্বেই পরিচয় হইয়াছে। আকৃতি দীর্ঘ ও উন্নত, ললাট প্রশস্ত, নয়নযুগল উজ্জ্বল ও তেজঃপূর্ণ, সমস্ত অবয়ব যৌবন-কান্তিতে শোভিত, যৌবনবলে বলিষ্ঠ। যুবক ধীরে ধীরে বলিলেন—

"সম্রাট্‌কে এরূপ সময়ে সাক্ষাৎ করা মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে অবিধেয়, কিন্তু পিতার নিকট হইতে অতিশয় গুরু সংবাদ আসিয়াছে, প্রভুকে জানাইতে আসিলাম।"

আরং। "আপনার পিতার নিকট আমরাও অদ্য পত্র পাইয়াছি ও সমস্ত সংবাদ অবগত আছি।"

রাম। "তবে সম্রাট্‌ অবগত আছেন যে পিতা সমস্ত শত্রু পরাজিত করিয়া, শত্রুদেশ বিদীর্ণ করিয়া রাজধানী বিজয়পুর আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের সৈন্যের অল্পতাবশতঃ সে নগর এপর্য্যন্ত হস্তগত করিতে পারেন নাই, বিশেষ গলখন্দের সুলতান বিজয়পুরের সহায়ার্থ নেকনাম খাঁ নামক সেনাপতিকে বহুসংখ্যক্ সৈন্যসমেত প্রেরণ করিয়াছেন।"

আরং। "সমস্ত অবগত হইয়াছি।"

রাম। "চতুর্দ্দিকে শত্রুবেষ্টিত হইয়া পিতা সম্রাটের আদেশে এখনও যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু এ যুদ্ধে জয় অসম্ভব, প্রভুর নিকট আর অল্পসংখ্যক্ সৈন্যের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।"

আরং। "আপনার পিতা বীরাগ্রগণ্য! তিনি নিজের সৈন্যে বিজয়পুর হস্তগত করিতে পারিবেন না?"

রাম। "মনুষ্যের যাহা সাধ্য, পিতা তাহা করিবেন; শিবজী পূর্ব্বে পরাস্ত হয়েন নাই, পিতা তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছেন; বিজয়পুর পূর্ব্বে আক্রান্ত হয় নাই, পিতা ততদূর যাইয়া সেই নগর আক্রমণ করিয়াছেন, এখন আপনার নিকট অল্পমাত্র সৈন্য-সহায়তা প্রার্থনা করিতেছেন। তাহা হইলেই সমস্ত কার্য্য শেষ হয়, দক্ষিণদেশে মোগলসাম্রাজ্য বিস্তৃত ও দৃঢ়ীভূত হয়।"

এরূপ অবস্থায় অন্য কোন সম্রাট্‌ সেই সহায়তা প্রেরণ করিয়া দাক্ষিণাত্যদেশবিজয়কার্য্য সমাধা করিতেন। আরংজীব আপনাকে বহু-দূরদর্শী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি মনে করিতেন, তিনি সে সহায়তা প্রেরণ করিলেন না। বলিলেন—

"রামসিংহ! আপনার পিতা আমাদের সুহৃদ্‌প্রবর, তাঁহার বিপদের কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি শোকাকুল হইলাম, তাঁহাকে পত্র লিখিবেন যে,

তিনি নিজের অসাধারণ বাহুবলে জয়সাধন করিবেন, সম্রাট্ দিবানিশি এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন; কিন্তু এখন দিল্লীতে সেনাসংখ্যা অতি অল্প, আমি সহায়তা প্রেরণ করিতে অক্ষম।”

রামসিংহ কাতরস্বরে বলিলেন, “জহাঁপানা! পিতা দিল্লীশ্বরের পুরাতন দাস, আপনার কালে, আপনার পিতার কালে অসংখ্য যুদ্ধে যুঝিয়াছেন, অনেক কার্য্যসাধন করিয়াছেন; দিল্লীশ্বরের কার্য্যসাধন ভিন্ন তাঁহার জীবনের অন্য উদ্দেশ্য নাই। এই ঘোর বিপদে আপনি কিঞ্চিৎ সাহায্য দান না করিলে তিনি বোধ হয় সসৈন্যে নিধনপ্রাপ্ত হইবেন।” রামসিংহের কণ্ঠরুদ্ধ হইল, তাঁহার নয়নে জলবিন্দু।

বালক! জলবিন্দুতে আরংজীবের গভীর উদ্দেশ্য, দৃঢ়মন্ত্রণা বিচলিত হয় না!

সে উদ্দেশ্য—সে মন্ত্রণা কি? রাজা জয়সিংহ অতিশয় ক্ষমতাশালী প্রতাপান্বিত সেনাপতি, তাঁহার অসংখ্য সৈন্য, বিস্তীর্ণ যশঃ, অনন্ত দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ! আজীবন তিনি নিষ্কলঙ্কে দিল্লীশ্বরের কার্য্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু এত ক্ষমতা কোন সেনাপতির থাকা বিধেয় নহে; সম্রাট এতদূর জয়সিংহকে বিশ্বাস করিতে পারেন না। এ যুদ্ধে যদি জয়সিংহ সার্থকতা লাভ করিতে না পারিয়া অবমানিত হয়েন, তবে সে প্রতাপ ও যশের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইবে। যদি সসৈন্যে বিজয়পুরসম্মুখে নষ্ট হয়েন, দিল্লীশ্বরের হৃদয়ের একটী কণ্টকোদ্ধার হইবে! ঊর্ণনাভের জালের ন্যায় আরংজীবের উদ্দেশ্যগুলি বহুবিস্তীর্ণ ও অব্যর্থ, অদ্য জয়সিংহ-কীট তাহাতে পড়িয়াছেন, উদ্ধার নাই।

জয়সিংহ বহুকালাবধি দিল্লীশ্বরের কার্য্যে জীবন পণ করিয়াছেন বটে, সেজন্য কি সূক্ষ্ম মন্ত্রণাজাল অদ্য ব্যর্থ হইবে?

জয়সিংহের উদারচরিত্র যুবকপুত্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতেছেন বটে, বালকের রোদনের জন্য কি দূরদর্শী সম্রাট উদ্দেশ্য ত্যাগ করিবেন?

দয়া মায়া প্রভৃতি সুকুমার মনোবৃত্তিসমূহ আরংজীব বিশ্বাস করিতেন না, নিজহৃদয়েও স্থান দিতেন না; আত্মপথ পরিষ্কারার্থ অদ্য একটী পতঙ্গ সরাইয়া ফেলিলেন, কল্য একজন সহোদর ভ্রাতাকে হনন করিলেন, উভয় কার্য্যই একই প্রকার ধীর নিরুদ্বেগ হৃদয়ে করিতেন! একদিন পিতা, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র আত্মীয়বর্গ সেই উন্নতিপথে পড়িয়াছিলেন, ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে সরাইয়া দিয়াছিলেন। পিতাকে মায়াবশতঃ জীবিত রাখেন

নাই, জ্যেষ্ঠভ্রাতা দারাকে ক্রোধবশতঃ হত্যা করেন নাই, সে সমস্ত বালকোচিত মনোবৃত্তি তাঁহার ছিল না।, পিতা জীবিত থাকিলে ভবিষ্যতে উদ্বেগের সম্ভাবনা নাই, আপন উদ্দেশ্যসাধনে কোন প্রতিবন্ধক হইবে না, তিনি জীবিত থাকুন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা জীবিত থাকিলে উদ্দেশ্যসাধনে প্রতিবন্ধক হইতে পারে; জল্লাদ! তাহাকে সরাইয়া সম্রাট আলমগীরের পথ পরিষ্কার করিয়া দাও!

মন্ত্রণাসাধনের জন্য অদ্য আবশ্যক যে জয়সিংহ সসৈন্যে হত হইবেন; তিনি ভাল কি মন্দ, বিশ্বাসী কি বিদ্রোহী, অনুসন্ধানে আবশ্যক নাই, তিনি সসৈন্যে মরিবেন! এই পরিচ্ছেদ-বিবৃতি সময়ের পর কয়েক মাসের মধ্যেই দিল্লীতে সংবাদ আসিল, অবমানিত, অকৃতার্থ জয়সিংহ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন!

অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রামসিংহ বলিলেন—

"প্রভু! আমার একটী যাচ্ঞা আছে।"

আরং। "নিবেদন করুন।"

রাম। "শিবজী যখন দিল্লী আগমন করিয়াছিলেন, পিতা তাঁহাকে বাক্যদান করিয়াছিলেন যে দিল্লীতে শিবজীর কোন আপদ ঘটিবে না।"

আরং। "আপনার পিতা সে কথা আমাদের অবগত করাইয়াছেন।"

রাম। "রাজপুতদিগের মধ্যে বাক্যদান করিয়া তাহা লঙ্ঘন হইলে অতিশয় নিন্দার বিষয়। পিতার প্রার্থনা ও দাসের প্রার্থনা যে প্রভু শিবজীর যে কোনও দোষ হইয়া থাকে, ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিন্।"

আরংজীব ক্রোধ সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "সম্রাটের যাহা উচিতকার্য্য সম্রাট্ তাহা করিবেন, সে বিষয়ে আপনি চিন্তিত হইবেন না।"

আরও ক্ষণেক দানেশমন্দের সহিত কথোপকথনের পর সম্রাট্ বেগম-মহলে যাইলেন, দানেশমন্দ ও রামসিংহ ক্ষুণ্ণমনে প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

শিবজী নামে দ্বিতীয় একটী কীট সম্রাটের সেই বিস্তীর্ণ মন্ত্রণাজালে পতিত হইয়াছেন; দানেশমন্দ্ ও রামসিংহ তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না!

জয়সিংহের যে দোষ, শিবজীরও সেই দোষ; শিবজীও সন্ধিস্থাপনাবধি প্রাণপণে দিল্লীর কার্য্য করিয়াছেন, নিজ সৈন্যদ্বারা অনেক দুর্গ দিল্লীর অধীনে আনিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারও বিপুল ক্ষমতা; আরংজীব কোনও

ভৃত্যের উপর বিপুল ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে পারেন না, কাহাকেও বিশ্বাস করেন না।

যাহাকে অবিশ্বাস করা যায়, তাহারা ক্রমে অবিশ্বাসের যোগ্য হয়। আরংজীবের জীবিতকালের মধ্যেই মহারাষ্ট্রীয়েরা ও দিল্লীর চিরবিশ্বস্ত রাজপুতেরা দিল্লীর বিরুদ্ধে যে ভীষণ যুদ্ধানল প্রজ্জলিত করিল, মোগল-সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া গেল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

পীড়া।

"দূরে গেল জটাজুট।"

মধুসূদন দত্ত।

শিবজীর অতিশয় সঙ্কটজনক পীড়া হইয়াছে, সমগ্র দিল্লীনগরে এ সংবাদ প্রচারিত হইল। দিবানিশি শিবজীর গৃহের গবাক্ষ ও দ্বার রুদ্ধ; দিবানিশি চিকিৎসক আসিতেছেন। এ ভীষণ রোগের উপশম সন্দেহস্থল, অদ্য যেরূপ রোগ বৃদ্ধি হইয়াছে কল্য পর্য্যন্ত জীবিত থাকা অসম্ভব। কখন কখন বা সংবাদ রাষ্ট্র হইতেছে যে শিবজী আর নাই! রাজপথ দিয়া বহুসংখ্যক লোক গমনাগমন করিত ও সেই রুদ্ধ গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিত, আশ্বারোহী সৈনিক ও সেনাপতিগণ ক্ষণেক অশ্ব থামাইয়া প্রহরীদিগের নিকট শিবজীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন; শিবিকারোহী রাজা বা মনসব্‌দার শিবজীর গৃহের সম্মুখে আসিয়া একবার উঠিয়া সেই-দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন; শিবজী কিরূপ আছেন, তিনি উদ্ধার পাইবেন কি না, তিনি কল্য পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবেন কি না, এইরূপ নানা কথা নগরবাসী সকলেই বাজারে, পথে, ঘাটে সর্ব্বসময়ে আন্দোলন করিত। আরংজীব সর্ব্বদাই শিবজীর রোগের সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন, তথাপি গৃহের চারিদিকে যে প্রহরী সন্নিবেশিত ছিল তাহা পূর্ব্বমত রাখিলেন। লোকের নিকট শিবজীর রোগের বিষয় আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন, মনে মনে সর্ব্বদাই ভাবিতেন, "যদি এই রোগেই শিবজীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার বিশেষ কোন নিন্দা না হইয়াই অনায়াসে কণ্টকোদ্ধার হইবে!"

সন্ধ্যাকাল সমাগত. এরূপ সময়ে একজন প্রাচীন সম্ভ্রান্ত মুসলমান হাকিম শিবির হইতে শিবজীর গৃহদ্বারের নিকট অবতীর্ণ হইলেন। প্রহরী-গণ জিজ্ঞাসা করিল, "কি উদ্দেশে শিবজীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন ?" হাকিম উত্তর করিলেন, "সম্রাটের আদেশ অনুসারে রোগীর চিকিৎসা করিতে আসিয়াছি।" সসম্মানে প্রহরীগণ পথ ছাড়িয়া দিল।

শিবজী শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার ভৃত্য সম্বাদ দিল, যে সম্রাট্ একজন হাকিম পাঠাইয়া দিয়াছেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী তৎক্ষণাৎ বিবেচনা করিলেন, কোনরূপ বিষপ্রয়োগের জন্য সম্রাট্ একাণ্ড করিতেছেন; ভৃত্যকে আদেশ করিলেন—

"হাকিমকে আমার সেলাম জানাইও ও বলিও হিন্দু কবিরাজে আমার চিকিৎসা করিতেছে, আমি হিন্দু, অন্যরূপ চিকিৎসা ইচ্ছা করি না। সম্রাটের এই অনুগ্রহের জন্য আমার কোটী কোটী ধন্যবাদ জানাইবেন।" কিন্তু ভৃত্য এই আদেশ লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবার পূর্ব্বেই হাকিম অনাহূত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

শিবজীর হৃদয়ে ক্রোধসঞ্চার হইল, কিন্তু তাহা সঙ্গোপন করিয়া অতি ক্ষীণ মৃদুস্বরে হাকিমকে অভ্যর্থনা করিলেন, ও শয্যাপার্শ্বে বসিতে আদেশ দিলেন। হাকিম উপবেশন করিলেন।

আকৃতি দেখিলে এরূপ লোকের প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ হইতে পারে না। বয়স অনেক হইয়াছে, অতি শুক্ল শ্মশ্রু লম্বিত হইয়া উরঃস্থল আবৃত করিয়াছে; মস্তকোপরি প্রকাণ্ড উষ্ণীষ, হাকিমের স্বর ধীর ও গম্ভীর। বলিলেন—

"মহাশয়! ভৃত্যকে যে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রুত হইয়াছি, আমার চিকিৎসা ইচ্ছা করেন না; তথাপি মানবজীবন রক্ষা করা আমাদের ধর্ম্ম, আমি স্বধর্ম্মসাধন করিব।"

শিবজী মনে মনে আরও ক্রুদ্ধ হইলেন, ভাবিলেন এ বিপদ কোথা হইতে আসিল? কিছু বলিলেন না।

হাকিম। "আপনার পীড়া কি ?"

কাতরস্বরে শিবজী বলিলেন, "জানি না এ কি ভীষণ পীড়া; শরীর সর্ব্বদাই অগ্নিবৎ জ্বলিতেছে, হৃদয়ে বেদনা, সর্ব্বস্থানে বেদনা।"

হাকিম গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "পীড়া অপেক্ষা জিঘাংসায় শরীর অধিক জ্বলে, হৃদয়ের বেদনা অনেক সময় মানসিক ক্লেশসঞ্জাত; আপনার কি সেই পীড়া ?"

বিস্মিত ও ভীত হইয়া শিবজী এই অপরূপ হাকিমের দিকে চাহিলেন; মুখ সেইরূপ গম্ভীর, কোনও ভাবই লক্ষিত হইল না। শিবজী নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। হাকিম তাঁহার হস্ত ও শরীর দেখিতে চাহিলেন।

শিবজী আরও ভীত হইলেন, অগত্যা হস্ত ও শরীর দেখাইলেন।

অনেকক্ষণ অতিশয় মনোনিবেশপূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া হাকিম উত্তর করিলেন—

"আপনার বচন যেরূপ ক্ষীণ, নাড়ি ত সেরূপ ক্ষীণ নহে, ধমনীতে শোণিত সজোরে সঞ্চালিত হইতেছে, পেশীগুলি পূর্ব্ববৎ দৃঢ়বদ্ধ। আপনার এসমস্ত কি প্রবঞ্চনামাত্র?"

পুনরায় বিস্মিত হইয়া শিবজী এই অপূর্ব্ব চিকিৎসকের দিকে চাহিলেন, চিকিৎসকের মুখমণ্ডল গম্ভীর ও অকম্পিত, কোনও ভাব লক্ষিত হইল না। শিবজীর শরীরে ক্রমে উষ্ণ শোণিত সঞ্চালিত হইতে লাগিল, কিন্তু ক্রোধসম্বরণ করিয়া পুনরায় ক্ষীণস্বরে বলিলেন--

"আপনি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, অন্যান্য চিকিৎসকগণও সেইরূপ বলেন; এ মহৎ পীড়া বাহ্যলক্ষণশূন্য, কিন্তু দিনে দিনে তিল তিল করিয়া আমার জীবননাশ করিতেছে।"

হাকিম ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন—

"'আলফলায়লা ও লায়নুন' নামক আমাদের যে প্রকাণ্ড চিকিৎসাশাস্ত্র আছে, তাহাতে এক সহস্র এক পীড়ার বিষয় নির্দ্দেশ আছে; তাহারি মধ্যে কয়েকটী বাহ্যলক্ষণশূন্য পীড়ার কথা লিখিত আছে। একটীর নাম 'আকল্তু সামাকাতা হত্তা রাশি হা'। বালকেরা এই পীড়া ভাণ করিয়া চুরি করিয়া মৎস্য ভক্ষণ করে, ইহার চিকিৎসা প্রহার। আর একটীর নাম 'বকুস্তনে আসিরী ইশারৎ কৰ্দ্দ।' কয়েদীগণ কায না করিবার জন্য এই পীড়া ভাণ করে, ইহার চিকিৎসা শিরচ্ছেদন। তৃতীয় একপ্রকার বাহ্যলক্ষণ-শূন্য পীড়া আছে, শত্রুহস্ত হইতে পলায়িতুকাম বন্দীদিগের সেই পীড়া ঘটে, তাহারও ঔষধি নির্দ্দেশ আছে; আমি তাহাই আপনাকে দিতেছি।"

শিবজী এ সমস্ত শাস্ত্রকথা বিশেষ বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু হাকিম তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চতুর, শিবজীর মনের ভাব বুঝিয়াছেন তাহা শিবজী বুঝিতে পারিলেন। ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে ঔষধি কি?"

হাকিম উত্তর করিলেন, "সে একটী উৎকৃষ্ট ঔষধিও বটে, উৎকট বিষও বটে। রব্বুল আলমিনার নাম লইয়া তাহাই আপনাকে দিব, যদি রোগ যথার্থ হয়, অব্যর্থ ঔষধিতে তৎক্ষণাৎ পীড়া আরোগ্য হইবে, যদি প্রতারণা

হয়, অব্যর্থ বিষে তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশ হইবে।" এই বলিয়া হাকিম ঔষধি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

শিবজীর হৃৎকম্প হইল, ললাট হইতে স্বেদবিন্দু পড়িতে লাগিল! ঔষধিসেবনে অস্বীকৃত হইলে তাঁহার প্রতারণা প্রচারিত হইবে, সেবন করিলে নিশ্চয় মৃত্যু!

হাকিম ঔষধি প্রস্তুত করিয়া আনিল, শিবজী বলিলেন, "মুসলমানের স্পৃষ্ট পানীয় আমি পান করিব না।" সজোর হস্তসঞ্চালনে পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

হাকিম কিছুমাত্র রুষ্ট হইলেন না। ধীরে ধীরে বলিলেন, "এরূপ সজোর হস্তসঞ্চালন ক্ষীণতার লক্ষণ নহে।"

শিবজী অনেকক্ষণ অতি কষ্টে ক্রোধসম্বরণ করিয়াছিলেন, আর পারিলেন না। সহসা উঠিয়া বসিলেন, "রোগীকে উপহাস করিবার এই শাস্তি," বলিয়া মস্তকে চপেটাঘাত করিলেন ও হাকিমের শুক্র শ্মশ্রু সজোরে আকর্ষণ করিলেন।

বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সেই মিথ্যা শ্মশ্রু সমস্ত খসিয়া আসিল, চপেটাঘাতে উষ্ণীষ দূরে নিক্ষিপ্ত হইল, তাঁহার বাল্যসুহৃদ্ তন্নজী মালশ্রী খিল্‌খিল্ করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল!

কষ্টে অনেকক্ষণ পর হাস্য সম্বরণ করিয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। পরে শিবজীর নিকটে আসিয়া উপবেশন করিয়া বলিলেন—

"প্রভু কি সর্ব্বদাই চিকিৎসককে এইরূপ পারিতোষিক দিয়া থাকেন? তাহা হইলে রোগীর মৃত্যুর পূর্ব্বে দেশের চিকিৎসক নিঃশেষিত হইবে! বজ্রসম চপেটাঘাতে এখনও মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছে!"

শিবজী সহাস্যে বলিলেন, "বন্ধু, সিংহের সহিত খেলা করিলে কখন কখন আহত হইতে হয়। যাহা হউক, তোমাকে দেখিয়া কতদূর আহ্লাদিত হইলাম বলিতে পারি না, এ কয়দিনই তোমাকে প্রত্যাশা করিতেছিলাম, এখন সংবাদ কি বল।"

তন্ন। "প্রভুর সমস্ত আদেশ সম্পাদিত করিয়াছি, একে একে নিবেদন করিতেছি।"

"সম্রাট্ যে অনুমতিপত্র দিয়াছিলেন তদ্দ্বারা আপনার অনুচরবর্গ সমস্তই নিরাপদে দিল্লী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে।"

শিব। "সেজন্য জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ করি। এখন আমার মন শান্ত হইল, আমি আপনার পলায়নের জন্য তত ভাবি না; গগনবিহারী গরুড়-পক্ষী সামান্য পিঞ্জরবদ্ধ হইয়া থাকে না।"

তন্ন। "সেই সমস্ত অনুচর দিল্লী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গোস্বামীর বেশ ধরিয়া মথুরা ও বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিতেছে; মথুরায় অনেক দেবালয়ের পুরোহিতগণও প্রত্যহ আপনাকে প্রতীক্ষা করিতেছে। আমি দিল্লী হইতে মথুরার পথ বিশেষরূপে দৃষ্টি করিয়াছি, যে যে স্থানে যেরূপ লোক সন্নিবেশিত করিবার আদেশ করিয়াছিলেন তাহাও করিয়াছি।"

শিব। "চিরবন্ধু! তুমি যেরূপ কার্য্যদক্ষ, অবশ্যই আমরা নিরাপদে স্বদেশ যাইতে পারিব।"

তন্ন। "দিল্লীর প্রাচীরের বাহিরে আপনি যেরূপ একটী তীব্রগতি অশ্ব রাখিতে বলিয়াছিলেন তাহাও রাখিয়াছি; যেদিন স্থির করিবেন, সেইদিনে সমস্ত প্রস্তুত থাকিবে।"

শিব। "ভাল।"

তন্ন। "রাজা জয়সিংহের পুত্র রামসিংহের নিকট গিয়াছিলাম, তাঁহার পিতা আপনাকে যে বাক্যদান করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম। রামসিংহ পিতার ন্যায় সত্যপ্রিয় ও উদারচেতা, শুনিয়াছি স্বয়ং সম্রাটের নিকট যাইয়া আপনার জন্য সাশ্রুনয়নে আবেদন করিয়াছিলেন।"

শিব। "সম্রাট্ কি বলিলেন?"

তন্ন। "বলিলেন, সম্রাটের যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবেন।"

শিব। "বিশ্বাসঘাতক! কপটাচারী! এখনও একদিন শিবজী ইহার প্রতিশোধ দিবে।"

তন্ন। "রামসিংহ সে বিষয়ে বিফলপ্রযত্ন হইয়াছেন বটে, কিন্তু যুবক সরোষে আমার নিকট বলিলেন, যে রাজপুতের বাক্য অন্যথা হয় না, অর্থদ্বারা, সৈন্যদ্বারা, যেরূপে পারেন, তিনি আপনার সহায়তা করিবেন, তাহাতে যদি তাঁহার প্রাণ যায় তাহাতেও স্বীকার আছেন।"

শিব। "পিতার উপযুক্ত পুত্র! কিন্তু আমি তাঁহাকে বিপদ্গ্রস্থ করিতে চাহি না, আমি পলায়নের যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি তাহা তুমি তাঁহাকে জানাইয়াছ?"

তন্ন। "জানাইয়াছি, তিনি জানিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং আপনার সম্পূর্ণ সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।"

শিব। "ভাল।"

তন্ন। "এতদ্ভিন্ন দানেশমন্দ্ প্রভৃতি যাবতীয় আরংজীবের সভাসদ্কে মিষ্ট কথায়, বা অর্থদ্বারা, বা নজর দিয়া আপনার পক্ষবর্ত্তী করিয়াছি।

দিল্লীতে হিন্দু কি মুসলমান এরূপ বড়লোক কেহ নাই যিনি আপনার পক্ষবর্ত্তী নহেন; কিন্তু আরংজীব কাহারও পরামর্শ গ্রাহ্য করেন না।”

শিব। “তবে সমস্ত প্রস্তুত! আমি আরোগ্যলাভ করিতে পারি?”

সহাস্যে তন্নজী বলিলেন, “আমার ন্যায় বিজ্ঞ হাকিম যখন আপনার পীড়ার চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছে, তখন পীড়া কি থাকিতে পারে? কিন্তু আপনার পানের জন্য সুন্দর মিষ্ট শরবৎ প্রস্তুত করিয়াছিলাম, সমস্তটা নষ্ট করিলেন?”

শিবজী বলিলেন, “বন্ধু, আর এক পাত্র প্রস্তুত কর।” তন্নজী সেই পাত্র লইয়া পুনরায় শরবৎ প্রস্তুত করিলেন; শিবজী পান করিলেন,— সহাস্যে বাললেন, “চিকিৎসক! আপনার ঔষধি যেরূপ মিষ্ট সেইরূপ ফলদায়ী, আমার পীড়া একেবারে আরাম হইয়াছে।”

তন্ন। “তবে এখন প্রস্থান করি।” শিবজীকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় উষ্ণীষ ও শ্মশ্রু ধারণ করিয়া তন্নজী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বারদেশে প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, “পীড়া কিরূপ দেখিলেন?”

হাকিম উত্তর করিলেন, “পীড়া অতিশয় সঙ্কটজনক, কিন্তু আমার অব্যর্থ ঔষধিতে অনেক উপশম হইয়াছে; বোধ করি অল্পদিনের মধ্যেই শিবজী এ ক্লেশ হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিবেন।

হাকিম শিবিকাযোগে চলিয়া গেলেন; এক প্রহরী অন্যকে বলিল—

“এ হাকিম বড় ভাল, এত বৈদ্যে যে পীড়া আরাম করিতে পারিল না, হাকিম একদিনে তাহা আরাম করিল কিরূপে?”

দ্বিতীয় প্রহরী উত্তর করিল, “হবে না কেন, এ যে রাজবাটীর হাকিম!”

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

আরোগ্য।

" এত শুনি উত্তর ক্ষণেক স্তব্ধ হ'য়ে।
কহিতে লাগিল পুনঃ প্রণাম করিয়ে ॥
হে বীর, কমলচক্ষে কর পরিহার।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমিবা আমার ॥"
কাশীরাম দাস।

উপরি উক্ত ঘটনার কয়েকদিন পর নগরে সংবাদ প্রচারিত হইল যে, শিবজীর পীড়ার কিছু উপশম হইয়াছে। নগরে পুনরায় ধূমধাম পড়িয়া গেল; সকলেই সেই কথা কহিতে লাগিল। কেহ কেহ শিবজীর আরোগ্যে দুঃখিত হইলেন; কোন কোন মহদাশয় মুসলমান এই সংবাদ পাইয়া সুখী হইলেন। পথে, ঘাটে, দোকানে, মস্‌জীদে সকলেই এই কথা কহিতে লাগিল; আরংজীব এ সংবাদ শুনিয়া যথোচিত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

নগরে ধূমধাম পড়িয়া গেল! শিবজী ব্রাহ্মণদিগকে রাশি রাশি মুদ্রা দান করিতে লাগিলেন, দেবালয়ে পূজা পাঠাইতে লাগিলেন, চিকিৎসক সকলকে অর্থদানে সন্তুষ্ট করিলেন। বাজারে আর মিষ্টান্ন রহিল না, শিবজী রাশি রাশি মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া দিল্লীর সমস্ত বড়লোকের বাটীতে পাঠাইতে লাগিলেন। পরিচিত সমস্ত লোকের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন, এমন কি, প্রতি মস্‌জীদে ফকীরগণের সেবনার্থে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন পাঠাইতে লাগিলেন! সম্রাটের মনে যাহাই থাকুক, অন্য সকলেই শিবজীর এই বদান্যতা ও সদাচরণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।—" দিল্লীকালাড্ডুর " ছড়াছড়ি হইতে লাগিল, তাহাতে আর কেহ "পস্তাইয়া" ছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আরংজীব অতি শীঘ্রই পস্তাইয়াছিলেন!

শিবজী কেবল মিষ্টান্ন প্রেরণ করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না, মিষ্টান্ন ক্রয় করাইয়া নিজের গৃহে আনিতেন ও অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আধার সমস্ত নির্ম্মাণ করাইয়া স্বয়ং মিষ্টান্ন সাজাইয়া প্রেরণ করিতেন। সে আধার কখন কখন তিন চারি হাত দীর্ঘ হইত, ৮ কি ১০ জন লোকে বহিয়া লইয়া যাইত। কয়েকদিন এইরূপে মিষ্টান্ন বিতরিত হইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় এইরূপ দুইটী প্রকাণ্ড মিষ্টান্নের আধার শিবজীর গৃহ হইতে বাহির হইল। প্রহরীগণ জিজ্ঞাসা করিল—

"এ কাহার বাটীতে যাইবে?" বাহকেরা উত্তর করিল, "রাজা জয়সিংহ-সদনে।"

প্রহ। "তোমাদের প্রভু আর কতদিন এরূপ মিষ্টান্ন পাঠাইবেন?"

বাহ। "এই অদ্যই শেষ।"

মিষ্টান্নের ভার লইয়া বাহকগণ চলিয়া গেল।

কতক পথ যাইয়া একটী অতি সঙ্গুপ্ত স্থানে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই দুইটী আধার নামাইল। বাহকগণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, জনমাত্র নাই, শব্দমাত্র নাই, কেবল সন্ধ্যার বায়ু রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাইতেছে! বাহকেরা একটী ইঙ্গিত করিল, একটী আধার হইতে শিবজী, অপরটী হইতে শম্ভুজী বাহির হইলেন; উভয়ে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

বিলম্ব না করিয়া উভয়ে ছদ্মবেশে দিল্লীর প্রাচীরাভিমুখে যাইলেন। সন্ধ্যার সময় লোক অতি অল্প, তথাপি রাজপথে এক একজন লোক যখন নিকট দিয়া যায়, শম্ভুজীর হৃদয় ভয়ে, উদ্বেগে নৃত্য করিয়া উঠে! শিবজীর চিরজীবন এইরূপ বিপদপূর্ণ, তাঁহার পক্ষে কিছুই নূতন নহে; তথাপি তাঁহারও হৃদয় উদ্বেগশূন্য ছিল না।

কম্পিতহৃদয়ে প্রাচীর পার হইলেন, একজন প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, "কে যায়?"

শিবজী উত্তর করিলেন, "গোস্বামী। হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণাম কেবলং।"

"কোথা যাইতেছ?"

"মথুরা তীর্থস্থানে। কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

প্রাচীর পার হইলেন।

প্রাচীরের বাহিরেও অনেক হর্ম্ম্যাদি ছিল, অনেক ধনাঢ্য ও উচ্চ-পদাভিষিক্ত লোক বাস করিতেন। সে সকল দুইপার্শ্বে রাখিয়া শিবজী ও শম্ভুজী ত্বরিতে পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। "হরের্ণাম হরের্ণাম—" ইত্যাদি।

দূরে একটী বৃক্ষতলে একটী অশ্ব বদ্ধ রহিয়াছে দেখিলেন। অতি সতর্কভাবে সেইদিকে যাইলেন, দেখিলেন, তন্নজী-বর্ণিত অশ্বই বটে।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, অশ্বরক্ষক! তোমার নাম কি?"

"জানকীনাথ।"

"কোথায় যাইবে ?"

"মথুরা।"

শিবজী বলিলেন, "হাঁ, এই অশ্ব বটে।" শিবজী অশ্বে আরোহণ করিলেন, পশ্চাতে শম্ভুজীকে উঠাইয়া লইলেন, মথুরার দিকে চলিলেন। অশ্বরক্ষক পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে চলিতে লাগিল।

অন্ধকার নিশীথে নিঃশব্দ পল্লী বা প্রান্তর দিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া শিবজী পলায়ন করিতেছেন। আকাশে নক্ষত্রগুলি মিট্ মিট্ করিতেছে, অল্প অল্প মেঘ এক একবার গগন আচ্ছাদিত করিতেছে, বর্ষাকালে পূর্ণকলেবরা যমুনা নদী প্রবলবেগে বহিয়া যাইতেছে, পথ, ঘাট কর্দ্দম বা জলপূর্ণ। শিবজী উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে পলায়ন করিতেছেন।

দূর হইতে,অশ্বের পদশব্দ শ্রুত হইল; শিবজী লুকাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেস্থানে বৃক্ষ বা কুটীর নাই, অগত্যা পূর্ব্ববৎ গমন করিতে লাগিলেন।

তিনজন অশ্বারোহী বেগে দিল্লী অভিমুখে আসিতেছেন; তাহাদিগের স্কন্ধে অসি, হস্তে বর্শা। দূর হইতে শিবজীর অশ্ব দেখিতে পাইয়া সেইদিকে অশ্ব প্রধাবিত করিলেন। শিবজীর হৃদয় উদ্বেগে দুরু দুরু করিতে লাগিল।

নিকটে আসিয়া একজন অশ্বারোহী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে যায় ?"

শিব। "গোস্বামী।"

অশ্বারোহী। "কোথা হইতে আসিতেছ ?"

শিব। "দিল্লীনগর হইতে।"

অশ্বারোহী। "আমরা দিল্লীনগর যাইব, কিন্তু পথ হারাইয়াছি, আমাদিগের সঙ্গে আসিয়া পথ দেখাইয়া দাও, পরে মথুরায় যাইও।"

শিবজীর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল; দিল্লী যাইতে অস্বীকার করিলে সৈনিকেরা বলপ্রকাশ করিবে, বিবাদের সময় সহসা শিবজীকে চিনিলেও চিনিতে পারে; কেননা দিল্লীতে এরূপ সৈনিক ছিল না যে শিবজীকে দেখে নাই। আর দিল্লীতে পুনর্গমন করিলে সহস্র বিপদ্! ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একজন অশ্বারোহী সম্মুখে আসিয়া শিবজীর সহিত কথা কহিয়াছিল, অপর দুইজন অস্পষ্টস্বরে পরামর্শ করিতেছিল। কি পরামর্শ ?

একজন বলিল, "এ স্বর আমি জানি,—আমি দক্ষিণদেশে শায়েস্তাখাঁর অধীনে অনেকদিন যুদ্ধ করিয়াছি, আমি নিশ্চয় বলিতেছি পথিক গোস্বামী নহে।"

অপরজন বলিল, "তবে কে?"

"আমি সন্দেহ করি এ স্বয়ং শিবজী। দুইজন মনুষ্যের কণ্ঠস্বর ঠিক একরূপ হয় না।"

"দূর মূর্খ! শিবজী দিল্লীতে বন্দী হইয়াছে।"

"সেইরূপ আমরাও মনে করিয়াছিলাম যে শিবজী সিংহগড় দুর্গে আছে, সহসা একদিন রজনীযোগে পুনা ধ্বংস করিয়া গিয়াছিল।"

"ভাল, মস্তকের বস্ত্র তুলিয়া দেখিলেই সকল সন্দেহ দূর হইবে।"

সহসা একজন অশ্বারোহী আসিয়া শিবজীর উষ্ণীষ দূরে নিক্ষেপ করিল, শিবজী চিনিলেন, শায়েস্তাখাঁর অধীনস্থ একজন প্রধান সেনানী!

যদি হস্তে কোনরূপ অস্ত্র থাকিত, শিবজী একাকী তিনজনকে হত করিবার চেষ্টা করিতেন। রিক্তহস্তেও একজনকে মুষ্টি-আঘাতে অচেতন করিলেন, এমন সময় আর দুইজন অসিহস্তে নিকটে আসিয়া শিবজীকে ধরিয়া ভূতলশায়ী করিল।

শিবজী নির্ব্বাক্! ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন। আবার বন্দী হইবেন, বিদেশে বন্ধুশূন্য হইয়া আরংজীব কর্ত্তৃক হত হইবেন, এই চিন্তা করিতেছিলেন। শম্ভুজীর দিকে নয়ন পড়িল, চক্ষু জলে আপ্লুত হইল। বলিলেন, "দেবদেব মহাদেব, জীবনে একমনে আপনার পূজা করিয়াছি, হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার্থ যুদ্ধ করিয়াছি, এক্ষণে আপনার যাহা উদ্দেশ্য থাকে তাহাই করুন।" আশা, ভরসা, উদ্যম এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বিলুপ্ত হইল।

সহসা একটী শব্দ হইল, শিবজী দেখিলেন, একজন অশ্বারোহী তীরবিদ্ধ হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। আর একটী তীর, আর একটি তীর; শিবজীর তিনজন শত্রুই ভূতলশায়ী! তিনজনই গতজীবন!

শিবজী পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া উঠিয়া দেখিলেন, পশ্চাৎ হইতে সেই অশ্বরক্ষক জানকী এই তীর নিক্ষেপ করিয়াছিল। বিস্মিত হইয়া জানকীকে নিকটে ডাকিয়া জীবনরক্ষার জন্য শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সে নিকটে আসিলে শিবজী আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সে অশ্বরক্ষক নহে, সীতাপতি গোস্বামী অশ্বরক্ষকবেশে!

তখন সহস্রবার ব্রাহ্মণের ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "সীতাপতি! আপনি ভিন্ন শিবজীর বিপদের সময় প্রকৃত বন্ধু আর কে আছে? আপনাকে অশ্বরক্ষক মনে করিয়া তুচ্ছ করিয়াছিলাম, ক্ষমা করুন। আপনার এ কার্য্যের জন্য আমি কি উপযুক্ত পুরস্কার দিতে পারি?"

সীতাপতি শিবজীর সম্মুখে জানু গাড়িয়া করযোড়ে বলিলেন—

"রাজন্! ছদ্মবেশ ক্ষমা করুন, আমি অশ্বরক্ষকও নহি, গোস্বামীও নহি, আমি আপনার পুরাতন ভৃত্য রঘুনাথজী হাবেলদার; জ্ঞান হইয়া অবধি, আপনার সেবা করিয়াছি, আজীবনকাল আপনার সেবা করিব, ইহা ভিন্ন কামনা নাই; অন্য পুরস্কার চাহি না। প্রভুর কাছে যদি না জানিয়া কখন কোন দোষ করিয়া থাকি, প্রভু নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দোষ ক্ষমা করুন।"

শিবজী চকিত ও বাক্‌শূন্য! কিন্তু হৃদয়ের উদ্বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া রঘুনাথকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন, "রঘুনাথ! রঘুনাথ! তোমার নিকট শিবজী শত অপরাধে অপরাধী, কিন্তু এই মহৎ আচরণে আমাকে যথেষ্ট দণ্ড দিয়াছ, তোমাকে সন্দেহ করিয়াছিলাম,—তোমার অবমাননা করিয়াছিলাম, স্মরণ করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। শিবজী যতদিন জীবিত থাকিবে তোমার গুণ বিস্মৃত হইবে না, প্রণয় ও যত্নে যদি এ মহৎ ঋণ পরিশোধ করা যায়, তবে পরিশোধ করিবার চেষ্টা করিবে।"

শান্ত নিস্তব্ধ রজনীতে উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গনসুখে বিমুগ্ধ হইলেন। রঘুনাথের ব্রত অদ্য শেষ হইল, শিবজীর হৃদয়বেদনা অদ্য দূর হইল; বালকের ন্যায় উভয়ে অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

উনত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

প্রাসাদে।

"কি দারুণ বুকের ব্যথা।
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি পাপ পিরিতের কথা॥
সই! কে বলে পিরিতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়া কাঁদিয়া জনম গেল॥
কুলবতী হইয়া কুলে দাঁড়াইয়া যে ধনী পিরতি করে।
তুষের অনল যেন সাজাইয়া এমতি পুড়িয়া মরে॥
হাম বিনোদিনী, এ দুঃখে দুঃখিনী, প্রেমে ছল ছল আঁখি।
চণ্ডীদাস কহে, সে গতি হইয়া, পরাণ সংশয় দেখি॥"

চণ্ডীদাস।

নিশীথে সীতাপতি গোস্বামীর নিকট বিদায় লইয়া রাজপুতবালা গৃহে আসিলেন, কিন্তু গৃহে আসিয়া সরযু দেখিলেন হৃদয় শূন্য! কে না জানে

প্রথম কষ্ট যদিও অতিশয় ভীষণ ও দুর্ব্বহণীয়, কিন্তু তাহার পর সেই কথা স্মরণ করিলে হৃদয়ে যে দুঃখ উছলিতে থাকে, নীরবে নয়ন হইতে যে অশ্রু বহির্গত হইতে থাকে, সেই শোক অধিক মর্ম্মভেদী। জগতের মধ্যে প্রিয়জনের প্রথম বিচ্ছেদ ঘটিলে আমরা বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠি, জ্ঞানশূন্যের ন্যায় ভূমিতে গড়াগড়ি দি,—সে প্রথম শোক-উচ্ছ্বাস সেই আর্ত্তনাদেই নিবারিত হয়। কিন্তু দিবস যাইলে, মাস গত হইলে, বৎসর অতিবাহিত হইলে, সেই প্রিয়জনের কথা যখন স্মরণ হয়, নীরবে রজনীর অন্ধকারে যখন হৃদয় আপন শোকপারাবারে ভাসিতে থাকে,—নয়নের দ্বার যখন উদ্ঘাটিত হয়, নীরবে অশ্রুবিন্দু পড়িতে থাকে,—উঃ মনুষ্যজীবনে সেই যাতনাই অসহ্য! প্রিয়জনের মুখ মনে পড়ে, তাহার বাক্যগুলি, কার্য্যপরম্পরা, স্নেহ, ভালবাসা একে একে হৃদয়ে জাগরিত হইতে থাকে, নিস্তব্ধ রজনীতে সেই পূর্ব্বকথা একে একে উদয় হইতে থাকে, তখনই হৃদয় শূন্য হয়, আমারা বালিকার ন্যায় নিরাশ্রয় হইয়া নীরবে রোদন করিতে থাকি!

দিন গেল, সপ্তাহ গত হইল, মাস অতিবাহিত হইল, সরযুর চিন্তা দিনে দিনে মর্ম্মভেদী হইতে লাগিল। অন্ধকার নিশীথে কখন কখন বালিকা একাকী গবাক্ষপার্শ্বে উপবেশন করিয়া সন্ধ্যা হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, দ্বিপ্রহর হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কত চিন্তা করিত কে বলিবে? কত কথা একে একে স্মরণ হইত, কতবার নীরবে নয়ন হইতে ধীরে ধীরে অশ্রুবিন্দু প্রবাহিত হইত। নীরবে সেই গবাক্ষ দিয়া পথপানে চাহিয়া থাকিতেন, সে পথ দিয়া হৃদয়বল্লভ আর আসিলেন না!

কখন বা সেই পর্ব্বতসঙ্কুল কঙ্কণ দেশ মনে জাগরিত হইত, সেই তোরণ-দুর্গ মনে উদয় হইত। সরযু একাকী ছাদে আসীন রহিয়াছেন, সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গগন ও জগৎ আবৃত করিতেছে, সন্ধ্যার বায়ু বহিয়া বহিয়া সরযুর কেশ লইয়া ক্রীড়া করিতেছে;—এমত সময় সেই দীর্ঘাকার উদার-মূর্ত্তি যুবক যেন আকাশপটে দেবচিত্রের ন্যায় দৃষ্ট হইল। সরযুর হৃদয় শিহরিয়া উঠিল, বালিকার হৃদয় নব নব ভাবে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। অদ্য তিন বৎসর অতীত হইয়াছে, কিন্তু সে মূর্ত্তি সরযুর হৃদয় হইতে অপনীত হয় নাই।

তাহার পরদিন সেই পুরুষসিংহ যে স্নেহগদ্গদস্বরে সরযুর নিকট বিদায় লইয়াছিলেন, সভয়ে ধীরে ধীরে সরযুর কণ্ঠে যে কণ্ঠমালা দোলাইয়া দিয়া-ছিলেন, জীবন থাকিতে সরযু কি তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন? পুনরায় কি

সে বীর সরযুর কণ্ঠে কণ্ঠমালা পরাইয়া দিবেন? পুনরায় কি সরযু সেই হৃদয়-বল্লভকে দেখিতে পাইবেন?—নীরবে সরযু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, নীরবে গণ্ডস্থল দিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল।

কখন বা অপরাহ্নে একাকী সরযু আম্রকাননে ভ্রমণ করিতেন, ভ্রমণ করিতে করিতে কত কথা হৃদয়ে জাগরিত হইত! বৃক্ষের উপর হইতে কপোতকপোতী মৃদুস্বরে প্রেমগীত গাইতেছে, সেই গীত শুনিয়া একদিন রঘুনাথ কাণে কাণে সরযুকে কি কথা বলিয়াছিলেন স্মরণ হইল; সরযুর মুখে বিষাদের হাসি আসিল। আর একদিন ঐ বিশাল আম্রবৃক্ষতলে বসিয়া রঘুনাথ ও সরযু একত্রে একটী সুমিষ্ট আম্র ভক্ষণ করিয়াছিলেন, খাইতেছিলেন, আর পরস্পরে পরস্পরের দিকে সস্নেহে চাহিতেছিলেন, সে কথা হৃদয়ে জাগরিত হইল। ঐ কণ্টকবনের ভিতর দিয়া আর একদিন রঘুনাথ স্বয়ং ক্ষতবিক্ষত হইয়াও একটী সুন্দর বন্যপুষ্প চয়ন করিয়া সরযুর কেশে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, পরে কি মিষ্টস্বরে বলিয়াছিলেন, "সরযু! কি অপরূপ বনদেবীর রূপধারণ করিয়াছ।" আহা! সে সুমধুর স্বর কি সরযু আর শুনিবেন, পুনরায় কি রঘুনাথ দুঃখিনীর জন্য পুষ্পচয়ন করিবেন, হতভাগিনীর ভাগ্যে কি এরূপ সুখ আছে? সরযু শোকে বিবশা হইলেন, নয়ন হইতে দুই চারি বিন্দু জল টস্ টস্ করিয়া ভূমিতে পতিত হইল, নীরবে আপন অঞ্চল দিয়া নয়ন মুছিলেন। বৃথা চেষ্টা, আবার চিন্তা আসিল, আবার নয়ন পূর্ণ হইল।

কখন কখন রজনী দ্বিপ্রহরের সময় সহসা হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হইত, ভাদ্রমাসের নদীর ন্যায় শোকপারাবার উথলিয়া উঠিত। তখন কেহ দেখিবার নাই, সরযু প্রাণ ভরে কাঁদিতেন, শ্রাবণ মাসের ধারার ন্যায় নয়ন হইতে অজস্র বারিধারা বহিতে থাকিত। রঘুনাথের মধুময় মুখ, মধুময় কথা মনে পড়িত, একটী কথার পর অন্য কথা মনে উদয় হইত, শোক-তরঙ্গের পর শোকতরঙ্গ হৃদয়ের উপর বহিয়া যাইত,—উপাধানে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া বালিকা বিবশা ব্যাকুলহৃদয়া হইয়া দরবিগলিত ধারায় উপাধান সিক্ত করিত। রজনী প্রভাত হইত, প্রাতঃকালের রক্তিমাচ্ছটা পূর্ব্বদিকে দেখা দিত; বালিকা তখনও চিন্তাবিদগ্ধা, অথবা শোকে বিবশা হইয়া লুণ্ঠিত রহিয়াছে!

প্রাতঃকালে পুষ্পচয়ন করিতে উদ্যানে যাইতেন, প্রফুল্ল পুষ্পগুলি একে একে চয়ন করিতেন, হৃদয়ে স্থাপন করিতেন, আর কি চিন্তা করিতেন কে বলিবে? চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় পুষ্পের দিকে চাহিতেন,

পুষ্পদলগত প্রাতঃ শিশিরবিন্দুর সহিত দুই একটী পরিষ্কার স্বচ্ছ অশ্রুবিন্দু মিশাইয়া যাইত। সায়ংকালে বীণা হস্তে করিয়া কখন কখন গীত গাইতেন;—আহা! সে যে শোকের গীত, শ্রোতৃদিগের নয়নেও জল আসিত। বাল্যকালে রাজপুত চরণদিগের নিকট যত শোকের গীত শিখিয়াছিলেন তাহাই গাইতেন, ভিখারিণীর গীত গাইতেন, দুঃখিনীর গীত গাইতেন, অনাথিনীর গীত গাইতেন, সায়ংকালের নিস্তব্ধতায় সেই গীত ছাদ হইতে ধীরে ধীরে নৈশ আকাশে উত্থিত হইত, ধীরে ধীরে বায়ুমার্গে বিস্তৃত হইত, গীতের সহিত গায়কীর নয়ন হইতে বিন্দু বিন্দু জল নির্গত হইত, অথবা শোকপারাবার সহসা উথলিয়া উঠিত, গায়কীর কণ্ঠরুদ্ধ হইত, গীত সহসা লীন হইয়া যাইত।

দিবারাত্রি শোকচিন্তা শেষ হইত না, দিবারাত্রি সেই পথের দিকে সরযূবালা চাহিয়া থাকিতেন, সে পথ দিয়া হৃদয়বল্লভ আর আসিলেন না!

বসন্তকালে রঘুনাথ বিদায় হইয়াছেন, সে বসন্তকাল অতিবাহিত হইল, সুকণ্ঠ পক্ষীগুলি একে একে কুলায় হইতে উড়িয়া গেল। বৃক্ষসমূহে সুন্দর পুষ্পগুলি একে একে অদৃশ্য হইল, গ্রীষ্মকাল নানারূপ সুস্বাদু ফল আনিয়া মানবহৃদয় আনন্দিত করিল, জগৎকে সুশোভিত করিল! সরযূবালা সেই পথ চাহিয়া রহিয়াছেন,—সে পথে রঘুনাথ দর্শন দিলেন না!

আকাশে মেঘাড়ম্বর হইল, ক্রমে বর্ষার ধারা আরম্ভ হইল, নদনদী, জলাশয় পূর্ণকলেবর হইল, ক্ষেত্রে সুন্দর শস্য শোভা পাইতে লাগিল, জলে মাঠ, বিল, প্রান্তর প্লাবিত হইল। সেই প্রান্তরের উপর সরযূ একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন, হৃদয়েশ কি এখনও কার্য্যসিদ্ধি লাভ করেন নাই? হৃদয়েশের কি এখনও সরযূকে মনে আছে? হৃদয়েশ কি কুশলে আছেন? জলে নয়ন প্লাবিত হইল,—আর দেখিতে পাইলেন না।

ক্রমে ক্রমে বর্ষার জল অপসৃত হইল, আকাশ পরিষ্কার হইল, নিশীথে শরচ্চন্দ্র উদয় হইয়া গগনে ও জগতে জ্যোতিঃ বিস্তার করিতে লাগিল। সরযূর হৃদয়াকাশ কবে পরিষ্কার হইবে, হৃদয়নাথ কবে নিশানাথের ন্যায় উদয় হইয়া সরযূর মনে আনন্দজ্যোতিঃ বিস্তার করিবেন? সরযূ পথ চাহিয়া রহিলেন, হৃদয়নাথ আসিলেন না!

এরূপ ভীষণ চিন্তায় ক্রমে সরযূর শরীর শুষ্ক হইতে লাগিল, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল, নয়ন কালিমাবেষ্টিত হইল! সরলস্বভাব জনার্দ্দন এখনও সরযূর হৃদয়ের কথা কিছু জানেন না, কিন্তু সরযূর শরীরের

অবস্থা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইলেন, কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

নারীর নিকট নারীর মনের কথা গুপ্ত থাকে না, সরযূ অনেক যত্নে শোক সঙ্গোপন করিলেও তাঁহার সখী ও দাসীগণ তাঁহার গুপ্তকথা কিছু কিছু অনুমান করিয়াছিল, ক্রমে সেই কথা বৃদ্ধ জনার্দ্দনের কর্ণে উঠিল।

জনার্দ্দন সরল ও নির্ম্মলচরিত্র, তথাপি জনার্দ্দন রাজপুত, সকল রাজপুত ব্রাহ্মণের ন্যায় অতিশয় বংশমর্য্যাদাগর্ব্বী। যখন শুনিলেন, আপনার এক-মাত্র দুহিতা একজন সামান্য মহারাষ্ট্র সৈনিককে বিবাহ করিতে চাহে, বিদ্রোহীর সহিত বিবাহ করিয়া কুলে কলঙ্ক আনিতে চাহে; তখন জনার্দ্দনের নয়ন আরক্ত হইল, বৃদ্ধের শরীর কম্পিত হইতে লাগিল।

গৃহাভ্যন্তরে আসিয়া বালিকাকে "পাপীয়সী," "পিশাচী" বলিয়া গালি দিলেন, সরযূ পিতার তিরস্কার নীরবে সহ্য করিলেন, জগতে এরূপ কি যাতনা আছে হৃদয়বল্লভের জন্য নারী যে যাতনা সহ্য করিতে পরাঙ্মুখ?

বৃদ্ধ বাতুলের ন্যায় একমাত্র দুহিতাকে শোকার্ত্ত নীরব দেখিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিলেন, সরযূকে ক্রোড়ে লইয়া সাশ্রুনয়নে বলিলেন—

"দেখ দেখি মা! আমার মস্তকে একটী কেশও কৃষ্ণ নাই, এই বৃদ্ধ-বয়সে কি তুমি আমাকে যাতনা দিবে?" উঃ! সে সস্নেহ ভৎর্সনা সরযূ সহ্য করিতে পারিলেন না, পিতার কণ্ঠ ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, পিতাও রোদন করিলেন।

বৃদ্ধ সরযূর সখীদিগের দ্বারা সরযূকে অনেক বুঝাইলেন, অন্য যুবকের সহিত সরযূর বিবাহ স্থির করিতে চাহিলেন, সরযূর পিতার কুল-গৌরবের কথা অনেক বলিলেন।

সরযূর একই উত্তর, "পিতাকে বলিও আমার বিবাহে রুচি নাই, চিরকাল অবিবাহিতা থাকিয়া তাঁহারই পদসেবা করিব।"

বৃদ্ধ ক্ষণে ক্ষণে শোকার্ত্ত হইতেন, ক্ষণে ক্ষণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইতেন। একদিন ক্রোধপরবশ হইয়া সরযূকে বলিলেন—

"সরযূ! আমি রাজপুত, রাজপুতেরা কন্যার অবমাননা দেখিবার পূর্ব্বে কন্যার হৃদয়ে ছুরিকা স্থাপন করে, চরণদিগের গীতে এরূপ শুনিয়া থাকিবে।"

ধীরে ধীরে সরযূ উত্তর করিলেন—

পিতা, সেইরূপ জনকই যথার্থ দয়ালু! পিতা, আপনিও যদি সেইরূপ আচরণে আমার হৃদয়ের অসহ্য বেদনা শান্ত করেন, আমি জন্মে জন্মে আপনার দয়ার কীর্ত্তন করিব।"—বৃদ্ধ সাশ্রুনয়নে গৃহ ত্যাগ করিলেন

ক্রমে চারিদিকে একথা বিস্তার হইতে লাগিল, মন্দ লোকে আরও দুই একটী কথা বাড়াইল,—কেহ কেহ বলিতে লাগিল, জনার্দ্দনের কন্যা ব্যভিচারিণী; তাহার বিবাহ হইতেছে না।

যেদিন জনার্দ্দন এই কথা শুনিলেন, তাঁহার কলেবর ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল; গৃহে আসিয়া কন্যাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া বলিলেন—

পাপীয়সি, তোর জন্য কি আমি এই বৃদ্ধ বয়সেঅবমানিত হইব? তুই তোর পিতার নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক দিবি? আমার বাটী হইতে দূর হ।"

ধীরে ধীরে অশ্রুপূর্ণনয়নে সরযু উত্তর করিলেন—

"পিতা! আমি অবোধ, যদি আপনার নিকট কখন কোনও দোষ করিয়া থাকি, মার্জ্জনা করুন, কিন্তু জগদীশ্বর আমার সহায় হউন, আমা হইতে আপনার অবমাননা হইবে না।"

এ কথার অর্থ তখন জনার্দ্দন বুঝিলেন না, এ কথার অর্থ তাহার পরদিন বৃদ্ধ বুঝিতে পারিলেন।

সেইদিন অন্ধকার নিশীথে সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকা একাকিনী পিতৃগৃহ ত্যাগ করিলেন, একাকিনী সংসারের বিস্তীর্ণ সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

কুটীরে।

"দুঃখে সুখে খুল্লনা শরৎকাল ভাবে।
আশ্বিনে আসিবেন প্রভু দেবীর উৎসবে॥
কার্ত্তিক মাসেতে হইল হিমের প্রকাশ।
গৃহে নাহি প্রাণনাথ করি বনবাস॥"

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

শরৎকালের প্রাতের কমনীয় আলোকে বেগবতী নীরানদী বহিয়া যাইতেছে, সূর্য্যকিরণে জলের হিল্লোল হাস্য করিতে করিতে যাইতেছে। সেই সুন্দর নদীর উভয় পার্শ্বে সুন্দর শস্যক্ষেত্র বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে, কৃষকের পূজায় যেন সন্তুষ্ট হইয়া মেদিনী সেই হরিৎ পরিচ্ছদে হাস্য করিতেছে। উত্তর ও পূর্ব্বদিকে সেইরূপ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র অথবা সুদূরে দুই একটী গ্রাম দৃষ্ট হইতেছে, দক্ষিণ ও পশ্চিমে পর্ব্বতরাশির উপর পর্ব্বত-, রাশি বাপ-সূর্য্যকিরণে অপরূপ শোভা ধারণ করিতেছে।

সেই নদীকূলে শ্যামলক্ষেত্রবেষ্টিত একটী সুন্দর গ্রাম সন্নিবেশিত ছিল, গ্রামের এক প্রান্তে একটী কৃষকের কুটীরের নিকট একটী বালিকা নদীকূলে খেলা করিতেছে, নিকটে একজন দাসী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কৃষকপত্নী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছে।

গৃহ দেখিলে কৃষককে সম্ভ্রান্ত বলিয়াই বোধ হয়। প্রাঙ্গণে দুই একটী গোলাঘর রহিয়াছে, পার্শ্বে চারি পাঁচটী গরু বাঁধা রহিয়াছে, বাটীর ভিতর তিন চারিখানি ঘর, বাহিরে একখানি বড় ঘর। দেখিলেই বোধ হয়, গৃহস্বামী কৃষক হইলেও গ্রামের মধ্যে একজন "মাতব্বর" লোক,—ব্যবসা ও মহাজনী কার্য্যও কিছু কিছু করিয়া থাকে।

বালিকা সপ্তমবর্ষীয়া, শ্যামবর্ণ, চঞ্চল, প্রফুল্ল ও উজ্জ্বলনয়না। একবা নদীকূলে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে একবার মাতা যে ঘরে রন্ধন করিতেছে, তথায় দৌড়াইয়া যাইতেছে, এক একবার বা দাসীর নিকট আসিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া কোন কথা কহিতেছে, অথবা প্রফুল্লতার হাস্য হাসিতেছে।

বালিকা বলিল, "দিদি, আয় না কাল্‌কের মত ঘাটে যাই, কাপড় দিয়া মাছ ধরিব।"

দাসী। "না দিদি, মা বারণ করিয়াছেন, ঘাটে যেও না।"

বালিকা। "মা টের পাবে না।"

দাসী। "না, ছি, মা যা বারণ করেন তা করিতে নাই, মার কথা কি অন্যথা করে।"

বালিকা। "আচ্ছা দিদি, মা কি তোরও মা হয়?"

দাসী হাসিয়া বলিল—"হয় বৈ কি।"

বালিকা। "না, সত্য করিয়া বল।"

দাসী। "সত্যই মা হয়।"

বালিকা। "না দিদি, তুই যে রাজপুতের মেয়ে, আমরা তো রাজপুত নয়।"

দাসী বালিকাকে চুম্বন করিয়া বলিল, "এতদূর যদি জ্ঞান তবে জিজ্ঞাসা কর কেন?"

বালিকা। "জিজ্ঞাসা করি, তবে তুই মাকে মা বলিস্ কেন?"

দাসী। "যিনি আমাকে খাইতে পরিতে দিতেছেন, যিনি আমাকে থাকিবার স্থান দিয়াছেন,—যিনি আমাকে মেয়ের মত লালনপালন করেন তাঁকে মা বলিব না ত কি বলিব? এজগতে আমার অন্য স্থান নাই. মা আমাকে জগতে স্থান দিয়াছেন।"

বালিকা। "ছি দিদি, তোর চক্ষে জল কেন, তুই কথায় কথায় কাঁদিস্ কেন দিদি ?"

দাসী। "না দিদি, কাঁদ্‌ব কেন ?"

বালিকা। "তোর চক্ষে জল দেখ্‌লে আমার চক্ষে জল আসে কেন দিদি ?"

দাসী বালিকাকে পুনরায় চুম্বন করিয়া বলিল,—"তুমি যে আমাকে ভালবাস।"

বালিকা। "আর তুই আমাকে ভালবাসিস্ ?"

দাসী। "বাসি বৈ কি।"

বালিকা। "বরাবর ভাল বাস্‌বি, কখনও আমাকে ভুল্‌বি নি ?"

দাসী। "না, আর তুমি, দিদি তুমি আমাকে ভালবাসবে, কখনও ভুলিবে না ?"

বালিকা। "না।"

দাসী। "হাঁ, তুমি আমাকে একদিন ভুল্‌বে।"

বালিকা। "কবে ?"

দাসী। "যবে তোমার বর আসবে।"

বালিকা। "সে কবে ?

দাসী। "আর দুই এক বৎসরের মধ্যেই :

বালিকা। "না দিদি, তখনও তোকে ভুলিব না, বরের চেয়ে তোকে অধিক ভালবাসব। আর তুই দিদি—তোর যখন বর আস্‌বে তখন আমাকে ভুল্‌বিনি ?"

দাসীর চক্ষে পুনরায় জল আসিল, তাহা মোচন করিয়া একটী দীর্ঘ-শ্বাস ত্যাগ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—

"না, তখনও ভুলব না।"

বালিকা। "বরের চেয়ে আমাকে অধিক ভালবাস্‌বি ?"

দাসী হাস্য করিয়া বলিল, "সমান সমান।"

বালিকা। "তোর বর কবে আস্‌বে দিদি ?"

দাসী। "ভগবান্ জানেন ! ছাড়, রান্নার বেলা হইয়াছে, আমি যাই।" দাসী অন্ন প্রস্তুত করিতে গেল।

পাঠককে বলা অনাবশ্যক যে, অনাথিনী সরযূবালা জগতে আর স্থান না পাইয়া একজন কৃষকের বাটীতে দাস্যবৃত্তি স্বীকার করিয়াছিলেন। কৃষকের কিছু সম্পত্তি ছিল, মহাজনী ছিল, নাম গোকর্ণনাথ। গোকর্ণের

অন্তঃকরণ সরল ও স্নেহযুক্ত, নিরাশ্রয় রাজপুতকন্যাকে নিজের বাটীতে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিলেন। গোকর্ণের গৃহিণীও স্বামীর উপযুক্ত, নিরাশ্রয় ভদ্র রাজপুতকন্যাকে দেখিয়া অবধি নিজের কন্যার ন্যায় লালনপালন করিতেন। সরযুও কৃতজ্ঞ হইয়া গোকর্ণ ও তাঁহার স্ত্রীর যথোচিত সমাদর করিতেন, নিজে দুইবেলা অন্ন প্রস্তুত করিতেন, বালিকার তত্ত্বাবধারণ করিতেন, সুতরাং কৃষক ও কৃষকপত্নীর কার্য্যের অনেক লাঘব হইল, তাঁহারাও দিন দিন সরযুর উপর অধিক প্রসন্ন হইতে লাগিলেন।

রঘুনাথের অবর্ত্তমানে যদি সরযুর কোথাও সুখের সম্ভাবনা থাকিত, তবে উদারস্বভাব গোকর্ণনাথ ও তাঁহার সরল গৃহিণীর বাটীতে থাকিয়া সরযু পরম সুখলাভ করিতে পারিতেন। গোকর্ণের বয়ঃক্রম ৪৫ বৎসর হইবে, কিন্তু চিরকাল নিয়মিত পরিশ্রম করিতেন বলিয়া এখনও শরীর সুবদ্ধ ও বলিষ্ঠ। গোকর্ণের একটী পুত্র শিবজীর সৈনিক, বহুদিন অবধি বাটী ত্যাগ করিয়াছে; শেষে যে একটী কন্যা হইয়াছিল, পিতা মাতা উভয়েই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। প্রাতঃকালে গোকর্ণ কৃষিকার্য্যে বা অন্য কার্য্যে বাহির হইয়া যাইতেন, সরযু গৃহের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। গৃহিণী অনেক সময় বলিতেন, "বাছা, তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে, এরূপ পরিশ্রম করিলে তোমার শরীর থাকিবে কেন? তোমার করিতে হইবে না, আমিই করিব।" সরযু সস্নেহে উত্তর করিতেন, "মা! তুমি আমাকে যেরূপ যত্ন কর, তোমার কাজ করিতে পরিশ্রম হয় না, আমি জন্ম জন্ম তোমার সেবা করিব, তুমি আমাকে এইরূপ স্নেহ করিও।" স্নেহবাক্যে সরলস্বভাব বৃদ্ধ গৃহিণীর নয়নে জল আসিত, চক্ষুর জল মুছিয়া বলিতেন, "সরযু! বাছা তোর মত মেয়ে কখনও দেখি নাই, তোমার মত আমাদের জাতির একটী মেয়ে পাই, তবে আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দি।" পুত্র অনেকদিন গৃহ ত্যাগ করিয়াছে, সে কথা স্মরণ করিয়া প্রাচীনা ক্ষণেক রোদন করিতেন।

এইরূপে এক মাস, দুই মাস অতিবাহিত হইল। একদিন সায়ংকালে গোকর্ণনাথ গৃহিণীর নিকট বসিয়াছেন, একপ্রান্তে সরযু বালিকাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, এরূপ সময়ে গোকর্ণ বলিলেন,—

"গৃহিণী, শান্ত হও, আজ সুসংবাদ আছে।"

গৃহিণী। "আহা! তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, বাছা ভীমজীর কোন্ সংবাদ পাইয়াছ?"

গোক। "শীঘ্রই পাইব, পুত্র শিবজীর সহিত দিল্লী গিয়াছিল,—অদ্য শুনিলাম শিবজী দুষ্ট বাদশাহের হস্ত হইতে পলাইয়াছেন, দেশে আসিতেছেন, আমাদের ভীমজী অবশ্য তাঁহার সঙ্গে আসিবেন।"

গৃহিণী। "আহা ভগবান্ তাহাই করুন, প্রায় একবৎসর হইল বাছাকে না দেখিয়া যে মন কি অবস্থায় আছে তাহা ভগবানই জানেন।"

গোক। "ভীমজী অবশ্যই আসিবে, সে রঘুনাথজী হাবেলদারের অধীনে কার্য্য করিত, রঘুনাথজীর সম্বাদ পাইয়াছি।"

সরযুর হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, উদ্বেগে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া তিনি গোকর্ণের কথা শুনিতে লাগিলেন। গোকর্ণ বলিতে লাগিলেন,—

"যেদিন রঘুনাথকে বিদ্রোহী বলিয়া শিবজী দূর করিয়া দেন সেদিন পুত্র আমাদের কি বলিয়াছিল মনে আছে?"

গৃহিণী। "আমি মেয়েমানুষ আমার কি অত মনে থাকে?"

গোক। "পুত্র বলিয়াছিল 'পিতা, রঘুনাথজী যদি বিদ্রোহী হয়েন তাহা হইলে আমি যেন কখনও খড়্গ ধারণ করিতে না পারি। আমি হাবেলদারকে চিনি, তাঁহার ন্যায় বীর শিবজীর সৈন্যে আর নাই, কি ভ্রমে পতিত হইয়া রাজা তাঁহার অবমাননা করিলেন,—পশ্চাৎ জানিবেন, তখন রঘুনাথের গুণ জানিতে পারিবেন।' পুত্রের কথা এত দিনে সত্য হইল।"

সরযুর হৃদয় উল্লাসে উদ্বেগে দুরু দুরু করিতে লাগিল, তিনি ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে লাগিলেন, তাঁহার মস্তক হইতে স্বেদবিন্দু বহির্গত হইতে লাগিল। এ উদ্বেগ অসহ্য।

গোকর্ণনাথ বলিতে লাগিলেন—

"রঘুনাথজী ছদ্মবেশে রাজার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী গিয়াছিলেন, আপন কৌশলে রাজাকে উদ্ধার করিয়াছেন, আপন সম্পূর্ণ নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিয়াছেন; শুনিয়াছি, শিবজী সাশ্রুনয়নে আপন দোষের ক্ষমা চাহিয়াছেন, রঘুনাথকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন, হাবেলদারের পদ হইতে একেবারে 'পাঁচহাজারী' করিয়া দিয়াছেন। সহরে অন্য কথা নাই, হাটে বাজারে অন্য কথা নাই, গ্রামে অন্য কথা নাই, কেবল রঘুনাথের বীরত্বকথা শুনিয়া সকলে জয় জয় নাদে ধন্যবাদ দিতেছে।"

আনন্দে, উল্লাসে সরযুর হৃদয় একেবারে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল,—রমণী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, চীৎকার শব্দ করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন।

একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন দর্শন।

" বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ হইও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক মন লইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়া দেখিলাম এ তিন ভুবনে আর কেহ মোর কাছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই, দাঁড়াব কাহার কাছে॥
একুলে ওকুলে গোকুলে দুকুলে, আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইলাম ও দুটী কমল পায়॥"

চণ্ডীদাস।

অনেক শুশ্রূষায় সরযূ চেতনা প্রাপ্ত হইলেন, হৃদয়ে সহসা বেদনা পাইয়াছিলেন বলিয়া গোকর্ণও তাঁহার স্ত্রীকে ভুলাইলেন,-কিন্তু সেই অবধি উদ্বেগে সরযুর আহার নিদ্রা নিয়মানুসারে হইত না, দিন গণিতেন, প্রহর গণিতেন, দণ্ড গণিতেন, সময়ে সময়ে পদশব্দে চকিত হইতেন। চিন্তায় ও অতিশয় উদ্বেগে শরীরে রোগের সঞ্চার হইতে লাগিল।

এক দিন, দুই দিন, দশ দিন, এক মাস অতিবাহিত হইল, রঘুনাথ আসিলেন না। তখন সরযূ আর সহ্য করিতে পারিলেন না; চিন্তায় শরীর ক্ষীণ হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে শরীর জ্বালা করিত, মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা যাইতেন।

রঘুনাথ জীবিত আছেন সরযূ তাহা জানিলেন, রঘুনাথ তবে আসেন না কেন? সরযুকে কি বিস্মৃত হইয়াছেন! বজ্রাঘাতের ন্যায় সরযুর হৃদয়ে এই ভীষণ চিন্তার আঘাত হইল। দিন দিন সরযুর হৃদয়ে এই চিন্তা প্রবল হইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় সরযূ নদীকূলে একাকিনী বসিয়া রহিয়াছেন, হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া চিন্তা করিতেছেন. এরূপ সময়ে গোকর্ণের কন্যা আসিয়া ধীরে ধীরে সরযুর পার্শ্বে বসিয়া বলিল,—

"দিদি! তোর বুকে বেদনা হইয়াছে তবে তুই অত ভাবিস্ কেন? ভাব্‌লেই ও বেদনা বৃদ্ধি হয়।"

সর। "না দিদি, ভাব্‌লে বেদনা একটু কমে, সেই জন্য ভাবি।"

শান্তি। "তুই কি ভাবিস্ দিদি? তোর বরের কথা বুঝি ভাবিস্?"

সরযূ সজলনয়নে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "হাঁ বরের কথাই ভাবি।"

বালি। "বর কবে আসিবে?"

সর। "বর আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে।" সরযূর মুখে হাস্য, চক্ষে জলবিন্দু!

বালি। "তবে কি হবে?"

সর। "আর একজন বর আমাকে বিবাহ করিবে।"

বালি। "সে কে দিদি?"

সর। "যম।"

বালি। "সে কে?"

সর। "আমার মত যাহাদের বরে ভুলিয়া যায়, যম তাহাকে বিবাহ করে।"

বালি। "তাহার ত বড় দয়ার শরীর।"

সর। "অতিশয় দয়ার শরীর; আহা! কবে সে আমাকে নেবে?"

বালি। "সে তোকে বিবাহ করিলে তোর পীড়া আর থাকিবে না?"

সর। "না; সমস্ত কষ্ট নিবারণ হবে। হা জগদীশ্বর!"

বালি। "সে কবে আসিবে?"

সর। "শীঘ্র।"

ক্ষণেক এইরূপ কথার পর বালিকা শয়ন করিতে গেল,—সরযূ একাকিনী সেই নদীকূলে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

রজনী জগতে গভীর অন্ধকার ঢালিতে লাগিল, আকাশে তারাগুলি মিট্ মিট্ করিতেছে, সম্মুখে নদী কুল কুল শব্দ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। সরযূ নদীর দিকে চাহিলেন, পার্শ্বস্থ কুঞ্জবনের দিকে চাহিলেন, শেষে সেই নৈশ আকাশের দিকে চাহিলেন। অনেকক্ষণ স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

সরযূ কি ভাবিতেছিলেন? অভাগিনী ভাবিতেছিলেন;—

"বিধাতা যদি আমাকে চিরদুঃখিনী করিতেন, কায়িক পরিশ্রমে যদি জীবনধারণ করিতে হইত, ভগ্ন কুটীরে যদি বাস করিতে হইত, ভিক্ষা করিয়া যদি দিনযাপন করিতে হইত, হৃদয়েশ! সরযূ তোমাকে পাইলে এ সমস্ত উল্লাসে সহ্য করিত! পিতা দূর করিয়াছেন, মাতা বাল্যকালে ত্যাগ করিয়াছেন, হৃদয়নাথ, তাহা সহ্য করিয়াছি! লোকে আমাকে কলঙ্কিনী বলিয়াছে, জগতে নিন্দা করিয়াছে, নাথ, তাহাও সহ্য করিয়াছি, তোমার চিন্তা করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়াছি, জগতে এরূপ কি আছে অভাগিনী তোমার জন্য যাহা সহ্য করিতে না পারে? রোগ, শোক, পরিতাপ, বিধাতা যে কোন

ক্লেশ এ দুঃখিনীকে দিতেন, নাথ! তোমাকে পাইলে সমস্ত সহ্য করিতে পারিতাম। কিন্তু সরযুর জীবন এখন শূন্য! নাথ, চিরজীবী হও, তোমার যশ, তোমার মান, জগতে বিস্তার হউক;—অভাগিনীকে বিদায় দাও! আমার আর অধিক দিন বাঁচিবার নাই, জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন।” নয়নজলে বালিকা শরীর আর্দ্র করিল। শেষে শ্রান্ত হইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—“বাল্যকালে মাতাকে হারাইলাম, যৌবনে ধর্ম্মপরায়ণ পিতা হারাইলাম। নাথ! অদ্য তুমিও অভাগিনীকে পায়ে ঠেলিলে। তোমাকে নিন্দা করি না, জীবিত থাকিতে সরযু যেন তোমার নিন্দা না করে। আমারই ভাগ্যদোষে তোমাকে পাইলাম না, আমি যে চির-অভাগিনী!”

অসহ্য বেদনায় শিরে করাঘাত করিয়া সরযু মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

কতক্ষণ সেই অন্ধকার রজনীতে সেই সুন্দর নদীতীরে সরযু মূর্চ্ছিতা হইয়া রহিলেন, ক্রমে শীতল বায়ুতে চেতনা হইল, সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের ন্যায় পূর্ব্বচিন্তা হৃদয়ে উদ্রেক হইতে লাগিল।

বোধ হইল যেন সেই দেববিনিন্দিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, বোধ হইল যেন সেই মধুময় কথাগুলি শুনিতে পাইলেন, “সরযু, সরযু, আমাকে ক্ষমা কর আমি তোমার রঘুনাথ।”

সরযু নয়ন উন্মীলিত করিলেন,—সহসা তারকালোকে সেই দীর্ঘাকার বীরপুরুষকে দণ্ডায়মান দেখিলেন,—বাহুদ্বয় সরযুর দিকে প্রসারিত, চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ!

এ কি রোগীর স্বপ্নমাত্র? বিধাতা! এ বিড়ম্বনা কি জন্য? সরযু নয়ন পুনরায় মুদিত করিলেন।

স্বপ্ন নহে, এ বিড়ম্বনা নহে! সরযু পুনরায় চাহিলেন, কি দেখিলেন?

দেখিলেন, হৃদয়নাথ অভাগিনীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, উঃ! সরযুর তপ্তহৃদয় সেই প্রশান্ত হৃদয়ে শীতল হইল, সরযুর ঘনশ্বাসের সহিত রঘুনাথের নিশ্বাস মিশ্রিত হইল, সরযুর কম্পিত ওষ্ঠদ্বয় রঘুনাথের ওষ্ঠ স্পর্শ করিল!

উঃ! সে স্পর্শে বালিকা শিহরিয়া উঠিল, বালিকা সংজ্ঞাশূন্য! এ কি প্রকৃত, না স্বপ্ন?

আনন্দভরে বায়ুতাড়িত পত্রের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে সরযু মনে মনে বলিলেন, “জগদীশ্বর! এ যদি স্বপ্ন হয়, যেন এ সুখনিদ্রা হইতে কখনও না জাগরিত হই!”

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

জীবন নির্ব্বাণ।

"হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শুনহ রাজন্।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় অবশ্য ঘটন॥
ধর্ম্ম অনুসারে জয় ঈশ্বর বচন।"
কাশীরাম দাস।

মহারাষ্ট্রদেশে মহাসমারোহ আরম্ভ হইল! শিবজী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, পুনরায় আরংজীবের সহিত যুদ্ধ করিবেন, ম্লেচ্ছদিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিবেন, হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিবেন। নগরে, গ্রামে, পথে, ঘাটে এই জনরব হইতে লাগিল।

এদিকে রাজা জয়সিংহ বিজয়পুর নগর আক্রমণ করিয়াও সে স্থান হস্তগত করিতে পারিলেন না। তিনি বার বার দিল্লীর সম্রাটের নিকট সহায়তার জন্য যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহাও বিফল হইল, অবশেষে তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন, যে তাঁহার সৈন্য সমেত বিনাশ ভিন্ন আরংজীবের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। তখন বিজয়পুর ত্যাগ করিয়া আরঙ্গাবাদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শেষ পর্য্যন্ত আরংজীবের বিশ্বস্ত অনুচরের ন্যায় কার্য্য করিলেন। আরংজীব তাঁহার প্রতি এরূপ অভদ্র আচরণ করিয়াছেন বলিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও সম্রাটের কার্য্যে ঔদাস্য প্রকাশ করিলেন না। যখন নিশ্চয় দেখিলেন মহারাষ্ট্রদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে তখন পর্য্যন্ত যতদূর সাধ্য সম্রাটের ক্ষমতা রক্ষার চেষ্টা করিলেন। লোহগড়, সিংহগড়, পুরন্দর প্রভৃতি স্থানে, সম্রাটের সেনা সন্নিবেশিত করিলেন, তদ্ভিন্ন যে যে দুর্গ অধিকারে রাখিবার সম্ভাবনা ছিল না, সে সমস্ত একেবারে চূর্ণ করিয়া দিলেন যেন শত্রুরা ব্যবহার করিতে না পারে।

কিন্তু এ জগতে এরূপ বিশ্বস্ত কার্য্যের পুরস্কার নাই; জয়সিংহ অকৃতকার্য্য হইয়াছেন শুনিয়া আরংজীব যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন, আরও অবমানিত করিবার জন্য তাঁহাকে দক্ষিণদেশের সেনাপতিত্ব হইতে অপসৃত করিয়া দিল্লীতে "তলব" করিলেন, যশোবন্তসিংহকে তাঁহার স্থলে পাঠাইয়া দিলেন।

চতুস্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

বিচার।

"পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইল উচিত।"

কাশীরাম দাস।

সেই দিবস সন্ধ্যার সময় রঘুনাথ একাকী নদীতীরে পদচারণ করিতেছিলেন; আপনার পদোন্নতি, সরযুর সহিত পুনর্মিলন, মুসলমানদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ, হিন্দুদিগের ভাবী স্বাধীনতা, এইরূপ নববিষয়ের চিন্তায় তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইতেছিল। সহসা পশ্চাৎ হইতে একজন ডাকিলেন—

"রঘুনাথ!"

রঘুনাথ পশ্চাৎদিকে চাহিয়া দেখিলেন চন্দ্ররাও জুম্‌লাদার! রোষে তাঁহার শরীর কাঁপিতেছিল, কিন্তু ঈশানী-মন্দিরের প্রতিজ্ঞা তিনি বিস্মৃত হয়েন নাই।

চন্দ্ররাও বলিলেন, "রঘুনাথ! এ জগতে তোমার ও আমার উভয়ের স্থান নাই, একজন মরিব।"

রঘুনাথ রোষ সম্বরণ করিয়া ধীরস্বরে বলিলেন, "চন্দ্ররাও! কপটাচারী মিত্রহন্তা চন্দ্ররাও! তোমার উপযুক্ত শাস্তি শিরচ্ছেদন, কিন্তু রঘুনাথ তোমাকে ক্ষমা করিলেন,—জগদীশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।"

চন্দ্র। "বালকের ক্ষমা গ্রহণ করা আমার অভ্যাস নাই। তোমার আর অধিক জীবিত থাকিবার সময় নাই, মন দিয়া আমার কথা শুন।

"জন্ম অবধি তুমি আমার পরম শত্রু, আমি তোমার পরম শত্রু। বাল্যকালে তোমাকে আমি বিষচক্ষুতে দেখিতাম, সহস্রবার প্রস্তরের উপর তোমার মস্তক আঘাত করিবার সঙ্কল্প মনে উদয় হইয়াছে! তাহা করি নাই, কিন্তু তোমার বিষয়নাশ করিয়াছি, তোমাকে দেশত্যাগী করিয়াছি, তোমাকে বিদ্রোহী বলিয়া অবমানিত ও দূরীকৃত করিয়াছি! চন্দ্ররাওয়ের ভীষণ জিঘাংসা তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে শান্ত হইয়াছিল।

"তোমার ভাগ্য মন্দ, পুনরায় উন্নতপদ লাভ করিয়া সৈন্যমধ্যে আসিয়াছ। চন্দ্ররাওয়ের স্থির প্রতিজ্ঞা জীবনে কখনও নিষ্ফল হয় নাই, এখনও হইবে না। অন্য উপায় ত্যাগ করিলাম, এই অসিদ্বারা তোর হৃদয় বিদ্ধ করিব, হৃদয়ের শোণিত পান করিয়া এ ভীষণ পিপাসা নির্ব্বাণ করিব। ভীরু! তোর অদ্য আমার হস্তে রক্ষা নাই।"

রোষে রঘুনাথের নয়ন অগ্নিবৎ জ্বলিতেছিল, কম্পিতস্বরে বলিলেন—"পামর! সম্মুখ হইতে দূর হ, নচেৎ আমি পবিত্র প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইব, সহসা তোর পাপের দণ্ড দিব।"

চন্দ্র। "ভীরু! এখনও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ, তবে আরও শোন্। উজ্জয়িনীর যুদ্ধে যে তীরে তোর পিতার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল সে শত্রুনিক্ষিপ্ত নহে, চন্দ্ররাও তোর পিতৃহন্তা!"

রঘুনাথ আর নয়নে কিছু দেখিতে পাইলেন না, কর্ণে শুনিতে পাইলেন না, রোষে অসি নিষ্কোষিত করিয়া চন্দ্ররাওকে আক্রমণ করিলেন। চন্দ্ররাওও ক্ষীণহস্তে অসি ধারণ করেন নাই, অনেক্ষণ যুদ্ধ হইল, উভয়ের অসিতে উভয়ের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, বর্ষার ধারার ন্যায় উভয়ের শরীর দিয়া রক্ত বহিতে লাগিল। চন্দ্ররাও বলে ন্যূন নহেন, কিন্তু রঘুনাথ দিল্লীতে চমৎকার অসিযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন, অনেক্ষণ যুদ্ধের পর চন্দ্র-রাওকে পরাস্ত করিলেন, তাঁহাকে ভূমিতে পাতিত করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে জানু স্থাপিত করিলেন; বলিলেন—

"পামর! অদ্য তোর পাপরাশির শেষ হইল, পিতা! আপনার মৃত্যুর পরিশোধ হইল।"

মৃত্যুর সময়েও চন্দ্ররাও নির্ভীক; বিকট হাস্য হাসিয়া বলিলেন, "আর তোর ভগ্নী কিনা হইল, সে চিন্তা করিয়া সুখে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।" পুনরায় হাস্য করিয়া উঠিলেন।

বিদ্যুতের ন্যায় সমস্ত কথা তখন রঘুনাথের মনে উপলব্ধি হইল! এই-জন্য লক্ষ্মী স্বামীর নাম করেন নাই, এইজন্য চন্দ্ররাওয়ের অনিষ্ট না হয়, প্রার্থনা করিয়াছিলেন! পিতৃহন্তা রক্তপিশাচ চন্দ্ররাও বলপূর্ব্বক প্রাণের লক্ষ্মীকে বিবাহ করিয়াছে! রোষে রঘুনাথের নয়ন দিয়া অগ্নি বহির্গত হইতে লাগিল; দন্ত কড়মড় করিল; কিন্তু তাঁহার উন্নত অসি চন্দ্ররাওয়ের হৃদয়ে স্থাপিত হইল না; তিনি ধীরে ধীরে চন্দ্ররাওকে ছাড়িয়া দিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

কম্পিতস্বরে কহিলেন, "পিশাচ! তোর পাপ জগদীশ্বর বিচার করুন, রঘুনাথ তোর দোষের দণ্ড দিতে অক্ষম!"

"দোষের, বিদ্রোহিতার দণ্ড দিতে আমি অক্ষম নহি" বলিয়া পশ্চাৎ হইতে একজন লোক নিকটে আসিলেন, রঘুনাথ চাহিয়া দেখিলেন শিবজী!

শিবজী ইঙ্গিত করাতে অন্তরাল হইতে চারিজন সৈনিক আসিল, চন্দ্র-রাওয়ের হস্ত বদ্ধ করিয়া তাহাকে বন্দীস্বরূপ লইয়া গেল!

পরদিন প্রাতে চন্দ্ররাওয়ের বিচার। রঘুনাথের পিতাকে হনন করিয়াছিলেন, সে দোষের বিচার নহে; রঘুনাথকে কল্য অন্যায় আক্রমণ করিয়াছিলেন, সে দোষের বিচার নহে; রুদ্রমণ্ডলদুর্গ আক্রমণপূর্ব্বে শত্রু রহমৎখাঁকে গুপ্ত সংবাদ দিয়াছিলেন, পরে সে দোষে রঘুনাথকে দোষী প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, অদ্য তাহারই বিচার!

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—আফ্‌গানসেনাপতি রহমৎখাঁ রুদ্রমণ্ডলে বন্দী হইলে পর শিবজী তাঁহাকে ভদ্রাচরণপূর্ব্বক ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, রহমৎখাঁও স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া আপন প্রভু বিজয়পুরের সুলতানের নিকট গমন করিয়াছিলেন। জয়সিংহ যখন বিজয়পুর আক্রমণ করেন তখন রহমৎখাঁ আপন নৈসর্গিক সাহসের সহিত যুদ্ধ করেন, একটী যুদ্ধে অতিশয় আহত হইয়া জয়সিংহের বন্দী হয়েন। জয়সিংহ তাঁহাকে আপন শিবিরে আনাইয়া অনেক যত্ন ও শুশ্রূষা করাইয়াছিলেন, কিন্তু সে রোগ আরাম হইল না, তাহাতেই রহমৎখাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পূর্ব্বদিন জয়সিংহ রহমৎখাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাঁ সাহেব! আপনার আর অধিক পরমায়ু নাই, আমার সমস্ত যত্ন ও চিকিৎসা বৃথা হইল। এক্ষণে যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে তবে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি।"

রহমৎখাঁ বলিলেন—"আমার মরণের জন্য আক্ষেপ নাই, কিন্তু আপনি শত্রু হইয়া আমার প্রতি যেরূপ সদাচরণ করিয়াছেন তাহার পরিশোধ করিতে পারিলাম না, এই আক্ষেপ রহিল। কি জিজ্ঞাসা করিবেন করুন, আপনার নিকট আমার অবক্তব্য কিছুই নাই।"

রাজা জয়সিংহ বলিলেন, "রুদ্রমণ্ডল আক্রমণের পূর্ব্বে একজন শিবজীর সেনানী আপনাকে সংবাদ দিয়াছিল; সে কে আমরা জানি না, আমার বোধ হয় একজন অন্যায় দণ্ডিত হইয়াছে।"

রহমৎ। "আমি জীবিত থাকিতে সে নাম প্রকাশ করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। রাজপুত! আপনার ভদ্রাচরণে আমি অতিশয় সম্মানিত হইয়াছি, কিন্তু পাঠান প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে অশক্ত।"

জয়সিংহ ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "যোদ্ধা! আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে আমি বলিতেছি না, কিন্তু যদি কোনও নিদর্শন থাকে তাহা আমাকে দিতে আপত্তি আছে?

রহমৎ। "প্রতিজ্ঞা করুন, সে নিদর্শন আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে পাঠ করিবেন না।"

জয়সিংহ তাহাই প্রতিজ্ঞা করিলেন; তখন রহমৎখাঁ তাঁহাকে কতক-গুলি কাগজ দিলেন।

রহমতের মৃত্যুর পরে রাজা জয়সিংহ সেই সমস্ত পত্রাদি পাঠ করিয়া দেখিলেন, বিদ্রোহী চন্দ্ররাও!

চন্দ্ররাও রহমৎখাঁকে স্বহস্তলিখিত পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা রাজা পড়িলেন, সে সম্বন্ধে অন্যান্য যে যে কাগজ ছিল তাহাও পাঠ করিলেন, চন্দ্ররাও পাঠানদিগের নিকট যে পারিতোষিক পাইয়াছিলেন তাহার প্রাপ্তিস্বীকার পর্য্যন্ত রাজা জয়সিংহ দেখিলেন।

জয়সিংহের মৃত্যুর দিনে তাঁহার মন্ত্রী সেই সমস্ত কাগজ শিবজীকে দিয়াছিলেন।

বিচারকার্য্যে অধিক সময় আবশ্যক হইল না। শিবজীর চিরবিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রী একে একে সেই পত্রগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন, যখন পাঠ সমাধা হইল তখন রোষে সমস্ত সেনানীগণ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। চন্দ্ররাও বিদ্রোহী, স্বয়ং শত্রুদিগকে সংবাদ দিয়া পারিতোষিক গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দোষে নির্দ্দোষী নিষ্কলঙ্ক বীর রঘুনাথের প্রাণদণ্ডের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এ কথা সকলে জানিতে পারিয়া রোষে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন।

তখন শিবজী বলিলেন—"পাপাচারী বিদ্রোহী, তোর মৃত্যু সন্নিকট, তোর কিছু বলিবার আছে?"

মৃত্যুর সময়ও চন্দ্ররাও নির্ভীক, তাঁহার দুর্দ্দমনীয় দর্প ও অভিমান এখনও পূর্ব্ববৎ। বলিলেন—

"আমি আর কি বলিব? আপনার বিচার ক্ষমতা প্রসিদ্ধ! একদিন এই দোষে রঘুনাথকে দণ্ড দিয়াছিলেন, অদ্য আমাকে দণ্ড দিতেছেন, আমার মৃত্যুর পর আর একদিন আর এক জনকে দণ্ড দিবেন, তখন জানি-বেন চন্দ্ররাও এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানে না, এ সমস্ত প্রমাণ মিথ্যা।"

এই বিদ্রূপে শিবজী মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ করিলেন—

"জল্লাদ, চন্দ্ররাওয়ের দুই হস্ত ছেদন কর; তাহা হইলে আর ঘুষ লইতে পারিবে না, তাহার পর তপ্ত লৌহদ্বারা ললাটে "বিশ্বাসঘাতক" অঙ্কিত করিয়া দাও, তাহা হইলে আর কেহ বিশ্বাস করিবে না।"

জল্লাদ এই নৃশংস আদেশ পালন করিতে যাইতেছিলেন এরূপ সময় রঘুনাথ দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমার একটী নিবেদন আছে।

শিব। "রঘুনাথ! এ বিষয়ে তোমার নিবেদন আমরা অবশ্য শুনিব, কেননা এই পামর তোমারই প্রাণনাশের যত্ন করিয়াছিল; তাহার কি প্রতিহিংসা লইতে ইচ্ছা কর, নিবেদন কর।"

রঘুনাথ। "মহারাজের অঙ্গীকার অলঙ্ঘ্য, আমি এই প্রতিহিংসা যাচ্ঞা করি, যে চন্দ্ররাওয়ের কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ না করে;—অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া বিনা দণ্ডে মুক্ত দিন্‌

সভাস্থ সকলে বিস্মিত ও স্তব্ধ!

শিবজী ক্রোধ সম্বরণ করিয়া কহিলেন—

তোমার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিল,—তোমার অনুরোধে সেজন্য চন্দ্ররাওকে ক্ষমা করিলাম। রাজবিদ্রোহাচরণের শাস্তি দিবার অধিকারী রাজা। সে শাস্তির আদেশ করিয়াছি, জল্লাদ, আপন কার্য্য কর।"

রঘু। "মহারাজের বিচার অনিন্দনীয়, কিন্তু দাস প্রভুর নিকট ভিক্ষা চাহিতেছে, চন্দ্ররাওকে বিনা দণ্ডে মুক্তিদান করুন।"

শিব। "এ ভিক্ষাদানে আমি অসমর্থ, রঘুনাথ তোমাকে এবার ক্ষমা করিলাম,—অন্যকে এতদূর ক্ষমা করিতাম না।" শিবজীর নয়ন প্রজ্বলিত হইতেছিল।

রঘু। "প্রভু দুই একটী যুদ্ধে এ দাস প্রভুর কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিল, প্রভুও দাসকে অভিলষিত পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, অদ্য সেই পুরস্কার চাহিতেছি, চন্দ্ররাওকে বিনা দণ্ডে মুক্ত করুন।"

রোষে শিবজীর নয়ন হইতে অগ্নিকণা বাহির হইতেছিল; গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "রঘুনাথ! রঘুনাথ! কখন কখন আমাদের উপকার করিয়াছিলে বলিয়া অদ্য আমাদিগের বিচার অন্যথা করিতে চাহ? রাজ-আদেশ অন্যথা হয় না; তুমিও আপনার বীরত্বের কথা আপনি বলিতে ক্ষান্ত হও!"

এ তিরস্কার-বাক্যে রঘুনাথের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; ধীরে ধীরে কম্পিতস্বরে উত্তর করিলেন,—

প্রভু! পুরস্কার চাহা দাসের অভ্যাস নাই। অদ্য জীবনের মধ্যে প্রথমবার পুরস্কার চাহিয়াছি, প্রভু যদি এ পুরস্কার দানে অসম্মত হয়েন, দাস দ্বিতীয়বার চাহিবে না। দাসের কেবল এইমাত্র ভিক্ষা, প্রভু সদয় হইয়া তাহাকে বিদায় দিন্‌, রঘুনাথ সৈনিকের ব্রত ত্যাগ করিবে, পুনরায় গোস্বামী হইয়া দেশে দেশে ভিক্ষা করিতে থাকিবে।"

শিবজী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, রঘুনাথের নিকট কত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন স্মরণ করিলেন,—রঘুনাথের চক্ষুতে জল দেখিয়া কাতর হইলেন, ক্রোধ বিলুপ্ত হইল, ধীরে ধীরে বলিলেন,—

রঘুনাথ! তোমার যাচ্ঞা দান করিলাম; চন্দ্ররাওকে মুক্ত করিলাম। রঘুনাথ! যে ব্রত ধারণ করিয়াছ তাহাতেই অবস্থিতি কর,—চিরকাল শিবজীর দক্ষিণহস্তের ন্যায় হইয়া থাকিও!”

সভাসদ্ সকলে নিস্তব্ধ! সকলে ঘৃণার সহিত চন্দ্ররাওয়ের দিকে চাহিলেন,—

ঘোর অভিমানী চন্দ্ররাও সাধারণের এ ঘৃণা ও নিন্দাবাক্য সহ্য করিতে পারিলেন না, রঘুনাথের দয়াতে তাঁহার রক্ষা হইল এ কথা সহ্য করিতে পারিলেন না।

চন্দ্ররাও ভীরু নহেন। ধীরে ধীরে ক্রোধ-জর্জ্জরিতশরীরে রঘুনাথের নিকট যাইয়া বলিলেন,—

“বালক! তোর দয়া আমি চাহি না, তোর দেওয়া জীবন আমি তুচ্ছ করি, তোর অনুগ্রহে আমি এইরূপে পদাঘাত করি,” বলিতে বলিতে রঘুনাথের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন। পরক্ষণে আপন ছুরিকা নিজ বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া অভিমানী ভীষণপ্রতিজ্ঞ চন্দ্ররাও জুমলাদার সাধারণের ঘৃণা হইতে আপনার চিরনিষ্কৃতি সাধন করিলেন। জীবনশূন্য দেহ সভাস্থলে পতিত হইল!

পঞ্চত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতা ভগিনী।

“ সুত পরিবার,
কেবা বল কার,
যেমত বৃক্ষের ছায়া।
জলবিম্ব প্রায়,
সকল মিছামায়,
কেবল ভবের মায়া॥”
কীর্ত্তিবাস ওঝা।

আমাদের আখ্যায়িকা শেষ হইয়াছে; এক্ষণে নায়ক-নায়িকাদিগের বিষয় দুই একটী কথা বলিয়া পাঠক মহাশয়ের নিকট বিদায় লইব।

বৃদ্ধ জনার্দ্দন কন্যাকে হারাইয়া বাতুলের ন্যায় হইয়াছিলেন, পুনরায় সরযুকে পাইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, "সরযু! সরযু! তোমার ন্যায় রত্ন আমি ত্যাগ করিয়াছিলাম? তোমাকে ত্যাগ করিয়া কি একদিনও জীবনধারণ করিতে পারি?" সরযুও পিতার গলা ধরিয়া ক্রন্দন করিয়া বলিলেন,—"পিতা, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, জীবন থাকিতে আর কখনও আপনার ছাড়া হইব না।"

পুলকিতহৃদয়ে বৃদ্ধ শুনিলেন যে রঘুনাথ রাজপুতসন্তান, অতি উন্নত হাড়াবংশীয় বীরপ্রবর গজপতিসিংহের পুত্র; সানন্দহৃদয়ে শুভদিনে কন্যা দান করিলেন। সরযুর সুখ কে বর্ণনা করিবে? চারি বৎসর যে দেবকান্তির জপ করিয়াছিলেন, সেই পুরুষদেবকে যখন আপন কোমল হৃদয়ে ধারণ করিলেন, তাঁহার ওষ্ঠে যখন উষ্ণ ওষ্ঠ স্থাপন করিলেন, তখন সরযু সুখে উন্মাদিনী হইলেন। যাঁহারা সে সুখ ভোগ করিয়াছ, অনুভব কর, লেখক বর্ণনায় অক্ষম!

আর রঘুনাথ?—রঘুনাথ তোরণদুর্গে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা কি অদ্য সার্থক হইল? সেই প্রিয় কণ্ঠমালা বার বার সরযুর হৃদয়ে লাগাইয়া দিলেন, সেই পুষ্পবিনিন্দিত দেহ হৃদয়ে ধারণ করিলেন, সেই কোমল স্নেহপূর্ণ নয়নের দিকে চাহিয়া চাহিয়া উন্মত্তপ্রায় হইলেন!

সরযু তাঁহার সপ্তমবর্ষীয়া "দিদি"কে বিস্মৃত হইলেন না। রঘুনাথের অনুরোধে শিবজী গোকর্ণকে একটী জায়গীর দান করিলেন ও গোকর্ণের পুত্র ভীমজীকে উন্নতি দান করিয়া হাবেলদার পদে নিযুক্ত করিলেন।

সরযু দিদিকে সর্ব্বদাই আপন গৃহে রাখিতেন ও বরের সহিত "সমান সমান" ভাল বাসিতেন,—কয়েক বৎসর পরে একটী সদ্বংশীয় সুচরিত্র পাত্র দেখিয়া দিদির বিবাহ দিলেন। বিবাহদিবসে সরযু ও রঘুনাথ স্বয়ং উপস্থিত রহিলেন; সরযু কন্যার কাণে কাণে বলিলেন,—"দেখিও দিদি! যাহা বলিয়াছিলে সে কথা যেন রাখিও,—বরের চেয়ে আমাকে ভাল বাসিবে!"

রঘুনাথ আখ্যায়িকাবিবৃত সময়ের পর ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত সুখ্যাতি ও সম্মানের সহিত শিবজীর অধীনে কার্য্য করিতে লাগিলেন। যশোবন্ত-সিংহ যখন জানিতে পারিলেন রঘুনাথ তাঁহারই প্রিয় অনুচর গজপতি-সিংহের পুত্র, তখন রঘুনাথকে পৈতৃক ভূমি সমস্ত ছাড়িয়া দিলেন, তাহা ভিন্ন অনেক জায়গীর দান করিলেন। কিন্তু শিবজী রঘুনাথকে দেশে যাইতে দিলেন না, যতদিন জীবিত ছিলেন, রঘুনাথকে নিকটে রাখিলেন।

পরে যখন ১৬৮০ খৃঃ অব্দে চৈত্র মাসে শিবজীর মৃত্যু হয়, যখন শিবজী অযোগ্য পুত্র শম্ভুজী পিতার পুরাতন ভৃত্যদিগকে একে একে অবমানি বা কারারুদ্ধ করিতে লাগিলেন; রঘুনাথ আর মহারাষ্ট্রে থাকিলে উপক নাই দেখিয়া সরযূ ও জনার্দ্দনের সহিত স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পৈতৃক জায়গীর অধিকার করিলেন, পৈতৃক প্রশস্ত গৃহ রঘুনাথ সরযূর বালকবালিকাদিগের ক্রীড়ানন্দ ও হাস্যধ্বনিতে শব্দিত হই লাগিল!

পাঠক! ইচ্ছা, এই স্থানেই আপনার নিকট বিদায় লই, কিন্তু আ এক জনের কথা বলিতে বাকি আছে; শান্ত চিরসহিষ্ণু লক্ষ্মীরূপি লক্ষ্মীর কি হইল?

যেদিন চন্দ্ররাও আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, রঘুনাথ অনতিবিলম্ব ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেম; যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহা হৃদয় স্তম্ভিত হইল। দেখিলেন শবের পার্শ্বে লক্ষ্মী আলুলায়িতবে গড়াগড়ি দিতেছেন, ঘন ঘন মোহ যাইতেছেন, সময়ে সময়ে হৃদয়বিদার আর্ত্তনাদে ঘর পরিপূরিত করিতেছেন! হিন্দুরমণীর পতির মৃত্যুতে ভীষণ যাতনা হয় কে বর্ণনা করিতে পারে? অদ্য লক্ষ্মীর নয়নের আলো নির্ব্বাণ হইয়াছে, হৃদয় শূন্য হইয়াছে, জগৎ অন্ধকারময় হইয়াছে শোকে, বিষাদে, নৈরাশে, নব বৈধব্যের অসহ্য যাতনায়, বিধবা ঘন ঘ আর্ত্তনাদ করিতেছে!

রঘুনাথ সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলেন, সান্ত্বনা দূরে থাকুক, লক্ষ্ম প্রাণের ভ্রাতাকে চিনিতেও পারিলেন না। ঝর ঝর করিয়া অশ্রুবর্ষ করিতে করিতে রঘুনাথ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সন্ধ্যার সময় পুনরায় ভগিনীকে দেখিতে আসিলেন, লক্ষ্মীর ভা পরিবর্ত্তন দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন লক্ষ্মীর নয়নে জ নাই, ধীরে ধীরে স্বামীর মৃতদেহ সুন্দর শুভ্র সুগন্ধ পুষ্প দিয়া সাজাইতে ছেন। বালিকা যেরূপ মনোনিবেশ করিয়া পুত্তলি সাজায়, লক্ষ্মী সেইরূ মনোনিবেশপূর্ব্বক মৃতদেহ সাজাইতেছেন।

রঘুনাথ গৃহে আসিলে লক্ষ্মী ধীরে ধীরে রঘুনাথের নিকটে আসিলে অতি মৃদু পদবিক্ষেপে আসিলেন, যেন শব্দ হইলে স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হইবে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন—

ভাই রঘুনাথ! তোমার সঙ্গে যে আর একবার দেখা হইল আমা পরম ভাগ্য, এখন আর আমার মনে কোনও কষ্ট থাকিল না।"

সাশ্রুনয়নে রঘুনাথ বলিলেন—"প্রাণের ভগিনী লক্ষ্মী, আমি তোমার সঙ্গে এ সময়ে দেখা না করিয়া কি থাকিতে পারি ?"

লক্ষ্মী অঞ্চল দিয়া রঘুনাথের চক্ষের জল মোচন করিয়া বলিলেন—

"সত্য ভাই তোমার দয়ার শরীর, তুমি হৃদয়েশ্বরের জন্য রাজার নিকট যে আবেদন করিয়াছিলে শুনিয়াছি। আমার ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা হইয়াছে, জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন।" নিজের চক্ষু হইতে একবিন্দু জল মোচন করিলেন।

রঘু। "লক্ষ্মী ! তুমি বুদ্ধিমতী আমি চিরকাল জানি, অসহ্য শোক কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়াছ দেখিয়া তুষ্ট হইলাম। মনুষ্যের জীবন শোকময়, তোমার কপালে যাহা ছিল ঘটিয়াছে, সে শোক সহিষ্ণু হইয়া বহন কর, আইস, আমার গৃহে আইস, ভ্রাতার ভালবাসায় ভ্রাতার যত্নে যদি সন্তোষ দান করিতে পারে, লক্ষ্মী, আমি ক্রটি করিব না।"

লক্ষ্মী একটু হাসিলেন, সে হাস্য দেখিয়া রঘুনাথের প্রাণ শুকাইয়া গেল। ঈষৎ হাসিয়া লক্ষ্মী বলিলেন—

"ভ্রাতা, তোমার দয়ার শরীর, কিন্তু লক্ষ্মীকে জগদীশ্বরই স্বয়ং সান্ত্বনা করিয়াছেন, শান্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। হৃদয়েশ্বর চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছেন, তিনি জীবদ্দশায় দাসীকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, দাসী জীবনে তাঁহার প্রণয়িনী ছিল, মরণে তাঁহার সঙ্গিনী হইবে।"

রঘুনাথের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। তখন তিনি লক্ষ্মীর ভাব পরিবর্ত্তনের কারণ বুঝিতে পারিলেন, লক্ষ্মীর শান্তভাবের হেতু বুঝিতে পারিলেন ; লক্ষ্মী সহমরণে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছেন।

তখন অনেকক্ষণ অবধি লক্ষ্মীর প্রতিজ্ঞাভঙ্গের চেষ্টা করিলেন, অনেক বুঝাইলেন, অনেক ক্রন্দন করিলেন, এক প্রহর রজনী পর্য্যন্ত লক্ষ্মীর সহিত তর্ক করিলেন ; ধীর শান্ত লক্ষ্মীর একই উত্তর—"হৃদয়েশ্বর আমাকে বড় ভাল বাসিতেন, আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।"

অবশেষে রঘুনাথ সজলনয়নে বলিলেন,—

লক্ষ্মী, একদিন আমার জীবন নৈরাশে পূর্ণ হইয়াছিল, আমি জীবনত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। ভগিনী, তোমার প্রবোধে, তোমার স্নেহময় কথায় সে সঙ্কল্প ছাড়িলাম, পুনরায় কার্য্যজগতে প্রবেশ করিলাম। আজি তুমি কি ভ্রাতার কথা রাখিবে না? তুমি কি ভ্রাতাকে ভাল বাস না।

লক্ষ্মী পূর্ব্ববৎ শান্তভাবে উত্তর করিলেন—

"ভাই, সে কথা আমি বিস্মৃত হই নাই, তুমি লক্ষ্মীকে ভালব লক্ষ্মীর কথা শুনিয়াছিলে তাহা বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু ভাবিয়া পুরুষের অনেক আশা, অনেক উদ্যম, অনেক অবলম্বন, একটী যা অন্যটী থাকে; একটী চেষ্টা নিষ্ফল হইলে দ্বিতীয়টী সফল হয়। তুমি সেদিন ভগিনীর কথাটী রাখিয়াছিলে, অদ্য তোমার কলঙ্ক দূরী হইয়াছে, ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে, সুযশ দেশদেশান্তরে বিস্তৃত হইয়া কিন্তু অভাগিনী নারীর কি আছে? অদ্য আমি যে নয়নের মণিটী হা ইয়াছি তাহা কি জীবনে আর পাইব? যে মহাত্মা দাসীকে এত বাসতেন, এত অনুগ্রহ করিতেন, জীবিত থাকিলে তাঁহাকে কি পাইব? ভাই! তুমি লক্ষ্মীকে বাল্যকাল হইতে বড় ভালবাসিয়াছ, সদয় হও। লক্ষ্মীর একমাত্র সুখের পথে কাঁটা দিও না, যিনি দাসীকে ভালবাসিতেন তাহার সহিত যাইতে দাও!"

রঘুনাথ নিরস্ত হইলেন; স্নেহময়ী ভগিনীর অঞ্চলে মুখ লুকা বালিকার ন্যায় ঝর ঝরে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এ অসার ক সংসারে ভ্রাতা ভগিনীর অথগুনীয় প্রণয়ের ন্যায় পবিত্র নিষ্ক প্রণয় কি আছে? স্নেহময়ী ভগিনীর ন্যায় অমূল্য রত্ন এ বিস্তীর্ণ জগতে কোথায় খুঁজিলে পাইব?

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় চিতা প্রস্তুত হইল, চন্দ্ররাওয়ের শব তা উপর স্থাপিত হইল, হাস্যবদনা লক্ষ্মী সুন্দর পট্টবস্ত্র ও অলঙ্কারাদি পরি করিয়া একে একে সকলের নিকট বিদায় লইলেন।

চিতাপার্শ্বে আসিলেন, দাসীদিগকে অলঙ্কার, রত্ন, মুক্তা বিতরণ করি লাগিলেন, স্বহস্তে তাহাদিগের নয়নের জল মোচন করিয়া মধুর-বা সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, জ্ঞাতি কুটুম্বিনী-দিগের নিকট বিদায় লইলে গুরুদিগের পদধূলি লইলেন, সপত্নীদিগের আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দি সকলের নয়নের জল অঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দিলেন, মধুময় বাক্যদ্ব সকলকে প্রবোধ দিলেন।

শেষে রঘুনাথের নিকট আসিলেন,—

বলিলেন, "ভাই! বাল্যকাল অবধি তোমার লক্ষ্মীকে তুমি বড় ভা বাসিতে, অদ্য লক্ষ্মী ভাগ্যবতী, অদ্য চিরসুখিনী হইবে, একবার ভা বাসার কায কর,—সস্নেহে কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিদায় দাও, তোমার লক্ষ্মী বিদায় দাও।"

রঘুনাথ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, লক্ষ্মীর দুটী হাত ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন! লক্ষ্মীরও চক্ষুতে জল আসিল।

সস্নেহে ভ্রাতার চক্ষুর জল মুছাইয়া লক্ষ্মী বলিতে লাগিলেন—

"ছি ভাই, শুভকার্য্যে চক্ষুর জল ফেল কি জন্য? পিতার ন্যায় তোমার সাহস, পিতার ন্যায় তোমার মহৎ অন্তঃকরণ, জগদীশ্বর তোমার আরও সম্মান বৃদ্ধি করিবেন; জগৎ তোমার যশে পূর্ণ হইবে! লক্ষ্মীর শেষ বাসনা এই, জগদীশ্বর যেন রঘুনাথকে সুখে রাখেন! ভাই, বিদায় দাও, দাসীর জন্য স্বামী অপেক্ষা করিতেছেন।"

কাতরস্বরে রঘুনাথ বলিলেন—

"লক্ষ্মী, তোমা বিনা জগৎ তুচ্ছজ্ঞান হইতেছে, জগতে আর রঘুনাথের কি আছে? প্রাণের লক্ষ্মী! তোকে কিরূপে বিদায় দিব, তোকে ছাড়িয়া আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব?" আর্ত্তনাদ করিয়া রঘুনাথ ভূমিতে পতিত হইলেন।

অনেক যত্ন করিয়া লক্ষ্মী রঘুনাথকে উঠাইলেন, পুনরায় চক্ষুর জল মুছিয়া দিলেন, অনেক সান্ত্বনা করিলেন, অনেক বুঝাইলেন, বলিলেন, "ভ্রাতঃ তুমি বীরশ্রেষ্ঠ! পুরুষের যাহা ধর্ম্ম তাহা তুমি পালন করিতেছ, তোমার লক্ষ্মীকে নারীর ধর্ম্ম পালন করিতে দাও। আর বিলম্ব করিও না, বাধা দিও না; ঐ দেখ পূর্ব্বদিকে আকাশ রক্তবর্ণ হইয়াছে, তোমার লক্ষ্মীকে বিদায় দাও।"

গদ্ গদ্‌স্বরে রঘুনাথ বলিলেন,—

লক্ষ্মী, প্রাণের লক্ষ্মী, এ জগতে তোমাকে বিদায় দিলাম, ঐ আকাশে ঐ পুণ্যধামে আর একবার তোমাকে পাইব। সে পর্য্যন্ত জীবন্মৃত হইয়া রহিলাম।'

ভ্রাতার চরণধূলি লইয়া লক্ষ্মী চিতাপার্শ্বে যাইলেন, স্বামীর পদদ্বয়ে মস্তক স্থাপন করিয়া বলিলেন, "হৃদয়েশ্বর! জীবনে তুমি দাসীকে বড় ভাল বাসিতে, এখন অনুগ্রহ কর, যেন তোমার পদপ্রান্তে বসিয়া তোমার সঙ্গে যাইতে পারি। জন্ম জন্ম যেন তোমাকে স্বামী পাই,—জন্ম জন্ম যেন লক্ষ্মী তোমার পদসেবা করিতে পায়। জগদীশ্বর! লক্ষ্মীর অন্য কামনা নাই।"

ধীরে ধীরে চিতা আরোহণ করিলেন, স্বামীর পদপ্রান্তে বসিলেন, পদদ্বয় ভক্তিভাবে অঙ্কের উপর উঠাইয়া লইলেন। নয়ন মুদিত করিলেন,—বোধ হইল যেন সেই মহূর্ত্তেই লক্ষ্মীর আত্মা স্বর্গে প্রবেশ করিল।

অগ্নি জ্বলিল; অতিশয় ঘৃত থাকায় শীঘ্র অগ্নি ধূ ধূ শব্দে জ্বলিয়া উঠিল। প্রথমে অগ্নিজিহ্বা লক্ষ্মীর পবিত্র শরীর লেহন করিতে লাগিল, শীঘ্রই সতেজে চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া লক্ষ্মীর মস্তকের উপর উঠিল, নৈশ গগনের দিকে মহাশব্দে ধাবমান হইল। লক্ষ্মীর একটী অঙ্গ নড়িল না, একটী কেশ কম্পিত হইল না!

এক প্রহরের মধ্যে অগ্নি নির্ব্বাণ হইল, কিন্তু সেই ভীষণ দৃশ্য, চিতার সেই নৈরাশজনক ধূ ধূ শব্দ রঘুনাথ জীবনে বিস্মৃত হইলেন না।

সমাপ্ত।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Street, Calcutta.